

বর্ষ ৩৫
অঙ্ক-১-৬

ভারতী

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১৩১৮

(বৈশাখ—চৈত্র)

১৩১৮ সালের

বর্নানুক্রমিক সূচী

বিষয়	লেখক
অকৃতজ্ঞ (গল্প)	শ্রীমদীশ্বরচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
অবনাস্ত্রনাথ ও চিত্তাঞ্জন-পঙ্কতি (সচিত্র)	শ্রী বিনীতকুমার হালদার
অবনাস্ত্রনাথের পথ	শ্রী অবনাস্ত্রনাথ ঠাকুর ১১৪
অপূর্ণ পোনার ঘরে (কবিতা) ...	শ্রী বেবেস্ত্রনাথ বেন ১৩৭
অভিমান ও দ্বন্দ্ব (কবিতা)	শ্রী কালিদাস রায় ২৫৪
অভেদন (কবিতা)	শ্রীমতী চিত্রমণি দেবী ২৫৫
অঙ্গপূর্ণার মন্দির (উপভাস)	শ্রীমতী নিকশমা দেবী ৭০৮, ৭২৪, ৮২৪, ৯০৯, ১০৫০, ১১৫০
অযেবন (কবিতা)	শ্রী ভুবনেশ্বর রায় চৌধুরী ১১৪৮
অবাকনি শেলি (সচিত্র)	শ্রী দেবানন্দনাথ চক্রবর্তী এম.এ ... ৭৭২
অভিভাবন	শ্রীমদীশ্বরনাথ ঠাকুর ১১০৯
আজ (কবিতা)	শ্রী বিহু হিচুধন মজুমদার ৮৭২
আমেরিকাতে প্রিয়ানবাস (সচিত্র)	শ্রী নিকশমজুমদার ২২
আমার স্মৃতি (গল্প—চরম)	শ্রী জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৯
আমাত (কবিতা)	শ্রীমতী নিকশমা দেবী ২৫৭
আমাদের বিনোদন ও উদ্যোগ (গল্প)	শ্রীমতী আশোদিনী ঘোষদাস ৩২৭
আবিস্ফোটা (কবিতা)	শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ ৫০০
আলোর পথ (কবিতা)	শ্রীমতী হেমলতা দেবী ৫২৯
আগমনী	শ্রীমতী প্রমথদেবী দেবী ৫৫৫
আগা—তীর সখা লিখন	শ্রী শব্দকল্প ভট্টাচার্য ৭১০
আগা নিবেদিতা (সচিত্র)	৯২৪
আমিষের আগার (সচিত্র)	৯২৪
আমি গুন আর (কবিতা)	শ্রীমতী বর্ণনাক্ষী কলিগাল ৯১১
ইংলণ্ডের ট্রেনে ভ্রমণ (সচিত্র)	শ্রীমতী সরলাদেবী দি ৬০০
ইংলণ্ডে ভ্রমণে যাঁরা গেলেন (সচিত্র—সংগৃহীত)	৬০২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চিহ্নামণির বিপদ (গল্প)	ডী. এ. তিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৪৮
চৈত (কবিতা)	ডী. মতী স্বর্ণগতা কাঞ্জিলাল	১২২০
চোৰ (গল্প)	ডী. মতী অম্বুজা দেবী	১১৬৭
জাতিমতি (গল্প—চরম)	ডী. জ্যোতিঃপ্রসন্ন ঠাকুর	৪৮১
জাপানী আকৃতি ও প্রকৃতি (সচিত্র)	ডী. ব্রজনাথ সরকার	৪১
জগৎ ও মৃত্যু (কবিতা—চরম)	ডী. সত্যেন্দ্রনাথ বোষ	১৬৪
জীবন ও মৃত্যু (কবিতা)	ডী. গদ্যমোহন বাগচী	২২৮
জাপানে অতিথি সংস্কার (সচিত্র)	ডী. ব্রজনাথ সরকার	২৮১
জাপানের ধর্ম (সচিত্র)	ডী. ব্রজনাথ সরকার	৪১২, ৭৪১
জগদ্বাসী	ডী. চেম্বের্স কুমার স্বায়	৬৩৪
জাহাঙ্গীর কাল	ডী. অম্বিকুমার সেন	৮১৪
জাপানের সেনা এবং নৌ-বিশাগ (সচিত্র)	ডী. ব্রজনাথ সরকার	১০৬১
জুনি (সচিত্র)	ডী. মতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৮৭৩
ঊন-কাচিনীর একটি চিত্র (চরম)	ডী. বিশিষ্টাচারী চক্রবর্তী	৪৭১
ডাকঘর	ডী. অজিতকুমার চক্রবর্তী	১১৪৩
তাপ ও উত্তাপ	ডী. পদমজ্ঞ ভট্টাচার্য	২০৪
তিমটি-স্বপ্ন (গল্প—চরম)	ডী. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪৭
দৈবীপাল (গল্প)	ডী. হৃদয়চন্দ্র স্বায়	৩৪৭
দণ্ড সংগ্রহ (গল্প)	ডী. মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪২
দূরে (কবিতা)	ডী. তপস্বীস্বর স্বায়	৪৮৩
দুইজন মহারাজ (সাময়িক প্রসঙ্গ)		৪৮৮
দুই দিক (সচিত্র)	ডী. অম্বিকুমার ঠাকুর	৪০১
দলিত আত্মিকার জুলুমতি (সচিত্র—চরম)	ডী. মদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬৬
বেহত্যাতি (চরম)	ডী. অম্বিকুমার দেবী	২০০
বিনি (সচিত্র)	ডী. কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩২৮
বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস (সচিত্র)	ডী. মতী স্বর্ণকুমারী দেবী	১০১৮
বাস্তব পদার্থের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (সচিত্র)	ডী. পদমজ্ঞ ভট্টাচার্য	১১৬
বর্ণের মনোগ্রাফ	ডী. বীজনাথ ঠাকুর	১০৮১
বনবর্ষ (কবিতা)	ডী. মতী স্বর্ণকুমারী দেবী	১
বনভাষ্যের নব সামাজিকতা	ডী. শিবনাথ শাস্ত্রী	৪০১
বাগিকাল (চরম)	ডী. বীজনাথ সেন	১২১০

ମୂଳ

ନିବନ୍ଧ

ନିବନ୍ଧର ଶୃଙ୍ଖଳନ (କବିତା)

ନିବେଦନ (କବିତା)

ଫୋଟୋପୁସ୍ତକ (ଉପକ୍ରମ)

ଆର୍ଥନା (କବିତା)

ଆବିଷ୍କାର (ଗଳ୍ପ)

ଆଜିନି ଦିନର ଡାକ୍ତରୀ (ଗଳ୍ପ - ଚଉକ)

ପୂର୍ବମାସ (କବିତା)

ମାତାମତେନୀ ମାତା

ଆଦିଆ (ଗଳ୍ପ)

ଆଦିଆ ଓ ମରଣ (କବିତା)

ପୂର୍ବଦିନର ଦିନ (ଚଉକ)

ମାତାମତେନୀ (ଗଳ୍ପ)

ମାତାମତେନୀ କୋଥର

ଆଦିଆ (ଗଳ୍ପ)

ଆଦିଆ (କବିତା)

ଆଦିଆ ମାଗର ଦିନେ ଶୁଣିବାକୁ (ଗଳ୍ପ - ଚଉକ)

ମାତାମତେନୀ (ଗଳ୍ପ)

ଆଦିଆ

ମାତାମତେନୀ (ଗଳ୍ପ)

ମାତାମତେନୀ (କବିତା)

ମାତାମତେନୀ

ଆଦିଆ ଚାକ-ମାତା-ମାତାମତେନୀ

ମାତାମତେନୀ ଦିନେ ଦିନେ ଶୁଣିବାକୁ

ବର୍ଷ-ବର୍ଷ (କବିତା)

ବିଜୟ (ଗଳ୍ପ)

ବିଜୟ (ଗଳ୍ପ)

ବିଜୟ ଓ ବୈଷାଖ (କବିତା)

ବିଜୟ ବାଦୀ (ଗଳ୍ପ)

ବିଜୟବାର (ଗଳ୍ପ)

ମେଧକ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ର ମାତା

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ର

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଦେବୀ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ର

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ମେଧକ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ମାତା ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ର

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ମେଧକ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଦେବୀ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ମେଧକ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଦେବୀ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଦେବୀ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଦେବୀ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଦେବୀ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଦେବୀ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଦେବୀ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଦେବୀ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଦେବୀ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଦେବୀ

ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ରମାତା ଦେବୀ

ଶ୍ରୀ

ভাৰতী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বৰ্ষ শেখ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	১২৫৬
বৰ্ণশেখ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	১৩৭
বিশ্ব শতাব্দী (কবিতা)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	১৪৭
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	২৪৪
বৈশ্বাত্মী অৰ্জুণ সখ্যা	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৩০১
বৰ্ণা-মহাভাৰত (কবিতা)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৩১২
বিশ্ব (কবিতা—চয়ন)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৩৮৩
বাণেশ্বৰীয়া কথা (গল্প)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৪১১
বাণেশ্বৰীয়া কথা (কবিতা)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	১১৮০
বাণেশ্বৰীয়া কথা (কবিতা)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৪৮২
বাণেশ্বৰীয়া কথা (কবিতা)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৪২১, ৪৩৫, ৮০৫, ৯১৫, ৯২০, ৯২৫, ৯৩০, ৯৩৫, ৯৪০
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৪২৬
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৪৩৪
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৮০১
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৯১৭
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৮৪০
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	১০৮০
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	১১০৪
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	১১১৫
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	১১৩২
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	১২১৮
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৭৮
বাক্স ও সমাজ	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৩৬৫, ৪৬৭, ৫১৫, ৬২০, ৮০৪, ৮১১, ৯১৫, ৯২০
ভাৰত নাট্য উৎপত্তি (চয়ন)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	১২০৮
ভাৰত নাট্য উৎপত্তি (চয়ন)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৪৩৫
ভাৰত নাট্য উৎপত্তি (চয়ন)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৪২০
ভাৰত নাট্য উৎপত্তি (চয়ন)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৬৭২
ভাৰত নাট্য উৎপত্তি (চয়ন)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৭৭১
ভাৰত নাট্য উৎপত্তি (চয়ন)	ত্ৰিমতা ত্ৰিবিধবা দেবী	৯১৭

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

মানসিক (কবিতা)

ঐশ্বরকুমার চার চৌধুরী

৪*

মানবের ভবিষ্যৎ (চরন)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মহাত্মা (সচিত্র উপজ্ঞান—চরন)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী ৬৬, ১৭৪, ২৮৭, ৩৮১, ৪৭১, ৫৭৪, ৬৮৬, ৭৯১, ৮৮২, ৯৮০, ১০৯৭, ১১২৩

মানবদেহের জৈববিকাশ

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

৮২

মহাত্মা (গাথা)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মৃত্যু পরেও আত্মিক জীবন (চরন)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মহাত্মা খৃষ্টের একটি উপদেশ

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মির্জার স্বপ্নদর্শন (চরন)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মুখ্যমন্ত্রক ও মনোবৈজ্ঞানিক (সচিত্র)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মানব উপস্থিতিতে হিন্দুধর্ম ও সাহিত্য

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মিলন (গল্প—চরন)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মৃত্যুর সহিত স্বপ্নগৃহ (সাময়িক প্রসঙ্গ)

মোহনবাগান দুটোপল্লব (সচিত্র—সাময়িক প্রসঙ্গ)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মুক্ত ও শুদ্ধি (কবিতা)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মহাত্মা কুচিহাস (সচিত্র)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মা (গল্প—চরন)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মিলন (গল্প—চরন)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

যোগাযোগ

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

যৌবন জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

যোগাযোগ (গাথা—চরন)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মামলা (নাটোপজ্ঞান)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মামলা (সচিত্র)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মামলা (কবিতা)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মামলা (গল্প)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মামলা (সচিত্র)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মামলা (গল্প)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মামলা (সচিত্র)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মামলা (সচিত্র)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মামলা (সচিত্র)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

মামলা (কবিতা)

ঐশ্বরকুমার চৌধুরী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
রামটেক (সচিত্র)	ঐশ্বর্যবন্ধুনাথ বসু	২৫৬
রামপ্রসঙ্গ		১১১৬
লীলাব, কাহিনী (গল্প - চরন)	ঐক্যোতিব্রজনাথ ঠাকুর	১২৫, ১৭৪
লভার নটরাজ শিব (সচিত্র)	মহামহোপাধ্যায় ডাঃ লতীশচন্দ্রবিজয়াচরণ	১০১
শাণে বস (গল্প)	ঐক্যনাথরজন চট্টোপাধ্যায়	১০৮
শোক সংবাদ		
শারদা (কবিতা)	ঐক্যোতিব্রজনাথ ঠাকুর	৩২৮
শব্দগোষ্ঠীর দার্শনিক সিদ্ধান্ত	ঐক্যব্রজনাথ বসু	৬৩০, ৭৬২, ৮৬২, ৯৭৭, ১০৪২, ১১৫২
শান্তি (গল্প)	ঐক্যচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭০৫
শিববাহিনী (কবিতা)	ঐক্যোতিব্রজনাথ বসু	১২২০
ঐক্য	ঐক্যোতিব্রজনাথ বসু	২০৮
স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সচিত্র)		৮৮
সমালোচনা	ঐক্যোতিব্রজনাথ ঠাকুর	২৮, ২০০, ২৭৩, ৪০০, ৪২৮, ৬২৬, ৭২৬, ৮২৩, ৯০৮, ১০৩০, ১১২২, ১২০৫
সংস্কৃতশিল্পী	ঐক্যোতিব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭৮
গাম্ভীর্য প্রসঙ্গ (সচিত্র)		১২৫, ৪৮৮, ৬২০, ৭২১
সম্মতি-স্বাধীন (কবিতা)	ঐক্যোতিব্রজনাথ বসু	২১০
সবুজ সম্মতি (নটক)	ঐক্যোতিব্রজনাথ বসু	২৫৬
সুন্দর	ঐক্যোতিব্রজনাথ ঠাকুর	২০৮
সুন্দর (কবিতা)	ঐক্যোতিব্রজনাথ বসু	১১৮৮
স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন (সচিত্র)...		৩৬৩
সবুজ সুন্দর (সচিত্র—চরন)		৩৭৮
সন্ন্যাসী কল্যাণের স্মৃতিসংকেত (সচিত্র)	ঐক্যোতিব্রজনাথ ঠাকুর	৩৮৭
সিদ্ধি (কবিতা)	ঐক্যোতিব্রজনাথ বসু	১২৭
সারনাথ (সচিত্র—চরন)	ঐক্যোতিব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়	৪৭৬
স্বাধীন (কবিতা—চরন)	ঐক্যোতিব্রজনাথ বসু	৪৭৫
সীতারাম (সচিত্র)	ঐক্যোতিব্রজনাথ বসু	৪০৬
সরোজবাসিনী (কবিতা)	ঐক্যোতিব্রজনাথ বসু	৪১২
সৌভাগ্য (কবিতা)	ঐক্যোতিব্রজনাথ বসু	৪৩৩
সত্যের প্রতি (কবিতা)	ঐক্যোতিব্রজনাথ বসু	৪৫৩

হুঁচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
স্বপ্নলিপি	ঐতহেন্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪০
সংসারের সার (কবিতা—চরন)	ঐতহেন্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪৮
মিলাহী যুদ্ধের ইতিহাস (সচিত্র)		৬৬২
সকিত ধন (গল্প চরন)		৬৭৮
মিষ্ট সংবাদ (কবিতা)	ঐনতী প্রিয়দর্শনা দেবী	২২০
সত্য, স্বপ্ন, মরণ (সচিত্র)		২২০
সত্যাবলা দেবী (সচিত্র)		২২১৯
সাহিত্যগরিষ্বে শিরঃপ্রবর্ণনী		২২২৭
হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি ...	ঐযোগীন্দ্রনাথ সন্দাক্ষর ৪৭, ১৪৭, ২৮৩, ৪৪৭, ৪৬৩, ৬৭৩, ৭৮০, ৮৮৪, ৯৭২, ১০৮২, ১১৮২	
হিমালয় প্রাচীন কীর্তি ও বর্ণনায় স্থান (সচিত্র)	ঐযোগেন্দ্র বসু	১১৭১
হিমালয় কীর্তির একটি প্রাচীন কাহিনী	ঐ	১০২২
স্বপ্ন ও মরণ (কবিতা)	ঐরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৪০

১৩১৮ সালে

বর্ণনামূলক চিত্র সূচী

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
অনন্তোষবাদিনী	২২	অপুংগণ	১২৭
অনন্তোষমুক্তা	২২	আর্দ্রেত্র কহিল "কীদনটা	
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪০	মূল্যবেলা নয়"	
অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণ	১৪২	আগা নিবেদিতা	
অভিষেকের উপকরণ সামগ্রী	৩৩১, ৩৩২	আলাউদ্দিন গেট (দিল্লী)...	
অন্তঃপুরে সাদাধান (বহুবর্ণ)	৪০১	ইদা কহিল, "চল আশ্রয় বাড়ী বাই"	
আলেকজান্দারের জয় (বহুবর্ণ)		ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
—হাকিম মহম্মদ খাঁ অঙ্কিত		ইদা জ্যাককে আশ্রয় নৃকে	
আমরা কার্য করিবার জন্ত .		চাপিরা ধরিল	
প্রস্তুত হইরাছি		উৎসব-যাত্রা	
আইজু জী পূর্ব		একজন বাঙ্গালী ছাত্র	

ভাষ্য

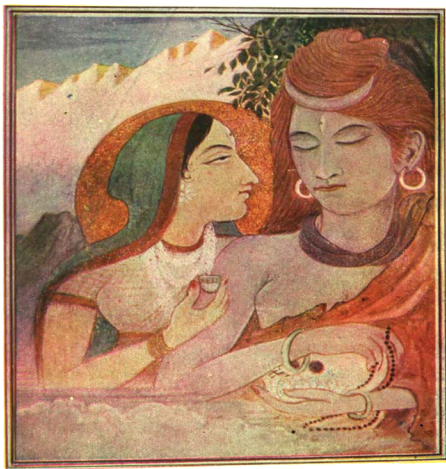
নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
ওইচামা (ঐহান সেনাপতি)...	১০৬৩	জুগু বাহু কয়দিয়ের সূত্র	৫৭১
কথীর	১০১৪	জুগু সর্দার	৫৭৩
কাজ করিতে করিতে তুর্কাজ		জুগু স্ত্রী পুত্র দুই গণকালিকা	৫১২
হুগুতে তরমুজ তরমুজ...		জ্যাক কহিল "তোমার ভাইয়েরা	
কোম্পানীর বেগমনি		বেগম নি কেন"	৭২০
কমুকি ম'ল্ল		জেনম লং (হেভায়েত)	৮০৮
কুচবেহার অধিপতি মহারাজ		কুদিস পাহাড় ও এলাহাবাদ কোর্ট	৮৭৩
নুপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ ...		কোটিভিষ্ণুনাথ ঠাকুর	৯২১, ৯২৩, ৯২৪
কুচবেহারের মহারাজী		টোগো (আফ্রিকা)	১০৬২
কুলাতি শেখী		টেনিং কলেজ (ইংলণ্ড)	৩০৫
কবিকেশরী ভাষ্যচন্দ্র ও রাজা		ডাকহরকরা (বহুবর্ণ)	১০৩৩
কল্যাণের হস্তলিপি ...		ড্রুপাট (মিশ্র)	৪২০
কালী প্রসন্ন সিংহ		ডাউং কোষ	১১২
কমলাসনা (বহুবর্ণ)		ডাউং গিলিয়েন কোষ	১২১
কুতব দিনর (মিলী)		জু'তের জু	১২৩
খালিচা রমণী		ভেগমারিকা মন্দির	৮৭৪
গুজী খালিচা রমণী		ভেগমারিকা মন্দিরের দ্বার	৮৭৫
খালিচা কুটীর		ভেগমারিকা মন্দিরের ভীমের মূর্তি	৮৭৬
খালিচা "মনোলিথ"		জু'তের মূর্তি	৮৭৭
গুহকর্ণিততা আপনি কস্তা		জু'তের মূর্তি	৮৭৮
ওপেন্ড্রনাথ ঠাকুর		তলে তুমিও আমার দূর করে দিচ্ছ না	৮২৮
ওজরাতী ম'ল্লারের প্রার্থনা		বারেবেগে হাঁটু গেড়ে আত্মার্থনা	২৩৭
ওজরাতী কবকের ক'র্ণাল		দীপদান—জটিল ইংরেজ	
লটটা গমন		চিত্রকর অঙ্কিত	
গিনীপচন্দ্র শেখ		বিল্লীর পুরাতন কোলা	
টিনের পুলাপ		মল্লিক	
চিহ্ন মহল উভান		মতি মল্লিক	
জাপ ম'ল্লারের সূত্রসান		জাহানারা বেগম কবর	
জগদীশনাথ রায়		বেগমনি খাল	
জুগু পরিবার		জাম	
জুগু খোজা		টানি চক	

হুটী

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	
দিল্লীর শাহিমহল	১০০৮	বর্ষ শেষ (বহর্য)—ঐ অদিতকুমার	
কুমার মঙ্গল	১০০৯	হালদার অক্লিষ্ট	১১৩৩
রুক টাওয়ার	১০১১	বুদ্ধদেবের ১ম চিত্র	১০২
“ লৌহমিনার	১০১৪	“ ২য় চিত্র	১০৩
দিল্লীগেট	১০০২	অক্ষদেবেব রমণী	৮০২
দিল্লী সহরের দৃশ্য	১০১৩	মহিলা	৮০৩
ধামেক জুপ	৪৬০	“ রাজা ও রাণী	৮০৩
ধামেক জুপের কারুকার্য	৪৬২	বাগিকী-অতিভা	১১২২
নতুন ফ্যামানের চুলবাঁধা ...	৪৪	ভোরে উত্তীর্ণ মাতৃ বাল্যে যার	১৭৯
নৌকাবিহার (বহর্য)		ভারচাট	১৮৪
—হাকিম মরহুম র্তা অঙ্কিত		জুপে দেবমুষ্টি	১৮৫
নটরাজ		জুপে বন্ধ-বন্ধিনী ...	১৮৬
নরেন্দ্রনাথ পেন		জুপে প্রাপ্ত চিত্রাঙ্কিত ধ্বজা	১৮৭
নাভে কহিল—...“আমার সর্বনাশ		জুপাগারে পোষিত ধর্মচক্র	১৮৮
হুদে যার যে কামিসা”		জুপ গায়ে পোষিত আটীন	
পাক্‌হাট (মিলেম)		কর্তৃত্বগ চিত্র	
পুরাতন ফ্যামানের চুলবাঁধা		কৃষক মুখোপাধার	
পিকিনের ফাটক		মহাভারত লিখন (বহর্য)	
পিকিনের অপর ফাটক		—ঐযুক্ত ভেড়টারা	
পিকিনের লামা মন্দির		মন্দির পথে (প্রাচীন চিত্র হুটীতে) ...	
পিকিনের প্রার্থনা মন্দির		মা বশোবা—ঐ অদিতকুমার, হালদার...	
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		মধুমক্ষিকা ও ফলোৎপত্তি (১ম ও	
প্রীতি রচয়িত্রী রাজকুমারী		২য় চিত্র)	
অনঙ্গমোহিনী দেবী		ঐ ঐ (৩য় ও ৪র্থ চিত্র)	
বাগানে কেহ কেহ জাওউইচ		মহলগড়ের ভগ্নাবশেষের একাংশ	
পাইতেছেন, কেহ বা জল		মোহনবাগানের খেলোয়াড়গণ	
তুলিবা পান করিতেছেন		মনোমোহন বজ্র	
হালিকার অতিথি সংকর		মহুগড়ের মহাবাজা ও	
বাহিরীর মন্দির		মহারাণী	
বাহিরীর ভল্ল হুটীতে প্রাপ্ত		বহুনাথ মজুমদার (রায় সাহাবুদ্র)...	
প্রস্তর মূর্তি		বুদ্ধ শিখিয়ার লাকাক	

ਅੰਤਰੀ ।

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
স্বাক্ষরকোট	৩০০	সম্রাট শকদ জর্জ ও সম্রাজ্ঞী থেরী	
সামলগার	৪০৭	(বহুবর্ণ)	
বেলুনের বৃক্ষমূর্তি	৫৩৭	ঐ	
সাদাট্রো (বহুবর্ণ)—ঐতিহাসিক		গেথ লায়ো শিবাজী (বহুবর্ণ)...	
একাল গঙ্গোপাধ্যায়	৬২৯	জয় চূড়াম সিংহমূর্তি	
স্বজনীকান্ত ভট্ট	৬৬৩	সারনাথের বিউলিয়ার	
স্বদেশীকান্ত দেব বাহাদুর	৮১০	সত্যজ্ঞানেশ্বর	
স্বাম্যোজন মণি	৮১০	সত্যজ্ঞানেশ্বর	
স্বাম্যোটক মন্দির	৯৬৯	সীতারামের মূর্তিবর্ণন	
স্বাক্ষরকোট গৃহ-বিজ্ঞান (টোকিও)	১০৬৪	সীতারামের মৈত্রয়ণ	
স্বাক্ষরকোট বাহাদুর ভূপ (মহারাষ্ট্র)	৮২২	সিংহগণের সীতারাম	
স্বাক্ষরকোট ঠাকুর	১০৮০, ১০৮১, ১১০২, ১১২৪, ১১২৬	সম্রাট শকদীপ্তে স্থাপিত	
		বুদ্ধবেশের মন্দির	৫১৪
স্বাক্ষরকোটের নির্দেশ অনুসারে স্বাক্ষরকোট		স্থল মন্দির	৫৩৪
কর্জু চিত্রাঙ্গনা কাণ্ডের চিত্র		সোমেশ্বরেশ্বর মন্দির	৫৩৪
পারিকল্পনা		মন্দিরের বহির্ভূত	৫৩৬
স্বাক্ষরকোটের গানে সোমেশ্বরেশ্বর		মন্দিরের কাজকাঁঠা...	৫৩৮
স্বাক্ষরকোটের		সঙ্ঘা	৫৪৭
শিবপূজা (প্রাচীন চিত্র হইতে) ...		সোমেশ্বরেশ্বর মন্দির	৭০২
শিব		" " সুমারী	৭০৩
শিবজী (বহুবর্ণ)		সামা	৭০৪
সত্যজ্ঞানেশ্বর বাহাদুর		সোমেশ্বরেশ্বর মন্দির	৭০৭
(প্রাচীন মোগল চিত্র হইতে)...		স্বাক্ষরকোট (বহুবর্ণ)	
সম্রাট শকদীপ্ত বাহাদুর		—ঐতিহাসিক গঙ্গোপাধ্যায় ঠাকুর ...	১
(কালানের)		হংসকূপ	৮৭৯
সম্রাট কৃষ্ণের বহির্ভূত		হংসকূপের উৎসর্গ প্রস্তাব কলক	৮৮০
"		হংসকূপের (দিল্লী)	১০১০
লিপি	৩৬০	হিন্দুধর্মী (হিন্দুধর্ম বৎসর পূর্ণোৎসব)...	১১৪৮



ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାମାୟଣ ଚିତ୍ର
 ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାମାୟଣ ଚିତ୍ର

ভান্ডারী

৩৫শ বর্ষ]

বৈশাখ, ১৩১৮

[১ম সংখ্যা

নব-বর্ষ ।

১

পুরাতন বর্ষ শেষ, আইল নবীন,
স্বত্বীন হল হার পুরাণো সে দিন !
ছিলে যে সাথের সান্নি, নীধু হে বিদায়।—
নবীন অতিথি এস, আগত তোমায়ে !

২

গেছে কত ব্যথা ক্রেশ, অতৃপ্ত বাসনা,
স্বপ্ন-আশা গেছে তেজে, অসিদ্ধ সাপনা ;
নববর্ষে ধর আজি উত্তম নূতন,
নবোৎসাহে গড় পুন নূতন জীবন ।

৩

যুচুক অস্তাব দৈত্য, দুঃখ সাপতার,
অবিদ্যাস, ভ্রান্তিপাশ, সংশয়-আঁধার ;
নিবে থাক্ শোকানল চিরদিন তরে
কালের ইন্ধনে ঘাধা অগ্নে ঘরে ঘরে ।

৪

গর্ব হোক্ নৃপা গর্ব মান অতিমান,
জাতিকুল ভেদভেদ বিচ্ছেদ-নিদান ;
বাধুক অগতমানে ঐশ্বর্যের বন্ধন,
একপ্রাণ রাজা প্রজা, সদন নির্দন ।

৫

অলিত প্রমাদ লোভ, থাক্ এ ভ্রমাল,
কমা দহা প্রতি দমি থাক্ চিরকাল ;
অনাচার অত্যাচার হোক্ নিবারিত,
হউক্ সত্যের জয়, নিখ্যা পরাজিত ।

৬

অপিতৃপিতৃ অমঙ্গল থাক্ দূরে থাক্,
খাদ্য কাস্তি মকরন্দে জীবন জড়াক্ ;
যুদ্ধ বিগ্রহের হোক্, হোক্ অবসান,
উড়ুক্ ধরণীমাঝে শান্তির নিশান ।

৭

হৃদয়ের বিনয়ত্ব থাক্ পেঁয়ৈ থাক্,
বিবেক বৈরাগ্য দুই থাক্ কাছে থাক্ ;
শক্তি অপরাধিত, দেবভক্তি মাথে,
পথের সফল চির থাক্ সাথে সাথে ।

৮

গিরাজে কতই বাত্যা বৃকে বরহানি,
সমুখে কি আছে দেব কিছই না জানি ;
স্বপ্ন দুখ বাই দেও, স্নেহ বা গরল,
মানি লব, ইচ্ছা তব হউক্ সদল ।

ঐশ্বর্যপ্রদায় ঠাকুর ।

বর্ষ-বরণ ।

এস তুমি এস নূতন অতিথি !
 উষার রতন-প্রদীপ আলি' ;
 মৌজা এখনো হরনি অসহ
 এখনো তাতেনি পথের বাশি ।
 মধু ঘামিনীর ঘোতিহার ছিঁড়ে
 ছড়ারে পড়েছে মতঃ ফুল,
 ত্রোতার কুঁড়িরা রঙের নেশার
 বনভূমি আজ কী মশ-গল !
 রেশ্মী সবুজে সাজে দেবদারু,
 গশ্মী সবুজে রসাল সাজে,
 আবৃত্ত ধরার কিশোর-গরব
 সবুজের মধ্যমলের সাজে ।
 কত ফুল আজি পড়িছে ঝরিয়া,—
 পড়ুক ঝরিয়া নাহিক কতি ;
 হাল্কা হাওয়ার দিন সে স্থাল,
 উদিল জীবনে তপের ঘোষিত ।
 বসন্ত আজ মাগে অবসর
 যৌবন শোভা পড়িছে ফরি ;
 চির-মবীনের ওগো নব দূত !
 তোমায়ে আজিকে বরণ করি ।
 এস গো যৌন ! মর্ত্যভুবনে
 নীরব চরণে এস গো চ'লে,
 তজ্জা-তরল বক্স আঁধার
 উঠিছে তুলিরা হাওয়ার বোলে ।
 ওগো পুরন্দারী ভরি' হেম কাঁচি
 চন্দন বাঁচি ঢালো গো ঢালো ।
 শিরীষ ফুলের পেলব কেশর
 অঁকাশে বিছার উষার আলো ।
 এস গো নূতন ! রাজার মতন
 এস আলোকের চতুর্দোশে,

অনোকের ফুলে ফুলে মধুকর
 আমের ফুলে কোকিল ভোলে ।
 অগ্নি প্রভাতের প্রথম প্রভা
 পরাণে আবার নিশাণ 'আনি'
 তুলারে দাও গো শোচন রোমন
 পূর্বণোর 'গরে পূর্বা টানি' ।
 বাসি স্বপনের কক্ষল-লেখা
 হরতো নরনে রথেরে লাগি'
 তাপুল-রাগ রথেরে অধরে
 সে জটিল অমা নীরবে মাগি ।
 মঙ্গলারতি করিছে পখীরা
 চামেলি বরিষে লাভাভালি,
 পূণ্যাহ ! কিরে এল গো জীবনে
 প্রভাত ভূন সমুদ্ভবিন' ।
 উহু হুরে বেঁধে তুলেছি সেতার
 বাজাও তাহারে যেমন পূনী,
 নীপকে বাহারে যেণে মঞ্জারে
 কখনো হাসিয়া কখনো কপি' ।
 চন্দন-লেপা হারে হাতে আজি
 বন্দন-মালা হুগিছে বাঘে,
 পেয়ালা ফুলের রেশ্মী মিঠাই
 ছড়ারে পড়িছে দধিণে বাঘে ।
 উৎসব-অঙ্গে বাঁধি বাজে পুরে
 অতিথি আলয়ে এস হে ভবে,
 মাকী দেবতা, তোমার আবার
 সন্তপনীর অধিক হ'বে ।
 রৌজ তখন রবিবে না মৃৎ,
 তাতিয়া উঠিবে পথের বাশি,
 'তবু এস তুমি, অজানা পথিক ।
 আঁশার রতন-প্রদীপ আলি ।
 প্রীত্যন্তোহুনাং বসন্ত ।

বিবাহ । (৭৫)

অন্ত রবিবারে তাহার আয়ুর্ভঙ্গ, আগামী রবিবারে বিবাহ । এি পটীক্ষার পর গৃহে আনিয়া বাগানধি কাল হতেই হুকুমার এই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে । পূর্ণ রজনী তাহার আগরণে কাটিয়াছে বলিলেই হয় । একটা অনির্দিষ্ট আনন্দ উত্তেজনায় তাহার মস্তিষ্কের স্বক্ৰান্ত শিরা বিশিরা—এমন কি প্রত্যেক অঙ্গপরিমাণটি পর্যন্ত সেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল । ভোরবেলায় সামান্ত তন্দ্রা আসিতে না আসিতে উৎসব বাগড়ীর তৈরীতানে—একটা চুঃখণ লইয়া সে সহসা জাগিয়া উঠিল । তন্দ্রাবেশে হুকুমার স্বপ্ন দেখিতেছিল—যেন তাহার চাবি হারাইয়া গিয়াছে ।

ছেলেবেলায়—যখন তাহার বয়স সাত আট বৎসর, তখন একবার তাহার একটি চাবি হারাইয়া গিয়াছিল । তাহার মামা বাড়ী আনিবার সময় কলিকাতা হইতে তাহাকে একটি সুন্দর সূত্র আপানী বাক্স আনিয়া দিয়াছিলেন । বাক্সটি পাইয়া তাহার আনন্দের সীমা ছিল না । বাক্সের চাবিটি দেখিতে ছিল ঠিক রূপার নতন । হুকুমার দিনের মধ্যে কতবার যে বাক্সটি খুলিত, বন্ধ করিত, আবার সতর্পণে চাবিটি লুকাইয়া রাখিত তাহার ঠিক নাই । এইরূপ আতি সাবধানতা বলতই বোধ হয়—একদিন তাহার সেই সাত রাজার ধন এক মানিক চাবিটি হারাইয়া গেল । চাবির হুঃখে সে একান্ত শোকাহুলা হইয়া পড়িল । এতদিন সকলে ভাবিত, বাক্সটিই তাহার প্রিয়দামপ্রী, এখন বৃক্ষিণ চাবির অভাবে বাক্সের আদর ।

তখন মা বাড়িরাহিলেন, তিনি কলিকাতা হইতে আর একটি আপানী বাক্স আনাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতে হুকুমারের পূর্ণ চাবির বিষয়ভূমি ছিল না । তাহার মনে হইল—ইহা ত পুরাতনটির জায় স্থান নহে । ছ-একদিন নাড়াচাড়া করিয়াই সে—তাহারই নামধের প্রিয় বসন্ত আর এক হুকুমারকে সেটি দান করিয়া ফেলিল । এই বন্ধু-হুকুমার বধনে কিছু বড় বলিয়া আমাদের হুকুমার ইহাকে গ্রহণা বলিয়া ভাবিত । পার্থক্য বুঝাইবার জন্য আনন্ড সময় সময় ইহাকে হুঃখনামেই অভিহিত করিত ।

স্বপ্ন বন্ধুত বাক্সটি আনন্দে গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে পকেট হইতে সেই হারান চাবিটি বাহির করিয়া দেখাইল । মুহূর্তকাল হুকুমারের মুক্তি আনন্দলীলা হইয়া উঠিল ; পরমুহূর্তে হুকুমারের কহিল ; “আমার চাবি ! তুমি নিজেছ ! আর আমাকে নাওনি !”

স্বপ্ন বলিল—“এইনে । আজ ত দিলুম । না দিলে ত তুই আজও পেতিল নে ।”

বালক ভাবিল—তাহাত ঠিক !

তখন কৃতজ্ঞচিত্তে চাবিটি গ্রহণ করিল ।

আজ আনন্দপ্রভাতে হুকুমার সেই চাবি হারানর স্বপ্নই দেখিতেছিল । তফাতের মধ্যে স্বপ্নের চাবিটি রূপার নহে পোনা, আর বালাকালের হারান চাবিটি পরে সে ফিরিয়া পাইয়াছিল—স্বপ্নের চাবিটা খুঁজিয়া মা নিশিতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । জাগিয়া সে যখন বুলিল ইহা সত্য নহে স্বপ্ন মাত্র,—তখন পূর্ব একটা আশ্রয় বোধ করিল । তথাপি গভ রজনীর করনানন্দ সূত্রপ্রভাতে

একটা বিদ্যাময় ভাবে যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। উৎসব বাণীর মধুর ঠৈরবীরাগ হ্রস্বতরকে উত্তীর্ণা পড়িয়া জনমে কেমন একটা করুণ তানই আগাইয়া তুলিতে লাগিল, নিম্নের অজ্ঞাতসারে তাহার নমনপাতে দুইবিন্দু অশ্রু লজিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে, উদ্ভুক্ত-ধারের মধ্য দিয়া তাহার অশ্রুবিধিত নয়নপটে অশ্রুত্যাগিত ঈমানবিশ্বের কুটাইয়া তুলিয়া সমুখে গাড়াইল আসিয়া ও কে ? তাহার বালাবন্ধু স্বপ্না ! হৃৎকিরণে যেন নিম্নে সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া যায়—সুসুমারের বিদ্যায়মান জনমও দেহরূপ সূত্রে প্রসূর হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বিছানার উত্তীর্ণা বসিয়া সে বলিল—“একি স্বপ্না যে! আজ সভ্যই সুশ্রুত !”

২

সুসুমারের বয়স বেশী নহে, আঠার মাত্র। ইহারি মধ্যে সে বি-এ দিয়াছে। ইহাতেই পাঠক বুকিয়েন, সুসুমার বুদ্ধিমান। তথাপি সামসারিক লোকে সম্ভবতঃ তাহাকে নির্দোষই বলিবেন। কেননা এখনো সে বালকের জায় সরলবুদ্ধি, কপটতা-অনভিজ্ঞ বিস্তৃত জনম। তাহার কলাগণিমাণসর মধুর হাসিতে, জনমের স্বচ্ছরূপ মর্পণের জায় বিতানিত। তাহার হাসিতে, স্মৃতিতে, ভাবে, কথায় তন্ত্র বিস্তৃত মঙ্গলভাব প্রাচুর্ভূত সুসুমার সভ্য লভনগে বিকাশিত।

সুসুমারের সহিত তাহার বন্ধু অনেক দিন হইতেই ছাড়াছাড়ি। সুসুমার এটেন্স-ক্লাসে উত্তীর্ণা পড়িতে গেল কখনও—আর স্বপ্ন তাহার একবৎসর পূর্বেই বাল করিতে চলিয়া যার কলিকাতায়। বনগ্রাম তাহার মানার

বাড়ী—শৈশবে মাতৃহীন হওয়াতে মাতামহী তাহাকে এখানে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, মাতামহীর মৃত্যু হইবামাত্র তাহার পিতা তাহাকে কলিকাতার আপনার নিকট লইয়া গেলেন।

ইহাদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান বড় একটা ছিল না। সুসুমার মধ্যে মধ্যে বন্ধুকে লিখিত—এবং দল খানার উত্তরে কলাচিৎ একখানি সুসু পত্র পাইলেই নৌভাগ্য বিবেচনা করিত এবং লজ্জিত এইরূপ উপেক্ষাই সুসুমারের বালা মিত্রতাকে সুদৃঢ় বন্ধনে এখনো তাহার স্মৃতিবিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। বিবাহের খবর সে সর্বপ্রায়ে স্বপ্নাকেই দিয়াছিল—এবং উৎসবে আসিবার লজ্জা সনির্বন্ধ অস্বরণে করিতেও যে ক্রটি করে নাই তাহা বলা বাহুল্য।

সুসুমার বিছানা হইতে উত্তীর্ণা তাড়াতাড়ি মশারিটা তুলিয়া, স্বপ্নাকে টানিয়া লইয়া আবার বিছানার উপর বসিল। কিছুক্ষণ কোন কথা না কহিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসি নীরব হইলেও মধুর আনন্দ সঙ্গীত-পূর্ণ। স্বপ্ন বলিয়া উঠিল “হুই ভারী ছেলে-মাছুষ।”

“কেন ?”

“বিরোধে এত আনন্দ তোমার !”

এ কথাই সুসুমারের আনন্দভাব কিছুমাত্র কমিল না, বিনা প্রতিবাদে নীরব হাসিতে এই অপব্যয় সে গিতোপাখ্য করিয়া লইল।

স্বপ্ন বলিল—“যেবে বেবেছিস ?”

“মেবেছি বইকি। তুমিও ত বেবেছ।

সত্যবাণীকে মনে নেই ?

“সেই চার পাঁচ বছরের বোলক-নাকে

কাদন-চোখো মেয়েটা? কাঠের পুতুল হাতে করে চৌকীদার পুরুষদ্বয়ের সঙ্গে থাকত— আর পুতুলটা কেঁকে নিতে গেলেই কেঁদে লুটিয়ে পড়ত সেই নাকি? রামঃ!”

স্বহৃদ্যের সহ্যতরঙ্গের মুখশ্রী “এই কথার কোকিলপূর্ণ হইয়া! আরও মনোহর ভাব ধারণ করিল—সে হাসিয়া কহিল—“এখন আর রামঃ নয়—সুখদা!; এখন তাকে সীতাদেবী বলাই শায়ে!”

“গেছি যে! একেবারে মাথা জল— হাবুডু! তোরা যে দেখছি লগন মল্ল হুয়ে জমেছিল! ভূমিষ্ঠ না হতেই দুর্ভাগ্যের প্রেম দীড়িয়েছে! ছেলেবেলার যদি তাকে একটা ভাড়া দিয়েছি—অমনি আঁহা উহ!”

“ছেলে মানুষকে তুমি যে জালান করিতে সুখদা! আমার ভারী মারা হোত! বাহক এখন আর সে চার পাঁচ বছরের মেয়েটি নেই—এখন যদি একবার দেখ!”

“সেটা বোধ হয় অদৃষ্টে ঘটছে না,— আমাকে আজই যেতে হবে। তুমি বিশেষ অনুরোধ করবেছিন তাই একবার বলে যেতে এলুম।”

স্বহৃদ্যের প্রকৃত মুখশ্রী সহসা মলিন হইয়া পড়িল। সফাতর অনুরোধে সে কহিল—“না সুখদা তা হবে না। এ হাণ্ডা তোমার থেকে বেতেই হবে। এত কি কাল—এখন ত ছুটি।”

“আমার ত বিয়ে করাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়! তার চেয়ে ঢের সহস্তর কালে আমি জন্মি হয়েছি।”

“কি কাল?”

“দেশের কাল।”

“বদশৈ হুয়েছে? আমিও ত বদশৈ!”

“নামে বদশৈ হলে ত হবে না—কাল কটা চাই!”

“আইন পরীক্ষাটা হয়ে গেলে আমিও কাল করব। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি।”

“মনে মনে ঠিক করলে ত হবে না; যে কান্নাই কর—আগে থাকতে ত সম্ভব হতে হবে—”

“আমি ভেবেছি সেমেন একটা নিম্ন স্থল করব—চাষাবের ক্ষেত্রে—”

“হাইহো! আমার ছেলেমানবি! তোর ঝাড়া সংসারে দেখছি কিছু হবে না! টাকা আসবে কোথা থেকে?”

“কেন উপার্জন করব! চাঁদা তুলব— আর আমার যা সম্পত্তি আছে—তা—”

“তবেই হয়েছে! তোর সম্পত্তি আর উপার্জনের উপর নির্ভর করলেই দেশোদ্ধার হবে বটে! এদেশে দেশের কালে চাঁদা কেউ দেয়না—নিত্যে যারা ইচ্ছা করবে তরে ভাড়াও পারবে না। এখানে টাকা তোলায় একটি মাত্র উপায় হচ্ছে—”

“কি?”

“ডাকাতি। বাড়ি ধরে আদার করা। গবর্নমেন্টও ত আগলে তাই করে। দেশের কালে আমরাই বা তা না করব কেন?”

স্বহৃদ্যের প্রত্যেক শিরা হৃদা সজ্জিত হইয়া উঠিল। উত্তেজিত স্বরে বলিল— “নিশ্চয়ই তুমি ঠাট্টা করছ সুখদা! শান্তি যে তুমি এ মকদ্দম মনে কর—কিছুতেই আমি তা বিশ্বাস করতে পারিনে। অত্যাচারে কখনও মঙ্গল হতে পারে? দেশোদ্ধারগ পিতৃা দিতে হলে, তাহারূপ, বার্ষিকাগ, একতা এ সব

আগে শিলা দেওয়া আবশ্যক। অথয়ে, অত্যাচারে কেবল যে মানুষ উদ্বেগের জাতি অধিষ্ঠান জন্মিয়ে দেবে—তা নয়—একতার মূলেই আঘাত পড়বে—”

“তোমার আর লেখটার দিতে হবে না। ওসব বাধা পুলিশ সব জানা আছে। ধর্ম কথ্য কর্তব্য সবই অবহেলায় রেখে;—ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন—

‘মার্কণ্ডেয় গচ্ছ কোত্তর নৈতংরযুগপত্ততে,—’
‘পড়ে দেখ।’ পকেট হইতে একখানা গীতা বাহির করিয়া সে অর্জুনের হাতে দিল।
এই সময় একজন চাকর আসিয়া বলিল,
“দাদাবাবু বেলা চলেছে উঠুন।
রত্নাল ঘান করতে হবে—মাঠকরণের ডাকছেন।”

অর্জুনের বলিল—“আচ্ছা যাচ্ছি তুই এগো”। সে চলিয়া গেলে বহুদিকিটে খোলা-পাতার চৌখ বুলাইয়া অর্জুনের কহিল—
“দ্বিতীয় অব্যাহার। আচ্ছা হুন্না, এখন থাক, বিকালে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে দুজনে মিলে পড়ব এখন।” বলিয়া বইখানা সে বিছানার রাখিল। হুন্না বলিল,—“বিকাল পর্যন্ত আমিও থাকতে পারব না—একটার টেপে আমাকে বেতেই হবে।”

বিবাহ পর্যন্ত কয়েকটা দিন থাকিবার জন্ত তাহাকে অর্জুনের অনেক উপরোধ অনুরোধ করিল, কিন্তু কিছুতেই টলাইতে না পারিয়া অবশেষে কহিল—“আচ্ছা আজ তবে বাও—বিয়ের দিন কিন্তু তাই আসতেই হবে, কথা দাও।

“দেখব,—তবে ঠিক বলতে পারিবে।”

আবার ভূতা আসিয়া ডাকিল, দাদাবাবু

এস। মাঠকরণের ডাকাডাকি করছেন—
জুত মনর বহে যায়।”

উত্তরে তখন ভূতের অলুবাড়ী হইল।

(৩)

গারে-হুন্না, ঘানোংলব, ভোজ সকলি হুন্না হইয়া গিয়াছে। চন্দন চর্চিত, রক্তবস্ত্রপরিহিত অর্জুনের হুন্না দেখিতে দেখিতে, বিশ্রাম মানসে অনুরাগে পালকের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার বন্ধ অর্জুনের আশ্রয়ান্তে একটার গাড়ীতেই চলিয়া গিয়াছে। বিছানার শুইয়া গীতাখানা হাতে লইয়া গুলিতেই এই প্রৌঢ়ি তাহার চোখে পড়িল—

যোগসূক্ত বিভ্রাম্বা বিজিতাম্মা ভিত্তেজ্জিহ
সর্গ ভূতাম্মা কুর্জ্জপিন ন লিপ্যতে।

নিমিটে চিন্তে ইহার তাৎপৰ্য্য গ্রহণ করিয়া অর্জুনের মনে মনে কহিল—“কি হুন্না উপদেশ। আর হুন্না আমাকে কি দে বোঝাচ্ছিলেন!”

এই সময় বাহিরে একটা অপ্রত্যাশিত কোলাহল উঠিল; অর্জুনের ভাড়াডাকি বিছানার উপর গীতাখানা ফেলিয়া মাটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল পুলিশের লোকের উঠান-পূর্ণ। একজন তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “আপনার নাম অর্জুনের?” উত্তর হইল,—“হ্যাঁ”। তখন বিনাশ্রদ্ধাভাবে তাহার ব্যতীর সর্বত্র প্রবেশ করিল! জ্রোণেকেরা ভাবিকল্পিতা হবিগীর জ্ঞান অপ্রত্যবে এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হুইজন পুলিশের লোক অর্জুনের পরনকল টুকিয়া পড়িল। বিছানার উপর গীতাখানা দেখিতে পাইয়া একজন তাহা উঠাইয়া লইয়া লম্বের

চীৎকার করিয়া উঠিল—“গীতা গীতা”! যেন আর্কিমিডিসের স্তম্ভ সেও একটা কোন অকৃত-পূর্ণ ব্যাপার সহ্য! আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আর একজন সাগরে ভাঙার চাতের উপর স্ক্রিগা পড়িল, এবং দুই বড়তে মিলিয়া তখন গীতার পাতাগুলি মহিহত বিপণ্য করিয়া ফুলিল। হানে হানে শোকের নীচে যে সকল অস্পষ্ট টপিত মস্তব্য চীকাটগনি ছিল পুলিশের অণুবীক্ষণ নেত্রালোকে তাহা অস্পষ্ট বিজ্ঞোহিতাক্ষপে নীপ্তিমান হইয়া উঠিল, এমন কি ডাকাতির তারিখটি পর্যন্ত তাহার প্রচ্ছন্ন আবরণ ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে মুদ্রিত হইয়া পড়িল। এই বলন্ত অকটি প্রমাণ হস্তে পরিয়া তাহার আর অধিক মিথ্যাসাবানের কোন আবশ্যক দেখিল না, বাদিকািরুক্ত সম্পত্তির স্তম্ভ বিনাবাক্য বায়ে তখন সেই পুলিশ পুঙ্খব দুইটি অকুমারকে দণ্ড করিয়া ফেলিল।—বাড়ীতে কাতর জন্মনরোল উঠিল, নিমন্ত্রণ আনন্দ জনতা মুহূর্ত্তে শোক বাতায় যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন ধরাশূন্য হইয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে অকুমারের মা নাই, পিতা উগ্রত অকুলকণ্ঠে বলিলেন—“ওকে কোথায় নিয়ে যাও? আগে আমাকে দেখে ফেল,—নিরে হৈঁটে হয়—ভারপর নিয়ে যেও,—” এই বলিয়া তিনি একেবারে সপ্তখে আদিয়া পাড়াইলেন। বিধব গভীর বন্দী অকুমার একান্ত বিবর্ত্তচিত্তে কহিল—“বাবা আপনি ভাববেন না, আমি নিশ্চয় ফিরব, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের স্তম্ভ-বিচারের প্রতি লক্ষ্য করবেন না,—আমাকে বেতে দিন।” চারিদিকের জন্মন মোণের

মধ্যে—কতর পিতামহ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাদিয়া কহিলেন,—“ছেড়ে নাও বাবা, অকুমারকে ছেড়ে নাও, আগামী রবিবারে বিবাহ, আজ গায়ে হলুদ পড়ে গেছে। হিন্দুর দস্তান চরে বাবা তোমরা অদর্শ করোনা। আমাদের ভাত ঘায়ে—ভাত ঘায়ে—ওকে ছেড়ে নাও, সাক্ষণের মোচাই—তোমাদের,—ওকে ছেড়ে নাও বাবা!” একজন পুলিশ ইন্স্পেকটর পে লবে মা—“পুলিস বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে—এ রকম কার্যে এটী তাহার হাতে খড়ি, ইহারের আর্জনায়ে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কিছু ইন্স্পেকটর লবে হাদিরা বলিলেন—“ভাবনা কি মশার! হিন্দু হয়ে কি আমরা হিন্দুর জাতধর্ম মারতে পারি? কিছু চিন্তা করবেন না—আমরা ঠিক সন্থেই এঁকে ফিরিয়ে আনব।” পিতা কহিলেন, নিরে বেও না বাবো—ওকে নিরে বেও না;—ও গেলে এ ব্রাহ্মণ বাঁচবে না, তোমাদের ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগবে—”

অকুমার সজলনেত্রে অখণ্ড ঘোরকণ্ঠে কহিল—“বাবা ভাববেন না, দৈর্ঘ্য ধরুন,—নিশ্চয় ফিরব,—আমি ত দোষী নই।” ইন্স্পেকটর সাহেব মহাভে কহিলেন “তাহলে নিশ্চয়ই ভাবনার কোন কারণ নেই। তবুও যদি না ফেরে—ঠাকুর মশাহ—তাহলে কিছু আমাদের দায় পোব নেই,—শাপটাপ দেবেন না,—তাহলে বুকে নেবেন ছেলেই দোষী—অধর্মের কি কখনো ভয় হয়!”

ধাকপ ছপর বেদনা—আর্জনায়ে হাধাকারের মধ্যে পুলিশ অকুমারকে ধরিয়া লইয়া গেল।

কালোর আলো ।

সঙ্গীতের প্রকাশ সুরে এবং বাণীতে, কাব্যের প্রকাশ ভাষার ও ছন্দে, শিল্পের প্রকাশ তেমনি রেখার বর্ণে এবং গঠনে, কিছু এতলা সমস্তই শিল্পের বহিঃস্থ পদার্থ, যেন মন ভূগাইবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মমি ! কবির মনোবীণায় যে সুর বাজিতেছে, যে ছন্দ যে কথা জাগিতেছে, শিল্পী যেন যে বিভিন্ন ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে সেইগুলিকে সাধারণের চক্ষুরণের গোচর করিবার অস্ত্রই কবিতা ছন্দ রেখা বর্ণ ইত্যাদি ; হস্তরাঃ এই বহিঃস্থ পদার্থগুলিকেই অঙ্গল বলিয়া জ্ঞান করিও না । সুবপাড়ানো গান গৃহ আনিবার উপায় মাত্র, রত্নিন সূক্ষ্মমিটা কলা ভূগাইবার অস্ত্র মাতৃবেদের একটা—নাই আমার চেয়ে কাণা মামা গোছেহর—প্রতিজ্ঞাগ ।

সকল সঙ্গীতের সঙ্গে একটা অনাহত সুর, সকল কবিতার ভিতরে একটা অলিখিত কাব্য এবং সকল শিল্পের অন্তরে একটা প্রচ্ছন্ন বর্ণমান থাকে, এবং সেই অলিখিত অনাহত অপ্রকাশিতকে প্রকাশিত করিবার প্রকাশিত বৈবাহিক ইচ্ছা ও চেষ্টাতে তোমাই বল বা তোমার শিল্পের সঙ্গীতের আর কাব্যেরই বল চরিতার্থতা ।

মায়ের যেমন বেহ-কর্ভ সুবপাড়ানো গানের বিভিন্ন সুরের নানা কণার ভিতরে ভিতরে বর্ণমান থাকিয়া সমস্ত গানটাকে একটা অপূর্ণ মাধুর্য্য প্রদান করে, তেমনি বর্ণার্থ শিল্পের অন্তরে অন্তরে—গাছের পাতার পাতার ফুল ফলে, সাখার এলাখার জীবনী রসের মত—একটা অনিচ্ছনীর শ্রী বহিঃস্থ

গঠন বর্ণন ইত্যাদিকে সজীবতা বান করিয়া বিভবান থাকে । নবরসের নর সৃষ্টি অতি সূক্ষ্ম অতি অল্পময় এই অমৃত সৃষ্টিই মূল আকর্ষণ, আর রেখা বর্ণ ইত্যাদি—এই নবরসকে সাজাইবার বহিঃস্থ । ঠিক যেন সূত্রাঙ্কে দেওয়া পঞ্চভূতের সমষ্টি, তাহার উপরে নানা বর্ণের নানা ঢেয়ের নানা বেশ !

মাছের আত্মা ও মাছের দৈহিক দৌকুমার্য্য এবং বৈকল্যের মধ্যে ঘতটা পার্থক্য এবং যেটুকু সংযোগ, শিল্পের গোচর অংগটার সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত সার পদার্থটির তেমনি যোগাযোগ ।

কৃত্ত যেমন ব্যতিক্রম ধারণ করিয়া সার্থক হয়, শিল্প সামগ্রীও তেমনি এই অমৃতরসকে ধারণ করিয়াই চরিতার্থতা লাভ করে ; নচেৎ তাহা মৃত নিরর্থক । নিরর্থক এবং সার্থক এই দুই প্রকার শিল্পের প্রভেদ বোঝার দান শিল্প জ্ঞান এবং এই জ্ঞানশাস্ত্রের উদ্দেশ্যই শিল্পচর্চা ।

বিষয়গতের নব নব বিচিত্রতার মধ্যে এককে পাইবার অস্ত্র বৌদ্ধির প্রকাশ আর শিল্পীর সমস্ত চেষ্টা নবরসের বিভিন্ন রূপের ভিতরে সেই অমৃতরসকে পাইবার অস্ত্র । স্থিরচিত্র বৌদ্ধি, মরণের জীবনতার, জীবনের নবীনতার, দিবলের আলোকে, রাত্রির অন্ধকারে, তরঙ্গের মধ্যে বিনি, মরণে জীবনে বিনি, আধারে আলোকে বিনি এক অগচ বিভিন্ন স্তাধারণ সজ্ঞান পাইয়া বলিলেন ‘বেবাহমেতম্’ বলিরাই মনে হইল—আহা বাহাকে জামিলাম তিনি কে পুলিয়া বলি ‘বেবাহমেতম্’ পৃথক্ মহাত্ম—ওগো আমি

বাঁধকে জানিয়াছি তিনি যখন পুণ্য, এমন করিয়া তাঁহার কথা বলিয়াও ঘন উঠিল না,—‘বলিতে হইল ওগো পোনো তাঁর রূপের কথা—‘আনিভানবন্ তমসঃ পরজাতং’ তাঁর অপরূপ রূপের মঙ্গল আভা এই দেখ অন্ধকারের পরপারে দেখা যাচ্ছে। চিরজন্মের যিনি তিনি আশা ও হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিলেন এবং এই চিরজন্মকে ধারণ করিয়া অগভীর অভ্যর্থনায় এই গুটি হৃদয় সরল ব্যক্তি চিরদিনের জন্য সার্বিক হইয়া রহিল।

শিরীষ বনন রূপে রোজ অদৃষ্ট বীজসং শাক্ত প্রকৃতি নব নব রূপের অন্তরে এক অনির্ব্যক্তীয় রসমুখিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চির রত্না বা মুক্তি গঠন করেন তখন তিনি যোগীর স্তায় সেই এককে নানার মধ্যেই ধরিতে চাহেন। তাৎ নিজেই মনো কোনটা সার কোনটা বা অগার এটা ধরিবার একমাত্র উপায় সেই অন্তরের বস্তু নিগূঢ় রূপের অনাহত সঙ্গীত এবং প্রজ্ঞার স্বপ্নের আভাস পাওয়া, ‘নানাঃ পথা’ অন্য উপায় নাই, এই জন্যই এবেশের পণ্ডিতগণ শিরীষ গোষ্ঠী কাব্যাকার এবং সঙ্গীতবেত্তার জন্য এক ধ্যানেও পুণ্যই নির্দেশ করিয়া গেছেন।

পৈশবেব চণ্ডলতা যৌবনেই কণ্ঠভা বান্ধকের প্রণাস্তার ভিতর দিয়া অন্তরের মাজলটির একটা স্পষ্ট ছাপ আবার মুখে ঢেকে ক্রমশঃ বনন সুগোচর হইয়া উঠে তখন ‘আর আমাকে চিনিতে লাগারওঁর বিন্দু হয় না, তেমতি তার কি অগার শিল্প চিনিতে তিলময়ে আমাদের বিলম্ব ঘটে না, যিনি কোন

শিল্পে অন্তরের ছবির একটা আভাস বা তাহার আভাস সামগ্রীটির বাহিরের গঠনে আনবা অল্পজন করি।

এই মাতান্তরীণকে বাতির হৃদয়ে আকারে প্রকাশ করিয়া দেওয়া অসম্ভব, সে প্রকাশিতও থাকে প্রজ্ঞারও থাকে। ঠিক যেন কলের মধুস, সে নিজে প্রজ্ঞা ঘটে, কিন্তু তাহার প্রকাশ কলটির সুড়ৌল গঠনে, হৃদয় বর্ণে, ছবিই গায়ে। শিশু নিকটে কলের সুড়ৌল গঠন, হৃদয় ভয়নাই নথেষ্ট খেলিবার যেন উৎসাহের ভাঁটা! হৃদয়ের পক্ষে সেটি অভ্যন্তরীণ রূপের ক্ষুদ্র দেবতাকে ভোগ দিবার, দেখিবার, দেখাইবার, আবাদ লইবার, আবাদ গ্রহণ করাইবার সামগ্রী; শিরীষ তেমনি কাহারও কাছে রহিন পোনা; কাহারও কাছে এক অতি বিচিত্র সৌন্দর্য।

এই প্রজ্ঞার রূপের সন্ধান পাটয়া কি শিরীষ, কি কবি, কি গোষ্ঠী কেহই চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহাদের বলিতেই ৩৩ ‘স্বৰ্গে গিবে’—ওগো তোমরা পোনো, তোমরা দেখো—এই প্রজ্ঞাকে চুপাইবার, দেখাইবার, শুনিবার, দেখিবার জন্য কত না আত্মোত্তম, কত বর্ণ কত রং কত গঠন কত গান!

শান্ত্রেরও যে কথা শিল্পেরও সেই কথা ‘এতজন্মেই’ জানিবার সামগ্রী তিনি। শান্ত্রেরও যেখানে যেন শিল্পেরও সেইখানে যেন ‘নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ’ সেই অবিদিত অনাহতকে জানা ছাড়া পোনা ছাড়া আর কিছুই নাই।

তাক্ষরশের স্তম্ভ মধ্যের বিচিত্র রূপের

অভাৱ বিকশিত হইবা মুক্তাৰ স্বৰূপ মৰুকাৱেৰ
পৰশৰে হইতে যে অনাহত হুৱ, অগৰুণ
অভা অসিত্তেছে তাহাই দেখ।

তি নিৰ সাঁবকো গহিৰা আঁঠে
ছাঁঠে শ্ৰেয় মন তনমে
পশ্চিম দিশকী বিড়িকি খোলে
চুৰছ শ্ৰেয় গগন মে
চেত-কংবল-বল বল পিহোৱে
লহৰ লেহ বা তনমে
সংখ বট লহনাট বাট
খোতা দিক মল মে
কট্ট কবীৰ তনো তাই লাখো
অমৰ সাঁব লখ বটমে

লক্ষ্যৰ অন্ধকাৰে বনৰ শ্ৰেয়াৰ্জ সাধাৰন
সাজায়াসেৰ পশ্চিম হুৱাৰ পুনিয়া ভাক-
মহলেৰ দিকে চাহিয়া তজ্জ্বনকে শ্ৰেয়সাগৰে
চুৰাইয়া দিত তখন যে অনাহত সলীত যে
অগ্ৰকশিত লল লক্ষ্য কৰিয়া নে তৰু হইবা
বাইত তাহাই তাজমহলেৰ সখাৰ শোভা এবং
তেননি কৰিয়া পিৰকে দেখাই বখাৰ দেখা।
মনে কৰিও না তাজমহলটি মচাৰ্ঘ যদি দিয়া
হুসফিত বলিয়া এত হুন্দৰ, মনে কৰিও না
তাহাৰ গঠন নিৰ্মিত সেউজনা তাহাৰ অৱ
কোঁকা নাই। হাপতা পত্নাৱল্যে দেখিলে
তাজমহলে লহন ধোম বাহিৰ হয়, অলক্ষ্য
শিয়েৰ দিক দিয়া দেখিলে তাহাৰ সাজ-
লক্ষ্যৰ বনিদাণিকোৱ বাহুল্যেৰ দৰ বেণি
নয়, তাৰতে সত্ৰ সত্ৰ বদিৰ আছে বাহা
বাদলাহি 'ওট খেলনাটি অপেক্ষা পতন্ত্ৰে
শ্ৰেষ্ঠ, অৰু তাৰমহল আমাৰেৰ নিকট
অতুলনীয় সামগ্ৰী। বহুনাটীৰে এই
বনিদাণিকা মতিত বীণাৰ যে বিৰহেৰ পাখা

চিৰদিন ধৰিগা সাজিতেছে তাহাৰ বিচিয়
মুৰ্খনাৰ ভিত্তৰে ভিত্তৰে এক বিশ্বব্যাপী
অৰু গোপন ক্ষমতা কি জানি কেমন কৰিয়া
ধৰা পড়িহাছে। এই যে মহাসলীত ইহাৰই
মূলো তাজমহলেৰ সখাৰ ভিত্তি চাৰিখানা
অমূল্য হইবা উঠিহাছে। ছবিস মূল্য যেমন
গিণ্টিৰ ফেম বাঁ তপ্তেৰ পোচড়া দিগা নৱ
তাজমহলেৰ মূল্য তেননি তাহাৰ বাহিৰেৰ
খোলাখানি দিগা মৱ। পাতী না পাকিলে
সোনাৰ খাটাৰ যে মূল্য, শিয়েৰ ভিত্তৰে ওই
অমৃতমল না পাকিলে তাহাৰও সেই একট
মূল্য। সোনাৰ খাটা অৰু পাতী নাই
কোখাৰ তাহাৰ আদৰ, কাঠিৰ বাঁটা অৰু
পাতীটি দৱ আছে তাহাৰও যে দৰ সোনা
দিগা হুৱ হয়। এই অমৃতমল কেবলমাত্ৰ
যে গুণতেনেৰ ভিত্তৰেই বৰ্তমান থাকিবে
এমন কোন কথা নাই। বিশ্বতপ্তেৰ বেলে
আনাৰ এক আনা মাত্ৰ মাহুৰ হুন্দৰ বলিয়া
পৰিচিত তাই বলিয়া কোমলতাই বল
নহুন্দবই বল কেবল বো ওট এক আনাৰ
ভিত্তৰে নাট, সে যে হুন্দৰে যেমন কাণোতেও
তেনন সমভাবে বিদ্যমান। সাধাৰণে যে
কেবল চাকুপ এবং বহিঃলৌক্যেৰ বাটপাত্ৰ
দিগা শিয়েৰ স্তম্ভাৱণ বিচাৰ কৰিতে বদেন
সেটা অগাগোফুতা তুল, যেন মুক্তাৰ বিচাৰ
তজ্জিত বহিৰাংলটা দেখিয়া।

কবীৰ বলেন 'লবৰি মূৰতবীৰ অমৃতত,
মূৰত কি বলিহাৰি—কি ভালো কি কালো
সকল মুক্তিৰ মধ্যে অমৃত, বলিহাৰি বাই সকল
মুক্তিৰ।

নাৱিকেল ফলেৰ বাহিৰটা গোলা ও
ছোবকা কিছ কে তাহাৰ আনাৰ কৰিবে,

ভাঙতে যে জল আছে লুপা আছে । মাকাল ফলে রস আছে রস নাই তাহার আদর কেনই বা কর না ?

শিল্পের যে প্রতিষ্ঠাও অমূল্য নাই সে অগতি হইলেও কুসঙ্গ আর বাহ্যে অমূল্য আছেন অথচ অগতি নহ সেও আমাদের কাছে অমূল্য ।

কেবল নিজের দৌন্দর্য্য বৃদ্ধিরই ছাপটা শিল্পিগণ যদি নিজের নিজের হাতের কাছে রাখিয়া দেয় এবং আমরাকে আপন আপন দৌন্দর্য্য বৃদ্ধিষ্ট লইয়াই কেবল যদি শিল্প চর্চাটা করিতে চলি তবে উক্তই দিকেই কি বিষম গোলাযোগ না বাড়িয়া উঠে ।

এটোতো প্রতিদিনই দেখিতেছি শিল্পী যেটা ছন্দর বলিয়া গড়িতেছে সাধারণ সেটাকে কুৎসিত বলিয়া বলিয়া আছে । দশ জনে একটা চিত্র বলিল ভাল আর পঁচিশ জনে বলিয়া উঠিল মন্দ । বাহিরের দৌন্দর্য্যে শিল্পের প্রতিষ্ঠা এটা বহুদিন আমাদের বিখ্যাত থাকিবে, বহুদিন আমরা য য় রুচি অজ্ঞান্যে শিল্পকে দেখিতে চলিব, ততদিন ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে ।

বহিঃদৌন্দর্য্যের দিক দিয়া আমরা লোকসঙ্গম বা পরস্পর আহরণ করিবার উপায় স্বল্প বাজারে যে শিল্পী কাটুতি হয় তাহার একটা ঘোড়ামুটি দর স্থির করিতে পারি কিন্তু এখনই আমরা একটা বখাৰ্শ শিল্পের সম্মুখে উপনীত হই তখনই দেখি যে হালে আর পানি পাই না ; দেখি সেখানে হ্রদে হ্রদে, বড় প্রভেদ নাই, গুরুরই সমান আসন সমান আদর । মনে হয় শিল্পী কেবল খেলা করিয়া গেছে রঙে বেরঙে একটা জট

পাকাইয়া রাখিয়া গেছে, শিল্পী যে কিছুমাত্র মনোযোগ দিয়া রেখাঙ্কণ টানিয়াছে এমন মনে হয় না—তাহার দৈ কৌশলে দৌন্দর্য্য জ্ঞান জন্মিয়াছিল একমুখি বিখ্যাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে মনঃ আমাদের কঠিন হঠকা উক্ত প্রকার শিল্প হইতে বিদূষ হয় ! কেবলমাত্র বহিঃ দৌন্দর্য্যের দিক দিয়া শিল্পকে দেখার এটো বিপদ । কিন্তু তাহা না করিয়া খোলাটা দাঁড়ার ভাগ বলিয়া উপরে অংশটা অগুরুর যত্নকে প্রকাশ করিবার উপায় মাত্র জানিয়া যদি আমরা শিল্পচর্চা করিতে চালা তবে আমরা দেখি—আহা শিল্পী কি খেলাই বেশিরাছে !

‘মূল তেল মিল ততো মূলেন’

একদিকে তেল ছিল আর একদিকে ছিল মূল, শিল্পী চাইকে এক করিয়া মূলেন প্রস্তুত করিল । ফলের উপরটা দেখিয়া ফলের আবাদ গ্রহণ করা চলে না, তর্ক চলে যতে ।

মাল্য হইলে সুজোল চাইলেই ফল যে মিষ্ট হয় তাহা নয় পাহাড়ি আতা গঠনে কঠোর কিন্তু অপূর্ণ তাহার মিষ্টতা ! আবার যেমন স্তরঙ্গ যেমন সুজোল তেমনি মিষ্ট এমন ফলও প্রায়ই দেখা যায় । সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে কি সুজোল কি বেজোল সকলেই মধুরল থাকিতে পারে ।

ফলের অন্তর বাহির বিচ্ছিন্ন করিয়া দেবার নাম যেমন সেটি চাখা নয় তেমনি কোন চোজের বা কোন সূক্তির অগ্রঃ বাহির পুষ্প করিয়া দেখাও নাম দেখাই নয়—

বিভক্ত নহি মিলিবে

জোঁ তরবার ছোড় পন্থাময়ী—

তরুকে ছাড়িয়া বন, নমকে ছাড়িয়া
তরু মিলিবে কোথায় ?

দিবলে রাতে, অলোকে অঁধারে কালের
বেমন অধিষ্ঠান, শিল্পেরও অধিষ্ঠান ভেদনি
শোভন এবং অশোভন এই দুই পাদপীঠে—

‘বাহুর ভিতর সকল নিরুজ্জ্বল
চিত্ত অঁচিত দই পীঠা লো।’

অবিগ্ন বসেন ‘মাতঙ্গ্যং সত্যমগ্রন্থম্’
সত্যকে অগ্রসরবেশে ধরিতে নাই, শিল্পীর
অন্তরে যে সত্য প্রকাশ পাইতেছে
তাহাকে বখালাধা প্রিয় এবং মনোহর বেশে
সাজাইয়া লোকের সম্মুখে ধরাই শিল্পীর কায় ;
কমতার তারতম্য হিমাবে কাহারও সাজ
ভাল হয়, কাহারও সাজ ভাল হয় না ; কিন্তু
অগ্রসরবেশে দেখা দিলেও সত্য বেমন
সত্যই, সুসুগ্ধ না হইলেও শিল্পের স্বার্থ
অংশটা ভিন্নবিনই ভেদনি মনোহর। স্বর্গীয়
লালাবাবুর নিজটে সত্যটা কুৎসিত।
মৎসকিক্রোধের মুখ হইতে যে সজ্জিত
তাহার হৃদয় আকারে দেখা দিরাছিল তাহা
নয় কিন্তু সেজন্য তাহার মনোহরবেশ কিছু
যে লাগেব হইরাছিল এমন তো মনে
হয় না।

সকল শিল্পে অজনিহিত বৈরাগ্য সে চির-
দিনই স্মরণ। অদন্তরে সাজাইলে তাহার
সুখা বাড়েনা, নিয়ালভাবে রাখিলেও তাহার
মর্যাদার হানি হয় না। স্মরণে অস্বন্দরে
কঠোর কোমলে, ঐক্যে হীনতার সর্বত্র
তাহার প্রকাশ সম্ভব। মনে করিতেছ খুব
একটা অটল সমতার ভিতরে তোমাদের
লইতেছি। শিল্পের ভাল মন্দ বিচার করা
ক্রমশই ক্ষুদ্রতর চেষ্টা পড়িতেছে। কোথায়

শিল্পের অপ্রকাশিততর বর্তমান আর কোপায়
বা তাহার মতাব তাহা জানিবার
উপায় কি ?

বল বেশ কেনন করিয়া আদর্শ দেখিবা
মায় পুত্রিতে পারি এ বাড়িতে গৃহস্থ বাল
করিতেছে, ওটাতে বৃদ্ধ চরিতেছে ? খোলায়
ববেগ গৃহস্থ থাকিলে তাহার এক শ্রী আর
স্বর্ণ অট্টালিকার লোক না থাকিলে তাহার
এক শ্রী। এটা যেমন আদর্শ চক্ষে দেখিতে
পাঠে, তেমনি যে শিল্প রসস্বত্বপক্ষে ধারণ করে
আর সে সেটা না করে তাহাদের উত্তরের
পার্থক্য বাহু লক্ষণেই প্রকাশ পায় ; সুতরাং
অঙ্গলে নকলে প্রভেদ শূভ্র ও পূর্ণে প্রভেদ
বোঝা কিছুই প্রফুর নয়।

যে শিল্পী সত্যই রসিক সে এই রস
স্বত্বের সজ্ঞানেই নিজের কমতা এবং অক্ষম-
তাকে নিরোপ্য করে, আর যে কেবল মাস
চুহু ধেন নানা বর্ণে নানা ছন্দে নিজের
চাতুরীই প্রকাশ করিতে গিয়া একথা জুলিয়া
যায় যে এত স্বর্ণ এত রেখা এত শিল্পকৌশল
সমগ্রই সেই এক অপ্রতিষ্ঠিতকে বহু বিচিত্রতার
ভিতর প্রতিষ্ঠিত দেখিবার ও দেখাইবার অজ্ঞ।
যে শিল্পের ভিতরে রসের সন্ধান করে তাহার
কাছে স্বর্ণও নাই মরকও নাই, সে দেখে
স্বন্দরে অস্বন্দরে এক মহা স্বন্দর বর্তমান।

“অনজ্ঞানেকো স্বর্ণ নরক হৈ হরি জ্ঞানেকো
নাহি।” কথাই বলে শ্রীমদ্রস্কন্ধ। ক্রাম বর্ণটা
বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নয় কিন্তু সেটা ক্রাম হইয়াও
‘স্বন্দর হয় তাহার ভণে তাহাকেই পাইবার
চেষ্টা’ কর, একদিকে ক্রাম একদিকে স্বন্দর
জয়ের ভিতর, দিরাই এক যিনি তিনি প্রকাশিত
হইতে চাওন। সেই স্বার্থ শিল্পী স্বার্থ

সাপেক্ষ দলার কবি যে দৈন্তের অস্তরে অষ্টের
গতিভেদ ভিতরে অগতিভেদ স্থাপনা করে ।

বাণ সঙ্কেত প্রসঙ্গ সঙ্কেত জনক বিজ্ঞকারি,
দৃষ্টে সে দমন আয়োজিত ভবন সেদৃষ্ট গণ
কাঙ্ক্ষিত এবং কোমলতা ত্রেতেটক প্রতিষ্ঠিত,
ভেমনি শিল্পের অবিদিত রস সঙ্কেত মনোহর
এবং নব রসের কটু তিক্ত মধু প্রভৃতি
বিচিত্রতার উপরে তাহার প্রতিষ্ঠা ।

শিল্পের এই অঙ্গকটি সুদৃষ্ট দরিতে
হইলে মনোযোগ করিয়া বসিতে হইবে ।
এই মনোযোগের আর এক নাম ধ্যান ।
হিন্দুস্থানীরা বলিয়া থাকে 'ধ্যানসে পড়ে',
ধ্যান সে দেখে', ধ্যান সে বলাই' । মনো-
যোগের সহিত পাড়িয়া দেখে যথার্থ অর্থটা বরা
পড়িবে । পৃথকে যেটা অঙ্গর ছন্দ ইত্যাদি
সুদৃষ্টে ধরা থাকে, সেই বস্তুই শিল্পে, গঠন
বর্ণ ইত্যাদি সুদৃষ্টে প্রকাশ পায় । অমনো-
যোগে পাঠকের অর্থ গ্রহণ যেমন দ্রুত, বিনা
ধ্যানে শিল্পে রস পাওয়া ভেমনি কঠিন ।
অমনোযোগে বইখানাই পড় বা চিহ্নই দেখ
দেখিবে সবটাই হিজি বিজি পোছ পাছ ।

যদি সঙ্গীতের ভিতরে অনাহতকে, শিল্পের
ভিতরে অলিখিতকে, প্রকাশের ভিতরে
অপ্রকাশিতকে, প্রকৃতির ভিতরে অপ্রকট এবং
বিচিত্রতার মধ্যে এক অবিচ্ছিন্নকে পাইতে

চাও তবে—'কাল্পন্য শোভন মোহ নী'দমে'
কেন মোহনিদ্রার গুইয়া আছে ?

'চিত সে লল জনো'—মন দিয়া একবার
প্রবণ কর

'সর্ব্বন যে উঠত দুগ রাগরা'

সকল বেচে, সকল গঠনে, স্ত্রে, কুচে,
কদম্বো সৌন্দর্যো কি মধুর রাগিণী উল্লিখাছে,
কি স্তম্ভের আঁচাই কুটরা পড়িতেছে !

'বহু রোগ তো লেগান জাই

মাতা লগৈন কাম'

সেই বর্ণনাতীত বর্ণ তো চোখে দেখে গার
না, সেই অনাহত মাতা তো শ্রবণে শুন
হয় না !

'দুঃখট পোশ'—বহিস্থাসেব অবশ্যই
খুলিয়া ফেল ধ্যানসে দেখো, ধ্যান দেখে
জনো' বহু ভাংছে কবীর গাহিতেন—

'অনগতিয়া দেখা কোন করে' তেজী সেবা'
হাথের গঠনের সেবাই সকলে করে কিন্তু
সকল গঠনেই যে অগতিত-বিজ্ঞমনি তাহাকে
কর জন চার ?

স্পর্শ মগ্নির স্পর্শে লোহ যেমন স্ত-বর্ণ
লাভ করে তেমনি যেমনই গড়া থাক অগতিত
দেবতাকে নিবেদন করিলে তাঁহার চরণ স্পর্শে
সেটি একটি অপরূপ সৌন্দর্য রূপে অভিযুক্ত হয় ।

ঐশ্বর্যব্রীক্ষনাথ ঠাকুর ।

পৌষপুত্র ।

বাড়িতে বথানিঃমিত ক্রিয়াকলাপ কাজ
কর্ম সমগ্রই চলিতেছে । তথাপি বাঁশ এক
হইলেও তিন্ন স্তরে যেমন 'অনন্দ ও বিবাদ
অনিত হয় সেইরূপ শান্তি না থাকার লক্ষ্যপূরে

দেবসেবা অতিথি সেবা প্রভৃতি সমগ্র কাজ
কর্মের মধ্যেও কি একটা অতাব নৃত্যতা,
ঐশ্বর্য অবলাপ জড়িত হইয়া রহিয়াছে ।

কিন্তু ঠিক এমন সময়ে দিগ্ভ্রমরী

হঠাৎ যুদ্ধান্তে সংসারেই সমুদ্র তাহাই এক সঙ্গে শিবানীর কাছে পড়িয়া তাহাকে হঠাৎ জাগাইয়া তুলিল। এত বড় সংসার তাহারি নিকে তাহার অসঙ্গার বাহ্যিক বিস্তার করিয়া তাহারি বক্ষণীয় ক্ষুদ্র শিত্র মত জীবকর্তে তাহাকে আচ্ছাদন করিতেছে। এখন আর তাহার এমন করিয়া নিজের মৰ্ম্মবেদনার বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নের মত এখানে সেখানে লুটাইয়া চুটাইয়া বেড়াইলে হইবে কেন ? সমুদ্রে যে স্থিতিত কর্তৃত্ব তাহার কতবাসাধনের জগৎ অলসতা অসুণি বেলাইয়া পূড় কৰ্ত্তে তাহাকে ডাকিতেছে তাহার অপরিবর্তিত আদেশ অগ্রাহ্য করিবার সাধা তাহার আছে। নিজেকে নিজের প্রের হইতে নিজের করিয়া কার্যক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করিবার জগৎ মনের মধ্যে বস ও সাহস সঙ্গ করিবার জগৎ তাই সে প্রথমবার নিজের মনের সহিত যুক্তি বিচারের দ্বারা আশেবে মিটাইয়া লইতে চাহিল। যুক্তি দিচ্চা চিত্তকে বুঝাইতে চাহিল, ঐশ্বর্য তাহাকে যেখানে বিরাজেন সেইখানকার সকল কাব্য সকল কৰ্ত্তব্য প্রকৃষ্টাঙ্কঃকরণে যদি সমাধা করা যায় এ জীবন উদ্দেশ্য-বিহীন কেন হবে ? এতে কি তাকে পাওয়া হয় না ? যিনি আজ তাহারি মধ্যে সন্নিহিত, একান্ত ? শিবানী এই প্রথমবার জোর করিয়া মনে করিল যে বিধবা। ছিঃ সত্যকে বুঝা তাহের দ্বারা চাপিয়া রাখা মনকে কি সাধনা দেওয়া না জীর্ণিয়ার ? ঐশ্বরের দেওয়া দত্ত সনিকৃত্যর সহিত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করাই মঙ্গল্য। হাহাকার করিয়া মাথা কুটিয়া কৰ্ম্মবন্ধন বধন-পুলিয়ার নয় তখন তাহাতে জড়টাই পাকি লাভ আছে :

শিবানী মনের সমস্ত গুরুত্বতা ধোর করিয়া ত্যাগ করিয়া নিজের কল্প গুণের দ্বার পুণিরা হঠাৎ একদিন বাহিরের তপ্ত ঘোরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকেও কিছু বলিল না, চুপি চুপি ঘনেন্দ্র পর লাগা থান পরিয়া হাতের গহনাখানা পুণিরা তুলিল।

শ্যামাকান্ত শিবানীর বিধবাবেশ দেখিয়া প্রথমটা তাহাকে চিনিতে পারেন নাই তারপর চিনিয়াই “মা তারা !” বলিয়া ঐশ্বর্য শিহরিয়া অগ্রদিকে সুখ কিরাইয়া লইলেন ; বুকের মধ্যে অস্ত্র অতর্কিতভাবে জীবন একটা আঘাত হাতুড়ির বাঘের মত সজোরে আঘাত পড়িল। অল্পক্ষণ পরে যেন একটুখানি দম লইয়া আত্মভাবে বলিলেন, “হোমা “মাংস আর লবাই মিলে হুতা করোনা। কেমন করে তোমার এ যুক্তি আমি চোখে দেখব ?” শিবানী এই ভাবনার জগৎ বর্জ্যজীবিত বোঝার মতনই প্রস্তুত হইয়া সমবাক্যে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সে অকুণ্ঠিত সাহসে সুখ তুলিয়া পরিষ্কার করে কহিল “মাংস আর অস্ত্রের কাষে প্রের দেবেন না। যা করতেই হবে তার জন্তে প্রস্তুত হওয়াই ভাল।”

শ্যামাকান্ত কাতর ধ্বনি করিয়া বাগাইত বিহ্বলের মত চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। আত্মলকর্মে কহিলেন “তবু যে আশা ছাড়তে পারিনি যে, এখনও সে তাকে ফিরে পাব মনে করতে বড়ই ইচ্ছা করে।”

এদিকে কাণী দ্বার সমুদ্র আয়োজন প্রস্তুত ! সেখানে দেওয়ানজী নিজে গিয়া বাড়ি-ঠিক করিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। পুরাতন বাড়ি কত মাসে মেহামত করিয়া গলাইয়া গাশোপাখোঁ প্রবণ করিয়া ভোগা

হইরাছে । এখানেও সব বন্দোবস্ত ঠিক ।
বিশ্ব কাপের বন্দোবস্ত, পর বাড়ির ব্যবস্থা
সবই পরামর্শে করা হইয়াছে ; শুধু তাঁহার
শরীরটা একটুখানি দুর্ব্ব হইলেই যাওয়া যায় ।
শিবানীও লক্ষীপুর তাগ করিতে পারিলে
ভাষিণী পূর্ণাঙ্গেরা অনেকখানি প্রসন্ন হইয়া
উঠিয়াছিল এবং সম্মুখাগত সেই সমস্ত লোকের
বাহিরে জনবিরল স্ত্রীপুত্র সন্তান করিয়া গঠিত
করিতেছিল । ঐশ্বর্যের জোড় ছাড়িলে আঃ
কি অনাবিল অপভ্রমের শাস্তি ! বনের হরিণী
যেন ভালবসে হইয়াছিল । কেবল অমূল্যকৃদারই
এ বন্দোবস্তে বড় দুঃখী হইতে পারিতেছিল
না । সে মধ্যে মধ্যে পিতামহকে আনিয়া প্রশ্ন
করিতেছিল “সেখানে গালি আছে ? পুতুল
আছে ? কমলা নেবু আছে ? আল কি
আছে ?”

সেদিন সবে কর্দম পরে যোদ উদ্ভি-
রাছে ; যোদ গঠার সঙ্গে সঙ্গেই পারের
বেদনাও অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে দেখিয়া
শ্রামাকান্ত পাঁজ দেখাওয়া কানী বাতায় দিন
দ্বিৎ করাইলেন । আগামী বুবার ব্যতীত দিন
ভুল । শ্রামাকান্ত মনে মনে বলিলেন “মাগে
যেন নীচ নীচ মুক্তি পাই মা । আর কিছুই
ভুল আমার নেই ; শুধু এখন তোর শাপশ্রমে
একটুখানি ছানি !”

শিবানী সমস্ত দিন ধরিয়া বালকোশন
গোছাইয়া আবশ্রুক বস্ত্র লকল একত্র করিল,
বাধ্য বেখানে রাখিবার ব্যথিতে তুলিতে লজ্জা
হইয়া গেল । তাড়াতাড়ি কাপড় কাটিয়া
পট্টবস্ত্র পরিয়া পুণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিতে
বাইতেছে এমন রোক্তমানী মোক্ষদাদানী

আনিয়া ডাকিল “বড় মা কর্তাণ্যু তোমার
শীগিরি একবার ডাকচেন” । কি যেন একটা
অজানিত ভয়ে শিবানীর কৃৎস্ন মধ্যে ধড়ল
করিয়া উঠিল ; কম্পিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা
করিল “কেন জানিস ?” রজন লজ্জিত
কণ্ঠে মোক্ষদা কহিল “ছোটবার বড় ব্যাধাম
গো—বাপু ব কাছে তার এষেচে—বাচে কি না
বাচে ?” শিবানীর হাত পাঠেই তলা যেন
হিম হইয়া আসিল । শ্রামাকান্ত বদকে দেখিয়া
অলম্বনীর জনমবেগে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন
“শামার মুত্থা নেই এই অল্প মুত্থা অলম্বার
কেবল ঐলব গোথে দেখবার লজ্জাই শুধু নেচে
থাকলান বইতো না । নিজে যে চুটে একবার
গিয়ে দেখবো সে শক্তিও নেই”—মুহু হইতে
মুহুতর স্বরকে আবার একটু স্পষ্ট করিয়া
লইলেন, বলিলেন “তুমি যাও মা কিছু টাকা
নিরে যাও ; যেন বিনা চিকিৎসার মাকে
আমার ঘেরে কেলে না । তোমার আর
কি বলে দেখো—আমার ভাগ্যে অনেক
দুঃখই আছে, অনেক লক্ষ্য করছি আরও অনেক
সইতেও হবে । প্রাক্তনে যা লেখা আছে
কে শক্তবে ? তুমি যাও মা ভোরের টেনেই
যাও এখন তো আর টেনে নেই করিবার
মশাই বিপিন আর দাসীনের দুইকটাকে
সঙ্গে নিও । এই গলিগলানী বেঘমকে বিও
যদি তার ভাততেও একটু দয়া হয় ! আর
একটি কাজ কর বিপিনকে ডেকে পাঠাও ;
রজনীকে একটা তার কড়ক,—সে বেধে হয়
কিছুই জানে না, তারা মা ব্রহ্মমহি ! আমার
তোর চরণে একটু ছানি দে মা ; আর যে
আমি পারচিনে ।”

শিবানী নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া

গেল। আজ আবার অনেক দিন পরে তাহার শুকনো হস্তে কল পড়িল।

শিবানী এখন দারুণ উৎকর্ষা ও নিরাশা বহিরা। লইয়া গাড়োয়ানের নির্দিষ্ট বাড়ি-খানার মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন চারিদিকের গাড়োয়ালার উপর দিয়া সন্ধ্যার ঘনাক-কার সেই ক্ষুদ্র পরীখানিকে নির্বিড় ভাবে বেটন করিয়া পরিদৃষ্ট। অন্ন অন্ন কোরাণা ও মেগে আকাশে তারকাচন্দকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, মধ্যে মধ্যে চলন্ত ভয়ল বেলের আবরণের মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের যোগীর নিশ্চিহ্ন খোলা চক্কের দ্বারা মান চক্রে প্রকাশিত হইয়া আবার মেঘাভবে আচ্ছাদনে লুকাইয়া পড়িতেছে। খোপকাপ গাড়োয়ালার মধ্যে পুজ পুজ অন্ধকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। নিকটিক কোনাকির পৃচ্ছ লত লত জ্বলিত আলোক-গুলি স্যালাইয়াও সেই বৃহত্তর অন্ধকারকে পরাভূত করিতে না পারিয়া বৃক্কে বৃক্কে কেজ্র চূত উদ্যোগের মতন ছুটিয়া বেড়াইতেছিল।

প্রবেশ ঘাটের ঠিক সমুখেষ্ট একটা নব্বের সমুখেষ্ট বারান্দার একটা গঠন অলিতেছে, এবং কে এক ব্যক্তি সেট আলোর সামনে বসিয়া একখানা কুঁজ নোটবুকে পেনসিল দিয়া লিখিতে মনে কি লিখিতে ছিল। তাহার মত মুখের উপরে লম্বাটের উপর হঠাৎ অসম্মিত দীর্ঘ ক্ষুণ্ণিত কেশের ছাড়া আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া শিবানী তাহার মুখ দেখিতে পারিতেছিল না। তথাপি হেমেস্ত্র বলিয়াই সে তাহাকে অনুমান করিয়া লইল এবং সেই বিবাসেই অল্পসর হইয়া গিয়া তার বিহ্বল ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল “ঠাকুরপো!”

সে ব্যক্তি চমকিয়া মুগ্ধ হুগিল, আলোকের

উজ্জ্বল রশ্মি পরিভারক্বে তাহার মুখের উপরে পতিত হইয়াছিল, শিবানী দেখিল সেখানি হেমেস্ত্র নহ, — কে? একবার মার সেই সমুখত মুখখানার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই শিবানীর আগামমস্তক বাহ্যোত তাড়িত কালজুহুদের মত কম্পিত হইয়া উঠিল। সে তাহার বিস্মারিত বিম্বিত দৃষ্টি দেখানে সংবদ্ধ রাপিতেও পারিতেছিল না; আবার কিরাইরা লইবার শক্তিও তাকে বৃহত্তর মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।

কোন মহা ঐশ্বর্যালিনের এ গৃহ! দেখানে অসম্ভব অনাভাব সম্ভব হইয়া উঠে? দেখানে বস্ত্র প্রত্যক্ষ পরীরে দেখা দিয়া সজ্ঞা আশা স্নোতে লবেগে আঘাত করে! একি মারার রাজ্যে সে আজ লহন আসিয়া পড়িল! একবৃহত্তর সে ব্যক্তি, জড়ের মতনই নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। কিছু তার পর এও কি ইন্দ্রজাল! হঠাৎ সে পেনসিল ও খাতা-খানা জাহার লকেটের মধ্যে ফেলিয়া শিবানীরই নিকটে এত নিকটে আসিয়া ঠিক-ইল যে তারার তত্ত্ব নিখাস শিবানীর গুণ্ণপর্ণ করিতে লাগিল। শিবানীর বকের ক্ষত কম্পনও নুশ্বিত তারার কণে অল্পভূত হইয়া উঠিল। একবৃহত্তর কেহ দুকান কথাই বলিল না হুজনেই নিম্পল হইয়া পরম্পরের পানে চাহিয়া রহিল।

বিরাট পুরুষের সমাধি মৃষ্টির জাহার সমস্ত চরাচর তখন ধ্যানমগ্নবৎ সজ্ঞ হইয়া রহিয়াছে! কেবল স্মিত্রির সমতান সেট যোগমন্ত বিবের অস্ত্রকেন্দ্রের মধ্যে প্রবেশের গভীর খুলির সহিত মিলিয়া যেন এক চটয়া গিয়াছিল। কেবলমাত্র শক্তি সজ্ঞ কুরাসামত শীতের রাজি নিঃশব্দে স্মিত্রির যানের প্রচরীর মত গ্রহর-

বেশ হস্তে তর্জনী তুলিয়া আশিয়া ছিল !
শিবানীর হাতপায়ের তলা অগাধ হিমবৎ
হইয়া আসিতে লাগিল ।

নীরদকুমার আর একটু নিকটে আসিয়া
শিবানীর একটা হাত ধরিল । মুঠ অধট
অকম্পিত সহজকণ্ঠে বলিল “শিবানী, তুমি
পেরেছ আমার চিনতে পারলে না ?”

সত্ত্বাত একটা দমকা হাওয়ায় আলোটা
নিম্না গিয়া ঘোর অন্ধকারে চারিদিক আবৃত
হইয়া গেল । * * * *

দ্বিতীয় সুসূচীটার পর হইতেই যোগীর
অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে । ভাল করিয়া
আর সংজ্ঞা কিরিয়া আসে নাই, প্রাণশয়ও
আরম্ভ হইয়াছিল । হেম শান্তির বিছানা
বৈশিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল । যোগী
অল্পকণ মাত্র একটু তত্বাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে,
নীরদ সত্ত্বর্ণণে কাছে আসিয়া তাহার কানের
কাছে নত হইয়া চুপি চুপি বলিল “তোমার
বৌদি এগেছে একটা আলো নিয়ে যাও ।”
বলিয়াই হেমের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে
চাহিয়া দেখিল ; হেমেত্র বিপা না করিয়া ব্যস্ত
হইয়া চলিয়া গেল ।

অন্ধকারে শিবানী একা ঠাঁড়াইয়াছিল,
হেম আসিয়া তাহার পা ধুপানি হই হাতে
অড়াইয়া ধরিয়া একেবারে তাহার পায়ের
উপরে মাথা রাখিল “বৌদি ! তোমার মনে
কষ্ট নিষেছি বলেই আমার এ শাস্তি, তুমি
ক্ষমা করো বৌদি, না হলে আমি জন্মের মত
গেলাম ।”

শিবানীর সমস্ত শরীর কাটা দিয়া উঠিল,
অবসর পা গ্রন্থানা তখনও ধর ধর করিয়া
কাঁপিতেছিল ; কঠকালু পর্ষাও শুকাইয়া কাঠ

হইয়া গিয়াছে, সে অতি কষ্টে শরীর মনোর
শক্তি সংগ্রহ করিয়া বেহিম্বী সর্পসংহ জননীর
জায় লম্বাঅহুশোচনাশ্রুপিড়িত দেহরকে
ধরিয়া তুলিতে গেল ! সাবনা দিয়া
বলিল “এত কাতর হয়ো না ঠাকুরপো ; শান্তি
আমাদের ভাল হবে শৈকি ।”

হেম তথাপি তাহার পা ছাড়িল না,
উদ্ভ্রান্তের মত জোর করিয়া স্তই হস্তে পা
ধরিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল “তোমার
আশীর্বাদ নাগেলে যে শান্তি পাওবে না বৌদি ;
বলে তুমি আমার জুয়াবহার কি জ্বলতে
পারবে ?”

শিবানীর গণ্ড বহিয়া আনন্দ মিশ্রিত
বেদনাব অলপায়া গড়াইয়া পড়িল, কণ্ঠপ্রায়
কণ্ঠে সে কহিল—

“হিম হও ঠাকুরপো অত কাতর হয়ো না ;
নিশ্চয়ই শান্তি আমাদের ভাল হবে, তর কি !”

হেমের নত হইয়া আবার হৃদয়ের সহিত
তাহার পদগুলি গ্রহণ করিল ; ঈষৎ লম্বুভিত্তে
কহিল “তোমার আশীর্বাদে আমার আমার
আশা হচ্ছে ।”

৪৪

নীরদের টেলিগ্রাফখানা সন্ধানীনাথ বগল
পাইলেন তখন তিনি মকেলদের নিদার করিয়া
নিজের পাঠাগারে হুকুমারকে লইয়া বসিয়া-
ছিলেন । সমুখে একখানা খোলা বই পড়িয়া
ছিল বটে কিন্তু অকু তাহাকে সে দিকে মন
বিত্তেই বিত্বেছিল না । একটুখানি চিত্ত
সংযত করিয়া একটি প্যায় না পড়িয়া
উঠিতে উঠিতেই অকু অসহিষ্ণু হইয়া
শিতার বাহ আকর্ষণ করিয়া তাড়াতাড়ি
বলিয়া উঠিতেছে,—“ষ্টিক এইখানটাই আপনি

শুনলেন না। বিস্ময়ের টিন কেটে তো চাকা হলো, পাতলা কাঠির ছিপকে দিয়ে পাখা ছুটি হ'বে—কিন্তু এইবার পেটোল না হলে তো চলবে না। সোফার আমার দেখ না—তুমি যদি বাবা তাকে একটু দিতে বলে দাও তাহলেই দেখবে আমার এরাগোপ্সেন চব্বছ কের আকাশে উঠতে থাকবে। ঐ আবার তুমি বই পড়গে—!” স্বকৃত অভিমানকে আজ কাল রজনীনাথ অত্যন্ত ভয় করেন, তাই তাক্তা তাক্তি বই রাখিয়া বলিলেন “না রে একটু দেখে নিলুম, আচ্ছা থাক্।”

সুপ্রকাশ খুশী হইয়া কাছে বৈয়া আসিল, বিব্রতভাবে কোলে মাথাটা রাখিয়া হুই হাতে গলাটা জড়াইয়া বলিল “আচ্ছা বাবা সন্ধ্যার চাইতে আগে কোন বেশের লোকেরা উন্নত হয়েছিল ?” এ প্রশ্ন নতন নয়, রজনীনাথ মেচের সহিত হাসিলেন “আমাদের দেশ,” স্বকৃত হাসিল। এমন সময় বলাই লাগিয়া বলিল, “আরজেন্ট টেলিগ্রাম একটা এসেছে।” তুমিরাই কে জানে কেন হঠাৎ রজনীনাথ চমকিয়া উঠিলেন, তিনি রসিঘটা নই করিতে লাগিলেন স্বকৃত উঠিয়া বসিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহা হইতে ত্রি-কি সংগ্রহ করিতে গিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল যে ইহাতে বিদ্য পুতুলের বালা করিত। স্বকৃত বুঝানো আলোড়িত হইয়া উঠিল। পাছে বাবা তাহার মনোগততাব বৃদ্ধিতে পারিয়া কাতর হন সেই ভয়ে তাক্তা তাক্তি টেলিগ্রামটা খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রজনীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন “বুঝতে পারছিল ?” সুপ্রকাশ অকস্মাৎ সর্পিটের মতন চমকিয়া আত্মকণ্ঠে

অক্ষুট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “ও বাবা, একি লিখেছে—দিবির অস্থল—দিবিরলু,—মানেতো পু বৈশ ?” ঘরের মধ্যেকার সমস্ত বায়ুবেগ একেবারে ফুট হইয়া গিয়া রজনীনাথের নিখাস রোধ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। শান্তির কঠিন সীড়া! স্বকৃত হাত হইতে তাক্তাতাক্তি টেলিগ্রামখানা গইয়া রজনীনাথ পড়িলেন। কি পড়িলেন যেন বৃদ্ধিলেন না—নিতকে কাগজ খানার প্রতি বহু দৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

সুপ্রকাশ, সতয়ে ডাকিল “বাবা!” “রজনীনাথ সুখ জুগিলেন আগবীনের মতন বর্ণবিহীন ও মান সে সুখের দিকে চাহিয়া ভীত স্বকৃত আরও শিহরিয়া উঠিল। একটুপানি চুষ করিয়া থাকিয়া সাহস করিয়া সে আবার বলিল “বাবা ?” “কি ?” “যায়েন না আপনি দিবির কাছে ? দেখি হয়ে যাচ্ছে যে”।

রজনীনাথ প্রপ্রোথিতের মতন চমকিয়া উঠিয়া অধীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন “গাবো না স্বকৃত,—যাবো বই কি ! সে যে আমায় ডেকেচে !” সুপ্রকাশ হুই তাতে সুখ চাকিয়া সহসা কাদিয়া উঠিল। রজনীনাথ “বর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার লইয়া টেনে গাড়িতে উঠিবার সময় হঠাৎ নজর পড়িল স্বকৃত ও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। রজনীনাথ কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দীর ও সংঘত ভাব দেখিয়া কেহ মনে করিতেও পারিল না যে তিনিই এই শব্দটাপর রোগীর পিতা। হেবেত্র মনে

করিল “এখনও আত্মপের ক্ষমা করেননি, কি কষ্টনি মন ।” নীরব আন্তর্গে মনে মনে বলিল “অন্যধারণ দেখা ! ইনিই প্রকৃতজ্ঞানী ।” ডাক্তারেরা পরস্পর বলাবলি করিলেন, “যেয়েটি ভাল না হলে বেচারা হয়ত লাগল হয়ে পাবে । কি ভয়ানক আত্মদমন প্রয়াস ।” শিবানী আসিবার কিছুক্ষণ পরে ভোরের সময় শান্তি একবার ভাল করিয়া চোখ চাছিল, কণকাল চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ তাহার একখানা হাত ধরিল “দিদি !”

শিবানী তাহার মুখের উপর নত হইয়া সম্মুখে তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে করিল “আমরা যে তোমার কাছে এলোছি দিদি !”

দুর্দল রোগী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর আবার জিজ্ঞাসা করিল “আর জোঠা মশাই ?” “তিনি কাল পরন্তর মৃত্যে আসবেন, তাঁর পায়ে বাধা হয়েছে তাই এলোতে পারেননি । অমুকেও আনবেন ।”

শান্তি মুখে ঘোর নৈরাশ্র প্রকাশিত হইল । “দিদি !”

রজনীনাথ আর আত্মলব্ধ করিতে পারিলেন না, কাছে দরিদ্রা আদিয়া কড়ার মাথার হাত রাখিয়া বন্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন “শান্তি আমার !”

“বাধা !” রোগীর ক্লিষ্ট মুখে আনন্দের গভীর উজ্জ্বল উজ্জল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, ক্রান্ত মস্তক দ্রব্য কিরহিয়া সে পূর্ণ চক্ষে চাহিল “কমা করেছ কি বাধা ? আমার অপরাধ, কমা তবে করেছে কি ?”

রজনীনাথের অনির্বচিত বাক্য অবলম্ব্য বেদনার ফাটিতে লাগিল, কণ্ঠে করিলেন

“কমা তো অনেক দিনই করা উচিত ছিল না, লজ্জান ভুল করলেও তো পিতার রাগ করবার কোন অধিকার মাই ।”

হেমেন্দ্র সহসা রজনীনাথের পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল “শান্তি আপনার অপরাধ খপরও পার নি ; সবি আবার সুবুদ্ধি ! বোগেশ ও আমি মিলে বিধা কথা বলে আপনারকে সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম বাগ্গা ! সত্যানকে ক্ষমা করুন ।”

শান্তি রজনীনাথ হোবপ্রদীপনেই জামাতার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ; শান্তি ধীরে ধীরে আবার ক্রান্তভাবে চোখ মুদ্রিত করিল ।

দেদিনটাও কাটা গেল । ডাক্তারেরা বলিলেন, আজ আত্মবক্তা, আজই একটা জাইসিন্দু, আজই যে কতকটা মানুষ চিনতে পারচে একটা বড় মূলক্ষণ । তবে রোগী বড় দুর্দল হঠাৎ কোন বিপদ না ঘটিলে বার—” সমস্ত দিন সপ্তপ্রাণী করটি নিশাপ কছ করিয়া রোগীর ক্রমশ পরিবর্তিত মুখের দিকে চাহিয়া কাটাইল । অস্ত্র কাহারও দিকে চাহিতে যেন তাহার সাহল করিতেছিল না ।

অপরাত্নের দিকে একত্রার সে সন্ধ্যা হইয়া অপ্রকাশকে দেখিতে চাহিল । অহু দিবার আন্তর্গে পরিবর্তিত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিতে বাইতেছিল । পিতার ইঙ্গিতে উজ্জত অপ্রপ্রবাহ গোবের মনো চালিয়া কেনিয়া গতিত মূর্ত্তির জার জর হইয়া বসিয়া রহিল ।

রজনীনাথ নীরবের স্তব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন “ওমু খাওয়াবার সময় হয়েছে না ?” শিবানীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, “ওম্বু বোবার আগে একটু ডুখ খাও-
 মাতে হবে বুঝি ?” শিবানী অর্দ্ধাঘুর্ণিতনাক্ষাণে
 চাহিয়া দেখিল,—মিঃ রাধ ঔষধের গ্লাস লইয়া
 তাহাদের দিকে আগ্রসর হইতেছেন। সে
 কণ্ঠিত বকে অবগদ পাছথানাকে ধোর
 করিয়া টানিয়া লইয়া ছুঁ গরম করিয়া আনিতে
 পাশের খরে চলিয়া গেল। তাহার নবজীবনের
 আশা উৎসাহ আলোকে ও পুলকে প্রথম
 অকণকিরণসম্পর্শে নির্মূল নীহারবিন্দুর
 মতই স্বলম্বন করিয়া উঠিতেছিল। যদিও
 মাথার উপর মীল নীরদমালা আসন্ন ঝটিকার
 বিপুল উজ্জ্বেল সাংঘাত মুষ্টিতে সাজিয়া উঠিয়াছে,
 বীতিমালাসংকুল জীবনলম্বুর উত্তাল হইয়া
 গ্রাস করিতে আসিতেছে তথাপি সেই মুক্তার
 হুসে আল জীবনের রাগিণী মিলনের মহানু
 সঙ্গীতই গাধিতেছিল।

বহুদিনের ক্রান্তিতে অবসর, ভাবনার
 ভাষাজ্ঞান শিবানীর বিষর চিত্ত, সহসা যে
 বাহকদের স্বিতহাস্তমণ্ডিত জ্যোতির্ঘর
 আলোকে নবীন জগতের হরিৎ শোভাযুক্ত
 নূতন সূত্রের মাঝখানে আবদ্ধ হইয়া
 পড়িয়াছিল সেখানে জন্মায়ত্তাক্ষর ও বিখ্যার
 আক্রমণকে হঠাৎ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে
 যেন কোনমতেই পারিতেছিল না। তাই
 এই আলস স্বপ্নের বুথও সে শান্ত সংযত অটল
 ভাবে বিপদকে মরীচিকার মত বিকপ্রান্তের
 অন্তরালে বিনোদমান অপরূপে ধরিয়া
 লইয়া চিত্তকে আশাপূর্ণ করিয়া রাখিতে
 সক্ষম হইয়াছিল।

রায়ে রোগী যেন একটু শান্ত হইয়া
 দুমাইতে লাগিল। রজনীনাথের বিধানী
 কলিকাতায় দুইজন ডাক্তার করিনই দেখানে

উপস্থিত, আজ আবার আর একজন সাহেব
 ডাক্তারকেও আনা হইয়াছিল, বিশেষ করে
 সময়টা কাটিলে যেন বাটা যায়। বহুমতী
 দেখানে জীবন্ত হইয়া আছেন, তাঁহাকে
 একটু ডাক্তার বলিয়া সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল,
 কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া
 তিনিও বিনয়ের সহিতই চলিয়া আসিবার স্তম্ভ
 কাঁচাকাটি আরম্ভ করিয়াছিলেন।

যখন সে জাগিয়া উঠিল তখন আনাগার
 চারিদিক নিরা মীল পর্দার অন্তরাল হইতে
 প্রভাত সূর্যের নবীন রশ্মি সঞ্চিত রোগী
 গৃহে, নব্বাহীন নির্মূল তত্ত্বতত্ত্ব শিশুর অকুণ্ঠিত
 সরল হাস্তমণ্ডিত নেত্রপাতের মত বিধাপ্ত
 হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। রাজের অন্ধকারে
 গভবিরসের কর্ণকাজি ও অবসাদের
 কালিমাকে মিলাইয়া নিরা সিঁদু স্তম্ভের প্রভাত
 প্রভাত নবজাগ্রত জীবনকে নবীন
 শক্তি ও কর্ণ উদ্দীপনা দান করিয়া আবার
 কর্ণসংঘাতের মাঝখানে নামাইয়া দিতে
 আসিয়াছে। এখনও সেখানে তৃকানুধার
 কান্তরক্ষসন ও বাতপ্রতিষেধকের বিরোধ,
 উষ্মের তীব্র চীৎকার জাগ্রত হইয়া উঠে নাই।
 জগৎ এখনও সজ্ঞানাত শিশুর মতই নির্জিহাবী,
 বিরোধে বিবাদের হুচনার তখনও বিলম্ব ছিল।
 জগতের সমস্ত সঙ্কেত, সমস্ত ভুলত্রুটি, সমস্ত
 শাপতাপ প্রতিদিনই এমনি করিয়া বিগত ক্লোম
 ও স্তম্ভ শান্ত হইয়াই বেহমরীমারের শূন্য অকলে
 শিশুর মতই বেথা দেয়। যুগ যুগান্ত হইতে
 এই নিরম চলিয়া আসিতেছে। তবু যেন
 আলিকার প্রভাত নবীন আনন্দ লইয়া এই
 গৃহেই আল প্রথম জাগিয়া উঠিল।

শান্তিকে আগিতে দেখিয়া ডাক্তার

আসিয়া নাড়ি বেঁধেলেন, যুগ প্রসূর হইয়া আসিল, রজনীনাত্মক শত্রুর নিশাংগ ফেলিলেন। শাস্তি তাহাদের ভাব বৃদ্ধিরা ক্রান্তিহীন নেত্রে সমুখে উপবিষ্ট হেমেস্ত্রের উৎসুক মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া যুগ ককণার হালি হাসিল, হেম ও ঈশং লজ্জিত হইয়া স্নানভাবে হাসিয়া যুগ নীচু করিয়া ফেলিল। তবে তাহার পাশ প্রায়শ্চিত্তবিহীন নয়!

একটু বেলা হইলে শিবানী একথানা কাগজ হেমেস্ত্র হাতে দিয়া বলিল “বাবা আসবার সময় এই কাগজখানা তোমার দিতে দিহেছিলেন। কদিন আর দিতে পারিনি, ঠাকুরপো এই নাও।”

“কি এখানা।” বলিয়া হেম সেখানা পুলিশ একবার মাত্র দৃষ্টিশীল করিয়াই তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আরক্ত মুখে বলিয়া উঠিল, “ও সব অমূল্য, আমি নিজে উপার্জন করব। আমার পে তুকাই এখন আর সেই তখন আর কেন বোদিদি।” রজনীনাত্মক ভ্রাম্যাক্ষের দানপত্রবানী ভূমি হইতে কড়াইয়া লইয়া মনে মনে পাঠ করিলেন, হেমেস্ত্র ও শাস্তি তাঁহার স্বায়ত্ত অস্বাভাব সম্পত্তির অর্জাংশের অধিকারী, এই কথাই তাহাতে লেগা ছিল। রজনীনাত্মকের সাহায্য না পাইয়া জেলা কোর্টের উকীলের দ্বারা বৃদ্ধ একটু কোণের সহিত এই দানপত্রবানী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সম্পত্তির অর্ধ পৌত্রকে এবং অর্ধাংশে বিধবা পুত্রবধূ শিবানীকে দান করিলেন, এই মর্মে এই উইল লেগাপড়া করা হয় এবং শিবানীও সর্গে সুখে তাহার সমুদয় সম্পত্তি তাহার দেবর ও দেবর পত্নীকে

দান পত্রে লিখিয়া দিয়াছিল। রজনী নাথ দানপত্র পড়িয়া একটু হাসিয়া শিবানীর দিকে ফিরিলেন “বিবাহ ত তোমার নয় মা, ভূমি দান করচো কেমন করে? তোমার স্বত্ত্বের সম্পত্তি তোমার স্বামীই দান কর্তার প্রকৃত অধিকারী।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিকটস্থ কুত্র টেবিলের উপরকার শিশিপত্র শুছাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত মিঃ দায়ের দিকে ফিরিয়া তাঁহার স্বভাব-লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর সত্যত কর্তে ডাকিলেন “বিনোদ!” নীরব ফিরিয়া গড়াইল। রজনী-নাথ উত্তীর্ণ গড়াইয়া কহিলেন, “তোমার বাবাকে ঠেলন থেকে নিয়ে আগতে চলে। তোমার জীকে এ অশিষ্ট দানপত্র ফিরিয়ে দিও—”

সহসা সেই স্বরের মধ্যে বস্তুশীল হইলেও এর চেয়ে কেহ সজ্জিত হইত না! হেমেস্ত্র উত্তীর্ণ গিয়া ভিঃসঙ্গে নীরবভ্রমার পথতলে লুটাইয়া পড়িয়া লজ্জাপীড়িত রুদ্ধকণ্ঠে বলিল “পাশা!”

বিনোদ তাহাকে ধরিয়া তুলিল, সবচেয়ে আলিঙ্গন করিয়া প্রশান্ত স্বরে কহিল “ও সব কথাই আমাদের কাজ কি হেন?” বাবা আগটেন এসো আমরা একসঙ্গে হু তাগে তাঁর পারে পড়ে ক্ষমা চাই, আমরা হুগনেই যে তাঁর কাছে অপরাধী।” শাস্তির রক্তহীন মুখ মুহূর্ত্তে আনন্দের উজ্জল দীপ্তিতে স্ফোতিত হইয়া উঠিল। দিদি বলিয়া দে শিবানীর সাগ্রহ বাহর মধ্যে পরিতৃপ্তচিত্ত শান্ত শিত্তির মত নিঃশব্দে অর্পণ করিয়া দিচ্চ হাতের সহিত মুখের উপর ঈশং ঘোমটা টানিয়া দিল।

অলক্ষণ পরেই দায়ের নিকট হইতে ভ্রাম্যাক্ষ ডাকিয়া বলিলেন “কই আমার মা, আমার মা কই গো।” শ্রীঅমৃতকণা দেবী।

সমাপ্ত।

প্রার্থনা ।

গানের স্বরে জনর মন রাখ হে রাখ ধরে
তারে দিহোনা করু ছুটি ।
আদেশ দিয়ে রজনী দিন দাও হে দাও ভরে
এতু আমার বাহু ছুটি ।
তব পলকহারি আলোকনিষ্ঠি মরহ পরে রাখ,
যত সরমে ঘোর স্তম্ভ দিয়ে নীরবে চেরে থাক,
এতু সকলভণ্ডা আমার তব রাখ আত্ম করে
মোর যেখানে যত ছুটি ।
মোর দিহোনা দিন স্বপ্নের আশে করিতে দিন গত
তু দু শমনপরে লুটি ।
আমি চাইনি ঘাড়া তাই দিহোহে আপন ইচ্ছামত
আমার ভরিয়া ছুই খুটি ।
মোর বতই তুবা ততই কৃপাবরষা এস নেমে,
মোর যত গভীর বৈজ্ঞ তত ভরিয়া তোলা প্রেমে,
মোর যত কঠিন গর্জ তারে হান ততই বলে
তাঁহা পড়ুক পারে টুটি ।

শ্রীরাবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

আমেরিকায় গ্রীষ্মাবকাশ ।

এবার গ্রীষ্মের বসে আমি কি কার্য
করিয়াছি এবং এ স্থানের ছাত্রেরা সে সময়
সাধারণতঃ কি রকম কাজ করে তাহাই আজ
কিছু লিখিব। কেন না সম্ভবতঃ তাহাতে
আমাদের দেশের যুবকগণের কিছু উপকার
হইতে পারে। এখানে গ্রীষ্মাবকাশে আমা-
দিগকে যাঠে কার্য্য করিতে হয়। এসেশের
ছাত্রেরা বতই বনী হউক না কেন,

গ্রীষ্মাবকাশে শারীরিক পরিভ্রমের কার্য্য
করিয়া থাকে। এ সময়ে ছাত্রগণের মুক্তক্ষেত্রে
(open air) কাজ করাই বিধি, এবং
সকলেই এখানত নিজ নিজ শিক্ষাহারী
কার্য্য সংগ্রহ করে।

আমাদের কলেজ বহু হওয়ার অব্যবহিত
পরেই কলেজ হইতে কাজ সংগ্রহ করিয়া
আমরা যার মন ছাড়ে এখান হইতে আর

৮০ মাইল দূরে (Jewiston) লুইস্‌টন্‌ নামক স্থানে ঘাড়া করিলাম। পূর্ণের কখনও এমন কার্যে বাহির না হওয়ায়, এমনকি আমার বিশ্বাসাত্মক অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই কোন্‌ কোন্‌ জিনিষ সর্বৈ নেওয়া প্রয়োজন, তাহার তালিকার অঙ্ক, একজন পদ্রব পরগণার হইতে হইল এবং তাহার পরামর্শ মত জিনিষপত্র প্যাক করিয়া লইলাম। জিনিষ প্যাক করার মধ্যেও, বেশ একটু চাতুর্য্য আছে, যত স্থলভরণে এবং ছোট করিয়া প্যাক করিতে পার ততই তোমার বাহাদুরী। কারণ এই সমস্ত জিনিষ কয়েক মাইল আমাদের আপনাদিগকেই বহন করিতে হইবে। জিনিষ পত্রাদি প্যাক হইলে, চামড়ার ব্যাগ হাতে ও বিছানার মোট বন্ধে করিয়া, আমরা ব্যত জন ষ্টেশন অভিমুখে চলিলাম, ষ্টেশনে পৌছিবার অল্পকণ পরেই গাড়ি পাওয়া গেল, এবং রাজি প্রায় আট ঘটিকার সময় আমাদের গাড়ি লুইস্‌টন সহরে পৌছিল।

আমাদের কার্যাবলী সার হইতে প্রায় আট মাইল দূরে পাহাড়ের উপর। এই আট মাইল হাঁটিয়া কিংবা মালগাড়ী (Wagon) করিয়া অতিক্রম করিতে হইবে; রাজি হওয়ার সেনি আয় ঐ আট মাইল অতিক্রমের প্রয়াস না করিয়া, একটা হোটেলের স্থান লওয়া গেল। হোটেলের আহাৰাদির পর বিশ্রাম ঘরে বলিয়াছি এমন সময় শুনিতে পাইলাম এখানে (Ringling Brothers) রিংলিং ব্রাদার্সের স্থবিখ্যাত সাইকাস্‌ এক রজনীর লজ তাহালা বেণাইতেছে; লুইস্‌টন্‌ ক্ষুদ্র সহর প্রতি বৎসরে

এখানে সার্কাস আসে মা, তাই সকলেই এই সুযোগে সার্কাস দেখিতে ছুটিয়াছে। টহাদের মধ্যে আমেরিকার আদিম আদিবাসী যেড ইন্ডিয়ানগণের সংখ্যা কম নহে। তাহালা দেখিবার টহাদের বড়ই সখ। আমি পূর্ণের কখনও ছই তিন শত আদিম আদিবাসী একত্র দেখি নাই, তাই আমিও ইহাদিগকে দেখিবার লজ উৎসুক হইয়া উঠিলাম।

সার্কাসে যাইবার আমার বড় ইচ্ছা নাই অনেকবার সার্কাস দেখিয়াছি, আর গেলেনই টাক। খরচ; তাই আমরা কয়েকজন বাহিরে চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসব হইতেই রক্তবর্ণ পোশাকপরিহিত একাঙ উজ্জ্বলবর্ণী কয়েকটি শিশুকে দেখিতে পাইলাম; অনেকদিন পরে দেশের লোকের মুখ দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ হইল; এবং এই সার্কাসে ইহারা কি কাজ কবে তাহা জানিবার লজ উৎসুক হইলাম, তাই অগ্রসর হইয়া হিন্দু ভাবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাহারা কি হিন্দুস্থানের লোক?' তাহারাও দেশীয় লোক দেখিয়া আমাদের সাহসে আগ্রাসে প্রবৃত্ত হইল এবং অবশেষে আমাদের দিকে সার্কাস দেখাইয়া তবে ছাড়িয়া দিল। এইরূপে বিনা পরসার আমাদের সার্কাস দেখা হইয়া গেল। ইহারা এই সার্কাসের পার্শ্বনানা প্রকারের ব্যতন্ত্র নিয়ম এমন একটা বিপরীত গোণযোগে করে, যে তাহার তাল মান হ্রস্ব কিছুই থাকে না; সার্কাস কোম্পানি ইহাকে হিন্দু ব্যাঙ বলে। এই হিন্দু ব্যাঙ শুনিবার লজ অল্পলোক ১০ সেন্ট (পাঁচ আনা) খরচ করিতেছে।

ইহারা এই কার্যের অল্প প্রত্যেকে মানিক একশত আনি টাকা (৫০ ডগার) বেতন ও খোদাক পাইয়া থাকে । এই ধরণের হিন্দুযাও তন্নিরা আবাদের বাস্তব ও লক্ষ্যের প্রতি এদেশের লোকের কিয়দংশ দায়গা অথবা তাহা সহজেই বোধগম্য ।

তাড়াভাড়া সার্কাস দেখা শেষ করিয়া ছোট্টো গেলাম, পরদিন অতি প্রত্যবে ছোট্টো একটা ওরগন গাড়ীতে, করিয়া কার্যস্থল অতিমুখে রওনা হইতে হইবে । তোর ছোট্টো ছাড়িয়া, নানা প্রকারের লক্ষ্যে ও কলের বাগান অতিক্রম করিয়া আর সাড়ে নয়টার সময়, আমাদের আড্ডার আসিয়া পৌছিয়া । এখানে আসিয়া দেখি যে ঘটগুলি তাহা ছিল, সমস্তই অল্প প্রমজীবী দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে । কোথাও আমরা ১২ জনে একত্রে একটা তাহা পাইলাম না । কোম্পানীকে কানাইলাস, আমরা ১২ জনে একত্রে বিভিন্ন তাহাতে বাস করিতে চাই । আমরা সাধারণ প্রমজীবীদের সঙ্গে থাকিতে না

চাহার কারণ এদেশে প্রমজীবীরা সাধারণতঃ বড় মাথা এবং তাহাদের অনেকেরই নানা প্রকারের দুষ্টীর ব্যাঘাত পীড়া থাকে । সমস্ত প্রমজীবী যে এই প্রকারের তাহা নহে, তাণ লোক ও বিত্তর আছে । তবে তন্নিরা-হিলাস যে অধিক দিন অদ্যত থাকার অল্প ইহাদের সকলেরই আর পরীয়ে এক প্রকারের উত্তম জমিয়া থাকে, এবং উহা একজনদের অল্প হইতে অপরদের সঙ্গে অতি সহজেই চলাকরা করে এবং ইহা একবার জমিলে তাহা হইতে ছাড়ান পাওয়া বড় কষ্টকর, সমস্ত বিছানা পর পোড়ানো তির পরিভ্রাণের অল্প উপায় নাই । বেশে থাকিতে তন্নিতার কাবুলিদের গায়ে একরূপ পোকা আছে, কিন্তু তাহা তখন বিবাস করিতাম না, এখানে আসিয়া 'গারপোকা' প্রত্যক্ষ করিলাম । বাহা হউক অবশেষে আমাদিগের অল্প একটা যত্ন তাহা ট্রিল চটল । কিন্তু সে রাত্রির অল্প কোম্পানি আন গকে যত্ন তাহা দিতে পারিবে না বলিয়া, আমরা বাহিরে তৃণপথায়া রাত্রি বাপন করিলাম ।



আমরা কাণ্ড করিবার অল্প প্রত্যবে হইয়াছি ।

পরদিন কোম্পানীর তাবু আসিল, আমরা নিজেরাই তাহা খাটাইয়া লইলাম। আমাদের সঙ্গে অধিক বিছানা নাই,—তাই তাবুগৃহ-ভলে পুঙ্ক করিখা পড়ি বিছাইয়া তত্পরি কমল পাতিয়া বেশ মরম বিছানি তৈয়ার করা গেল। এই প্রকারের বিছানার আকাই মাস কাল কাটাইরাছি। সমস্ত বন্যোৎসব ঠিক হইলে আমরা কাজের অস্ত্র প্রস্তুত হইলাম; আমাদের গাছ ছাঁটা (pruning) কাজ করিতে হইবে। এখানে আট হাজার একরু জমিতে—আপেল পিচু জুল (plum) চেরি ও পেয়ার ফলের চারা লাগান হইয়াছে; এই সমস্ত বৃক্ষ এক হইতে চার বৎসর বয়স; এখনও ভালরূপ ফলধারণ করে না; কোন কোন গাছে দুই চারিটা করিয়া মাত্র ফল ফলিতেছে।

পেয়ার চারার পাখা বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম *“Fruit Age”* জানে। শিশুকে যেমন সুশিকার অস্ত্র বালাবহা হইতেই বয়স আরম্ভ করা প্রয়োজন, বৃক্ষ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা। বৃক্ষদিগকেও ঠিক চারা অবস্থা হইতে উপযুক্ত পরিমাণের ফল ধারণে অভ্যাস করান হইয়া থাকে, এই জন্তই গাছগুলিকে ছাঁটিবার প্রয়োজন হয়; এবং এই জন্তই গাছ ছাঁটিবার পূর্বে ইহার বৃদ্ধি ও বিস্তার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সমস্ত বৃক্ষই একপ্রকার বৃদ্ধি পায় না বা শাখা বিস্তার করে না; বহুখা জাতির জাব বৃক্ষাদিও নিম্ন নিম্ন জাতি অস্থায়ী বৃদ্ধিগত করে। যেমন মোগল জাতির আকার অব্যব একবার দেখিলেই তাহাকে মোগল বলিয়া জানা যায়; কিংবা আর্থা জাতিকে দেখিলেই

আর্থা বলিয়া বৃদ্ধি; সেইরূপ উদ্ভিদবিজ্ঞান-বিদগণও একবার দেখিয়াই এক বৃক্ষ হইতে অস্ত্র বৃক্ষের প্রভেদ বলিয়া দিতে পারেন। সমস্ত আর বৃক্ষই আমাদের নিকট এক প্রকারের বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আসলে তাহা নহে, ফলনি আমের বৃক্ষ এক প্রকারে শাখা বিস্তার করে এবং লেঙ্গড়া আম অস্ত্র প্রকারে। বৃক্ষ জীবনের এই সমস্ত রহস্য তবু সুবগত থাকিলে, নিজে ইচ্ছাযুগারী বৃক্ষগুলির ব্যবস্থা করা যায়; আপন ইচ্ছা-যুগারী ফল ধরান যায়। এই জন্তই গাছ ছাঁটির প্রয়োজন; গাছকে ফল ধরাইবার অস্ত্র অভ্যাস করাইতে হইলে ইহার ভাল, পাঠ ও কাঠের বৃদ্ধি সময় মত বন্ধ করাইয়া, সেই খাড়া ও রসটুকু ফল ও ফলের বৃদ্ধিতে পরিবর্তন করিতে হয়। গাছছাঁটির প্রধান উদ্দেশ্যই গাছকে ইচ্ছাযুগারী করিয়া তোলা। গাছ ছাঁটিবার অপর উদ্দেশ্য এই যে গাছকে চতুর্দিকে সমভাবে বর্ধিত হইবার পক্ষে সহায়তা প্রদান করা ও তাহার জাতি অস্থায়ী গাছের অবয়ব বৃদ্ধি করা।

এতদেখিলে আধুনিক ও প্রাচীন ফলবৃক্ষের তুলনা করিলে দেখিতে পাওঁজা যায় যে আধুনিক বৃক্ষ প্রাচীন বৃক্ষ হইতে, অব্যববে অনেক ছোট। ইহার কারণ এই যে, ফলবৃক্ষ ছোট হইলে ফল শাঙিতে অনেক সুবিধা; ফল দূর দেশে প্রেরণ করিতে হইলে ফল অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পাড়িতে হয়, ফলে কোনরূপ একটু সামান্য আঘাত লাগিলেও, তাহা দূর-দেশে প্রেরণ করার উপযোগী থাকে না, একটা ফল পচিতে আরম্ভ করিলে অবশিষ্ট সমস্ত ফলই প্রায় নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। ফল

পশু-এক প্রকার উদ্ভিদাণু (Bacteria or Fungus) কার্য, এই উদ্ভিদাণু সর্বত্রই বর্তমান, ইহা সর্বত্রই বাতালে ভাগমান অবস্থায় আছে ; ইহারা ইহাদের সুবিধা মত আহার ও স্থান পাইলেই সে স্থানে, সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে ; ইহারা কৈব পদার্থের উপর জীবনধারণ করিয়া থাকে। ফলে কোন প্রকারের অস্বাস্থ্য লাগিলে সে স্থান নষ্ট হইয়া পড়ায় উহাদের আধিপত্য বিস্তারের সুবিধা হয়। বাতালের দ্বারা নীত হইয়া, উহারা তখন ঐ স্থানে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায় ; একবার একটা ফলে প্রবেশ করিতে পারিলেই সেই ফল হইতে অল্প ফলে অতি সহজেই প্রবেশিত হইয়া থাকে।

বৃক্ষ ছোট হইলে ফলের পোকা নিসারণের পক্ষেও অনেক সুবিধা। বৃহৎ বৃক্ষ হইতে পোকা দ্বারা বিশেষ ব্যয় ও আশঙ্কা সাধা। ফলের গাছ বড় হইলে পোকাও সহজে বৃদ্ধি পায় কারণ ইহারা লুকাইবার যথেষ্ট স্থান পায়। পিচকানী বা গম্পবোগে কোন প্রকার বিবাক্ত স্নানায়নিক আরক সিকনের দ্বারা গাছের ফলের পোকা নষ্ট করা হয়। বৃক্ষ বড় হইলে ঐযথ সিকনেরও অসুবিধা। এই সমস্ত বিবেচনা করিছাই ফলের গাছ এমনভাবে বাড়িতে দেখা হয় যে, বাহ্যতে অন্ততঃ তাহার আর্দ্র ফল হস্তের সাহায্যে,—এক চতুর্থাংশ কোন উচ্চস্থানে গাড়াইয়া,—এবং অপর চতুর্থাংশ নইএর সাহায্যে পাড়া যায়। এ এসক্রে গাছ ছাঁটা সম্বন্ধে এটাই বলাই যে আমি নিরুত হইলাম ; কারণ বিবাক্ত একটা বিশেষ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ; অল্প পরিদর্শ

প্রবেশে তাহার স্থানগতগুণ এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদেশীয় ছাত্র দেখিতে পাই ; তাহাদের সঙ্গে একত্র আমরা অধ্যয়ন করিতেছি ; কিন্তু ভারতীয় ছাত্রেরা অত্যন্ত বিনোদিত ছাত্র অপেক্ষা ভাল ইংরেজী জানে বলিয়া এখানে তাহাদের বিলম্বন খ্যাতি আছে। অপর দেশীয় ছাত্রগণ যদিও ইংরেজি তেমন ভাল জানেন না ; কিন্তু তথাপি ইহারা সকলেই প্রায় ভারতীয় ছাত্রাপেক্ষা অধিক শিক্ষিত। ইহাদের মধ্যে অনেকের উচ্চ বিদ্যালয় (high school) হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আসে ; কিন্তু High School Chemistry Physics Botany প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দেশীয় ডিগ্রীধারী ছাত্র অপেক্ষাও ইহাদের প্রকৃষ্টতর জ্ঞান থাকে ; ইহারা ল্যাবরেটরির কার্য শিক্ষকের বিনা সাহায্যেই করিতে পারে ; আমরা কিন্তু পরীক্ষা দিলেই কোন প্রকারের ব্যয় প্রস্তুত করিতে হইলে অতি পদেই শিক্ষককে নিরস্ত করিয়া তুলি।

আপান ও আমেরিকার ভারতীয় ছাত্রেরা অনেকেরই আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহারা আপনাদের সম্বন্ধে দ্বারা ইচ্ছা লিখিয়া দেশের পত্রিকা দ্বিত্তে প্রকাশার্থ পাঠান। লিখিয়া পাঠান যে, তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং এত নম্বর পাইয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সকল উক্তি একেবারে ভিত্তিহীন ; কারণ এখানে পরীক্ষার কোন শ্রেণী বিভাগ নাই ; শুধুই প্রথম বিভাগ আছে। এখানে অনেক ছাত্রই পুরা নম্বর

পাইয়া থাকে ; কোন বিষয়ে পাশ করিতে
হইলে শত করা আশি (৮০) নম্বর
পাইতেই হইবে। এখানে এমন ভাবে
শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে কোন মেথাবী ছাত্র



একজন বাগানী হার ।

একটু চেষ্টা করিলেই শত করা ৮০ নম্বর
পাইতে পারে।

“দান ভাঙ্গিতে শিবের গীত”! আবার
কখন লিখিবার সুবিধা হইবে তাহা জানি না,
তাই কথাটার উল্লেখ করিলাম।

কার্য্য স্থানে কিরূপ ছিলার ও কেমন

আমোদ প্রমোদ হইত, সে বিষয়েও একটু
আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। পূর্বেই
আমাদের বিছানা পর ও বাগদানের বিষয়
গিথিয়াছি। উক্ত প্রকারে তাড়তে থকের
বিছানার শুটে কোন রূপ কষ্টই হইত না ;
পরক বারতনে একত্রে বেদ্ গয়ে ও নানা-
প্রকারের আমোদ প্রমোদে সময় কাটিত ;
দিনের বেলায় আমাদের তাড়ুর সঙ্গে
কোন সম্পর্কই থাকিত না, প্রাতে সাড়ে
ছয়টার সময় কার্ঘ্যে চলিয়া বাইতাম, এবং
বিকাল ছয়টা পর্য্যন্ত কার্ঘ্য করিতে
হইত।

প্রত্যহ কোর সাড়ে পাঁচটার নিদ্রা
ভঙ্গের ঘণ্টা পড়িত, সেই ঘণ্টার সঙ্গেই
সকলকে উঠিতে হইত ; নোনে ছয়টার প্রাত-
ভোজন। বিনি তখন উপস্থিত হইতে না
পারিতেন তাঁর ভাগ্যে প্রাতঃরুটা দেবিনকার
মত বন্ধ। প্রথমটা আমাদের আহােরের বড়
কষ্ট হইয়াছিল, কারণ পাঁচকের বন্দোবস্ত
ভাল ছিল না, রাত্রা যেমন বিবাদ তেমনই
অপরিহার। ঐ প্রকার আহােরের লজ্জা
আমাদিগের মধ্যে অনেকেই অস্বস্তি হইয়া
পড়িয়াছিলেন এবং সকলেই আমরা কার্ঘ্য
ত্যাগ করিব বলিয়া হির করিয়াছিলাম। কিন্তু
সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগকে কোম্পানির অপর
ছাউনিতে বদলি করিয়া দিল, সেখানে
আহােরের বন্দোবস্ত ভাল ছিল ; এক ক্লদক
পরিবার আমাদের আহাের প্রস্তুত করিতেন ;
দ্বিতীয় পরিবার পরিচ্ছন্ন ভাবে আহাের প্রস্তুত
হইত, এখানে আমরা বেশ সুখে ছিলাম।
আহােরের বিষয় বেশি কিছু বলিবার পরকায়
নাই, অনেক সময়ই হিম্মতলাহিনিসিদ্ধ

আহাৰ্য্য গ্রহণ কৰিতে হইত। বাগৰা ও থাকা সত্বেও বেশই হুৰিখা হইয়া গেল, কিন্তু ঘানের অহুৰিখা ঘুচিল না। ঘান কৰিব্যৱস্থা লক্ষ ৮ মাইল পথ চলিয়া সহরে যাইতে হইত, অন্ততঃ সপ্তাহে একদিনও ত ঘান করা আৰোজন! সাধাৰণতঃ এদেশীয় লোক ভাহি কৰিয়া থাকে। জলাভাবে আমাদেৱ ঘানের বাধ্যত হইত তাহা নহে। মাঠে জল পেলনের (Irrigation) লক্ষ এখানে সৰ্ব্ব স্থানেই জলের কল বৰ্ত্তমান; কিন্তু গা খুদিয়া কলের নীচে বসিয়া ঘান করা দেশের

নীতি ও আইন বিৰুদ্ধ। অথচ মজা এই, ঘানাগারে বা নদীতে কিংবা স্বর্ণাৰ সৰ্কে একত্ৰ উলঙ্গ অবস্থায় ঘান করা দেখেই নহে, কলেজে ব্যাথাম মন্দিরে কলের জলের স্বর্ণাৰ (shower bath) নীচে সৰ্কে একত্ৰ উলঙ্গ অবস্থায় ঘান কৰিয়া থাকে। কিন্তু মেয়েদের সৰ্কে অঙ্গৰূপ ব্যবস্থা। এতোক মেয়ের লক্ষ পুত্ৰ ঘানাগার আছে, মেয়েরা কেহই ছেলেদের মত এক সঙ্গে ঘান করে না।

আমরা কলেজের ছাত্র—সেজ্ঞ আমাদেৱ



বাথানে কেব কেব ডাউটইচ পাইতেছেন, কেব বা জলের মালা হইতে জল খুদিয়া জল পান কৰিতেছেন।

একটু অহঙ্কারও আছে; আমাদেৱ উপগ্রহ কৰ্ম্মচাৰিগণ আমাদিগকে একটু ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমাদেৱ ঘানের লক্ষ কোন একটা হুৰিখা কৰিতেই হইবে; চিন্তা কৰিয়া, আমরা একটা কলের সঙ্গে একটা লম্বা ধ্বাংয়ের নল সংযুক্ত কৰিয়া একটু উচ্চ খুঁটিৰ সঙ্গে অপর ভাগ সংযুক্ত কৰিয়া তৎসঙ্গে একটু কেরোসিন তৈলের টিনেৰ এক পাৰ্শ্বে চাপুড়িৰ জ্বাৰ ছিঁত কৰিয়া

একটি 'সাইয়াৰ বাণ' প্রস্তুত কৰিলাম। এ দেশে আলিয়া অৰ্থি ঠাণ্ডা জলে লক্ষ ঘান কৰি নাই, আর এখানে ঠাণ্ডা জলে ঘান করাটা যে বড় উপভোগ্য তাহাও নহে। এ স্থানে দিনে ঘান করা হুৰিখাজনক নহে ও আমাদেৱও সময় নাই, তাই এতাহ রাত্রে ঘান কৰিলাম।

প্রথম প্রথম কাল কৰিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম; দুই তিন সপ্তাহ কাল

করিবার পর আর তেমন ক্রান্তি বোধ হইত না ; ভালোই লাগিত । নানাবিধ আমোদ এমোদেরও অভাব ছিল না, অপূর্ণাঙ্গ ফল যত ইচ্ছা আহাৰ্য্য করিতাম, কেবল যে এদেশীয় পিচ আপেল প্রভৃতি ফল তাহাই, নহে যথেষ্ট পরিমাণে তরমুজাদিও খাইতাম ; এ সমস্ত ফল এত অল্পদামেই যে ইহারা বিক্রয় করিয়া উন্নিতে পারিতেছে না, গাছেই আর পাড়তেছে । আম্র ফলের ত অভাবই নাই যত ইচ্ছা খাইতাম !



কাম করিতে করিতে তৃষ্ণার হওয়াতে তরমুজ ভক্ষণ ।

প্রথমে আমরা বৃক্ষ ছেদনের কার্য্য করিতাম । যখন গাছ ছাঁটার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অর্থাৎ যে সময়ের পরে গাছ ছাঁটিলে যত্নলব্ধ অপেক্ষা ক্ষয়লাই সম্ভাবনা,—তখন আমাদের মধ্যে অনেকই কার্য্যান্তরে চলিয়া

গেলেন ; যে কৰজন আমরা অবশিষ্ট ছিলাম, তাহাদিগকে পরিদর্শনের (Inspector) কার্য্য করিতে হইত । এ কার্য্যে আমরা প্রত্যেকে একটি করিয়া বোড়া পাইয়াছিলাম, বোড়ার চড়িয়া তাহাদিগকে বৃক্ষাদি পরিদর্শন করিতে হইত । কোন গাছে, কোন অনিষ্টকর শোকা আছে কি না, কোন খারাম, পোড়ার লক্ষণ দেখা যায় কিনা ইত্যাদি । এতাহ কার্য্যান্তরে তাহাদিগকে পরিদর্শনের রিপোর্ট দিতে হইত । বোড়ার চড়া অত্যন্ত ছিল না তত্পরি তোর লাড়ু ছয়টা হইতে বিকাল ছটা পর্য্যন্ত বোড়ার উপর থাকিতে হইত তাই প্রথম সপ্তাহে শরীরে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছিল । ক্রমশ তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া আসিলাম ।

এই পত্র পড়িয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন আমি এখানে কলোজে উদ্ভিদবিজ্ঞা এবং কৃষি-বিজ্ঞা (Horticulture এবং Agriculture) শিখিতেছি, তত্পরি যথাসম্ভব মাঠে যাইয়া কৃষকদের সঙ্গেও কার্য্য করিতেছি । আমার ইচ্ছা দেশে যাইয়া কোন প্রকারের চাকুরির চেষ্টা না করিয়া, নিজেই কিছু জমী সংগ্রহ করিয়া, কার্য্য করিব । কৃষকার্য্য হইলে উন্নত শ্রেণীতে কৃষিকার্য্য করিতে অনেকই অগ্রসর হইবেন । আমি না দেশে জমী পাইব কি না, শুনিয়াছি, এখনো দেশে অনেক পতিত জমী আছে, যদি আমাকে কেহ জমী সংগ্রহ বিষয়ে সাহায্য করেন, তাহার নিকট চির বাধিত হইব ।

ঐনিদ্রপমচন্দ্র শুভ ।

যোগাযোগ ।

একটি ভক্তবান্ধু তুলিনাম

বিশ্বনাথ বোলে যেথা বিহারে

সেইখানে যোগ ভোমার সাথে আমারে ।

তুলিনা অবধি মন অঙ্গুলস্থান করিতে লাগিল সে যোগটি কোথায় ? পূজিয়া পাইলাম তাহা কর্ণে । সংসঙ্গ সভা সমিতি পরিষদ বা যে কোন প্রকার সমুদ্ভূতান হোঙ্ক না কেন তাহাই কর্ণযোগে পরম্পরের সহিত এবং বিশ্বের সহিত সঙ্গ । আজ আমরা যে কর্তী নাতী এই সভাগমনজন্য সংসঙ্গজন্য কর্ণযোগে এখানে মিলিত হইয়াছি কোন্ জাতির কস্তা আমরা ? কোন্ গৃহের ভগ্নী ? কোন্ মহাদেশের পুত্রী ? হিন্দুর কস্তা আমরা, ভারতের পুত্রী, কলিকাতা নগরীর লক্ষ লক্ষ অজানিত, অদৃষ্ট, অজ্ঞাতনামধেয় তাইতমী-মিথের ভটী কত ভগ্নী আমরা । একটি সমুদ্রে প্রবেশিত হইয়া পরম্পরের কাছাকাছি আনিয়াছি, পরম্পরে সংযুক্ত হইয়াছি । কিন্তু মনে রাখা উচিত—এই বিপুল ভারত পরিবারের একমুঠিতরা কস্তা আমরা । আমাদের দ্বার কোটি কোটি কস্তা ভারতের বক্ষে রহিয়াছেন । হরত আরও কোথাও কোথাও বা এমনি এক একটি শুষ্ক কখন কখন বাধিয়া উঠিয়াছে । যে তাব আমাদের প্রাণে আঘাত করে নাই, হরত সে তাবে অঙ্গপ্রাণিত হইয়া আর একটি ওষা-সমষ্টি কোথাও স্বাধীনভাবে সংযুক্ত হইয়াছেন । যে কাল আমাদের সাধ্যাতীত সে কালের বোঝা হরত আর কোন পরীতে আর কোন ভারত কস্তার দিলেদের ক্কে

বহন করিতেছেন । জানিতে কৌতূহল হয় না কি আপনারেই মত ভারতের দেহেরা আর কোথায় কি করিতেছেন ? পরিবারের যজ্ঞবাণীর ন্যায়ত পোলাওটার তার আজ আপনার উপর, কিন্তু ভাতভাগটার তার কোন্ বহিনদের উপর, ভাতারের চাবি কাহার হাতে, পাত সাগাইতেছেন কস্তা—এসব জানিতে মন চায় না কি ? সাধ ত বার আমিই সবটা কবি, কিন্তু সাধো বধন ফুলার না তখন আমিই বেন দেহের দ্বারা প্রীতির দ্বারা বিকৃত হইয়া অজ্ঞে প্রণারিত হইয়া পড়ি । যে কালটা আমি পাশিলাম না যে যদি আর কেহ করেন তবে সে ত প্রকারান্তরে আমরাই করা হইল—কারণ করিলেন যিনি তিনি ভগ্নী ত আমরাই । দেহজন্ত উদাম আগ্রহযুক্ত হইয়া জানিবার উৎসুক রাখা চাই আমাদেরই গৃহে, আমাদেরই দেশে, আমাদেরই ক্ষেত্রে আর আর ভগ্নীরা কি কি করিতেছেন । ভারত-স্রী-মহামণ্ডল নামে যে মহাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য তাহাই । আপনার পরম্পরের কাজের সন্ধান পরম্পরের কাছে পৌছাইয়া দিবে ।

কত পর্ত্ত, কত প্রাণত, কত দেশ অতিক্রম করিয়া কত মদী সমুদ্রের অতিথুখে ছুটিয়া আনিতেছে পরম্পরের সহিত মিলিত হইবে বলিগা । সমুদ্রের মহাবক্ষ সকলের মিলনের স্থান । গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্মদা, কাবেরী, তাপ্তী সুকণ্ঠেই আপনাপন বৈচিত্র্য-

মর জীবনকাহিনী দিগা সমুদ্রের কম্বোল-
সকীত রচনা করিতেছে। রংগরাগিনীর
অভিনব মুর্ছনার মধ্যে ‘লক্ষ গঙ্গা পথন’
এই লাভটা হরেরই লীলা ছুটিয়া উঠে।
কিছু গান যদি না থাকিত কোঁদার এই
হর কটি মিলিত হইত? মহার্ণব যদি
না থাকিত কোঁদার প্রাচী ও স্রোতী ধারা
সকল সংযুক্ত হইত? আপনাদের সচিত
অপরের সেই যোগাযোগাধনের জন্ম
শ্রী-মহামণ্ডল স্ফুটিল। যুক্ত হইবেন কি?
পরম্পরের সহিত পরিচয় ও পরম্পরের
সহিত মহাহুত্বের চর্চ্চা করিবেন কি?
ইহার পূর্বা এইঃ প্রথমতঃ শ্রী-মহামণ্ডলের
সম্পাদিকাকে নাম ও ঠিকানা পাঠাইয়া
জানাইতে হইবে যে আপনি সংযুক্ত হইতে
ইচ্ছুক। যদি কোন সমিতি হয় তবে
সমিতি নিলের নাম, অভিষেক উদ্দেশ্য ও
নিম্নমাধলীর একটি বিবরণী মহামণ্ডলের
নিকট প্রেরণ করিবে। তারপরে য য
কার্যের মাসিক বামাসিক বা বার্ষিক রিপোর্ট
মহামণ্ডলের নিকট প্রেরণ করিতে থাকিবে।
বৎসরান্তে বহু সমিতির বা অস্থানীয়ের রিপোর্ট
মহামণ্ডলের নিকট একত্রিত হইবে। যখন
মহামণ্ডলের বাৎসরিক পরিবর্তে ভারত-
মহাসংঘের সের্ববিষেণ হইতে মহিলাগণ
সমবেত হইবেন, তখন তিন সমিতির
প্রতিনিধিগণ একত্র হইবেন, তখন উপস্থিত
সকলের সম্মুখে ভারতের জাগরণ-পরিচালিত
সদস্য সমিতি বা অস্থানীয়ের বিবরণী
একে একে গঠিত হইবে। যেন সকলে
পরম্পরের চেহী, কৃতকার্যতা, বীণা, উত্তম,
বিদ্য ও অভিজ্ঞতার বর্ণনার উৎসাহিত,

শিক্ষাপ্রাপ্ত ও মহাহুত্বের দ্বারা পুষ্টিত হইয়া
য য যুগে ফিরিয়া গিয়া দ্বিত্যবলে আপনাপন
কার্যে লভী হইতে পারেন। যেন বিভিন্ন
কর্ণের মধ্য দিগাও আমরা পরম্পরের সহিত
যোগের গ্রহি লাগিতে পারি। কর্ণের দ্বারা
ঐশ্বরের সহিত আমাদের যোগসাধন করিতে
হইবে। তাহার উপাদান যানেই তাঁহার
শ্রমকর্মের সাধনা। ধ্যান, ধীর্ঘা, তপস্বী,
পরমেশ্বর, পরোপকার এ সকলই কর্ম।
এই কর্ণের দ্বারা দিগাও তাঁহার নিকট
পৌছিতে হইবে—যের পপ নাট।
ছোট ছোট কর্ণের দ্বারা পরম্পরের নিকট
পৌছিতে হইবে। আবার আমার কর্ম,
তোমার কর্ম এক জায়গায় সংযুক্ত করিয়া
সকলের সহিত যোগসাধন করিতে হইবে।
সেই তোমার আমার এর এর তার সবাই
কর্ণের সংযোগক শ্রী-মহামণ্ডল।

সমুদ্র যেমন বহনধীর মিলনে গঠিত হইয়া
তদু মিলনক্ষেত্রেই পর্যাপ্তিত হয় না,—তাঁরা
এক মহাসেপকে আর এক মহাসেপের সহিত
সংযুক্ত করিবার রাজপথ হয়, তাহার বারিবিদ্যু-
সকল স্থায়শি প্রত্যবে আকৃষ্ট হইয়া
সেবাকারে ধরণীতে শ্রুতলতা ও শস্ত্রশালিতা
বর্ণন করে, তাহার অতলগর্ভ মণিমাণিকা ও
অসংখ্য প্রাণীর আবাসস্থান হয়—তেমনি
ভারত-শ্রী মহামণ্ডল শুধুই বহনধীর মিলন
ক্ষেত্র মাত্র হইয়া আপনাদের জন্ম চরিতার্থ
মনে করিবে না। মহার্ণবের দ্বারা তাঁরাও
ভারতের এক প্রান্তকে আর এক প্রান্তের
সহিত সংযুক্ত করিবে, বহুপ্রাণীকে বকে
ধারণ করিবে, আভিধর্ম সমুদায় নির্মিলেবে
সমগ্র ভারত মহিলা এই মহাসমিতির সভ্য

হইবেন ! মহামণ্ডল শব্দেই বুঝিতে পারিতেছেন সমস্ত ভারতবর্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া ইহা একটি মহাসভা । ইহার চত্ৰাভ্যন্তরে সকলেই মত্ত আলম বিতীর্ণ আছে । বাঙ্গালিনী, হিন্দুস্থানী, মালেকোবাসিনী, মাদ্রাসিনী, মত্ৰাজিনী পঞ্জাবিনী সকলেই ইহাতে নিমগ্নিত । আবার যুরোপ, আমেরিকা, ইরান, আফানি, বা আর যে কোন দেশের যে কোন স্ত্রী ভারতবর্ষকে ভাগস্বাগেন, ভারতের যেরূপের উন্নতি চাহেন, তাহাদের সহিত সখিত্ব স্থাপন করিতে চাহেন, তাহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে চাহেন তিনিই ইহার সত্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন । সকিত লোকবল ও অর্থবলের দ্বারা মহামণ্ডল ভারতের অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে শিক্ষাবারি বর্ষণ করিবে, নিঃস্ব পুত্রনারীগণের নির্জাহের উপায় করিবে, আর্ন্ত ভারতনারীর চিকিৎসার পথ সুগম করিবে ও আদেশিক সাহিত্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিবে । ইহার মধ্যে যে কোন একটি কার্য্যের ভার যে কোন ক্ষুদ্র সমিতি বহু গ্রহণ করিয়াও মহামণ্ডলের সহিত সঙ্গত্ববৃত্ত হইতে পারেন । মহামণ্ডল সাধারণতঃ সনিত্তগুলিকে অর্থ সাহায্য বা লোক সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে ।

যেই ইং উইয়েন্স, ক্রী-টান এসোসিয়েশন কিনা করিতেছেন । প্রথমে একটি স্বচ মহিলার মনে একটি ভাবের উদ্রেক হয় । তাহার দ্বারা চালিত হইয়া তিনি আরও কয়েকটি মহিলাকে তাঁরই ভাবে অঙ্গপ্রাণিত করেন । সেই মহিলাদের পরস্পরের সংযোগে দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে চালক শক্তি আর একটি পুষ্টতা প্রাপ্ত করিল, তাঁরা ভটল্যাভ, ইংলণ্ড,

ইথেরোপ, আমেরিকা, এদিয়া সকল দেশের মহিলাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন, এখন সর্ব্বদেশের মহিলাদের মধ্যে তাঁহারা কত শুভকর কার্য্যের অহুস্তান করিতেছেন ।

এত কার্য্য করিবার বল ইংরাজমহিলাকে আসে, আমাদের মধ্যে আসে না কেন ? শুধু যোগাযোগের, যেমামিতির অভাবে । ভারতীয় স্ত্রী-মহামণ্ডল সেই যোগাযোগ সাধনের একটি যন্ত্রবর্ত্তন ।

এই যন্ত্রণে আমরা অন্তঃপুর শিক্ষার রেলগাড়ী চালাইবার উচ্চাভিলাষ পোষণ করিব । নিঃস্বপুত্রনারীগণের নির্জাহের একটা উপায় পুলিশ দেওয়ার লক্ষ্য রাখিব । আর্ন্ত নারীগণের চিকিৎসার পথ সুগম করিবা দেওয়ার অভিপ্রায় ধরিবা । আদেশিক সাহিত্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিব ।

যতদিন যুরোপের সহিত এদিয়ার সংযোগ হইরাছে আর ততদিন হইতেই বিভিন্ন জাতীয় মিসনরী সম্প্রদায় ভারতের অন্তঃপুর শিক্ষার ভার স্বয়ং দ্বকে বহন করিতেছেন । ব্রট, ইংলিশ, আইরিশ, ফরাসী, রুশিয়ান, পর্তুগীজ, ডানিশ, সুইজ, জার্মান, আমেরিকান কেহই পশ্চাৎপদ থাকেন নাই । তাহাদের চেষ্টার ফলে আমাদের মধ্যে এখন অনেকই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইরাছি । তবে এখনও কি সময় আসে নাই যে আমাদের নিজেদের শিক্ষার বোঝা আমরা নিজেরা বহন করি ? বিশেষতঃ মিসনরীদের অমর উৎসাহ সবেও বর্ণবিপ্লবের ভয়ে ভারতের অধিকাংশ পরিবারই তাহাদের প্রতি বিশ্বীর্ণ, তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে অসম্মত । “আমাদের সেই সকল গৃহে শিক্ষার দীপ হতে আমরা নিজেরাই কি এখন দাইব

না? আর কতদিন—আর কতদিন এমন নিকৃষ্টে নিষ্কেষ্টভাবে বসিরা রহিবে? সাত সত্তর উন্নয়ন নবী পার হইয়া আসিরা বিবেচিনীরা এত করিতেছেন—আমরা এখনও কি অপরের কার্যকলাপের প্রশংসার শুধু হতভম্ব হইরা বসিরা থাকিব? তাঁহাদের প্রশংসাযোগ্য কণ্ঠশীলতার অহুকরণ করিব না, তাঁহাদের কার্যকলাপের নিজেদের মধ্যে লক্ষ্য করিব না? দীর্ঘ রমণীর এক একটির জীবন চরিত্র অহুস্কান করিয়া দেখ কি স্বর্ণ-তাগ, কি কৃষ্ণ-স্বাক্ষর, কি পূত্ৰ প্রতিজ্ঞা, কি অক্লান্ত-মহাবলার—কি মনের সাধন কিংবা শরীর পতন এই পনের উৎপাদনে তাহা পূর্ণ। এসব শুণ কি আমাদের মধ্যে নাই? এসব কি আমরা পারি না? কেন পারিব না? তাঁহাদের মত ক্রতু সাধন কর, তপস্যা কর, প্রতিজ্ঞা লও, ত্রুতনিয়ম রাখ এবং পরম্পরের সহিত যোগ রক্ষা কর।

ভারত-স্ত্রী-মহামত্তণ এক পাড়ার বের-বের সহিত আর এক পাড়ার মেতেদের সংযোগ করিয়া দিবে, এক সহরের স্ত্রীদের সহিত আর এক সহরের স্ত্রীগণকে সংযুক্ত করিবে,—এক প্রদেশের মহিলাদের সহিত আর এক প্রদেশের মহিলাগণের সঙ্গিন করিরা দিবে এবং ভারতমহাভারতের নারীগণের সহিত অক্লান্ত মহাবেগের নারীগণের আধ্যাত্মিক মিলন সংঘটন করিবে। শুনিরা স্ত্রী হইবেন ইংলণ্ড শহর হইতে একটি প্রবাসিনী হিন্দু রমণীর চিঠি আসিরাছে, তিনি ভারত-স্ত্রী-মহামত্তণের সভা হইতে অভিনাদিনী এবং ইংলণ্ডে তাঁহার ইংরেজ স্বর্ণপুণ্ডকে লইয়া ইহার একটি শাখা স্থাপনের অহুমতি প্রাপিনী।

শিখাল নগরীর পাড়ার পাড়ার শাখা স্থাপন করিরা অগ্র:পুরসিকা ও নিঃস্বনা-গণের নির্বাহের জন্ত ভাণ্ডার খোলার বন্দোবস্ত আপনারা করিতে পারেন। আপনারদের মধ্যে যে কেহ কখন মকদ্দমে গাইবেন সেখানেই মহিলাদের একত্র করিরা উদ্বেগ বৃদ্ধিরা শাখা স্থাপন করিরা দিরা কার্য চালাইরা আসিতে পারেন। সর্ব্বদা লক্ষ্যটি মনের সামনে ধরিরা রাখিতে হইবে। বস্তুর স্বাভাবিক দেহের নমন প্রকৃতি পরিবারের সকলের দেবার রত থাকিলেও সত্যী স্ত্রীর জনরপট হইতে পতির মূর্তি দেখন একমুহূর্তের জন্তও তিরোহিত হয় না, তেমনি আমাদের সকলের মনে সকল গৃহকাণ্ড, সকল সামাজিক উৎসব আমোদ প্রমোদের মধ্যে এই কর্তব্য-ভাষটি বরাবর ধারণ করিরা রাখিতে হইবে যে আমরা আমাদের তমীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের সপরুষ্ঠান করিতে থাকিব। কষ্টে দিনপাত হয় অথচ কিছু বিজ্ঞা আছে পাড়ার পাড়ার এমন রমণীর অহুস্কান করিরা তাঁহাদের সেই পাড়ার শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত করা হইবে। শিক্ষিতাদের বারংবার দেওয়া হইবে যে বিধির যেটুকু জানা আছে তিনি ততটুকুই নিয়মপূর্ণক অঙ্গদের দান করিবেন।

ইংরেজ মেম্বেরা রিডিং ক্লাব করেন। তাহার মেম্বেরা নিজেদের অনেক সময় এই-রূপ নিয়মে আবদ্ধ করেন যে প্রতিদিন এক ঘণ্টা একটু গভীর বিষয়ক কিছু পাঠ করিবেন—শুধুই নভেল নাটক নহে। যিনি বেধিন নিয়ম ভঙ্গ করেন আপনার বৈমিক লিপিতে তাহা টুকিরা রাখিরা নিয়মভঙ্গের আশঙ্কিত-বক্ষণ সভাকে অর্পণও দেন। মনে কখন

আপনারা মিডি ক্রবের স্থানে টিটিং ক্রব করিয়া তাহার মেঘর হইলেন। এতদ্ব্যতীত ব ব অবসর ও কষ্টবিহীনতার মাহাত্ম্যের প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিপত্ত্যে এক ঘটনা কাহাকেও কিছু শিখাইবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। যদি বৃহৎ পরিবারভুক্ত হন তবে নিয়মিত সময় বৌদ্ধিমের লইয়া বলিলেন। বাঙ্গলা জানেন ত কিছু বাঙ্গলা পড়াইলেন, ইংরাজী জানেন ত ইংরাজী শিখাইলেন, গান বাজনা, সেলাই বা আলিঙ্গন বা যা কিছু জানেন তাহাই অল্পকাল দান করিলেন। যদি বাড়ীতে শিক্ষাপাত্রী না থাকে পাড়াপড়শীর মেয়েদের বলিয়া বাখিবে, তাহাদের অভ্যস্ত করিয়া শিখাইবেন। যদি কাছাকাছি পল্লী না থাকে তবে নিজের গৃহের ষ্টিচাকরের মেয়েকে ডাকিয়া শিক্ষাদান করিবেন। ছোট কথা এই, দানের সংকল্প থাকিলে পাত্রীর অভাব হইবে না। ব্রত পালনের দৈনিক লিপি লিখিতে হইবে। যদি কখন নিরন্তর হয়, ব্রত অগ্নি হয় তবে দৈনিকলিপিতে টুকরা রাখিয়া প্রারম্ভিকরূপ মহাশক্তিকে অর্পণও পাঠাইয়া দিবেন। এই বৈশাখ মাস আসিতেছে। ভারতবর্ষ মরুত সমস্ত ভারতবাসী ১লা বৈশাখ হইতে কত শতবিধ ব্রত গ্রহণ করিবেন। আপনাদের মধ্যে বাহার নবা আলোক প্রাপ্ত তাহারও একবার সকলের সঙ্গে এক মনোগ্রাণ হউন, নতুন বৈশাখে নতুন ব্রত লউন। এই ভারতের মাটিতে আমাদের সকলের শরীরই গঠিত, এই মাটির স্তম্বে যে সংযম-শিক্ষা অন্তের চর্চ্কা করিতেছে আমরা তাহা হইতে নিজেদের বঞ্চিত রাখি কেন? আর পুরাতন খেতালের তরিয়ণ তোমাদের দশটি

ব্রতের মধ্যে দেশকালের প্রয়োজন অনুসারে আর একটি ব্রতের স্থান কম। বিভাগদানও যে একটি পুণ্যকাজ, তাহাও যে নিত্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তাহা সর্বসাধারণকে উপলব্ধি করিও, নিজেরা বিভাগ দানের ব্রত লও, এবং অপরকে লগ্নও। ব্রতের লাভ হইতে স্পর্শে। ইহা বার আত্মোপকার ও পরোপকার দুইই সাধিত হয়। যিনি ব্রত লবের সংঘম ও নিরন্তর বার তাঁর আত্মোন্নতি সাধন হয়, অভ্যস্ত বা পাপের ভাব হইতে তিনি ক্রমে মনুষ্যত্বের ভাবে উঠিতে শেখেন, এবং ব্রতজনিত দানের বার পরের উপকার হয়।

ইহাছাড়া শ্রী-মহামণ্ডল হইতে কাককাণ্ড-কুশলা নারীবিশেষ হাতের কাজ একত্র করিয়া পাড়ার পাড়ার আমরা বিক্রয়ের ভাণ্ডার খুলিয়া দিব। ব্রত তাহাতে কোন ধুঁকিনীর ছেলেটির অলপখাবারেরও উপায় হইবে, ব্রত কাহারও শ্রুতির বস্ত্র ছুটিবে, কাহারও বা স্কুলের মাছিরানাটা আসিবে। আমাদের দেশের মেয়েদের বুক ফাটে ত মুখ ফুটেনা তাই যদি এমন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যায় যে ভাতারিণী ছাড়া আর কেহই অবগত হইবে না যে কে কোন্‌ জিনিষটি পাঠাইলেন তবে অনেকেরই জিনিষদায় পাঠাইয়া নিজেদের নির্জাহের একটা উপায় করিতে উৎসাহিত হইবেন।

কেবল একজনের আন্তরিক চেষ্টার কত হ্রাসাধ্য মহৎ কার্য পৃথিবীতে সংগঠিত হয়—আর, শব্দ ভারতবর্ষের শ্রী-মহামণ্ডলের সমবেত চেষ্টার কি না হইতে পারে?

কর্ণের বন্ধনের ভার এমন কাছের-টান

অথচ দৃঢ় বন্ধন আর কিছু নাই। যেখানে এক কণ্ঠ এক লক্ষ্য সেইখানেই একজনও স্ত্রীতি। জী-মহামণ্ডলের হৃদয়ে বিভিন্ন প্রদেশের নারীগণের পরস্পরের সহিত, কণ্ঠের মধ্য দিয়া আমরা স্ত্রীতির গ্রন্থি বাঁধি। কণ্ঠের পেছু দিরাই ভারতমহিলাগণ পরস্পরের নিকট পৌঁছিতে পারেন—নতুবা হাতা নাই। জী-মহামণ্ডল সেই সংযোগক পেছুবন্ধ।

এই মহামণ্ডলের বল পুঠি করিতে হইবে প্রত্যেকে ইহার মেঘর হইয়া। এ কথা বলি-
বেন না—আমি না-ই বা হইলাম, অনেকেই
ত আছেন, আমি একা না হলে কি বা এসে
গেল ? একজন রাজা তাঁর রাজধানীতে
একটা প্রকাণ্ড খদ খন্দন করাইয়া রাজ্যের
সকল গোরাণাকে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন
আজ রাতারাতিই প্রত্যেকে যেন উছাতে
এক ঘটি মাত্র দুধ ঢালিয়া দিয়া ব্যাধ, পরদিন
প্রভাতে তিনি কীরসমুত্র দেখিতে চান।
হুর্ঘোষদেব রাজা যখন বড় আগ্রহে মন্ত্রীবর্গের
সহিত কীরসমুত্র দেখিতে আসিলেন—দেখি-
লেন কীরসমুত্র কোথায়—সমুদ্রে মহা জলাশয়
বিস্তৃত, দুধের কোন চিহ্ন মাত্র নাই। নিকটস্থ
একজন গোরাণাকে তলব হইল। সে আসি-
লেই বিজ্ঞাসা করিলেন—“তুই যেটা জল
ঢেলে গেছিল, দুধ দিসনি ?” সে ভয়ে কম্প-
মান হইয়া ভাবিল মহারাজা কেমন করিয়া
টের পাইলেন না জানি। ঘাছোক যখন ধরা
পড়িয়াছি স্বীকার করাই ভাল। সে আত্মবাহু
করিয়া বলিল—“মহারাজ অপরাধ যাপ

করোক ! ঠাণ্ডের ছিছ হাঁপার হাঁপারগোলের
গো রুধ ঢেলে যাবেন তাহ মধ্যে দুই গম্বীষ
না হয় এক ঘটি জলই দিছ, তাতে কীর-
সমুত্রের কোনই হানি হবেন না।”

দ্বিতীয় গোপপুত্রকে ডাকিয়া বিজ্ঞাসা
করা গেল সেও ঐ উত্তর দিল। তৃতীয়
গোপনন্দনও সেই কথাই বলিল। একে
একে সকলের কৈফিয়ৎ তলব হইল, সকলেরই
একই উক্তি। প্রত্যেকেই বন্ধনার গুক্তি করি-
রাছিল, প্রত্যেকেই যৌর কর্তব্যের অংশটুকু
পালনে ঐটা করিয়াছিল তাই জলাশয়মাত্র
হইল, যদি প্রত্যেকেই আপনাপন কর্তব্যটুকু
পালন করিত তবে কীরসমুত্র হইত।

যদি শিক্ষিত ভারত স্ত্রী মাঝে আপনাদ
কর্তব্যটুকু পালন করেন, প্রথমতঃ ইছাতে
সম্মিলিত হইয়া, দ্বিতীয়তঃ ইছার উদ্দেশ্য সাধনে
চেষ্টা ও সহায়তা করিয়া তবে ভারত-স্ত্রী-
মহামণ্ডল কীরসমুত্র হইবে, নতুবা জলাশয় দেখা
দিবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেকে এক ঘটি মাত্র
দুধ যোগাইয়া যদি কীরসাগর করিতে পারা
যায় তবে সেটুকু যোগানর কৃষ্ণসাধন কি
আমরা করিব না ? যদি না করি তবে বক্রা
কাকে করা হইবে ? নিজেদেরই। অপর
দেশের নারীদের নহে।

“এ কথা না ভুলে রও

তুমি শুধু তুমি নও

দেশের মাঝারে একজন

দেশের দেশের দানে সমান আপন।”

ঐশ্বর্য্য দেবী।

অকৃতজ্ঞ ।

১

করালাপাড়ার চক্রবর্তীদিগের একাও পরিবার বখন জাতি-ভুলভ মাঘলা-মোকদ্দমার উৎসব বাইতে বসিয়াছিল, সেই সময় দুই শরিক ভাণ্ডারের ও সুরারিমোহন আপনা-দিগের অংশভণি জাতিবর্ণের হস্তে তুলিয়া দিয়া আপোবে মোকদ্দমা মিটাইয়া কান্ট-বাসের জন্ত দেশত্যাগ করিল।

এই মহাহুতবত্তা ও ভ্যাগ-বীকার দেখিয়া গ্রামের গ্রীবীগণ যেমন বিষয়াবিষ্ট হইলেন, উকিলগণ ঠিক সেই পরিমাণে এই উত্তম পরিবারের নির্মুক্তিতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

ভাণ্ডারের নির্ঝিঝিৎ প্রকৃতির লোক,—আদালতে আমলাবর্ণের অত্যধিক অর্থলাভসা দেখিয়া ও উকিলগণের নানাবিধ জেরা ও জুসুমের মধ্যে পড়িয়া গে বেচারী সন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সুরারিমোহন আমোদ লেবণ—আইনের কূট রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে দিশাহারা হইয়া পড়িত,—তাই একাও পরিবারের এই দুইটি শরিক মাঘলা মিটাইয়া, একামালিখের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, কান্টে বলাবমেধের ঘাটের নিকট থালা গইল।

পাশাপাশি দুইটি ছোট বাড়িতে নূতন করিয়া সংসার পাতা হইল। সঠিকগণের কলহের তুহল কোলাহল, আদালতের ক্রত শাসন, উকিলের উৎপীড়ন সব ছাড়িয়া অগষ্ট শান্তিহুধ করিয়া পাইয়া উত্তর পরিবারই বেন নিবাস ফেলিয়া বাটিল। কিন্তু গলাব ঘাটে

বাঘ-সেবন ও মন্দিরে দেবতা-দর্শন করিলে মনে শান্তি মিলিলেও সংসারের অভাব তাহাতে ঘুঞ্চে না। দেশে থাকিতে কেত্রের চাউল, পুষ্করিণীর মৎস্ত ও বাগানের তরীতরকারী যেমন অনায়াসলভ্য ছিল, এখন আর তেমনটি নাই! এখানে চাকুরির অবলম্বন নহিলে অন্ন মেলা দার।

এদিকে চক্রবর্তী বংশে কাহারও নাথের পিছনে বিষবিজ্ঞানরের ছাপ ত কোম কালে ছিলই না, উপরন্তু বিজ্ঞানরের সহিতও বড় একটা সম্পর্ক রাখিবার কখনও প্রয়োজন মনে হয় নাই—কাজেই নানা চেষ্টায় লামাত চাকুরিমাত্র জুটিল।

ভাণ্ডারের আসিয়া ডাকিল, “সুরারি!”

সুরারি বলিল, “দাদা, এ বেণে এসে অজ্ঞায় করেছে, দেখছি। অন্ন খরচে এখানে চলে ভাবতাম, তা এ যে দেখছি সহরের মতই সব হয়ে পড়েছে—”

ভাণ্ডারের বলিল, “কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বল?—দেশের অন্নি ভাটা এমন করে ছেড়ে আসা ভাল হয়নি, মনে হচ্ছে—”

সুরারি বলিল, “ছেড়ে এসেছি বটেই হু পরগা তবুবাধ্যক হাতে তেকেছে—না হলে এ মোকদ্দমার তুমি কি মনে কর কিছু থাকি থাকবে। উকিল পেরাদা মিলে সমস্ত বিষচট্টু,—আর পাড়াগার তার দামই বা কি—থেরে বসবে! দেখো এর পর আর সকলের অবস্থাটা!”

ভাণ্ডারের বলিল, “ছেলেপিলেগুলো যে পেট পুরে খেতে পার না—”

মুন্সারি বলিল, “আপণেটা যে ভুটছে এটাই ভাণা বলে মেনো!”

রোব পড়িয়া আসিলে, ছেলে-ঘেরিয়া যখন প্রাণ ভরিয়া খেলা করিত, তাহাদের লে উল্লাস চীৎকারে তারাপকরের চোখ ছল-ছল করিয়া আসিত। সে ভাবিত, “হা রে অভাগারা—”

২

মনসাখালির অমিদার হরকান্ত চৌধুরী পুত্রশোকে কাতর হইয়া পত্নীকে লইয়া নানা ভীর্ণ দুরিদ্ভা শেষে কান্দিয়াল করিতেছিলেন। গৃহে কিরিবার দিকে তাহার বড় একটা ইচ্ছা ছিল না। বিষয়-কর্মে কতি হইতেছে দেখিয়া কর্মচারীবর্গ ও গুরুদেব তাহাকে দানাতাবে বুসাইলেন, শেষে পাত্রকণা পাড়িয়া বলিলেন, এ অবলংসারে শোক পার নাই এমন লোক বিয়ল, সংসারীর নানা কর্তব্য আছে, কাতর হইলে চলিবে না। এবং গৃহিণীকুমারীর কঠিন দীড়াবণতঃ পুত্রমুখ দর্শনের আশা চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও পোষাপুত্র লইলে বংশলোপের আশঙ্কা নাই ইত্যাদি।

কথাটা হরকান্তের মন লাগিল না— নানা মন্ত্র ও ঔষধ-মাছলির ব্যবস্থা করিয়া যে পুত্র তিনি পাইরাছিলেন, সে ত রহিলই না! বিপুল বিষয় ও প্রাচীন বংশটা হ্রাস করিতে হইলে পোষাপুত্র লওয়া ভিন্ন এখন আর উপায়ই বা কি? কিন্তু তেমন একটি পুত্রই বা মিলে কোথায়?

একজন কর্মচারী অসিয়া বলিল, “দাঁশাখ-ঘেবের কাছে একটি লোক আছেন, নাম তারাপকর চক্রবর্তী, অনেকগুলি ছেলে মেয়ে—

অবস্থা খারাপ—ছোট ছেলেটি দেখতেও বেশ কাটিক, পাঁচ বৎসর মাত্র বয়স—”

৩

বাড়ীর সম্মুখে রোয়াকে বসিয়া তারাপকর তামাকু টানিতেছিল, এমন সময় হরকান্তের দেওয়ান আসিয়া প্রণাম করিল। দেওয়ান আগমনের উদ্দেশ্যে খুসাইয়া দিলে, তারাপকর অনেকগুলি দ্বির-হইয়া বলিয়া রহিল।

দেওয়ান কহিল, “তা হলে মশায়ের ইচ্ছা নাই, বোধ হয়—তবে আসি—মাশ করবেন!” তারাপকরের ঘেন চমক তানিল। সে কহিল, “বজ্রম, আমি আসছি।”

তারাপকর আসিয়া জীর নিকট ব্যাপার খুলিয়া বলিল। তিনি জী বলিল, “পেড়ো কপাল! পেটের ছেলে বিক্রী করব—গলায় দড়ি জোটে না?”

তারাপকর হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল, পরে কহিল, “কিন্তু তুমি বুঝ না, ছেলেটা খেয়ে বাচেবে—ভবিষ্যতে কত বড় সম্পত্তির সে মালিক হবে—সকলের ভাল হবে—”

জী অকুটি করিয়া বলিল, “অমন ভালর মুখে আসুন!”

তারাপকর বলিল, “বলছে এখন পাঁচল টাকা নগদ দেবে—তারপর বছরদিন আমরা বেঁচে থাকবো, ততদিন পনেরো টাকা করে মাগহারা দেবে—”

জী বলিল, “অমন টাকার কাজ নেই, আমার! পেটে স্থান দিছি যখন, একমুঠো খেতেও দিতে পারব—”

জী গৃহকাব্যে চলিয়া গেল। তারাপকর নিশ্চিন্তের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে মহা-

“কি বলছিল, শ্ৰিয় ?”

“কি বলছি ? এই ঘোহিনী—এ কি ছিল—কিছু আৰু—। অগতঃ এ পব আমাৰই প্ৰাণা ! জমিবাৰ হৰকান্ত আমাকে গোহাগুৰ নিতে চেষ্টাছিল—ঘোহিনীকে নয় ! কিছু আমাকে ছেড়ে দাওনি তুমি ! তিব্বতল এই চাপেৰ মথো, দাতিত্ৰোৰ মথো আমাৰ দিন কেটে গেল ! নিজের স্বার্থের জন্ত ছেলের ভাল হতে দাওনি—এই কাল্প ঘোহিনী আমাৰ মনে ধনী হ'বে, আৰু তালপুত্ৰের মত চলকে, আৰু আমি—”

শ্ৰিয়শব্দৰে চোখ দুইটা মেন মলিতেছিল !

মা বলিলেন, “ও কি বলছিল বাবা,—পৰমা নিয়ে ছেলে বিক্ৰী কৰব, এমন মা, আমি তোর ?” মায় চোখে জল আসিল ।

শ্ৰিয় কহিল, “বাবা, আৰু আনৰ দেখাতে হ'বে না ! এমন কাৰা আমি তেৰ দেখেছি । আমাৰ জীবনটাকে তুমি একেবাৰে ভেঙে চূৰে পেছ—মনে কেরান। ভগবান

কখনও এ অপৰাধ কৰা কৰবেন—আমি চপলাম—তোমাৰ সংসাৰ নিয়ে তুমি থাকো—আমি একবার জগতে ভাগ্য পৰীক্ষা কৰে দেখতে চাই—”

মা কুপাটা ভাল বুজিলেন না, চোখেৰ জল মুছিয়া কহিলেন, “কোথাৰ থাকিছ ?—খিৰেটাৰে ?”

“চুণোৰ”,—বলিয়া চলিয়া গেল !

মাতাৰ জ্বৰে বাখাটা শেলের মত বিধিল ! হা হে অকৃতজ্ঞ পুত্ৰ, মাতাৰ দুঃখ তুই কি বুজিবি ! স্বার্থের জন্ত তোর ভাল হইতে দিলাম না ! বেশ, তাই যদি বুজিয়া থাকিস—ত বলিবার কিছু নাই, আৰু—শুধু ভগবান তোকে কৰ্মা কৰুন !

শ্ৰিয়শব্দৰ বশন গলি পাৰ হইয়া গলে পড়িল, তখন সন্মুখ দুলি উড়াইয়া বোড় থাকিয়া ঘোহিনীৰ ভুড়ি দুটিৰ অন্তৰালে মিলাইয়া গেল !

শ্ৰীমদৌলমোহন মুখোপাধ্যায় ।

মাজলিক ।

অতীব তুচ্ছ হই আমি যদি
হে জননি, তাহে নাহি কৌন কতি !—
তুমি যদি শুধু মোরে লহ তুলি'
পদ মূল হ'তে ; কখনো বা তুলি',
বাবেকের তরে মম শিরোপরে
রাগিয়া তোমাৰ কলাপ-কমে,
সেহ-লকৰণ রাজীব নয়ন
মেলি' মোৰ পানে, অন্তৰ বচন

কহ দয়াময়ি ;—তখনি পুলক
আগিণে জীবনে ; তুলি' হ'ব শোক
তখনি বার্থ জীবনে আমাৰ
কীৰ্ত্তি-ভাৱে মত স্বকাৰ
উঠিবে ।

ভাষ্যতি, সে শুভ লগনে
হ'ব ত্ৰিততী তোমাৰি চপে !

শ্ৰীদেবকুমার ঝাৰচৌধুৰী ।

জাপানী আকৃতি ও প্রকৃতি ।

অতি প্রাচীনকালে জাপানে আইহু নামক এক জাতীয় লোকের বাস ছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান জাপানীদের পূর্বপুরুষগণ উহাদিগকে পরাজিত করিয়া বসতি বিস্তার করিতে থাকে। আইহু জাতি ভারতীয় পরাজিত অনাথের দ্বারা অল্পে অল্পে লয়। অন্ত্যাবদি হোকাইবো দ্বীপের স্থানে স্থানে আইহুজাতির দুই একটি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, তবে শিকার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী ও আইহু জাতির ভেদাভেদ লোপ পাইতে বসিয়াছে। পরস্পর বিবাহাদি হইতেছে; আইহুদের ভিতর নবাতাব প্রবেশ করিয়া উহাদিগকেও সমস্ত জাপানীর দ্বারা করিয়া তুলিয়াছে। আইহু পুরুষদের চেহারা অনেকটা প্রাচীন আৰ্য্য হিন্দু মুনিব্রহ্মদের দ্বারা বলিয়া মনে হয়। নাক, চোক, এবং কেশ অনেকটা ককেশিয়ান জাতির দ্বারা, নিম্ন গোপ দাড়ি আছে। বেশ ছোটগুঠি অথচ স্বকীয় নহে। কয়েক বংশব পূর্বে সংবাদ পত্রে কাম্বাটকার শিবদাম্বির বাহির হওয়ার খবর পাইয়াছিলাম। কোন কালে যে প্রস্তুত মহাদাগরের উপকূলস্থ জাপান পৰ্য্যন্ত হিন্দুগণ অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে আর বিতর্ক কি।

আইহু মেয়েরা আজকাল জাপানী মেয়েদের মতনই প্রায় হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের চাল চলন, হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই জাপানী মেয়েদের দ্বারা। আত্মদের বেশের উড়িয়া এবং উত্তর পশ্চিম আদেশের মেয়েরা এবং ইয়োয়োপের নাবিক সন্তানদের মধ্যে

অনেকে বেশের সতীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উলকির ছাপ ধারণ করে, আইহু-মেয়েরা ভেতনি তাহাদের স্থান কালে রং লাগাইয়া বারী গোপের বেশা করিয়া লয়। নবা মেয়েরা ভেতন করে না, জাপানী মেয়েদের দ্বারা তাহারা উহা আজকাল অলভ্যতা বলিয়াই মনে করে।



আইহু স্ত্রী পুরুষ ।

জাপানীরা ছোটকার, স্বকীয়তা। আদরা এক প্রকৃতিতে ২২টি ছাত্র ছিল। আদি উচ্চতার দ্বিতীয় স্থান দখল করিলেও এখন এবং শক্তিতে এক অনেক দূর উপরে ছিল। উহাদের চক্কের মণি এবং কেশ ভারতবাসীর

ভারত কালো কিন্তু অধিকাংশেরই চক্ষু অতি ছোট। এমন কি হাসিবার সময় কাঁধেরও কাঁধেরও চক্ষু দুইটি একেবারেই খুলিয়া গিয়া কেবল লোমমায়ে নজরে পড়ে। আমাদের যেমন নাক দুটি ঢকের নীমানা নির্দেশ করিয়া দেয় উহাদের তেমন নহে। উহাদের নাক চেপটা বা খেলা, অনেকেরই যেন সমস্তল ক্ষেত্রে দুটি চক্ষু; কেবল নালিকারদ্বারা আরগা টুকু কথকিং উঠে। হাতগুলি অনেকেরই অসমান এবং কিংব সুন্দর সংযোগে আকার প্রাপ্ত। অধিকাংশেরই গোঁপ বাড়ি নাই। শরীরের রং বেশ পরিষ্কার; বিলাতী সাহেবদের রং লাগাত আর উহাদের খেতাব। ভারত-বাসীকে দেখিয়া উহারা হাসি সঘরণ করিতে পারে না; অনেক সময় রাস্তা বাটে নিগ্রো-বলিয়া ডাকে। আমাদের চক্ষু বড়, নাক উঁচু তাই অনেকের নিকট চক্ষু এবং নাক সযত্নে বিজ্ঞান সূচক সম্ভাও ভনিত্তে পাইরাছি। উহাদের ভিতর বাহ্যের চক্ষু এবং নালিকা আর্থের জার তাহার দেখিতে বেশ সুন্দর। কিন্তু এমন চেহারা পতকরা একটিও মিলে না। মিঃ ব্রিটাই বৈজ্ঞানিক ভাষায় অধ্যাপক তিনি একদিন বলিলেন যে জাপানিদের মধ্যে ককেশিয়ান এবং মঙ্গোলিয়ান দুই জাতির লোকই আছে। যেহেতু দুই চেহারার লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য দুই জাতির মিশ্রণে মাঝামাঝি চেহারার লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। দুইজাত বহুদ দেখাইলেন তাহার নিজের চেহারা ককেশিয়ানের জাত, জীর চেহারা মঙ্গোলিয়ানের জাত এবং ছেলে মেয়ের চেহারা মাঝামাঝি। প্রফেশর হিয়াই কয়েকটি

নিদর্শন দেখাইয়া জাপানী ভাষাকে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি আর্থ ভাষা হইতে সম্বৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এইরূপ আরও দুই একজনে নানাভাবে জাপানিদিগকে আর্থজাতি বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। অনেক মার্কিন দেশীয় পণ্ডিতও গত গৃহের পর এক গ্রন্থে জাপানি-দিগকে আর্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর্থই হউক আর অনার্থই হউক উহাদের চেহারা স্বাধীনতার আওতিতে সমুজ্জল; অপর আর্থ না বলিবে বা কেন?

জাপানীদের পরিচ্ছন্ন ইউরোপীয়ানদের জায়গা নহে; আমাদের জায়গা নহে এমন কি চীনা পোষকের সহিতও কোনরূপ সাধুত্ব, নাই; তবে ইউরোপীয় ভাব উহাদের ভিতর এত অধিক প্রবেশ করিয়াছে যে এখন মূল কলেজ আকিন, ক্রমিকের সর্বত্রই কোট পেট্টলেনের ব্যবহার। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শাকুমো শোজোন নামক এক ব্যক্তি কাব্যকর্মে ইউরোপীয় পোষকের স্রেষ্ঠ প্রচারণা করিতে থাকেন। তিনি বলেন জাপানী পোষক পরিধানের যেন লোককে অলস করিয়া তোলে; আর ইউরোপীয়ান পোষকে সকলের শ্রমীবৃত্তা বৃদ্ধি পায়। আপানে তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপীয়ানদের জায় পোষক পরিধান করেন। বিদেশী চাল চলনে নিরতিশর মেলা দেখিয়া রাজপক্ষীর কতিপয় সান্ন্যাই উৎসাহে নিহত করে। (১৮৮৬খৃঃ)। আজ সেই আপানে সভা-সমিতিতে ফ্রক কোটের ছড়াছড়ি। আজ মুটে মজুরও বলিয়া থাকে যে কোট পেট্টলেন

৩৪শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

জাপানী আকৃতি ও প্রকৃতি।

শরীরে বেশ লাগিয়া থাকে, এবং তাহা পরিয়া কাঞ্চক্ষণ করিবার সময় বেশ ক্ষুষ্টি পাওয়া যায়। আহার স্বপ্ন যেমন তপন তেমনি। যখনই অগ্নি ছাড়িয়া বাড়ী ফিরিল তখনই জাতীয় পোষাক পরিধান করিল। "আমরা বৈদেশিক কাহারও সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে কোট প্যান্ট হাওলাত করিবার ক্ষমতা এখানে এখানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই, আর জাপানীরা বৈদেশিককে অভ্যর্থনা করিতে অপব্যব বৈদেশিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোট প্যান্ট ছাড়িয়া জাতীয় পোষাক পরিধান করিয়া থাকে। কাউন্ট ওকুমায়ে সঙ্গীনের আগা খা, এবং ধনকুবের তাঁহার ছাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জাপানী কাপড় পরিধান করিয়া অভ্যর্থনা করিতে দেখিয়াছি। ডাক্তার মোতোবা এবং হারাদা কয়েক বৎসর পূর্বে ভারত ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন; ডাক্তার মোতোবা একদিন ইন্দোজাপানীসভার বক্তৃতা কালে বলিলেন, ভারতবাসী ইউরোপীয়ানদের ভাল ভাল স্ত্রীর দিকে না তাকাইয়া, নিজেদের জাতীয়ক ভূষণ কেবল সাহেবী বসন, সাহেবী ভূষণ, সাহেবী কখন এবং সম্ভবপর হইলে সাহেবী অশ্ব অশ্রু করিতে সিদ্ধ হইত।

আমরা যেমন বাড়ীতে থাকিবার বেলায় একখানা কাপড় এবং একটি গেঞ্জি কিম্বা শাট পরিয়া থাকি জাপানীরা পুরুষ বাড়ীতে কোমর বন্ধের সাহায্যে আলখেলার ছাত্র পা পর্যন্ত একটি লম্বা কোট পরিধান করিয়া থাকে, উহার যেতাখ নাহি। সভাসমিতি কিম্বা কোন তত্ত্বলোকের নিকট

যাইতে আমরা যেমন জামা এবং চাদর ছাড়া বাচির হইয়া উহারও তেমনি তত্ত্ব-সমাজে যাইতে কোমর হইতে পা পর্যন্ত একটি গাউন এবং শরীরের উপরিতাগে একটি টিলা কোট না পরিয়া বাহির হইয়া না। টিলা কোট অনেকটা আমাদের চোগার প্রায়। এই চোগার পৃষ্ঠদেশে কিম্বা বাহুর উপরে, প্রত্যেক বংশের নির্দিষ্ট নিদর্শন (মার্ক) অঙ্কিত থাকে। লতা, পাতা, এবং ফুলের চিত্রই সাধারণতঃ এক এক বংশের চিহ্ন। সুরাট-বংশের চিহ্ন কিম্বা অর্ধাং জিনেদু খামাশু পুষ্প। পূর্ব বিশিষ্ট সমাজে যাইতে বংশ চিহ্ন-সহিত চোগাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকাল উত্তরের পোষাক আর একরূপই; তবে মেয়েদের পোষাক জাঁকাল ছিটের। ছিট ছাড়া সম্পূর্ণ লম্বা কাপড়ের পোষাক বড় মেয়ে ধারণ না, শ্রীতের আলখেলার আমাদের বাগা-পোষ বা রেজার ছাত্র জুগা পরিয়া তৈয়ার করা হয়। আর কাল বিলাতেও জাপানী আলখেলার (কিমোনোর) দোকান বসিয়াছে মেয়েরাও সময় সময় কিমোনো পরিয়া থাকেন।

ছোট ছোট মেয়েগুলি এমনই জাঁকাল ছিটের পোষাক পরিধান করে যে রাত্রে চণ্ডিলা তাহাদিগকে নানারঙে চিত্রিত বড় বড় চীনাঘাটীর পুতুলের ছাত্র দেখা হয়। পূর্বে যে কোমর বন্ধের উল্লেখ করিয়াছি জীলোকের উহাই সবচেয়ে বাগ্‌গিরির জিনিস। যে বস্ত্র ধনী এবং সৌখীন তাহা এই কোমর বন্ধে প্রকাশ পায়। বাড়ীতে সর্বদা বাহা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা স্ত্রী আর কোন জায়গায় যাইতে বাহা ব্যবহার করে তাহা বেশমতী কিম্বা পশমী, তাহার উপর পোশাকের তাহা নির্দিষ্ট

মানাকপ লতা-পাতা, ফুল পানী ইত্যাদি
দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নাম ওবি। উহা



নৃতন ফ্যাশনের চুল বঁধা

দীর্ঘে সাধারণতঃ ১১/১২ ফুট, পাশে এক
হইতে দেক ফুট। কোমর বন্ধের পশ্চাতে
ইহার একটা ডুলাভরা গদি পরে। পুরুসগণ
ইউরোপীয়ানদের ভাৱ টুপী পরিয়া থাকে
এবং কতিং দ্বই একজন ঘেরকেও মেমদের
পোষাকে ভূষিতা দেখিতে পাওয়া যায়।
আপানে রাঙাবাতে মাঠে, তজ্র ঘুটে মস্তুর
গ্রীপুরুষ সকলেই কোন না কোন রকম
বড়ম, কিম্বা খড় ও কাপড় নির্মিত ছুতা
পরিয়া থাকে।

অধিকাংশ ঘেঘেরাই চুলের উপর রেশমী
রিবম, ক্রীম ফুল, চিকণি এবং সুখারি প্রোইই
বড় বড় দ্বই একটা পুঁতি ব্যবহার করে।

আপানী ঘেঘেরের চুল বিশেষ উন্নতযোগা।
উহার চুলের বিশেষ যত্ন লাইয়া থাকে।
অনেকেই হাঁটু পর্যন্ত চুল। এক পরিবারের
ঘেঘেরের চুল মাটি স্পর্শ করিতে দেখিরাছি।
অনেক সংবাদ পত্রের লোক তাঁহাদেখ চুলের
চোটে লইতে যায়। আপানী ঘেঘে-
দের ভিতর দ্বই প্রকার কেশ বিভাগ দেখিতে
পাওয়া যায়। প্রাচীন ক্যাশানি বৈদেশিকদের
নিকট কোঁতুহলোপক। আর আধুনিক
ঘেঘেরা কয়েক বৎসর যাবৎ নব্য ক্যাশানের



পুর্নাতন ফ্যাশনে চুল বঁধা।

প্রবর্তন করিয়াছে। ঘেঘেরা গৃহকাৰ্যের সময়
চুলে ময়ূরী পাশিবার করে মাথার একখানা
কম্বল জড়াইয়া লয় এবং একগাছা ফিতের

৩৭শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

জাপানী আকৃতি ও প্রকৃতি।

সাহায্যে পরিধেয় বস্ত্র বেশ আঁটিয়া রাখে। জাপানে মেয়েরা আমাদের আলতার স্তায় লাল তরল পদার্থে অপর রঙাইয়া থাকে।



গৃহকাণ্ডের জাপানী মহিলা

মেয়েরা সে দেশে অতি সামান্যই দাতব্য অলঙ্কার ব্যবহার করে। যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা সাধারণতঃ ঘড়ীর সঙ্গে একছড়া সোনার সূক্ষ চেন এবং সুবর্ণ নেকটাই-পিন পরে। যাহাদের সঙ্গীতি নাই তাহারা সুবর্ণের পরিবর্তে পিত্তল চেন ও পিত্তল পিন ব্যবহার করে। ঐ পিনখারা উহার কক্ষটার কিছা কিমোনো গলার নীচে আঁটিয়া লয়। শ্রুতির সময় উপের এবং গ্রীষ্মের সময় রেশমী কক্ষটার ব্যবহৃত হয়। আজকাল জাপানী অনেকে আংটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সৌখিন বাবু এবং

মেয়েদের কাছারিও ক্রকারিও দুই হাতে বাগটি আংটিও সময় সময় বেঁধিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের হিতর আংটি ও চেনের প্রচলন কম। তবে ঘুটে মস্তুরের নিকটেও লোহার ঘড়ী ও চেন আছে। পরিচ্ছদের বাহার স্রীপুঙ্গন উভয়ের মধ্যেই বেশ দেখা যায়। কোপাও বাটতে হইলে যে কোন শ্রেণীর মেয়েই এত মূল্যবান, পরিচ্ছদে ভূষিতা হয় যে উচ্চশ্রেণী নিরশ্রেণী বৃদ্ধিবার দেখা নাট। অনেক সময় টামের হিতরের জাঁকাল পরিচ্ছদ-ধারণী চাকরাণী ও হিতর শ্রেণীর মেয়েদিগকে স্থান দিয়া অতি বিশিষ্ট ভদ্র লোককেও গাড়াইয়া থাকিতে হয়। টামে স্থানান্তর হইলে পুরুষ আরোহিগণ মেয়েদিগকে দাঁতের দিয়া নিখোয়া গাড়াইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্বে লোকের হিতর এই অভ্যাস বেশ দেখিতে পাইতাম। ক্রমেই জাপান উচ্চ সভ্য হওয়ার পূর্বাভাসের ব্যতিক্রম ঘটতেছে।

ব্যক্তি চোরা এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে, আজ এই পর্যন্ত বলিয়াই উহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে হুঁচক কথ্য বলিব। অজ্ঞান ভবসাজের প্রাচীন জাপান সর্গপ্রবন ভাংকালিক স্তম্ভ্য ভারতের সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তখন ভারতের বাহা কিছু জাপানীদের নিকট আদর্শরূপে বিবেচিত হইত। উহার ভারতকে তেনজিহু (বর্গ) এবং ভারতবাসীকে তেন-জিহু জিন (বর্গবাসী) বলিত। বেস্টমিনের কথা নর ১৮৫০ খ্রীঃপে আমেরিকার কমোডোর পেরি বাণিজ্য উপলক্ষে মোবাহিনী লইয়া জাপানের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সেই সময় হইতে জাপানীদের হিতর পাশ্চাত্যের সভ্যতা গ্রহণ করিতে থাকে। হুটনীতি

এখন প্রাচীন
করিয়াছে ।

ভাষ্যের ছাত্রগণ জাপানে গিয়া প্রথম
প্রথম তাহাদের বাহ্যিক ভঙ্গাবহায়ে
আশ্চর্যিত হইয়া অনেকে আটখানা হয় ।
প্রথম বন্দর আর্মিও দেশে বঙ্গবাসীদের
নিকট চিঠিগত্রে এবং সংবাদ পত্র জ্ঞেত্রে,
জাপানের ঘোষণিত ছাড়া আর কিছু শিখার
পাইতাম না । ক্রমে যখন উহাদের ভিতরে
প্রবেশ করিতে লাগিলাম তখন দেখিতে
পাইলাম যে উহাদের চরিত্রের দুইটি দিক
আছে । উহারা উহাদের নিজেদের ভিতর
একরূপ আর বৈদেশিকদের নিকট অপরূপ ।
নিজেদের কাছে ভিতরে বাহিরে সমান,
একমন একপ্রাণ,—আর বৈদেশিকদের সম্বন্ধে
বাহিরে একরূপ আর ভিতরে অপরূপ ।

উহাদের বাহা তামা কোন বৈদেশিক
কিছুতেই নিম্না করিতে পারিবে না । কাচা
কিচা পচা অহার্য্য হউক যুগ্ম নুটিয়া বলিবার
যে নাই । উনঙ্গ হইয়া ১৮২০ জন এক
খরের ভিতর যান কক্ষ দে দীতিরও প্রশংসা
করিতেই হইবে । শরাস্ত্রের উহাদের মান-
গার বর্ণনা করিবার ইচ্ছা বহিল । গীত
উদ্ভাটনের ক্রমব্রতের জায় ক্ষত হইলেও অতি
মিলি মিটি (উদ্ভাট উদ্ভাট) বলিয়া চোঁচাইয়া
উদ্ভিষ্ট হইবে । Gladstone was a great
politician এই কথা জাপানীরা উচ্চারণ
করিবে,—“গ্লাডস্টোন তোহু ওয়াহু এ গ্লাডেস্টো
পোৱিতেনিয়াহু” । তৎক্ষণাৎ বলিতে হইবে
“মহাশয় আপনাদের ইংরাজী উচ্চারণকি চন্দ্রকার!
আপনি অতি দক্ষ” (নাকা নাকা কোজু) ।
বাহাদের নিজেদের কোন অক্ষর নাই এবং

বাহারা চীনাদের বিশ হাজার অক্ষর চাপাত
করিয়া লইয়া কণ চাপাইতেছে তাহাদের
দেই ভিত্তিহীন ভাষাকে অতি প্রাচীন জ্ঞাতা
ভাষা বলিয়া প্রশংসা করিতে হইবে । যুগ কণা
তাহাদের সম্বন্ধে কিছু সবই জ্ঞান বলিতে হইবে ।
এই সকল বিষয়ে যদি ঠিক মত প্রকাশ করিতে
যাই তাহা হইলে উহারা অন্তরে অন্তরে তণা
করে এবং এমন কি উহারা উহাদের দেশের
পক্ষ বলিয়া মনে করে । আমাদের মনে হয়
প্রত্যেক জাপানীরই প্রগাঢ় এবং অকৃত্রিম
মনোযোগ আছে বলিয়াই উহারা
মনোনের কিছুই মন্য দেখে না ।

একদিন কোন বৈদেশিক ইংরাজী
কাগজে “কোরিয়াতে জাপানীর অত্যাচার”
শীর্ষক প্রবন্ধে জাপানের অনেক কথা
প্রকাশিত হয় । চীনাগণ ছাড়া জাপান প্রবাসী
অগ্রজ বৈদেশিক বিশ হাজার অক্ষর আরম্ভ
না করিয়া সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষার সংবাদ
পত্রদি পড়িয়া থাকে ; আমিও তেমন
করিতাম । আমার সহাধারী কয়েকজন আমি
উক্ত প্রবন্ধটী অবগত আছি কিনা,—সে
সম্বন্ধে আমার কি মত, জিজ্ঞাসা করিল ।
আমি অস্বীকার মত প্রকাশ করিবার
পরিবর্তে এ কথা সে কণার বিষয়টি
চাপা দিতে চেষ্টা করিলাম । কিন্তু উহারা
ছাড়িবার পাত্র নহে । অগত্যা নিজের কোন
মত প্রকাশ না করিয়া ইংলণ্ড, মার্কিন
এবং চীনের সংবাদ পত্রাদির এবং কোরিয়ান
ছাত্রগণের মত এবং হেগ্ কন্ফারেন্সের
দুই একটি কথা বলিলাম মাত্র । সকলেই রাগে
লাগে হইয়া উঠিল,—এবং একজন সক্রোধে
বলিল, যে তাহাদের উরতি দেখিয়া পৃথিবীর

আর আর সকলেই স্তম্ভের অনিরা পূড়িয়া মরিতেছে ; তাই এক্ষণ কলঙ্কের আরোপ । বৈদেশিকগণ নীলবর্ণ চশমা চক্ষে দিয়া জাপান পানে তাকাইতেছে ; ইত্যাদি ।”

আমি যদিও সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলাম তথাপি নিরুজ্জ্বল পাইলাম না । তারতবাসী কোন আভিহ্ন মধ্যেই গণ্য নহে—তাহাদের কথার মূল্যই বা কি ? ইত্যাদি অনেক কথাই শো শুনাইয়া দিল । আমি কোন বাস্তবায়ন না করিয়া শেষেরটরিতে কান করিতে আরম্ভ করিলাম । বোধ হয় ঐ ঘটনার পর উহাদের মধ্যে এ সবকে কিছু আলোচনা হইয়া থাকিবে,—পরদিন প্রাতে কলঙ্কে বাওয়া মাত্রই সেই ছেলেটি আমাকে অভিবাধন করিয়া পূর্বদিনের ত্রুটির ক্ষমা প্রার্থনা করিল । বোধহয় সত্যই অমৃত্ত পইয়াছিল কারণ তারপর হইতে আমার সহিত বেনী যেমামিষি করিত ; আমাদের তোকিওস্থ বাড়ীতে আসিত ; এমন কি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াও তাহার পর পাইয়াছি ।

জাপানীদের বাড়ী গেলে জাপানীই কি আর বিশেষীই কি এমন ভাবে অত্যধিক হইয়া থাকে যে আমার মনে হয় পৃথিবীর অস্ত্র কোন দেশে এমন অতিথি সম্মান নাই । পরিবারস্থ যাবতীয় লোক আশঙ্ককের সনাত্তির অস্ত্র উদ্গীৰ্ণ হইয়া উঠে ।

আমীর কুটুবই হটক, পথিক বা ডাকপিয়নই হটক অগ্নয়ের দ্বার দেশে গোয়েন্দা নাছাই বলিয়া উপস্থিত হয় । উহার অর্থ,—মান কখন । আগন্তুককে বাড়ীর কএঁ পৰ্য্যন্ত হাঁটু গাড়িয়া অভিবাধন করিতে ক্রুরিতে অত্যধিক করিয়া থাকে । প্রবেশের বাড়ী গিয়াও

বেশিয়াছি উহাদের পত্নীগণ হাই গাড়িয়া আমাদিগকে অত্যধিক করিয়াছেন ।

আমীর স্বজন এবং বিশেষ পরিচিতের মধ্যে পরস্পর অভিবাধন কাণে এতগুলি গদ উজারিত হইয়া থাকে যে সকলগুলি উল্লেখ করিয়া দুখাইতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে । তবে মোটামুটি এই কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ;—প্রাতঃকালীন, মাধ্যাহ্নিক কিবা সাহ্যাহ্নিক অভিবাধনের পর ক্রমে নিম্নলিখিত অর্থবোধক গদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । “গত ব্যয়ের সাক্ষাতে যে ত্রুটি হইয়াছে মান কখন” “সে ব্যয়ের সময় অত্যধিকার অস্ত্র ক্রতজ্ঞতা জানাইতেছি,” “আম পরিষ্কার দিন কিবা; ব্যয়নের দিন,” আপনি শারীরিক ভাণত ?” “বাড়ীর সকলের কুশল ভ ?” “আমার অন্তঃস্থ ব্যবহারের অস্ত্র কখন কখন,” ইত্যাদি । হুই অনেকই ঐ গদগুলি আবৃত্তি করিতে থাকে ; কেহ কাহারও উত্তরের অপেক্ষা করে না । বলা বাহুল্য প্রত্যেক গদের পরই পরস্পরের অভিবাধন চলিতে থাকে । ঘরের ভিতর অভিবাধনের সময় হুই পক্ষ মাত্র আঁটা গরি, অর্থাৎ কুশনের উপর হাঁটু গাড়িয়া অবনত মস্তকে অভিবাধন করে, মস্তক মাটিতে লাগে না কিংবা উপরে থাকে । আর রাত্ৰাঘাতে অভিবাধনের সময় উত্তরে গাড়াইয়া শরীরের উচ্চভাগ অর্থাৎ কোমর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যক্তভাবে অবনত করে । ঘরের ভিতরই হটক আর বাহিরেই হটক এক সঙ্গে অনেকগুলি পরিচিত ব্যক্তি থাকিলে একে একে সকলকেই ঐ ভাবে অভিবাধন করিতে হয় । বলাবাহুল্য পাশ্চাত্য আদব

কার্য এ বেশে চুকিতাছে বলিয়া ক্রমেই প্রাচীন
সরলতা এবং শিষ্টাচার লোকের ভিতর কমিয়া
আসিতেছে। কাহারও নিকট কেহ পথ
নিজ্ঞান্য করিতে হইলে প্রথমে অভিবা-
দন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তারপর গম্ভীরা
পথের বিবরণ জানিয়া লয়। হউক মুটে
মজুর অথবা কৃষক তাহার নিকট পথ নিজ্ঞান্য
করিবার সময় বিশিষ্ট ভয়লোক ও শিষ্টাচারের
কুটি করেন না। এইরূপ প্রতি কথার গম্ভীরা
এবং অভিবা-দন একমাত্র ভাষানেই দেখিতে
পাওয়া যায়। কি প্রাধান মন্ত্রী, কি বিখ
বিভাগলের প্রেসিডেন্ট কি সাধারণ একজন
ছাত্র অভিবা-দন কালে পরস্পরে একইভাবে
শিষ্টাচার পালন করেন। আশাশুভের ভারতের
অধিকাংশ স্থলেই কিছু অজ্ঞান। অনেক
জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায় যে একব্যক্তি
অপরের গায়ে পড়িয়া ধূলি লইতেছে অপর
ব্যক্তি প্রত্যভিবা-দনের পরিবর্তে ভীষ্মের
পদখানি উহার সম্মুখের দিকে বাড়াইয়া
দিতেছেন। এমন কি, কেহ হস্ত কস্ত মাঠ
জঙ্গল বেড়াইয়া আসিয়া ব্যাগিলি
এবং ব্যাকটারিয়া বিকৃত, ময়লা পদপ্রক্ষা-
লিত চরণাবৃত স্থানে অপরের স্বর্ণের বাঁহ
উল্লুঙ্গ করিয়া দিতেছেন।

শিষ্টাচার দেখাইলে পদগোরবের বুদ্ধি হয়
ভিন্ন লাবণ হয় না। ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ
হেনরি বেড়াইতে বাহির হইয়া সাধারণ
প্রজাতিগকেও অবনত মস্তকে প্রত্য-
ভিবা-দন করিতেন। জটনৈক অমাত্যপুত্র
একদিন রাজাকে বলিলেন, প্রজাতিগকে
নমস্কার করিবার নিমিত্ত রাজার এতদূর কষ্ট
স্বীকার করা নিশ্চরোজন। রাজা

উত্তরে বলিলেন “বেশিতে হইবে প্রজাগণ
শিষ্টাচারেও যেন রাজাকে অতিক্রম করিতে
না পারে।”

অনেক ইউরোপীয়ান এবং আমেরি-
কানের নিকট সেই দেশেই ভ্রমিয়াছি যে
কথার কথার গম্ভীরা, ক্ষমা প্রার্থনা, নমস্কার
এবং অজ্ঞান হাব ভাবে জাপানিদের ভিতর
গম্ভীরা শিষ্টাচার দেখা যায় পৃথিবীর অন্য
কোন ভাষার ভিতর তেমন দেখা যায় না।
জাপানে কোন বাড়ীতে এক মুটে
একটা কিছু জিনিস রাখিয়া মজুর লইয়া
ঘাইবার বেলায় কিবা কোন কেরিওয়াল
কোন জ্বা বিক্রয় করিয়া দায় লইয়া ফিরিবার
বেলায় বাড়ির কেহ তাহাকে “গোকুরো
ছামা” বলিয়া অভিবা-দন করবে। গোকুরো
ছামার অর্থ মহাশয়ের পরিশ্রমের সমস্ত
গম্ভীরা। উহারও “দোইতামিনাস্তে”
বলিয়া প্রত্যভিবা-দন করিয়া। উহার অর্থ
উল্লেখ “নিশ্চরোজন”। এইরূপ যে কোন
কাষে শিষ্টাচারের এক শেখ। মনে করুন
জটনৈক ছাত্র সিগারেট টানিতেছে এমন সময়
তাহার গকজন বন্ধু একটা সিগারেট সুখে
বদ্ধ সিগারেট হইতে আগুন হাওলাত লইতে
উপস্থিত। প্রথমে ক্ষমা চাহিয়া অবনত মস্তকে
আপন সিগারেটে আগুন লাগাইয়া পুনরায়
গম্ভীরাবানস্তর অভিবা-দন করিয়া বিদায় লেখেন।
বিপন্নীত বিক হইতে চলিবার বেলায় সাক্ষার
দুই সহপাঠীর সাক্ষাৎ হইলে অভিবা-দন কালে
“দিকেশীমাতা” (মাণ করুন) অর্থাৎ “আপ-
নাকে, অতিক্রম করিয়া ঘাইতেছি সে সমস্ত
মাণ করুন” এই বলা হয়। আদি একদিন
পন্নীপ্রাণে একটি চেনা সাক্ষা অতিক্রম করিয়া

বাইতেছিল। সমুখে একজন কৃষক একখানা গাড়ীতে শত টানিয়া লইয়া বাইতেছিল। আমি উহার পাশ কাটিয়া গেলাম। এমন সময় কৃষক গাড়ি পামাইয়া আমার সমুখে আনিয়া অভিমান করিয়া বলিল “ওগোরা

ইতাদিমাত্তে” অর্থাৎ আমার গাড়ির দক্ষণে যে প্রতিবন্ধকত্বকৃত্ত অলুভ্য করিয়াছেন তচ্ছত্র কমা করুন। আমিও প্রতিবাদবান করিলাম। এইরূপ কত বিষয়ে তাহানের বাহ্যিক শিষ্টাচারে আমরা মুগ্ধ হইতাম।

ঐগত্নাথ সবকাষ।

চরন।

আমার জুল-কাঁকা।

(মোপার্সার দরানী হইতে)

একজন বৃদ্ধ ডিক্ক—গদা দাড়ী—আমার নিকট ডিক্কা চাহিল। আমার সঙ্গে চোদ্দেক দাব্রীশ তাহাকে ২ টাকা দিলেন। আমি নিশ্চিত হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন :

—এই হতভাগ্য ব্যক্তির মুখে, তার জীবনের যে ইতিহাস আমি শুনেছি, তা আমার শ্রুতি থেকে কিছুতেই যায় না,—ক্রমাগত আমার মনে পড়ে। সেই ইতিহাসটা তোমাকে নুচি শোনো :—

আমার পিতামাতার আদি নিবাস—হাথর। ঠাণ্ডা ধনী ছিলেন না। কোন প্রকারে সংসার-বাড়া নির্বাহে হইত—এই-মাত্র। আমার পিতা আফিনে কঁজ করিতেন। আফিন হইতে দেনী করিয়া আনিতে। বেশী-কিছু রোজকার ছিল না। আমার গুইটি ভগিনী ছিল।

আমাদের সাংসারিক কষ্ট দেখিয়া মারের বড় কষ্ট হইত। আমার পিতাকে তিনি অনেক কড়া কথা শুকাইয়া দিতেন, “ঠাণ্ডে-ঠাণ্ডে” আস্তে যা নিতে ছাড়িতেন না। সেই সময়ে

শিতার ডাব-ডালী দেখিয়া আমার মর্শাস্থিক মাতনা হইত। কপালে গাম নাই অথচ ঘেন গাম হইয়াছে—এই ভাণে কপালে হাতটা বুলাইতেন। কোন জবাব করিতেন না।

তার অক্ষমতা-জনিত কষ্ট আমি বেশ অলুভ্য করিতে পারিতাম।

সকল বিষয়েই পরচ কসাইবার চেষ্টা হইত; কেহ আহাের নিমন্ত্রণ করিলে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইত না,—পাছে কিরে আবার তাকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। বোকারের অবশিষ্ট জগত জিনিসগুলা হস্তাধায়ে কেনা হইত। আমার ভগিনীরা আপনাদের পরিচ্ছদ আপনায়াই ঠৈরাবী করিতেন, কোন জরীর পাড়ের দাম গর-পিছু আট আনা হইলে, সেই মূল্য লইয়া তাহাদের অনেককণ ধরিয়া তর্কবিতর্ক চলিত। একটা গাঢ়-রকমের সুপ, আর বা-‘তা’ চট্টনী মিলাইয়া একটা মাংসের রান্না—এই আমাদের নিত্য-আহারের ব্যবস্থা। স্বয়ং, এইরূপ আহারই স্বাস্থ্য-জনক ও বলপ্রদ; কিন্তু আমার কটি ভিন্ন

রকমের। তাছাড়া, লোক-সমায়ে বোম্বাই-
হীন জাতিও ছেঁড়া পেট-গুনের অল্প অনেক
সময় আহার লক্ষ্য পাইতে হইত।

কিন্তু প্রতি রবিবারে, আমার পূর্ব ফিট্-
ফাট্ কাপড় পরিয়া কেউতে বেড়াইতে
যাইতাম। উৎসব-দিনে আহাৰগুলি বেতপ
পতাকাগিকে বিক্ৰয়িত হইত, সেইরূপ লম্বা-
কোর্তী, খুচনী-টুপী ও নতুনায় হুলঙ্কিত হইয়া
আমার পিতা, মাকে তাঁর বাহ-অবলম্বন এদগ
করিতেন। সকলের আগে আমার ভগিনী
হুটি বাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন; এবং
আগ্রহের সহিত রাজার কাল-প্রতীক করিয়া
থাকিতেন। কিন্তু শেষ-মুহুর্তে তাঁহারা
দেখিতে পাইতেন,—বাড়ীর কর্তার লম্বা-
কোর্তার গায়ে একটা দাগ আছে,—অমনি
“বেলিন্”—তৈলে একটা স্নাক্কা ভিজাইয়া
সেই দাগ উঠাইতে বসিতেন।

আমার পিতা, মাঝার সেই খুচনী টুপীটা
পরিয়া,—খালি কানি গায়ে, বতকণ না
সেই দাগ-তঠানো ব্যাপারটা চুকিয়া বাইত,
ততকণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন।
এদিকে আমার মা, তাঁহার কীর্ণ দৃষ্টি চন্দ্রাটা
নাকের উপর টিক্কাঙ্ক করিয়া বসাইয়া, এবং
পাছে ব্যাঘাৎ হয় এই ভয়ে নতুনটা হাত
হইতে খুলিয়া, বাইবার অল্প তাড়াতাড়ি
করিতেন।

ভারপর, খুব কৈত-দ্রুত-ভাবে আড়ম্বরের
সহিত বাক্স আরম্ভ হইত। আমার ভগিনীরা
বাহু ধরাধরি করিয়া আগে আগে চলিত;
তাঁহাদের নিব্বাহের বয়স হইয়াছিল, তাই,
বাহাতে তাঁহারা লোক-দৃষ্টির গোচরে আইলে
এই অল্প তাহাণিকে এক একবার সহরে

বাহির করা হইত;—আমি মারের বা-দিকে
থাকিতাম, আর পিতা ডান দিকে থাকিতেন।
আমার মনে পড়ে—আমার দরিদ্র পিতা মাঝা
কিরূপ ঘটা করিয়া সেই রবিবারের সময়ে
বাহির হইতেন—মনে পড়ে তাঁহাদের
সেই কঠোর মুখভঙ্গী, তাঁহাদের সেই কৈত-
দ্রুত ফিট্-ফাট্ পরিচ্ছদ। তাঁহারা, শরীর
পাড়া করিয়া, আড়ষ্টভাবে পা কেলিয়া, গাছীর
চালে চলিতেন, ঘেন, এইরূপ চালের উপর
কি-একটা স্তম্ভতম ব্যাপার নির্ব্ব
করিতেছে।

এবং প্রতি রবিবারে, যখন কোন অজ্ঞাত
দূর-দেশ হইতে কোন বড় জাহাজকে আনিতে
দেখিতেন, তখন এই একই কথা প্রতিবারেই
বলিতেন :—

—“এই জাহাজের মধ্যে যদি ডল্‌ থাকে
ত কি মজাই হয়—আঁ।?”

আমার জুল্-কাঁকা, আমার পিতার
আপনার ডাই, আমাদের পরিবারের একমাত্র
ভরসা-স্থল—পরে তিনিই আবার পরিবারের
ভরের বিবর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি
ছেলে-বেলা হইতেই তাঁর কথা শুনিয়া
আগিতছি; আমার মনে হইত, আমি তাঁকে
এখন দৃষ্টিতেই চিনিতে পারিব—এতই তাঁর
সম্বন্ধীয় সমস্ত-কথা আমার পরিচিত ছিল। যে
দিন তিনি আমেরিকার যাত্রা করিলেন সে পর্য্যন্ত
তাঁর জীবনে যাহা কিছু ঘটাইছিল তাহার
সমস্ত খুঁটিনাটিই আমি জানিতাম,—গদিও
শেব সিঙ্কায় ঘটনাগুলির কথা আমার পিতা
আগনাদেশ মণে পূর্ব মুহুর্তেরে বলাবলি
করিতেন।

বোধ হয়, জুল্ কাঁকা একটা পারাপ কাঁজ

করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কতকগুলি টাকা তিনি নষ্ট করিয়াছিলেন;—দরিদ্র পরিবারে, সে একটা সত্ত্ব অপরূপ। ধনী-পরিবারে, যে লোক আদোদ-প্রমোদে টাকা গড়ায়, সে একটা “কল-খেয়ালি” করে মজি। তারু সৎকে লোকেরা হাসি-মুখে বলে,—“লোকটা বড় মৌখীন”। কিন্তু পরিবের ঘরে, সে ছেলে তার বাপ মায়ের টাকা নষ্ট করে, সে হস্তভাগা, লক্ষী-ছাড়ী, সে বদমায়েস!

এই পার্থক্যটা অস্তায় নহে—বলিও কাজটা একই; কেন না, কাজের পরিণাম অল্পদূরেই কাজের শুষ্ক-লগ্নতা নিশ্চারিত হইয়া থাকে।

সে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন বলিয়া আমার পিতা আশা করিয়া-ছিলেন, সেই সম্পত্তি নষ্ট করিয়া জুল-কাঁকা অনেকটা কমাইয়া ফেলিলেন; নিঃশেষ অল্পটুকু শেষ কপর্দক পর্যন্ত নিঃশেষ করিলেন।

যখন এইরূপ অবস্থা হইল, তখন জুল-কাঁকাকে একটা সওয়াগরী লাহাজে করিয়া নিউ-ইয়র্কে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

নিউ-ইয়র্কে গিয়াই, জুল-কাঁকা দেখানে একজন দোকানদার হইয়া বলিলেন। কিশোর দোকান খুলিলেন তাহা জানি না। পত্র লিখিলেন, তিনি অমর্য্য অর্থ উপার্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং আমার পিতার যে অর্থ তিনি নষ্ট করিয়াছেন, সে কতি পূরণ করিতে পারিবেন এইরূপ আশা করিতেছেন। এই পত্রখানি পাওয়ার, পরিবারের মধ্যে একটা গভীর মেঘের উজ্জ্বল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জুল—যে একেবারে লক্ষীছাড়ী হইয়া গিয়াছিল

সে হঠাৎ খাটি দোকান হইয়া দাড়াইয়াছে, সন্দেহ হইয়া উঠিয়াছে, দাত্রী-বংশের আকৃত বংশধর হইয়াছে, বংশের অতুল্য কাল করিয়াছে।

তাছাড়া লাহাজের একজন কাপ্তেনের নিকটে আমার জামিনাম, জুল দেখানে একটা বড় দোকান ভাড়া করিয়া, একটা বড়-রকমের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে।

১৫ বৎসর পরে, জুল-কাঁকা লিখিলেন :—

“শ্রী কলিঙ্গ, আমার বাহ্যিক জগৎ জুনি উদ্বিগ্ন না হও,—এই জগৎ তোমাকে লিখিতেছি, আমি এখানে ভাল আছি। কাজকর্মও বেশ চলিতেছে। আগামী কল্য আমি দক্ষিণ-আমেরিকার যাত্রা করিব। দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রা। বোধ হয় কয়েক বৎসর ব্যয় আমার কোন সংবাদ তোমাকে দিতে পারিব না। যদি পত্র না লিখিত উদ্বিগ্ন হইও না। যথেষ্ট ধন উপার্জন করিতে পারিলে তবে ঘেলে ফিরিব। আশা করি শীঘ্রই তাহা করিতে পারিব। তখন আমরা দুই তাই একত্রে সুখসম্পন্নে জীবন যাপন করিব...”

এই পত্রখানি, পরিবারের মধ্যে, বিন্দুর বাইবেল-গ্রন্থ হইয়া দাড়াইল। যখন-তখন ইহা পাঠ করা হইত, যাকে-তাকে ইহা দেখান হইত।

দগুতা, বৎস বৎসকাল, জুল-কাঁকা কোন পত্র লিখিলেন না। কিন্তু বতই কাগলিগ হইতে লাগিল পিতার আশাও সেই পরিমাণে বর্ধিত হইতে লাগিল। আমার মা-ও আদাই বলিতেন :—

—জুল দক্ষিণ আমেরিকার পৌছিলেই, আমাদের ভাগ্য কিরিয়া বাইবেল! এ একটা

লোকের মত লোক বটে; জুলু জানে কেমন করিয়া কার্য সিদ্ধি করিতে হয়।

এবং প্রতি রবিবারে আমার পিতা মদন দেখিতেন, দিগন্ত হইতে কৃষ্ণবর্ণ ঘন বাষ্পরাশি উঠাইয়া ধূমের সর্পণলা আকাশের উপর দূর বমন করিতেছে, তখন তিনি গুীর সেই চিরকোলে বুলিটি বলিতেন :—

—“যদি জুলু ঐ জাহাজের মধ্যে থাকে তাহলে কি মজা হয়, ‘জ্যা’?”

এমন কি, তিনি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন, কখন জুলু কমালা নাড়িয়া গুীর নাম ধরিয়া বলিয়া উঠিবে :—

—ও: ফিলিপ!

জুলু নিশ্চয়ই অস্ত্রাগমন করিবে এইরূপ মনে করিয়া, তাঁহা কত মংলবই আঁটিতেন। এমন কি, জুলু-কাকার অর্থে, অনতিদূরে একটা বাগান-বাড়ী-ও ক্রম করিতেন, স্থির করিলেন। ইহা ধরিল করিবার অল্প দূর-দূরত্বের কথাবার্তা চালাচলি এরই-মধ্যে যে আরম্ভ হয় নাই একথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

আমার বড় ভগিনীটির বয়স ২৮ এবং অল্পটির বয়স ২১ বৎসর। এখনও তাহাদের বিবাহ হয় নাই। এইজন্য সকলেরই মনে একটা কষ্ট ছিল।

অবশেষে দ্বিতীয়টির জন্য একটি বর জুটিল। বরটি আদিসে কাজ করে, ধনবান্ নহে কিন্তু সস্ত্রয় বংশের।

আমার ক্রম বিবাহ ছিল, জুলু-কাকার সেই পত্রখানি তাকে দেখাইলেই, সে আর ইতস্তত করিবে না। কলেক্ত তাহাই হইল।

পত্রখানি দেখিবারাত্র সে বিবাহের

প্রস্তাবটা অগ্রাহ্যের সহিত গ্রহণ করিল; এবং এইরূপ স্থির হইল, বিবাহের অজ্ঞানটা হইয়া গেলেই সকলে একসঙ্গে জদি-দীপে বেড়াইতে যাইবেন। যদি বেশী দূর নহে। একটা ছোট ডাকু-জাহাজে করিয়া সমুদ্র ঘিরা সেই যিবেন-ভূমিতে পৌছান যাইবে—সে দীপটা ইংরাজদিগের। গুই বন্টার মধ্যেই একজন ফরাসী, কোন এক প্রতিবেশী-জাতির দেশে গিয়া তাহাদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার (অতি ক্ষমত্ব হইলেও) অঙ্গুদগণ করিতে পারিবে—এ একটা কম সুবিধা নহে। শুনা যায় নাকি, সে দীপটা ব্রিটানীর ধ্বজা-পতাকার আচ্ছন্ন।

এখন এই জদি জমগটাই আমাদের এক মাত্র চিন্তা, একমাত্র কথোপকথনের বিষয়, একমাত্র সাধের স্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইল। অতঃপর ঐ কথা লইয়াই আমরা ব্যাপ্ত থাকিতাম। অবশেষে যাত্রা করা গেল। মনে হয় যেন কল্যাকার কথা। প্রান্তিরের জাহাজ-ঘাটে ডাকু-জাহাজখানা ধূমোপায় করিতেছে; আমাদের তিনটা পেট্রা জাহাজে উঠানো হইতেছে—আমার পিতা ব্যক্তিগত হইয়া তাহার তদারক করিতেছেন; আমার মা, জ্ঞতভাবে আমার অবিবাহিতা ভগিনীটির বাহ ধরিয়াছেন;—এই বড় ভগিনীর বিবাহ হইয়া যাওয়ার, এক নোড়ে পালিত দুটি পক্ষী-শাবকের একটি চলিয়া যাইবার মত, আমার ছোট গোমুটে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। আর আমাদের পশ্চাতে, নবদম্পতি—তাহারা বরাবর পশ্চাতেই থাকিয়া যাইতেছে।

এইবার জাহাজের শিট দিল। আমরা জাহাজে উঠিয়া পড়িলাম। ছোট ছাড়িয়া

জাহাজবান। দুঃ-সমুদ্রে গিয়া পড়িল। সমুদ্রটি সমুদ্র মার্শেল-টেবিলের মত দিয়া সমতল। আমাদের চোখের সামনে দিয়া উপস্থাপন করিবে যেন শলাঘন করিতে লাগিল, বাহারা বড়-একটা ভ্রমণ করে না—আমাদেরই মত আমরা মনে মনে আনন্দ ও গর্জ অস্থির করিতে লাগিলাম।

দাগ-উঠানো সেই লম্বা কোর্কটোর ভিতর হইতে আমার পিতার উপরটি দীত হইয়া উঠিয়াছে—আর সেই “বেকিন”-টেলের গন্ধটা চকুদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে; আমার তখন সেই রবিবার-গুলার কথা মনে পড়িতে লাগিল।

এই সময়ে হঠাৎ আমার পিতার নজরে পড়িল,—পরিপাটা পরিচ্ছন্ন-পরিহিতা দুইটি মহিলাকে, দুইজন তত্ত্বগোচক সমুদ্র-গুপ্তা (oyster)-বিবেদ কি না লিখালা করিতেছেন।

তৎক্ষণাৎ জীর্ণবস্ত্র-পরিহিত একজন বৃদ্ধ নাবিক, ছুরির এক-ঘায়ে গুপ্তার খোলাগুলার মুখ গুলিয়া দিয়া সেই তত্ত্বগোচক দুইটির নিকট আনিয়া ধরিল—পরে তাঁহারা সেই গুপ্তাগুলি মহিলাদের দিলেন। মহিলাদ্বয়, একটা পাতলা কুমালের উপর খোলাগুলি রাখিয়া, এবং পাছে “গাউনে” দাগ লাগে এইজন্য মুখ আঁড়াইয়া অতি সতর্পণে তাহা আহার করিলেন। তারপর ভাঙাভাঙি তাহার কলটুকু পান করিয়া, খোলাগুলি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।

আমার পিতা বোধ হয়, চমক জাহাজের উপর, বিশিষ্ট লোকদের ধরণে এইরূপ

গুপ্তা আহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি এই আহারে, এতই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়—মার্জিত রুচির পরিচয় পাঠাইছিলেন যে, তিনি আমার মা ও ভগিনীদিগের নিকটে আনিয়া লিখালা করিলেন :—

—তোমাদের কিছু গুপ্তা দিও কি ?

অর্থবাহের ভয়ে মা ইতস্তত করিতে-ছিলেন; কিন্তু আমার ভগিনী দুইটি তৎক্ষণাৎ রাজ হইলেন। মা বলিলেন :—

—আমার ভয় হয়, পাছে আমার পেটের অস্থির করে। শুধু মেয়েদের দেও, কিন্তু বোনী না,—বোনী পেলে অস্থির করবে। পরে আমার দিকে ফিরিয়া, আরও এই কথা বলিলেন :—

—আর কোম্পানীকে আদর্শেই দিও না—ওতে ছেলেদের বিগড়ে দেওয়া হয়।

আমি মায়ের পালে বলিরাছিলাম; ছেলেমেয়ের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য করাটা আমার অজ্ঞাব বলিয়া মনে হইল। আমি বেধিতে লাগিলাম—পিতা কি করেন। পিতা, কেতা দুরন্তভাবে তাঁর দুই মেয়েকে ও জামাইকে, সেই জীর্ণ-বস্ত্র বৃদ্ধ নাবিকের নিকট লইয়া গেলেন।

সেই মহিলা-দুইটি চলিয়া গেলে, আমার পিতা, আমার ভগিনীদিগকে বলিয়া দিলেন—গুপ্তা কি রকম করিয়া খাইতে হয়। জল গড়াইয়া পড়িবে না, অথচ খাইতে হইবে। এমন কি, তিনি নিজে দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, খণ্ড করিয়া একটা গুপ্তা হাতে করিয়া লইলেন। এবং সেই মহিলাদ্বয়ের

* কাচা সমুদ্র-গুপ্তা বনো যুরোপীয়দের একটা প্রিয় খাদ্য। বেশী খাওয়া বলিরা দরিদ্রতা ইহা পাইতে পারে না।

অনুগ্রহণ করিতে গিয়া, গুণ্ণীর ভিতরকার সমস্ত জলটুকু তৎক্ষণাত্ তীর সেই লম্বা কোঠার উপর উঁচাইয়া ফেলিলেন। জানিতে পাইলাম, মা গুন্ গুন্ করিয়া বলিতেছেন :—

—দেখাতে না গেলেই তাগ হ'ত।

কিন্তু আমার মনে হইল, হঠাৎ পিতা যেন ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কয়েক পা দূরে সরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার সমস্ত পরিবার সেই গুণ্ণীওয়ারালাকে বিরহা আছে,—তিনি তাহাই একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর, 'তাড়াতাড়ি' আমাদের নিকটে আসিলেন। বেখিলাম, তাঁর মুখ ভীকরণে হইয়া গিয়াছে, আর, কি-এক-রকম চোখের চাহনী। মুহূর্ত্তে আমার নাকে বলিলেন :—

—ভারী আশ্চর্য, যে লোকটা গুণ্ণী ভেঙ্গে দেয়, তাকে দেখতে অনেকটা জ্বলের মত। মা ভিজালা করিলেন :—

কেন জ্বলের কথা বলত ?

—আবার কে... আমার ভাই..... আমেরিকার তার এখন ভাল অবস্থা হয়েছে 'আমি যদি না জানতুম, তাহলে ওকেই জ্বল বলে' বিশ্বাস করতুম।

আমার মা হতবুদ্ধি হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন :—

—তুমি বড় নিমোহ! এখন তুমি ঠিক জান ও জ্বল নয়,—তবে আবার এইলব পাণ্ডামী-কথা বলত কেন ?

কিন্তু আমার পিতা, তবুও লাগিলেন :—

—তবে তুমি একবার দেখে এলো,

তারিণী ; আমার ইচ্ছে তুমি নিজের চোখে দেখে যা হয় একটা ছেত-নেস্ত কর।

মা তার আদন হইতে উঠিয়া মেঘেরের নিকট আসিয়া আবার দ্বিলিত হইলেন। আমিও ঘেঁই লোকটাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, লোকটা বৃদ্ধ, অতিশয় অপরিষ্কার, মুখ বালি রেবার আচ্ছন্ন, এবং তাহার নিজের কাছ ছাড়া আর কোন দিকে তাঁর দৃষ্টি নাই।

মা আবার কিরিয়া লাগিলেন। বেখিলাম, তিনি কাঁপিতেছেন। তাড়াতাড়ি বলতে লাগিলেন :—

—জুগুই বটে। মাঝা তবে, কাপ্তানের কাছে গিয়ে আরও কিছু খোঁজখবর নেও। কিন্তু সেখো সাবধান, আবার যেন ও আমাদের বাড়ি না এসে পড়ে।

পিতা একটু দূরে চলিয়া গেলেন, আমিও তাঁর পিছনে পিছনে গোগাম। কি জানি যেন আমার মনটা কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

কাপ্তেনুটি লম্বা, পাতলা, গুণ্ণেনে দীঘল হৃদয় ; যেন তিনি বৃহৎ ভারত-ডাক-আফগের কমাণ্ডার, এইরূপ একটা গুরুগভীরভাবে ধারণ করিয়া সর ডেকের উপর পারচাকি করিতেছেন।

আমার পিতা দস্তরমত তাঁকে অতিবাসন করিয়া, তাঁহার কাপ্তেনী-কমর সহজে অনেক কথা ভিজালা করিলেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহারও প্রশংসা করিলেন :—

—জদি কিলের গুজ বিখ্যাত ? কি কি দ্রব্য উৎপন্ন, হয় ? লোকসংখ্যা কত ? আচার-ব্যবহার কিরূপ ? গোবাক-পরিচ্ছন্ন

কিরূপ? জীবির এককি কিরূপ,—ইত্যাদি, নানা কথা।

আমার বিবাহ ছিল, পিতা আমেরিকার কপাটাই আগে পাড়িয়েন। কিন্তু তিনি ত সে কিছু দিরাই গেলেন না।

তারপর যে জাহাজে আমাদের ডাক আইলে সেই জাহাজের কপা পাড়িয়েন; তারপর জাহাজের সরঞ্জামের কপা। অবশেষে আমার পিতা কল্লিতবশে চিকিৎসা করিলেন :—

—আপনার ঐ দুই পালাসিট বেশ ভাল—
কপালীর খোলা-ভাঙ্গা বার কাছ। ঐ
লোকটার নিবরণ আপনি কি কিছু জানেন?

কাপ্তেন একটু চটখা কক্ষভাবে উত্তর করিলেন :—

—ও একটা বুড়ো ফরাসী তিক্ক, গত বৎসর ওকে আমেরিকার মেনেছিলুম, ওকে আমার দেশে ফিরিয়ে এনেছি। বোধ হয়, হাবান্ন নগরে ওর আত্মীয়জন আছে, কিন্তু ও তাদের কাছে ফিরে যেতে পার না—কেন না, তাদের কিছু টাকা ধারে। ওর নাম—জন্ম..... কি পীর্ডাস—ঐ রকম একটা কিছু; লোকটা এক সময়ের ধনী ছিল—কিন্তু দেখ না এখন ওর কিরূপ রূপনা।

আমার পিতার মুখ নীচ হইয়া গেল, কণ্ঠ কঁদ হইয়া আসিল। চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

না! বেশ—তাল...পূর্ণ তাল...হবারই কথা—আমি এতে একটুও আশ্চর্য্য হইনি... খজবার কাপ্তেন।

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কাপ্তেন

হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে নিতীকণ করিতে লাগিল।

পিতা, আমার মাতার কাছে আমার কিরূপ আসিলেন, তাহার দিক্ত মুখশ্রী দেখিয়া মা বলিলেন :—

—বোসো বোসো,—তোমার কি একটা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। তিনি বেকের উপর বসিয়া পড়িলেন ও গদগদ স্ববে এত কথা বলিলেন :—

—দে-ই বটে, সেট বটে!

তার পর, তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—এখন কি করা যায়?

মা বলিলেন :—মেয়েদের একটু দূরে সরিয়ে দিতে হবে। বোসো, এখন সব কথাই জানে—ওট গিয়ে মেয়েদের খুঁজে নিয়ে আসুক। আর, বিশেষ সাবধান হুতে হবে, যাতে জামাইয়ের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ না হয়।

আমার পিতা ত মাঝার হাত দিয়া বলিয়া পড়িলেন। এবং অক্ষুট স্বরে বলিলেন :—

—কি তরানক বিপর!

মা সহসা ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন :—

—আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল—ও ভ্রাতাটোরা কিছুই করবে না—আবার ও আমাদের বাড়ি চাপবে! বাস্তবিকবশের লোকের কাছ থেকে আর কি প্রত্যাশা করা যায়!...

আর আমার পিতা,—জী তব্দ'না করিলে বরাবর বাহা করিয়া থাকেন—কপালে একবার হাতটা বুলাইলেন।

মা আরও বলিলেন :—

—বোসোককে কিছু পরদা দেও, আপা-

তত ও শ্ৰুগ্নীৰ নামটো নিম্নে আহুক ।
ভিকুকাটো জোদেদকে নিশ্চয়ই চিৰে ফেলবে ।
তাৰে জাহাঙ্গীর উপর একটা বেষ কাও
হবে । এসো আমরা জাহাঙ্গীর আর এক
প্রান্তে চলে যাই ; ঐ লোকটা যেন আমাদের
কাছে না আসতে পারে !

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন ; এবং
আমাকে একটা টাকা দিয়া দূরে সরিয়া
গেলেন ।

আমার ভগিনীরা বিস্মিত হইয়া, পিতার
তত্ত্ব অপেক্ষা করিতেছিল । আমি বলিলাম,
সমুদ্র সীড়ার বা একটু কাতর আছি । তাঁর
পর, শ্ৰুগ্নীৰ খোলা ভাঙ্গিবার লোকটাকে
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—

—তোমার কত পাওযানা ?

তাকে কাকা বলিয়া সন্ধানন করিতে
আমার এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল ।

সে উত্তর করিল :—

—আট আনা ।

আমি একটা টাকা তাকে দিলাম, সে
আট আনা লইয়া বাকি আট আনা ফেরৎ
দিল ।

আমি তাহা হাতটা দেখিতেছিলাম ;—
নাথিকের মত হাতের উপর কতকগুলি গভীর
রেখার ভাঁজ পড়িয়াছে । যুথ দেখিয়া মনে
হইল, বুড়ার যুথ,—অতি কুৎসিত, বিগর,
চিত্তভাগ্যক্রান্ত ।

তখন মনে মনে বলিলাম :—

—ইনিই আমার কাকা, আমার পিতার
আপনার তাই—আমার কাকা । তাকে চারি
আনা বকুদিস্ দিলাম । সে আমাকে দস্তখত
করিল ।

—বাবা, লেখর তোমার মঙ্গল করুন ।

এই কথা সে ভিকুকদের স্বরে বলিল ।
আমার তখন মনে হইল, আমেরিকা
বোধ হয় ভিকা করিয়াই আদিকা নির্ধার
করিত ।

আমার দানশীলতা দেখিয়া, আমার ভগি-
নীরা অবাক হইয়া আমার মুখের পানে
তাকাইয়া ছিল । বাকী চারি আনা যখন
পিতাকে ফেরৎ দিলাম, আমার বা বিস্মিত
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

ঐ ক-টি শ্ৰুগ্নীৰ নাম বারো আনা ?...
অসম্ভব ।

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম :—

আমি চারি আনা বকুদিস্ দিচ্ছি ।

আমার বা লাকাইয়া উঠিলেন এবং
আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন :—

—তুই ভারী বোকা ! ঐ লোকটাকে,—

ঐ হতভাগটাকে চার আনা বকুদিস্ !...

পিতা, আমাকে দেখাইয়া চোখের
ইসারা করায়, মা থামিয়া গেলেন ।

তাঁর পর, সব চুপচাপ ।

আমাদের সমুখ ভাগে, দিগন্তের দিকে,—
সমুদ্রের মধ্য হইতে যেন একটা বেগনী রত্নের
ছায়া নির্গত হইল । উহাই জদি ।

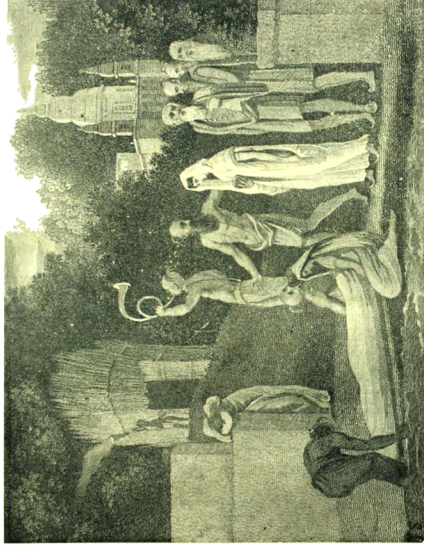
আমরা যখন ছোট্ট কাছাকাছি হইলাম,
আমার বড়ই ইচ্ছা হইল, আর একবার
আমার জুলু কাকাকে দেখি, তাঁহার নিকটে
যাই, কিছু সাধনার কথা, কিছু ভালবাসার
কথা তাঁকে বলি ।

কিন্তু, শ্ৰুগ্নী খাবার লোক আর কেহ
নাই দেখিয়াই তিনি পূর্ণহৃদে অতর্কিত হইয়া-
ছিলেন । বোধ হয় জাহাঙ্গীর খেলের মধ্যে

মৃত্যুর সঙ্কল্পে গাভী।
(শতিন পোলা দিও ইউড)

৭

৮



মানিয়া গিয়াছেন । পেই খোলুই বেটারার
বাসস্থান ।

আমরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম ।
আর কখন তাঁকে দেখিতে পাইব না ।
আমার মা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন ।

তার পর, আমার পিতার ভায়েক সঙ্গে
আর কখন দেখা হয় নাই ।

তুমি যে কখন কখন ভিক্টরের হুই এক
টাকা দিতে আমাকে দেখিতে পাও—ইহাই
তাঁহার কারণ ।

জ্যোতিবিস্ময়মাণ তাঁহুর ।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি ।

চতুর্থ খণ্ড ।

১। সেকিয়া (তক্ষ) রাজ্য ।

এই রাজ্য আর ১০,০০০ লি বিস্তৃত । ইহার
পূর্বে পিনোডি (বিপালা) নদী, পশ্চিমে দিম্বুদন ।
রাজধানী আর ২০ লি বিস্তৃত । তুই বাজ উৎপালনের
জন্ত প্রস্তুত । যেনে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও তীল
প্রভৃৎ পরিমাণে পাওয়া যায় । এই যেনে আরও
বড় তর । অধিবাসীরা তুইন এবং কোদোবাগর ।
ইহারা কোমের পরিচালন করে । যেনে দলদী সম্মারাই
এবং নতাবিক কনিয় আছে । আর সখোক
লোককে বোদ্ধবর্ণাবলম্বী । পূর্বে এই যেনে
যথেষ্ট পুণ্যপালা ছিল ; এই সকল পুণ্যপালায়
শ্রীতি ও আত্মর দান করিত । উৎস, পথা, বস্ত্র
ও আশুভকীর সকল ত্রায়াদিই সরবরাহ করা হইত ।
এইরূপ পরিচালন কোন ভই ভোগ করিত না ।

রাজধানীর ১০১১৭লি তক্ষিপ-পশ্চিমে প্রাচীন
শাকল নগরে পৌছি । নগরের আটচালি পড়িয়া
গিয়াছে কিন্তু গির্জাগুলি এখনও শক্ত আছে ।
ইহার পশ্চিমে আর ২০ লি । ইহার মধ্যে জুই একটী
দগর স্থাপিত হইয়াছে । অধিবাসীরা ধনী এবং
সমৃদ্ধিশালী । এই স্থানেই বহুপূর্বে রাজধানী ছিল ।
বহুদিন পূর্বে এই স্থানে মহিষহৃৎ নামে এক নরপতি
রাজধানী স্থাপনা করিয়া নরপতি ভাটনবর্ষের উপর

আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । তিনি যিগেন
কমতাপর ও দারদী ছিলেন । নিকটবর্তী সকল
রাজ্যই তিনি অধিকার করিয়াছিলেন । অবশ্য যত
তিনি বৌদ্ধধর্ম লগোত্র নিরুদ্বাহি পুণ্যপালায়
করিতেন এবং একদিন প্রধান কোদ বক্তিক তাহার দিকট
উপস্থিত হইতে আবেল গিলেন । কিন্তু কোন
মুতিই তাহার সম্মুখীন হইতে দারদী হইলেন না ।
ইহারা অত্যাচার ও বীর দীর অবস্থার তুই
ছিলেন তাহার রাজবস্ত্রলগ্নাবের অস্ত্র ইন্দুক ছিলেন
না । ইহারা বহুবর্ণী ছিলেন তাহার রাজবস্ত্রলগ্ন
ত্যাগ করিতেন । এই সময় রাজপরিবারে এক
বৃদ্ধ ভৃত্য দান করিতেন । এই ভৃত্য অনেককাল পূর্বে
কোমের দারদ করিয়াছিলেন । "ইহি বহুবর্ণী,
বিদ্য, ও বক্তা ছিলেন । যতিগণ রাজ্যে পালনার্থ
ইহাকেই রাজপদে প্রেরণ করিলেন । রাজা
যলিলেন "হাযি বৌদ্ধধর্মপদ্ধতিতে সম্মান করি
এবং সেইরূপ বেন্দোপাত্ত হইতে আমি সুখিয়াত
যতি আস্থান করিয়াছিলাম । কিন্তু এইকণ আহার
সহিত ভর্ষের অস্ত্র বর্ষগণ্ডী এক ভৃত্য প্রেরণ
করিয়াছেন । আমার বিশ্বাস ছিল যে যতিগণের
অথবা যথেষ্ট গ্রন্থি ব্যক্তি আছেন কিন্তু অস্ত্রযা
যতিগণের তাহাতে আমার পক্ষে যতিগণকে সম্মান
লগ্নবর্ষের আর সম্ভাবনা নাই ।" গল্পে তিনি

পক্ষ্যভায়ে মোড়বন্দীনাশের জন্য দক্ষ যত্ন
সুতরাং প্রায় অস্তিত্ব করিলেন ।

যখনকার বলাদিভাষায় মোড়বন্দীকে যথেষ্ট
সম্মান করিতেন এবং প্রজ্ঞাপূরিত ছিলেন । যখন
তিনি মহিষকুলের আবেশ শু শীতের সম্মান অবসর
হইলেন তখন তিনি নীচায় প্রবেশ প্রদর্শিত করিয়া
বাহকরএখানে আকীকার করিলেন । মহিষকুল
বিশ্রোত বিহারার্থ লৈকলগ্রহ করিলেন ।
বলাদিভাষায় মহিষকুলের প্রতাপ অবদত থাকতে
ঐহার হস্তীগণকে বলিলেন “আমি শুনিলাম যে
তোমাদের সন্তি হৃদকরা আমার সাথে নাই ;
সুতরাং সন্তোগের অনুমতি লইয়া আমি জলাভূমিত
কোণের মধ্যে সুকারিত থাকিব ।”

এই বলিয়া তিনি রাজধানী পরিভ্রমণ করিয়া
পূর্ণিতে শু যত্নকৃতিতে ইতস্ততঃ স্রবণ করিতে
লাগিলেন । প্রজ্ঞাপূরিত ঐহার প্রতি অত্যন্ত অনুমত
থাকায়, ঐহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রস্থ স্থানে সাজত লইয়া
মহিষকুলায় নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লৈকলব্যাক
স্বাধিনা জলপথে বলাদিভাষাকে আস্বাদার্থ যাত্রা
করিলেন বলাদিভাষা কোনসে মহিষকুলকে বন্দী
করিলেন । মহিষকুল লক্ষ্যে নিজ বসনে বসন
আসুত করিয়া বসিলেন । সিংহাসনোপবীত স্বীপরিপূত
বলাদিভাষা ঐহার একজন বস্ত্রীকে মহিষকুলের
আবরণ উদ্ভূত করিবার অনুমতি করিলেন ।

মহিষকুল উত্তর করিলেন “প্রভুত্বো এইক্ষণ
হয়ে পরিবর্তন হইয়াছে ; পক্ষ্য যখনবন্দী অববাস্তব ;
বিশেষতঃ কথাব্যক্তি সবার মুখ দেখিবার আবস্তক
কি ?” বলাদিভাষার আবেশ মহিষকুল শুনিবার
অবাক করিলে বলাদিভাষা বলিলেন যে, মহিষকুল
ত্রিভয় বিনষ্ট করিয়াছেন এবং সেইজন্য তিনি
সুতরাংক বস্তি হইবেন ।

বলাদিভাষার ভাষা বিশেষ বুদ্ধিবত্তা এবং ভোজী
প্রদর্শন প্রদর্শন ছিলেন । মহিষকুলের প্রাণবত
হইবে আশিতে পারিলাম বলাদিভাষাককে সম্বোধন
করিয়া বলিলেন যে “আমি শুনিতে পাইলাম যে

মহিষকুল বিরা এবং বুদ্ধি । সুতরাং আমি ভাষাকে
একবার দেখিতে চাই ।” বলাদিভাষা মহিষকুলকে
তথায় আনিবার আবেশ প্রদান করিলেন ।
মহিষকুলকে দেখিয়া রাজধানী বলিলেন, “মহিষকুল
লক্ষিত হইও না । সংসারে দক্ষমই অসিত্য,
স্রব শু হ্রবে বসনায়ত্তে বস্তি থাকে । প্রুি আশিতে
তোমার ভাষার ভাষা বিবেচনা করিবে এবং আশিতে
তোমাকে সম্বোধন করার দেখিব । তোমার মুখের
আবরণ উদ্ভূত করিয়া আমার সঙ্গে কথা বল ।”

মহিষকুল উত্তর করিলেন “কিছুদিন পূর্বে
আমি এবল পক্ষ্যস্রব রাজ্য ছিলো । কিন্তু এইক্ষণ
আমি সুতরাংক বস্তি বন্দী । আমি আমার রাজ্য
রাজ্যইহার এবং এইক্ষণ আমি বস্তিচরণে শু অশ্রুত ।
আমার পূর্ণপুত্র শু একবার দিকট আমি হের
হইয়াছি । বস্ততঃ পৃথিবীর বা বস্তের স্রবের
দিকটই আমি শুণিত । এইজন্য আমি নিজ বস্ত্রে
বসন আবৃত করিয়াছি ।” রাজধানী উত্তর করিলেন,
“এর পরামর্শ শুনিবার উপায় নির্ভর করে ।
স্রব হ্রবে সম্বোধন আইসে । তোমার আবরণ
উদ্ভূত করে ; আমি তোমার স্রব বস্তর তেই
করিব ।”

মহিষকুল রাজধানীকে বস্তবদ বিরা বলিলেন
“রাজধানীকে অনুপস্থিত হইয়াও আমি বিরাট রাজ্যের
অধীশ হইয়াছিলাম এবং আমি সেইজন্য রাজধানীর
অপব্যবহার করিয়া শান্তি প্রদান করিয়াছিলাম ।
কিন্তু এইক্ষণ বস্তি আমি বন্দী তত্রাপি একদিনের
জন্য বীতিয়া থাকিতে পারিলেও আমি সুতরাংক হইব ।
এইজন্য আপনি যে আমার স্রব বস্তর তেই
করিবেন এই আশিতে আমি আমার আবরণ উদ্ভোতন
করিয়া আপনাকে বস্তবদ বিবেচনা করিবে ।” মহিষকুল
এই বলিয়া মুখের আবরণ উদ্ভোতন করিলেন ।
রাজধানী মহিষকুলকে পূত্র সম্বোধন সম্বোধন করিয়া
বলিলেন যে ঐহার সুতরাংক বস্তি সেরা আছে । পরে
তিনি বলাদিভাষাকে বলিলেন যে পূর্ণতঃ, দিগবাস্তবী
সেই রাজধানী করাই উচিত । বস্তি মহিষকুল
বস্তি পাপ করিয়াছেন তত্রাপি ঐহার পূর্ণবাস্তবী

পূণ্য দেশে ঘর বাই। গবি তুমি সহিষ্ণুদের আশ্রয়
কর, তবে বাবশবৎসরকাল তাঁহার পাঠ্য গ্রন্থ
দেখিতে হইবে। আমি দেখিতে পাইতেছি যে
সহিষ্ণু লোকসমূহের অবিলম্বে হইবে, সুতরাং
উত্তরাকালে লোকসমূহ তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত কর।"

বলাবিত্ত্যাক হাম্বাভার অধোনে রাজ্যস্থিত
রাজ্যে অতি কৃপাশ্রয়ণ হইয়া তাঁহার বিবাহ দিয়া
যশেই সম্রাটের সহিত সৈন্তসহ যৌগ হইতে রতনা
করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সহিষ্ণুসমূহের খাতা
অধোনে প্রত্যাশ্রয়ণ করিয়া তাঁহার সিংহাসন পবিত্র
করিয়াছিলেন। সহিষ্ণু লোকসমূহ যৌগ ও
সকলস্থিতে বসন্তের অধন করিয়া কান্দীর গ্রন্থ
করিলেন। কান্দীরাক উপহারে সম্রাটের অভিযুক্ত
করিয়া প্রত্যাশ্রয়ণ হইয়া মানবের লজ্জা লুপ্ত
ও নগর প্রদান করেন। কিছুদিন পরে তিনি
ঐ সময়ের অবিস্মরণীয়ক উত্তেজিত করিয়া
কান্দীরাককে হত্যা করিয়া সিংহাসনাবিহীন
করেন। এই যুদ্ধে অসংখ্য ও সবে সবে যুদ্ধ লাভ
করিয়া তিনি পশ্চিমদেশে গমন করিয়া পাকার রাজ্যের
বিজয়ে বৃত্তান্ত করেন। তিনি কতকগুলি সৈন্তকে
যোগে লুণ্ঠিত করিয়া ঐ দেশের রাজাকে বন্দী
করিয়া হত্যা করেন। তিনি রাজবংশ ও প্রদান
মন্ত্রীকে লগ্নে বিনাশ করেন এবং ১৬০০ সপ্ত ও
সম্রাটের গলে করেন। তাঁহার সৈন্তগণ অনেক
লোককে হত্যা করে। তথাভীত তিনি এর লক্ষ
লোকের হত্যার আয়োজন করেন। এই সময়
সকল মন্ত্রী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহারাজ।
আপনার বীর্যের অসংখ্য করিয়াছেন এবং বর্তমানে
আপাদের সৈন্তসমূহ হুজ 'হইতে বিহত আছে।
আপনি এইকণ বৈশ্ববিক্রমে পাপন করিয়াছেন;
কিন্তু অবিস্মরণীয় কি দোষ? তাঁহাদের পরিবর্তে
আমাদের প্রাণদণ্ডের অধোনে করুন।"

রাজা ভয়ভয়ে বলিলেন "তোমরা যৌতবর্ণাবলী
এক উচ্চ বর্ণের সিংহ অধোনে লগ্ন কর। তোমরা
বৃত্তবর্ণের লজ্জা কর এবং সৈন্তসমূহ পরে
আবার খোঁচ উল্লেখ করিবে। এইকণ তোমরা

তোমাদের স্বপ্নানে প্রস্থান কর। এ সময়ে আমি
অধিক বাক্যসমূহের আশ্রয় করি।"

পরে তিনি সিংহাসনে অধন জেষ্ঠ্য তিন অশ্বত
লোককে মন্ত্রীপণ্ডে নিযুক্ত করিয়া হত্যা করিলেন
এবং তিন অশ্ব ব্যতিক্রমে দাসত্বে তাঁহার সৈন্তসমূহ
বিভাগ করিয়া দিলেন। পরে সম্রাটের দেশের
অধোনে করিয়া বাকী সৈন্ত সম্রাটের অধোনে
প্রত্যাশ্রয়ণ করিলেন। কিন্তু বৎসর পূর্ণ না হইতেই
তিনি প্রত্যাশ্রয়ণ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর সময়ে
বসন্ত ও কটিকা হইয়াছিল এবং সম্রাট পুত্রী
লক্ষ্যকরী হইয়াছিল। ক্রিয়াকর্ম হইয়া পুত্রী
টলাহমান হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধ দেখিয়া
সিদ্ধপুত্রগণ বলিতে লাগিলেন যে অসংখ্য বিদ্রোহ
আগিহত্যার লজ্জা সহিষ্ণুকে লক্ষ্যপেক্ষা নিম্ন বরতে
সম্রাট বৎসর অতিবাহিত করিতে হইবে।

সকাল প্রায় সম্রাটের হীম্যানসভাবলী
১০০ পত যতি আছেন। পুরাকালে বহুযুদ্ধ বৈশ্ববিক্রম
এইখানে প্রত্যাশ্রয়ণের প্রদান করিয়াছিলেন।
বর্তমান পক্ষেই ২০০ ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। এইখানে
পূর্ণতন চাষিগণ হুজ বর্ধমানের করিয়াছিলেন এবং
এইখানে অদ্যাপিও তাঁহাদের অধোনে চিত্র দেখিতে
পাওয়া যায়। সম্রাটের বাকী উত্তর-পশ্চিম
অংশের লক্ষ্য ২০০ পত ফুট উচ্চ স্তূপ আছে।
এই স্থানেও পূর্ণতন র লক্ষ্য হুজ প্রদান করিয়াছিলেন।
মন্ত্রম রাজধানীর ১০০ উত্তর-পশ্চিম অংশে
২০০ পত ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। তথাভীত উত্তরাকালে
বর্ধমানের লজ্জা বাইবার সময় এইখানে অলক্ষ্য
করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে পুত্রগণের দেখিতে
পাওয়া যায় যে, এই স্তূপে বৃত্তবর্ণের অনেক
স্বতন্ত্র-চিত্র আছে।

এইস্থান হইতে ৪০০ লি পূর্ণদিকে হাইরা নামের
চীনাগাতি নামে পৌছি।

চীনাগাতি।

এই অংশে আর দুই স্তূপ লি বিখ্যাত। সম্রাট
১৪১০ লি। দেখে প্রায় ১০০ পত পাওয়া যায় কিন্তু

ফলের পরি ক্রম : অধিবাদীরা শাক্তিগ্রের এবং
অগ্রহে সমস্ত থাকে। বেশ সমৃদ্ধিশালী ; জল বায়ু
উষ্ণ, অধিবাদীরা তীব্র শুষ্কতা কাণে অধনোযোগী।
বিবাদী এবং অধিবাদী উভয় প্রকারেরই লোক আছে।
বেশ ১-৩টি সন্তানপ্রাপ্ত ও ৮টি বৈবাহিক আছে।

দশন কবিকরার সিংহাসনাবিধোয় কবিরাজিলেন
তখন তাঁহার ব্যাতি নিকটবর্তী সকল যেনেই ব্যাভ
হইরাছিল এবং তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। পীত
দ্বারা পশ্চিম পাহাৰ কদম্বাশ্রয় তাঁহার নিকট
প্রতিভূ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কবিকরার এই সকল
প্রতিভূগণকে বিশেষ সমাদর করিতেন। যৎপ্রের
তিন কহুতে তিনি তাঁহাদের তিন তির আলাসে তান
বিতেন এবং মাথাঘল্ল রক্ষণের মন্ত প্রহরী নিযুক্ত
করিতেন। প্রতিভূগণ ষটকালে এই দেশে বাস
করিতেন। এই মন্ত এই বেশকে গ্রীষ্মাণী বলা
হইয়া থাকে।

এই বেনে পূর্ণ শেয়ার বা পিত্ত জড়িত না।
 বসন্তঃ, সীমাবদ্ধ হইতে হেরিত জড়িতকুল কর্তৃক
 এই সকল কল কুল গোপনের পূর্ণে ভাষ্যবর্ষ
 সুজাণি এই সকল কল জড়িত না। এই মজ পীঠক
 সীমাবদ্ধ এবং শেয়ারকে সীমাবদ্ধপূজ বসন্তঃ এই
 মজ এতদেবদানী লোকে পূর্ণকালের লোকদিগকে
 বিশেষ সম্মান করে। আবার দিকে বিশেষ করিয়া
 এতদেবদানী বসন্তঃ "এই বাজি আবারের পূর্ণ-
 তদ্বাস্তব কর্তৃক বসন্তঃ হইতে আদ্যদেবদানী"

সামগ্রিকভাবে ৩০০ শতাংশ লিফটের শ্রমিকের আয়
তুলনামূলকভাবে ৩০ শতাংশ উপস্থিত হয়। এই হিসাবে আর
৩০০ শতাংশ লিফটের শ্রমিকের আয়। তাঁরা সর্বশ্রেণীর শ্রমিকের
আয়। ইহাও শ্রমিকের আয় এবং শ্রমিক। ইহাও
শ্রমিকের আয়। তত্বেও এক শ্রমিক বৃদ্ধ এই
দেশে দেখাওগে। বিস্ময় (কোম্পানী) অর্থাৎ কঠিন।

বুদ্ধদেবের বিদ্যাপ্রাপ্তির তিনশত বৎসর পরে কাত্যায়ন এই মতে অতিবর্ণিত। অতঃপর শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তদনুসারেই বর্তমান অণ্ডোলন বিদিত। ২০০ পরেই উক্ত তত্ত্ব আছে। ইহার পক্ষে পূর্ণ-তত্ত্ব ও বুদ্ধের উপদেশ ও প্রবণের বিদ্য আছে।

অনেক ছাত্র ছাত্রীও এ সময় গৃহ আছে। কলকাতা
হইতে যে সতলজদি অর্থীয়াপত্র হইয়াছিলেন তাঁহারা
এই জানেনই নিকট প্রান্তে বস। ইহাদের মধ্যে
উপরে কতক অসংখ্য। ইহাদের মধ্যেও অতি অসংখ্য
বর্তমান হইয়াছে। গুরুতর চতুর্দিকে ২০ লি
মিটার কোমলই। দুইমাসের মধ্যে চিত্র লিপিত
কণের ইয়ত্তা নাই।

এই স্থান হইতে ১৪০। ১৪০ মি উত্তর পূর্বে বাইরা
আসরা আলমার পৌছি।

काङ्ग्रेस्स ।

এই রাজ্য পূর্বে শক্তিদে এক নগর ছিল এবং উত্তর দিকেরে আটপাড়া ছিল। রাজধানী ১২১৩ খ্রিঃ লইয়া বিস্তৃত। দেশের পাক সমভূমি ও চাটাল বয়েই পরিমাণে করে। এই দেশে বয়েই পরিমাণে মূল ও মল পাওয়া যায়। অল বায়ু উষ্ণ এবং আর্দ্র। অববাসিনী সাহসী এবং স্রোতবাসী কিস্তি যেখানে ঘরুর। মুহুর্তি আসবাব পূর্ণ। আর ৫০০ মঠে ছই সহস্র হস্তি বাস করে। হীন ও মহাবাহা উত্তর সমভূমি ব্যক্তিই দেখা যায়। এটা দেশে বসিনে ৫০০ নত অধিবাসী আছে। ইহারা সকলেই শৈব।

পূরাকালে এতদেবীর এক রাজ্যে অবস্থানীপনকে
অত্যন্ত শক্তপাতি দেখাইতেন কিন্তু পরে এক অর্ধন্তের
নহিৎ সাক্ষ্য হইলে তিনি খোঁজ বর্গে আত্মবাস
হয়ে। সেই লজ্জা অত্যন্তের রাজ্যে তাঁহাকে
শক্তপাতির জিহ্বা পূর্ণবেশের তথ্যবায়ক দিচ্ত
করেন। শক্তপাতি পূর্ণ হইয়া তিনি অত্যন্তের
বলী দিচ্তেন। বার্ষিক সন্তান ও
অন্যদিকে পাত দিচ্তেন। যে স্থানে যুদ্ধবয়ের কোন
কিছ পাইতেন সেই কালেই তিনি শূন্য কি সজ্জার
পাঠ্য করিতেন এবং তাঁহাভয়ের সকল স্থানেই তিনি
অন্য করিয়াছিলেন।

এই স্থান দ্বীপে উত্তর পূর্বাধিকে অগ্রগর দ্বীপ।
আমরা পাল্লুতা গর, সমতল ক্ষেত্র এবং অনেক
শিখরসমূহ দৃশ্যে বিরাট কুলটমেনে গোঁড়ি।

কুসুট

এই দেশ আর তিন সহস্র লি বিস্তৃত ; ইহার চতুঃপার্শেই পর্বত । রাজধানী ১৪১২০ লি। জুহি উপর এবং অচূর নদ তটে। যথেষ্ট ফুলফল ও ভেষজগুণ। পাণ্ডরা নদ। হুগল, হোণা, গ্রাম ক্ষুদ্রিক ও টান নদের পাণ্ডরা নদ। দেশ অত্যন্ত শৈত্যগ্রন্থান এবং অসহনীয় শিল ও বরফপাত হয়। অধিবাসীরা দেখিতে বর্ম্মরের ডার এবং ইহাদের মৰ্ফায়ে কোটক। আর ২০টী সঙ্গারাম ও এক সহস্র বতি আছে। ইহারা অধিকাংশই মহাবান মহাবলদ্বী, অত্যন্ত সস্ত্রাধার যুদ্ধ লোকত আছে। পনরটী বেবলির আছে ; নানাদেশবাসর লোক ঐ স্থানে বাস করে।

পর্বত মধ্যে গুহায় অধিবাস বাস করেন। কহি-পনত এই স্থানে থাকেন। বেশ মধ্যে অশোক বিস্তিত একটী তৃণ আছে। সুম্যাকলে তথাপত সবচর পরিবৃত্ত হইয়া এই দেশে বর্ম্মজাতক মনুয্যের উদ্ভবের মত আদমক করিয়াছিলেন। এই তৃণ ভাষায়ই স্তম্ভার্থে নির্ধিত হইয়াছিল।

এই স্থান হইতে ১৮০০/১২০০ নত লি উত্তরে বাইরা আমরা লাবল দেশে গৌড়ি। লাবল হইতে ২০০০ লি উত্তরে আমরা মোলাসো দেশে গৌড়ি। পরে ২০০০ লি দক্ষিণে বাইরা আমরা নদতটে দেশে গৌড়ি।

শান্ত্র

এই দেশ পূর্বে পশ্চিমে ২০০ লি এবং প্রস্থে ২০০ লি দক্ষিণে। রাজধানী ১৭১২০ লি বিস্তৃত। দেশে অচূর নদ সবলী এবং কল পাণ্ডরা নদ ৭ বর্ষ, হোণা ও নানাদেশকার মূল্যবান গুণবস্ত্র যথেষ্ট। অধিবাসীরা উজ্জল বেশধী বস্ত্র ব্যবহার করে। বসমানি মূল্যবান। দেশ উষ্ণ ও আর্দ্র। ইহারা শিক্ত ও ক্রুর। সন্-লেই বৌদ্ধবর্ণ্যবলদ্বী। রাজধানীর পার্শ্বে দশটী সস্ত্রাধার বিস্ত্র এইকণ এই সকল স্থান জন মৃত্ত। মগরের দক্ষিণ পূর্বে অশোকজাত নির্ধিত ২০০ নত ফুট উচ্চ তৃণ। ইহার পার্শ্বে পূর্বেদল মৃত্তবর্ণের উপবেশন ও অমগের

ভিক্ত আছে। এই স্থান হইতে ৮০০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে পাখ্যাজনদেশে গৌড়ি। এই দেশ ৩০০০ লি বিস্তৃত এবং রাজধানীর পার্শ্বে ১৪১২০ লি। যথেষ্ট নদ আছে। একপ্রকার অমৃত চাউল পাণ্ডরা নদ; উহা ৬০ দিনে শক হয়। অচূর নদ ৬ দেশ পাণ্ডরা নদ কিন্তু ফুল ও ফল কম। দেশ উষ্ণ ও আর্দ্র। অধিবাসীরা নিম্নর। ইহারা অধিকাংশ ও অধিবাসী। গ্রামা-ভারিতে শৈব; তিনি সাহসী ও পৃষ্ঠগ্রহ। জনসুখ ৮টী সস্ত্রাধার আছে। কঠোরজন নদে বতি বাস করে, ইহারা বৌদ্ধবর্ণ্য মহাবলদ্বী। বেবলিগিরের দশটী মন্দির আছে এবং তিন তিন সস্ত্রাধারতুল্য এক সহস্র বতি এই সকল মন্দিরে বাস করে।

মণ্ডুরা

মণ্ডুরা রাজ্য ৪০০০ লি বিস্তৃত; রাজধানীর পার্শ্বে ২০০ লি। জুহি উপরা এবং পত্তোপনানের জন্ত স্ত্রপত্ত; অধিবাসীরা পুকাংখানদেশে বসবাস। এই সকল বৃক্ষ হই আতীর। কুস্তাকার বৃক্ষের কল অধমে সমুদ্র বর্ষ থাকে কিন্তু পরিমেষে গীত বর্ষ হয়। প্রমা-কার পাণ্ডালির কল বরাবরই সমুদ্রবর্ষবিশিষ্ট। বেশে সুন্দর কার্শাল ও বর্ষ পাণ্ডরা নদ। দেশটি উষ্ণগ্রন্থান; অধিবাসীরা মন্ম ও শিষ্ট। ইহারা বার্ষিক ও শিক-গ্রন্থ।

আর ২০০০ বতি বিশিষ্ট ২০টী সস্ত্রাধার আছে। ইহারা হীন ও মহাবান উত্তর মস্ত্রাধারতুল্য। দেবভাগিনের ৪টী মন্দির আছে। অনেক বিধি ৮০০ ৩টী তৃণ আছে। সুদেব সমুদ্রদেশে অনেক ৮০০ এই দেশ পাণ্ডরা নদ। ন্যাক তথাপতের শিশ্যপণের স্ত্রপার্থ অনেক তৃণ আছে। দশা সাতীপুত্র, মূল্যবানপুত্র, পূর্বেদজ্ঞানিপুত্র, উপালি, আবল, রাজল, মজ্জী এবং অত্যন্ত বোমিগন্তের স্ত্রপার্থ তৃণ আছে। উপবানকানীর সকল বতি এইভাবে উপস্থিত হইয়া উপালনা করেন ও নানাদেশকার উপহার আদমক করেন। বাহারা অভিব্যক্তিগত অধ্যয়ন করেন, ওঁহারা সাতীপুত্রকে লক্ষ্য করেন। বাহারা ব্যামপণ ওঁহারা মূল্যবানপুত্রকে, বাঁহারা

পূজ পাঠ করেন তাঁহারা পূর্ণবৈজ্ঞানিকনিপুণকে, সাধারণ
বিশ্ব শিক্ষা করেন তাঁহারা উপাধিক লক্ষ্যন করেন।
চিকুণীপন মানকে লক্ষ্যন করেন এবং প্রযোজন
রাষ্ট্রকে পূজা করেন। সাধারণ সাধারণ সত্যবলম্বী
তাঁহারা বোধিসত্ত্ব পূজা করেন। এই সময়ে তাঁহারা
পূর্ণ মানবজ্ঞান উপহার প্রদান করেন। তাঁহারা
নিজ নিজ মণিদর পতাকা দ্বারা স্থান স্থাপিত
করেন; তাঁহারা দ্বারা স্থান স্থাপিত করেন; পূর্ণ
প্রদর্শিত করেন এবং চতুর্দিকে পূর্ণরূপে করেন।
দেশের দ্বারা চতুর্দিকে উপহারের সহিত এই সকল
কাব্য সম্পন্ন করেন।

নগরের দ্বারা লি পূর্ণের আশ্রয় একটি পার্শ্বত
লক্ষ্যার্থে উপস্থিত হয়। পার্শ্বত দ্বারা চেন করিয়া
ভদ্রা নির্মিত হইয়াছে। এই সকল দ্বারা যতিপন
বাল করেন। সমস্ত ক্ষেত্র দ্বারা এই সকলে
স্থানে প্রবেশ করিতে হয়। মানবী উপস্থিত এই সকল
প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। একটি পূর্ণে তথ্যভেদ
নগরের অবশিষ্ট আছে।

সম্রাটের উত্তরে গুহাভ্যন্তরে ২০ ফুট উচ্চ
এবং ৩০ ফুট বিস্তৃত একটি প্রদর্শন আছে।
ইহার মধ্যে চতুর্দিকে অনেকগুলি কঠিন আছে।
এইখানে মানবী উপস্থিত প্রদর্শিত করিয়াছিলেন।
তাঁহারা প্রচারে লক্ষ্যন কোন দক্ষিণে বোধিসত্ত্ব

লক্ষিত হইয়া অর্ধশতাব্দে হইয়াছিলেন তখনই তিনি
এই পূর্ণে ১ খাদি কঠিনত স্থাপন করিয়াছিলেন।
কিঞ্চিৎ সস্ত্রাচার বা স্ত্রীকর্তৃক বাস্তব অর্থহাতির
তিনি কোন মিশ্রণে প্রাপ্ত নাই।

প্রদর্শনপূর্ণের ২৪২৬লি দক্ষিণপূর্ণের জলাভূমির
তুল্য আছে। পূর্ণাংশে তথ্যভেদ এই স্থানে প্রদর্শিত
করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক মানব তাঁহাকে
এক পূর্ণে বহু উপহার দিয়াছিল। বুদ্ধ এই বহু জলের
সহিত মিশ্রিত করিয়া সমস্তে জনসংখ্যার মধ্যে
বিতরণার্থে প্রদর্শিত দিয়াছিলেন। আলোচ্যে প্রদর্শিত
হইয়া মানব প্রদর্শন প্রদর্শিত হইয়া প্রদর্শিত করে।
তাঁহারা এই পূর্ণাংশে লক্ষ্যন প্রদর্শিত বহু
দেহ প্রাপ্ত হয়।

ইহার কিছুদূরেই পূর্ণতন দ্বারা লক্ষ্যন ইত্যদ্য
প্রদর্শিত চিত্র আছে। দিকটো দ্বারা মানবীপূর্ণ,
পূর্ণাংশপূর্ণ এবং প্রদর্শিত ১২৬০ অর্থ লক্ষ্যন প্রদর্শিত
করিয়াছিলেন তথ্যভেদ তুল্য আছে। তথ্যভেদ এইখানে
অনেকবার প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। যে যে স্থানে
তিনি বিশদ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে
চিত্র আছে।

৫০০ লি উত্তরপূর্ণ দিক দ্বারা মানব
প্রদর্শিত নৌচি।

মানবের ভবিষ্যৎ।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা এক আশ্চর্য্যাত্মক
আবিষ্কার করিয়া শিক্তব্যক্তিত্বকে শক্তিত
করিয়া তুলিয়াছেন। সেই তথ্যটি এই :—
বিষমত অক্ষ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে
অক্সিজেন বাষ্পের পরিমাণ বহুপরিমাণে হ্রাস
পাইয়াছে। সত্যতা বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে
তুল্য হইতে সহস্র সহস্র যোজনবাসী
অরণ্যমণী সমুদ্রের বিনাশবশতঃ এবং রানি

রানি অক্সিজেন বাষ্প বায়ুমণ্ডলে স্থানলাভ
করাই, অক্সিজেন বাষ্পের পরিমাণ দিন দিন
বহুতর হইয়া আসিতেছে। সত্যতা প্রদর্শিত
উক্তিগাছে যে প্রাপ্যবস্তুর অক্সিজেন বাষ্পের
পরিমাণ হ্রাস পাইয়া, বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন-
বাসী-উপাদানের ক্ষমতা হইতে থাকিলে,
মানবের অস্তিত্ব কি হইবে?

শিক্ত ব্যক্তি মাঝেই অবগত আছেন

যে বায়ুশিশির ঐক্যে উপাদান হইল—
অস্রজান ও বৎকারজান। ইহাদের মধ্যে
অস্রজান বায়ু জীবন-রক্ষক, জীবনের পরি-
পোষক। অপরটি জীবন রক্ষণে অক্ষম,
এমন কি জীবনের পরিপত্র। কিন্তু অস্রজান
বায়ু জীবন-রক্ষক হইয়াও তীব্রতাবশতঃ
হলাহলের দ্বারা জীবননাশী; আর বৎকার-
জান জীবনরক্ষণে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াও
অস্রজানের তীব্রতানামক বলিয়া জীবনের
অক্ষতুল। কঠিণরুদ্ধ না হইলে বলিতে পারি
যে অস্রজান তীব্রতর, আর বৎকারজান
বারি। অস্রজান ও বৎকারজান কেহই
নিরপেক্ষভাবে আমাদের জীবনরক্ষণে সমর্থ
নহে। কিন্তু ইহাদের সম্মিশ্রণে যে পদার্থ
উৎপন্ন হয় তাহাই আমাদের জীবনোপযোগী
—আমাদের প্রাণবস্তুর বায়ু।

বায়ুমণ্ডলের এই উপাদানবহুর উপর
আমাদের জীবন এক্ষণ নির্ভর করিতেছে
যে, আজ যদি বায়ুমণ্ডল অস্রজানবাস্প
একেবারে অপ্রতিত হয় তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ
এই কোটি কোটি জীব, বারিহীন মীনজলের
জাতি, শালরুদ্ধ হইয়া অত্যাশঙ্কন মধ্যে প্রাণ-
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। আর যদি অস্র-
জানবাস্পশিশির পরিমাণ কোনও অভাববীর
কারণে প্রকৃতরূপে বর্ধিত হয়, তাহা হইলে
আমাদের নিশ্বাস গ্রহণোপযোগী বায়ু উদ্ধার-
কর হইয়া উঠিবে; আমাদের দেহস্থ পোষিত-
রাশি অবশ্যকৃত্বৎ ধমনী ও শিরা সমূহের মধ্যে
তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়া আমাদের স্বগঠিত
দেহবস্তুর নিকল করিয়া দিবে; মস্তিষ্ক ও
দেহের কার্য বিঘ্ন্যবেগে চলিতে থাকিবে;
এবং সমগ্র মানব সমাজ উদ্ভাসপ্রাপ্ত হইয়া

ভূমণ্ডলকে ‘পাণ্ডাখারবে’ পরিণত করিবে।
শক্তি ক্ষুদ্রণ এমনই হইবে যে, জীবন-বাস্পী
সাধনার কার্য চকিত মধ্যে সম্পন্ন হইবে।
আজ বাহায়া অজবুদ্ধি মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার
প্রতিভাশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু হায়! এই
এতদূর শক্তির বৈশ্বাচারে অসমর্থ হইয়া
আমাদের এই দেহবস্তুর ‘স্টাটোনোগ্রাফ’ এঞ্জিনের
জায় নিমেষ মধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

পক্ষাঘরে, বায়ুহীনস্থ অস্রজান বাস্পের
বলতা বটিলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক
শক্তিনিচর দ্বাদশ প্রাপ্ত হইয়া পঙ্গোদ্রুপ
হইবে। মানবজাতি তাহার সমুদায় জীবনী-
শক্তি হারাইয়া জড়তাব পঠণ করিবে। এত-
দিন পরিশ্রম জমোদ্ধতি নিগন্ধন যে বিভিন্ন
সত্যতা মানব সমাজে দেখা বিরাহিল
তাহা নিমেষ মধ্যে যেন কোন কৃষ্ণ প্রভাবে
অদৃশ্য হইয়া যাইবে; এবং ভূমণ্ডল চরুণ
ও নগণ্য জীবজুলের স্থগিত আনন্দে পরিণত
হইবে।

ফলকথা, ভূপৃষ্ঠ হইতে মানবজাতির
বিলোপনাধন যদি বিধাতার টঙ্কা চর তাহা
হইলে তাহার সংহারমুষ্টি ধারণ করিয়া অগ্নি-
সংযোগে পূর্ণী ভস্মীভূত করিবার আশংক
নাই, কিংবা তুহিনগাতে ভূমণ্ডলকে হিমমত্তিত
করিয়া মানবজাতির অব্যোগ্য করিবারও
প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না; কেবলমাত্র
বায়ুশিশির উপাদান সমূহ হইতে অস্রজান-
বাস্পের কিয়ৎংশ তুলিয়া গইলেই তাহার
অতীত সাধন পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

অতএব বায়ুমণ্ডলস্থ অস্রজানবাস্পের
দ্বাদশপ্রাপ্তির সংবাদ কখনই আশা-প্রদ নহে।
মানবের বর্ত্তমান দেহমন যুগযুগান্তরবাসী

অভিযাত্রিকরূপে ফল যে অসুস্থকাল ঘটনাপন্থার
সংসার ফলে আত্মসমুৎসাহের বর্তমান অবস্থা,
বিশবীত ঘটনায় তাহার সন্মুখ পরিণত
অবস্থান। সুস্থর ভবিষ্যতে বাস্তুশাস্ত্র
অন্নজানবাস্পেব অন্নতা নিবন্ধন সমুৎসাহের
শারীরিক গঠন ক্রিয়ণ হইবে Science
Siftings নামক বৈজ্ঞানিক পত্র তাহার
এক বর্ণনা দিয়াছেন। পাঠকবর্গের
কৌতূহল নিবারণ তত্ত্ব আমবা নিয়ে তাহা
বিবৃত করিতেছি।

হুমিতলের শারীরিকবৃত্তি সূত্রাংশে অন্নজান
বাস্তু এংগে কবিবার অন্ন মানবকে প্রথমতঃ
চতুশ্চন্দ্র প্রাণীর জায় হস্তপদাদির উপর
তর দিয়া বিচরণ করিতে হইবে; অন্নজান-
বাস্তুর নান্যতাবশতঃ বাস্তুশাস্ত্রীতে জলীয়
বাস্পেব অন্নতাব হওয়ার উত্তাপাদিকানিবন্ধন
সমুৎসাহের দেহতর্য্য বৃদ্ধিহস্তের জায় স্থল ও কঠিন
হইবে; স্বাভাবিক শোষণশক্তি বাস্পপ্রবণ
ক্রিয়ায় সহায়তা করিতে গিয়া ক্রমশঃ
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; বৃদ্ধিত কর্ণবর্গ কণাক্রান্তি
ধারণ করিয়া মণ্ডলাকাবস্থাপন্ন হইবে এবং
মাসিকালভ্যন্তরস্থ হ্রাস শুভাক্রান্তি প্রাপ্ত হইবে;
ক্ৰমে সমুৎসাহ পরীক্ষণতাপন্ন হইয়া বস্তু
ভূতল-অবলম্বী হইবে ততই তাহার পদব্রজ
অকণ্ঠ্য ও অসংব্রজ হইয়া উঠিবে;
পরিবেশের আশ্রয়ার্থ তাহার পরীক্ষণ
গোমাবলী সজ্ঞান জায় কণ্টকে পরিণত
হইবে।

সুস্থর ভবিষ্যতে মানবসংসারের এই অত্যন্ত
ভাবী পরিণতি আপাততঃ আমাদের বিশ্বব ও
অবস্থাসংসার কারণ হইলেও, বাস্তুশাস্ত্র
অন্নজানবাস্পের পরিমাণ যে দিন দিন

হ্রাস পাইতেছে তাহা বিবিধ প্রকারে প্রমাণিত
হইয়াছে।

বোম্বাই-মহোৎসবে বিমানারোহণ করিলে
দেখা যায় যে সমুৎসাহ হইতে বস্তুই উর্দ্ধগত
উৎসাহ হওয়া যায়, অন্নজানবাস্তু প্রাচুর্য্য
ততই পরিণত হইতে থাকে। বস্তুবার
হাজার ফুট উপরে অন্নজানবাস্তুর অন্নতা
এতই অসুস্থ হইয়া যায় যে আমাদের ধৃতিশীল
ক্রিয়া বৃত্তি হইবার উপক্রম হয় এবং তদুর্দ্ধে
আবোহণ করিলে জীবনীশক্তি লোপ হইয়া
আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় যখনই সম্ভাবনা
পাড়ায়। ফলতঃ, এই যে সমুৎসাহ
বাস্তুশাস্ত্রের আমবা বাগ করিতেছি, ইহার
উর্দ্ধগত বস্তুজানবস্থাপন্ন এবং তলদেশে
অন্নজানবাস্পবন। শুষ্ক-নিবন্ধন অন্নজানের
গতি নিয়ন্ত্রিত্রুপে এবং অগ্নিক্রান্ত লবু বলিয়া
বস্তুজান উর্দ্ধগামী। সুতরাং অন্নজান-
বাস্পের পরিমাণ লবু সম্ভাবী যদি হ্রাস পাইয়া
থাকে, তবে তাহা নভোদেশেই সর্জপ্রবণ
লবিত হইবার কথা। এবং বৈজ্ঞানিক
পরীবেক্ষণ দ্বারা ইহাই প্রকৃত অবস্থা বলিয়া
প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর
পরিমাণে সত্যগতে গমনপর্য্যটনের যে বিপুল
প্রমাণ দেখা দিয়াছে—বোম্বাই-মহোৎসাহের উল্লেখ-
সাধন, বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীর দ্বারা
সর্জিত লিখিত উপনিবেশ সংস্থাপন, বিবিধ
উচ্চীরমান যন্ত্রের উদ্ভাবন প্রকৃতি বিচিত্র
চেষ্টার ফলে ইহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে
অসুস্থ পরীক্ষিত লিখিত বাস্তুশাস্ত্রপ্রবণ
সূক্ষ্মগণনা অধিকতর কষ্টসাধ্য।

অধিকতর, বাস্তুশাস্ত্র উপাদান নিচয়ের
পরিবর্তন ব্যাপার আমবা অন্ন এক কারণে

বিশেষরূপে বৃদ্ধিতে পারি। তাহা এই যে বায়ুয়ের জীবনীশক্তি প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সভ্যতার বিলম্বপটাকা হেতু শইরা বিগতবাপিনী উন্নতির অধীনস্থি জুগিরা জুপুঠে সগরুর বিচরণ করিলেও, টহা নিশ্চিত যে অধিকাংশ মানবই, বিশেষতঃ নাগরিকজগৎ, তাহাদের জীবনীশক্তি পূর্ণ-পুঙ্খবাপেকা অনেক পরিমাণে হারাইয়াছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, অরণ্যানী সনুহের বিশোপগাধন, এবং কৃত্রিম উদ্ভাবন জনিত প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের বিপর্যায় বশতঃ জড়জগতে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, বায়ুমণ্ডল উপাদান সনুহের পরিবর্তনবাপারে আমরা তাহানই অভিধাক্তি দেখিতে পাইতেছি।

অরণ্যনবাপের এই ক্রমবিলোপের সঠিক পরিমাণ যদিও অক্ষপাত করিয়া আশাততঃ দেখান সম্ভব নহে, কিন্তু ইহা আমাদের মরণ রাখা উচিত যে, বায়ুমণ্ডলে অরণ্যনের প্রাচুর্য্য আমরা চিরকাল আশা করিতে পারি না। পৃথিবীর জার শীতায়মান কোন গ্রহই অরণ্যনবাপ চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারে না; জুপুঠ দত্তই শীতল হইবে, শিগামৃত্তিকা-সংগঠনে অরণ্যনবাপ ততই ব্যচিত হইবে। যুগগুপ্তের বাপিধা এই প্রক্রিয়া জড়জগতে চলিয়া আদিতেছে।

কেহ কেহ এইরূপ অসুমান করেন যে বায়ুমণ্ডল অরণ্যনবাপের এই অবশেষাবী ক্রম পূরণ জন্ত, মহাকাশ হইতে অরণ্যনবাপ পৃথিবীতে আদিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই আমাদের এই অজাবজ্ঞক বাপের উৎপত্তিস্থান এবং

কিস্থপেই বা টহা পৃথিবীতে আদিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ জন নাই। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অরণ্যনবাপ উদ্ভিদ জগৎ হইতে প্রাপ্ত হই বলিয়াই আমরা জানি। অতএব ইহা বেশ বৃদ্ধিতে পারা যায় যে জুপুঠ অরণ্যানী সনুহের সংরক্ষণ আমাদের জীবন ধারণোক্ষেত্রে কিস্থ প্রয়োজনীয়। যদি কৃষকগণ কতকটা নিদিষ্ট বিশালক্ষেত্রে উদ্ভিদ-উপাদানের জন্ত রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে আমরা আমাদের জীবনরক্ষার একটি প্রধান সহায়ের উৎপত্তিস্থলে কুঠা রাখা করিব।

আর একটি পদার্থ আমাদের বায়ুমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইতেছে—তাহা অক্সারায়মান। ইহাও শীতায়মান পৃথিবী কতৃক শোষিত হইতেছে। শিগামৃত্তিকা-সংগঠনে অরণ্যনবাপের জার অক্সারায়বাপও ব্যচিত হইতেছে। অরণ্যনবায়ু জীবজগতের পক্ষে যেক্ষণ অতি প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ জীবনের পক্ষে অক্সারায়বায়ুও সেইরূপ। অতএব যদি অক্সারায় বাপের পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পায়, তাহা হইলে উদ্ভিদগণ বাঁচিতে পারে না; আর উদ্ভিদ বিনষ্ট হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অরণ্যন-প্রাণির একটি মূল প্রস্রবণ কষ্ট হইয়া যাইবে।

অতএব প্রুটী কঠিন সমতা আমাদের সমক্ষে উপস্থিত। অরণ্যনবায়ুর পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে অব্যাহত রাখিতে হইলে উদ্ভিদ-জগতের ব্যতির অপরিহার্য্য এবং উদ্ভিদ-জীবন রক্ষার অক্সারায়মান-বায়ুর প্রয়োজনীয়তা অনতিক্রমণীয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে শীতায়মান পৃথিবীপুঠে যে শক্তি অবিবত

কার্য করিতেছে, তাহার প্রত্যবে উদ্ভূত
ও জীবনগতের প্রাণস্বরূপ অকার্যজন্য ও
অসুখজন্য বাস্তব ক্রমশই বরতা প্রাপ্ত
হইতেছে ।

এ কথাও সত্য যে মহুঘোর নৈশন্ধিন
কার্যপ্রণালী অকার্যজন্যবাদের পরিমাণ
বৃদ্ধি করিতেছে । প্রত্যেক কলকারখানার
চিমনী নির্গত ধূমরাশি ও সত্যতাস্থলত
বিবিধ কৃত্রিম উপাযোগের প্রসূত অকার্য-
জন্য জাহনিরত আবাসমার্গ পরিব্যাপ্ত
করিতেছে ; এবং পৃথবীর আভ্যন্তরীণ
ক্রিয়াযোগেও অকার্যজন্য প্রচুর পরিমাণে
উৎপন্ন হইতেছে ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে মানবের
প্রাণস্বরূপ অসুখজন্যবাদের ক্রমবিলোপ
দৃষ্ট হইলেও উদ্ভূত জীবনোপযোগী অকার্য-
জন্যবাদের পরিমাণ অনেকটা অব্যাহত
রহিতেছে । স্ততঃ পৰিশেষে আমরা এই
দিক্‌তে উপনীত হইতে পারি যে, অসুখ
তথ্যেত কৃষ্ণ প্রাণীজন্য অপেক্ষা উদ্ভূত
জীবনেই অসুখ অসুখ হইবে এবং এইজন্য
অসুখের পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ অধ্যায়,

প্রথম অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি করিবে । কৃতজ্ঞবদ্
বাস্তবিকতাই অবগত আছেন যে, উদ্ভূতনিচরই
পৃথিবীর আদিম আবিধানী ; মানবের
আবির্ভাব ক্রমবিকাশের ইতিহাসে অধুনাভব ।
অভিব্যক্তির চরম ফলস্বরূপ যাহার সর্বশেষে
ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছিল, বিদ্যাত্মক
নিচিহ্নবিধানে তাহারাই মহাব্যক্তির প্রথম
পথিক হইয়া সর্বপ্রায়ে কৃষ্ণ হইতে বিলুপ্ত
হইবে ।

এখন বিজ্ঞাত এই যে, অসুখজন্যবাদের
ক্রমিক অপচয় বর্ষ প্রাণীজীবনভাণ্ডার আলোক
কারণ তর তাহা হইলে মহুঘূর্ণনাথ্য কোনও
উপারে ইহার নিরাকরণ হইতে পারে কি না ?
এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ অসুখজন্যবাদের
উৎপাদনে সমর্থ হন নাই ; কিন্তু দিন দিন
বিজ্ঞানের বেগ প্রভ উন্নতি দেখা যাইতেছে,
তাহাতে আমরা কি আশা করিতে পারি না
যে, অবিকৃত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্যগণ প্রচুর পরিমাণে
অসুখজন্য বাস্তব উৎপাদনেও প্রণালী উদ্ভাবন
করিয়া অসুখ্যেব এই ধ্বংসোদ্ভূত গতি রোধ
করিতে সমর্থ হইবেন ।

শ্রীদীনবন্ধু সেন ।

মাতৃঋণ ।

(উপভাস)

প্রথম অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

মাতা-পুত্র ।

তখন শ্রীর কুরাণা ঠেলিয়া দূর্য্য
আকাশের অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে ।
একখানি ক্ষুদ্র ক্রহর আশিরা প্রকাণ্ড কুল

যাতীর কটকে লাগিল । একটি বালককে হাত
ধরিয়া এক সুন্দরী গাড়ী হইতে নামিল ।
বালকটি ঈষৎ ক্লশাক, বেশিতে বিদ্য সুদী,
পরিচ্ছদেও একটা পাতিপাটা ছিল । বরন
সাত আট বৎসরের বেনী হইবে না !

রমণীর তত্ত্বা দেহলতা বহুশূন্য কক্ষ পরিচ্ছবে ভূষিত। কঠোর লোমশ বেঠেনী ও মাথার টুপি এবং গাড়ী-খোঁড়া দেখিলে তাহাকে রীতিমত বিলাসিনী বলিয়া বুঝিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। সুন্দর কেমল মুখের চারিদিকের লোগাণী কেনের সজ্জ উড়িয়া পড়িতেছে—রমণী স্নাত্তোল বাহু দ্বারা কুন্তলগুচ্ছ জীবৎ সরাইয়া দিতেছিল। সম-প্রচুর বাস্তবর গুণ্ডর, উজ্জল নীল চন্দ্র, গতিতে একটা সুন্দর নীলা ওল, সূর্য লগাটে চিত্তার যেখাটি অবধি পড়ে নাই, অপূর্ণ সুন্দরী এই রমণী—পুত্রের হাত ধরিয়া জুগুৎবে প্রবেশ করিল।

সুন্দর অধ্যাক্ষের সহিত রমণীর কথাবার্ত্তা হইল। বালকটিকে সুলেখ বোর্ডিংএ রাখিবার সম্বন্ধে এরোজমদীর বন্দোবস্ত হইলে মোটা খাতা টানিয়া অধ্যাক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছেলেটির নাম কি?”

“জ্যাক!”

অধ্যাক্ষ কহিলেন, “জ্যাক—! পদবী?”

রমণী কহিল, “ঐ জ্যাক, শুধু জ্যাক! এর বর্ণশিল্পিতা ছিলেন ইংরাজ, তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজ করতেন! তারী বিখ্যাত লোক, নাম লর্ড পিমনক! বোধ হয় তুনে থাকবেন! খুব সম্ভবতঃ যৎ! তেমনি নাচতেও পারতেন! এই ক’ম্বড়র চকু তন্ত্রলোক সিলাপুরে মারা গেছেন! রাগায় সঙ্গে তিনি বাঘ শিকার করতে গেছিলেন! সিলাপুরের রাজা মজ রাতা, খুব বীরপুরুষ! নামটা—আহা জুগে যাচ্ছি—বেগ মনে ছিল, এই বে, —রাগা—কি,—রাগা—”

অধ্যাক্ষ কহিলেন, “কহা কবৈন, জ্যাক্ষের পদবীটা—?”

রমণী একবার বালকের মুখের দিকে চাহিল! জ্যাক্ষের চোখে ছল-ছল ক্রিান্তেছিল! ‘মা’ ছাড়া বালক কাহাকেও জানে না—মাত্র সঙ্গ মুহূর্ত্তের লজ্জ সে কখনও তাগ করে নাই! সে জানে, তাহাকে বোর্ডিংএ রাখিবার লজ্জ না জ্যাক অস্বিমাচ্ছে! বাড়ীতে কাঁদিয়া কাটিয়া মাকে সে কত মনতি ক’রয়াছে, সুলে মাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারিবে না, মাকে দেখিয়া সে একমুহূর্ত্ত বাচিনে না—কিন্তু হার, মা সে কথার কান দেয় নাই! শেষে সুলে আলিবার সময় মা আপা দিরাছেন, ছুটি হইলেই জ্যাক বাড়ী আসিবে,—মাও মধ্যে মধ্যে সুলে তাহাকে দেখিতে আসিবে—কিন্তু কাঁদিলে মা অত্যন্ত রাগ করিবে! তাই জ্যাক অনেক কষ্টে চোখের কলটুকু সামলাইয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু বুড়া অধ্যাক্ষের চোখে ধূলি দেওয়া সহজ নহে। এই সুলের কাজে তাহার মাথার বেশ গুজ্ব হইয়াছে! আরো পারি সত্তর সমাজ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। উজ্জ্বল আশোষ-বিলালের স্রোতে মরমারী গা তাসাটরা চলিয়াছে—উত্তর মধ্যে গল-মল পুঁথিরা পাওয়া যায়!

রমণীর বেশভূষা ও বাচালতা দেখিয়া বৃদ্ধের মনে কেমল একটা সংশয় জাগিত-ছিল। অধ্যাক্ষ রমণীকে নিরন্তর ঘেঁষিয়া তাহার মুখের দিকে কৌতূহল দৃষ্টিপাত করিলেন। কহিলেন, “তা হলে নামটা কি লিখব?”

বৃদ্ধের সহিত দৃষ্টি মিলিলে রমণী একান্ত সজ্জিতা হইল। তাহার গোলাপের মত গাওঁর গাড় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। নিরদৃষ্টিতে

দে কহিল, “মাগ করবেন—পরিচরটা দিতে কুলে গেছলাম।” পকেট হইতে হস্তদস্ত-নির্মিত কার্ড-কেস বাহির করিয়া তাহা হইতে একখানি হৃদয় কাণ্ড লটরা রমণী অধ্যাকের হাতে দিল। তাহাতে পরিচর ক্রম অক্ষরে লেখা ছিল,—

“ইদা দে বারগাস।”

অধ্যাক সুত হাসিয়া কহিলেন, “নাম তা-হলে জ্যাক দে বারগাস?” বস্তুর হৃদে কেমন একটা প্রজ্বর বিকল মিশানো ছিল। সঙ্কোচ কটাইয়া রমণী কহিল, “নিশ্চয়।”

অধ্যাক গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “তাই বলছি।”

কথাটা বলিয়া অধ্যাক কার্ড হতে লইয়া উঠিলেন। সন্মুখের শাশি খুলিলেন। বাহিরে গাছপালাগুলার উপর ভয়ন হৃদয়ের রশ্মি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শাশির পশ্চাতে একজন তরুণ শিকক আসিয়া সেখা দিল।

অধ্যাক কহিলেন, “ব্রুকে, এই ছেলেটিকে একবার ওখানে নিয়ে যাও—চারিখার দেখিয়ে আনো।”

জ্যাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, মাতার সঙ্গ ত্যাগ করাইবার ক্ষমতা এ একটা ছল মাত্র। হস্তান্তরভাবে সে মাতা স্মৃতির পানে চাহিল—তাহার চোখ কাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল।

অধ্যাক বুঝিলেন, মিষ্টবরে কহিলেন, “যাও জ্যাক, তবু কি? তোমার মাতা এখনই যাক্কেন না—যুগে এস—ইনি এখানেই এখন আছেন।”

জ্যাক তবু নড়িতে চাহিল না—মাতা পানে চাহিয়া মার নিকটে সে সরিয়া আসিল। মা

বলিল, “যাও—জ্যাক, ছিঃ, লম্বী ছেলে, তুমি যে।”

কোন কথা না বলিয়া জ্যাক শিককের সহিত চলিয়া গেল। জ্যাক চলিয়া যাইলে কক্ষমধ্যে কাহারও স্মৃতি অনেকদূর কথা কুটিল না। বাহিরে ছাত্রের দল বেলা করিতে-ছিল। তাহাদের উল্লাস-চীৎকার কক্ষমধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল—দুই একটা পানী ডাকিতেছিল, ঘুরে কে কাঠ কাটিতেছিল, সেই শব্দ এবং পিরামেদর স্বাক্ষর সমস্ত মিলিয়া এক হৃদয় মিশ্র রাগিণীর সঙ্গার করিয়াছিল। এই শব্দের পরমাকতার সুসুখ মলিন কক্ষ দিন-গুলার মধ্যে ব্যস্ত জীবনের একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছিল।

অধ্যাক প্রবেশেই কথা কহিলেন—জ্যাকের শব্দ মধুর ভাবে তাঁহার হৃদয়ে মারা পড়িয়া-ছিল—তিনি কহিলেন, “ছেলেটি আপনাকে বড় ভালবাসে।”

মাগাম বারগাসের ঘেন চমক ভাবিল, কহিল, “তা আর হবে না! এত বড় পুণ্ড্রীতে মা ছাড়া গুর কেউ নেই। আহা, বেচারা জ্যাক।”

“আপনি বিধবা?”

“হী মমার। আমার স্বামী দশ বৎসর হল মারা গেছেন। সে কি ভয়ঙ্কর সৃষ্টি।” মাতা উপভাস লেখেন তাঁয়া করনার চোখে কত দুঃখ-বয়না দেখেন—কিন্তু তাঁয়া আসেন না, আসাঘের এই সাধা-সিধা জীবনে কি সব অসহ দুঃখ-বয়না ভোগ করতে হয়, তা থেকে তাঁদের মশখানা উপভাসের খোঁজাক ভোগান বেঁচে পারে। আমার নিজের জীবনই তার এক কি জীবন পরিচয়। আমার

স্বামী কাউও দে বার্মাসি তুঁরের এক কণ্ড বড়
বাপের—”

অধাক চমকিয়া উঠিলেন! কাউও দে
বার্মাসি! আশ্চর্য! অসম্ভব! তীতায় সংসার
পড়িল—মনের ভাব চাপিয়া তিনি কহিলেন,
“তবে এই আর বললেই ছেলেটিকে ফুলে
দিয়েছেন কেন? এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ,
তা ছাড়া আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারে
না সে। এ বিচ্ছেদ ওর লক্ষ হবে কি?”

রমণী কহিল, “আপনি ভুল কচ্ছেন, মশায়!
কাক এ দিকে ভেমন অবস্থ নহ! তা ছাড়া
ওর শরীর ভাল, অস্থ-বিস্থ নাই বললেই
হয়! একটু রোগা—তা এ পারি সচরের
বন্ধ বায়ুতে সেটা শোধরান অসম্ভব!”

অধাক কহিলেন, “আরো তা ছাড়া আমাদের
বোজি এ এখন এক ছেলে রয়েছে যে, নতুন
ছেলে নেওয়া সম্ভব নয়! আর বছর দুবিধা
হতে পারে—কিছু তার জন্তও আমি এখন
থেকে কথা দিয়ে রাখতে পারি না অবশ্য!”

রমণী ইঙ্গিতটি অল্প বুঝিল। কহিল,
“তা হলে আমার ছেলেকে আপনারা রাখবেন
না! তার কারণ শুনতে পারি কি?”

অধাক বাহরের দিকে একবার চাহিলেন
—পরে স্থির অকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,
“দেখুন, কারণটা না বললেই তথ্য হত—তবু
বখন শুনতে চাচ্ছেন, তখন বলতে পারি,
কিছু না শুনলেই ভাল হয়, কারণ শুনলে
আপনি কষ্ট পাবেন ছাড়া—”

রমণীর মুখ কোঁড়ে যোবে লাল হইয়া
উঠিল! অধাকের মুখের দিকে সতেজে সে
চাহিল। অধাক বলিতে লাগিলেন,—কথা-
গুলো শুনিয়া রমণী একান্ত কাতর হইয়া

পড়িল—লক্ষ্যের দৃষ্টিতে সে কাহিয়া ফেলিল!
হতভাগিনী! সত্যই দে হতভাগিনী! কেহ
জানে না, এই হতভাগা পুত্রের জন্ত সে কি
হুংসই না লক্ষ করিয়াছে!

হাঁ, সত্য! এ কথা খুবই সত্য! সত্যই
বালকের কোন পদখী নাট! পিতা নাট,—
ছিল না! কিন্তু এ কি তাহার পাপ?
পিতামাতার পাপের তার মাথায় বহিরা—
সারা জীবন তাহাদের পাপের প্রারম্ভিত
করিয়া যাইবে, সে এমনই হতভাগা! রমণী
কাহিয়া কহিল, “মশায়, দয়া করুন—
বেচারাকে একটু দয়া করুন! নিষ্ঠুর হবেন
না!” সে স্বরে কি সত্যের নিরাশা, কি
মর্মভেদী অশ্রুতাপ!

অধাক ব্যথিত চিত্তে কহিলেন, “শান্ত
হন আপনি!”

কিন্তু কথাটা চাপা দিবার নহে!
অধাক জানিতেন, তুঁরের এই এসিক জাটোন
বংশ কি কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত! সে এক
শুণ্ডীর পাপের দীর্ঘ ইতিহাস! দে বার্মাসি
পরিবারের প্রতিবেশী এই অধাকের সব কথা
আজ নতুন করিয়া মনে পড়িয়াছিল! তিনি
উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া
উঠিতেছিলেন!

রমণীকে সাহসনা দিবারও কোন কথা
নাই! তবু তিনি কহিলেন, “এ পাপের
একমাত্র প্রারম্ভিত আছে! আপনি সন্তানের
মাতা—গৃহটিকে পবিত্র করুন—জীবনে এ সমস্ত
পড়িলতা ভাগ করুন নতুন বাহু হতে চেষ্টা
করুন—এ ছাড়া আর কি উপায় আছে?
কিছু না! কিছু না! ছেলেকে বাহু
করুন!”

কমলে চোখের জল মুছিয়া রমণী কহিল,
“আমার জীবনের ঐচ্ছ্য চাই, মণায়! জ্যাক
এখন বড় চরম্বে—যেহারা এ সব কিছু
হানে না, তাই আমি ওকে দূরে রাখতে
চাই! আপনাদের সঙ্গে পেকে, আপনাদের
কাছে শিক্ষা শেষে ও মাহুত হয়, এই আমার
ইচ্ছা! আজ আপনারা যদি ওকে স্থান না
দেন, নানা ছলে ভাঙিয়ে দেন, তবে কোথায়
ওর স্থান—কোথায় ওর মাহুত হবার
সম্ভাবনা থাকে?”

জ্যাক সে কথাটাও ভাবিয়া দেখিয়া-
ছিলেন! হতভাগা বালক! সে কি অপরাধ
করিয়াছে যে, বিকচোদ্ধ পুষ্পের মত অমল
ভ্রম তাহার এই নবীন জীবন বিধাতার এই
অমূল্য দান অন্যদের অবজ্ঞায় ধ্বংস হুটাইবে!

তিনি কহিলেন, “মারি ছেলেটিকে নিতে
রাজী আছি, কিন্তু দুটি সন্ত আছে!”

আশার উৎফুল্ল রমণী কহিল, “কি,
বলুন?”

“প্রথম, বর্তমান আপনার জীবনের গতি
না শোধরায়, ততদিন জ্যাক আপনার বাড়ীতে
যেতে পারে না—ছুটির সময়ও সে এখানে
আমাদের সঙ্গে থাকবে।”

“কিন্তু আমাকে না দেখে ও যে মরে
যাবে! আহা জ্যাক—ও যে আমাকে ভেঁকে
কখনো কোথাও থাকেনি—এই প্রথম—”

“আপনি এখানে থাকে থাকে এসে দেখে
যেতে পারেন—কিন্তু আমার ঘরে আমার
সামনে ও সব দেখে করতে হবে—অন্ত
কোন ঘরে নয়, আর কারো সামনে নয়।”

রমণী শিরিষা উঠিল! এখন ছুটির
সময় অপর শিতা-মাতা আসিয়া পূজাপণ্ডকে

আদর করিবে, তাহাঙ্গিরের সহিত কত কথা
কহিবে—সে তখন আসিতে পাইবে না—
আপনার ঐশ্বর্য দেখাইয়া অপরের সর্বা উদ্বেক
করিবে না! জ্যাকই বা কি মনে করিবে?
কি সে লজ্জা—আক সে অপমান! ইদা সকল
কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সারা পারির
সম্প্রদ নন্দনারীর চিতে আপনার ঐশ্বর্যের
জাকজমক দেখাইয়া যে ঐশ্বর্য আগাইতে
পারিবে না—এ দুঃখ একান্ত অসহ!

রমণী কহিল, “এ যে বড় নিষ্ঠুর সন্ত!
এ আমি কি করে সহ্য করব—বিশেষতঃ
নাহী আমি, মা আমি! আমার ছেলেই বা
কি মনে করবে?”

সেই সময় খোলা দ্বারের পশ্চাতে পুত্রকে
দেখিয়া ইদা চুপ করিল; পুত্রকে ককে আসিতে
ইচ্ছিত করিল। জ্যাক নিকটে আসিল।
হাসিয়া মার অঙ্ক ঘেঁষিয়া সে কহিল, “বাঃ,
তুমি এখনো আছে, মা! ওরা বলছিল তবু
কিন্তু আমি মনে করেছিলুম তুমি চলে
গেছ!”

জ্যাকের ছোট হাতখানি আপনার হাতের
মধ্যে ঢাপিয়া ধরিয়া পুত্রের অধরে চুষন
করিয়া ইদা কহিল, “না বাবা—চল
আমরা বাড়ী বাই।” এঁরা আমাদের এখানে
রাখিবেন না।” কথাটা বলিয়া পুত্রের হাত
ধরিয়া ইদা বাহিরে চলিয়া গেল! পিঙ্গলের
পানীকে বুক করিয়া দিলে সে যেমন আনন্দে
উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, মার সব ভাগ করিয়া
এই দেহহীন পক্ষ্য কঠিন স্কলপুঃ থাকিতে
হইবে না জানিয়া জ্যাকের মূত্র হননধানি
তেননই আনন্দে ভরিয়া উঠিল! এত আনন্দের
মধ্যেও জ্যাক এখন জীবৎ নির কঠে কহিলেন,

“জাহা, বেচারা ছেলেটি,” তখন জ্যাকের
বুক কাঁপিয়া উঠিল !

বেচারা ! সে বেচারা ! কেন ?

কপাটা তাহার অস্তরের মায়গানে একটা
দীর্ঘ কানীর রেখা গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া
ছিল !

অব্যাক ঠিকই বুঝিয়াছিলেন !

এট মাদাম দে কাউস্তেল দে বার্গাঁসি
সত্যি এক ছদ্ম নাম ! এট রমণী মাদাম
বার্গাঁসি নহে—ইদাও তাহার প্রকৃত
নাম নয় ! কে তবে এট রমণী ? কি গভীর
রহস্যের জাল এট রমণীর চারিদিকে বিস্তারিত
রহিয়াছে ! কেহ তাহার পরিচয় জানে
না । বিনাগিনী চরিত্রহীন। এট রমণীর
হৃদয়ে অতীত রহস্যের এ পর্য্যন্ত কেহ
কোনরূপ একটা মীমাংসা করিতে পারে
নাই ! এক একটা লক্ষ্যবস্তুর উদ্দেশ্যে গমন
অন্তকারের মধ্যে সহসা দীপ্ত ঐচ্ছল্যে
অনিয়া পৃথিবীর অগ্নে ঝরিয়া পড়ে, এ যেন
তাঁহাদেরই মত সহসা পারি সহরের বুকের
মধ্যে কোথা হঠাৎ ঠিকরাইয়া আসিয়া
পড়িয়াছে !

গাড়ীতে যাত্রাপথে অনেককাল কোন
কথা হইল না ! সহসা জ্যাক ডাকিল,
“মা !”

ইদা কহিল, “কেন, জ্যাক ?”

“কথা কছনা কেন, তুমি ?”

ইদা কহিল, “জ্যাক, জ্যাক, তোরা গুজ
আমার কি কষ্ট, তা তুমি জানিস্ না ! যেদিন
থেকে তুমি এসেছিস্, সেদিন থেকে কি যাতনা
পাচ্ছি আমি—” ইদা দীর্ঘ নিশ্বাস
ফেলিল ! জ্যাকের মুখে বিদ্যাবের কালো

ছায়া পড়িল—সে মুখ তুলিয়া কহিল,
ত কিছু করিনি, মা !”

জগতে জ্যাক শুধু এক জনকে জানে,
এক জনকে ভালবাসে—সে এক জন আর
কেহই নহে, তাহার মা ! সেট মার মনে সে
যায়া দিখাচ্ছে ! জ্যাকের মুখ দেখে কাটিয়া
যাচ্ছেছিল—সে হুঁশাওয়া কাঁদিয়া উঠিল !
মাতার প্রাণ এ মুখে বির রহিল না ।
ইদা বলিল, “হিঃ, তুমি ছেলের মত কীকে
কি ? আমি তোমার কেনাচ্ছলাম যে ! হিঃ,
চুপ কর—সোনা আমার, লক্ষী আমার !
তোমাকে গেছে আমি লক্ষ্য হুগে আছি ! আর
কে আমার কাছে কাক ? আমায়ই দেখ—
তুমি কিছু জানো না—হুগের মত লক্ষ্য
পরিজ তুমি !”

জ্যাককে বুকের মধ্যে টানিয়া ইদা
বার বার তাহার মুখ চুসন করিতে লাগিল ।
অত্যধিক আগের জ্যাকের সকল কষ্ট, সকল
গুণ, নিমেষে অসুস্ত হইয়া গেল ! জ্যাক
হার বুকে মুখ ঘাষিয়া আনন্দ-গল্পন করে
ডাকিল, “মা—মা !”

গাড়ী আসিয়া বাটার দ্বারে লাগিল ।
দাদী কঁঠা ছুটিয়া আসিল । জ্যাককে দেখিয়াই
সে ভীতবরে কহিল, “একি তুমি কিরে
এলেছ ! তাহী তুমি হুগ, তুমি ! পাঁচরালা
বিরে তোমাকে ফুলে পাঠাতে হুগে । আর
মাও ত কিছু বলবে না, খালি আদর দেবে” ।

ইদা কহিল, “না, না কঁঠা, ওগ বোম
নেই ! তাহা ওকে মিলে না, বুকে পাচ্ছি
কথাটা ! এতদূর অপমান করতে পার্ছি হুগ
তাদের !”

ইদার চোখ জলে ঝরিয়া আসিল ।

সে মনে মনে ভাবিল, “যদি কি অপরাধ
করেছি, ভগবান, যে এত হৃৎ-
দিক্ত !”

কীৰ্ত্তা জ্যাককে বুকের কভে টানিয়া কহিল,
“ওঃ—কুলে নিলে না, তাতে কি ? আবার কুল
ও আছে ! মাঝরা দেপনা, একবার ! এই
ডিক বলছিল, ও আগে যেখানে কাজ করত,
সেদিন সেখান কারমনিবদের ভেলে একটা
কুলে পড়ে,—খাসা কুল, মাটিনাও কম
নেহ ! সেট কুলের খোঁজ মিছি আমি,
পাঁড়াও ত !”

ইদা বলিল, “সে দেখা যাবে, কাল ভেবে !
এখন খাবার বাও, জ্যাকের খিদে পেয়েছে ;
অনেকক্ষণ খারনি, আঠা, সুখখানি শুকিয়ে
গেছে । জ্যাক !”

“না” বলিয়া জ্যাক মার নিকট আসিল ।
মা জ্যাকের মুখে চুপন কথিয়া খাবার ডাকিল,
“জ্যাক !”

“কেন, মা ?”

“জ্যাক ! খাশা—”

ইদা দুই হাতে জ্যাককে বুকের মধ্যে
চাপিয়া ধরিল, তাহার মুখে কথা ফুটিল না !
সে ভাবিতেছিল, পাণ কি এমনই শুকন্তর যে
উজগতে তাহার প্রাণশক্তি নাই ! আর এই
সুন্দর অবোধ বালক, সে কেন অপরের ভক্ত
কষ্টে পায় ! সে ত নির্দোষ, অকলঙ্ক, তবু এমনই
মাঝবের বিচার, এমনই তাহার জ্বরের ভৌল-
দত্ত ! জ্যাক মার বেহের উপর তর দিরাঙিল
—সে অত্যন্ত রুস্ত হঠকা পড়িয়াছিল— অর
ভলাও আসিতেছিল, তজ্জর ঘোরে সে খপ
দেখিল, মিঠে লাভ ববে কে বলিতেছে,
“আমি বেচোবা—বেচোবা ভেলেগি !”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

নূতন পূজ ।

পারি সচরের এক গ্রামে কতকগুলি জীর্ণ
গাটীন অট্টালিকার পশ্চাতে একটা সড় গলি
দাঁকিয়া গিয়াছে । সেট গলির মধ্যে ফুটিবগুলিতে
ফুল, সহিস, কখ্যাবেদী ভুতা সস্ত্রনার, দরজী
ও শ্রমজীবীগণের বাস । সকালে সন্ধ্যার সূত্রী
কনাকার বালকগুলার খেলায় বাপটে তত্ব-
লোকের পক্ষে সে পথে চলি যায় হইয়া উঠে ।
বড় গাড়ী সে গলির পথে চলিতে পারে না,
এবং এ পথে আসিবার প্রয়োজনও কখনো
ঘটিয়া উঠে না ।

এমনই গলির মধ্যে ‘মহোত্তা’ জিমনেল’
ফুলগৃহ । বাটীটি যেমন জীর্ণ, অধিবাসীগণের
জীবনেও তেমনই একটা বিকট জীর্ণতা
বিদ্যমান করিত । প্রত্যহ সকালে এবং
সন্ধ্যায় যখন নানাবেশধারী জীর্ণকার সূত্বে
বালকের দল তাড়াইয়া ফুলের অধাক গৃহে
কিরিতেন, তখন তাঁহাদের চালচলনে দর্পের
যথেষ্ট আধরণ থাকিলেও ভিতরকার দৈন্ত-
চুহু কিছুতে ঢাকা পড়িত না । কিন্তু পরীর
মধ্যে সে দৈন্ত বৃদ্ধিবার লোক ছিল না, ইহাই
ছিল হুয়ের কথা ! মাঝাম বাঁসি যদি
স্বয়ং আসিয়া এ ফুলগৃহে প্রত্যক্ষ করিত, তাহা
হইলে বেচোবা জ্যাক এই অন্ধকার গলির
কখনও নিকট হইত না ! কিন্তু জ্যাককে
লইয়া ইদা এখানে আসে নাই, জ্যাকের সঙ্গে
আসিয়াছিল, দানী কীৰ্ত্তা !

বহির্বাণ ভিতর হইতে কড় ছিল ! সহসা
দিরা গিগ্রহে সে ঘরে কখ্যাবেদীর শব্দ শুনিয়া
অধাক মহোত্তা বিম্বিত হইয়া গেল ! সে যেন
উদ্ভ্রান্ত হইল ! এ কি খপ ! কিন্তু না, ঐ

বেচারে অগাধ ক্রোধে ক্রোধিত করে। চাির গোছা লইয়া মরোত্তী ক্ষত ধায়ে অতিশূণ্যে চলিল ।

হার মুক্ত হইলে কীর্তী ও জ্যাক তিতরে প্রবেশ করিল ।

মদীতে জোয়ার আসিলে তিতরকার তল ঘেমন সোতের বেগে ফুঁলিয়া ফুঁলিয়া উঠে সারা গু গু হইতেমনই একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিরা গেল । “ডুটিং ক্রমে আসুন আনো” মনে দক গু-গু কানিয়া উঠিল । জ্যাক ও কীর্তীকে মরোত্তী ডুটিং ক্রমে

আনিয়া বসাইল ! একটি কুকুর্বা কান্দি বালক আনিয়া আশ্রম আনিয়া নিল ।

দেখিতে দেখিতে তিত্ত জমিয়া গেল । ২৫ দিন পরে কীর্বা গুহের সংস্কার হইলে চৌধুরা ঘেমন একটা মৃতন শ্রীতে উচ্ছল হইয়া উঠে, সকলের মুখে তেমনই একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিল ।

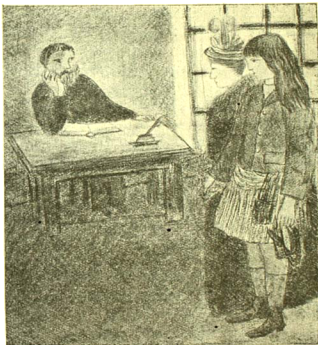
কীর্বা দ্বিতীয় মরোত্তী কথাবার্তা অব্যক্ত হইল ! “জিমনেজ্, মরোত্তী” নাম শুনিয়া ছেলেটি ব্যাকান্তে মাড়ব কর, এই ক্রমসম জ্যাককে মরোত্তী তথ্যবাহানে রাখিবার চেষ্টা তাহার আগমন হইয়াছে !

মাদাম মরোত্তী অধ্যাতিক আত্মীয়তা দেখাইবার লোভে বলিয়া উঠিল, “ছেলেটির চোখটি ঠিক মরি মত হয়েছে ।”

জ্যাক একটা তিত্তরকার-পূর্ণ দৃষ্টি মাদামের মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, “না, ও আমার মা নয়—ও কী !”

মাদাম মরোত্তী নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া, একটু স্তব্ধা গেল ।

তখন দরদস্তব চলিল । মরোত্তী কহিল, “এখানে বেশী ছেলে নেওয়া হয় না । সংখ্যা বাড়িলে জীবন হয় না—নিষ্কার



ইদা কহিল, “চল, আমার বাড়ী বাই ।” (১০ পৃঃ)

ব্যাসাত্তর। এখানে মন ও শরীর দুইইই
লিখা দেওয়া হয়। সে কত দণ্ডের কম
নেওয়া কঠিন—বহুরে একশ' ছাঁড় পাঁচ
মিটে হয়,—তা ছাড়া কামড়-চোপড় যা
লাগে।”

তার পর স্থানের অপূর্ণ পটচিত্র দেওয়া
হইল। উজ্জ্বল চব্বত এবং আবহ-তান্দ্রা
লিখাটবার ভিত্তি এমন স্থল আর চুইটি নাই।
আর দেওয়ান, ছাত্তোয়া স্থল গুলিকে বাড়ীর
মতই মনে করে। মরোভাঁ কাহল, “এক
রাজপুত্র এখানে পড়ছে।”

চক্ষু বিস্মিত করিয়া কত্ৰাঁ কহিল,
“রাজপুত্র?”

মরোভাঁ কহিল, “হাঁ, রাজপুত্র। যুথল
জ্যাক, রাজার ছেলের সঙ্গে কুমি পড়েন
এখানে। দাহমির রাজপুত্র। মাহ্ যখন সে
ছাত্তোর রাজা হবে, তখন এখানকার শিকার
জন্ত চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।”

কথটো শুনিয়া জ্যাক একটু আনন্দিত
হইল। রাজপুত্র। আর কাছে সে কত শরীর
গর, রাজপুত্রের গর শুনিরছে। রাজপুত্রকে
দেখিবার মত তার কত টঙ্কা হইয়াছে, কিম্ব
কখনও দেখা মিলে নাই, এখানে গেই
রাজপুত্রের সঁহে সে একজ পাড়বে। না
জানি, কোন্ পল্লীকর্তাবাস্তব মরম মেঘের
স্থলবিরিঞ্চল ধারণ অতিবক্ত এই রাজ-
পুত্রের মনটুকু।

কত্ৰাঁ বাগল, “তা মনেও মনে, একটি
ছোট ছেলের কত বছরে এত পাঁচত?”

মরোভাঁ বাধা বিধা বলিল, “তার মত
ভাড়া কি? বছরে দু খেপে মিলেই হবে।”

কিন্তু তাতা বখাধ হইল।

সমস্ত বাটটি এক করণ লুবে সাভাষা
প্রার্থনা করিতেছিল। তার তেঁবন-চোঁক, জাঁপ
বেগাল, ছির, মালন কাপেট, মরোভাঁর
মারাত্মক বিদ্রি পোষাক, অর্ধপূর্ণ প্লেট,
মাকণ চুপে আগ্রহ মাগিতেছিল। এ বৈশা
বুটবার উপায়ও ছিল না। যেমন কঠিন
হটক, যেখানে হাটে হটক, চাই, চাই,
সাধাষা চাট, ভিকা চাই।

এই ভাণ্ড গুল, শিককগণের দ্বীন মলিন
বেগ, চারিদিকে এই বিধম লরানন্দ তাব
মোঁরো ভাংকের আশ আভে লিহাট
উঠিতেছিল। তারার বারবার মনে পড়িতেছিল,
সেই স্থলবাড়ার কথা—যেখানে মায় সঁহে
দে বিন পে গগাছিল। শিককগণের অন্তর
এতর মূল, মূলর লাজত বাড়িখানি, মলী-
ছাত্রগণের মুক্ত বন্ধ মানন্দকোলাহল, দে
কি মধুর! সে কেন সেখানে রহিল না?

মরোভাঁ তখন ধোঁবানো মোটা পাতা লইয়া
লিখিতেছিল। কত্ৰাঁ পার্শ্বে বসিয়া মাঝে
মাঝে জ্যাকের দিকে চাহিতেছিল। মারাম
মরোভাঁ কত্ৰাঁর কথা শুনিতে শুনিতে
বলতছিল, “মাহা যেচোরা, যেচোরা
ছেলেটি।”

“বেচোরা ছেলেটি।” ইহাভাও বলে, সেই
কথা। সে কি করিয়াছে যে, শূণ্যায় সকল
প্রার্থীর নিমিত্ত সে এত কত্ৰাঁই হইয়া
পাড়রাছে। এ অঘাচেত করণা, এ অসাহিত
সহায়ত্ব জ্যাক চাহে নাত। তবু কেন এ
বিড়ম্বনা?

কত্ৰাঁ পকেট চুইতে নোটের ভাড়া
বাঁহির করিয়া মরোভাঁর হাতে দিল। চারিদিকে
শিককগণের চক্ষু হঠাৎ একটা আগ্রহের

অদীর দৃষ্টি মোড়লগত উপর যেন
কঁপাটরা পড়ল। কঁপাটর সহিত 'লক্ষ-
গণের পরে আগল চটল। অ'চর্য্য লাবা-
জাদু সজীত-লক্ষক! ডাটার চাহু-
সজীত এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপক,—যুগধান।
কুকুকের মত ধীরে, কৃষ্ণী ক্ষুদ্র চকু চপমার
আনকণে মজিত, শীর্ণ দেহ। আর্জের
ফ্রান্সের চেষ্টে ক'পি, 'নিচু'র শিকারের গ্রন্থ
করিয়াছেন—সাহিত্যের অধ্যাপক।

দলের মধ্যে ঘ'র কেন্দ্রে কেন্দ্র ক্ষুদ্র
থাকে, তবে সে ঠট আর্জের! কিছু টোকে
মোথকা জ্যাকের বুক যেন ঝাঁপিয়া উঠল।
আর্জের চোখের দ্বিতীয় যেন হিংসার একটা
ভরল প্রবাহ বহির্ভেদে,—চা'র মনে হটল,
যেন একোন্স ভাবন লক্ষ্য লক্ষ্যে সে আসন্ন
পড়িগাছে!

হার! জীবনের কত দুর্দিনে তাহার
এই আর্জের চোখের বিবেচনা হটে
হটে—ক্ষুদ্র ভবিষ্যৎ যেন একটি বিদ্য-
চমকের মত জ্যাকের সমস্ত অস্তর চি'রগা
ছুটিয়া বহিয়া গেল!

জীবনের মনের বাতাসের বসিগা করিয়া
কল্পনা করেন, কিন্তু আর্জের ঠট কত
বাতাসের অস্তরালে জ্বর মাধব পরে তা
কোন'লভনই পাওয়া যায় না!

মহোত্তী জ্যাকের গুঠে গাত রাশিয়া
জাকিলেও, "জাকিলে এসো, জাক!"

কঁপাট যাটবার কত উঠিয়া ঝাড়াইল।
জ্যাক উঠিতে দেখিয়া জ্যাকের চক্ষু
জলে ভরিয়া আসিল! কঁপাট প্রতি জ্যাকের
একটুকু অস্তরালে 'ভল মা, কিছু তবু জ্যাকের
মনে হইতেছিল, কঁপাট। যাটী যাইবে,—দেই

বাড়ী,—যেখানে তাহার মা আছে, কত
আবহ বেতের সম্ভার লটকা মা বসিগা আছে,
কঁপাট দেই মা'র কাছে। কঁপাট যাইবে—
কিন্তু মা'র কাছে যাটবার তাহার আজ
কোন উপায় নাই! সে বেহা'তরা ভবনের ঘর
তাহার সম্মুখে আজ কত! সে আনন্দ
উল্লসের সহিত জ্যাকের দল সন্দর্ভ
ফুটিগাছে! সে ঘ'র জ্যাক না হটগা
হটল! আগে। এখানে মিষ্ট কথা বলিতে
কেন্দ্র মাই. অদ'র কর্তে কেন্দ্র মাই!
বিদ্যাকের অগ্রগত অগ্রগত মুখ এখানে!
ভালবাসা মাই, ব্রহ্ম মাই!

জ্যাক কঁপাটের হাত ধরিয়া বলিল,
"কঁপাট, মাকে আসতে গেলো"—

"তা বগলো—মা আসবেন, কিন্তু তাই
বলে চুপি কৌদান, জ্যাক!"

জ্যাকের চোখে বাণ ডাকিগাছিল—কিন্তু
এতগুলি লোক বাগ্নভাবে জ্যাকের বিকে
'চা'রগা আছে—টো ম'গর বিজ্ঞান ও হীম
কৌতুকের মধ্যে আপনাকে নিবেশ করিবে,
এ কথা মনে হটেই সে আ'নাকে
সামলাটরা লটল। কঁপাট চুপিগা গেল।

বাটারে তখন অবিশ্রাম জুয়ার বর্ষণ
হটেছিল।

মহোত্তী আইন পাল করিয়াছিল। নিহা
সে আগলিতে যাটত, কিন্তু মজলের সহিত
জ্যাকের কখনও সংক'ত লাভ ঘটগা
উঠিত না! একদিন সহসা এক ম'জল
আ'সন্ন মহোত্তী'র নিকট আ'জলমর্ষণ
করিল। প্রাণগণে পরিভ্রম ক'রগা কাগজপত্র
ও বস্তুগা ঠিক করিয়া জাকিলের সম্মুখে
উঠিয়া সে যখন বস্তুগা আরম্ভ করিল, তখন

হাকিম ও সচিবোক্তি উক্তেরা ছিলেন। অতীত-
পূর্ণ কৌতুকে হাস্য। এমনই প্রবৃত্তি
পড়িয়াছিল যে, পরদিন ইষ্টে আদালতের
কৃষি সম্পন্ন করিতে বেচারী মরোভার সাহসে
ফলাই নাই। তার পর সে সহসা একদিন
সাংবাদিক হইয়া উঠিল। কিন্তু পারিত
সাংবাদ্যসেবা দ্বারা নাম বা অর্থ উপার্জন
করা নিত্যস্থায়ী কঠিন বিষয়। সে ১২ ও ১৩
বছরে বেচারী ভাগ্য করিল। তখন একটা
ছোট ফুল শিককড়া ছুটিল।

একদিন সে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের তিন
জরীর পরিচালিত এক ফুল আদালত
শিককড়ার তার গ্রহণ করিল এবং কান্টন-
মেন্টে পড়িয়া তাৎকালে বিবাহ করিল।
বিবাহের পর অপর দুইটি ভ্রাতা ফুলের
সম্পর্ক ভাগ করিলে মরোভার ও আদালত
মরোভারই ফুলের সম্বন্ধিকার প্রাপ্ত হইল।
ফুলের নাম হইল, জিমেনেজ্ মরোভার।
ক্রমে তাহার জীব দেওয়ানে বড় ক্রিয়াইতা,
বিজ্ঞাপনের কথক লাগাইতা ফুলের উন্নতি
সাধনে মনোনিবেশ করিল। মরোভার

কয়েকটি পুস্তক রচিত হইল — কনি বৈজ্ঞানিকের
দল আদালত বোর্ডের। আদালতের, মরোভার,
অতীত দেবের ছাত্র। বিজ্ঞাপনের মধ্যে
ফুলেরা জিমেনেজ্ আদালত লাগিল। কিন্তু
জিমেনেজ্‌র পরিচয় যখন একটু প্রসারিত
হইল, তখন ছাত্রের দল আদালত কমে
লাগিল। কথিত। শেষে আদালত আদালত
দেখাইল। এই আদালত ছাত্র লইয়া ফুল যখন
আব চলেতে চাহে না, এমনই হৃদয়ে
আদালত দেখাইয়া ফুল দল যখন দল
করিল।

মরোভার কহিল, "নূতন ফুলের বাড়িতে
কত ছুটি! তাহে কোথায়?" কথকাল ও
অন্যদিকের সত্য সত্যে নূতন ছাত্রের
কত কার্যনা করিল।

সে তাহে আদালতের দ্বিধা ঠিকানা ও
আদালতের আদালত ফুল ফুলে যে আদালত
বিজ্ঞাপিত হইয়া উঠিল, তাহার সম্পর্কে বহুদিন
সকল বৈজ্ঞানিক কালিয়া নিমেষে স্বাক্ষর গেল।
জিমেনেজ্-বাসী বহুদিন এমন আদালত, এমন
আদালতের দল পাও নাই। (ক্রমঃ)

ঈশ্বরী স্রোতঃন সুখোপাধায়।

ভারত ও বিলাত ।

(বিলাত-প্রবাসীর পত্র ।)

১৮। সভ্যতা ও অসভ্যতা ।

বর্তমান না যাবৎ সভ্যতার একটা সার্ব-
ভৌমিক উন্নতি হইতেছে, তখন
আমরা কিছুতেই সভ্যতা বা অসভ্যতার
একটা সঠিক মাপকাটি দিবার করিতে

পারিব না। কারণ; আজ পর্যন্ত প্রায়
সবই সভ্যতা বলিতে প্রত্যেক কালি বা
সভ্যত আপনাদের বিশেষ সাধনা, বিশেষ
শিল্পকলা, বিশেষ রীতি রীতি, এ সকলই
বুঝা থাকেন। বিলাতী সভ্যতা বলিতে

বিলাতে। কিন্তু যে সাধনাটুকু তাই সকলে বুঝিয়া থাকেন; আর ১৭৭৫র নোকেরা যখন অপর কোনো দেশের নোকাগকে অসভ্য বা বর্জিত বলিয়া থাকেন, তখন তাঁরা এই নিম্নলিখিত বিশেষ সাধনাটুকুর দ্বারা এই সকল দেশের নোকের সাধনাদির ওজন করেন। ইংরেজ যখন আমানগকে অসভ্য বা অর্ধসভ্য বলেন না তাহেব, তখন মুসলমান কেবল এই মাত্র সম্মান কাম্য থাকেন যে আমরা ইংরেজ মতি। যুগোপ যখন আমানকে অসভ্য বলে, তখনো কেবল আমরা যে যুগোপ নয়, যুগোপের মত চলে যলে না, কেবল টোকাই প্রমাণ করে। তাই যখনই আমরা ইংরেজের মত চলেতে বলিতে আরম্ভ করি, খুঁত চাকর ছাড়িয়া যেন আমরা কোট পাটালুন পরিতে আরম্ভ করি, আপন মানুষ দূর করিয়া যখন কোট কেন্দ্রা ব্যবহার করিতে পারি, ইংরেজের মত টেবিলে বসিয়া কাটা চামচ ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করি,—নিকোলা সাবের লাভ, মেয়েদের বিবি সাজাই—তখনই ইংরেজ আমাদের সভ্যতার দাবীটা সম্পূর্ণরূপে মাড়ুক, অস্ত্রঃ কিংবা পরমাণে আমরা লইতে রাজ হই। জাপান এখনই সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে না। আর সে বেশি দিনেও কা নাহ। কিন্তু আম যুগোপের নোকেরা জাপানকে আপনাদের সভ্যসমাজভুক্ত করিয়া লইতেছে। হঠাৎ কারণ এই যে জাপান আমের চলে-চলন, ধরণ-ধরণে, পোষাক-পাওজর অনেকটা যুগোপের মত করিয়া তুলিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে আমেরা তথা উত্তীরাছিল যে জাপান সমাজতানে খুবই স্বত্বকে

আপনার রাষ্ট্রদূত বা টেট রিপলডান State Representative কারোকে না। এ সমস্তের মীমাংসাও মনুষ্য করিয়াছিল। মন পনেরো বছর পূর্বে জাপানের মেতুবন যুদ্ধের দিকে একান্তভাবেই মুক্তি পড়িয়াছিল, এমনো শোনা যায়। সে তাহাটা অনেক পরিমাণে বোধ হয় কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু আপনাদের যুগোপের জাপান যে যুগোপের মত অস্ত্রের প্রভু হইয়াছে, আপনাদের সভ্যতার দাবীটা পাকোয়া তুলিয়াছে, হঠাৎ অসভ্যতার করা যায় না। জাপান যদিও নিজে একদিন সভ্যতার ক, ম, লিখিয়াছিল, যারা জাপানকে ধরানিয়াছে, কয় দিয়াছে, নোত দিয়াছে, নোত দিয়াছে, তাহা দিয়াছে, লোপ দিয়াছে, তাহের সভ্যতার দাবী যে যুগোপ ও আমেরিকা কিছুতেই মানিতে চান নহে, সেই যুগোপ ও আমেরিকাই আজ মুক্তকণ্ঠে জাপানের সভ্যতাকে স্বাক্ষর করিতেছে ও জাপানের সঙ্গে কেবল ব্যবসার বাণিজ্যে মনে, পরমাণুনাশেও মুক্তকণ্ঠে আপন প্রাধান্যের সমস্ত পাতাতেই লাস্ত করিয়াছে। জাপান যুগোপের মত হইয়া, যুগোপের সভ্যতার আকর্ষণ হইয়াছে। যুগোপ ও আমেরিকা জাপানকে বিশেষ সাধনাটুকুই, জাপানের নোত নোতি ও আচার ব্যবহার, জাপানের লিঙ্গনাশটুকুকেই, সভ্যতার একমাত্র মাপকাটি বলিয়া ধরয়া রাখিয়াছে।

কেবল যুগোপ যে আজ এতদূর গিয়াছে তাহা নহে। প্রাচীন কাল হইতেই এই নীতি চলিয়া আসিয়াছে। গ্রীস ও রোমের আমানগকেও জগতে একমাত্র সাজে সভ্যতার অধিকারী বলিয়া অভিহিত,

অপর সঙ্গ জাতি তাদের চক্ষে অসত্য ও
বন্ধন ছিল। ইহুদিরা আবার সেষ্ট্রপ
অপমানদিককেই জগতের একমাত্র আত্মজ্ঞাত-
শ্রেণীভুক্ত বলিয়া ভাবিত, গ্রীসীয় ও রোমক
পন্থার তাহার চক্ষে হীন ও বর্ষার ছিল।
খ্রীস্টেরা অপর জাতিকে বন্ধন বলিত,
ইহুদিরা তাহাদিগকে জেন্টাইল বলিত।
আমাদের প্রাচীন পুণ্যসুখেরা যেন হয়,
গ্রীসীয়, রোমক বা ইহুদ অপেক্ষা অনেকটা
অধিক দুরার ছিলেন। একই তাহার উদার
দৃষ্টিতেও আর্থ ও অনার্থ্য, হিন্দু ও মৈত্রেয়
হেব আত্মকৃত্য করিতে সক্ষম হয় নাই।
প্রাচ্যেরা যেন তাহারে পন্থার বারমুখ
লোককে বন্ধন বলিত, ইহুদিও যেন
অপর সমাজের লোকদিগকে জেন্টাইল
বলিত, হিন্দুও সেইরূপ অধিন্দুদিগকে মৈত্রে
বলিতেন। বন্ধন জেন্টাইল, মৈত্রে, এ
সকলই অবজ্ঞাহুক পদ। আমরা আলি-
কালে যে অর্থে অসত্য পদ ব্যবহার করি,
প্রাচীনকালে এই সত্য প্রাচীন সমাজের
লোকেরা ঠিক সেই অর্থেই বন্ধন, জেন্টাইল,
মৈত্রে প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিতেন। আর
প্রাচীনকালে যেন লোকেরা যারা ঠিক
তাদের মত নহে, যারা বর্ণ, ধর্ম, বর্ণ,
আজকে, ব্যবহারে, সীমিত, নীতিতে, তাদের
নিজের চাইতে ভিন্ন ছিল। তাহাদিগকে
অসত্য, বন্ধন, হীন ও হেব বলিয়া ভাবিত,
আর আবার ঠিক সেই প্রাচীন পন্থারই
অনুগত করিয়া চিনিতেন এবং আবার
মত যারা নহ, তাহাদিগকে অসত্য, বর্ষার,
হীন ও হেব বলিয়া ভাবিয়া থাকি। ইহা
সত্যতার সাধারণ ধর্ম বলিয়াই মনে হয়।

আর এই কথাটা যখন একটু তলাইয়া
যেদি, তখন যুগোপ আমাকে যখন অসত্য
বা বন্ধন বলিয়া জ্ঞাত করত, তাহাতে
আমি নিজে কিছুমাত্র সন্তোষে বোধ করি
ন। যুগোপ যখন আমাকে বন্ধন বা অসত্য
বলে, তখন আমি তার মত নই, কেবল
এই সত্যটাট সে ব্যক্ত করে; ইহাতে আমার
মাথা হেঁট কাববার চো কোনোই কারণ
নাই। বন্ধন আমি বা অসত্য, তা না থাকিয়া,
যদি আমরা এই নিজের প্রত্যাপ্তে যুগোপের
পোষাক দিয়া ঢাকি, যুগোপের প্রত্যাপ্ত
অগ্রহণ বলিয়া প্রত্যাপ্তি করতে থাকি,
সে মিনা চাচ্ছি আমার পক্ষে প্রত্যাপ্ত লক্ষ্য
ও প্রত্যাপ্তের কারণ হইত। আমি যদি সত্য
সত্যে যুগোপ অপেক্ষা ছোট হই, তাহাতেও
কোনো লক্ষ্যের কারণ নাই। এই ছোটতাই
আমার নিজের, এই ছোটতাই নিজের
আমার মনকে পূর্ণ যাত্রার সূচনা হইতে
হইবে। ইহাই আমার মত। সত্যের মত
বিশ্ব পদ নাই বলিয়া কি যথেষ্ট বা পাপ্যতার
কোনো ক্ষেত্রে কারণ আছে? ছোট
জুঁজুলি বড় জলপদ্ম নয় বলিয়া কি যথেষ্ট
ম'বলা থাকে? জুঁজুলির ক্ষেত্রে, তার
জুঁজুলিতেই। জলপদ্মের ক্ষেত্রে, জলপদ্মে।
দলের বা পাপ্যতার ক্ষেত্রে দলের বা পাপি-
রাকে, সত্যনিকে বা অন্য কোনো পাপ্য
নিজের নহে। যাত্রার পক্ষেও তাই।
জাতির পক্ষেও তাই। প্রত্যেক জাতির
সাধনা ও সত্যতা তার নিজের প্রকৃতি
হইতে সূচনা উঠে। অপর জাতির সাধনা
ও সত্যতার সংস্পর্শে তার নিজের সাধনা
ও সত্যতা পরিস্ফুট লাভ করিতে পারে।

কিন্তু এই পরিপুষ্ট বস্তুর ভিত্তবদ্ধ, বাহিরেও নহে। মনুষ্য প্রতিদিনই বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে। সে ফল-মূলদিগে আহার করিতেছে, পশুপক্ষীর মাংসাদিও ভক্ষণ করিতেছে। কিন্তু উদ্ভিদেব বনে মাছাদিও রক্তমাংসই পরিপুষ্ট হয়, তার ভিতর হইতে অল্প উদ্ভিদেব সুটগা বাহির হয় না, আর পশুপক্ষীর মাংস ভোজনে মাংস কখনো বৃহত্তর না ছাড়েও না হংসও কি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লাভ করে না। বাহির হইতে যা কিছু খাদ্যাদি আহার গ্রহণ করি, সে সকলই আমাদের রক্তমাংসে পরিণত হইয়া যায়, যা রক্তমাংসেই পরিণত হয় না, তাহা মূত্র-পুষ্ণুবাচ্ছিন্নে বর্জিত ও নষ্ট হইয়া যায়। জাতীয় সত্যতা বা সাধনা সর্বত্রই সেই কথা। এক জাতি অপর জাতির দংশনে আদিলে, তাহাদের মরণো ভাব ও চিন্তা, জ্ঞান ও মনের আদানপ্রদান অবশ্যস্বাভাবিক। এইরূপ আদানপ্রদানে যাবাই জগতের সত্যতা ও সাধনা যুগে যুগে বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। একই আদানপ্রদানে যে সমাজ বা যে জাতি রক্ষিত হয় না, তার সত্যতা ও সাধনা ক্ষয়ন; সংকার্য ও হীনমূল হইতেই হইবে। বাক্যই পক্ষে দর্শনশাস্ত্রবোধী মনসন বৈজ্ঞানিক বণ ও আয়ুর্করের কারণে, জাতির পক্ষে এই আদানপ্রদানে বাধ্যজন্য ও টিক দেউড়ীতে জাতীয় পুঞ্জের আয়ুর্করের যেতু হইয়া পড়ে। জাতীয়তার নামে এইরূপ অনশনের বাধ্যতা করিলে চণ্ডিবে কেন? কিন্তু অধোবের পার্থক্য বৈষম্য পরিপাক, আর পরিপাকের সামর্থ্য বৈষম্য জীবনী পুঞ্জের উপর নির্ভর করে, পেরেক জাতীয় আদানে

এইরূপ আদানপ্রদানের পার্থক্যতা ও আধ্যাত্মিক ও মানসিক পরিপাক। এটি পরিপাকের সামর্থ্য জাতিব জীবনীপুঞ্জের উপর নির্ভর করে। আর এটি জীবনীপুঞ্জের ভাব নিত্য বস্তু, ভিতর হইতে উঠাকে সুটগা তোলা যায়, বাহির হইতে কখনো বেগরা যায় না। যেমন আমি ফল খাই, মূল খাই, মাছ খাই, মাংস খাই, যা কিছু খাই না কেন, তাতে আমার পেশী, আমার অস্থি, আমার স্নায়ু, আমার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যই ক্ষতিগা ওঠে; এ সকলে আমার বিশেষভাবে সুস্থ, কিন্তু নষ্ট করে না। সেটরূপ জাতিব জীবনেও আদান-প্রদানেও জাতির সাধনার ও সত্যতার বিশেষত্বই হই সুটগা। তুলিবে, তাহাকে নষ্ট করিবে না।

আমি আমার সত্যতা ও সাধনার একটা বিশেষই আছে, আমি আর কোনো মত নষ্ট, আমার জাতিও অপর কোনো জাতির মত নহে; আমি ছোট হই, বড় হই,—আমি আমি, আমার ছোটব, বড়ব, লম্বা, ভাতিব সকলই আমার, এই জ্ঞান জন্মাচ্ছে বিন্ধ্যাট, তুমি আমাকে অসত্য বা বস্তুর বলিলে আমার গারে লাগে না। আমি আমাকে জানিচ্ছাতি, আমি আমাকে পাঠিচ্ছাতি, নিজের পানের উপর পাঠিচ্ছাতি, আমার ভালো ও আমার মন্দ, আমার বল ও আমার দুর্বলতা, আমার আদর্শ ও আমার অসত্য, উভয়ই আমার চক্ষে সুটগা উঠিচ্ছে বলিচ্ছাতি তোমার ওজন আমি আর আমার নিজের মাপ করিতে চাই না। তাই বলিচ্ছাতি হুরোপ এখন আমাকে বস্তুর বলে, তাহাতে আমার লক্ষ্য হয় না, ক্রোধেরও সন্ধার হয় না। সত্য

অতিশয়গেট দেবগ লক্ষ্যে কারণ হয়; আর
গোপন্যভাবে ইচ্ছা হইতেছি বলিয়াই সে
লক্ষ্য হইতে প্রোৎসাহিত হয়। যুগে
যখন ভোমার বচনের অর্থ সার্বভৌম মানিতে
হাজ নহ, তখন ভোমার অতিশয় বা
নিজাবার অব্যবহারে গায়ে লাগিবে কেন ?

১৯। সভ্যতার লক্ষণ ।

তবে কি সভ্যতা ও অসভ্যতা এ কথা
জটিল কোনো মানে নাট ? এ কি কেবল
গরজ্ঞানের কলহ ! এমন কি কোনো
সাধারণ লক্ষণ নাট, যাঁরা যাঁরা কে সভ্য কে
অসভ্য হবার বিচার করা যাউতে পারে ?
আছে বৈ কি ? সে লক্ষণ নির্ধারণ করিতে
গেলে, মানব সমাজের সমগ্র ইতিহাসের
আগোচনা করা অপেক্ষক। অতি আদিম
কাল হইতে ক্রমেতে মানুষ ধাপে ধাপে, তরে
তরে, পশু ছাড়িয়াই মানুষের জ্বলিতে
আনিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা বিচার করিয়া দেখা
চাই। এই ভাবে যখন সভ্যতার একটা সাধারণ
ইতিহাস গুচ্ছ কল্পিতে পারিব, তখনই এই
সভ্যতা কাকে বলে, ইহার সাধারণ লক্ষণ
কি, ইহার যুগ শ্রুতি ও চরিত্র লক্ষ্যই বা
কি, এসকল সম্বন্ধে আমাদের মনের
চরিত্র। আর তখনই কেবল আমরা মানবের
সভ্যতার সভ্যতার মাপকাঠিটা খুঁজিয়া
পাইব।

মানব আজ যেমন আছে, এক দিন
তেমনটি ছিল না। আজ যে বর বাড়ী
বাঁধা, আমনগর পাততা বাগ করিতেছে।
একদিন এসকলের কিছুই জ্ঞান ছিল না।
তখন তার বাগবাঁধা ছিল বাগবাঁধা নয়, বনজল,

ভার বর বাড়ী ছিল কৃষ্ণকোট বা পলিত
গলিয়া। খাজ ছিল অশ্রু কলম্বু কিবা
আম মাংস। তখন সে পশুর মত চলিত
কিরিত, পশুর মত শিকার করিয়া বেড়াইত।
পশুর মত গুপ্ত বা সমাধিগত হইয়া, শত্রুর
আগ্রে বাগ করিত। সে অশ্রু মানুষ
বলদিন ছাড়িয়াই আনিয়াছে। আর এট যে
মানুষ ক্রমে পশুর জ্বলি ছাড়িয়া, আমরা
আজ যাহাকে বহুদেব জ্বলি বলিতেছি
তাহাকে আনিয়া উন্নিমিত, ইহাট জ্ঞান
উন্নতির, তার বিকাশের, তার সভ্যতার ও
সাধারণ ইতিহাস। সুতরাং এট ইতিহাসের
ছাড়া বিচার করিয়া দেখিলে, সভ্যতারই তহল
আর মানুষের ইতিহাস একই হইয়া যায়।

মানুষ একদিন পশুর মত ছিল, পশুরই
মত চলিত কিরিত। সে অশ্রু তাহাকে
সুপ্ততা বলা বাইত না। এখনো দারা পশুর
মতই আছে, পশুর মতই চলে ফিরে,
ভাড়া মানুষ হইলেও, সভ্যতার দাবি করিতে
পারে না। কিন্তু পশুতে আর মানুষে
পার্থক্য কোথায় ? পশুর শরীর আছে,
মানুষ বোবা শরীর আছে; শরীরের অঙ্গসংখ্যা
সমান। স্নায়ুতন্ত্র ও ত্বনুতন্ত্র, এসকল
ইঞ্জিনিয়ারিং মানুষ ও পশুতে সমান। সভ্য
সমাজের দারা এসকলতবে এট সকল
ইঞ্জিনিয়ারিং অঙ্গসংখ্যা হইয়া গেল, তাহা সকলকে
লোকে পশু বলিয়া গাণি বিচার থাকে।
যাও এসকল ইঞ্জিনিয়ারিং যবে আনিয়াছেন,
মানুষ তাহা সকলকেই বৈশেষ্যভাবে ও বিশেষ
অর্থের বহুদেব, অর্থিক বলিয়া মনে করে।
শত্রু তরে বৈশ আনিয়া—মানুষের। চিহ্ন
পশু শত্রুর অঙ্গসংখ্যা, শত্রুর জীবাণুতন্ত্র,

প্রকৃতি তাহাকে আপন ইচ্ছামত ঘুরাইয়া থাকে। ইহাই পশুর পন্থা। পশু প্রকৃতির দাস। আর মানুষ প্রকৃতির এই দাসের কাটাঠের উত্তরাচ্ছে। ইহাট তার মনুষ্য। আর যে পরিমাণে মানুষ প্রকৃতিকে আপনার বশে আনিয়াছে, সেই পরিমাণে তার মনুষ্যের ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই পরিমাণে তার সভ্যতা বিকাশ পাইয়াছে। যে দিন মানুষ বৃক্ষকেটির ও পর্দভগ্না ছাড়িয়া, আপনার ইচ্ছামত ঘর ঘর বাঁধিয়া আপনাকে ও আপনার সম্বন্ধপদ্ধতিকে শীতাতপাদি হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে দিনই সে প্রকৃতির নিগড় তাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই দিন তার সভ্যতা ও মনুষ্যের আরম্ভ হয়। সেদিন হইতে পশুই সে আপনাকে প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছে, ততই তার সভ্যতা বাড়িয়া উঠিতেছে। ইহাই সভ্যতার সাধারণ লক্ষণ।

যুরোপীয়েরা এই লক্ষণ ধারাই আপনাদের মেষভর সভ্যতার দাবিটা আনিবার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাঁরা নিগর্গের শক্তি সম্বন্ধে নিম্নতই আপনাদিগের আধিপত্যবোধ করিয়া, আপনাদের ঈশ্বর সাধনে নিযুক্ত করিতেছেন; আমরা এ বিষয়ে এখনো এতটা দৃষ্টিতে লুপ্ত করিতে পারি নাই। আমরা আমাদের ঋত উৎসবের সময় প্রকৃতির সুগোপন্য হইয়া থাকি। বস্তু বাহিরবর্ষণ করিবেন, পৃথক তাপ লব্ধ করিবেন, পতঙ্গাদি আমাদের পক্ষপালের উপরে আসিয়া পড়িয়া তাহা নষ্ট করিয়া দিবে না, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইতে আমাদের জীব রক্ষিত হইবে,—এ সকলের উপর আমাদের জীবিকা নির্ভর

করিতেছে। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে উপেক্ষা করিয়া কিরূপে প্রয়োজনীয় শক্ত উৎপাদন করিতে পারিব, সে তথ্য আমরা শিখি নাই। এইজন্য, প্রকৃতিকে আমরা বশীভূত করিতে পারি নাই বলিয়া, আমরা অসভ্য। যুরোপ সমগ্র সাধারণে এমন কৃত্রিমকৌশল আবিষ্কার করিয়াছে যে তাহাকে আর প্রকৃতির খেলালের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না, বেক্ষামত, প্রয়োজনমত, আচ্ছাদিত, প্রতিফল প্রকৃতির নিকট হইতেও ভয় করিয়া সে আপনাদের ঋত কাড়িয়া লইতে পারে। এতজন্য সে সভ্য। নিগর্গের শক্তি সমূহের উপরে, বাহিরের প্রকৃতির উপরে, যুরোপ যে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে, তারই বলে সে আশিয়ার প্রাচীন সাধনা ও সভ্যতার অপেক্ষা আপনাদের আধুনিক সভ্যতা ও সাধনাকে প্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে যুরোপের এ ছবিটাকে একেবারে উড়িয়া দেওয়াও পার না।

২০। প্রকৃতির প্রভু—

আসিয়া ও যুরোপ।

প্রকৃতি প্রভু হইতে মানবকে মুক্ত করাই মানবীর সাধনা ও সভ্যতার উদ্দেশ্য। ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি। যতদিন মানুষ আপনাকে না প্রকৃতির হাত হইতে ছাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, ততদিন তার সভ্যতা ও মনুষ্যের পুনর্নাই হয় না,—ইহা মানিতেই হইবে; এ কথাও স্বীকার করি। আর মানুষের এই স্বাধীনতাব মাত্রই ধারাই তার সভ্যতার মাপ করিতে হইবে, ইহাও মানি। কিন্তু প্রকৃতির বশত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য, যুরোপ যে পন্থা

এমন তর করিয়া আজ ধরিয়াছে তা ছাড়া যে আর অপর পথ নাই, এই কথাটাটাই হঠাৎ মনিতে রাজি নই ।

কলন্তঃ যুরোপীয় সভ্যতা সভ্য সভ্যই কি মানুষকে মুক্ত করিতেছে ? বর্তমানে যুরোপ জড়বিজ্ঞানের যে অত্যন্ত উন্নতি করিয়াছে, যুরোপীয় মনীষীগণ চতুর্ভুজের নিগূঢ় নিরুমাণিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন, ও এটী সকল নিগূঢ় তথ্য ও নব্যবিজ্ঞান পক্ষি সকলকে যেভাবে আপনাদের জৈবিকগতভাবে নিয়োজিত করিতেছেন, যুরোপের এটী সভ্যতার মানব মূলে ইহাই রহিয়াছে । কিন্তু এটী সকল তথ্যের আবিষ্কারে, মানবের আর বড়টী কল্যাণ হউক না কেন তাহার দ্বারা যে সে প্রকৃতির আধিপত্য হইতে বিমুক্ত পরিমাণে ও মুক্তিলাভ করিতেছে, ইহা বলা যায় কি না, সন্দেহের কথা । জড়তত্ত্বের আবিষ্কারে মানবীয় সভ্যতা দিকানের সাহায্য করে, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি । এটী সকল তথ্যের আবিষ্কার করিয়া, যুরোপ মানবকে বহু পরিমাণে অপেক্ষ প্রকারের আদি-ব্যাধির

হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি । পূর্ণ মনুষ্য সভ্যতার অস্ত্র এসকল অস্ত্রাবলম্বক ইহা মানি । এসকল পন্থাকে বর্জন করিয়া ভাষ্যতর্ক আপনাদের পূর্ণতালাভে প্রচুর ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করি । কিন্তু এসকল জানিয়া শুনিয়া, এসকল পূর্ণমাত্রার জানিয়া গটগট, এটী প্রসঙ্গ করিতে চাই,—যুরোপ এই যে জড়বিজ্ঞানের পথ ধরিয়া চলিয়াছে, ইহাতে সভ্যতাকে, পূর্ণতাকে, মানুষকে প্রকৃতির আধিপত্য হইতে মুক্ত করিতেছে কি না ? গ্রাম্যে এ মুক্তিলাভ আদৌ সম্ভব কি না ? বিজ্ঞানের বলে যুরোপ প্রকৃতির উপরে, যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়া গর্বি কহে, তাহা কলে আধিপত্য না বলবে ?

ভারত ও বিলাতের সভ্যতা ও সাধনার তুলনার সমালোচনার মতনোতেই আমি এটী মূল প্রশ্নটাই তুলিতে চাই । ইহারই উপরে এ বিষয়ের সমস্ত দিকান্ত নির্ভর করিতেছে ।

আজ প্রশ্নটা তুলিয়া রাখিলাম—বারাণসে ইহার আলোচনার প্রস্তুত হইব ।

ঐবিপিনচন্দ্র পাল ।

মানবদেহের ক্রমবিকাশ ।

ডার্টউইনের ক্রমবিকাশবাদ আজ সমস্ত সভ্যজগতের বুদ্ধিমান ব্যক্তি কেবল যে অঙ্গ-যোজন করেন তাহা নহে বরং ঐ মত যে প্রবল সভ্য সে বিষয়ে কোন সংশয়ও মনে স্থান দেন না । প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা সমধিক প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি থাকিতে পারে ? অপ্রতীক্ষণীয় অসাধারণ অত্যাশ্চর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে

একদল তত্ত্ববিজ্ঞান পণ্ডিতের উদয় হইয়াছে । তাঁহারা মানব ও অস্ত্রপ্রাণীর শরীর, কঙ্কাল রূপ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অল্প বার হুচকরণে বিচ্ছেদসাধন করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ পূর্বক এই ক্রমবিকাশের সমর্থন করিয়াছেন । তাঁহাদের যুক্তিতর্ক ও মীমাংসা অগ্রাহ্য করিবার যো নাই । তাঁহাদেরই পরি-

প্রমের ফলে আমরা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানিতে পারিরাছি।

১ম। মানবের শরীর ক্রমবিকাশের অতি নিয়ন্ত্রিত হইতে আধুনিক উন্নত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

২য়। এক শ্রেণীর জীব যে অবস্থায় স্বভাবতঃ থাকে, সেই প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন নৈসর্গিক কারণে যদি স্থায়ী পরিবর্তন হয়, তবে সেই জীব পরিবর্তিত অবস্থাহুযায়ী জীবন ধারণ ও সংশোধনামান করিবার চেষ্টা পায়। প্রকৃতি বলবতী হইলে জীবদেহের ক্ষয় হইয়া যায় ও সেই শ্রেণীর প্রাণীর অস্তিত্ব লোপ হয়। যদি দেহ প্রাকৃতিক পরিবর্তনে ক্ষয় না হয়, যদি দেহট বলবান হয়, তাহা হইলে ঐ জীবের অস্তিত্ব দমায় পাকে; কিন্তু অবস্থান্তরে তাহার সেই গঠনেরও ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটে। যোগাত্মক প্রাণীই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া দেহের কাণ্ডে দুগুণতঃ অঙ্গুর দ্বাণিতে পারে এবং পরিবর্তিত অবস্থাহুযায়ী শরীর পায়। ইহাকেই Law of Adaptation বলাে।

৩য়। যে সকল পরিবর্তন ক্রমের সঙ্গে অর্শে না, কিন্তু বহুকাল ধরিয়া অত্যন্ত হইলে, সেই বিকৃতি ক্রমের শরীরেও আসিয়া পড়ে। তখন উহা ঐ শ্রেণীর প্রত্যেক জীবেরই শরীরে লক্ষিত হইয়া পাকে ও সঞ্চিত-পণ্যাক্রমে পরিচালিত হয়। ইহাকেই Law of Habit ও Law of Heredity বলাে।

৪র্থ। মানবজগৎ আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত যে সকল পরিবর্তনের কথা নিয়া জঠরে গঠিত হয় সেই পরিবর্তনগুলি একে

এক জীবন্তের নিয়ন্ত্রণ প্রাণী হইতে নগা-কৃতি মানব পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীর ক্রমের অবিকল অমুরূপ। পূর্বজদ্বারিত দেহ-সংস্কার পাতাবাহিক্রমে ক্রমের গঠনে পরি-লক্ষিত হয়।

৫ম। মানবদেহে কতকগুলি অঙ্গরপ ও বহু দৃষ্ট হয় বাহার কোন কার্যকারিতা দেখা যায় না। ঐ সকল প্রত্যক্ষ ও বহুদ্রাণি পূর্ব পূর্ব জন্মের শরীরে বিশেষ আবশ্রুত ছিল, কালক্রমে (যুগযুগান্তরের পরিবর্তনে) বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে পড়ায় ঐ সকল বহু ও অবস্থার কার্য অনাবশ্রুত হইয়া পড়ে, এবং অবস্থারের অভ্যাস বা ব্যবহারের নিত্য অনভ্যাস বলতঃ উহাদের বিকৃতি ঘটে। অতাপি ও ঐ সকল অকর্মণ্য বহু সেই পূর্ব জন্মের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া অকর্মণ্য তাবৈত বেহে রহিয়া গিয়াছে।

উপরি উক্ত পকতথ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা ইচ্ছা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ইহার জন্ত শারীরবিজ্ঞান (Physiology) এবং অস্থিবিজ্ঞান ও শব্দজন্মের জ্ঞান (Anatomy) আবশ্রুত। এই পক সত্যের সমষ্টিই ক্রম-বিকাশবাহ। (Theory of Evolution) প্রত্যাহ কুরি কুরি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহীত হইয়া ক্রমশঃ এই ক্রমবিকাশের ভিত্তি বৃদ্ধ হই-তেছে। সমস্ত প্রমাণই প্রত্যক্ষ ও অশঙ্কনীয়। একে একে ঐ পাঁচটি বিবরণ সংক্ষেপে আলো-চিত হইতেছে।

১ম। মানব শরীরের অভ্যাস। অত্যা-বধি এ বিশ্বর বস্তুর তামা গিয়াছে তাহা এই,—প্রথমে কোন এক অজ্ঞাত মূল উৎস হইতে Protyle নামক এক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব

অজমিত হইয়াছে। কালসহকারে ঐ প্রোটো-ইন্স হইতে উহার লভ্য ও গতি উৎপন্ন হইল। ঐ বস্তু ও তাহার গতি (আণবিক ও পারমাণবিক গতি) মিশিয়া আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সহযোগে রাসায়নিক ক্রিয়ার উদ্ভব হইয়া প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm) নামক পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রোটোপ্লাজম্ কেই মহাত্মা হাক্সলি (Huxley) জীবনের প্রাকৃতিক ভিত্তি বলিয়াছেন (Physical Basis of Life)। সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণির দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃৎকোষে (Cells) গঠিত। ঐ Protoplasm পদার্থই প্রত্যেক সজীব হৃৎকোষের অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবের সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে। বহিঃস্থ বস্তু লইয়া পুষ্টিলাভ ও বহুভাগে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র সত্ত্বার অভিব্যক্তি উহার আছে। এক বিশুদ্ধ মাত্র প্রোটোপ্লাজম্ লইয়া জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে। উহা হইতে ক্লোরোফিল্ (Chlorophyll) নামক বস্তু প্রস্তুত হয়। সমস্ত উদ্ভিদ ও বণিজ পদার্থের মূল ঐ ক্লোরোফিল্। উহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেটেরার স্তর (Fungus) পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অনতিকাল পরে এমিবা (Amoeba) নামক প্রাণীর উদ্ভব হয়। ঐ এমিবাই প্রাণিত্বের সর্বনিম্ন জীব। উহা একটি ক্ষুদ্র কোটাপুংখ। উহার হস্ত পদাদি প্রত্যঙ্গ বা অস্থি, মাংস, মূত্র ইত্যাদি কিছুই থাকে না। কেবল একটি গোলাকার হৃৎকোষ, প্রোটোপ্লাজমে ভরা। কোন কোনটির একদিকে একটি অতি ক্ষুদ্র ফেন বেগা বার (Cellia)। উহাদের কেবল ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার ক্ষমতা মাত্র থাকে, প্রাণ জলে সম্ভরণ করিয়া বেড়ায়। উদ্ভিদ ও প্রাণী এই

দুই শ্রেণীর সংযোগ স্থলে ঐ এমিবাই লক্ষিত হয়। উহাকে (Connecting Link) সংযোগকারী বলে।

এক কোষ বিশিষ্ট এমিবা হইতে ক্রমে বহুকোষ বিশিষ্ট (Synmaccha) সিন্ এমিবার উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের শরীরে বহু হৃৎকোষের সমাবেশে অসংখ্য ও খাণ্ড পরিপাক করিবার বস্তু এবং জননেন্দ্রিয় থাকে কিন্তু স্বতন্ত্র মূত্র গল্লব্দ সৃষ্ট হয় না। একমাত্র অবশ্যে সকল কার্য্য-সমাধা হইয়া থাকে। ইহাদের পর জীবের তৃতীয় স্তর Gastrula (গাস্ট্রুলা) নামক জীব শ্রেণী। ইহাদের মূত্র গল্লব্দ স্বতন্ত্র ভাবে উদ্ভূত হয়। পরে চতুর্থ স্তরে Hydra বা Polyp—স্বতন্ত্র দুই একটি ইঞ্জির ও তৎসমুদ্র জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি লক্ষিত হয়। পঞ্চম স্তরে Medusa জাতীয় জীবের হৃৎকোষায়ুগল ও মাংসপেশী প্রথম দেখা দেয়। এখনও মস্তিষ্ক বা মস্তকপ্তের উদ্ভব হয় নাই। ষষ্ঠ স্তর কোট (worm) ও ৭ম স্তর কোটাস্তর্গত Himatoga নামক এক জাতীয় প্রাণীদের শরীরাত্মকরে প্রথম মস্তক বা মস্তিষ্ক অবস্থার সৃষ্ট হয়। এই মস্তিষ্ক মস্তকগত জীব-পরে মস্তকগত হৃৎকোষ (Vertebrata) পোকা মাকড় হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্ত, পক্ষী, সরীসৃপ ও গুপ্তপারী জীব। সরীসৃপ গুপ্তপারী নহে, ডিম প্রসব করে। একেবারে গুপ্তপারীর উদ্ভব সরীসৃপ হইতে পারে না। Monotremata নামক এক জাতীয় অর্ধ সরীসৃপ অর্ধ গুপ্তপারী জীব উত্তর শ্রেণীর সংযোগক Connecting Link। তাহার পর Lemur জাতীয় জীব, পরে বানর জাতি। ইহার পর কিছু মানব

একটা পৃথক জীব। তাই বানর ও মানব এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী একটি সংযোগকারী জীব করিত হইয়াছে; কিন্তু অত্যানি ও তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। উহার নাম Missing Link দেওয়া হইয়াছে। ঐ জাতির প্রাণী বানর অপেক্ষা বেশ বুদ্ধিমান ও কম লোমশ হওয়া চাই। পদাঙ্গুলির গঠনও আর মানবের জায় হওয়া আবশ্যক এবং একটু বর্ণজ্ঞান থাকা উচিত। Alali নামক এক শ্রেণীর বানর অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মানবের সমাধিক নিকটবর্তী। উহাকেই কেহ কেহ Missing Link বলেন।

উপরে উক্ত প্রাণীত্রয়ের যে তালিকা দেওয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ক্রমোন্নতি সহকারে এক একটি অব্যবহৃত প্রাণী ও বস্তুর উদ্ভব হইয়া এক এক শ্রেণীর জীব গঠিত হইয়াছে। এক শ্রেণীর জীবের দেহে পূর্ণ পূর্ণ সকল স্তরেরই পরিচয় পাওয়া যাউতে পারে এমন অনেক চিহ্ন আছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

২য়। জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের স্থায়িত্ব। এ বিষয়ে বহুলোক বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। অবস্থা তেবে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের গঠনে ও কাৰ্য্যকারিতা শক্তির যে বিশেষ পরিবর্তন হয় তাহা আমরা প্রতিদৃষ্ট হই দেখিতে পাই। উদ্ভিদের এইরূপ পরিবর্তন অসমসাময়িক জ্ঞানসংগ্রহে উহা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। প্রাণিদেহের স্থায়ী পরিবর্তন সমাধিক মস্তর পতিতে সম্পন্ন হয়—অনেক সময়ে আবাদেই জ্ঞানগোচর হয় না। পারাবত, হংস প্রভৃতি পক্ষী, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুর বহু অবস্থা হইতে

গৃহপালিত অবস্থা যে অত্যন্ত বিভিন্ন তাহা সহজেই পরীক্ষিত হইতে পারে। বহু অবস্থায় যে সকল প্রাণীই সমাধিক বসবাস, তাহার কারণ ঐ সকলের ব্যবহার ও আবাসিকতা বেশি। এই নিয়মকে Adaptation “অবস্থানরূপ উপযোগী করণ” কহে। যদি প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন জন্তুর শরীরের বিশেষ পরিবর্তন হস্তান্তর আবশ্যক হইয়া পড়ে, এমন কি তাহাতে যদি ঐ জন্তুর আত্যন্তিক (চন্দ্র প্রভৃতি) বস্তুর দিকে যেহেতু ঐ অবস্থানের যোগ্য করিতে সক্ষম না হইয়া উঠে তাহা হইলে সেই জাতীয় জন্তু ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়েন; পড়েন; অবশেষে প্রাণী হয়। এইরূপে মামথ (Mammoth) নামক এক জাতীয় অতিবীর হস্তান্তর বংশ অপেক্ষাকৃত আর কালে মৃত্যু হইয়াছে। উদ্ভাদের কতাল অত্যানিও কোন কোন অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা জাতীয় অত্যন্ত কালকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করিয়াছেন (Zoological ages)। এক যুগের জীববংশ যুগান্তরে আসিয়া মৃত্যু হইয়াছে—তাহাদের দেহাবশিষ্ট কতাল বা প্রস্তরীকৃত শরীরের মাত্র পড়িয়া আছে—যোগ্যতমের পরিবর্তিত শরীর হইয়া বাহ্যতঃ বিভিন্নভাবে জীবরূপে পরিচয় আছে ও বংশবিস্তার করিতেছে। এই অংশেই প্রথমোক্ত বিংশতি প্রকার জীববংশের উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ উহারা বিভিন্ন অবস্থায় এক মৌলিক জীবেরই বিভিন্ন শরীরগঠন-ভেদেই উদ্ভূত হইয়াছে।

৩য়। অজ্ঞানের প্রভাব ও পুঙ্খবহুতমের পরিচালন। এ বিষয় আমার পূর্বে প্রকাশিত

“ক্রমবিকাশে অভ্যাসের প্রভাব” শীর্ষক গ্রন্থে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, লক্ষ্যুগের অভ্যাসের ফলে, ব্যক্তিগত পার্শ্বিক গঠনভেদে জগের শরীর দিগ্না সম্বন্ধে বিকশিত হয়। রে ল্যাঙ্কাষ্টার (Ray Lankaster) প্রমুখ বিখ্যাত জগতব্যবিস্তার বলেদে যে, সে পরিবর্তন জগে অর্শ্য না তাহা কখনও ভবিষ্যপ্রাণ্ডিতে দেখা যায় না। এই যুগের অভ্যাসই কেবল জগে অর্শ্য।

৪র্থ। মানব জগের ক্রমবিকাশ। মানব জগাবস্থায় ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধ পরিবর্তনের মধ্যে বর্ধিত হয়। অধ্যাপক হিবেল (Professor Haeckel) তাঁহার Evolution of Man নামক অগ্রন্থে গ্রন্থে এই পরীক্ষার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত করিয়াছেন যে গর্ভসংকারিত জগে পূর্ণ পূর্ণ জগের লগ্ন জাতির জগের, অগ্ররূপ পরিবর্তন ঘটে। প্রথমে একটি এমিবার (amœba) জগ, পরে gastrula Medusa' কোট, মংজ, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি ক্রমবিকশিত প্রাণীর জগ বেক্রপ, মানব জগের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থা অবিকল দেখেঁরূপ। মানবজগ পরিপক অবস্থায় পুঙ্খ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে—পরে পুঙ্খ “বসিরা” গিয়া তৎস্থানে থান করেক পণ্ড অহি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে বিংশিত প্রাণিক্রমের অঙ্কিত ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে মানবের আকার ধারণ করে। ক্রমবিকাশের উহা অপেক্ষা আর প্রকৃষ্ট প্রমাণ কি থাকিতে পারে ?

অধ্যাপক হাক্সলে (Huxley) তাঁহার

Man's Place in Nature নামক গ্রন্থে প্রমাণ প্রমাণে দেখাইয়াছেন যে মানবীয় গর্ভস্থ জগের সহিত মানবজগের সাম্য অতি নিকট। জগের শেগাবস্থায় এই সাম্য লক্ষিত হয় ও বহুদিন বাৎ উহা বর্তমান থাকে। অজের সর্ক্স লোমের সমতাযে উৎপত্তি, ক্ষুদ্র পুঙ্খ, পদাঙ্গুণির ক্ষমতা, বর্ণ স্পন্দিত করিবার ক্ষমতা মানবজগের যেরূপ থাকে মানবজগেরও অবিকল তৎরূ-রূপ। আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন, অবস্থিতি ও আপেক্ষিক প্রকার উচ্চতরত এক প্রকার। স্মৃত্তাঃ মানব যে মানব জাতির মধ্য দিয়া উদ্ভূত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আবার ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন নরাকৃতি বানরের মধ্যে পরস্পর যতদূর পার্থক্য লক্ষিত হয়, মানব ও আদম বানরের মধ্যে তত পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। অশিচ জগাবস্থায় ই সাম্য এত অধিক যে জগাবস্থায় বানরে ও মানবে প্রভেদ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

৫ম। মানবদেহে অকর্ণণ্য বস্তুদি। অধ্যাপক ওয়াইডারশীয়েম (Weidershiem) তাঁহার The Human Frame as a witness to its past নামক গ্রন্থে মানবদেহে বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরীণ বস্তুদির নাম উল্লেখ করিয়াছেন বাহ্যিক কোনও কার্য-কারিতা পরিপলক্ষিত হয় না। আমাদের শরীরের সর্ক্সগনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমপ্রাণির অবিকলতা কি ? তৎ পুট প্রভৃতি হানের হস্ত লোম বেহের কোন কাণে লাগে না, অশচ উহা আমাদের কতক রক্ত শোধন করে। শরীরের

মধ্যে নানাহানে নানাজন গ্রহি, বাসেপেশী প্রকৃতি দৃষ্ট হয় বহু। আমাদের কোন উপকারে আসে না। যথা বৃহৎ অস্ত্রের পরিণামে কুণ্ডলাকৃতি অস্ত্রাংশ (Vermicular appendix) ইত্যাদি। এই সকল আবর্জনা-বহন প্রত্যঙ্গাদি বিধাতা যে কি উদ্দেশ্যে আমাদের শরীরের মধ্যে স্থলন করিয়া রাখিয়াছেন তাহা লইয়া বহু বাদাভিমান সম্মত পণ্ডিতেরা কোন সুমীমাংসার উপনীত হইতে পারেন নাই। বিধাতা যে উদ্দেশ্যাত্মক কার্য করেন এ কথা বলিলে বিধাতার উপর দোষারোপ করা হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উপায় কি? এইরূপ অঙ্গ নাস্তিকতা বড় ভয়ানক অবস্থা। ক্রমবিকাশে যদিও ঐশ্বরের কার্য ক্রমশঃ পিছাইয়া এক প্রোটাইল (Protyle) ও তাহার ভড়ৎ ও গতির সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে লভ্য, যদিও আমাদের বৈদল্লিহ কার্যো, আমাদের ভয়ে, পূর্নজন্মে, বহু পূর্নজন্মের গঠনে ঐশ্বরের সাফাৎকর্ষের ঘুরে অপস্থত হইতেছে লভ্য, কিন্তু আবিষ্কৃত হস্তকোষ ও প্রোটোপ্লাজমের গঠন যে মহাপ্রতি হইতে উদ্ভূত তাহাকেই ঐশ্বর বলিয়া গৃহীত করিতে যতঃই মন যায়। স্তত্রায় ক্রমবিকাশে যে নাস্তিকতার প্রস্তর দেহ এ সর্বৈব নিখা। যদি ঐশ্বর আমাদের কলবর এককালে সৃষ্টি করিয়া মাৎগর্ভে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া মানিয়া লই তাহা হইলে ঐ শরীরের ভিতর কতকগুলি অকর্ণণ্য বস্তুর সৃষ্টি করিয়া শরীরের ভার ও চূড়পিত এবং সুদৃঢ় প্রকৃতি বস্তাদির পোষণকার্য্য অনর্থক বৃদ্ধি করিয়া তাহার কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইল? ইহার উত্তর নাই। ক্রমবিকাশবাদ

ইহার উত্তর সহজে দেয়। যে সকল অকর্ণণ্য অংশ আমাদের শরীরে বিস্তারিত আছে, তাহা বহু শতাব্দী, এমন কি গুণগুণাত্মক পূর্ণ শরীরের আশ্রয়ক বস্তাদি ছিল, তাহা হইতে যে সময়ে শরীরের কার্য সাধিত হইত; কিন্তু ক্রমশঃ জীবদেহ পরিণর্জনশীল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে পতিত হওয়ায় ঐ সকল যন্ত্রের আবশ্যকতা বহিল না। ক্রমশঃ অগাধভাবে ইহাদের অবনতি ঘটয়াছে। আমীরের কর্ণের বহিঃস্থগঠনের (বাহির কানেক) কোন কার্য্য দেখা যায় না। উহা পূর্নজন্মের গোষ্ঠ্য ও বানরকর্ণের অবশিষ্ট চিহ্নমাত্র। ঐ জন্মের কর্ণ বিভিন্ন ভাবে বৃদ্ধ করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে আগত শব্দের অঙ্গুসরণ করিতে পারে; আমরা সেট হানে বাড়ি বাঁকাইলেই সকল হই, কর্ণ নাড়িবার স্তত্রায় আবশ্যক হয় না। গো অথবা কুকুর যেমন কানে পাতিতে পারে, বানর ভগ্নপেঙ্গা কম; আবার মনেবে দেখি ঐ ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতে পারে। গো অথবা স্তত্রায় গৃহপালিত পশুদের গাত্রচর্মের নিম্নে এক প্রকাব মাংসপেশী আছে বাহার বাবা উহা চর্মে সুকিত করিতে পারে; আমাদেরও ঐরূপ স্থানে পেশী দৃষ্ট হয়। লগাট সুখ ইত্যাদি দুই এক স্থানের চর্মে আমরা ইচ্ছামত ঐ পেশীর সাহায্যে সুকিত করিতে পারি। উক্ত জন্তুদের ঐরূপ চর্মে সুকিত গায়ের সর্করট আবশ্যক হয়; উহার দ্বারা তাহার মনিক। মনক প্রকৃতি মৎসকের অবস্থান নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। আমাদের ঐ সকল পেশীর কার্য্য কেবল কতকগুলি মানসিক ভাগ ব্যক্ত করিবার জন্যই ব্যবস্তুত হইয়া থাকে; তাহাও আবার

সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। অপর উদাহর: আজিও শরীরে বর্ধমান থাকিয়া রক্ত প্রকৃতি কীবনী-রূপ শোধন করে। শরীরভর্যং পশুভেদে পূর্বে ঐ সকল অকর্ণণা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আভ্যন্তর কারণ নির্দেশ করিতে পারিতেন না। এক্ষণে ভারউইনব্রডের আশ্রমে ঐ সকল রক্ত সমস্তা পরিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল অকর্ণণা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণ পূর্ণ তন্দ্রের সাক্ষীস্বরূপ দেহের মধ্যে বহিয়া গিয়াছে এবং লক্ষিতরূপে পর্যায়গত হইতেছে। ক্রমশঃ উদাহর একেবারে বিলুপ্ত হইবে।

ভারউইনের ক্রমবিকাশবাদ বহু পরীক্ষা ও গবেষণার ফল। উদাহর মানবদেহ ও তাহার গঠন বেশ বুঝা গেল। আধুনিক পণ্ডিতগণের

মত এই যে মানবের দেহ যেমন ক্রমশঃ নিম্নতর হইতে ক্রমোন্নত হইয়াছে, তাহার মন, বুদ্ধি, এমন কি আত্মাও সেইরূপ ক্রমে ক্রমবিকাশিত হইয়া গিয়াছে। মানবাত্মার ক্রমবিকাশ ব্যাভ্যন্তরে আলোচিত হইবে।

আমরা মানব হইতে উন্নত এত কথা হস্ত অনেকের ভাল না লাগিতে পারে। অনেক ভারউইনের বক্তকে পাগলের খেতাল বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। মানবদেহের দৌর্লভ্যই উহার অকৃতম কাব্য। আমরা মানবশরীরের সঙ্গে সঙ্গে এই মানসিক দৌর্লভ্যেরও উন্নয়নবিধারী হইয়াছি। কিন্তু উপায় নাই।

ঐশ্বর্যরক্ত ভট্টাচার্য।

স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

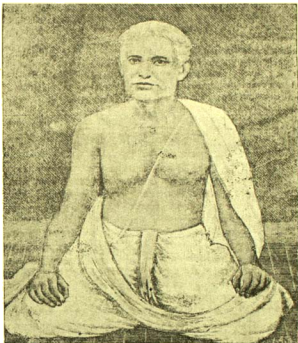
গত ২ই চৈত্র মদনী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বৃত্তান্তে বাংলা সাহিত্যে একজন অতিভাবান লেখকের স্থান মুক্ত হইল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তী পাণ্ডু গ্রামে মাহুলদাসের ইন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পূর্ণিয়ার উকীল ছিলেন। হািস কীবনে ইন্দ্রনাথ বিশেষ অধ্যয়নশীল ছিলেন না তবে তপন হইতেই তাঁহার অতিভাব বিকাশ হয়। তাগালপুর হইতে তিনি বৃত্তির সহিত এটীক পত্রীকার উদ্বোধন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিএল পাশ করিয়া কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া বর্ধমানে আসেন।

কর্ণক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচ্ছদ হইয়াছিল। তিনি একজন পক্ষিপালী ব্যবসায়িকবী ছিলেন। ওকালতী করিয়া তিনি প্রচুর অতিপল্লভক করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সরল স্বাভাব্যসাই

তাঁহাকে বহুবানীর নিকট সর্বাধিক পরিচিত করিয়াছে। রক্তভার ও পরিহাসপট্টার তিনি অধীত ছিলেন। তাঁহার পূর্বে মর্দুপার্নী অথচ স্বাধীন ভাবের মেধাস্বক কবিতা রচনা করিয়া কেহই এত কৃতকাণ্য হন নাই। তাঁহার রচিত “কলভর” “ভারভোজ্য” প্রভৃতি গ্রন্থ নিতর বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে অপরূপ রত—ইহারা তাঁহার পুণ্যবৃতি স্বাক্ষরী ভগ্ন চিত্রাঙ্কল করিয়া রাখিব। “পকাদল” নামক রক্তগণ ও বিজ্ঞাপ্যক স্বাসিকগত স্বকণ ও ইন্দ্রনাথের আর এক বিশেষ স্মৃতি। এই স্মৃতির স্বাসিকগত স্বাক্ষর আর দেখা যায় নাই।

ইন্দ্রনাথ রক্তশীল রক্তরক্ত ছিলেন। আধুনিক শুল্কিত ব্যক্তি বর্ণের লম্বা লম্বা চোখ তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু তিনি যে একজন সহানুভূতিবী ও বঙ্গবক্ত ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। ইন্দ্রনাথ নিতীবান্ স্বাক্ষর ছিলেন

এবং ব্রাহ্মণ সমাজের উন্নতি সাধন তাঁরই কীর্তনের পত্রাঙ্গী ছিলেন। তাঁরই স্মৃতিতে বহুসংখ্যক বৈ
এক অর্থান লক্ষ্য ছিল। তিনি অসম্প্রতির ও পরো- ক্ষতি হইল তাঁর নীচ পুত্র হইবে না।



ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজকন্যা।

প্রথম দৃষ্ট।

নৃত্যগীত ইত্যাদি বাননের মহল।

শিকড়িগো, গারিক, বামিক। ও নৃত্যকারীগণ।

গান

পাখি—কাঁওহালি।

রক্তনীর রক্ত মধুবা,

গাওগো রক্ত, গাওগো রক্ত,

কল্পকল্প নাচি আদর্শ,

বাঁজাও পেতারাবীণ, ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিন,
ঘীরে ধমকি, দ্রুত ঢমকি,
তাহে তাহে ঘীরে স্বভাবেরে অবীরা—

কহুতুহ নাচি আমরা ।

বাঁজাও শব্দ, নীরন্তরঙ্গ, তাগে তাগে তাগে,
মকল বোল মলিরা ।

কহুতুহ নাচি আমরা ।

সঙ্গীত গানে, ঐক্যবাদনে, বিধুরা —

মত্তচরণ, কহুতুন খন—নুপুর শুভন সুখরা ।

স্পর্শে হর্ষে শিহরে মেঘিনী

বিমানের বিহরে—পুলককাগিনী

স্বপ্ন কল্পিত বিহরণ বাদিনী—

তরু মুগ্ধ অপরা !

মনোমানে নাচি আমরা ।

(একবার নৃত্য বীতের পর)

শিখ । বেশ বেশ, ঠিক হয়েছে । কেবল
বাজনারবীদের বসার ভরীটা একটু বদলাতে
হবে । ওগো—পেতারাবি তুমি পেতারের
দিকে মাথাটা আর একটু হেলিয়ে রাখ,—
আর তুমি সুবর্ণিনি, একটুখানি আরো সরে
বস দেখি—বীণা ও পেতারার ঠিক শিহনে—
নুখলে ?

তাঁহার । আচ্ছা আচ্ছা—অধিকারী
মহার—হোলত ?

(হাত করিতে করিতে তপাকরণ)

মলিরা-ওহালী ।—(উত্তিরা গাড়াইরা)
আমার জাগ্রাত মৃত্তকিনী দলন করলে—
আমি তবে গাই কোথা ?

শিখ । মলিরা—তুমি শারঙ্গের কাছে
গাড়াও—বসলে হবে না ।

অত কাছে না, এত রকম একটু তফাতে,

গাছের কাছে, একটু আড়ালে ; ঠিক হয়েছে,
বাঃ যেন ছবির মত দেখাচ্ছে !

তাহারা । বাঁচা গেল, আর ত ওলী

বদলাতে হবে না ?

(কাহারো ষাড়টা ঝাঁকাইয়া, কাহারো
হাতটা ছেলাইয়া, কাহারো মুখ ঈষৎ তুলিয়া,
কাহারকেও একটু পাশে সরাইয়া—পুনঃপুনঃ
সকলকে অবলোকন করিতে করিতে)

শি । না আর বদলাতে হবে না,—এবার
ঠিক হয়েছে,—চমৎকার ! কিন্তু দেখোঃ সময়
কালে তুলে যেন গোলমাল করে ব'ল না ।

তাহারা । তা করব না, তা করব না,
এখন চরেছে ত ?

অগ্নি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েছে ত ?

শি । বাঃ এখন বে পেতারবীর ষাড়টা
সোঝা হয়ে গেল । নীণার হাতটা নীচু হয়ে
শুড়লো ! মাঃ পারি না আর তোদের
সঙ্গে ।

(সচকিতে ওলী ঠিক করিয়া লইয়া)

উঠয়ে ! আর হবে না, আর হবে না
নিশ্চয় বলছি, ঐতিজা ।

নৃত্যকারিনীগণ । আমাদের হাব ভাব
কিছু বদল করতে হবে না ত অধিকারী
ঠাকরণ ?

শি । না তোদের কাহাণী ঠিক আছে,—
এবার আরম্ভ কর ।

(পুনরাবৃত্ত নৃত্যগীত বাদন ।)

কিবা রজনী রজত মধুরা ।

গাও গো সঙ্গে বাঁজাও সঙ্গে,

*

কহুতুহ নাচি আমরা ।

ইত্যাদি—

গান সমাপনে প্রণাম ।—সম্ভার গান শু

চৌল ; সজ্জার গানটা একবার গেয়ে নেওয়া
যাক,

সাধাব তোমারে আজি যোরা যতনে
অকোমল হৃদয় মণি ভূষণে !

হুহুম চন্দনে, অলঙ্কারে

কুহুম সুবাসিত ঢাক বসনে—

শি। খাম খাম, হস্তিনী আদছে—

(সহসা গীত বাজাদি বন্ধ করিয়া)

সকলে। সতি নাকি সতি নাকি !

আঃ নাম তুলেই আতঙ্কে অঙ্গ পিউরে উঠে ।

হু একজন। অর অর মাতঙ্গিনী দিদির

অর—

অর একজন। অর অর ভাতারনীর অর—

সকলে। অর অর প্রদাদাদিনির অর !

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মা। মরমা দেওয়া হোল ? তৃতীয়
প্রহরের বিস্তৃত ত আর বিলম্ব নেই—এখনো
তোদের এখানে সমালিঙ্গ চলছে ।

১। আমার আবেদনটা মাতঙ্গিনীদি—

২। আমার নিবেদনটা কর্তৃষ্ঠাকরণ—

মা। তোদের নিবেদন আবেদনের অলোচ
আমার দেখছি তিষ্ঠেনো ভার !

৩। চুপে চুপে। ডালির কথাটা বল,—
খালি কথার কি চিঁড়ে ভেজে লো !

১। এই রত্ন হার আপনার পূজার অজ
এনেছি—আমার চৌতলা বাড়ীটি যাতে শ্রব
হয়ে যায়—

(হার সমর্পণ)

২। এই আমার অর্ঘ্যদান—আপনার
অজ্ঞান হলেই আমার ভায়ের চাকরটি হবে ।

(হস্তের বলর পুলিয়ার প্রদান)

এই আমার বোনীবন্ধ আপনার

চরণে অর্পণ করছি—আপনার রূপার উপর
আমার স্বামীর পদোন্নতি নির্ভর করছে ।

মা। (হাস্তমুখে) হবে হবে—সবই হবে ।

(একজন দরিদ্র রমণীর প্রবেশ)

মা। এ আবার কে ?

১। আপনার নাম শুনে বড় আশা করে
এলেছি। আপনি মহারাজকে বলে বাবাকে
যদি কারা থেকে সুক্তি দিয়ে দেন। তাঁর
কিছু দোষ নেই গো—কিছু দোষ নেই ।

১। (চুপে চুপে) ভেট কিছু এনেছি
কি ? নইলে শুধুই মাথা হেঁট, বুনি লো ?

১। আদ্য যন রত্ন কিছুই নেই ! যা
ছিল সব গেছে—সব গেছে। এই যা আছে,
কেবল হাতের বালা ছগাছি—তাই চরণে
সমর্পণ করছি—আর আমার প্রাণভরা
কৃতজ্ঞতার আধীন আপনার কেনা দানী
হয়ে থাকবে ।

মাতঙ্গিনী (বালা হস্তে লইয়া নাসিকা

স্পর্শ করিয়া স্বগত)

এক সোনা। ঠিক ত পিতল। তার
অবশ্য ফাঁপা যেন সোহাগার খই। এই
নিষে কি না আমার ভেট দিতে এসেছে !
মাগীর আশ্চর্য্য দেখ ! সজ্জার অঙ্গে উঠেছে ।

(একাশ্যে) দেখ আমি রাজাও নই—

রাজীও নই যে দত্ত পুত্রদ্বারে রাজ্য ওলট পালট
করে দেব। এরকম অচ্যুতের কথাই আমাকে
অপমান করা ।

১। বড় আশা করে এসেছি, মাগো—
ফেরাবেন না, তাকাবেন না, একবার
মহারাজকে বলুন—রক্ষা করুন গরীবকে,
অনাথকে, ভগবান আপনার ভাগ করবেন ।

(চরণে পতন)

মা। এত ভাল আগার পড়েছি। এসব
বেতানা লোকই বা অধ্যাপকের আসে কেন ?
এ কি রাজকন্ডার মহল পেয়েছে—নাকি ?
পা ছাড় বলছি,—(পা টানিয়া লইয়া)

চোখের জলে হাছতাপে—আর মরলা
কাপড়ের দুর্গন্ধে মত্তবার জমাতে চাপ ত
লেখানে বাও বাছা,—আমরা ওসব সহ্য করতে
পারব না—তার কথাও নেই। ধারকনিকা,
অতিহারিণি!

৪। (ভূমিতে পড়িয়া) মা রক্ষা করুন
—রক্ষা করুন!

ধার-রক্ষিকার প্রবেশ

মা। একি রক্ষক কণ্ড! রাতার লোক
এসে ধাঁ করে গায়ে পড়বে, এত দেখছি বড়
বাড়াবাড়ি!

বা। বাইরের লোক নাকি! ভাত
লানিনে! আমি স্তেবেছিলাম ললিতার কোন
আত্মীয়া—মাগ করবেন!

মা। মাগ মাগ—মাগ করবার আমি
কে? বেতনার সব বেতনটা হয়ে উঠেছে।
সরাও একে এখন এখান থেকে।

রক্ষকী—(কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া)

মাগো সংসারে কি আর ধর্ম বিচার নেই!
ভগবান কোথায় ভূমি।

বা। কথার কথার ভগবান দেখান।
ভগবান শ্রীম তোমার মুক্তি দিন। যা এখন
থেকে তাকে নিয়ে যা। আর সেন কাজে এ
রক্ষক পাঁকেলি না হয়!

বা। চল, মরতে কি আর জারগা ছিল
মা তোমার। (তাহাকে লইয়া ধাররক্ষিকার
প্রস্থান।)

মা। তোমরাও সবাই প্রস্তুত হয়ে
নাও—আমি মূল আনতে চলে! (প্রস্থান)

১। মাগী যেন রাজনী, হেথলে গায়ে
সর আসে।

২। আহা মেয়েটি দানের ঘাটে আমাকে
ধরে পড়েছিল—তাতেই আমি এ সময় তাকে
এখানে আসতে বলি। কে জানে লভ্যই
বাঘিনীটা তাকে গিলে ফেলার উদ্ভোগ করবে।

৩। ওটা না মরলে রাজ্যের লক্ষ্মী নেই।
সকলে। (আগুল মটকাইয়া) মক্ষক—
মক্ষক।

১। তাহলে হরির লুট দেব।

২। তাহলে গিরি দেব।

৩। কালীর কাছে পাটা মানছি।

৪। শিবের চরণে বিধিপত্র।

সকলে। মরছে পে মরছে নিশ্চয়,
হরিবোল,—হরিবোল—হরিবোল।

শিব। আরে খাম, ভোরা যে হালিটা
কারা করে তুরি!

১। তাইত হুনিয়ার নিরম—প্রথমে
হালি তার পর কারা!

২। আজ শিব কাল বৃদ্ধ।

৩। বারই অগা—তারাই মুকু।

সকলে। তলে আবার বল ভাই,
হরিবোল চুরিবোল। (নেপথ্যে হু-মুক্তি বীদন।)

শিব। খাম খাম, ঐ রাজনী বেজেছে
হরিবোল রাখ—মুহুরে শেব কর,—গান
গাইতে গাইতে চল—বাওরা থাক।

রজনী রক্ত মধুরা

গাও গো রক্তে বাজাও সজে

‘কণ্ড ভূপু নাচি আমরা।

(গান গাইতে গাইতে প্রস্থান।)

চীন ভ্রমণ।

(হংকং হইতে)

১

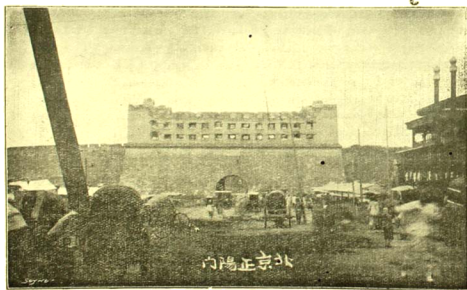
আমরা কোলি লেসিং নগর পরিত্যাগ করিয়া ২৪ কোলি দূরত্ব চলিয়া অবশেষে সাটাত নগরে পৌছিলাম। এই স্থান নগরটি একটি ছোট পলতের নিয়ে অবস্থিত। ইহারই সমীপে টিনের বিখ্যাত ইটকনিষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয়। অতি আশ্চর্য্যে আমরা সেখানে পৌছিলাম নগরের ভোগ্যের নিকট যাত্রা লইলাম। পথভ্রমের সময় ঘর্ষন করিতে বহির্গত হইলাম। ৮/১০ হাঁট এই দুর্গ জাতীর (Rampart) উপর দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। ৪২-বিশীষ্ম দুটি পুরাতন অগ্ন্যবলত পিতলের কামান আমাদের নগর গোত্র হইল।

আমাদের যথা একজন অস্ত্রমন্ডলভাণে জাতীর হইতে নীচে একটি ডিল মুক্তিলাভ হিলেন। দৈবাৎ উহা একটি সুস্থের পায়ের লাগে। তাহাতে উহার বানী নবা ক্ষুদ্র হইয়া পতঙ্গোল খাবাইয়ার উল্লেখ্য করিলেন। আমরা বিনেশী লোক আবাদিগকে শিক্ষা দিবার অভিযানে একটি জনতা আমাদের পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল ও আমরাও আশ্চর্য্যে দেখিলাম সমীপে দিয়া যাত্রা লইলাম। কিন্তু তাহারাও শুধায় দিয়া উপস্থিত। সেখানে নানাসকর ওষধি করিয়া ভোগ্যমোহন ও সাধনার অংশেই সুশিষ্ট চীনেদের কোল সাপ্তি হইল। এই যাত্রার সময় সেখানে থাকা আর দুর্জনপুত্র নয় বিবেচনা করিয়া পরদিন আশ্চর্য্যে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

এইবার পাকো ত্যাগ করিয়া সামত পুটে উঠতে হইল। এক বটী চলিয়াই বিখ্যাত নান্কাউ পাসের (Nang-kaio pass) যুগে আসিলাম। এই pass এর অর্থেন পদ দিয়ার সজীর্ণ ও বহু। এইখানে বিরাট জাতীরের চতুর্ন বৈভব। উহা পার হইয়া কয়েকজন মেতহালত লজ্জন করিলাম। শেষ পদটি (pass) চলিয়া হইতে যাত্রা বহু দীর্ঘ। পল্লব আশ্চর্য্য বিবারণের অত এই স্থানটিকে বিশেষ গুরুত্ব

করা হইয়াছে। এই স্থানের মনোহর আভির্ভূত পুস্ত্র শৈলিগা বিজল হইলাম। পাহাড় তের করিয়া একটি পুস্ত্র গোত্রপতি অবস্থিত। উহার উচ্চ পার্শ্বের পাহাড় পরশত এক মল্লের বে যানে স্থান সুগঠিত প্রবেশ করে না। উহার উপরে চীনদেশীয় একটি বিশ বস্ত্র পরিমিত প্যামোডা মন্দির। পাহাড় কংগি মন্দিরের দিগ্গৈ তৈজার হইয়াছে। মন্দিরের প্রবেশ ঘরটি অতীর্ণ স্থানর কাঠকাঠমোহিত স্থান হইতে হস্তিত। চতুর্দিকে টিনে লীন চলিতেছে। দেশেলে নগর বন মুক্ত ও অতরে পশ্চিম তানের উপর হইল। যথার্থই এমন ভয়ঙ্করভয়করী পুস্ত্র ও স্থান সুগঠি দেখি মাই।

উহার পার পাহাড়প্রদে অবশিষ্ট হইল চীন জাতীর অতিক্রম করিয়া নান্কাউ (Nang kao) নগরে প্রবেশ করিলাম। তির দেশীয় যুগপৎ মনোমুগ্ধবাই এই স্থানে পতিমিতি মনোমুগ্ধ এই স্থানের আধুনিকত্ব অশেষকই ইংরাজী ও ফার্সী ভাষা মুক্তি পাবে। এই স্থানের এক পুস্ত্র আদ্যকরণ দেখিলাম। মনোমুগ্ধনের যথ (Sedan) মেডান চৌকিতে চড়িয়া অবিকার এখন মন্দির (Mandarin) ব্যতীত আর কাহারও নাই। তবে মনোমুগ্ধকার পাণ্ডিতে মনোমুগ্ধরণে ঘাইতে পারে। আমাদের বাসার আশ্রয়ে পাকো করিয়া একটি মন্দির উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম পাহাড়ের দুইটা দ্বারা পা ছোট করিয়া তিনি এখন চলন্তকিরিত হইয়াছেন। মন্দির না বইলে এক পা চলিবার শক্তি তাঁহার নাই। মনোমুগ্ধের পা দুইপাশি আছে তাহা দেখিলে সহজে অনুমান হয় না। ঠিক যেন পুস্ত্রের পা। আশ্চর্য্য চীনের মনোমুগ্ধবোধ; চলিলাম যে পশ্চিতি তাঁহার বিবাহ হইয়াছে ও বানীর পতিত বেড়াইতে চলিছেন। অবস্থিত পরেই দেখি যে একটি স্থানর বেশ পরিষ্কার এক ভয়ঙ্কর পুস্ত্র ভয়ঙ্কর আসিয়া উপস্থিত। পুস্ত্রলাস ইনিই স্থানীয় বানী।



শ্রীমৎ দেবেন্দ্র কবী আচার্যের এখা বড়ই অভিনব।
 অমীম্ব বর্ণাচারীদিগের উপর সম্যক শিক্টি
 কর আচার্যের অনুসন্ধান করিলেন। তাহার তাৎপার্য
 অমীম্বের প্রতি উদার দৃষ্টি আচার্যের চকু লিল।
 তাহার আচার্য তাৎপার্য দ্বিতীয় বর্ণাচারীদিগের
 উপর ইহার দৃষ্টি আচার্যের আচ্ছাদিত। এইরূপে
 বারম্ভাশা। তাৎপার্য প্রকৃতি হইতে লাগিল, অতঃপর
 কদম্বাভিপ্রায়গণকে বাহা ইহার সম্মানের ভাবে
 অতঃপর। অতঃপর অধিক দৃষ্টি কর তাৎপার্য হইল।
 এই দৃষ্টি হইতে বর্ণাচার্যের বর্ণাচার্যের আচার্য
 পাঠ্য। তাৎপার্য। শ্রীমৎ কবী তাৎপার্য
 জনক করিয়া মোট আচার্যের অধিক দৃষ্টি হইতে
 পাই নাই। তাৎপার্য, আচার্যের শ্রেণীর তাৎপার্য,
 দৃষ্টি বর্ণাচার্যের তাৎপার্য কদম্বাভিপ্রায়গণকে
 পাই নাই।

সহানুগের শিকম সহ্যই গ্রীষ্ম সময়জোয় রাজধানী ।
ইহার অনুসরণে এত অধিক যে, ভবিষ্যে বিস্তৃত হইতে
হয়—আর চল্লিশ কোটি । এত অধিক জনসংখ্যা
পূর্ববর্তী আব ভূভাগে দৃষ্ট হয় না । শিবিরে
চীনদেশীয় এবার এখান সাধারণ Mandarin
লইয়া বহুসংখ্যক অবস্থান হয় । রাজ্যের দায়িত্ব
কাৰ্য্যভার উভয়ের উপর প্রাপ্ত । সম্রাট সর্বদা
রাজধানীতে বাস করেন । চীনদেশের ভিত্তি
বিভিন্নজাতিদের দ্বারাও বৈচিত্র্য প্ৰাপ্ত হইয়াছে
পৰীক্ষা দিবার ক্ষমতা এখনে অক্ষয়ন করেন । এই
সহানুগের চারিভাগে বিভক্ত :—১ম গ্রীষ্মসহর,
২য় ভাত্যাসহর, ৩য় রাজকীয় (Imperial) সহর, ও
৪র্থ নিষিদ্ধ (Forbidden) সহর । প্ৰত্যেক ভিত্তি
সহরই বহুসংখ্যক উচ্চ আট্টারখানা দ্বিষ্ট । শতক
আনন্দন নিবাণের প্রাপ্ত আট্টার উপরিত্তে উচ্চ
দুর্গ আছে । উত্তরা কোল নামে রাজ্য দুর্গ, কোলক
কাঞ্চকী নামে । নিষিদ্ধ সহরকে পশ্চাত্ত্বাগে
রাজপ্রাসাদ অবস্থিত । পূর্বে শতাব্দী হইল
যখন ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য দিল্লি হইয়া
এই নগর আক্রমণ করে, তখন ফরাসীরা রাজপ্রাসাদ
হইতে বহুসংখ্যক লোককে লুণ্ঠন করিয়া 'লিহা' নামে
উত্তা এখন নগর ও পূর্বাংশ বিউল্লোবনে গোপন

বর্ধন করিবেকে। গাথা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা এইবার ইচ্ছাপূৰ্ণ ও আনন্দিকার ভাষায় সেবানী উদয়লাল করিয়াছে সে বিদগ্ধ অশিক্ষিত বিহু বলিবার আনন্দক নাই।

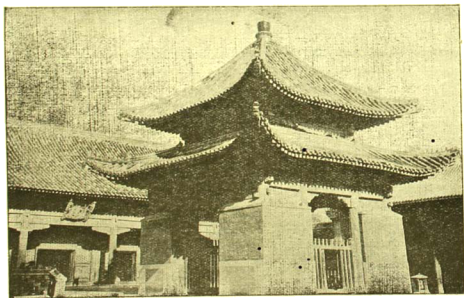
১) মনোবেশে অধিগমন করা নতুন একশের।
 ২) যোগে যা গুরুত্ব করতেন তাই হল। অর্থাৎ যোগ
 ন্যায়ের প্রতি, মূলতঃ যোগের যোগের যোগের
 ৩) যোগের যোগের যোগের যোগের যোগের
 ৪) যোগের যোগের যোগের যোগের যোগের
 ৫) যোগের যোগের যোগের যোগের যোগের
 ৬) যোগের যোগের যোগের যোগের যোগের
 ৭) যোগের যোগের যোগের যোগের যোগের
 ৮) যোগের যোগের যোগের যোগের যোগের
 ৯) যোগের যোগের যোগের যোগের যোগের
 ১০) যোগের যোগের যোগের যোগের যোগের

শিকশনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও
যেমন মূল্য তেমনই চিন্তাশ্রমের বৈধতা। বুদ্ধি
সামর্থ্যের সমস্ত চিন্তা এই এক সময়ে আশ্রিত হওয়া
করে। তখনই পাই শিকশনে আশি হাজার চিন্তাশ্রম
হয়। কিন্তু ভাবের দলপতি ভাবের দলপতি।
সাধারণিক বিষয় পরিচালনা করেই হলে ইচ্ছার
মত গণ্য করা হয়। এখানে মর্মেই নাট, শুধুই
যেমন গুণ, তারই শ্রুতিগোষ্ঠে চিত্রিত হওয়ার।
সময়ের বড় হওয়ার দুইপাশে একই সময়ে তার
কেবল প্রায়শই বাস্তবের উপস্থিতি, লেখক,
নাশিত ও পুস্তকন বস্তুবিশেষের পরিচয়। ভাবের
বিশেষের কঠোর নিবেদন বাস্তব ও ভাবের গুণবিশেষ
করিবে।

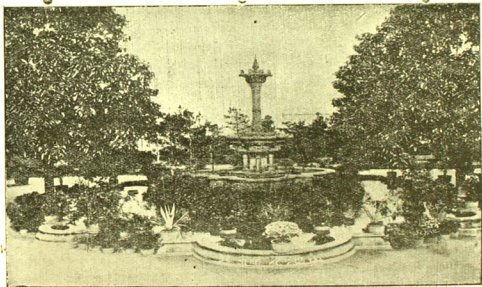
তীব্রবৈদ্যের স্বকায়সম্মান অমলকট। ইচ্ছাপ্রসঙ্গ
 নত। লব্ধবদন করিত। কইবার সময় সঙ্গে
 অনেক লোক গার। তখনো বালকবেলা বাকী প্রভৃতি
 গর খান্নাইটে বালকটিতে যার ও বৌদ্ধ পুরোহিতের
 ধরাপি পঠি করিয়া ও গুপ্ত হবাদি পোড়োটে
 পোড়োহিতে যায়। ই সঙ্গে কতগুলি ভাড়া কান
 খোকসকাপক পাতে। তাহারা ঘূরের লগ্ন কই
 না। কাননিক খোকসকাপ করে। এইরূপে লম্বা
 বয়সোৎপূর্ণ হয়। জন্মসঙ্গে মুক্ত পণিতাঙ্ক
 বদনাদি একটি পাড়ী করিয়া নইয়া পাড়ী হন এবং
 আভ্যন্তরে যেত বৎ পণিতার করিয়া থকে সঙ্গে
 যায়। সপ্তাহে পণিতারকেন কখন লগ্ন বালক

ভাৰতী ।

বৈশাখ, ১৩১৮



ଚିମ ଶ୍ୟାମ



ভাবতী ।

যথো নব জটিল যাতনা হয় । যথৈ হয় কলিকাতার
অনেকে নরপ শোভাবাহী বৈধিবা থাকিবেন ।
বেলিভাষাটার খালশায়ে চীনেদের পোষ্যদান আছে ।

বিশেষ সীমিত বিবাহে যুক্ত বাবার লাল ছাড়া
বহিঃ লইয়া যাকিয়া হয় । সেই সঙ্গে নিশান ও
আলোর পটী করা হয় ।

দিকিমে দেখিবার উপযুক্ত একটী মন্দির দেখে
যাচ্ছে । উহা একটী বিখ্যাত ঐতিহ্যের উপর অস্তিত
করা হইয়াছে এবং তাহার চতুর্দিকে সমস্তের সন্মো-
লোভান । এই কালের মূল অমরাবতীর সূত্র ।
জলাশয় নানা সজার স্তম্ভের স্তম্ভে উদ্ভবে পরিপূর্ণ ।
চীনের সমস্ত উচ্চতর মানবাত্মার পুণ্য স্মৃতিস্তম্ভ হয় ।
এই স্থানের চতুর্দিকে কোটে কোটে টিলাগুলি যেন ওই
বেলিতেছে দেখে হয় ।
স স্তম্ভ টিলায় উপর মান-
বাত্মার চতুর্দশা বহুদূর ঠিক আছে এবং ঐ স্থানে
অনেকগুলি প্যাণ্ডোড : যা তখনালের আছে । জলের
মধ্য হইতে কতগুলি উচ্চ স্তম্ভ উঠিয়াছে । সেগুলি
বিভিন্নাত্মক, দেখায়ে বহিঃসার আশ্রয় আছে । উচ্চ
ঐতিহ্যের চারিদিকে পাণ্ডাগুলি স্থাপত্য, যথৈ পরিষ্কার
ও মন, ঠিক যেন মনমলমিত্রিত বলিয়া মনে হয় ।
স স্তম্ভ পাণ্ডোডের উপর মানবাত্মার লভ্যগুলি
বহিঃ চীনা জলের উপর স্থিতিয়া আছে । এই

মানবী যথার্থে বিলাস উদ্যান, দেখিলে মন মন
চরিতার্থ হয় । যতই দেখা যায় অগোচর আর
যেটে না, মানবী লভিতাপ কঠিনে হইয়া হয় না ।
নির্দোষ কঠোর বিবেচনায় এবং কঠোর উচ্চ মনোবৃত্ত
উদাহরণ ।

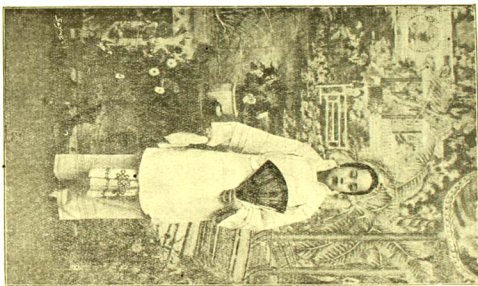
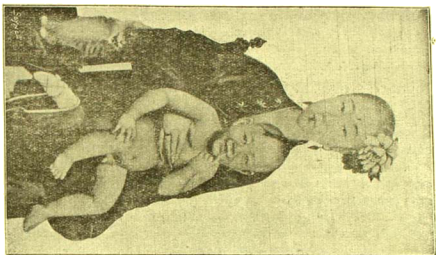
দিকিমেই স্মৃতিতে কতকগুলি কথার পানবী
যায় কঠিনেতে । তাহারেই বেশ ও পরিষ্কার ঠিক
চীনেদের মত । বাবার কোটী পদার্থে স্থানে
নাই । এই লক্ষ্য পানবী চীনের অগোচর
কায়ন ।

চীনেদের মধ্যে বারনা যুগাই করিবার ক্ষমতা
অনেকের সঙ্গে বাবার কঠোরতাবি চিত্র মনোবৃত্তি
করিলাম । তিনে যে মার্শনা মনিঃ বেক্স
হইয়াছে সেটী বহু পুণ্ডরন ; এইখানে স্মৃতি স্মৃতি
বৎসর একদিন আশিরা আশিরা করেন—হাওয়া
কোনোএক স্থানটীয়া উপস্থিত হইলেও তিনি এইপ মন
আশিরা আশিরা করেন । ইহার নির্দোষ কোণল এমন
চমৎকার যে উহারে চিত্র পদ বিরা বস্তু অগোচর করিয়া
বিহারে বাহ্যার বহু পদ, কুলিতেছে । তিনে
মহল উচ্চাটপ চমৎকার ও এখানে চীনের চতুর্দশ
স্মৃতি জগৎগরন করেন ।

সমালোচনা ।

রচনা-প্রণালী ।
মুখ্যোপায় বিএ প্রকৃত । সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিসে
বৃত্তিত । মূল্য আট মান্য । স্রব্ধকার বহুগণ বিভাগের
বিভক্তের ব্রত এবং করিয়াছেন । তিনি "শিকা-
ভাষ্যে বাণ্ডত থাকিয়া বাহ্যনী হাতের বাহ্যনা
ভাষ্যে অজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়া ০ ০ বাহ্যনা রচনা
সময়ে সাধারণ নিয়মাবলীপূর্ণ" এই পুস্তক রচনা
করিয়াছেন ।
আজগত ও বিস্তৃতি সাধনোপক্ষে
তিনি উদাহরণস্বরূপ কতগুলি এসোসীমীর হস্তের
অন্যতাপ্য করিয়াছেন ।
হস্তগুলি হইতে তাহার
পদব্যাগ ও চিত্রাশিল্পের পরিচয় পাই ।
হস্তগুলি

শিকাগী ও শিকানবীপণ্যে যিবৈ উপকারে ত
লাপিবেই, কথিকত্ব থাকিলে পত্রিকার বহুলমত ও
স্রব্ধকার এই স্রব্ধগণে রচনার জন্ম সাধনোপায়ের
অন্যদর পাইবেন । তবে স্রব্ধগুলি ভাষা স্থানে স্থানে
কঠিন হইয়া পড়িয়াছে—অর্থবোধ একটু কষ্টসাধ্য—
স্রব্ধের ভাষা সীমিতমত মূল্য বেক্সা উচিত বলিয়া
মনে করি ।
স্রব্ধকার বহুগণকে ব্যাকরণের প্রতি কিস্তি
অতিরিক্ত মনোযোগী দেখিলাম—বহুভাষা উচ্চতর
পদে চলিয়াছে, এমন বহি মান্য ।
স্রব্ধ-সুখলে তাহাকে
চাণ্ডিরা বস্যা হয়, তবে গতিতে বাধা পড়িবার আশঙ্কা
আছে, কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, "মৌল্য শিকান



পূর্বে ‘সীতা সরসতা ও বিলতি যে শিকড়ের তথিবনে
সরসৈব নাই’—এ কথা খুব ঠিক। এ ছবি পরিদ্রষ্টে
বড় বাফালা শব্দে প্রতিপদ সমস্ত হইয়াছে।
এছাড়াওের সহিত সঙ্গত অর্থও একমত না
হইলেও, এছাড়াওের অর্থোচ্চারণ ও উপকারিতা
স্বতন্ত্রে আলাদাভাবে বর্ণনাত্মক লক্ষ্যে নাই।

ইতিহাসও লক্ষ্যে :

অজিত-বোম্বাই — ২. টেবিল-পাশে বসে গাফিলি।
মুখা এক টাক। ইহা একপাশে দাঁড়ানিও গ্রহ।
এছাড়াও টাকতে বোম্বাইয়ের মূল হস্ত বুঝিয়ে চোঁড়া
করিয়াছেন। তিনি বোম্বাইয়াছেন যে ইঞ্জিনিয়ার কান
সমস্ত ‘আপেক্ষিক’ : সুতরাং, এই জান হইতে আমরা
কোনও অবশেষে ভিন্নতর বাস্তবত্বের পরিচয় পাইতে
পারি না। আমি বা আমার আত্মা বাস্তবতার
কিছুই নাই। বস্তুতঃ ‘আমি’ এই সমগ্র জগৎ-

জগৎব্যাপক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টিকর্তা নহে (তবু)
স্বতন্ত্র—(বস্তুতঃ) স্বতন্ত্র’। এছাড়াও কেবলমাত্র
আলাদাভাবেই বিবেচন করিয়াছেন, অল্প কোনও
মত লইয়া তাহার বক্তব্যের প্রকাশ পান নাই।
দার্শনিক গ্রন্থে দার্শনিক ভাবে প্রতিপাদন করিতে
হইলে প্রতিপাদ্য বিষয়টী একটি দৃষ্ট বা প্রতিজ্ঞার
আকারে নির্দেশ করিয়া, যা কেবল তৎসমস্যা
বিবেচন তাৎপার্যের বিবেচন করিয়াই শিষ্ট হওয়া
কর্তব্য নহে; অপর পক্ষেও যতগুলি প্রদান করিয়া
এক একে তাহারদের সম্মুখীন করা করিয়া, কোন প্রদর্শন
করিয়া তাহারদের বক্তব্য করিয়া, ক-বটে উপনীত
হইবার চোঁড়া করাই উচিত। যত্বেকার অমতঃ
‘জগৎ-বর্ণনা’ ও ‘যৌগিক বর্ণনায়’ কতের আশোচনা
করিলে তাহার পূর্ণত্বের উপযোগিতা বুঝি পাইত।

ইতিহাসের বর্ণনাপ্রণালী।

কবি-সম্বন্ধনা ।

আগামী ২০শে বৈশাখ ছবিবার তাবিবর শ্রীমুক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রদ্ধা বন্দন সম্পূর্ণ করিয়া
৩১ বৎসর পরে পুনঃ করিবেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের
দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যদেবী : তিনি বহুদূর
বহিরা মানচিত্রে স্বতন্ত্রতা ও স্বতন্ত্রত্বের সন্ধান সাধন
করিয়াছেন। তাহার এক বংশবৃত্তির অমূল্য
উপলক্ষে তাহাকে যথোচিত অভিনন্দন ও শুভা শু
সম্বন্ধনা করা সেন্দেবীর বর্ণনা বলিয়া মনে হইয়াছে
নিরালম্বিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি দীর্ঘ
সংগীত হইয়াছে : সমস্ত ইচ্ছা করিলে সভ্য দেখা
গ্রন্থ করিতে পারিবেন।

ইতিপূর্বে আমরা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যদেবীগণকে
যথোচিত সম্মান দেখাই নাই : তাহাতে আমাদের
জাতীয় কল্যাণ হইয়াছে : রবীন্দ্রনাথের আগামী জন্ম-
তিথি উপলক্ষে যেন আমরা ঐ কল্যাণ সাধন
আরম্ভ করিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান দান তাহাতে দেশব্যাপী
চল, অল্প সমিতি দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ধিত সাহিত্য
পরিষদে এই কাণ্ডের তার গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত
করিবেন। এবং পাইবাদের সহিত পরামর্শ করিয়া
উৎসবের দিন ও স্থানটা বাধা করিবেন।

সমিতি দ্বারা করিয়াছেন যে, উৎসব বিষয়ে সাধারণ
উৎসবের সঙ্গে কবিব্রহ্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রচার নিবন্ধন
মন্ত্রণ উপহার দেওয়া হইবে এবং কবিব্রহ্মের সাধ

সাহিত্যিক কবিব্রহ্ম উৎসবে বঙ্গদেশের সমস্ত কবি
কোন স্থানী অনুষ্ঠানের আয়োজন হইবে।

সমিতির উদ্দেশ্য আশা পণ্ডিত কবিব্রহ্ম অল্প
সমিতি সাধারণের সংগৃহীত ও অর্থ সাহায্য কার্যনা
করিতেছেন। এ বিষয়ে সকলেরই সংগেবন প্রার্থী।
‘দীন দ্বারা লিখেন সাবিত্রী’ গীত হইবে এবং সংবাদ
পত্রে বিস্তৃত হইবে। সমিতির বন্যব্রহ্ম শ্রীমুক্ত
অজিতকলার তার চৌধুরী মহাশয়ের নামে ৩০ নম্বর
তালিকা হইত, কলিকাতা প্রকাশ্য টাক পাইয়াই
হইবে।

সমিতির সমস্তগণ

মহাশয় শ্রীমুক্ত মল্লিকগণ নন্দী।

মল্লিকগণ বহু।

অজিতগণ বহু।

অজিতগণ বহু।

মল্লিকগণ বহু।

মল্লিকগণ বহু।

মল্লিকগণ বহু।

মল্লিকগণ বহু।

মল্লিকগণ বহু।

(সমিতির সম্পাদক)

শ্রীমুক্ত অজিতকলার তার চৌধুরী।

(সমিতির বন্যব্রহ্ম)।

ইতিহাস। ইতিহাস।

কলিকাতা, ২০ কর্তব্যগণি ট্রা কলিকাতা গেজে, ইতিহাসের মতো যারা সুস্থ ও ৪৪, ৩৫ বাসিন্দা হোটে হইতে
শ্রীমুক্ত অজিতকলার তার চৌধুরী।



ଅକ୍ଷରାବଳୀ ଲିଖନ

ଶ୍ରୀମତୀ ଡେବିକାନ୍ତା ଆଦିତି ଚିତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା

[କେ. ବି. ସେନ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରକ]

[ଆଦିତି ଗୋପାଳ ଗୁପ୍ତ]

ভাস্করী

৩৫শ বর্ষ]

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮

[২য় সংখ্যা]

বিবাহ । (ঐশ্বর্যের অহুতি)

(৩)

কস্তুর পিতা নাই। পিতামহ গদাধর ভট্টাচার্য্যের ঘরবার করিয়া দিন কাটিতেছে। ঐশ্বর্যের বাড়ীর বাহির হইতে রেলের গাড়ী দেখা যায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি সেইদিকেই চাহিয়া আছেন,—সানাহারের সন্ধ্যা গৃহে গমন করেন মাত্র,—আবার মণি অপ করিতে করিতে উল্লাসচিহ্নে বাহিরে আসিয়া পড়ান। এমনি করিয়া নিমেষমুহূর্ত্ত যায়, দিনও কাটে, সন্ধ্যাও আর কাটিতে চলিল—তবু ঐশ্বর্যের বা তাহার পিতার দেখা নাই। তাহার পিতাও সন্ধ্যামাত্র তথি করিতে তাহার অহুগমন করিয়াছেন।

কস্তুর মাতা ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্রবধূ— স্বত্তরকে কিছু বলেন না, ভগবানকে ডাকিয়া, তাহার উপর একান্ত শ্রাণে নির্ভর করিয়া নীরবে ধৈর্য্য পরিয়া আছেন। কিন্তু কস্তুর শিশুত্ব, ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিদ্যা কস্তা পিতাকে অস্ত্র পাথরের সন্ধানে তৎপর না দেখিয়া প্রতিদিনই তাহাকে অহুযোগ করেন। যে সকল স্মৃতিস্মরণ বিবাহ নিমন্ত্রণে আসিয়া এখনো গ্রামে রহিয়া গেছেন তাহারাজি অস্ত্র অহুযোগ

আঙ্গানের অবলম্বন কর্ত্তাকে উত্থাপন করিবার লক্ষ্য উপভোগে ক্ষুণ্ণ করেন না। ভট্টাচার্য মহাশয়ের কিঞ্চিৎ প্রবল বিদ্যা অহুযোগ নির্দোষ, অতএব সে নির্দোষই, যথাসময়ে নির্দোষ,—তিনি সকল অভিযোগ অহুযোগ ভগবানের নাম জপিতে জপিতে নীরবে লক্ষ করেন।

তাঁহার এ বিদ্যা সন্ধ্যা কিস্ত সাতদিন কাটিয়া গেল—ঐশ্বর্যের আসিয়া না; এমন কি ঐশ্বর্যের পিতাকে তিনি আজুল আগ্রহেরে যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছেন তাহার একখানিরও উত্তর পর্য্যন্ত এখনও পাঠগেন না।

বিবাহ প্রাক্কালে তাঁহার বিদ্যা কস্তা শুভ মলিনবুধে তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল—“বাগা চাতুল গে যার! আজ ঘরের বিয়ের দিন, আর পাথ ঠিক না করলে আর কবে হবে! তার আগে ছেড়ে দাও।”

বাহির বাতীর সম্মুখে পাথর রাখান নবীন অখণ্ড রক্ষণে একখানা মাজের উপর বসিয়া কয়েকজন আত্মীয়জন পাশে খেনিতেছেন, আর কেহ কেহ নিকটে বসিয়া খেলা দেখিতেছেন। ভট্টাচার্য

মহাশয় তাঁহাদেরই পাশে রেল অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া মাথা জপিতেছিলেন, এমন সময় কব্জার আবির্ভাব এবং তাহার মুখের এই কঠোর সত্য কথায় নৈরাশ্র বেদনার তীব্র সঙ্গত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—“সে কি হয় মা—সে যে নির্দোষ।”

পাশা খেলার একজন দর্শক নিখিরান চক্রবর্তী হাতের হুঁকাটি লষ্টকৈ রাখিতে রাখিতে এই কথাগুলি শুনিলেন, শুনিয়া খেলা দেখার লোভ স্তব্ধ করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চানন্দলাভের আশায় অবিলম্বে নিকটে আসিয়া উত্তরস্বরূপ কহিলেন—“ভট্টচাষ মহাশয় অনেক সময় নির্দোষ লোককেও ত দোষী হতে দেখা যায়।” ভট্টচাষ মহাশয় দুবাক্যে ভাষাশাস কিছু অব্যয়ন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সেদল এখন প্রায় কিছুই মনে ছিল না—অত্যাশি নিখিবামের মৃতিটা তাঁহার মনে স্রাজ্জ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, যে নির্দোষ সে আবার দোষী হইবে কিরূপে? তিনি মাথা নাড়িয়া কহিলেন—“হতেই পারে না,—সে যে বড় ভালমহুয।”

“জানেন ভট্টচাষ মহাশয়—ভালমহুয বলেই আরও ভয়! ভালমহুয লোকই অজ্ঞকাল দেশ দেশ করে পাগল, ভালমহুয লোকেই গুইরা যা বোঝাচ্ছে তাই বুঝছে। দেশের নামে—পুন ডাকাতি।”

শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে ভট্টচাষ মহাশয়ের মৈথ্য রহিল না। তিনি অবিশ্বাসপূতক মাথা নাড়িয়া কহিলেন—“ছোটবেলা থেকে জানি যে তাকে,—সে তা নয়।”

“কিন্তু অবশ্য একটা কথা ত ভ্রামতে

হবে। দোষী হোক নির্দোষ হোক হাজতে ত রয়েছে—সকল জাতের ছোঁয়া নাড়া ত থাকে, জাত ইচ্ছন্ন ত আর রইল না—দাগিত বটে!”

ভট্টচাষ মহাশয়ের চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল—দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—“তবে তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কবো। কিন্তু—কিন্তু সংপাত্রই বা কই?” তাঁহার কন্ঠা কহিলেন “সে আমার ষ্টিক করেছি, ঐমত্ব বিধে করতে পারি।” ভট্টচাষ মহাশয় আহুত মর্দ্য বাধা বাক্যে প্রকাশ করিয়া কহিলেন—“ঐমত্ব! তার ছেলে, বো নাতি নাভনী—সে যে আমার নগেনের চেরেও বড়। হা ভগবান—নগেনকে তুমি ডেকে নিলে—আর এই দুঃশ্রেণ্য সম্মানটিকে আমার কাছে রাখলে কি আমার হাত বিধে তাকে বলিদান দেবে বলে! মা ওকথা বলোনা মা,—আমি তা পারব না।”

“কি করবে বাবা—সবই বরাত! আমাকে ত ছেলেমহুয বরের হাতেই দিইয়েছিলে। আমার কপাল পড়লো কেন বলা! যদি অদৃষ্টে থাকে এতেই সে সুখী হবে। আর দোজব’রে বর আদরবর খুব করবে—পরদা কড়িরও কংখ নেই।”

নিখিরান চক্রবর্তী তাহার মতে সাধ দিয়া গেলেন,—“তা বই কি সবই ত কপালের কথা। আর এখন পাঁচটা দেখা শোনারই বা সময় কোথা—দেয়কে ত আজই পাত্র করিতে হবে, নইলে জাতরক্ষা হয় কই?” বুকের চোপ দিয়া জল গুহিতে লাগিল। প্রাণের মধ্যে গভীর অনিচ্ছায়া আতঙ্ক গুণিপ্রবাহে আলোড়িত হইয়া উঠিল—কিন্তু তিনি বুঝিলেন,

সেই বর্ণিশাকে আদ্যবন তাঁহাকে ক্রান্ত বিক্রান্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে থাকিলে; তথাপি কতাকে তিনি অবিনাশিত রাখিতে পারিলেন না ।

অনেকক্ষণ হইতেই রেলগাড়ীর শব্দ হইতেছিল,—এই সময় শব্দটা বাড়িয়া উঠিল, এবং শব্দে বাশিঙ বাজিয়া উঠিল । তিনি শেষবার আকুল আর্থনা করিয়া অকুমারের আগমন প্রতীক্ষার গাড়ীর দিকে চাহিলেন । গাড়ী খাণ্ডিল, বাহারা নামিবার তাহারা নামিয়া পড়িল, আবীর বাশি নামিয়া উঠিল; হসহস শব্দে গাড়ীও চলিতে আরম্ভ করিল । মহলা ভট্টচাঁব মহালয়ের বিবর্ণ মুখে জ্যোতি নির্গত হইল । একজন দ্রুতবেগে এইদিকেই আসিতেছে দেখিলেন । কিন্তু সে যখন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, বৃদ্ধের ঐহুকাপূর্ণ উচ্চল মুখ মুহূর্তে নিরাশমলিন হইয়া পড়িল । তিনি ক্রৌণকর্ষে বলিলেন—“তুমি অকুমার ! আমাদের অকুমার কোথা ? আগছে কি না জান ?”

অকুমারের বাড়ী ঘাইতে পথের ধারে ইহাঁদিগকে সমবেত দেখিয়া বৃদ্ধ অকুমার প্রথমে এইখানেই আসিয়া দাঁড়াইল এবং ভট্টচাঁব মহালয়ের প্রাণে সন্নিহনে উত্তর করিল—“কেন সে কোথা ? অজ্ঞ যে তার বিয়ে ।” তখন নিবিরাম এবং ভট্টচাঁব মহালয়ের কক্ষা উত্তরে মিলিয়া আভোপাত্ত সকল কথা ইনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন, সে অনিরা তন্ত্রিত হইয়া গেল !

কথা শেষ হইলে নিবিরাম বলিলেন “এ বিপদে অকুমার তুমি যদি বন্ধ-কর তবেই বৃদ্ধ দাঃসুত হন । লানত হিন্দুর ঘরে—তার

গারে হনুদ পড়েছে—অকুমার আহুক বা নাই আহুক আক ঘরের ঘরে দিতেই হইবে—তুমি বিবাহ করলেই আত্মকুল বজায় থাকে ।” অকুমারকে কে যেন মহলা অন্তলমুখে তেলিয়া ফেলিয়া ছিল । সন্ততপূর্ণ বিধরে বতজান হইয়া সে পরবৎ বলিল—“সে যে আমার বন্ধু” ।

“তুমি বিবাহ করলে বক্তার কাজই হইবে । তবে দেখ তুমি যদি বিয়ে না কর ত বিয়ে বন্ধ থাকবে না,—আজই কক্ষার বিয়ে দিতেই হবে,—ঐহুস্তের সঙ্গে বিয়ে হইতে পারে ।”

অকুমারের দ্ববরে একটা কক্ষ শিহবন উঠিল । তাহাকে নিক্রাক দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—“অকুমার, বাবা বাচাও—অনত কোরো না । আমি এখন তোমার মামাকেও ধরে পড়ছি ।”

বিধাতাও অপ্রাণ—এই সময় তার মহালয় পাণায় জিতরা সহাত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ভট্টচাঁব মহালয়ের কক্ষ অমুঘোষ বৃণা হইল না,—তখনই দরখাত্ত মজ্ব হইয়া গেল । তাঁহাকে এই দায় হইতে মুক্ত করা অকুমারের মামা বন্ধু ধর্ম ও কর্তব্য কর্ত্ত জান করিলেন ! অকুমার বন্দী হইল ।

বৈশাখ মাস, শুক্লপক্ষ, আকাশে পূর্ণিমা আসিয়া চলিয়াছে, নীনাথের মেয়কণা নাট, দিক্ বিদিক তন ষোৎসবার প্রাণিত ; দিগন্ত বেলার আঘাত করিয়া দক্ষিণাণিল স্মৃতরকে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোকিল পাণিরা গ্রালোক ভুলোক মাতাইয়া কুঙ্কহ শিউ শিউ তান তুলিয়াছে । বনপ্রাণের গুণের কথা এখানে যেন আর কাহারও মনে

মাই, তাহার অন্তরে বাহিরে দীপ্তি মধুরতা
 নত দ্বারা আজি উজ্জ্বলিত। এই আনন্দ
 পূর্ণিমার শুভকণ্ঠে শুভলয়ে বর সত্যের আদিবা
 বসিল। এও হুজুমার—কেবল সে হুজুমার
 হুজুমার নহে। হাহ! কণ কাহারও ক্ষত
 অপেক্ষা করে না—যে তাহাকে ধরিতে পারে
 সেই সৌভাগ্যবান, . যে পারে না—সে
 হতভাগ্য সকলেরই অবজ্ঞাভাজন, তাহার দুঃখ
 অধিকরণ কাহারও মনে স্থান পায় না।
 পরিবর্তে হুজুমার যখন বর বেণে শুটুচাখা
 মহাপ্রেরণ প্রক্ষেপেণে কুরিল, তখন সমানই
 আনন্দে হুজুমার উত্তিত হইল, লক্ষ্য বাজিয়া
 উঠিল, পুরবালগণ সমানই আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে
 জামাইকে সমাদর করিয়া লইলেন।

জামাতাবরণ, স্ত্রী আচার, অনুরিবিবিনমর,
 মাল্য বহন—শুভদৃষ্টি, সকলের মধ্যেই আনন্দ

এবাহ বহিতে লাগিল, প্রশান্ত লগ্নচিত্ত হইয়া
 প্রকৃষ্ট ভাবে শুটুচাখা মহাপ্রেরণ কল্পাদ্যদান
 করিলেন।

বিবাহ মন্ত্র শেষ হইয়া গেলে বরকর্তা
 অন্তঃপুরে বাইবেন বলিয়া যখন উঠিয়া গিয়াই-
 রাছেন সেই সময় সভাভূলে একটা অশুটকানা-
 কানি পড়িয়া গেল। “একি? এই যে হুজুমার!
 এখন—এত বিলম্বে?” হুজুমার মগন বিবর্ণ
 মুখে জামাতার দ্বার ক্ষুদ্রিত গীড়াইয়া বর
 কর্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল;—তাঁহার এবি-
 বন্ধনে এক হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন,—
 হুজুমারের দৈর্ঘ্য বসনে জাগিয়া উঠিল।
 সে দীর্ঘ নিশ্বাস কেলিয়া অশুট বরে কহিল :
 —“বস না মতা? সত্যই কি আমার চাষি
 হারাইয়া গেল!”

কোম্পানীর দেওয়ানী ।

মুতক্ষরীপকার বলিয়া গিয়াছেন যে একটা
 গদ্যভক্ত বিক্রমে যে সময় অতিবাহিত হয়,
 তদপেক্ষা অল্প সময়েরও কোম্পানী বর বিহার
 উড়িয়ায় দেওয়ানী লাভে লক্ষ্য হইরাছিলেন।
 সত্যই ভাগ্যলক্ষী অপ্রাপ্ত হইলে এইরূপই
 ঘটনা থাকে। এবল প্রত্যাশাযুক্ত সাহানলা
 দিল্লীর বাদশাহগণের উত্তরাধিকারী—
 হতভাগ্য সা আলম আজি গৃহশত্রুর অত্যাচারে
 লক্ষ্মীরিত হইয়া মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিকের ভৃত্য
 লর্ড ক্রাইবের পরপায়ন হইতে বাধ্য হইলেন।
 সেই ক্ষতই ১৭৮৫ সনের ১২ই আগষ্ট তারিখে
 ক্রাইবের ছাউনিতে ইংরাজ সৈন্যগণের
 আধাৰ্ঘ্যগ্রহণের টেবিলের উপরে সিংহাসনের

পরিবর্তে আরাম কেদারা স্থাপন করিয়া
 দিল্লীর শাসনাধীন নানাদারী সা আলম বা পৃথিবী-
 পতি ইংরাজ কোম্পানীকে দেওয়ানী সনন্দ
 দিয়া নিজেই নিরাপদ ও কৃতার্থ বিবেচনা
 করিলেন। জীবন সংগ্রামে যে বোধ্যাত্মের
 জর এই ঘটনা তাহারই অন্ততম প্রমাণ।
 কয়েক পায়েস সহিত মুংপায়েস সংঘর্ষণ হইলে
 মুংপায়েসই চূর্ণ হইবার কথা। তাই ভারতের
 ভাবীরাষ্ট্র ইংরাজের সহিত সা আলমের
 সংঘর্ষণে বোধ্যাত্মেরই জর হইল।

[দ্রষ্টব্য]—আমাদের অবস্থা তখন
 একান্ত পোচনী। গৃহবিবাদ, সিংহাসনের
 ক্ষত অনবরত দুঃখ, দীর্ঘনিশ্বাস অধিকার

চ্যুত হওয়া, এবং নাদির সাহ আফগান সাহ নবাবাষ্ট্র আক্রমণে সারাজী বিকলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যে সময়ে কথা বলিতেছি সে সময়ে দ্বিতীয় আলমগীর ঔরঙ্গ মন্ত্রী বা উজীর গাজী উল্লী খাঁর জীভা পুস্তলিকা মাত্র। বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলি গোহর (যিনি ভবিষ্যতে সা আমম নামে খ্যাত হইয়াছিলেন) উজীরের কন্য হইতে কোন প্রকারে নিজস্ব হইয়া বুৎপন্ন খন্দে লগন করিয়া সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। মোগল প্রতাপ শূন্য হইলেও মোগল নামে তখন কিছু মাহাত্ম্য ছিল। বিশেষতঃ সাজাদা বঙ্গবিকার করিলে সাহায্য-কারীগণ যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিশ্রমের মূল্য আদায় করিতে পারিবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। এই কারণে আলোহাবাদের নবাব মহম্মদ কুলী খাঁ, কানীয়ার বলবন্ত সিংহ, বিহারের জমিদার প্রসন্ন সিংহ এবং পাশোয়ান সিংহ ও ত্রিহতার নবাব কামগার খাঁ প্রভৃতি সকলেই স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া সাজাদার পক্ষাবলম্বন করিলেন। অযোধ্যার নবাব শ্রদ্ধাউল্লোহ এই অভিবানে যোগদান করিলেন। পিতা কর্তৃক বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এই সংবাদ বোনাগ করিয়া আলিগোহার শীঘ্রই আটহাজার সৈন্ত সংগ্রহ পূর্বক ১৭৫২ সনের প্রারম্ভেই কানীয়ায় পৌছিলেন।

সাজাদার আগমন সংবাদে মুর্শিদাবাদ দরবার অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। দ্বিতীয় আলমগীর নামে মাত্র বাদশাহ হইলেও তিনি যে ঔরঙ্গ পুত্রকে একবিহার উড়িষ্যার শাসন কর্তার পদে নিযুক্ত করিতে

পারেন তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। কিন্তু তাহা হইলে মিরজাফর কি করিবে? বাঙ্গালার মননে পাকিতে হইলে ভারত সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীর সহিত যুদ্ধ নতুবা বাঙ্গালার মননে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে মননে বসাইয়া সূর্য্য করিয়া মত্তর দিতে হয়! যুদ্ধেব জয় মিরজাফর আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। পাটনার নবাব তাকার রমণ্যবোধ কোন পক্ষে যোগদান করিবেন তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। কোষাগার অর্থশূন্য বলিলেও অতৃষ্ণি হয় না। সৈন্তগণ রীতিমত বৈতন না পাইয়া কোপাক্ত হইয়া ক্রান্তবৈর আবেগ না পাইলে কুচ করিবে না এইরূপ হির করিয়াছিল। এই অবস্থায় মিরজাফর সাজাদাকে নগর করেক গজ মুদ্রা দিয়া নিদায় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মিরজাফরের দৃষ্টিগোচরতঃ শেটজাফর এই সময় পরেশনাথ দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন। পাছে ঔরঙ্গ সাহাজাদার সহিত যোগদান করেন এই আশঙ্কার নবাব কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া মহারাষ্ট্রগণের সাহায্য গ্রহণ, সাহাজাদাকে অর্থদানে পরিতৃষ্টি ও অবশেষে ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ইহাই হির করিলেন।

অর্থদানে সাজাদাকে পরিতৃষ্টি করা হইবে এই সংবাদ পাইয়া ক্লাইব নবাবকে নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন যে, কোন প্রকারেই যেন তিনি তাহা না করেন। নবাব যদি একবার এই পথাবলম্বন করেন, তবে সাজা উল্লোহ, মহারাষ্ট্রেরা এবং অত্যন্ত অনেকই এই প্রকার সহজ লভ্য রসতথ্যের গোষ্ঠে ইচ্ছামুগ্ধ এবং য য সুবিধামুখ্য মিত্রীকরের রাজ্য আক্রমণ করিবে। আর

৬০ হাজার সৈন্তের আধিপতি এবং প্রতাপা-
খিত জাকরআলি যদি সৈন্ত সামগ্রহীন বালককে
কর বা উৎকোচ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে
লোককেই বা তাঁহাকে কি মনে করিবে?
সাহাজাদার ৩০ সহস্র সৈন্ত থাকুক না কেন
ইচ্ছা করিলে অত্যন্ত সংখ্যক ইউরোপীয়
সৈন্ত ও কয়েক সহস্র সিপাহী দ্বারা ক্রাইব
সাজাদাকে দূরীভূত করিতে পারিবে। এই
আশ্বাসে মিরজাকর নিশ্চিন্ত হইলেন।

এ দিকে সাজাদাও ইংরাজের অগ্রগৃহ
লাভের লক্ষ্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ব্যাঘ্র
করিবার অব্যবহিত পরেই প্রবলপ্রতাপবিত
শালাবৎজের নিকট অগ্রগৃহাঙ্কায় সাজাদা
অগ্রচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। “পৃথিবী হইতে
কণ্টক উদ্ধার করিলে বেগম পুশ্পবৃক্ষের উন্নতি
হয়” তত্ত্ব তিনি চক্ৰতকে শাসন করিয়া
চক্ৰতকে পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন।
ক্রাইব বাদশাহের ওমাগ্রহ তক্ষক তিনি
ক্রাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন
এবং কণ্টকোদ্ধারে সাহায্য করিলে সাজাদা
ক্রাইবকে ও কোম্পানীকে তাঁহাদেরই
ইচ্ছানুযায়ী পুরস্কৃত করিবে। এইরূপ সংবাদ
প্রেরণ করিলেন। এতদ্বত্তরে ক্রাইব সাজাদার
অগ্রচরগণকে পুনরায় তাঁহার নিকট আনিতে
নিষেধ করিলেন এবং আদেশ অব্যাহত করিয়া
যদি তাহার পুনরায় তাঁহার নিকটে আইসে
তবে তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবে। এইরূপ
বলিয়া দিলেন। সাজাদাকে জানাইলেন যে
সম্রাট যদিও তাঁহাকে ৬ হাজারী মনসবদারী
পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সে লক্ষ যদিও
তিনি সম্রাটের আদেশ পালনে বাধ্য কিন্তু
সাজাদার স্বভাগদান সংবাদ শুধন বাৎসাহ বা

উজীর কেহই তাঁহাকে জানান নাই তখন
তিনি সাজাদার সহিত যোগ দান করিতে বা
তাঁহার আদেশ পালনে অক্ষম।

সাজাদার আদেশ প্রতিপালন না করিবার
অন্ত কারণও ছিল। ইতিমধ্যে মিরজাকর
দিগি হইতে সম্রাটের এক আদেশ প্রাপ্ত
হইলেন, “সাজাদা কুণোজের পরামর্শে
পূর্বাঞ্চলে আক্রমণ করিতে যাইতে-
ছেন। ইহাতে রাজ্যের বখেট কতি হইবে
এবং সেই লক্ষ মীরজাকর যেন পত্রপাঠ
পাটনার বাইরা সাজাদাকে বন্দী করেন এবং
সাজাদার সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতাগণকে
শাসন করেন।” অব্যক্ত এ আশঙ্ক না
পৌছিলেও ক্রাইব যে সাজাদার পক্ষাবলম্বন
করিতেন না ইহা নিশ্চিত। তবে মিরজাকরের
ইহাতে স্তুতি হইল। বাৎসাহের পত্রখানি
যদিও উজীরের লিখিত কিন্তু তজ্জাপি এ
আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মিরজাকর সাজাদাকে
আক্রমণ করিতে আর কোনও বিধাযো
করিলেন না। সাজাদাও ক্রাইবের অসম্মতি
শূচক পত্র সাইরা করানী বীর লকে তাঁহার
পক্ষাবলম্বনে অগ্ররোধ করিলেন। ল তখন
বুন্দেল খণ্ডের রাজার অধীনে কার্য করিতে-
ছিলেন।

১৭৫২ খ্রের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে
৫৫০ শত গোরা ও ২৫০০ সিপাহী মুর্শিদাবাদ
অভিযুখে ব্যাঘ্র করিয়া মার্চ মাসের প্রথম
তাহা মুর্শিদাবাদ পৌছিল। তথায় নবাবকে
আশ্বাস প্রদান ও অস্ত্রান্ত বন্দোবস্ত করিয়া
ক্রাইব ও ছোট নবাব ১৩ই মার্চ মুর্শিদাবাদ
পরিভ্রাণ্ড কুলিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পৌছিল
যে সাজাদা কন্দানাশ পার হইয়া পাটনা

অভিমুখে গাফা করিষাচ্ছেন এবং রাজা রামনারায়ণ সাজাদার সহিত যোগদান করিষাচ্ছেন। এ সংবাদে ইংরাজ পক্ষ কিছু ব্যতিব্যস্ত হইলেন। রাইব তদন্তেই রামনারায়ণকে তিরস্কার করিয়া গজ দিলেন কিন্তু পত্রোত্তরে রামনারায়ণ জানাইলেন যে সংবাদ নষ্টের বিষয়। এবং প্রাণপণে তিনি পাটনা রক্ষা করিবেন ইহাই তাঁহার দৃঢ় পণ।

বস্তুতঃ রামনারায়ণ তই নৌকার পা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন কি না সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। সম্ভবতঃ রামনারায়ণ রাইবেব লক্ষ অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং সমরাস্তিপাতের লক্ষ নানাছলে সাজাদার মনস্তত্তি করিতেছিলেন মাত। রামনারায়ণের ইহা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। পাটনা অরক্ষিত ছিলনা; পৈতৃসংখ্যা অত্যন্ত এবং রামনারায়ণ হুঁশিয়ারি দরকার বা ইংরাজদিগের নিকট হইতেও কোন সংবাদ পান নাই। অনন্তোপায় হইয়া তিনি কুঠীর অধ্যক্ষ আমিরট সাহেবের মত চাওরিতে আমিরট উত্তর দিলেন যে, যদি লাহায়া সমরমত পৌছে তবে তিনি কুঠীতে থাকিবেন নতুবা তিনি বন্ধ দেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। রামনারায়ণ ষত দিন পারেন তত দিন সাজাদাকে প্রতারণা করিতে থাকুন এবং অবশেষে যাহা তিনি ভাল বোধ করেন তাহাই করিতে পারেন। রামনারায়ণ নিরক্ষার ও রাইবকে যতদূর সম্ভব পাটনা পৌছিবার লক্ষ অল্পরোধ গজ পাঠাইলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাজাদার নিকটে দূত প্রেরণ করিতেও ত্রুটি করিলেন না।

সাজাদা কর্ণনাশা পায় হইয়াছেন এই সংবাদ পাটনা পৌছিবামাত্র আমিরট ও কুঠীর অধ্যক্ষ সাহেবেরা পাটনা পরিত্যাগ করিলেন। অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া রামনারায়ণ সাজাদার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার যথোপযুক্ত আবাসভ্যর্থনা হইল। তাঁহাকে বেলাৎ প্রদান করা হইল এবং সাজাদা তাঁহাকে বেহারের শাসনকর্তার পদে বহাল রাখিলেন। চতুর্থ রামনারায়ণ ভুলিবার পাত্র ছিলেন না। শিবিরে অবস্থান কালীন সাজাদার পৈতৃসংখ্যার ও মিত্রগণের ব্যবহার পর্যবেক্ষণে তাঁহার প্রতীক্ষমান হইল যে, সাজাদার পক্ষাবলম্বন কিছুতেই সম্বোধন হইবে না। কয়েকদিন ছাউনিতে অতিবাহিত করিয়া তিনি পাটনার প্রত্যাগমন করিয়া যুদ্ধের লক্ষ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সাজাদার পৈতৃ পাটনার সমুখীন হইলেও তিনি নানা স্থলে আরও কয়েক দিন কাটাইয়া দিলেন। নৌরোজ উৎসবের লক্ষ্যেও সাজাদার কয়েক দিন বিলম্ব হইল। পরিশেষে রামনারায়ণ যখন রাইব ও ছোট নবাবের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি অপ্রাক্ষ্য ভাবে সাজাদার শত্রুতা করিতে লাগিলেন। বাদসাহী পৈতৃ নগর আক্রমণে বিকল মনোরথ হইয়া নগর অবরোধ করিল, কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকাব্য হইতে পারিল না। ইতি মধ্যে কর্ণে রাইব প্রেরিত একদল পৈতৃ পাটনার পৌছিল; সাজাদা তখন পাটনা অবরোধ ও গ্রহণের আশা পরিত্যাগ করিয়া পাটনা পরিত্যাগ করিলেন। পশ্চিমধ্যে সাজাদার সহিত কর্ণাণী বীর লর সাক্ষাৎ হওয়াতে লর সাজাদাকে পাটনা প্রত্যাগমনে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সাজাদার

শৈল্প মধো মনোমালিন্য ও বিবাদ ঘটনা উঠিয়াছিল! মহাম্মদুলি ধীর অল্পবয়স্কিতে হুজাউকৌলা, এলাহাবাদ অধিকার করিয়াছিলেন এবং মহাম্মদ কুণী খাঁ এই সংবাদে এলাহাবাদ পুনরধিকারের জন্য এখানে প্রত্যাগমনার্থ উৎসুক ছিলেন। ইত্যাদি কারণে কেহই সাকাদার পক্ষ অবলম্বন করিলেন না। কামগার খাঁ ও পাণ্ডোরান সিং শব জমিদারীতে প্রস্থান করিলেন; মহাম্মদ কুণী খাঁ এলাহাবাদ অধিকারে বিফল মনোরথ হইয়া বন্দী হইয়া অবশেষে প্রাণ হারাইলেন। সাকাদা এক্ষণ ক্ষেপে কিং কর্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিনীত ভাবে ব্রাহ্মণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বিত্তীয় আলমগীর 'ঐশ্বাধ্য পুরস্কে' বন্দী করিবার জন্য নিরাকারের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফ্রাইন ইচ্ছা করিলেই এই ক্ষণে আলি গোহারকে বন্দী করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি উহা সমাচীন বোধ করিলেন না। সত্য বটে, বিত্তীয় ব্যবসাহের প্রতাপ বলিতে কিছুই নাই কিন্তু ততাপি যোগল নামের মহিম্য তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। সেই জন্য ব্রাহ্মণের কয়েক সহস্র মুদ্রা সাকাদাকে প্রেরণ করিলেন। সাকাদাও ছত্রপুর অভিযানে প্রস্থান করিলেন। এই একবারে সাকাদার প্রথম অভিযান ব্যাপার শেষ হইল।

সম্পূর্ণরূপে বিফল মনোরথ হইলেও সাকাদার পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা সম্ভব ছিল না। পরামর্শদাতারও অভাব ছিল না। কামগার খাঁ সাকাদাকে অনবরতই উৎসাহ দিতেছিলেন। এই সময় সাকাদা অপ্রত্যাশিত

সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। ছোট মদাব মৌর্য কয়েকজন আফগান সেনাপতিকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে আলানৎ খাঁ ও দিল্লীর খাঁ প্রতিহিংসা সাধন মান্দে সাকাদার সহিত যোগদান করিলেন। শৈল্প সামন্ত সংগ্রহ করিয়া সাকাদা কর্তৃক পালার হইলেন এবং এই সময়ে অল্প অল্প এক ঘটনার তাহার অভিযানের পথ আরও প্রশস্ত হইয়া গেল।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে দিল্লীর তৎকালীন অবস্থার আভাস দিরাছি। বিত্তীয় আলমগীর তাহার উল্লিখিত হওতে বন্দী ও ক্রীতপুতলি হইয়া কালাতিপাত করিতে ছিলেন। উল্লিখিত অবস্থার নবায়কে ও ব্রোহিগণকে শাসন করিবার জন্য মহারাষ্ট্র-সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু উল্লিখিত অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। মহারাষ্ট্রগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইতিমধ্যে দিল্লিতে সংবাদ পৌছিল যে দ্রুত আবদালী পুনরায় ভারত আক্রমণের উদ্ভোগ করিতেছেন। এই সকল ঘটনার ও সংবাদে নুৎস উল্লিখিত হতভাগ্য আলমগীরকে হত্যা করিয়া তাহার মরণের শেদ করিয়া দিল। কর্তৃক নদাতারে সাকাদার নিকট এই সংবাদ পৌছিল।

সংবাদ পৌছিবামাত্র সাকাদার পাত্রাবিহীন তাহাকে দিল্লীর বাবসাহ বলিয়া অভিযান করিল। আলি গোহার সা আলম খাঁ পৃথিব্যপতি নাম ধারণ করিয়া অবোধ্যার নগরে হুজাউকৌলাকে উল্লিখিত প্রস্থান করিলেন। হুজাউকৌলা সম্মানে এই অভিযান পদবি গ্রহণ করিয়া নবীন শহাটের নামে মুদ্রা

প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অস্ত্রাশ্রয় পান
কর্তাগণও বাদ পড়িলেন না। রোহিলাসফ
নাজির উদ্দৌলকে পেগাং ও আদমির উল
ওমরা উপাদি প্রাপ্ত হইল। এত অস্ত্রাশ্রয়
সহায় সমস্ত সামান্যমতে সাহায্য করিয়া
ছিলেন বা করিতেছিলেন এবং বাহাদুর
নিকট সাহায্য প্রাপ্তির আশা ছিল সকলেই
কিন্তু না কিছু উপাদি পাইলেন। আহা! নব
নাহ আবদালীর নিকটও সাহায্য প্রার্থনা
করা হইল।

প্রস্তুত পক্ষে পলাতক 'অবস্থা সত্তান'
আলিগোহার ও বর্তমান পৃথিবীপতি উপাদি-
ধারী সামান্য একই ব্যক্তি হইলেও উত্তরে
গণ্ডে পার্থক্য ছিল। উত্তরাধিকার হুজ্জ
দিলীর তত্ত্ব সামান্যদেরই প্রাপ্য; পরাক্রান্ত
অবস্থার নবাব প্রকান্ত ভাবে সামান্য দত্ত
উপাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহার পক্ষাবলম্বন
করিতে ভবিষ্যৎ লাভের আশার অনেকেই
সামান্যদের পক্ষে যোগ দান করিতে লাগি-
লেন। কামগার খাঁ পাটহাওয়ার অখ্যাতরাই
দৈত্যসহ সামান্যদের সাহায্যার্থ উপস্থিত
হইলেন।

১৭৩০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের আরম্ভেই
বাদশাহী দৈত্য পাটনা পৌছিল। এদিকে
ক্রাইব বিলাত ব্যাঘ্র পূর্বেই কর্ণেল কেলডের
অধীনে তিন শত গোরা দৈত্য, একদল গোল-
ন্দাজ, ৬০০ কামান, ও একহাজার সিপাহী
মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৭৪২
সনের ২৬শে ডিসেম্বর এই দৈত্যবাহিনী মুর্শিদা-
বাদ পৌছিলে ক্রাইব আরও ২০০ শত
গোরাতে কলিকাতা হইতে এই বলের সহিত
যোগদানে আদেশ প্রদান করিলেন। ছোট

নবাব মীরজের অধীনে নবাবী ফৌজ প্রেরণের
সামর্থ্যও হঠাৎ লাগিল। অর্পণস্বাবস্থায়
কিন্তু অসুবিধা হইলেও শীঘ্রই শতদল
সহায় নবাবী দৈত্য ও ২৪০০ কামান, ১৭৩০
সনের ১৮ই অক্টোবরী মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ
করিয়া মুক্তকেশ্যভিমুখে অগ্রসর হইল।

নবাবী ও ইংরাজ দৈত্য পৌছিবার পূর্বে
হইতেই রামনারায়ণ প্রস্তুত হইতেছিলেন।
নিকটবর্তী কামগারখণ্ডের সাহায্যে দৈত্য
সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এবং কাশ্মির কোকেনের
দৈত্য সহ তিনি সামান্যদের গতি-
রোধে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সামান্যদের
সহিত সমুদ্র মুখে নিরস্ত থাকিতে তিনি
নবাবের উপদেশ পাইয়াছিলেন বটে কিন্তু
কয়েকটি বড় মুখে জরাজীর্ণ করিতে রাম-
নারায়ণের সাহায্য বৃদ্ধি হইল; তিনি বাদশাহী
দৈত্যের সহিত সমুদ্র মুখে অগ্রসর হইলেন।
মুসিমপুর প্রান্তরের মুখে রামনারায়ণ জরাজীর্ণ
করিতে পারিলেন না। কামগার খাঁ, দিলীর
খাঁ এবং আলানং খাঁ এবল বিক্রমে যুদ্ধ
করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বণন দিলীর ও
তাঁহার সন্তান আলানং প্রভৃতি বিক্রমে রাম-
নারায়ণী দৈত্যকে হঠাৎ হত্যা করিলেন, তখন
পালোজান সিং ও মোরাদ খাঁ নবাবী পক্ষ
পরিত্যাগ করিয়া বাদশাহী পক্ষে যোগ দান
করিল। ইহাই রামনারায়ণের পরাজয়ের
প্রধান কারণ। কিন্তু তথাপি রামনারায়ণ ও
তাঁহার দৈত্যগণ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন। কাশ্মির কোকেনের অধীনস্থ
দৈত্যও রাম নারায়ণকে বখেট সাহায্য
করিল। দিলীর ও আলানং মুক্তকেশ্য
বীরের লক্ষ্যবীর মুক্তকেশ্য পতিত হইলেন

কিন্তু কামগার নীর আক্রমণে রহিব
খাঁ ও মুহলীধর বন্দী হইলেন। অবশেষে
তামনারাধণ নিজেই আহত হইলেন।
কোফ্রেনের অধীনস্থ সৈন্তগণ রাজার সাহায্যার্থ
অগ্রসর হইয়া অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে অগত্যাগ
করিল। যে কয়েকজন অবশিষ্ট থাকিল
তাহারা নগরে প্রত্যাবর্তন করিল।

সাম্রাজ্য বিজয়লাভে উদ্বৃত্ত হইয়া
রণবাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে হতব্যক্তিগণের
গোরের আদেশ- প্রদান করিলেন। এই
বাণীরে অত্যধিক সময় অতিবাহিত হইল।
যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে নবীন বাদশাহ সবার
পাটনায় আক্রমণ করিতেন তবে সহজেই
পাটনায় করতলগত হইত। এদিকে
বামনারাধণ আহতাবস্থাতেও নগর রক্ষার
ব্যবস্থা করিয়া পূর্ববাবের ত্যাহ বাদশাহ
সমীপে দূত প্রেরণ করিয়া সম্মতিপাতি
করিতে লাগিলেন। বাদশাহ নগর অবরোধ
করিয়া রহিলেন। ২-শে কেরারাত্তি
কালিয়দ ও নবাবী সৈন্ত পাটনার নিকটবর্তী
হইলে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল।

২২শে তারিখে কালিয়দ নিকটবর্তী হইয়া
গ্রাম অধিকার করিয়া তথায় এক এক দল
সিপাহী রাখিলেন। বাদশাহী সৈন্ত ঐগ্রামস্থ
সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলে কালিয়দ তথায়
গোরাগৈন্য ও কামান প্রেরণ করিলেন। এই
অগ্রসর বাদশাহী সৈন্য নবাবী সৈন্য আক্রমণ
করিল। নবাবী সৈন্যের মধ্যস্থলে গোরা-
সৈন্য ও উভয় পার্শ্বে সিপাহীসৈন্ত সমাবেশ
করা হইল। বাদশাহী সৈন্য তিন শ্রেণিতে
নিভৃত হইয়া নবাবী সৈন্য আক্রমণে উদ্বৃত্ত
হইয়াছিল। প্রথম শ্রেণিতে বাদির দানপান

কুরাণী এবং লজ্জাবের গোলামী সা অধ্যাক্ষতা
করিতেছিলেন; দ্বিতীয় শ্রেণী কামগার নীর
অধীনে এবং তৃতীয় শ্রেণী বরং বাদশাহের
অধীনে ছিল।

মীরগের সৈন্ত-সমাবেশ উত্তম হয় নাই।
বিশেষতঃ যুদ্ধের আরম্ভেই মীরগের গোলামী
সৈন্য কামান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন
করিল। ইংরাজের প্রচণ্ড গোলাঘাতেও
বিশ্রুত কাতর না হইয়া বাদশাহী
অধ্যাক্ষরাহী মীরগের সৈন্তকে ব্যতিব্যস্ত
করিয়া তুলিল। নবাবী সৈন্ত পৃষ্ঠপ্রদর্শনের
উদ্দেশ্যে কামরমেজর কালিয়দ বাদশাহী সৈন্তের
পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিলেন। এই অতর্কিত
আক্রমণের জন্য বাদশাহী সৈন্ত প্রস্তত ছিল
না, তাহারা পলায়ন করিল। নাজ চারি ঘণ্টা-
ব্যাপী সেবপুরের যুদ্ধে সাম্রাজ্য পরাজিত
হইয়া আট কোশ দূরে বেহার প্রস্থান করিতে
বাধ্য হইলেন। যুদ্ধে মীরগ গলদেহে আহত
হইয়াছিলেন বলিয়া নবাবী সৈন্ত আর সা
অগ্রসর পশ্চাদ্ভাবনের অবকাশ পাইল না।

সাম্রাজ্য পরাজিত হইয়া পার্শ্বতাপবে
মুর্শিদাবাদে বাত্মা করিলেন। এ সংবাদে
সেখানে হলহুল পড়িয়া গেল। বিশেষতঃ এই
সময় পূর্ণিয়ার নবাব শাদেম হোসেন বিজোহ
ভাবাগর হইলেন। তাহার সহিত মিটমাট
হইবামাত্র মৃতন এক পত্র দেখা দিল। এক
দল মহারাজ সৈন্ত শিবরতন অধীনে অগ্রসর
হইয়া মেদিনীপুরের শাসনকর্তা কৃষ্ণ সিংকে
পরাজিত করিয়া—তাহারা বাদশাহের
সাহায্যার্থ উপস্থিত এইরূপ প্রচার করিল। বস্তুতঃ
মারাঠীগণ দুইনের সুবিধার জন্যই এই কথা
অকলঙ্ক করিয়াছিল। দাখা ইউক কুল

সিংহকে পরাজিত করিয়া মহারাত্রিগণ হুগলি ও কলিকাতা আক্রমণ করিল, এবং বাদশাহ মুর্শিদাবাদ পৌছিলে তাঁহার সহিত যোগদানের ব্যবস্থাও করিল ।

কলিকাতা কোম্পিগ ও মুর্শিদাবাদের দরবার ইহাতে অত্যন্ত জীত হইয়া পড়িলেন । কলিকাতার সৈন্তের ব্যবস্থা হইতে লাগিল এবং বর্ধমানে সৈন্ত প্রেরিত হইল । নবাবী ও ইংরেজসৈন্তকে বহুশব্দেতে রাখিয়া বাদশাহ শীগ্ধই মুর্শিদাবাদে পৌছিবেন এই সংবাদে নবাব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাদশাহের নিকট নিজ বক্তৃতা স্বীকারপূর্বক তাঁহার গতিরোধে কোনরূপ চেষ্টা করিবেন না এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন । নবাব এসংবাদ কলিকাতা কোম্পিগকে জানাইলেন না বটে কিন্তু কোম্পিগের আসেলে অবশেষে তাঁহাকে বর্ধমানান্তিমুখে দাড়া করিতে হইল ।

এদিকে বাদশাহের পক্ষাভেদে পক্ষাভেদে নবাবী ও ইংরাজের ফৌজ অগ্রগমন হইতে লাগিল । বাদশাহের ভুল বশতঃ কালিদেব অধীনস্থ ইংরাজ ও নবাবী সৈন্য ও মিসরফরের সৈন্য একত্রিত হইল । কালিদেব সেই সময়েই বাদশাহকে আক্রমণ করিতে চাহিলেন কিন্তু মিরজাফর ইতস্তত করিতে লাগিলেন । বাদশাহ যদি সেই সময়ে নবাবী ফৌজ আক্রমণ করিতেন, তবে "খুব সম্ভব জয়লাভ করিতে পারিতেন কেননা মিরজাফরের আদৌ বাদশাহের সহিত ঘৃণা করিবার ইচ্ছা ছিল না । কিন্তু বাদশাহ ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না এবং দায়োদার পার হইয়া তিনি পুনরায় পাটনান্তিমুখে প্রস্থান করিলেন । বাদশাহের প্রত্যাগমনের সংবাদ

নবাবী ফৌজ করেকদিন অবগত হইতে পারে নাই কিন্তু কালিদেব এই সংবাদ পাইয়া মাত্র কাশ্মির নগরের অধীনে ১৩ই এপ্রিল একদল সৈন্ত পাটনা রক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন ।

বাদশাহ মহারাত্রীর সৈন্য সহ বিহার পৌছিলে ফরাসী ল তাঁহার সৈন্তদল সহ বাদশাহের সহিত যোগদান করিলেন । পরে তাঁহার পাটনা অবরোধ করিলেন । এবার অংরোধের ভার ল সাহেবের উপর অর্পিত হইল । দুর্গ মধ্যে রামনারায়ণ, বেতাভ রায় এবং ডাক্তার ফুগারটনের অধীনে কুঠার সাহেব ও লিপাহীগণ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ল সাহেব প্রথমতঃ বিশেষ সুবিধা করিতে না পারায় এক সময়ে পূর্ণ ও পশ্চিম দিক হইতে নগর আক্রমণ করিলেন কিন্তু ইহাতে তিনি কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলেন না । অধিকন্তু জিয়ান উল আবাদ খা নামক বাদশাহের এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এই আক্রমণে প্রাণ হারাইলেন ।

তথাপি রামনারায়ণ যে অধিক দিন আর দুর্গরক্ষা করিতে পারিলেন এক্ষণে যথেষ্ট হইল না । দৌত্যগা বশতঃ কালিদেব কর্তৃক প্রেরিত কাশ্মির নগর এই সময়ে উপস্থিত হইলেন । কাশ্মির নগর ১৩ দিনে ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন । এবং সৈন্তদের প্রোসাহিত করিবার জন্য নিজেও সমস্ত পথ পদযাত্রাে আসিয়াছিলেন । নবীপার হইয়া যুদ্ধলক্ষ্যে সজ্জিত এই সৈন্তবাহিনী পাটনা পৌছিলে রামনারায়ণ ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্তদল আৰম্ভ হইল । তাত্তিকালেও অল্পাধিক কক্ষা নষ্ট করা হই জন ইংরাজ সৈন্তের সহিত বাদশাহী সৈন্তের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে

লাগিলেন ; এবং তৎপর দিন যখন বাদশাহী সৈন্ত বিগ্রহের বিবিস্তার আক্রমণ উপভোগ করিতেছিল তখন কামগার থাকে আক্রমণ করিলেন। কামগার খাঁ এই আক্রমণ বিপদের ভয় প্রসূত ছিলেন না। তিনি অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। হুদক নস্র কামগার খাঁর পতাকা কামান ও সূক্ষিত খঞ্জরাদি সহ-জেই অধিকার করিয়া নগর প্রভাগমন করিলেন। এপ্রকার শত্রুর সন্নিহিত পাকী সমীচীন নস্র কামগার খাঁ পাটনা হইতে দূরে বাইরা শিবির সরিষা করিলেন এবং সা আলাম ও পাটনা অধিপতির আশা পরিত্যাগ করিয়া গয়া মৌনপুরে পশ্চাৎগমন করিলেন।

ইতি মধ্যে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা খাদেম হোসেন বাদশাহের সহিত যোগদান মানসে আগমন হইতেছিলেন। নস্র এই সংবাদ অবগত হইয়া খাদেম হোসেনকে আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। রামনাথগণ এ সংবাদে আশ্চর্য্যবিত্ত হইলেন কিন্তু যেভাষ রাম নস্রের সহিত যোগদান করিতে তাঁহার রাতি যোগে খাদেম হোসেনের বিক্ষেপে বাজা করিলেন। পথভ্রষ্ট হইলেও নস্র ও যেভাষ রাম সাদাক্ষ অষ্টাশত পদাতিক, তিন শত অশ্ব-রোহী ও ৪০০ কামান সহ পশু পদাতিক ৬০০ সহস্র অশ্বারোহী এবং ৩০০ কামানের অধিকারী খাদেম হোসেনকে আক্রমণ করিতে নিরস্ত হইলেন না। হোসেনী সৈন্ত এই মুষ্টি-ময় সৈন্তগণকে ঘিরিয়া ফেলিল কিন্তু ছয় ঘণ্টার যুদ্ধেও তাহাদের কিছু ক্ষতি করিতে পারিল না। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে ৪০০ পত

সুসৈন্ত, ৩০০ হস্তী এবং ৮০০ কামান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ইংরাজ পক্ষে ১৬ জন গোরাসৈন্ত ও ৩ সংখ্যক সিপাহী আণত্যাগ করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে ইংরাজ পক্ষের সিপাহীগণ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া ছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যে অপরাধের তাহারই প্রমাণ দিয়াছিলেন।

নস্র খাদেম হোসেনের পশ্চাৎগমন করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে কালিদাস ও মীরগ আদিরা পৌঁছিলেন। মীরগের তৎপরতার অভাবে ইংরাজ খাদেম হোসেন বা তাঁহার অশ্বাশ্রয় ধনরাশি আটক করিতে পারিলেন না। বাহা হউক হুদা জুলাই মীরগ বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাইলেন। কয়েক দিন এ সংবাদ গোপন করিয়া রাখা হইল কিন্তু এক্ষণ অবস্থায় শত্রুর পশ্চাৎগমন সমীচীন নহে বলিয়া মেজর কালিদাস সৈন্তকে পাটনা প্রভাগমন করিলেন। কিছুদিন পরেই মীরগাকর পদচ্যুত হইলেন ও মীরগাদেয় বাণেশ্বর মদনদে আসীন হইলেন।

সা আলাম ইতি মধ্যে বিহারে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। দাউদনগর ও গয়া সৈন্তনিবাস স্থাপনা করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ পূরক তিনি মিল বনবৃদ্ধি করিতেছিলেন। কামগার খাঁ রাজা জুনিয়াস সিং এবং অজ্ঞাত কয়েক জন ভবিষ্যৎ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ১৭১১ সনের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে নবাবী সৈন্ত ইংরাজ সৈন্তের সহিত মিলিত হইয়া মহানদী নদীর পাশা বানোর নদীর তীরস্থ স্থান গ্রামে পৌঁছিল। নদীর অপর

পারে। বাদশাহী সৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল। ইংরাজ ও নবাবী সৈন্যের অধিক মেজর কার্ণার বাদশাহী সৈন্য আক্রমণ করিলে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর বাদশাহের হস্তী আহত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মাহতও এই সময়ে হত হয়; সুতরাং হস্তীকে দমন করিবার কোনই উপায় রহিল না। দশ-পতির এই দশাশ বাদশাহী সৈন্য ভীত হইয়া পলায়নপর হইল। কেবলমাত্র মেজর ল ও তাঁহার অধীনস্থ ১৩১৪ জন সেনানী এবং লক্ষাশ জন সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিলেন না। ইংরাজ আরও পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিবেন স্থির করিলেন। মেজর কার্ণার, ক্যাপ্টেন নর ও অপরায় ইংরাজ কর্মচারী তাঁহাদের সাহায্যে যুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে আত্ম সমর্পণ করিতে অস্বরণ করিলেন। এ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে আরও থাকিতে তাঁহারা তরবারী পরিত্যাগ করিবেন না। মেজর কার্ণার এই সকল বীরপুরুষের জীবন রক্ষণে ইচ্ছা হইয়া সশস্ত্র অবস্থায় ইংরাজকে বন্দী করিয়া সশস্ত্রমে ছাউনিতে আনয়ন-পূর্ব্বক বদ্ধ ভাবে তাঁহাদের পরিচর্যা করিলেন।

বাদশাহ এই যুদ্ধ পরাজিত হইয়া পুনরায় পাটনামুখে যাত্রার উদ্দেশ্যে করিতে লাগিলেন। স্রাব্যের যুদ্ধের পর কার্ণার খেতাব রায়কে বাদশাহের শিবিরে সন্ধির এক প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু কামগার খান চক্ৰান্তে খেতাব রায় কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। খেতাব রায় প্রবাসের সময় সাআবদকে পরিকারই বলিয়া আশিলেন যে বাদশাহের

সঙ্গে এইক্ষণ সন্ধিকরারই সমাধান ছিল; পরে একপ স্রাব্য মত সর্ভ তিনি পাইবেন না। ২৯ মে কাছুরাী সন্ন্যাসী নিজ বর্জা ফরস্তুরা খাঁকে মেজরের নিকট সন্ধির এক প্রেরণ করিলেন। সুচকী কামগার খাঁকে পদচ্যুত না করিলে মেজর কিছুই করিতে পারিবেন না এইরূপ বলিয়া পাঠাইলে সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ সৈন্য ইতি মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং সন্ন্যাসীর নিবেদন সংবৎ তাহার বাদশাহী সৈন্যকে আক্রমণ করিলে বাদশাহী সৈন্য পলায়ন করিল।

গতান্তর না দেখিয়া সাআবদ কামগার খাঁকে পদচ্যুত করিয়া ৬ই ফেব্রুয়ারী কার্ণারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই তিনি ইংরাজ শিবিরে আসিয়া অভ্যর্থিত হইয়া যথেষ্ট প্রীতিশ্রুতি করিলেন এবং নিরাপদ হইবার এক ইংরাজ শিবিরের নিকট ছাউনি ফেলিলেন। কলিকাতা হইতে সংবাদ বহুদিন না পৌঁছে ততদিন অবলম্ব্যপাণিত মোগল সন্ন্যাসীর বংশধর পুণ্ড্রীপতি বলিয়া আখ্যাত বাদশাহ দৈনিক এক সহস্র করিয়া মুদ্রা পাইবেন স্থিরীকৃত হইল। এই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া কার্ণার ও বাদশাহ ১৪ই ফেব্রুয়ারী পাটনায় পৌঁছিলেন।

পাটনায় পৌঁছিবার পর বাদশাহ তাঁহার নামে মুদ্রা ও খোৎবা প্রচারের এক অঙ্গপ্রাধ করিলেন এবং বিনীতভাবে দৈনিক কিছু বেশী করিয়া টাকা প্রার্থনা করিলেন। কার্ণার কলিকাতা হইতে না জানিয়া সন্ন্যাসীর সকল প্রার্থনার উত্তর দিতে পারিবেন না বলিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীর কাতর নিবেদনে দৈনিক

বৃষ্টির হার ৩০০ পত করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দিলেন ।

মৌর্যকালেমহার বাৎসর্য মনন প্রাপ্তির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । মৌর্যকালের আলি খাঁ প্রথমতঃ বাদশাহের সহিত সাক্ষাতে অভিনয়্য ছিলেন না কিন্তু মেজর কার্ণাকের পুনঃ পুনঃ অহুরোধ উপরোধে ১২ই মার্চ তারিখে পাটনার ইংরাজকুঠীতে তাঁহার সহিত দেখা করিলেন । বাদশাহ কুঠীর কলম্বের পৌষিণে মেজর কার্ণাক, ইংরাজকুঠীর অধ্যক্ষ মাকগিয়ার সাহেব এবং জ্যাক্স ইংরাজ কর্মচারীগণ বাদশাহকে কুঠী করিয়া নগর প্রদান করিলেন । নবাব মৌর্যকালেম আলিও উপস্থিত হইয়া বাদশাহকে ১০০১ মোহর এবং একশত এক পাত্ৰ পূর্ণ মণি মুক্তা, সাল, রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি উপহার দিলেন । বাদশাহের এক পার্শ্বে মেজর কার্ণাক ও মাকগিয়ার সাহেব অন্তরিক মৌর্যকালেম আগুন গ্রহণ করিলেন । মৌর্যকালেম বাদশাহকে বাদিক ২৪ লক্ষ টাকা করপ্রদানের অঙ্গীকার করিলে সাদাঘর মৌর্যকালেমকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবাদারী প্রদান করিলেন । কিছুকাল কথাবার্তার পর পরবার ভঙ্গ হইল ।

সাদাঘর এই সময় কোম্পানীকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পদপ্রদানে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন । কিন্তু ইংরাজ কোম্পানী এ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে এবং দিল্লি অধিকারে সাহায্য স্বীকার না করার বাদশাহ হুজাউদ্দৌলা প্রভৃতির পরামর্শে ছন্দ মানে পাটনা পরিত্যাগ করিলেন । মৌর্যকালেম বাদশাহকে বাইবার

পূর্বে অর্থদানে পরিতুষ্ট করিলেন এবং মেজর কার্ণাক কর্ণনাশা পদাভ্যুতাহার সহযোগী হইলেন । হুজাউদ্দৌলা কর্ণনাশার অপর পায়ে তাঁহাকে সম্রাটের অভিযাত্রী করিয়া লইলেন । কয়েকদিন লক্ষ্যে পাল করিয়া তিনি দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

দুঃখের বিষয় সিংহাসনলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিল উত্তীর্ণ না ; অবিকল্প পূর্ববর্তী উল্লীষ দ্বিতীয় আলমগীরকে বৈরপ আশঙ্ক করিয়া ছিলেন হুজাউদ্দৌলাও সাদাঘরের সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে পুনর্বার সিংহাসন বিরূপ হইয়া গেল । মৌর্যকালেম আলিখাঁ পদচ্যুত হইয়া অব্যোধ্যাপতি হুজাউদ্দৌলার সহিত একত্র হইয়া ইংরাজ দমনে যুধা প্রয়াস করিলেন । বঙ্গার ক্ষেত্রে ইংরাজ জয়লাভ করিলেন ।

বঙ্গার গৃহের পর বাদশাহ ইংরাজের নিকট গৃহপত্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । ইংরাজ সেনাপতি মেজর বনরো এবিমের কলিকাতা কোম্পিগের অহুমতি না পাইলে কিছুই করিতে পারিবেন না এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন । সন্ন্যাসের ২২শে নভেম্বরের (১৭৬৬) আবেদনের প্রত্যুত্তরে কলিকাতা কোম্পিগের সমস্তগণ ডিপেন্ডর মানে মেজর মনবোকে সম্মতিহতক পত্র দিলেন । এই পত্রের মর্ম্মাহ্বারী ১৭৬৪ সনের ২২ ডিপেম্বরে বাদশাহ বলবৎ নিঃসের জমিদারী ব্যতীত অব্যোধ্যায় অস্ত্রাত্মক মনন ব্যাধা ইংরাজ কোম্পানীকে প্রদান করিলেন ।

কিন্তু এ সমস্ত আগার পরিবর্তন করিতে



কোম্পানীর দেওয়ানী।

হইল। সীতকাপেদের সহিত বিবাদের নিবেচনা করিলেন। বহুবিহার উদ্ভিগ্ধার সবাদ পাইয়াই কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ লর্ড ক্লাইবকে ভাষ্যভাষ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ সনের ৩রা মে ক্লাইব কলিকাতা পৌছিয়া পূর্বতন সন্ধি পরিবর্তন করিতে মানস করিলেন। ক্লাইব বাবদাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বহুবিহার উদ্ভিগ্ধার দেওয়ানী প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ হইল। ক্লাইবের তাণ্ডে আরাকানার উপবিষ্ট হইরা আকবর আরাকানবের বংশধর বাৎসরিক ২৬ লক্ষ মুদ্রার ক্ষত মনস দ্বারা বহু বিহার উদ্ভিগ্ধার দেওয়ানী ইংরাজকে প্রদান করিয়া নিজেই কৃতার্থ

নিবেচনা করিলেন। বহুবিহার উদ্ভিগ্ধার ইংরাজই রাজা হইলেন।

বিধাতার আশেপাশে যে অসামান্য বেগে ইংরাজই শাস্তি দিলেন তাই যে ইংরাজ বণিক একদিন বাংলার আসিয়া সপন্যানে নতলাই হইয়া যোগদানবাহারের নিকট বাণিজ্যাদিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে মুষ্টিমের বণিকদল সবাধর্ষনা যোগদকে সঙ্ঘটে রাগিবার ক্ষমতা চেঁচায় ফুটিয়া করিতে ন। প্রবল প্রতাপবিত্ত যোগদানবাহারের বংশধর কান্তর-কণ্ঠে সেই ইংরাজের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া গৃহশত্রুর হস্ত হইতে নিজেই রক্ষা করিলেন।*

ঐশ্বর্য্যবান পদাধিকার।

* ইংরাজ ইতিহাসিক দৈনিক মহত্ববৃত্তান্ত বৃত্তিভোগী সা আলফকে 'generous' আখ্যা প্রদান করিতে স্মৃতিস্তম্ভ হইয়াছে। যেসকল কার্ণাট সা আলফের নিকট ছই লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক বরাদ্দ পাইয়াছিলেন। এসাহাবাদ কোম্পানীর একেই কর্ণেল স্মিথ (যাহাকে মুতক্ষরীপকার আসমাগ নামে আখ্যাত করিয়াছেন) ২ লক্ষ মুদ্রা 'টীপ' পাইয়াছিলেন; কিন্তু এই স্মিথের ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্যবিত্ত হইতে হয়। মুতক্ষরীপকার স্মিথেরা যে স্মিথ নামের একেই হইলেও সম্রাটের উপর যথেষ্ট অভ্যুত্থার করিতেন। "The Emperor was obliged to remain within, where to conceal his shame he amused himself in finishing with brick and stone some buildings which he had heretofore commenced." কিন্তু ইহাতেও তিনি বিতার পায় নাই। তিরক্ত মিহমাভুদারী সিংহ বরজার উপর প্রভাব মহাবৎসলি হইত কিন্তু স্মিথের অসুবিধার ক্ষত ইহাও স্মিথ বহু করিলেন। মুতক্ষরীপ অসুবিধার রেশল এই ঘটনার উপর টীকা স্বরূপ স্মিথেরা যে "This was a much graver affront than an European could apprehend; for this music, which consisted of a variety of instruments and played 3 or 4 times a day, and once at night, is a mark of sovereignty and always of command."

এই প্রবল মুতক্ষরীপ, কখনও স্মিথের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইল। কখনও বৃত্তান্ত অবিকারিত হইয়া বিখ্যাতগোষ্ঠ। মুতক্ষরীপকার প্রবল বসিত অনেকগুলি ঘটনার সহিত নিজেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উহার বৃত্তান্তও বিখ্যাতগোষ্ঠ কিন্তু যথেষ্ট যথেষ্ট তিনি মুসলমানের Prestige রক্ষার ক্ষমতা অতিরিক্তের আলোচনা করিয়াছেন।

ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ ।

୧

ଅଳିହେ ମିଳନ ଗୁଣା ପୂର୍ବକାଳ ମିତେ
ତେଜଃପୁର ମହାସୋପାନୀ ବଳି ଯୋଗାନନେ !
ଧ୍ୟାନାନ୍ତେ ବିଶାଳ ନେତ୍ର ଉଦ୍ବିଗ୍ନେନ ଧୀରେ,
ମନ୍ତରେ ଡାଳୋକବାନୀ ନନ୍ଦ ମିତେ ନୟେ !
ମନ୍ଦୁକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାତା — କରେ ଅଳ୍ପ ବୀଜ ବାଣୀ,
ତୃଷ୍ଣିତା ଆଦର ମନ ଚମ୍ପକେର ନଳେ,
ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ତରେ ନୟା କୋରୁନନ୍ଦା ବାଣୀ,
କବନୀ ସେବନା ନୁହେଁ ନନ୍ଦ ମନତଳେ !
ସୋପାନୀ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋପିତ ହେରିଆ ନୟନେ
ସହନା ସ୍ପନ୍ଦନ ଏକ ନିସେଷେର ତପେ,
ବାଳାର ମନୁଷ୍ୟ ନନ୍ଦ ରଞ୍ଜିତ ବନେ,
ନୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ହିଁସ କ୍ଷେପକେର ତପେ !
ଭାଗିଲ ଶଳାଟ ବଢ଼ି ଦୈବ୍ୟ କମ୍ପନେ
ନିମ୍ବଳ ଅନନ୍ତ ଦୂରେ ତୁଳି ମରାମନେ !

୨

ହେ କହ ହେ ଭରତବନ୍ଧବ ମନ୍ତବ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ
ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶଳାଟ ବଢ଼ି ମହା ବିସ୍ମୟାନ୍ତ,
ଲେଖିତ ଉତ୍କଳ ଶାଳ ମନ୍ଦର ମନ୍ଦର
ନିମେଷେ ଅନନ୍ତ ଓଠି ହ'ଲ ଭବବାସିନୀ !
ଆର୍ତ୍ତ ରାତି ବିଳାପେତେ ବିଷ ତରି ଗୁଡ଼େ,
ଦିବ୍ଦ୍ରୁ ଗୁଡ଼େ ଦିଗନ୍ତରେ ଆଗିଛି ଜ୍ଵଳନ,
ସୁକ୍ଷିତା ପ୍ରକୃତି ଶରଣମତଳେ ଲୋଡ଼େ,
ତୃଷ୍ଣିତ ବିଦେବ ବନ୍ଧେ ନୀରବ ସ୍ପନ୍ଦନ !
ବିଗ୍ରହ ବିଗ୍ରହ ବଜ୍ର ଡାମ ଗୁଡ଼ା ଡାମ,
ତାଳେ ଧୂଳି ଆଗି ହୁଏ କରାଳ ମିନାକୀ,
ସାମୀ ମୃତ ଉଡ଼େ ଧ୍ବଜ — “ସାର” ବନ୍ଦ କାମ,
ବଢ଼ିଛି ଅନଳ ମିଥା ଆରକ୍ତ ଗି ଆଗି !
ଆର୍ତ୍ତନାଦେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ “ବିରମ ବିରମ”,
ହେ କାଳ କରାଳ ବେଶ ! — ନୟା ନୟା ନୟା !
ତ୍ରିନିରୁପମା ଦେବୀ ।

ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର ପଦାର୍ଥର ତାଡ଼ିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ।

Electrolytic Dissociation.

“ଆମରା ଇତିହାସ: ସେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦେଖିତେ
ମାଟି ତାହାବେର ପଦାର୍ଥ କହେ ।” ପଦାର୍ଥ ହୁଏତାମେ
ବିଭକ୍ତ — ଯୌଗିକ ଓ ଯୌଗିକ । ସେ ସକଳ
ପଦାର୍ଥେ ଏକଜାତୀୟ ବସ୍ତୁଟି ମାତ୍ର ବାହା ତାହାର
ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ (Elements) । ହୁଏ ଧା
ତ୍ଵତ୍ୟାଗିକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣେ
ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । କେନ ଏକଟି
ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥେ ସେ ସକଳ ଯୌଗିକ ଉତ୍ପାଦନ
ପାକେ ତାହାଦେବ ପରିହାରଣେର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅପରି-

ବର୍ତ୍ତନୀୟ । କ୍ଷମ ଏକଟି ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ; ହୁଏଟି
ଯୌଗିକ ଅଭିଳାଷପଦାର୍ଥର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉଦାହରଣ
ପତ୍ରି । ଉଦାହରଣ (hydrogen) ଓ ଅକ୍ସିଜନ
(oxygen) । ବିଭକ୍ତ କ୍ଷମ ସେ ତାହାବେଶି,
ସେବାନେଟି, ସେ ସମୟେଟି, ବା ବାହାର ବାହାରି ଏକତ୍ର
ହୁଏକ ନା କେନ, ମର୍ଦ୍ଦବାହି ଏକତ୍ରାଗ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଓ
ଆଟି ତାଗ ଅକ୍ସିଜନ (ଯୋଟି ନୟ ତାଗ) ଏହି
ଅବସ୍ଥାତେ ଗଠିତ । ସେବେଳେଟି ହୁଏକ କ୍ଷମେର
ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଲେ, ମାଟି ନୟ ମେଶ

০৭শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা। খাতব পদার্থের জাতি নির্দেশন।

জল হইতে এক দেহ উদ্ভবন এবং আট দেহ অল্পজন পাওয়া যায়। এইরূপ অপরিবর্তনীয় পরিমাণই যৌগিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য। যদি যে পদার্থ মার্শেল পাথরও সেই পদার্থ—উত্তম পদার্থেই তিনটি মৌলিক পদার্থ আছে এবং ঐ মৌলিক উপাদানের পরিমাণও সমান।

ক্যালসিয়াম (calcium) — ৪০ ভাগ।

অক্সিজেন (carbon) — ১২ ভাগ।

অক্সিজেন (oxygen) — ৪৮ ভাগ।

মোট— ১০০ ভাগ।

যদি এক শত মণ খড়ি বা মার্শেল হইতে সমস্ত অক্সিজেন বিস্ফোট করিয়া লওয়া যায় তবে সেই অক্সিজেন ওজন ১২ মণ হইবে। ঐ বায়ব মণ অক্সিজেন হইতে ৪৪ মণ অক্সিজেন বাষ্প প্রস্তুত হইতে পারে। খড়ি বা মার্শেল কোন পাথ্রে রাখিয়া যথেষ্ট উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে সহজেই অক্সিজেন বাষ্প পাওয়া যায় এবং ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেনের এক যৌগিক পদার্থ চূর্ণ, পড়িয়া থাকে। প্রতি শত মণ খড়ি হইতে ৪৪ মণ অক্সিজেন ও ৪৬ মণ চূর্ণ পাওয়া যায়। দেখ, কাল, পাত্র তেবে এই সত্যের ব্যাখ্যা হয় না—ইহাই রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের বিশেষ লক্ষণ।

কতকগুলি মৌলিক পদার্থ কঠিন, দুইটি তরল ও কতকগুলি অনিল। ব্রোমিন ও পারদ এই দুইটি তরল। পারদ তরল ধাতু। তাম্র, যোপা, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুগুলিও মৌলিক পদার্থ। শিল্প বা কাঁচ মিশ্রধাতু, কিন্তু যৌগিক নহে। কারণ শিল্পের উপাদানের

কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই। কাঁচ ও শিল্প বহু প্রকারের প্রস্তুত করা যাইতে পারে। উহা- দেহ মূল উপাদান তাম্র ও বস্তা। এই দুই ধাতু যে কোনও পরিমাণে মিশ্রিত করিলে শিল্প বা কাঁচ হয়।

যদ্যপি, অক্সিজেন প্রভৃতি কতকগুলি মৌলিক পদার্থ আছে তাহারা ধাতু নহে। এ স্থলে ধাতুর বিশেষ লক্ষণ কি দেখা উচিত। দুই একটি ভিন্ন প্রকার লবণ মৌলিক পদার্থেই অক্সিজেনের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া সায়ক্সাইড (oxide) উৎপন্ন করে। ধাতু ও অক্সিজেনের সংমিশ্রণে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা প্রায় ক্ষার ধর্ম সম্পন্ন (basic)। যে মৌলিক পদার্থগুলি ধাতু নহে তাহাদেরও অক্সিজেনের যৌগিক প্রায় অম্লভাববিশিষ্ট (acid)। ক্ষার ও অম্ল পরস্পর বিকল্পধর্মী। আবাদ বিভিন্ন রকম নষ্টেই কিন্তু উহাদের রাসায়নিক জিয়াও সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ক্ষার ও অম্ল উভয়ের বিরোধ সহজে উপলব্ধি হয়। অম্ল উদ্ভবন (hydrogen) অক্সিজেন অপরিহার্য। অক্সিজেন (oxygen) না থাকিলে পারে, কিন্তু উদ্ভবন বিহীন অম্ল উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ প্রত্যেক ক্ষার পদার্থে ধাতু বা ধাতব সংহতি (radical) থাকি আবশ্যিক। যখন ক্ষার ও অম্ল একত্রী- কৃত করা যায়, ক্ষারের ধাতু অম্লের উদ্ভবনের স্থান অবিকার করিয়া সেই অম্লের অংশটি অংশ লইয়া একটি নূতন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। উহাকে ঐ ধাতুর অম্লসল (salt) বলা যায়।* অম্লের উদ্ভবন ধাতুর

* "সংস্কৃতি" এই নাম হুস্তের বর্ণন আখ্যায়িক Ray's Hindu Chemistry Vol. I page 48.

যখন যৌগিক বায়ুতেই হইয়াছে। Cf. Dr. P. C.

যারা স্থানান্তরিত হইয়া কায়ের অবশিষ্ট অংশের (অস্রজন) সহিত জল উৎপাদন করে। সুতরাং দেখা গেল যে কায় + অস্র = জল + অস্রজতি। এই সমীকরণ আরও স্পষ্টরূপে লেখা যায় :—

কায় = বাতু + অস্রজন + জল
 অস্র = উদ্বলন + অস্রণেদ (= অবাতু + অস্রজন)
 কায় + অস্র = (বাতু + অস্রণেদ -) অস্রজতি + (উদ্বলন + অস্রজন -) জল
 সুতরাং অস্রজতি = বাতু + অস্রণেদ ।

অতএব দেখা গেল যে যৌগিক পদার্থকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় :—
 কায়, অস্র ও অস্রজতি। অস্রের বিশেষ উপাদান উদ্বলন; কায় ও অস্রজতির প্রধান উপাদান বাতু। অস্রে বাতু নাই। যে সকল কায় ও অস্র জলে দ্রবীভূত, তাহাদের আরও একটা সহজ পরিচয় আছে। জাবা কায় হস্তে লাগিলে সাবানের দ্বারা পিঙ্কিল বেগ হয়; লিটমস্ (litmus) নামক নীলবর্ণ উদ্ভিদ রস ঐ কায় যোগে নীলবর্ণ হই থাকে, নীলিমা একটু পাচ হয় মাত্র। অস্র পদার্থ প্রায়ই টক্ অবস্থাদান-শুক এবং নীল লিটমসের রং লাল করিয়া দেয়। লিটমস্ রস অস্রযোগে রক্তবর্ণ ধারণ করিলে ঐ “লাল লিটমসে” যদি জাবাকায় মিশান যায় তাহা হইলে উহার নীলবর্ণ পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে। সুতরাং অস্র পদার্থ কায়ের ও কায় পদার্থ অস্রের গুণ নষ্ট করে। অস্রজতির উৎপত্তিই এত পরস্পর গুণ নষ্টের অব্যাহত কারণ। নিম্নে কতকগুলি সাধারণ কায় ও অস্রের নাম ও উপাদান দেওয়া গেল :—

কায় :—

- ১। বসাকায় (Carbonate of Potassium) ;
 বাতু = পোটাসিয়াম্ ।
- ২। সার্মিকাকায় (Carbonate of Sodium) ;
 বাতু = সোডিয়াম (সার্মিমাটি বা সোডা) ।
- ৩। ক্যাল (Calcium Hydrate) ;
 ক্যালসিয়াম্ । ইত্যাদি ।

অস্র :—

- ১। গন্ধকায় জাবক
 উদ্বলন + গন্ধক + অস্রজন ।
- ২। নোয়া জাবক (Nitric Acid) ;
 + উদ্বলন + অস্রজন ।
- ৩। লবণ জাবক (Hydrochloric Acid)
 উদ্বলন + হরিতীন (chlorine) ইত্যাদি ।

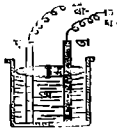
একণে দ্রবীভূত কায়, অস্র ও অস্রজতির একটি প্রধান গুণ আশোচ্য। কায় ও অস্রজতি দাতব্য পদার্থ। আধুনিক রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা উদ্ভদ্রব বাসকেও বাতুর অন্তর্গত করিয়া লইতে চাহেন। ইহার কারণ ঐ তিন শ্রেণীর পদার্থের তাত্ত্বিক দর্শ। ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে দুগুণতঃ তাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিকোপেক্ষ বিবরণ জানা আবশ্যক। আমাদের বস্তুটুকু আবশ্যক শুদ্ধ সেইটুকু বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এ বিষয়ে বাস্তবের বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হইবে।

তাত্ত্বিকোপেক্ষ যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক স্রোত প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাত্ত্বিক (বা বিদ্যুৎ) এক প্রকার মৌলিক পদার্থ। উহার দুইটি অবস্থাও দেখা আছে। দুই প্রকার তাত্ত্বিক সর্বাঙ্গ সমান পরিমাণে অবস্থিতি করে। উদাহরণ :— অত্যন্ত শুষ্ক; এমন কি অত্যন্ত এখন কোনরূপ বস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার দ্বারা তাত্ত্বিকের গুরুত্ব পরিমিত

৩৪শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

ধাতব পদার্থের জড়িত বিশেষণ।

হইতে পারে। দ্রুততঃ তাড়িতকোষ তিনটি উপাদানে গঠিত হয়। একটি কাচপাত্রে কিছু গন্ধকায় ড্রাবক (Sulphuric acid dilute) লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখা হয় এবং একটি দস্তার পাত ও একটা তাম্রের পাত ঐ ড্রাবকে স্পর্শক ভাবে ডুবাইয়া রাখা হয়। দস্তা ও ড্রাবকে রাসায়নিক ক্রিয়ার অভিধান হয় এবং ঐ রাসায়নিক ক্রিয়াই তাড়িতের উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। দ্রুততঃ দেখা যায় যে দস্তার অগ্রভাগে ও তাম্রের অগ্রভাগে তাড়িত উৎপন্ন হইয়াছে। আরই দস্তার গায়ে পারদ লাগান থাকে, তাহাতে দস্তা অনর্থক ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং তাড়িত সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এতোক পাতের সহিত একটু কৃত্রিমকৃত তাম্রের তার সংযুক্ত থাকে; হস্তগত ঐ তারের অগ্রভাগে তাড়িতের সমাবেশ হয়।



১ম চিত্র; তাড়িত কোষ।

দ দস্তার পাত।

তা তাম্রের পাত।

অ সলণ গন্ধকায় ড্রাবক।

ঘ ধনপ্রান্ত; অ ঋণপ্রান্ত।

তাম্রের পাতের যে তাড়িত থাকে তাহাকে ধন তাড়িত (positive electricity)

ও দস্তার পাতের যে তাড়িত থাকে তাহাকে ঋণ তাড়িত (negative electricity) বলা হইতে পারে। কারণ ঐ দুই প্রকার তাড়িতের ধর্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আকর্ষণ ও বিকর্ষণই তাড়িতের প্রধান গুণ। সম-তাড়িত পরস্পর বিকর্ষণশীল; বিপরীত তাড়িত পরস্পর আকর্ষণশীল। “ধনে ঋণে আকর্ষণ, সমানেতে বিকর্ষণ”, তাই উহাদের বিপরীত গুণবাচক নামকরণ হইয়াছে। তাম্রের সহিত যে তার সংশ্লিষ্ট আছে তাহার প্রান্তকে ধনপ্রান্ত এবং দস্তার তারের প্রান্তকে ঋণপ্রান্ত বলা যায়। ঐ ঐ ‘প্রান্তে আরই এক এক খণ্ড প্ল্যাটিনাম ধাতুর (platinum) পাত সংযুক্ত থাকে; কারণ ঐ ধাতু সহজে বিকৃত হয় না। ক্যাডিম প্রায়ফাইট নামক অকারের প্রান্তও ব্যবহৃত হয়। যতক্ষণ প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংস্পর্শ না হয়, ততক্ষণ উহার তাড়িতগুণ থাকে। কিন্তু কোন ধাতুর (তারের) দ্বারা যদি ঐ প্রান্তদ্বয় যুক্ত করা যায় তাহা হইলে আকর্ষণের বশে ধন তাড়িত ঐ তারের মধ্য দিয়া তাম্রের পাতের ঋণ-তাড়িতের সহিত মিলিত হইবে, এবং ঋণের ক্ষয় উত্তর পাতই তাড়িতশূন্য হইয়া পড়িবে। কারণ ধন ও ঋণ সম-পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া যদি একত্রিত হয় তাহা হইলে উহাদের বোগক্ষল শূন্য হইবে। বস্তুতঃ তাড়িত বিনষ্ট হয় না,—উত্তর তাড়িত যে অবস্থার পূর্বে ছিল, সেই অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার বাহ্য ফল উহাদের বিলুপ্ত হইল মাত্র! তাড়িতের বাহ্যফল বিনষ্ট হওয়ারকে তাড়িত বিনষ্ট হওয়া বলা যায়। কিন্তু কোষের মধ্যে ক্রমাগত রাসায়নিক ক্রিয়া হওয়ায়

পরস্পরেই আবার ধন ও ধন পূর্বক হইবে ও সংযোজক তারের ভিতর দিয়া আবার একত্রীভূত হইয়া পড়িবে। এইরূপে অবিরাম একটা স্রোত ঐ সংযোজক তারের ভিতর বহিতে থাকিবে। ইহাই বৈদ্যুতিক স্রোত।

একদা আমাদের পূর্বকথিত অরুণ্ডিত প্রবাহ বৈদ্যুতিক কি দেখা যাউক। তাড়িত-কোষের দুই প্রাটিনাম* প্রান্ত যদি কোন অরুণ্ডিতর অন্তর প্রবেশ করান যায়, দেখা যাইবে যে, তার সংযোগে 'বেদক বৈদ্যুতিক স্রোত' প্রবাহিত হইত, এখানেও সেইরূপ স্রোত অনায়াসে প্রবাহিত হইতেছে। ০ কিন্তু তাড়িত প্রবাহের লক্ষ্যে সঙ্গে ঐ প্রবাহের মধ্যে একটি বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। প্রায়ই প্রবাহের বস্তুর জ্ঞানগনিক বিশ্লেষণ ঘটে এবং বিশ্লিষ্ট অংশ তাড়িত-প্রান্তে বা উহার চতুঃপাশে উদ্ভূত হইয়া থাকে। একটা ঘূর্ণিত লইলে স্পষ্ট দৃষ্টিতে পাওয়া যাইবে। তাম্র ও গন্ধকার সংযোগে এক প্রকার অরুণ্ডিত উৎপন্ন হয় উহাকে চলিত কথায় তুঁতে বলে। ঐ তুঁতে অংশে ভাগিলে স্নায়ু নীলবর্ণ প্রবাহ হয়। তাড়িত কোষের দুই প্রান্ত ঐ তুঁতের প্রবেশ দু'বাইশে স্নায়ুই দেখা যাইবে যে স্নায়ুপ্রান্তস্থিত প্রাটিনামের উপর তাম্রবর্ণ স্তরের তার একটা আবরণ পড়িতেছে এবং ধন প্রান্ত হইতে

অনিবার পূর্বক উদ্ভিত হইতেছে। তুঁতের প্রবাহ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া তাম্র স্নায়ুপ্রান্তে ও অরুণ্ডিত ধনপ্রান্তে উদ্ভূত হইল। প্রবাহের বর্ণও মন্দীভূত ও স্নায়ু হইয়া আইসে। এখানে দুইটি বিশেষ কথা লক্ষিত হইল। প্রথমতঃ তুঁতে বিশ্লিষ্ট হইল ও দ্বিতীয়তঃ বিশ্লিষ্ট অংশ কেবল তাড়িতপ্রান্তেই উদ্ভূত হইল; স্নায়ু প্রবাহ কেবলমাত্র বর্ণহীন হইতে লাগিল।

ধনপ্রান্তে তাড়িত আসিয়া প্রবেশ প্রবেশ করিল। যদি তাড়িতের দ্বারা তুঁতের বিশ্লেষণ কার্য সম্পন্ন হইল এমন হয়, তবে ঐ ধনপ্রান্তেই তাম্র ও অরুণ্ডিত একত্র উদ্ভূত হইল না কেন? কেবলমাত্র অরুণ্ডিত ঐ স্থানে দেখা দিল, এবং তাহার উপরুক্ত তাম্র স্নায়ু তুঁতের স্তরের ভিতর দিয়া গিয়া অপর প্রান্তে দেখা দিল। তাহদের ঐ গতি ত দেখা গেল না—কেবল বোধ হইল তাম্র স্নায়ুপ্রান্তেই স্তর উদ্ভূত। আপন পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, ধনপ্রান্তের চতুঃপাশের প্রবেশ গন্ধকার প্রান্ত স্নায়ু পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাই বা কোথা হইতে আসিল? আরও এক কথা—যদি তাড়িত ঐ বিশ্লেষণ কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে তাহা হইলে ত উহার পুনঃবিশ্লেষণ ক্ষমতা কিরূপ পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায়

* বৈদ্যুতিক প্রবাহের পরিচয় চুবক পৃষ্ঠের সাধারণ্যে অতি সহজে অগ্রহৃত হয়। চুবক পৃষ্ঠ (একক ১০১) চুবক কোন দৃশ্য কণিকের সমাবেশে গঠিত। সাধারণতঃ উত্তর দক্ষিণ লম্বের দ্বারা নির্ণীত থাকে। যদি বৈদ্যুতিক স্রোত ঐ পৃষ্ঠের উপরিভাগে দক্ষিণ দিকে হইতে উত্তর প্রান্তের দিকে পরিচালিত হয় তবে পৃষ্ঠের উত্তর প্রান্ত দক্ষিণ দিকে মুহূর্ত হইবে। সুতরাং সংযোজক তারের এক অংশ উত্তর দক্ষিণ লম্বমান করিয়া একটি চুবক পৃষ্ঠের উপরিভাগে স্থাপন করিলে চুবক হইবে যে ঐ তারের বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত হইতেছে কিনা; আর যদি হইতেছে তাহা কোন দিক হইতে কোন দিকে।

যে এই আড়িতের পরিমাণ বা গতিবেগ কিছুই কমিয়া যায় নাই। যতবার ইচ্ছা একরূপ বিশ্লেষণ করাইলেও আড়িতের মাত্রা কিছুই কমে না। এখানে আড়িতপ্রবাহের ধারা কোনরূপ বিশিষ্ট রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় নাই; তবে ত্বঁতে বিশিষ্ট হইল কি একাধারে।

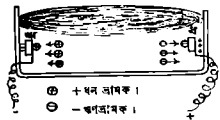
উক্ত প্রজ্ঞাবিশিষ্ট সম্ভাবনক উত্তর ১৮৮৭ সালে সুইডেন দেশীয় রাসায়নিক অধ্যাপক স্বাক্ষে আর্থারিয়াস (Svanic Arrhenius) দিয়াছেন। বহু পরীক্ষা ও গবেষণার তিনি জ্ঞানীও জ্ঞেয় বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে অগতে এই বিষয়ে অনেক নূতন সভ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহার কিকিৎ আভাস দেওয়া গেল।

কতকগুলি ধাতব পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইলে এই দ্রব আড়িতের উত্তম পরিচালক হয় বটে কিন্তু দ্রাব্য পদার্থটি আড়িতযুক্ত আন্তর সংযোগে বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। প্রায় সমস্ত অম্লভিত্তি জলীয় দ্রব এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শর্করা প্রভৃতি বাতুবিহীন পদার্থের দ্রব আদৌ আড়িত পরিচালন করে না। বিত্তজ্ঞ জলও আড়িতের অপরিচালক। অধ্যাপক আর্থারিয়াসের মত এই যে, কোন অম্লভিত্তি জলে দ্রবীভূত হইলেই উহা দুই ভাগে বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। এক ভাগে প্রচুর ধন-আড়িত ও অপর ভাগে সমান পরিমাণে ঋণ-আড়িত সংযুক্ত থাকে। যে সকল ক্ষার ও অম্ল জলে দ্রাব্য সে সকলও অম্ল বিস্তার ঐরূপে

বিশিষ্ট হয়। এই দুইটি বিশিষ্ট অংশকে ভ্রামক (ions) বলা যায়। যে ভ্রামকে ধনআড়িত থাকে তাহার নাম ধনভ্রামক (cation) এবং যে ভ্রামকে ঋণআড়িত থাকে তাহারকে ঋণ-ভ্রামক (anion) বলে। *

মনে কর কিছু ত্বঁতে জলে ভাপিয়া তাহাতে আড়িতকোষের দুইটি প্রান্ত স্থাপন হইল। চুষক ইটীর ধারা পরীক্ষা করিলে জানা যায় যে আড়িত প্রবাহ অগিজিত গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু শীঘ্রই দেখা যায় যে ঋণপ্রান্তে তার উভূত হইতেছে। ত্বঁতের জ্বলে, ত্বঁতে দুইটি ভ্রামকে বিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। একটি-ভ্রাম ও অপরটি ত্বঁতের অবশিষ্ট অংশ, (গন্ধক ও অক্সিজেনের সংহতি) উহার নাম "গন্ধকায় সংহতি"। রসায়নের গুণকে ত্বঁতের গঠন বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা ভ্রাম ও গন্ধকায় ভ্রামকের সংযোগে উৎপন্ন হয় এবং তাদের অম্লভূত

হয় চিত্র। আড়িত বিশ্লেষণ কোষ।



ধন প্রান্তে।

ধন প্রান্তে।

ভ্রাম-ভ্রামক ধনআড়িতযুক্ত ও গন্ধকায় সংহতি ঋণআড়িতযুক্ত। তবে এই দুইটি ভ্রামক

* এই অংশটিকে Michael Faraday ভ্রামক (ions) এই আখ্যা দেয়, কারণ তাহার জ্বলে মনো ইতস্ততঃ ভ্রামক কমিয়া থাকে ও এক স্থান হইতে আড়িতপ্রান্তের ভ্রামক করে।

পৰম্পরের আকর্ষণ এবং ভলকণাবি বিপ্লবণ শক্তির প্রভাবে পাশাপাশি স্বাধীনভাবে বিচরণ করে; প্রত্যেকের সহিত প্রচুর তাড়িত সংযুক্ত থাকার উহার সাধারণ ক্ষেত্রের গুণ হারাইরাছে, বসন্ত উহার নূতন পদার্থ। ধনাত্মক তাম্র সাধারণ তাম্র হইতে এত বিভিন্ন যে, প্রবে উহার অস্তিত্ব পর্যন্ত পরিণীত হয় না। এইরূপ কারণ উহার তাড়িত। যদি কোন প্রকারে ঐ তাম্র হইতে তাড়িত পৃথক করা যায়, তবেই তাম্র দেখা দিবে এবং সাধারণ তাম্রের গুণ প্রাপ্ত হইবে। যখন প্রান্তে যে পদার্থ তাড়িত থাকে তাহা ঐ তাম্রাত্মকের ধনতড়িত আকর্ষণ করিয়া পরিশেষে নিষ্কাশন করিয়া ফেলে, তাই তাম্রাত্মক পদার্থে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে তাড়িতবিহীন হইয়া সাধারণ তাম্রের আকারে দৃষ্টি গোচর হয়। তাম্রাত্মককে তাম্র ও ধনতড়িতের একটা বৌগিক মনে করা উচিত। বৌগিকে মূল উপাদানের গুণ নিপুণ হয় ইহা সচরাচর দেখা যায়। প্রবের মধ্যে কোন তাম্রকই দেখা যায় না বা উহাদের অস্তিত্ব কোন সাধারণ উপায়ে উপলব্ধি করা যায় না। কারণ উহার প্রচুর তাড়িতযুক্ত হইয়া সাধারণ বসন্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া পড়ে। ধনাত্মক পদার্থে আকৃষ্ট হয়, পদার্থিক ধনপ্রান্তে আকৃষ্ট হয়।

ঐ আকর্ষণের দশে ঐ দুই বসন্ত প্রান্তের উপাধি হইয়া তাড়িতবিহীন হইয়া পড়ে। হস্তমঃ উহার ঐ ঐ প্রান্তেই উদ্ভূত হয়। প্রান্তেরও সেইরূপে তাড়িতযুক্ত হইয়া পড়ে কিন্তু তাড়িত কোষে অবিরত রাসায়নিক ক্রিয়া সংযোগে আবার যথার্থ তাড়িতযুক্ত হইয়া উঠে। পুনরায় কিছু বেশী তাম্রক আকৃষ্ট হয় এবং এইরূপে বসন্তকণ না প্রব তাম্রকযুক্ত হইয়া পড়ে ততক্ষণ উহার বিপ্লবণ কার্য সম্পাদিত হয়। তাড়িতের প্রবাহও অবিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রবের মধ্যে তাড়িতকোষের তাড়িত চালিত না হইয়া তাম্রকদ্বয়ের তাড়িত পরিচালিত হয়—ফলে প্রবাহ অক্ষুর থাকে।

একটি তাম্রাত্মক যে ক্ষণে পদার্থে গিয়া তাড়িতবিহীন হইতে থাকে সেই ক্ষণেই উহার সহচর গন্ধকায়-তাম্রকটি ধন প্রান্তে গিয়া পড়ে ও তাহার পদার্থিক ঐ প্রান্তের ধন তড়িতের দ্বারা বিনষ্ট হয়। প্রবের মধ্যে ঐ দুইটি তাম্রক পরস্পরের শক্তি দ্বারা যে ভাবে ছিল, একটি তাম্রকের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইলে আর সে ভাবে অপরটি থাকিতে পারে না। হস্তমঃ একটি ছাড়িয়া অপরটি লাভ করিবার যোগ্য নাই। এক সময়ে দুইটিই দুই স্থানে পাওয়া যায়।

নিম্নে কতকগুলি অরত্বতির তাম্রক ধরের নাম ও গঠন দেওয়া গেল :—

অরত্বতি :	ধন তাম্রক :	পদ তাম্রক :
(১) লবণ	সোডিয়াম (sodium)	হরিতাম্র (chlorine)
(২) লোহা	পোটাসিয়াম	বসন্তায় তাম্রক (নাইট্রোজেন—১ পরমাণু)
		অক্সিজেন—১ পরমাণু)
	লৌহ	পদকায় লবণ (পদক—১ পরমাণু)
		অক্সিজেন—১ পরমাণু)

তবে বহু, দ্বিতীয় সংখ্যা।

পাতন পদার্থের তাক্তিত বিশেষণ।

(১) বিশদাল

আ্যামোনিয়

ধরিতম (১)

(নাইট্রো পদ—১) পরমাণু

উৎপন্ন—৩)

গোটিমিয়

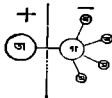
(২) সন্ধিক

(৩) কল্পিত

৭

দবকাইয় সাতক

সাধারণতঃ দেখা যায়, সকল অম্লত্বের ধন দামক থাকে। আর পরার্থের ধন দামক থাকে। অণুদামক অম্লত্বের অবশিষ্ট অংশ। প্রায়ই উহা দুট বা ততোধিক মৌলিকের “সংহতি” একরূপ “সংহতি” অতিথি কেবল জামক অবস্থাতেই সম্ভব। অণু তাক্তিও ঐ লক্ষিত হইতে চলিয়া যাউলে উহার প্রায় সাধারণরূপে রাসায়নিক বিশেষণ বা অপর কোন ক্রিয়ার বস্তুত্ব হইয়া থাকে।



৩৪ গি, ত্বের অণু।

তা তামের এক পরমাণু, ১- ধনতাক্তিও যুক্ত
গ গন্ধকের ঐ - অণুতাক্তিও যুক্ত
অ অম্লত্বের ঐ

জলে দ্রবীভূত হইলে ভয়বোনা স্থানে
বিশেষণ হয়।

উপর উক্ত ত্বের উদাহরণে অণুজামক গন্ধকায় সংহতি। ইহার গঠন এক পরমাণু গন্ধক ও চারি পরমাণু অম্লত্বের। ধনপ্রায়ে ঐ দামক সংহতি হইলে ধন উহার তাক্তিও বিনষ্ট

হয় অমনি উহা জলের উদ্বলন লইয়া গন্ধকায়
আবিক (sulphuric acid) নামক অম্ল
উৎপাদন করে এবং ঐ আবে জলের অবশিষ্ট
অম্লত্ব অম্লিকার উদ্ভূত হয়। ঐ আবে
চতুঃপার্শ্বে স্থতরাং ঐ অম্ল প্রচুর পরিমাণে
উৎপন্ন হয়।

অম্লত্বের এইরূপ জামকত্বের বিশেষণ
যতক্ষণ জল সংযোগ থাকে ততক্ষণই সম্ভব।
কোন উপায়ে যদি জল বাষ্পীভূত হইয়া
বিদূরিত হয়, তাহা হইলে ঐ দামকত্ব
পুনঃ সংশ্লিষ্ট হইয়া পরস্পরের তাক্তিও বিনষ্ট
করিয়া সাধারণ অম্লত্ব রূপে পরিণত হয়।
বিশ্লেষকের অবিরত অতিবেগ উপর যে বিশ্লে-
ষণ নির্ভর করে উহাকে “বিশ্লেষণ”
(dissociation) বলা যাইতে পারে; কারণ
বিশ্লেষক বিদূরিত হইলে বিশ্লিষ্ট অংশ পুনঃ
সংশ্লিষ্ট হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ (decom-
position) একরূপ নহে। উহাতে বিশ্লেষক
বিদূরিত হইলে বিশ্লিষ্ট অংশ পুনঃ সংশ্লিষ্ট
হয় না। যেমন তাপ সাহায্যে কাঠ বিশ্লিষ্ট
হয় কিন্তু ঐ বিশ্লিষ্ট অংশ জলির তাপ দ্বারা
কল্পিত পুনঃ সংশ্লিষ্ট হইয়া কাঠ উৎপাদিত
হয় না। ইহা রাসায়নিক বিশ্লেষণ। তাপ
সাহায্যে বড়ি বা মার্বেল বিশ্লিষ্ট হইয়া চূর্ণ
এবং অস্ফাট বাষ্পে পরিণত হয় কিন্তু সেই

তাপ বিদ্রুত হইলে চূর্ণ ও অক্সিজেন বাষ্প
পুনঃ সংশ্লিষ্ট হইয়া বড়ি উৎপন্ন হয়। ইহাই
“বিসংলেশন” বা dissociation.

এই বিশ্লেষণকে বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ বলা
যায়। জাৰা বস্তুতে যতগুলি অণু আছে সকল
গুলিই বে বিশ্লেষিত হইতে পারে নাহে। বিশ্লে-
ষণের মাত্রা জল ও ত্রায়া বস্তুর পরিমাণ ও
উত্তরের উত্তাপের উপর নির্ভর করে। জল
যত অধিক পরিমাণে থাকে ততই অধিক
সংখ্যক অণু স্রাবক অবস্থায় পরিণত হয়।
এইরূপে যখন যথেষ্ট জল মিশ্রিত করা যায়
তখন সমগ্র অণুই ঐরূপে বিশ্লেষিত হয়।
জারকের সংখ্যা যত বেশী হইতে থাকে,
ত্রয়ের তড়িৎপরিচালন ক্ষমতাও তত বেশী
হয়; পরিণেবে যখন জারকের সকল অণু-
গুলিই দ্রাবকে বিভক্ত হইয়া যায় তখন ঐ
অবস্থায় ত্রয়ের তড়িৎ পরিচালন ক্ষমতা
সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। উপরক্ত বস্তু পাচ্যে
কোন ত্রয়ের তড়িৎ পরিচালন ক্ষমতা কত
তাঙ্গা মূল্যরূপে নিরূপণ করা যায়; অতঃপা-
শ্চ কতকগুলি অণু বিশ্লিষ্ট হইয়াছে তাহা
জানিতে পারা যায়।

জল ভিন্ন অন্ত্র দ্রাবকে একজন বিশ্লেষণ
দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ আজিও জানা যায়
নাট। এ স্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, আকসি-
নিজালের জারকত্ব সম্পূর্ণরূপে কল্পনা প্রাপ্ত।
পরীক্ষা দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় সেই সমস্ত
ঘটনার অম্বর বোধগম্য হেতু নির্দেশ ঐ বস্তুর
সাহায্যে করিতে পারা যায়, এবং যতদিন না
উহার প্রতিকূল কোন প্রত্যক্ষ ঘটনা পাওয়া

যায় ততদিন ঐ মত লভ্য বলিয়া মানিয়া রাখা
ভাল। উহা এমত সত্য তথ্য কি না তাহা কালে
প্রতিপন্ন হইতে পারে মাত্র—সকল বিষয়ের
অঙ্গটো হেতু নির্দিষ্ট করিতে পারিলেই উহা
মধ্যাকর্ষণ বায়ু ইত্যাদির স্তায় সত্য তবে
পরিণত হইবে।

জাবক—Solvent

দ্রাব্য—Solute

ক্ষার—Base, alkali

অম্ল—Acid

অবকৃত—Salt

বিশ্লেষণ—Decomposition

বিসংলেশন—Dissociation

বৈদ্যুতিক প্রোত বা অধাৎ—Electric current

ধন তড়িৎ—Positive Electricity

ঋণ তড়িৎ—Negative Electricity

জারক—Ions

অণু—Molecule

পরমাণু—Atom

তড়িৎ পরিচালন—Electric Conductivity

জারকত্ব—Ionic Theory

কঠিন—Solid

তরল—Liquid

অনিল—Gas

মৌলিক পদার্থ—Element

যৌগিক ঐ—Compound

সংমিশ্রণ—Combination

সংযুক্তি—Radical

অম্লশেন—Acid Radical

তড়িৎ কোষ—Electric cell

তড়িৎপ্রান্ত—Electrode

ধনপ্রান্ত—Anode or Positive Electrode

ঋণপ্রান্ত—Kathode or negative Electrode

আকর্ষণ—Attraction

বিকর্ষণ—Repulsion

চুম্বক হুতা—Magnetic needle

ধনজারক—Kation or positive ion

ঋণজারক—Anion or negative ion

ঐশ্বরকল্প কট্টাচাৰ্য্য

বিদ্যে বাড়ী।

সেই সময় ইষ্টক জ্বপের সম্মুখে গাড়ী পারিতেই একটু নতুন কুস্ত চক্কে আকৃষ্ট করিল। গেট ও দ্বারবানের গৃহের চিত্তবিরূপ সেই বর্ণেচ্ছ পতিত ইটপাখা বখানোয় সজাটয়া শুছাইয়া দেখানে ছটা কলাগাছ রোপিত হইয়াছে। বহিরঙ্গণটি ঘণালাখা পতিত ; কাঁটানটে আঙ্গুণেড়া প্রভৃতির অঙ্গলগলা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। পূণ্যঙ্গর অর্ধচন্দ্র পূজামণ্ডপটিতেও ঝাট দিয়া দুই খানা বড় বড় সতবকি পাচা হইয়াছে। অর্ধচন্দ্র অট্টালিকা-মধ্যস্থ অঙ্গন হইতে তথ্য গৃহের ইষ্টক জ্বপের পার্শ্বে লামিয়ানা বাঁশ ও কাপড় দেখা যাইতেছে। বিস্তৃত নাঠের বৃকে ঘন বনের মধ্যে বংশপুঞ্জ বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে খানি। গ্রামের একপ্রান্তে ততোদিক বিলম্ব জঙ্গলে ভরা নষ্ট প্রায় তথ্য অট্টালিকা। দুই তিনটি বিধবা ভিন্ন বাধ্যমান কেহই দেখানে বাস করেন না। অস্ত্র আয়ালের এক জাতি খুঁড়খুঁড় পুরেণ বিবাহ দিতে দেশে আসিয়াছেন, তাই তাহার কমপেয়ে রত্নবস্ত্রের এ সাজ।

গাড়ী হইতে নামিতেই খুঁড় খাণ্ডী ঠাকুরাণী আসিয়া “আগ বাড়াইয়া” লইলেন এবং দেহাবদর পূর্ণ কর্তে বলিলেন, “এমন কুটুংগের মত কি আসতে হয় না! তোমাদের ভরসাতেই রমার দেশে বিয়ে দিতে আসা। বিদ্যার স্বর্ণে গিরেছেন, ঠারাই বিয়ে পাওয়া সব গিরেছেন, আনি ত কিছুই জানিনা ভোমাদের বেওয়ারি বিয়ে, তোমরা আজ কুটুংগের মত এলে?” কোন রকমে শাক্তী ঠাকুরাণীর এ বেহাঙ্গ-

যোগ কাটাইয়া লইলাম। বাড়ীর ভিতরে তখন উগু পড়িতেছে, খুঁড়মা বলিলেন “গায়ে হুগু হচ্ছে, আশীর্বাদ করবে চল বাছা।”

যদি অতি নিতীহ লোকটির মত দীর্ঘদিন উপর বলিয়া আছে, পরে নতুন লাগপেড়ে পুতী, কাঁখে রত্নগামছা! সখা বধু ও কজাগণ তাহার চারিদিক ঘিরিয়া ঠাড়াইয়া আছে। জনৈক গৃহিণী বলিলেন যেন কোড়া হয় না, সাত কিবা নলনে হলুদ দিও। “তাই হয়েছে, হরিব বোকে বাদ বেওয়া গেল।”

“কেন হরিব বৌ বাবু কেন?” একজন চোপ টিপিয়া বলিল “ওগে বিড়ী পকে!”

“ঠাণ্ডো খুঁড়মা, ক’বার হলুদ ছোঁপাতে হবে?”

“আমার কেন জিজ্ঞাসা করছ বাছা, তোমরা ত সব জান? সাতবার বুঝি, না বড় বোমা?” “বাম্বোরে মিলেবা কম্বুছে কি? বাম্বোতে বন্দা! মলিনী নাথ বাচা। সাতজন “এগো” হলুদ হাতে নিয়ে ব্যবের কপালে ছুঁইয়ে দাও! উলু দাওনা সবাই! বেশি গো কাপড়ের বাতাসে এদীপ যেন খবরবার নেবে না!” “মেজ বোমা! তুমি সব কর বাছা, ওদেরও বলে বলে দাও, আনি রান্না বাড়ী চন্দ্রান, বেশিকের কতপুর গোছগাছ হল বেশি।”

“বারবেলা পড়বে বারবেলা পড়বে!” বাহির হইতে চাঁৎকার করিতে করিতে পরমাণিক ভিতরে প্রবেশ করিল। এতদূরটুকী তাহার পো খরিল, “বাঙলা বাড়ি মহা সোরসোল বাধাইয়া জুলিল। বালক বলি-

কামা গায়ে হলুদ দেখা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া
বাজলানদের নিকটে ছুটিয়া গিয়া অশ্রু-
ভাবে সান্নিধ্যার্থী লাড়াইল !

শয্য ও তলুপ্পানির মধ্যে পাত্রেয় গাত্র
হরিদ্রা শেব হইল। বড় বিধি ডাকিলেন,
গুড়িমা তুমি আগে আশীর্বাদ কর তবেত
সবাই করবে।" "তোমরাই করনা বাছা
তা হলেই সব হবে।" "না না তা কি হয় ?"
সকলের নির্দ্বন্দ্ব গুড়িমাগুড়ী হুটুত তাহে
পূজকে আশীর্বাদ করিয়া ধানছরীর
পাত্রপানা সর্বগের হাতের নিকটে ধরিতে
লাগিলেন। আশীর্বাদে ক্রিয়া শেষ হইলে
গুড়িমা সকলের হাতে পান সুগাঠী সন্দেশ
ও সন্দেশের লগাটে সিন্দুর দিয়া দিলেন।
ওদিকে বালিকারহলে রং মাগানর ধূম
পড়িয়া গেল। শুধু বালিকারা নয়, শেষে
সকলেই সে পর্যায়ভুক্ত হইয়া পরস্পরকে রঙে
ডুবাইতে লাগিলেন। একজন বয়স্ক বধু বহুকে
তৈল মাখাইতে লাগিল। পান সুগাঠী দেওয়া
শেষ হইলে গুড়িমা বলিলেন "আর দেয়ী
ক'রনা, সবাই তেল হলুদ মেখে নেবে এল।
বড় বোমা তোমরাও নাইতে যাও বাছা।
তুমি ছোট বোমা, গোপালের বৌকে নিয়ে
নিরীহবে যাও। ওবাড়ীর মেজবোমা
নবোমা মুকুথোবোমা তোমরা সব আবে
যাও, আরও থাকে পাও ছুটিয়ে নাও। তোমা-
দের জল বাটনা কিয়েরা দেবে। নানি,
আইনড় তাতে পরমায় নাঁথনি কি বলি?"
"হ্যাঁ ছোট ঠাকুমা হ্যাঁ, আমি কাকার পায়েল
রাঁধব।" "নে তবে আর রং খেলিসনে।
হলুদ মাখদিনে ? একালের মেয়েরা হলুদ
মাখেনা। আমরা সেকালে বিয়ে বাড়ীতে কত

হলুদ মেখেছি,—না বড় বোমা ?" মেজবিনি
সহান্তে বলিলেন "ছাড়া করনা বাছা। তোমার
ছেলের গায়ে তার শোধ তুলে দিচ্ছে।
অমনি করে কি হলুদ ভায় বরের গায়ে ?
তথত অম্মার ! রমা ঠাকুরপো তুমিই বা
কেমন ? ছুঁড়িগুলো মাখুণী করছে আর
চূপ করে আছে ?" মেজবিনি কলহাতে
বলিলেন, চূপ ক'রে থাকবেনা ত আজও তেরি
মেরি করবে নাকি ? পাচদিন চোয়ের একদিন
সাধের !" মেজবিনি বলিলেন "আর তাই
ঠাকুরপো নাইয়ে দি, নইলে ওরা আরও হুর্দশা
করবে।" পরমাণিক হাঁক দিল "আমায় তেল
হলুদের বাটীটা দাওনা গো, কর্তা ওদিকে
বকাবাঁক করছেন, এখন আমায় কনের বাড়ী
দাওনা হতে হবে। ওবন্টা আর সময় আছে কিন
জোশ হাঁটেতে হবে।" রূপার বাটীতে বরের
ব্যবহৃত তৈল ও হরিদ্রাবাটী কস্তার গাত্র
হরিদ্রার কস্তা পরমাণিকের হাতে দেওয়া হইল।
এদিকে গরুহলুদের তবের সুগোৎসর্গ ব্যাণের
চলিত নাই ! বড়কোর এক বড়ী তেল ও কিছ
সন্দেশ হাঁরতায় সঙ্গে স্নেহিত হইয়া থাকে।

বালিকা ও বধুরা খুঁড়মার নির্দেশ মত
হলুদ তেল স্তমেন না মাগিলেও রঙে আপাদ-
মস্তক রঞ্জিত হইয়া সাবান গামছা ইত্যাদি
লইয়া ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত গ্রাম্যগণ সুশ্রুতি
করিতে করিতে ঘাটে গিয়া পড়িল। দীর্ঘকাল
যির কাশোজল অনেক দিন পরে অখীর তরঙ্গে
সচলিত, এবং বধুদের গাত্র ও বস্ত্রখলিত লাল
রং রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বিনি নিরানিবে
বাঁদেতে আঁঠে হইয়াছিলেন তিনি স্নানান্তে
বলিলেন "দেখিস তাই, সাবান ছোঁয়াস্নে,
আমরা ঠাকুরভোগের পরে যাব।"

তারপরে সমস্ত দিনব্যাপী একটা টেই দৈ
ব্যাপার চলিতে লাগিল! এখন রাত্রি বাড়ীর
দিকেই ঘুম ঘেঁসে। বধূ মাথায় কাপড়
জড়াইয়া “মাথা” নামক চূড় বোম্বুটে বড়
বড় কড়া ডেকচি ঢাকিয়া যন্ত্রের পূর্ণাঙ্গিত্তর
ব্যাপার প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিল।
তরকারি কোটার ব্যাপার রাজেই শেষ করিয়া
রাখা হইয়াছিল। বেঘিতে বেঘিতে কাঁটা
তরকারীর তুল্য কমিয়া মাহের আম্বানি
আরম্ভ হইল। উঠানের একধারে বটী পাতিয়া
ঝিঙের মাছ কুটিতেছে, কেহ বা ধুইগা
আনিয়া আম্বা-রাম্বাঘরে ঢালিয়া দিতেছে।
অগ্নির প্রবল উত্তাপে বগুনের মুখ তুলের
মত টকটকে হইয়া উঠিতেছে, তথাপি
সহ্যস্তমুখে মানবে—“এতে কখনো খুঁড়িমা,
এক কড়া ছাঁচিয়া কি কুসুবে? এইটাই
লোকে দেখে থাকে। আরও চাটি আলু
বেগুন সিম কুটে দিতে বগুন, মাহের
কাঁটা চোপ্ড়া এখনো তের আছে। মুগের
ডালও বোধ হচ্ছে আর এক ডেক চাই!
ভুজ, শাকও বোধহয় আর এক কড়া চড়াতে
হবে! হু কড়াতে হবে ত? বকে দেগুন
বাছা!”—ইত্যাদি বাক্যে তাহাদের অশ্রান্ত
উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন এবং কুট্র
ঠেলে মাছ ছাড়িয়া দিতেছেন। বাতুলী
ঠাকুবাণী তাহাদের অস্ত্র অল পান বধি
ইত্যাদি লইয়া বাধে বাধে আগিতেছেন ও
“বড় বোমা, ছোট বোমা, বাছাঝা আগুনের
আলে খুন হ’ল, ঠাকুর ভোগ হবে তবে বাছাঝা
একটু অল মুখে দিতে পাবে” ইত্যাদি বাক্যে
ক্লেত প্রকাশ করিতেছেন; অথচ নিজে এখনো
দান করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পান্দু নাই।

ঠাকুহুভোগের পর ঘরের আনুষ্ঠান
আরম্ভ হইল। একপাল বালকও ঘরের সঙ্গে
পাছন ভঞ্জে বসিল। তখন আবার সকলকে
পাকপাশা হইতে হাত ধুইয়া পান্দকে আশীর্বাদ
করিতে বাটতে হইল, নহিলে খুঁড়িমা
ছাড়িবেন না! বাটাচা বর দেবার
আশা পানিকাদিগকে প্রণাম করিতে তুলিয়া
গিয়াছিল, মাতা নুন করিয়া দিলে সে
অপ্রস্তুত ভাবে ক্রম সংশোধন করার মেজ দিদি
সহান্তে বলিলেন—“হ্যাঁ, আর তুয়া হয় না কেন!
এ ক’দিন প্রত্যেক কালো বুদ্ধিমানের গরুর
মত মাপা নাড়ার কসরৎ দেখানো চাই!”

আইবড় ভাতের ভোগ মিটিতে প্রাণ
লগা হইল। একজন জাতি বরকে
রাজিভোগে নিমন্ত্রণ করিলেন। তুইদিন
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে করিতে বর
বাটাচা জাহি জাহি করিয়া উঠিল।
সহেরে মত এক বাংলা মিটার ও বস্ত্র
পাঠাইয়া এখানে প্রতিবেশীরা নিকৃতি
লয় না। বরের সঙ্গে তাহার বাটীতে সমাগত
অম্বাঃকুটর সন্তানগুলিও প্রত্যেকের বাটীতে
নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে।

পরদিন অধিবাস! “এরোপের ডাকাইয়া
তাহাদের মধ্যে জনৈক গরিষ্ঠকে প্রধান
সদস্যর পদে বরণ করিয়া নতন কাপড়
পরাইয়া কামাইতে বসান হইল। নাপিত
বগু ও নতন কাপড় পরিণ। তখনও অন্ন বর
হস্তের খেলা চলিল। একে একে সমাগত
সকল সদস্য ও কুমারীদের আগন্তু পরাইয়া
পান হুপারী সম্মেলন দিয়া লক্ষ্যনা করা হইল।
পুত্রের আনুষ্ঠানিক কামনার প্রাণের ইতর
তত্ত্ব সকলের বাকী ঠেল লক্ষ্য পান হুপারী

বিস্তারিত হইতে লাগিল। দুটো আদি নীচ জাতিরা অধিবাসের দিন নিজেরা মলে মলে আসিয়া তৈল সন্দেশ মুড়ীমুড়কী বজ্রকল পুরিমা লইয়া বাইতে লাগিল। সন্দেশ এক একটা চিনির টিবি মাত্র, লুটী কচুয়া কীর আদির ছড়াছড়ি; তথাপি চুটো মুড়ী মুড়কী লইতে তাহাদের কি আগ্রহ!

পরমাণিকের বাস্তবতার সীমা নাই। সে সপ্তম গোটা কয়েক কলা গাছ আনিয়া ডাক হাঁক ফুড়িয়া নিল “ন’কড়া কড়ি দাও, গিটে হলুদ সুপারী দাও, ছান্দাটা বেধে দিয়ে যাই—আমার কি এক কাল! মালী মাণ্ডি শুধু টাকা আর গিথে নিতে জানে! ছান্দার টাঙ্গাতে কদমকুল পাতিময়ুর ব্যাগ্রান? আপনারা ত কিছু বলবেন না, ঘেমে না থেকে থেকে সবই জ্বলে গিয়েছেন। হ’ত আমাদের বাড়ী ত টের পেত!” ইত্যাদি বকিতে বকিতে নরজন্মের ছান্দা বাঁধিয়া দিয়া চলিয়া গেল। খুড়িমা বলিলেন “একজন এগোয়া” ছান্দা-তলা নিকোও, মেজবোমা তুমি পিটুলি দাট, আজই পিড়ের আল্পনা দিতে হবে! কলকে তোরে মলসাখা নান্দীমুখের হাসান আবার বরষাত্র সকাশেই খেয়ে রওনা হবে,—কাল আর কখন কি হবে? নাপিত বো, পাড়ার বৌঝিরের ডেকে আন, নান্দীমুখের চাপ কাঁড়তে হবে। রাঙ্গা দিদির বাড়ী “ছিরি” গড়তে দেওরা হয়েচে আনতে হবে।” জনৈক বধু বলিলেন “হ্যাঁ গা জুলো ডালা সাকান হয়েচে ত? অধিবাসের ডালায় বাইন রকম জিনিষ লাগে! জুলোর চাটি খান দিয়ে তার ওপরে ‘ছোবা’ চামুটে রাখতে হয়, ‘ছোবা’র তেতরে হলুদ মেখে

চাপ কলাই কড়ি গিটে হলুদ দিয়ে একপানা চেপির কাগড়ে জুলো ঢাকতে হয়! জুলো যে মাথায় করবে সে এক বজ্রের কাশন করবে না, বড়ী থেবে না, ছাত্ত খাবে না, মাঝেই জুলো মাথায় করতে হয়!”

“বড় বোমা তার খোকে দিয়ে জুলো ডালা সব গুছিয়ে দিইয়েছে!”

পাড়ার সদবা জুমারী লকশেই বসন জুগলে লজ্জিতা হইয়া আসিয়া হাজির হইল।

তাহাদের নিজ গৃহকর্ম আজ বিরে বাড়ীর মাস্তিক কাণ্ডের নিকটে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

“ওরে কেউ রমাকে ডাক! আমি চানের খাষা নিই, হরির বো পান সুপারীর খালা নিক্, নগিনী শাঁক বাজা, রাষ্ট্রকে জলের ঘটা দে। মেজবোমা রমাকে কোলে দাও,

ওরা তো তোমাদের দেওর নয় বাছা, পেটের ছেলের চেয়েও ছোট!” মেজদিদি হাসিতে হাসিতে বরকে কোলে তুলিয়া

লইয়া বলিলেন “শোন তাই! আমরা আজ দেওর বলে তোমার মস্ত করব মনে করছি

কিছু পুড়িমা তা করতে দিচ্ছেন না!”

পান দিয়া বরের চোখ ধরিয়া মেজদিদি অগ্রসর হইলেন। “রাণী, নগিনী আগে চল,

গোটা দুই বাজনারকে সঙ্গে ডেকে নে; আমার ত টোক নেই, কৈবর্ত বাড়ী যেতে

হবে। বড় বোমা, ছোট বোমা কুটনো কেলে একবার উঠে চল বাছা, দেওরের বিয়ের সব

কাজ দেখতে হয়!” বড় দিদি আপত্তি করিলেন “ওরাই যাক,—আমরা উঠলে

এখন কুটনো কেলে এটাও মৌড় দেবে, আর করতে পারব না!” খুড়মাখড়ী

না তনিয়া হাত ধরার অগত্যা আমাদের

উঠিতে হইল! কৈবর্ত বাঁকীর অঙ্গন বিদে
 বাঁকীর এদের ভরিয়া গেল। কৈবর্ত গৃহিণী
 “এসো মা সকল এসো” বলিয়া স্বর্জন
 করিল। দাত্তী বলিলেন “আট দিন
 ঢেঁকি পাড়তে পাবি না তাই! তোদের
 নিত্য খান ভানা, ক্ষেতিতো হবে বড়!”
 “তাছোক্ ছোটদিগি ঠাকুরণ! কত ভাগ্যে
 তোনার রমায় দিবে! কেন আনিত ঘণার
 মাকে বলেছি দিগি ঠাকুরণকে আমার ঢেঁকি
 নিতে বলিস্! আহা! সেকালে গিরিয়া
 আমার ঢেঁকি ছাড়া আর কেউরি ঢেঁকি
 নিতেন না! বহুরে তখন এবাড়িতে দুটো
 তিনটে করে বিয়ে হ’ত! কোথায় গেল
 সে সব ধনেয়া! গিরিয়াই কোথায় গেল!
 ভায়া থাকলে কি আজ ওপাড়ীর অমন দশা
 হয়?”—কৈবর্ত গৃহিণী চোখ মুছিতে লাগিল।
 আনন্দসঙ্গীতের মধ্যে করুণ শ্রাবণী বাজিয়া
 ওঠার সকলেরই নাদাপন হইতে এক
 একটা নিখাস বহির্গত হইল। বড়দিদি
 বলিলেন “আজ আর ওসব কথা কেন?
 শুভ কাল! কই ঢেঁকি নিকরে রেখেছিস্
 ত?” “আমি “জড়” মাছব, আমি কি
 পারি? পেপুলার বোডোকে ধরে নিকরে
 নিইছি!” “তোরা সব বিটকেল! ঢেঁকী
 নিকুবি তাও বোঝ?” “খুঁড়িমা! ঢেঁকীর
 মাথায় তেল সিঁদুর পান প্রসূরী সম্মেল মাও,
 ঢেঁকী বরণ কর? হাসমাওড়ী একটা
 বাঁকী আন্ বাছা, ঢেঁকির মাথার নীচে
 পাখ, নইলে তেলটা সব পড়ে নষ্ট হবে।
 নে তোরা ন’জন বা সাতজন ঢেঁকীতে
 ওঠ, আমি চাল দেওয়াই।” পান দিয়া
 বরের চক্ষু ঢাকিয়া, স্বর্ণরজ্জুতে (হারে)

মুগল হস্ত আবদ্ধ করিয়া ঢেঁকির গড়ে
 চাল দেওয়াইতে দেওয়াইতে মেক’দিদি
 বলিলেন “কনের নাম কি গো?” মণিনী, রাণী
 কলহাতে বলিল “মেল মোঠিমার” সাতকাণ্ড
 রামায়ণ শুনে দীতা কার ভাখ্যা?” কনের
 নাম জানেন না ‘অবচ সব করান’ চাই”।
 কি জানি বাছা স্বর্ণম অত বোঝ রাখতে
 পারি না। মে বল দিগুগিত, বাচারা হাত
 বাঁধা কতকণ থাকবে?”
 “স্বর্ণ-লতা গো স্বর্ণ-লতা!” “বল ঠাকুর
 গো! স্বর্ণ-লতার চাল কাঁড়াকি! তিন বার
 চাল দিতে হবে। মস্তর বস্ছ ত মনে মনে?”
 “হ্যাঁ হ্যাঁ হল তো তোমাদের?” “ওকি
 উঠছ কেন? কোলে চড়ে যেতে হবে
 আবার! শুধু দোটি পাওয়া নয় গো,
 এতে অনেক খুঁড়িমা! আর এই ত কনের
 দক্ষা! বাসর বরের ধাকা সামলে এসো
 তনে পল্লব বীর পুরুষ! নেলা তোরা পাড়
 দে, সাত বানের বেশী হয় না বেন”।
 লক্ষ হুসুফানি ও পদালকারশিত্তের সঙ্গে
 সঙ্গে ঢেঁকী তালে তালে সাত বার উঠিল
 ও নামিল। কোথায় গেলেন কালিদাস!
 নীরস শুকতারও বোধ হয় তাহার বর্ণনার
 এই মোহদে মুগ্ধরিত হইয়া উঠিত!
 আবার সহবানের হস্তে পানসুপারী ও
 ললাটে সিঁদুর দেওয়া হইল। আমাদের
 বাসিকা বিধবাটি একপালে কাঁড়াইয়া
 ফাল ফাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।
 খুঁড়িমা সম্মে তাহার হস্তেও পান সুপারী
 দিতে গেলেন, সে ছুটিয়া বড় দিদির নিকটে
 পলাইয়া আসিয়া তাহার জোড়ে মুখ লুকাইল।
 খুঁড়িমা অশ্রুজলকণ্ঠে বলিলেন “নাও মা

পান জুপারী নাও" ! বালিকা মাথা নাড়িয়া বলিল "না নিতে নেই যে" ! "কেন নিতে থাক্বেনা, আমি হাতে করে দিচ্ছি নাও তুমি !" খুড়িমার অহুরোধে অগত্যা লজ্জিত কুণ্ডিত ভাবে সে পান জুপারী লইল বটে কিন্তু ছই বিন্দু জল তাহার চোখে মুক্তার মত টপ টপ করিতেছিল। বরোমোষ্ঠারী সকলেই সকলের অজ্ঞাতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন ! খুড়িমা সনিবাসে বলিলেন "তোমরা জল ধায়া দিয়ে বর বাড়ী নিয়ে যাও। আমি "ছিরি" বরণ করে নিয়ে আসি, সেজন্যেই "ছিরি"র মিথোটা এসেছে ত ? রাণী, নগিনী জোরা কুলো ধর, একা তুলতে নেই" ! হনুস্বামীর সঙ্গে খুড়িমার মস্তকে কুলা তুলিয়া সেগা হইল। তাহার বারানদীর আঁচলে একখানা হৃদয়ে রঙের ছোপান নূতন জাক্‌ড়া-বাধা, সেটা মটীতে সুটাইতেছে। ইহার নাম "সোরাগ" ! বরকতার বাহাতে পরম্পরের নিকট আসার বর্জিত হয় সেজন্যে এ "তুহু" ! বাহিরের আসিয়া বালিকা রাণী তাহার সমবরতা হরিষ বোকে বলিল "তোমার পান জুপারী কই কনে দিবি ?" হরিষ বো তাঁট জুগাইয়া বলিল "নেপ্‌লার বোকে দিয়ে দিয়েছি ! কি করে বারে পান আর জুপারী হাতে নেওয়া, কাপড়ে সন্দেশের চট্টটে হাত বিতে হাতে" ! কৈবর্ত লাগড়ী সমাধানে বলিল "কি বলি কনে বো ? পান সন্দেশে কাপড় খাটান হবে ? "বত কিছু না বোম্‌তোবন্‌ সব ঐ ঘটের এসাদে,"—ঐদাঁদুর কোটাটি—ঐ পান জুপারীর কত মান্য তা জানিস ? এসব মঙ্গল কাজে ঐ তুচ্ছ জিনিষ হাতে পাওয়া কি কম

ভাগির কণা ? এইত তোর বড়দি, ছোটদি, ঐ কাটা বোটা বেরছিস্‌ তো ? তোদের বুদ্ধের পাটার বলিহারী ! একাণের ঘেরোই অমনি"—বাম্‌ বাম্‌ করিয়া সকলে তাককে খামাইল। বিড়ির পক্ষ বলিয়া এতোক কার্যো তাহাকে বাম্‌ দেওয়ারভে বেচারী হরিষ বো বড় চটিয়া গিয়াছিল ; সেও ত বালিকা বৈ নয় ! এখাপারের অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল।

সেজ দিদি বলিলেন "হ্যাঁ মেজদি !" তাই অমূল্য কাদের বিরে বাটানো বাবে ? অধি-বাসের জালা সকলেই ত চাই" ! "যাদের খুব ভাব এমন যেরে জামাই বা ছেলে বো ধরে বাটিয়ে নে" ! "ও মেজদি তবে সে তোমাকেই বাটতে হবে" ! সকলে লমববে এ প্রস্তাবে সাহা দিয়া গেল। মেজ দিদি "দূর পাল্লারা সব" বলিয়া কবটা ঝড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু বড়দিদি আসিয়া বসিলেন "তাই কহতে হবে গো। ওলব ছেলে ছোক্তারা রাজী হবেনা, একেলের ট্যাটা সব। আর তোরা বাটিলেই বরকনের বেরা ভাব হবে। আমি ঠাকুরপোকে ডাকাছি, হাতটা ছুঁইয়ে দিয়ে থাক্‌, শেষে কই বেঁটে সে" !

তুহু হনুস্বামি ও সন্দেশ হুড়াছড়ির মধ্যে "হাই আম্‌লা" বাটা শেন হইল। বাহারা আম্‌লা বাটিলেন তাহারো এবং পার্শ্বতরেরা সকলেই কলহাতে পরম্পরকে সন্দেশ খাওয়াইয়া,—ছুড়িয়া মারিয়া উক্ত কণ্ঠ শেন করিলেন।

আর লমত রাজি পান মাজিয়া কুটনা কুটরা "কাটাইরা" শেন রাজ্যে আবাস "বনি মঙ্গলের" খুদ। পরদিন উপবাস করিলে

বলিয়া বর ব্যাভারকে সেই রাজ্যে জীর্ণ চিড়া ডোরেনের জন্ত টানিয়া আনা হইল । তাহার পক্ষে যদিও ইহা নিব্যাভন ভিন্ন অল্প কিছু নয় কিন্তু ইহা আত্মনিক জিগার অগ্রভূত, অতএব করিতেই চাইবে । সম্ভবা ও কুমারীগণ পাতা পাতিকা “দ্বিধা মঙ্গল” নিরম রক্ষার্থ হুই চারিটা চিড়া মুখে দিলেন । পুন্ড্রমা বলিলেন “এই দেশ রাতে কি খেতে পারে ?” মেজ দিদি বলিলেন “তা বলে ফাঁকী দিলে চলবেনা বাছা ! বেলা হোন্সু তখন খেতে পারি না পারি বুঝিয়ে দেব ।” একটি দেবর যোড় হস্তে বলিলেন “ঐ “চানা” মোক্কাই চিড়ে এবং হাঁড়ী হাঁড়ী দই থাকল, মশাররা বত পায়ের ধাবেন, কিন্তু এখন অল্পগ্রহ পূর্জক একটু শীগগির করে উঠে আপনাদের হাঁড়ী মঙ্গল সয়া মঙ্গল আর বা আছে সেরে ফেলুন ; বর ঘাতীবা সকলেই খেয়ে বেরবে, নাকীমুখের অনেক গন্তগোল আছে, হেঁগেলে চটপট চুক্বেন, অরপূর্ণাদের দোহাই ।”

অতি এক্ষণে লক্ষ হুণু ও বাস্তলকে সমস্ত গ্রামকে আগারিত করিয়া সমগ্রা “জল সাধিতে” বাহির হইলেন । সর্কায়ের আভাঙ্গা পুকুরের জল লইবার জন্ত বংশপুত্র বেষ্টিত সর্কায় গ্রামাঞ্চলকে ভ্রমণপথে সুশ্রুতি করিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশে চলিলেন । উবার শিশল আভা দে বনের মধ্যে শুখনো প্রবেশ করিতে পার নাই ; শেষ তাত্রির হৃদয় চক্র-কিরণ বীণ স্বাদের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া বখাসাধা অন্ধকার বিদূরিত করিতেছিল । একজন বলিলেন “লক্ষ একটা আলো আনলে ভাল হত ।” “দূর, কোপ কাণ বলে এখনো এমন দেখাচ্ছে, নইলে ভোর হয়ে গিয়েছে ।

এ বাটটা বড় ভাঙ্গা, গাছের শেকড় শুকো পায়ে বাধবে, ওপারের বাটটা বহু ভাল আছে ঐটাতেই যাওয়া যাক্ ।”

দীর্ঘকাল বৃকে গন্ত চক্র চালিতেছিল । আকাশ পাতুবর্ণে রঞ্জিত, ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত লম্বু মেঘগুলির কোথা হইতে ঈবং গোলাপি আভাষ আদিয়া পড়িয়াছে । চন্দ্রবিধিত পুকুরের স্থির কালোজল উপাণোকে পিচ্ছিত শোভা দাখিয়াছে । ‘পাড়ের’ চারিদিকে আস্র কাটাণের ঘন বন ; নবপত্র ও আস-মঞ্জরীতে আমগাছতলা জুঁকিত, ভোরের পাতাল আমবুকুলের গন্ধে মাথামাথি হইতেছিল । কোকিল পাণিরা দেয়ল মছতলা নানা ধ্বনয় রাগিণী অলাপ দরিতাছে । বালিকা রানী চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া বলিল “পাড়ের বাগানেও আঁধা বোধ হয় বিবে বাড়ী” ।

“সাত ঘন এয়ে হাতগরখনি করিয়া হলুপনির সহিত মঙ্গল কলসে জল তরিল ; “চল,— সাত বাড়ী জল সাধুগেই হবে । তদিকে বেলা হচ্ছে ।” তাহাদের হলুপনিতে কুঁচ হইয়াই বোধ হয় পাণিরা গ্রামের উপর এসে তান চড়াইতে লাগিল ! কোকিলও তাহার ভোরের স্নৈত “কুউ”র পক্ষ হইতে সপ্তমে জুলিল ।

জল সাধিরা বাড়ী ফিরিয়া আস্তে আস্তে বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়া তাহারা রক্তনের দিকে ছুটিয়া । পুরোহিত মহাশয় কলামাছের “পেটো” লইয়া এবং পরামাণিক গুহার হাঁকা কলিকা লইয়া সমান বাস্ত । কর্তার ত্যাগের অগত্যা পুরোহিত মহাশয় নাকীমুখের অস্ত্র সমস্ত অব্য ঠিক করিয়া উঠরে নাকীমুখে

বসিয়া পড়িলেন । বরকেও মান করাইয়া “জু
গদ্ধাধিবাদে”র ক্ষুদ্র নিকটে বসান হইল ।

বারিহের ৯১০ খানি গোপকট রত্ন স্ত-
রকিতে “হাদোরে” বিবিয়া, বাপের গারে ও
গরু মহিষের খুঁজে নানা বর্ণের দাগ
কাটিয়া বর গাভী লইয়া ঘাইবার অস্ত্র প্রস্তুত
হইয়া রহিয়াছে । শাক্তীর বেধায়ালা নিরীহ
গাভোয়ানদের সাঙ্ক্কারে বলিতেছে “আরে
তোমরা গিহে সেই গাভীর কোণে পৌছিবার
পর ও যদি আমতা রওনা হই তো আগে গিহে
পৌছুন ।” তোমরা তাগাদা করে বেরিয়ে
পড়ুন !” তাহারের গর্জ্ঞে ক্রমে অসহিষ্ণু
হইয়া উঠিয়া কটনক মুখা গাভোয়ান বলিল
“যাবিত তার কাঁধে ব’রে । কাঁধে বা মাথাও
তাই !—মাথায় ব’রে সোমারি নিয়ে যাবি
তার আবার এত রহস্য !” আবার তোম
নগর পুস্তকের মত গুহতে খুঁজে আসেন করে
থাক । তোদের মত ত কাঁধে বইব না । কটনক
বেগায়া উত্তর দিল “কাঁধে কে না বর ! এই
গরু মোল, ওনার ও তো নাহুদ ! ওনার
কি কাঁধে বইবেন না ?” এ অকটা প্রমাণে
গাভোয়ান বেচারার আর প্রতিবাদের পূর্ণ
পাইল না ! রমুণা “আমকেই” রত্নর প্রকৃতি
স্বকেরা মাথার টেরা দাঁপি কাটিয়া, গারে
ইলিকরা ডবল ব্রেস্টের কামিজ এবং তরপারি
অর্ধ মলিন “কোর্তা” বা “উজুনি” পরিয়া,—
কোমর বাধিয়া লক্ষণের উপর সজ্জারি এবং
বরযাত্রার সকল বিবরের তরারক করিয়া
বেড়াইতেছে । “কেদার !—এই তোমাকের
সরঞ্জাম তোমার জিহা, স্বাস্থ্যের বেন তখন
এটা কই—ওটা কই বলে গোল বাধিওনা ।
তামুক চাটিলেই বেন লবাই পান !” যং মণাল

জুবড়ী হাউয়ের কুড়িক’জা হুসুং তাই
তোষার বেধা, গাভীতে বেন ভাঙেনা বা লটে
হয় না ! সব গাভীতে বিছনা পাতা ক’রেচে
ত ? দানঠাকুর !—গাভোয়ান আর বেচার-
দের সব খাইয়ে বেন, এরা তবে সব বাধা
ছ’দা করতে পারে । রার বৈশেষ দল যে
এখনো এলে পৌছুলনা । থাকুণে তানারা
প’ড়ে । বরজন্দার তাই সব খেয়ে লাও,
এখনি “ছি আচাও” আরম্ভ হবে, তোমরা
তখন বাধাথে না গমন তুলবে ! আশিঃ
দানঠাকুর এখনো আপনারা খেতে বসলেন
না ? দোপব গড়িয়ে বার ! তিন জোপ
যেতে হবে, পারপারানি, ঝড় ক্যাওটার
সমর ! এলব শুভ কর্ণে একটু আগাধ শুভ
যাত্রা করাই ভাল !”

বরযাত্রী বালবুধসুবারা আহোয়ানি সমাপনান্তে
যথাযথা বেগভূষা করিয়া গোধানারোগেণ
করিলেন । কেবল বর ও বরকর্তার
শাক্তী এবং রমুণা প্রকৃতি “সেফা-
সেবকে”রা কেহ কেহ বর লইয়া রওনা
হইবার ক্ষুদ্র অপেক্ষার রহিল । “ওগো আর
দেহী ক’রনা, কি কি কসুবে ক’রে লাও না !
পরমাণিকের চাঁৎকারে সজ্জ হইয়া এখোয়া
সব একত্র হইল । সেজদিদি বলিলেন “খুঁচিনা
আমরা হাতে হতো বেঁধেছি, তুমি বাছা
দশবার জপ করে একটু জল মুখে দিয়ে এস,
মইলে বর রওমা করা হবে না ।” বরকে
একখানা কাঁপের উপর ঝাঁক করাইয়া চাষি
দিকে সাতজন এখো গাড়াইল এবং নগীর
হুতা খুলিয়া বরের চতুর্দিকে সাত খেই সেটন
করিয়া দিল । সখবারা সেই হুতা হতে পরিয়া
সাতবার বরের পারে ও লগাটে ছোঁয়াইয়া

নেমে বনের পায়ের নীচে দিয়া তাহা বাহির করিয়া লইয়া বনের দক্ষিণ হস্তে যথাসাধ্য জটিল গ্রহী বাদিয়া দিল। বিবাহের পর এই স্থর কস্তার ঘায়া খেলাইতে হইল। “পুড়িয়া, এইবার এসে কলো মাপার করে পান দিয়ে বনের চোখ ঢেকে দাঁড়াও বাছা, আগুনিটা হ'লেই হয়! খোঁচা দিদি, এগিয়ে আর। তিনটে করে পড়ের হুড়ো এনেছিল ত? ঐ খড় কটা দিয়ে আঙন মাগ, এক একটা করে তিনবার তিনটে হুড়ো দিয়ে পা বরষ কর। ঠাকুরশের পরণের এ কাপড়খানা খোঁচা পাবে।” বরষ সমাপনান্তে খোঁচা বো খড়ের ছাই লইয়া গিছায়ে তিনবার স্পর্শ করিল। কেহ গিছায়া করিল “স্তেত’ না মেটে?!” খোঁচা বো তিন বারই বলিল “মেটে!”।

আগুনি সমাপ্ত হইলে বর অস্থিম্পর্শ করিয়া এবং সে বর ছাড়িয়া অস্ত্র বস্ত্র পরিয়া “কামানে” বলিল। নরহৃদয় কাণ্ড সমাপনান্তে নিজ প্রাণ্য বস্ত্র লইতে জ্বলিল না। কপালে সাতবার হালুদ ছোঁয়াইয়া, ছাউনি হাঁড়ের জল মত্তকে ছিটাইয়া দিয়া তখন সকলে বর সম্মার মন দিল। চন্দনে চর্জিত, সুগন্ধ গড়ে মালায় জুড়িত, ললাটে দখির কোঁটা, মত্তকে চোপার। হস্তে দর্পণ ও বাগানসীর জোড়ে সজ্জিত বরকে তখন ছান্দাতলায় আনা হইল। সকলে আশীর্বাদ করিলেন। জননী নিজ পদখুল লইয়া বাসহস্তে পুত্রের মত্তকে দিলেন, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ঐবৎ দলেন করিয়া, বকে পুংকুড়ি দিয়া মুহুরের বলিলেন “কোঁচায়ে বাজ বাবা?” পুত্র মত্ত মত্তকে বলিল “কোঁচায়ে দাদী

মান্তে”। হালু, বাজ ও শখখলনির মধ্যে বর শিখিকারোহণ করিল। নরহৃদয় ছুটিয়া আনিয়া বলিল “বাঃ বরের ত্রাতের জল খাবার পান নেওয়া হয়নি। আগে যে সেই জল খাবার বর খায়ে, তার পরে তাদের বাড়ীর খাওয়া। শ্রীগুণির দেন, না আমি নেন না করব তাত আর হবে না”!

অন্তঃপুর মণা দোহাখোলে বর ও বরকর্তার পাখী চলিয়া গেল।* পুঁচা অস্ত্র মত্তপের মত বিরে বাড়ী নিমিষে “ভোঁ ভোঁ হইয়া পড়িল। পুঁচি মা সজল চকে দাওয়ায় আনিয়া বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বিমর্ষভাবে বলিল।

সন্ধ্যাকালে একবার ছান্দাতলায় করিতে এগোয়া একত্র হইয়া, কুলা ডালা ত্রী ইত্যাদি লইয়া সকলে সাতবার ছান্দাতলায় প্রদক্ষিণ করিলেন, কিন্তু “বিরে বেহিহে” বাজার পর “বিরে বাড়ী”র কোন কার্যোৎপূর্ণের মত উৎসাহের সুর মিলিল না।

পরদিনও ঐরূপ “সিম্পানে” কাটাষ্টয়া বৈকালে সকলে বর কনে আসার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। ছান্দাতলায় কোড় পুঁচি পাতিয়া “কুলা-ডালা শ্রী” সব বাহির করিয়া রাখা হইল। সর্প কাণ্ড সমাপনান্তে বদুগণ সেই নিজ সজ্জার হাত দিয়াছেন অমনি প্রায়েই বাহিবে বাস্তব শব্দ খোঁচা খেল। “বিরে এসে প'ণ বিরে এসে প'ণ” মহা কোণাহল পড়িয়া গেল। প্রায়েই বালক-বালিকা বৃদ্ধা গুবতীরা বিরে বাড়ী অভিমুখে ছুটিয়া আনিতে লাগিল। মুখে উলু, হস্তে শখ, কেহবা অকলে খই কড়ি লইয়া সদর দরজাভিত্তিতে ছুটিল। বাজ শব্দের উপরও তিন ওণ “হেইও হেইও” শব্দ

করিতে করিতে বাহকগণ শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। পশ্চাতে “বাব বেপে” নামাটি ঘুড়াইয়া পূৰ্ণা দমে মাত আনন্দ করিয়াছে। পাকীর পাখে পাখে “দেজলেবকে” নামা লোকোচা মাতা, স্নেহে চুমান ডবল ত্রেরের সাট ও উড়ানিপর, সুখে পান, চেচা-বীতি, আলুখালু চুল, ললাটে ঘণ্টা, জনসংঘের মধ্য দিয়া পাকীকে অগ্রসর করিয়া আনিতেছে। শিবিকা ধামিতেই পাকীর উপর খেই কড়ি অঙ্কলি অঙ্কলি বর্ণিত হইল এবং বিবাহের মঙ্গল কামনায় “শিবিকার তলাব এক ঘড়া জল ঢালিয়া দেওয়া” হইল। ঘড়াটা বাহকের দ্বারা ধবল করিল। ছইজন সখ্যা পাকীর ছই ঘরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছই থালা চাউল তরুণির এক একটা মুত্ৰা লইয়া পাকীর তলা এবং ভিতর দিয়া পরস্পরের হস্তে দিতে লাগিলেন। তিনবার এইরূপ করার পর থালা ও মুত্ৰা বাহকের দ্বারা ধবল গেল। পূৰ্ণ ও বধূর মুখে খুঁড়িয়া শিবিকার ভিতরেই মিষ্ট দিলেন এবং সুখ ধরিয়া চুমন করিলেন। বর ও সখ্যকে • ক্রোড়ে করিয়া ছান্নাতলাব আনিয়া বধূকে হুধে-আলুতার পায়ে, বরকে পীড়িতে দাঁড় করান হইল। বধূর কক্ষে মঙ্গলস্মারি, হস্তে মংগা এবং মস্তকের উপর বরের বাহুদত্ত স্থাপনা করিয়া তাহার উপরে ধানের আড়ি দিল্লুর কোটাসহ দেওয়া হইল। কারি ও ধানের আড়ি সখ্যা বালিকায়া ধরিয়া রহিল, কেননা বরকর্তা বেচারার তখন নিজেস্বায়ে অসম্মত। খুঁড়িয়া ধান দুর্গা পান গ্রীণ ইত্যাদি লইয়া পূৰ্ণ ও বধূকে বরণ করিতে লাগিলেন।

যেহুনিয়া মাছের ডালা আনিয়া বধূর সখ্যে ধরিতে লাগিল কেননা যেমন তেমন মাছ দেখাওয়াও তাহার টাক ও বস্ত্র লাভ করিবে। বরণান্তে সকলের আশীর্বাদ লইয়া ভলপারার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নববস্ত্রের উপর দিয়া বর বধূ গৃহ প্রবেশ করিতে লাগিল। দেই সময়ে বধূর মস্তকস্থ খাত্ত বর দর্পণ দ্বারা কাটিয়া চারিধারে বধূর পশ্চাতে ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। যবে গিয়া বধূ বসটিয়া শাকুড়ী সর্প ভূষণের অগ্রে এক গাছি লোচা লইয়া বধূর বাম হস্তে পরাইয়া দিলেন। কড়ি খেলাইবার জন্য রত্ন সন্সকীর্ণগণ চারিধারে ঘেরিয়া বসিল।

বধূকে “তয়া হৈসেল” দেখাইয়া তবে সমাগত বরবাতীদের ভোজন করান হইল। পরদিন বৌভাত, আনের সকলেই নিজের কাজ ভাবিয়া দায় যথাসাধ্য করিতে লাগিল। দুপুর রাত্রি পর্যন্ত ভোজ চলিল। আহুত অনাহুত সকলেরই সমান আদর। উঠানে কলাপাতা পাতিয়া শাক গুড় ঘণ্ট চুচড়ি ও গুড় অন্ন, লুটি সন্দেশ গোলাও কালিয়ার অপেক্ষা সকলে সাধবে ভোজন করিতেছে। কার্যগতিকে সে বাইতে আগিতে পারে নাই তাহার জন্য পর্যন্ত অন্ন পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। পাকীর হেলেরা খিএহর রাত্রি পর্যন্ত মাথাব করিয়া ভাত বহিতেছে, “কোল” কাটিয়া হাড়ী হাড়ী ভাত নাহাইতেছে। তাহাতে তাহাদের লজ্জা অপমান বা আলস্য প্রাপ্তি নাই। •

শ্রীমতী নিরুপম দেবী।

• এ প্রথমে দেখিতেই বর বেগমের কেলে গড়িয়া আনাগোনা করিতেছেন। বরটি সুখ মিষ্টান্তই ভূপকার বালক। সুখাব বা সুন্দর বালক হইলে এতদূর হলে কি হইত? তাঃ নঃ

মহাশুচি ।

গুণ্য কানীষায়ে "মহাশুচি" নামে
 নারী ছিল একজন,
 তীর্থে বাঁধি থর নাছি মাঁধি উর
 পায়ে দিষ্টাছিল মন ।
 কত বন্যী বানী আপনাদের হাসি
 শূন্য ল'গেছিল তার,
 গরি মায়া ফাঁদী বারানলীধানী
 গুটে আগি তার পাশ ।
 নাপি বহুজনে "মহা" ভাবে মনে
 তার সম্বন্ধে নারী—
 এই কথা থাকে কেহ নাছি আছে
 অসুন্দর রূপ তারি ।
 আপন পরবে এইরূপে হবে
 "মহাশুচি" হুঁলি রত,
 গাপরাপি তার হোলো ভগ্নভার
 বন্ধা আর নাহি লভ ।
 কত লত সতী হাতাইয়া পতি
 কেলি নয়নের লোভ,
 তার মত পাশে শুভ্র অভিলাষে
 করি ভুলেছিল যোব ।
 একদিন রাতে শুয়ে বিভ্রাধাতে
 "মহা" শূন্যহাড়ে শুয়ে :
 দানী তার কপী আঁধি হুঁপি হুঁপি
 বিব বিল তার মুখে ।
 বহুদিন হতে রূপী মানবচেত
 গুঁজিতেছে অবসর—
 "মহাশু" খাতিয়া কেমন করিয়া
 নিজে লবে তার মন ।
 তার মত শুবে হাসি ভজা মুখে
 সমায়ে করবে বপ,
 তাহি মত বন তারি মত লন
 তারি মত প্যাতি বন ।
 মনে মত লোভ সেই মত ভোণ
 আপনি করিবে রূপী,

মাজি বিন অলি পেবে পেল চলি
 দেখা সাপুড়িয়া গুপি ।
 পান্য কথা ছাঁবে ফেলি তারে কানে
 জানি দিল তার পাশ;
 হেন বিব আছে, মাহে সাপ বাঁচে
 শুধু বর্গ করে' নাপ ।
 জনিমা উল্লাসে রূপী মহা হাসে
 ভাবে, হোলো বড় ভালো :—
 রূপ তার ছরি দিব দানী করি
 শূন্যবাদি হবে কাণো ।
 কালী হলে বেহ "মা" তিসিবে কেহ
 না কাঁবিয়ে মনে কিছু ;
 "মহা" বরি কোন্‌দো কথা তোলে হেন
 মুখে লব শুবে শিহু ।
 এত তাবি মনে রূপী গুপি মনে
 করিছে কেলিল চুতি,
 হুঁটি ঢাকা দিল, কিছু বিব দিল
 খেচাইয়া বালা হুঁটি ।
 গৃহে গিরে এসে রূপী ভাবে পেয়ে
 কখন হইবে মাজ,—
 বিবচুই খালি মুখে তার তালি
 জুড়াইব দিল পাশ ।
 রূপী পতীরে রূপী বীরে গীরে
 মহাশুচি দেখা ভয়ে—
 পাশে তারি পিয়া বিব তালি দিয়া
 দাঁড়াইয়া রহে হুঁটে ।
 মত দুই গরে মলিনবর্গ করে
 সেই কমনীয় কার—
 বিখ্যাতার স্তম্ভি হেন রূপগুণি
 খপ তুলিকার আঁঠ ।
 "মহা" নাহি মানে আঁধি সাবদানে
 বাঁচাইয়া মাঁধি সাপ,—
 হরিদেনে বিবি তার রূপ নিবি
 দিতে জানে মহাশুচি ।

এমনী একান্তে যবে আচম্যাজে
 হেরে "মহা" নিজ মুখ,
 কবে কাঁপি ওঠে কলে শব্দ ছোটো
 শিহরিয়া ভালো মুক ।
 তবে বিপদে হতজান হয়ে
 কথা কিছু নাহি বলি,
 না জানিতে কেহ ছাড়ি নিজ পের
 "মহা" পেল মুখে চলি ।
 রাত্রি দিন চলে কথা নাহি বলে
 নাহি বলে কৌন তাঁই ।
 কিছু নাহি যায় কিসে নাহি চার
 দেখে সেন আগ নাই ।
 পেল দুই দিন, অনাকাঙ্খে কীণ
 আপনদীন মত হতে,
 জাহ্নবীর জেড়ে আলি মুক্তি পড়ে
 নীৰব বেহখানি লয়ে ।
 এদী পুণ্য তোড়া সদ্য জোতে বোরা
 যকে লয়ে বেহ তার—
 চলিল উল্লসি তালি বায়ানদী
 মুক হতে পারাবার ।
 বিশ্ব ভিসকাঠী পুণ্য নদী ব্যরি
 "মহাভূতি" করি পান,
 বিবির বিধানে বাতি খাংক জাণে
 নিতে তাঁর মহাবান ।
 দেখে দিল পাশে, ভালোইয়া রাখে,
 যেন গুণ ছিল যিনে—
 ললে দা ভূমিরে যে অবধি হবে
 অম সনে ইয়া যিনে ।
 রাত্রি দিন রাত্রি গরা যকে বা
 অনিলাধ চল ভেগে,
 সাপার লগনে পুণ্য বেহাঙ্গনে
 বেহ তার লাগে এসে ।
 রাত্রি সবে ভোর লঙ্কতার ঘোর
 তবদো রয়েছে নিশি,
 সেই লঙ্কাবে মহা যোগালনে
 যগেহেন "দেব" কনি ।

নদী উপকূলে তাঁর পান হুলে
 "মহাভূতি" দেহ তৈকে ।
 কীণ চেতনার হইয়া লকার
 আঁখি খেলি তব বেধে ।
 কনি পুণ্য যোকে তাঁর মর্ত্যলোকে
 ঝার পবনু নাশি, —
 তাঁর পুণ্যজায়ে মহাভাণ্য জবে
 "মহাভূতি" নেলে আঁখি ।
 "দেব" নাম তাঁর করণ্য আবার
 জুনি "মহাভূতি" বেহ,
 নিধ বস্ত্র দিয়া তারে আঁখিরা
 মারে চলিলেম গেহ ।
 সদ্য হুত পান মহোদধি দান
 দেবকি "দেবের" দেহ,
 ঝাটাইল তারে বেহে পুনরাধ
 দেখা দিল সবজতা ।
 জাণ সে পাইল বরন রহিল
 সেই মত খোর কুক,
 কিন্তু তাহে আর ক্ষতি নাহি তার
 বেহ রাখে সে বিভূক ।
 কনি শুদ্ধ মতি তাঁর পুণ্য জ্যোতি
 পশিল পরাগমর,
 ব্যাকুল লবর হেন পুণ্যোদর
 "মহা" ভাবে কিসে হর ।
 নিজ চিত্ত তার যব লঙ্কতার
 এবে সে দেখিতে পার,
 মুচি পিতা শোক হেন পুণ্যালোক
 * কেননে উবিবে তার ।
 মা জানেন লঙ্কান এই দীপ্তিমান
 জ্যোতি একানিবে কিসে,
 লক্ষ মহাপাণে চিত্ত দার ভাণ
 যে আলোকে যাবে যিনে ।
 "মহা" লঙ্কেশ্বর কৃষ্ণি দুই কর
 কনি পবনলে পড়ি
 * বলে অরু নাশি, মহাপাণী আঁখি
 কেননে এ পাণে তার ।

৩৪শ বই, দ্বিতীয় সংখ্যা ।

কবি ত্রপা তুল্য নাহি সার স্রুতা
আত্মতুল্য করি তার
করিলেন দাস সেই ব্রহ্মজ্ঞান
জীব যাহে মুক্তি পায় ।
বলিলেন তব রাত্রি শেষে পুনঃ
তু তপ যে মলোচ্ছন্ন
সেই আলো নাহি যে তেমনা নাহি
বিষমাত্রে ভাব্য সার ।
চিত্ত মুক্ত করি এ আলোকোপরি
সঁপি দিলে গ্রাম মন,
পায়ে ধেন ঘোষ যাহে লক্ষ্য ভোপ
“একে” ধেন মহাপন ।
মেশিলে জতির লবি “এক” পূর্ণ
সকলি চৈতন্যময়,

বর্ষশেষ ।*

আজকের বর্ষশেষের দিব্যবসানের এই যে উপাসনা, এই উপাসনার তোমরা কি সম্পূর্ণ-মনে যোগ দিতে পারবে ? তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছি—বাগক—তোমরা জীবনের আরম্ভভূমিতে রয়েছ; শেষ বলতে যে কি বোঝায় তা তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না; বৎসরের পর বৎসর এগে তোমাদের পূর্ণ করচে—আর আমাদের জীবনে প্রত্যেক বৎসর নূতন করে নকশা করবার কাজই করতে। তোমরা এই যে জীবনের ক্ষেত্রে বাস করচ এর সমস্ত তোমাদের এখনো খাজনা দেবার সময় আসে নি—তোমরা কেবল নিষ্ঠা এবং ধাক্কা—আর আমরা যে এতকাল জীবনটাকে ভোগ করে আসছি তারই পুরো খাজনাটা চুকিয়ে দাবার- বরণ আমাদের

হয়েছে। বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু করে খাজনা আমরা লোধ করছি;—যের যা সঞ্চয় করে বসেছিলাম, মনে করেছিলাম কোনো কালে এ আর থমচ করতে হবে না—সেই সঞ্চয়ের টান পড়েছে; আজ কিছু থাকে, কাগ কিছু থাকে—অবশেষে একদিন এই পার্থিব জীবনের পুরা ভরবিলা নিকাশ করে দিয়ে শাভাগের বন্ধ করে বিদায় নিতে হবে।

তোমরা পৃষ্ঠাচলের যাত্রী, সূর্যোদয়ের দিকেই তোমাদের যুগ—সেউদিকে যিনি তোমাদের আত্মাদের পথে আচ্ছাদন করছেন তাঁকে তোমরা পূর্ণ যুগ করেই প্রণাম কর। আমরা পশ্চিম অস্তাচলের দিকে ঝোড়ো হাওয়া করে উপাসনা করি—সেই দিক থেকে আমাদের আচ্ছাদন আসচে—সেই আচ্ছাদনও

* পাতিমিত্তম আশ্রমে বর্ষশেষ উপাসনার কবিত বক্তৃতার সারসংক্ষেপ ।

সুন্দর সুগন্ধীর এবং শান্তিময় আনন্দরূপে পরিপূর্ণ।

অথচ এট পূর্ণশক্তির মতো শাখান কোনাখানাই নেই। আজ দেখানে বর্ণশেষ কানই দেখানে বহরত—একই পাতার এ পৃষ্ঠার সমাপ্তি, ও পৃষ্ঠার সমারম্ভ—কেউ কউকে পরিভাগ করে থাকতে পারে না। পূর্ব এবং পশ্চিম একটি অখণ্ড মণ্ডলের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাইর মধ্যে তেদ নেই বিবান নেই—একদিকে যিনি শিশু, আর একদিকে তিনিই বৃদ্ধ। একদিকে তাঁর বিচিত্র রূপের দিকে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর একদিকে তাঁর একরূপের দিকে আমাদের আশীর্বাদ করে আকর্ষণ করে নিচ্ছেন।

আজ পূর্ণিমার রাত্রিতে বঙ্গের শেখনি সমাপ্ত হয়েছে। কোনো পের যে শূন্যতার মধ্যে শেষ হয় না—ছন্দের হ্রির মধ্যেও ছন্দের সৌন্দর্য যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়—বিহীন যে কেবল কবীর অভাবমাহ নর, কর্তা বিরামের মধ্যেই আপনার মদুর এবং গভীর সার্থকতাকে দেখতে পায় এই কথাটি আজ এই চৈত্র-পূর্ণিমার জোৎস্নাকালে সেন স্মৃতিমান হয়ে প্রকাশ পাকে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি রূপেতে যা-কিছু চলে যায় কর হয়ে তার তার ঘারাও সেই অক্ষর পূর্ণতাই প্রকাশ পাকেন।

নিজের জীবনের দিকে তাকাতে গেলে এই কথাটাই মনে হয়। কিছু পূর্ণেই আমি পলেছি তোমাদের বরণে তোমরা যেমন প্রতি-দিন কেবল নূতন-নূতনকে পাল, আমাদের বরণে আমরা তেমনই কেবল বিতেই আছি, আমাদের কেবল থাকেই! এ কথাটা যদি

সম্পূর্ণতা হত তাহলে কল্পে আর উপাসনা করতে এগেছি, কোন্ তরফর শূন্যতাকে আর প্রণাম করতে বগেছি? তাহলে বিষয়ে আমাদের সুখ দিয়ে কথা বেরত না, আতকে আমরা মরে যেতুম।

কিন্তু স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি জীবনের সমস্ত পাওয়া কেবলি একটি পাওয়ারে এলে চেকরে—সমস্তই দেখানে মূরিরে থাকে দেখানে দেখাতি একটি অকৃত্রিম আবির্ভাব।

এইটিই বড় একটি আশ্চর্য পাওয়া। অহরহ নূতন নূতন পাওয়ার মধ্যে যে পাওয়া, তাই পরিপূর্ণ পাওয়ার রূপটি দেখা যায় না। তাতে প্রত্যেক পাওয়ার মধ্যেই পাইনি পাইনি কানটা থেকে যায়—অন্তরের সে কানটা সকল সময়ে শুনে পাইনে, কেননা আশা তখন আমাদের টেনে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, কোনো একটা জায়গার ক্ষণকাল থেমে এই না-পাওয়ার কানটাকে কান পেতে শুনে দেয় না।

কিন্তু একটু একটু করে দ্রুত হতে হতে অন্তরায় যে পাওয়ার মধ্যে এলে পৌছে সেটি কি গভীর পাওয়া কি বিস্তৃত পাওয়া! সেই পাওয়ার বর্ণার বাদ পাবার মতাত্তর চলে যায়—তাতে এ তরুটি আর থাকে না যে, যা-কিছু থাকে তাতে আশ্রয় কেবল ক্ষতিই হচ্ছে। সমস্ত ক্ষতির শেষে সে অক্ষরকে দেখতে পাওয়া যায় তাকে পাওয়াই আমাদের পাওয়া।

নবী আপন গতিপথে ছই কূলে দিনরাত্রি নূতন নূতন ক্ষেত্রে পেতে পেতে চলে—সমস্তে বখন সে এলে পৌছয় তখন আর নূতন নূতনকে পায় না—তখন তার দেখার পালা।

তখন আপনাকে সে নিঃশেষ করে কেবল নিতেই থাকে । কিন্তু আপনার সমস্তকে দিতে দিতে সে যে অন্তহীন পাণ্ডাকে পার দেইটিই শু পূরিপূর্ণ পাণ্ডা । তখন সে বেগে আপনাকে অহরহ রিক্ত করে দিবেও কিছুতেই তার লোকপান আর হয় না । বস্তুত কেবলি আপনাকে ক্ষয় করে দেওয়াই অক্ষরকে সত্য-রূপে জানবার প্রধান উপায় । যখন আপনার নানা জিনিষ থাকে তখন আমরা মনে করি সেই থাকতেই সমস্ত কিছু আছে, সে সব শুধুই একেবারে সব শূন্য হয়ে যায় । সেই ক্ষেত্রে আপনার দিকটা একেবারে উজাড় করে দিবে যখন তাঁকে পূর্ণ দেখা যায় তখন সেই দেখাই সত্য দেখা, সেই দেখাই সত্য দেখা ।

এই ক্ষেত্রেই সংসারের ক্ষয় আছে বৃত্তা আছে । যদি না থাকত তবে অক্ষরকে অব্যক্তকে কোন্ অবকাশ দিবে আমরা দেখতে পেতুম, তাহলে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু, বিষয়ের পর বিষয়কেই একান্ত করে দেখতুম, সত্যকে দেখতুম না । কিন্তু বিষয় কেবলি যেষের মত সবে থাকে, কৃত্যপার মত মিলিয়ে থাকে বলেই যিনি সঙ্গে থাকেন না, মিলিয়ে থাকেন না তাঁকে আমরা দেখতে পারি ।

তাই আমি বলছি, আজ বর্ষশেষের এই সন্মিলিতে তোমার বহু বছর জাননা থেকে জগতের সেই বাঙার পথটার দিকেই মূগ বাড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখ । কিছুই থাকে না, সবই চলেছে এইটিই লক্ষ্য কর । মন শান্ত করে জ্বর শুদ্ধ করে এই দিকে দেখতে দেখতেই দেখবে, এই সমস্ত বাঙার সার্থক হচ্ছে এমন একটি থাকা ব্রহ্ম হয়ে

আছে । দেখতে পাবে “মূগ ইব ত্বকো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ ।” সেই এক যিনি, তিনি সমস্তকে বৃক্ষের মত শুক হয়ে আছেন ।

আমি বস্তুই এগাঞ্জে ততট দেবতে পারি, সেখানেও সেই এক যিনি তিনি সমস্ত পাণ্ডা-আশার মধ্যে শুক হয়ে আছেন । নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে করে গেছে, যা দিতে হয়েছে তার হিসাব রাখতে কে পারে, তা অনেক তা অসংখ্য, কিন্তু এই সমস্ত গিরে সমস্ত দিয়ে থাকে পারি তিনি এক । গেছে গেছে একথাটা বস্তুই কেঁদে বলি না কেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন এটী কথাটাই সকল কামা ছাপিয়ে জেগে উঠে । সব গেছে এই শোক দেখানে জাগতে দেখানে ভাল করে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরামধান ।

সেখানে যা কিছু সমস্ত শেষ হয়ে থাকে সেই গভীর নিঃশেষতার মধ্যে আজ বর্ষশেষে যিনি মূগ তুলে তাকাও—দেখ, মূগ ইব ত্বকো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ । চিত্তকে নিস্তক কর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতি নিস্তক হয়ে যাবে, আকাশের চন্দ্রতারা স্থির হয়ে পড়াবে, অগ্নি-পরমাণুর অনিরাম বৃত্তা একেবারে থেমে যাবে, দেখবে বিশ্বকোড়া ক্ষয়বৃত্তা একভাঙ্গার সমাপ্ত হয়ে গেছে—কলসক নেই চাকল্য নেই, সেখানে জন্মমরণ এই নিঃশব্দ সঙ্গাতে বিলীন হয়ে রয়েছে,—মূগ ইব ত্বকো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ ।

আজ আমি আমার জীবনের দেওয়া এবং পাওয়ার মাধ্যমের আপনটিতে বসে তাঁর উপাসনা করতে এসেছি । এই জাগরণটিতে তিনি যে আজ আমাকে বস্তুতে দিয়েছেন

এজন্তে আমি আমার মানব জীবনকে ধক্ত মনে করি। তাঁর যে বাহু গ্রহণ করে এবং তাঁর যে বাহু দান করে এই দুই বাহুর মাঝ-পানটের তাঁর যে বক্ষ যে কোণ সেই বক্ষে সেই কোণে আমি আমার জীবনকে অহুত্ব করি। একদিকে অনেককে হারিয়েও আরেকদিকে এককে পাওয়া যায় এই কথাটি কানবার সুযোগ তিনি পটবেছেন। জীবনে যা চেয়েছি এবং পাইনি, যা পেয়েছি এবং চাইনি, যা দিয়ে আমার নিবেছেন সমস্তকেই আজ জীবনের দিগ্বিদ্যানে পরম মানুষের মধ্যে যখন বেশভূষা পাতি তখন তাপের গুণ-বেদনার জগৎ কোণার চলে গেল! আমার সমস্ত হারানো আজ আনন্দে ভরে উঠে—কেননা, আমি যে বেশভূষা পাতি তিনি পরেছেন, গুণে ছাড়িয়ে কিছুই হয় নি—আমার যা কিছু গেছে তাতে তাঁকে কিছুই কমিয়ে বিত্তে পারে নি, সমস্তই আপনাকে দি দিয়ে তাঁকেই বেপায়ে! সংসার আমার কিছুই নেই নি, মৃত্যু আমার কিছুই নেই নি, মহাপ্রজ্ঞা আমার কিছুই নেই নি—একটি অণু না, একটি পরমাণু না। সমস্তকে নিয়ে তখন তিনি ছিলেন সমস্ত নিয়ে এখনও তিনিই আছেন—এমন আনন্দ আর কিছু নেই এমন অন্তর আর কি হতে পারে।

আজ আমার মন ঠাঁকে বসে, বার বারে খেলা শেষ হয় কিন্তু হে আমার জীবন খেলার সাক্ষী, তোমার ত শেষ হয় না। হৃদয় বর

হৃদয় মেনে, মাটির খেলনা একে একে সমস্ত ভেঙে যায়, কিন্তু যে-ভূমি আমাকে এই খেলা খেলিয়েছে, যে-ভূমি এই খেলা আমার কাছে শির করে তুলেছে সেট ভূমি খেলার অন্তরেও যেমন ছিলে খেলায় শেষের তেমনই আজ। যখন খেলার খুব করে যেতে উল্লস তখন খেলাই আমার কাছে খেলার স্বর্গের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল তখন তোমাকে তেমন করে দেখা হয় নি। আজ যখন একটা খেলা শেষ হবে গেছে তখন তোমাকে পরেছি তোমাকে চিনেছি। তখন আমি তোমাকে বলতে পেরেছি খেলা আমার হারিয়ে যায় নি, সমস্তই তোমার মধ্যে মিশেছে; বেশভূষা পাতি বর অন্ধকার করে দিবে আমার ভূমি গোপনে নূতন আয়োজন করত,—সেই আয়োজন অন্ধকারের মধ্যেও আমি অন্ধরে অহুত্ব করি।

এবারকার এ খেলার নবটাকে তাড়লে ধূরে মুছে পরিষ্কার করে দাও। ভাঙাচোরা আনন্দের আঘাতে পড়ে পড়ে খেলার উপরে পড়তে হয়—এবার সে সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়ে দাও, কিছুই আর বাকি রেখো না। এই সমস্ত ভাঙা খেলনার জোড়া-ভাঙা খেলা এ আর আমি পেরে উঠিনে। সব ভূমি লও লও, সব ভূমি লও। দত্ত বিন্দু দর কর, যত তর দি দিয়ে দাও, যা কিছু ক্ষয় হবার দিকে থাকে সব লয় করে দাও—হে পরিপূর্ণ আনন্দ, পরিপূর্ণ নূতনের জন্তে আমাকে প্রস্তুত কর।

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজকল্পা।

দ্বিতীয় দৃশ্য। উত্তান-সুদ্বি।

নানাপ্রকার কলরামি ও কুলের টুকরী সমুদ্রে রাগিরা মালিনী-কল্পা স্বগন্ধা
অলঙ্কার রচনা করিতেছে।

হ। (একগাছি সঙ্গনের হাতে তুলিয়া ধরিয়া) এগাছি রাজকল্পাকে না পরালে তৃপ্তি নেই; এই স্বরা ফুলগুলির মধ্যে হারটি লুকিয়ে রাখি—মাগী এসে পড়লে মুক্তিলাভ হবে। কট মধুগন্ধা ত এখনো এলনা,—পদ্মফুল তুলতে গেছে—দে ত কখন?

মধুগন্ধার প্রবেশ।

এই যে পদ্ম পেয়েছিল দেখছি।

ম। অনেক খুঁজে একটি পেয়েছি বিবি। আজ কাল কি পদ্মের সময়—রাজকল্পা চেয়েছেন—তাই যেন তাঁকে আশ্রমদানের অজ্ঞেই এটি অসময়ে হুটেছিল!

হ। তারি যে কবি হয়ে উঠলি? এই টুকরীর মধ্যে তবে ফুলটি লুকিয়ে রাখ,—মাগী এসে দেখলে আর রাজকল্পাকে দিতে পারব না, সে ফুল নিয়ে চলে গেলে তখন বিয়ে আসব। ঐ বৃদ্ধি আসছে—একটা যেন ছাঁচা দেখছি, নুপুরগুণন কানে বাজছে,—লুকা! লুকা—

ম। (পদ্মফুল লুকাইতে লুকাইতে) আস্তে আস্তা হোক—

গুমনে। আস্তে আস্তা হোক, ভয় মাতঙ্গিনী—রাণীসদিনীর জয়—জয় জয়—

ছানির প্রবেশ।

হ। বলি এত অরাজকতার কি আশ্রম অত্যাচার নাকি? বড় ত দোভাগ্য!

হ। ওমা! এ যে ছানি!

ম। তাই ভাল, বাচসুন্দ—আমাদের আত্মপুরুষ ডাকিয়ে গিয়েছিল।

হ। আমরা ভাবলুম—বৃদ্ধি কুহকিনীটা এল—এইনে ভাই, সাতনর—

ম। এই নে তাই পদ্মফুল, অনেক কষ্টে এটি যোগাড় করেছি। মহারাণীর অজ্ঞে এতটা কষ্ট করতে ইচ্ছাই হোত না—কিন্তু আমাদের রাজকল্পা চেয়েছেন?

হ। মাগীকে হঠক্বে দেখতে পারিনে, তবে তবে এতক্ষণ সাতনরগাছি করা ফুল গুলোর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

হ। তবু ত তার অরাজকতা চাড়িসনে?

ম। বল না থাকলেই ছল ধরতে হয়, নইলে দীন দীন হুর্জল, আমাদের উপায় কি তাই!—রাজকল্পাকে ফুলগুলি দিয়ে ভাট আমাদের প্রণাম জানায়ে—

হ। মহারাণীর ভক্ত কি অলঙ্কার তৈরি করেছিল—একবার দেখে যাই—রোজ ত আসতে পাই নে—

হ। না ভাই, আর দেখী করিল নে—শীঘ্র যা—তার আগার সময় বনিবে এল—

ম। তোর চাতে এসব দেখলে আর ঢাকা থাকবে না।

হ। তবে ত আমি তবে মরে গেলাম!

হ। তুমি না মর—আমরা ত মরব।

হ। মাগীর যেন বাপকেলে ধন।

সংসারের এমন অকৃতজ্ঞ লোক আর দেখেছিল?

রাজকন্ডার দার খেরে পরে মাছুব আর তিনি
সরতে না সরতে তাঁর সতীনের ঘরে ঢুকলো!

ম। তা ঠিকই হয়েছে,—রাছ রাজা—
ওত মন্ত্রী কেতু ত চাই। বড় রাণীর কাছে
কিন্তু মাগীটার এর রকম হুঁচি ছিল না, যেন
কতই ভাল মাছুবটি!

ম। তা গেছে ভালই করেছে, ও রকম
লোক বা ওরোটা ভাল।

চ। তা গাফনা, মক্ক না; কিন্তু যার
মেয়ে তুই মাছুব, কি করে তার মেয়ের সঙ্গে
এমন করে নান সাধিস? বুধ দেখলে পাগ হয়!

জ। জানিসনে তাই,—যেও সমতা
করণার ঞ্চ—ও রকম করে শোধ দেওয়া
যায়; এক কৃতজ্ঞতা দিবে, আর কৃতজ্ঞতা
দিবে—

ম। রাণী তাকে যে রকম অহুগ্রহ
করতেন—কৃতজ্ঞতার ত দে ধার শোধ হবার
না—তাই মাগী অত গথ ধরেছে।

জ। বা হোক তুই তাই পালা, আর
একদিন ফুলের গহনা সব ভাল করে দেখাও—

ম। চ্যা ভাই—আর দেবী না—এখনি
সরে পড়।

জ। ঐ আগছে ঐ আগছে—পালা।

চ। কোথা দিবে যাই—এই দিকে—
ওমা ঐ যে! কোন দিকে ছুটি—

নাভিনীর জেবেশ।

(এ পথে একবার ও পথে একবার পলাইবার
চেষ্টা করিতে করিতে হাসি ঠিক
নাভিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হটল)।

ম। একে! হাসি দেখছি যে! অহো!
কি নামই মাঝাপ দিবেছিল! কখনো ত
ফুলে এ পগাত হাসি দেখলুম না!

হা। পথ দাও গো; আমার এখন
যেতে হবে—

(হাসির পাশ কাটাইয়া ঘাইবার চেষ্টা,—
নাভিনীর তাহাতে বাধা-মান)

ম। ফুলে ফুলে যে চুপড়ি ভরা দেখছি।
তুখ ফুল না—ফুলের গহনা—সাতনর—তার
উপর আবার পদ্মফুল। বুকেছি বুকেছি—
বড়বড় বুকেছি, এটো জুই আমার মহারাণী
একটা ভাল ফুল পান না।

জ। না দিদি, ও সাতনর আমার
গাধিনি—ও নিজে গেথে আমাদের দেপাতে
এনেছিল।

ম। এ পদ্মফুলও আমার দিই নি দিদি,
ও কোথা থেকে ফুলে এনেছে। আমার
সেই অবাধি ওর কাছে ফুলটি চাচ্ছি—

জ। বলছি—অসময়ের ফুলটি আমারদের
যে—মহারাণীকে দিলে ফুলটি সার্থক হবে—
তা দিচ্ছে না।

ম। যে তাই ফুলটি—মহারাণীর জন্ত বে।

চ। কেন দেব! আমি ত সেমকহারাম
নই। চিরদিন ঐর অরে ঐর দেহে
পালিত—ধনের লোভে আর তাঁকে ত্যাগ
করব, এমন যথেষ্ট মন্যাইনি আমি!

ম। (বগত) উঃ অলহ! (প্রকাশে)
—যত বড় বুধ না তত বড় কথা—বেরো
বলছি—এখান থেকে।

হা। কেন বেরোব—তোমার কিনা
বাণের বাগান—

ম। উঃ দত্ত দেব! ওলো আঁধারচোখি,
গোমসামুখি আমার বাণের বাগান না, তোর
বাণের বাগান নাকি?

চ। আমার রাজকন্ডার বাণের বাগান।

মা। রাকসি, হতভাগি, এ আমার মহা-
রাণীর বাগান! এ জল নিরে জুই যান
কি করে—তাই দেখব।

মাতঙ্গিনী টুকরো কাড়িতে উত্তত হইলে হাসি
সন্নিধা দাঁড়াইল।

হা। ধবরদার এ জলে হাত দিও না।

মা। হুগন্ধা, মধুগন্ধা জল কেড়ে নে
বলছি—

হা। কেড়ে নেবে! কাড়ুক দেখি?

হা। সে তাই দেখে—কেন মিছে গোল
করিস্।

হা। কণপো না,—প্রাণ থাকতে না,
ফাঁসিও দেবে না—

মা। ফাঁসি দেব না শূনে দেব—

হা। দেবে দিও, জল দেব না, তোমার
বা করার কোনো—ভগবান আছে।

এহান।

মা। লক্ষ্মীছাড়ি, হতভাগি, মরনা, রাকসি,
গোমলায়ুগি, দেখব তোকে কে ধকা করে?
তোরা তাই ভাইগো সব নিঃশব্দে করব, ঘর
দোরে যুঁজু চমাব—তবে আমার নাম
মাতঙ্গিনী!

এহান।

হা। সর্বনাশ হোল দেখছি! এ কুহকিনীর
অসাধ্য কিছুটে নেই।

মা। রাজার রাজার যুদ্ধ বাণে উগ্র খড়ের
আণ বাহ! আমাদের অদৃষ্টে কি আছে কে
জানে! কিন্তু মাগীটার বড় বাড় নেড়েছে!

(বলিতে বলিতে এহান।)

তৃতীয় দৃষ্ট।

উত্তান-বাটিকার রাজকথা বীণা বাজাইয়া

গান করিতেছেন।

মধুর আকাশ মধুর ছবি,
মধুরঙ্গসরী ধরনী ছবি
মধুর মিলনে আলোকিত সবি,
দশদিকে জ্যেৎ পলক বরি।
লতা পাতা জল ঢালিছে হুগন্ধ,
বহিছে পবন নীতগ জুমল
নিকর তটিনী গাধিছে আনন্দ,
তব নামে বিহু উঠিছে গর!
এত জ্বল ভরা এই নিকেতন;
ছালোক জ্বলোক হুবে খচেতন—
কেন শিতা তবে এ সজানগণ;
দীন দ্বীপ শুধু তোমার ঘরে—

এমন বরষা—এত সুখানোক,
মেলিতে কেলিতে পলক-পলক
হের তাহাদের নিম্নীলিত চোখ,—
যাতনার অঙ্ক সলিল ভরে!
এ মহা আঁধার প্রভুহে শূণ্য,
এ জ্বল প্রভাতে তাহেরও জাগাও
তব রাশা হতে দূর করে দাগ,
শোক পাপ তাপ বিপদ গেশ।
দিলে যদি জ্ঞান, কেন তবে মোহ,
কেন ঈর্ষা? যেন দিলে যদি বেহ,
এ আনন্দ রাজ্যে কেন অজু মেহ—
এত অমঙ্গল বেদনা কেন!

(একজন রমণীর দীর্ঘে প্রবেশ এবং গান শেষ হইলে লক্ষ্মী ছবি আসিয়া প্রসিদ্ধপূর্বক দণ্ডায়মান)

রাক। কে তুমি শায়ে?

আপনার কাছে হুগন্ধ নিবেদন করহে

রমণী। রাজকাজে, আমি অভাগিনী,

এলেছি।

রাজ। কি হুংব বল ভগিনি, আমার ক্ষমতার যদি তোমার হুংব নিবারণ হয়— তবে আমার দোষাত্ম্য ।

রমণী। সেনাপতির গরু আমাদের বাগানে ঢুকে শাকশগড়ি নষ্ট করছিল— তাই আমাদের চাকরটা—গরুটাকে বেঁচে রাখে। বাবা তখন নোকানে ছিলেন; তিনি এ সব কিছু জানেন না; তবুও আমাদের তিনিষত্রু সব ঋণেগ্রস্ত—আর বাবাও বন্দী হয়েছেন ।

রাজ। বৎস—আমার যদি সাধা থাকত—এই মুহূর্তে তোমার পিতাকে মুক্তি দিতোম—কিন্তু

রম। কিচ্ছু দোষ নেই--রাজকণ্ঠে—কিচ্ছু দোষ নেই, আপনি যদি মুক্তি না দেন, দয়া না করেন—তবে এই দীন হীন হুর্ভাগ্যেরা কাম দ্বারে দাঁড়াবে ?

রাজ। (দ্বপত) উঃ আমার জ্বর বিধীর্ণ হয়ে উঠছে! (প্রকণ্ঠে) আমি তোমাদের চেয়েও অসহ্যর অনাথা, আমার প্রাণ দিলে যদি তোমাদের কষ্টের প্রশমন হোত, যদি রাভো জ্বর সত্য হুঁচিটার কেরাতে পরিভূম—ত এক মুহূর্তের জ্ঞাত অশ্রুত্যা করতুম না ।

রম। আপনি একবার কেবল বহা-রাজকে বলুন—

রাজ। তবু, তোমাদের চেয়েও আমি অভাগিনী । বাঁহুহারা হয়ে পর্য্যন্ত পিতার চরণ দর্শনেও বঞ্চিত হয়েছি,—কিন্তু থাক্ ও কথার আমাকে শ্রবস্ত করো না ।

রম। তবে আমাদের কি দণ্ড হবে ? বাবাই যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়!—আমরা কোথার দাঁড়াব তবে ?

রাজ। বৎসে আমার এক মুষ্টি অন্ন পতন দিনবে—ততদিন সে চিত্তা কোরোনা, আমার এ ঘর বতদিন থাকবে—ততদিন তোমাদেরও আশ্রয় মিলবে । কিন্তু তাতে ত তোমার পিতার কারা-মুক্তি হবে না ।

রম। মাগো, অতুল সাগরে তুমি যে আমাদের তরণী দেখালে ? আমি কি তবে মাকে নিয়ে আসব ?

রাজ। যাও বৎসে, নিয়ে এস ।

প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান ।

রাজ। এই সব অজ্ঞার অত্যাচার দেখলে—প্রাণ যে কি তীব্র বেদনার আশ্রয় হয়ে ওঠে! মনে হয় অস্থিরমর্দিনী হয়ে এ সব বিনাশ করে ফেলি । তখন আমার মর্মে মর্মে আপনায় অক্ষমতা—পূর্ণতা কি নিদাক্ষণ ভাবেই অগ্রতব করি! হা বিধাতা! কেন তোমার রাজো—এত নিপীড়ন, এমন অবিচার! সাহস কি তোমার চেয়েও বড়, প্রজ্ঞা! অজ্ঞার কি জ্ঞানের চেয়েও ক্ষমতাবান । নিষ্ঠুরতা কি করুণার চেয়েও শক্তিশালী ?

(নেপথ্যে)—মাগো দয়া কর—

একজন কাহুরিয়া রমণীর প্রবেশ

রাজ। কি চাও বাছা ?

রমণী। আমার কাঠগলা সব কেড়ে নিয়ে গেল মা! ঝাঝনা নিতে এগেছিল, আমি বধূম—আজ না—আর একদিন আসি। তা জ্ঞানলে না কাঠগলো নিয়ে গেল, ঘরে কিচ্ছু অন্ন নেই, ছেলেগুলো কাঁদছে মা—

রাজ। কেঁদনা বাছা, আমার ঘরে এখনো অন্ন আছে—ছেলেদের এখানে নিয়ে এসো ।

আব আমার বাগানে বতরিন গাছ পাকবে,
ডাল কেটে নিয়ে খেও।

রম। মাগো—সাজসাজ
অল্পপূর্ণা মা আমার, অল্প হোক!—

(প্রস্থান—ও আর একজনের প্রবেশ।)
মাগো, রাজকন্তে!

রাজ। কি বাছা? মহারাণীর সেপাই
সাতা দিবে যাচ্ছিল—বাবা ত্রা দেখেনি,
বাস্তার জল দিচ্ছিল বাবা,—দৈবাৎ জলের
ছিটে সিপাইয়ের পারে লেগে গেল, আর
অমনি বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে মা;—মাগো
আমরা কোথায় দাঁড়াস, বাগদাবার লোক
কেউ আর নেই, রাজকন্তে!

রাজ। আমি ত বাছা তোমার বাবাকে
রক্ষা করতে পারব না; তোমরা আমার কাছে
এস—আশ্রয় দেব।

রম। তবে যাই মা—বোনগুলোকে
নিরে আনি—?

রাজ। যাও বৎসে!

রম। শকুনি মা, তুমিই আমাদের
কাজারী—! প্রস্থান।

আর একজনের প্রবেশ।

দরমার রাজকন্তে—বাঁচাও গো—

রাজ। কি হয়েছে, বাছা?

রম। আমার ছেলেকে বেরে ভাড়িয়ে
দিয়েছে—আমাদের বিনিসপত্রও সব কেড়ে
নিরেছে।

রাজ। কেন গা বাছা?

রম। আমরা মা শূন্য—নীচ মাহার
কাঠ—

রাজ। সেটাত কোন দোলের কথা নয়
—বাছা।

রম। দোলের কথা—বড়ই হয়েছে মা;
ছেলেটার মতি-গতি, একেবারেই মন্ব হয়েছে
—নটলে এমন দশা হয় রাজকন্তে?

রাজ। কৈদনী বাছা—এল কি হয়েছে?

রম। সে একজন সাধুর চাকর হয়েছিল;
মাধু তাকে পাঠ করতে শেখায়; খুলে মা?

রাজ। সে ত ভাল কথা বাছা—

রম। ভাল কথা মা? তুমি এত জানী
হয়ে মা একথা পরে! সাধু যতদিন বেঁচে-
ছিলেন—সব চলছিল ভাল; তিনি মরতে
ছেলেটা খরবানী হয়েছে, এখানে এসেও কিনা
—পুঁথি পড়বে মা!—এত বল ও পাপ কাঁধা
করিসনে, তাও নোনে না; শেষে রাজঘারে
খবর উঠলো; যা ভেবেছিলাম তাই!—মুচন
পণ্ডিত যের এনে—মার-খোর করে সব
জিনিষ-পত্র কেড়ে নিয়ে গেছে—মা,—এখন
কি করি বলনা—ছেলেটা ঐ গাছের আড়ালে
দাঁড়িয়ে আছে, বলত চরণ ধর্মনে নিয়ে আসি।

রাজ। (বগত) কি অভ্যচার—আর
জ্বনতে পারিনে। (প্রকাশে)—বাও বাছা
—ভাকে নিয়ে এস—আমার দেবী মন্দিরে
তোমার ছেলে স্নেহ পাঠ করবে।—

প্রস্থান। নেপথ্যে—মাগো
কর মা।

একজন গুরুদেব প্রবেশ।

গা। এস বাছা, কি হয়েছে?

পু। মাগো—আমরা ছোট জাত ‘গারবা’
—একটা বাঁচ তাকা করেছিল তাই ভাবানী
মন্দিরে ঢুকে পড়েছিলুম—তাইতে পুকত
ঠাকুর লাঠিতে আঘাতের কবে দেখেছে, মা!—

রাজ। (বগত) উঃ কি ভয়ানক, আগের
রক্ত জল হয়ে যায়! দেব দেবীর দরত

হুতাহোর নিকট পড় ! হে ব্রাহ্মণ, হে কস্তুর, হুতাহোর-নগনেই কি আজ তোমাদের মহত্বের পরিচয় ? হায় ! এ পাপের প্রারম্ভিত কোথার ? তোমার আমার বিনাশে শুধু না—তোমরা যে মনগ্র জাতির অধঃপতন আমনন করছ ! (প্রকৃষ্টে) বৎস, তোমার আর ভাবনা নেই—আজ থেকে আমার মন্দিরে তুমিই দেবতা পূজা করবে ।

পু। মাগো দম্যমরি—এমন পাপ কাল আমাকে করতে পেলোনা, এতদ্যে পারিরা হয়ে কেয়েছি, পরময়ে আবার কুতুহ হয়ে জন্মাব ।

রাজ। বৎস, মার্লব বার্থসিদ্ধির জন্ত এ রকম নিবন করেছ, দেবতার কাছে—ব্রাহ্মণ-পুত্রের প্রেমে নেই, বৎস। মনের তচ্ছিন্ন প্রকৃত তচ্ছিন্ন। প্রকৃত তচ্ছিন্ন মনের পূজা দেব দেবী সাধরে গ্রহণ করেন । যে সকল ব্রাহ্মণ এ রকম হীন কার্য করে—তারাই দেবতার চরণ-স্পর্শের অনধিকারী । তুমি পূজক হলে আমার মন্দির শুদ্ধ হবে । এতে তুমি কৃতা বোধ করনা ; বাও বৎস, মন শুদ্ধ করে মূল তুলে নিয়ে এস ।

হু। যা যে আদেশ করেন । আমি মাগের কৃত্য । মৃত মূর্ণ জন—আমরা আর কিছুই জানি না ! প্রস্থান ।

রা। আমার চোখের পরবা সহসা যেন গুলে গেছে—দীবা দৃষ্টি হয়েছ । বিধাতাকে আমরা দিকার দিই, অদৃষ্টকে আমরা নিন্দা করি—কিন্তু লাক্ষ্যবর্জিত লম্বাবহারের আমরা শু কিছুই চেষ্টা করিনে । আমি অভিমানে নিসর্গ হয়ে এত দিন কেবল বিধাতাকে আর পিতাকে নিন্দাই করেছি,—কিন্তু অদৃষ্ট যন্তনের জন্ত, অত্যাচার নিবারণের জন্ত

বধামাধা সংগ্রাম করেছি কি ? কিছু না কিছু না । আমার মধ্যে কতটা শক্তি কতটা সাধ্য নিহিত আছে তা বোঝবার পর্যাঙ্ক চেষ্টা করিনি । পিতার কাছে অপাচিতভাবে এ সকল গুণে জানাতে পর্য্যঙ্ক কৃতা বোধ করেছি । তিনি হয়ত এসব অত্যাচার নীড়ন কিছুই জানেন না ; তাঁকে জানালে এর একটা প্রতিকার অবশ্যই হতে পারে ।

(অন্তর্যমনে উচ্চস্বরে বীণা লইয়া বাজাইতে বাজাইতে কিছুক্ষণ পরে বীণা রাখিয়া)

আমার মনে আজ নবীন বল, নব আশার লক্ষ্য হইছে ! এতদিন বৃথা ধৈর্য, বৃথা গুণ ক'বে আমার অন্তর্নিহিত শক্তিরই অপলপ করেছি । আজ বেশ বুঝতে পারছি,—ক্রন্দন, অবলাদ নিশ্চেষ্টতা মহত্বপূর্ণ নয়—জড়তা অজানতা মহত্ববোধোপেক হীনতা মাত্র । যার মধ্যে যতটুকু শুভ শক্তি আছে, তাহার সাধনাতেই মহত্বের জীবন-জন্ম সার্থক,—কর্মই পুণ্য, কর্মই ধর্ম, কর্মই উপাসনা । তাহার প্রিয়কর্মা সাধনই তাহার উপাসনা ।

হে দেবতা ! প্রাণলোক কুলোকে মঙ্গলময় অবিশপতি আজ হতে আমি সেই ব্রতই গ্রহণ করণেষ্য । আজ হতে পুণ্য কর্মস্বারাই আমি তোমার পূজা করব । হে শুভ শক্তিধাতা বিধাতা পুণ্য তুমি আমাকে বর দাও, বল দাও, আমার জপের অদ্বিষ্ট হইবে এই পুণ্য ব্রত সাধনে আমার সহায় হও—

(হাসির প্রবেশ)

হা। রাজকর্তে, এই পণ্য মূল এনেছি,—আপনি এই মূলে আজ খোদার্ননা করতে চেয়েছিলেন ।

৩৪শ বর্ষ, বিত্তীয় সংখ্যা।

বিংশ শতাব্দী।

তা। কিন্তু তোর মুখ ত আজ পয়ের
মত অসুস্থ দেখছি। হাসি ? কি হয়েছে বল
দেখি ? আমার সহস্র রূপ কই ও ত তুই হাসি
দিয়ে তোলাতে চাও,—আজ কেন তোর
মুখে হাসি দেখচেন ?

হা। সেট মাগীটাকে মনে করে আর
চালি আসছে না। তার সঙ্গে খুঁজ অগড়া
করে এসেছি। এই সাতনের আপনাকে
দিয়ে হুগড়া প্রণাম জানিয়েছে।

রা। তার সঙ্গে অগড়া করেছিল ?

চা। সেট কুচকিনী কাগজেতুটার
সঙ্গে। এট সাতনব ও পদ্মলুটি আমার
হাতে দেখে—এম যেন রণরঙ্গে বেড়ে উঠেগে।
তবে সত্যি কথা বলি—আমিও তাকে দল
কথা শুনিতে দিয়েছি।

তা। ভাল করনি হাসি, এতে হরত
অনেক বিপদ ঘটবে—তোমাকে কত সহ

করতে হবে! আমার ফুলের কি দরকার
সখি! আমিআজ বুঝেছি—ফুলেই ভগবানের
পূজা হয় না—পূজা কারোই তাঁর বথার্থ
পূজা। তার সত্য এতদূর,—অজ্ঞার দমন
চেষ্টা—এই লক্ষ্যই তাঁর মির কাণ্ড—এইট
সাধনা তাঁর উপাসনা। আজ থেকে সেই
ব্রত আমি গ্রহণ করেছি। তুই পারনি
চালি আমাব সহায় হতে ?

হাসি। রাজকন্ডে, আমি বর্ণ নরক
—পাশপাশ, কন্দাকন্দ, দন্দাদন্দ জানিনে।
আমি শুধু তোমাকেই জানি। তুমি যেদিকে
দাবে, সেট আমার পথ, তুমি যা করবে—
তাই আমার কর্ম; তুমি যা খব্দ বলে
বোঝাবে, আমার মনে তাই সত্য, তাই
পূজা, তাই ধর্ম।

অজ্ঞান রমণীগণের জর জরকার করিতে
করিতে গবেদ।

বিংশ শতাব্দী।

হে বিংশ শতাব্দী নিঃশব্দ !

চলিয়াছে বহু বয়স,—

হয় না কি ওরূপ অবশ ?

এখনো চলিবে কতখানি,

কোথার চলিছ নাহি জানি,—

মুখ তুমি, মোরা অন্ধ প্রাণী !

পূর্ণ হয়ে গেল বর্ষ দশ,

নিঃশব্দ নূতন বয়স,—

এবে তোর কিশোর বয়স।

মোরা হবে দুদিন মরন,

হবে তোর সম্পূর্ণ বোধন,—

কিনে তার সুখি লক্ষণ ?

মানব কি বুঝে পাবে পথ ?

ভয়েত কি হবে হুমহুং ?

লক্ষন হবে কি মনোবশ ?

বুধা প্রহ্ন ! তুমি যে বহির,

কালক্রোড়ে ছুটেছ অধীর,

একটি ভয়ল জলধির !

ঐশ্বর্য ইন্দ্রিয়া দেবী

প্রতিষ্ঠানভ ।

মণীশ্রীসেবক প্রখ্যাতনামা গুরু মণীশ্রী যে দিন সন্ধ্যার বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা “বঙ্গবন্ধু” তে তাহার বচনা পাঠাইয়া দিল, সেদিন সে মনে করিয়াছিল, লেখাটা নিশ্চয়ই বাহির হইবে ।

“চন্দ্র মণ্ডলিক” নামে ছোট গল্পটি ; মণীশ্রীর অনেক লিখিত বঙ্গবন্ধু গল্পটি পড়িয়া বলিয়াছিলেন—“বেশ হইয়াছে, কোনো মাসিকে পাঠাও, ছাপিয়ে ।”

মণীশ্রী যশঃপ্রাপ্ত নহ, একথা সে বলিত না—তবে সেট বনের আকাশজাতিকে সে সন্ধ্যোচ্চক মধ্যে এমনি ভাবে গোপন রাখিয়াছিল, যে তাহার নিকটতম বন্ধু সেটুকু কোনো দিন বলিতে পারে নাট !

সহর হইতে উত্তর আসিল, একখানি তিন লাইনের ছোট চিঠি !

“আপনার লেখা ভালো, plot মন্দ নহ, সাধনা করিতে থাকুন সাক্ষ্য লাভ করিতে পারিবেন ; গল্পটি ‘বঙ্গবন্ধু’র যে কোনো মাসে ছাপানো যাইবে ।”

বৎসর প্রায় কাটিয়া গেল ; মণীশ্রী দুপান। রিগ্রাই কার্ড জানিতে চাহিল, কোন মাস নাগাদ লেখা প্রকাশিত হইতে পারে ? প্রত্যেক পরের ‘বঙ্গবন্ধু’র সম্পাদক উত্তর দিলেন, “আপনার লেখা কবে প্রকাশিত হইবে বলা শক্ত, তবে বৎসরের মধ্যেই যাইবে !

বৎসর কাটিয়া গেল ; তৈজ সংখ্যা বঙ্গবন্ধু পাঠিয়াই মণীশ্রী আগ্রহের সহিত খুলিয়া ফেলিল । মণীশ্রীর লেখার নাম গন্ধ ও নাই !

পরদিন “বঙ্গবন্ধু” সম্পাদকের এক পত্র আসিল । প্রতি মাসেই ভাল গল্প বা নামজাদা লেখকের গল্প পাওয়া যাইতেছে—একজন আপনার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই । আপনি ইচ্ছা করিলে গল্প ফেরত লইয়া অল্প কাগজে প্রকাশ করিতে পারেন ।”

এক চিঠি ! দেখতে, ভেবে, মণীশ্রীর লক্ষ্য হইয়া উঠিল ।

অল্পের মধ্যে ছিল, মিজাসা করিল, “কিবে মণি, কীর চিঠি ?”

“ও কিছু নহ”—বলিয়া মণীশ্রী চিঠি পকেটে ফেলিল । চিঠিখানি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবে, এমন সাহসটুকুও আর তাহার ছিল না—ধেন কত অপরাধী সে !

অল্পের ছাড়িবার পার নহে ; পয় কাড়িয়া লইয়া খেলিল !

“একবৎসর লেখা রাখিয়া এই উত্তর ! ‘ভাল গল্প বা নামজাদা লেখকের গল্প !’ ‘নামজাদা লেখকের গল্প’ worthless হইলেও একান্ত, এই অর্থ নয় কি ? অসহ্য । গল্প ফেরত পাঠাতে লিখে যাও ।”

“আঃ অল্পের খাম্, কি বলিষ্টিক নেই ; কাগজের প্রতিষ্ঠার খাতির ত দক্ষিণে চোট ? ঠিকই লিখেছেন—এতে আর রংগুণে”—

“নে নে বোঝা গেছে ; শোনু মণি, আমার মাথার একটা plan এসেছে—

‘কি plan’—

“Plan কি, ঠিক তোর কাছে ভাবছি নে” । ভাখ্, তোর গল্পটা জানিবে আমার দিস্ ! আর তোর সেই ‘দুটিবার’ গল্পটি

আমার দিবি চন্দ্র—সেটা আমার কাকাতার পুত্র
প্রাণশা করছেছিলেন”—

“কাজ নেই, আমি সব পুড়িয়ে ফেলব
মনে করছি”—মণীন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল।

“সে আমি দেখব—তুই চন্দ্র,” বলিয়া
হুশেন মণীন্দ্রকে চেলিয়া লইয়া চলিল।

(২)

‘অকণ’ একটা অবপ্রকাশিত মাসিক ;—
‘অকণের’ সম্পাদক চাক, হুশেনের সহপাঠী
ছিলেন। বৈশাখ মাসের ‘অকণে’ মণীন্দ্রের
‘দৃষ্টিহার’ বাহির হইল। হুশেন সগর্ভে
মণিকে দেখাইল ;—যেন সে একটা যুদ্ধের
করিয়া আসিয়াছে—এমন একটা ভাব।

মণি বেশী কিছু বলিল না। হুশেন বুদ্ধিগ
মণি ‘বজ্রহার’ সম্পাদকের চিঠির কথা জুলে
নাই।

আগাটের ‘অকণে’ ও ‘কল্যাণীতে’
মণীন্দ্রের আর দুইটা গল্প বাহির হইল।
‘কল্যাণীর’ সম্পাদক বিনয়রানু মণির গেল
তারি পছন্দ করিয়াছিলেন।

হুশেন এখন মণীন্দ্রকে তাহার প্রকাশিত
গল্প দুইটা দেখাইল—তখন মণীন্দ্র হাসিয়া
বলিল “তুই আমার খাতা ফিরিয়ে দে!”

হুশেন হাসিয়া বলিল “জা’ দেব ;
আপাততঃ তোর নতুন গল্পের খাতাখানা আর
২৫০ টাকা আমাকে হাওলাত দে ত !
ছদ্মস পরে শোধ করব।”

মণি টাকা দিল—কিন্তু বুদ্ধিতে পারিল না।
হুশেন অতগুলি টাকা দিয়া কি করিবে।
শিত্তহীন হুশেন ও মণি উভয়েই প্রাপ্ত বয়স ;
বিষয়ের ভার তাহাদেরই উপর জ্ঞাত।

তিন মাস পরে চারি পাঁচখানি মাসিক
পত্রিকার পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন বাহির হইল—

“লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখক মণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত
নতুন গল্পের বহি ‘দ্বর্জাবল’ ;—বাহির
হইয়াছে ! ‘দ্বর্জাবল’ পুস্তক দ্বর্জাবলেরই
মত প্রামাণ্য, বিশ্বাস, পবিত্র ! দেহাঙ্গল ভ্রাতা
ভগীকে, আমি প্রেমবরী পরীকে, বড় বড়কে
এই পবিত্র ‘দ্বর্জাবল’ উপহার দিয়া আশীর্বাদ
করুন !”—ইত্যাদি-ইত্যাদি !

বিজ্ঞাপনের চটকেই হটক, বা লেখকের
কৃত্তিৎবেই হটক, ছয় মাসের মধ্যে দ্বর্জাবলের
প্রথম সংস্করণ কাটিয়া গেল।

হুশেন মণীন্দ্রকে বলিল “দেখলি তো
মণি, নাম কিনতে করদিন লাগে ! বাসনা
পাঠকেরা পরের মুখে স্থান খায়। বিজ্ঞাপনের
চটক দেখেই বই কেনে।”

পূজা আসিয়াছে ! পূজার সংখ্যা ‘বজ্রহার’
পূজার পূর্বেই বাহির হইবে। বিজ্ঞাপনে
‘সহর ভরিয়া গিয়াছে। ‘বজ্রহার’ শারদীয়া
সংখ্যার অস্ত্র বিনেব বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

হুশেন পূজার ‘সংবাদ’ কিনিতে কলিকাতা
গিয়াছে। করদিন বন্ধুর চিঠি না পাইয়া
উৎকণ্ঠিত মণীন্দ্র নিজেই পোষ্ট অফিসে
আসিয়াছে।

করকপানি চিঠি ও একটা বুক পোষ্ট !
বুকপোষ্টটা পুলিয়া ফেলিয়া মণীন্দ্র দেখিল
‘বজ্রহার’ শারদীয়া সংখ্যা, একখানি রবিন্
বিজ্ঞাপন দিয়া অড়ানো ! বিজ্ঞাপনখানি
মণীন্দ্র পড়িয়া গেল—অজ্ঞাত কথার মধ্যে
বড় বড় ‘হরকে’ রবিন্ কানীতে দেখা
হইয়াছে—“লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখক মণীন্দ্রনাথের
ছোট গল্প ‘চন্দ্র তিলক’ !

হৃদয় ছোট গল ! হীরকের মত উজ্জ্বল !!
 লেখায় ভগ্নী সত্যোচবিহীন—পুণ্য লব্ধময় !!!
 বিস্তৃত মণীষ্মনাথের চোখের কাছে
 লেখাগুলি সারি বাধিয়া নড়িয়া চড়িয়া
 ফিরিতে লাগিল !

যদি স্মরণের চিহ্নের নাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়া
 পড়িল—তবু এক লাইন, জুতহতে মোটা-
 মোটা অক্ষরের নীল পেনসিলের লেখা—
 "দেখনি বাগান !!"

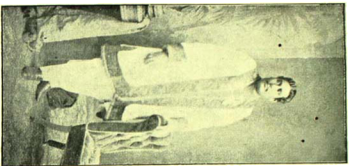
ঐগীতীস্রোতমোহন সেনগুপ্ত ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভারতীয় চিত্রাঙ্কণশক্তি ।

ঐগীতী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে ভারতীয় চিত্রাঙ্কণ শক্তির পুনঃ প্রবর্তন করিয়াছেন তাচা কে না অবগত আছে । হুঃখের বিষয় তাঁহার এই অসাধারণ প্রতিভা বিলাতের মনোবিদের দ্বারা বর্তমান সমাজত না হইয়াছে—কতদিন আমরা তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি নাই । অবনীন্দ্রনাথকে তাঁহার এই প্রাচীন ভারত-শিল্পের পুনঃপ্রবর্তনের জন্য অনেক সন্মান করিতে হইয়াছে । বাহারা শিল্পের কোন দ্বারই খাছেন না এই অবকাশে তাঁহারি ও অদ্বা ব্যাখ্যাস্তি করিতে ক্রটি করেন নাই । কিন্তু যেমন হুঃখের বিষয় মেম্বারবরণে অধিকক্ষণ ঢাকা থাকে না, তেমনি তাঁহার এই প্রতিভা-ব্যাখ্যাস্তি শত সহস্র জীবা সমালোচনার তিমিরপুঞ্জ ভেদ করিয়া অপ্রতিহতভাবে আপনায় মহিমা বহুঃ প্রকাশ করিয়াছে । এখন তাঁহার নিষ্কাব্যে করিলে তাঁহার শিল্পগৌরবের কিছুছাত্র লাভব হইবে না,—বাহারা নিম্না করেন তাঁহাদেরই অজ্ঞতা প্রকাশ পায় মাত্র । তাঁহার মত একজন প্রতিভাশালী শিল্পী যে আমাদের দেশে অসংখ্য করিয়াছেন তাহাতে এখন আমরা আপনাদিগকে ধন্ত মনে করি । পরন্তু

তিনি যে কেবল আমাদের দৃষ্টিভঙ্গেরই গৌরব স্বরূপ তাহা নহে সমগ্র শিল্পজগতে তিনি সুবিখ্যাত । কেবল দ্বারা ভারতনহে—প্রতিভা-বান ব্যক্তি তাঁহার সহৎ কর্তব্যে অহুষ্ঠান দ্বারা আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন । অবনীন্দ্র-নাথের চিত্রের নিপুণতা জাপান, আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতি জগতের কোন বিশেষ সমাজে অবিদিত নাই ।—যে কোন দেশের শিল্প-প্রিয় বিদেশী মহাজন ভারত ভ্রমণে আসেন, কলিকাতায় আসিলে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে এবং তাঁহার চিত্রাবলী না দেখিয়া ফিরেন না । —ইহা কি তাঁহার অপরিসীম প্রতিভার প্রতি সম্যক্ সঙ্গীত নহে ? ধন্য ও স্মরণ দাতার নিয়ম । এক এক মহাপ্রণয়ের পর এক এক প্রতিভাবান ব্যক্তি ধরার অসংখ্য করিয়া । ধন্যদের সুখ হইতে কিরাইয়া আমাদের মধ্যে আবার নবীন জীবনী সঞ্চারিত করেন ।—চিত্র-শিল্প বিষয়েও অবনীন্দ্রনাথের দ্বারা আমরা ঠিক সেই একই সহৎ উদ্বেগ সাধিত হইতে দেখিতেছি ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ত্রাতৃপুত্র ঐগীতী গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুরের অধিক পরিচয় আর কি দিব !



ଶ୍ରୀ ୧୮ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳ୍ପୀ ।



ଶ୍ରୀ ୧୯ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳ୍ପୀ ।

যে বংশের সন্তান সৃষ্টিতর্য আদ্যোপের বাঙ্গালীর এমন কি ভারতবর্ষের ধর্ম, সাহিত্য সম্বন্ধে নাটো প্রভৃতির পথপ্রদর্শক;—ভারতীয় চিত্রাঙ্কণশৈলীর প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথও সেই শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভূত। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পে আবালা অল্পরাস। তাঁহার বালায়চিত্ত বহুচিত্র পূর্ণে ভারতী সাধনা প্রকৃতি পরিচয় প্রকাশিত হইত। সেই সকল পূর্ণতন চিত্র দেখিলে তাঁহার উচ্চভাবের ক্রমোন্নতি বিশেষরূপে অপ্রকৃত হয়। ভূমিরাহি, প্রসিদ্ধ চিত্রকর রামা রবিবর্মা কোন সময়ে তাঁহাদের কোড়ালীকো ভবনে তাঁহার স্বগৌরব পিতা জগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে আসেন। সেই সময়ে বালক অবনীন্দ্রনাথের কতকগুলি পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে রচিত রেখাঙ্কণ চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “বালকের সাহস ত কখন?—এখন হইতেই একজন জড়তর বিশ্বয় আঁকিবার চেষ্টা! “রবিবর্মা তাঁহার মুঠায় কিছুদিন পূর্ণে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আঁকা “মৃত্যুশয্যায় বাদ্শাহ শাহজাহানে”র একখানি একবর্ষে সূত্রিত প্রতিশ্রুতি দেখিয়া বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যোগেশ রায়ের অবদানে কিছুকাল আদ্যোপের সেনের শিল্পচর্চা একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। অধুনা ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ দিন দিন বিলুপ্তি চিত্রশৈলীতাই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে অবনীন্দ্রনাথও একজন ইংরাজ শিল্পীর নিকট পাশ্চাত্য শিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ধরণের শিল্প

শিল্পীরা পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ তাঁহার সহিত একত্রে ইংরাজ শিক্ষকের কাছে শিক্ষিত। পরে ১৩০৫ সালে তিনি তাঁহার পিতামহের পুত্রকাগারে একখানি অতি প্রাচীন কোন যোগেশ বাদ্শাহের আদ্যোপের চিত্রপুস্তক দেখিয়া ভারতীয় শিল্পের প্রতি সর্বপ্রথমে আকৃষ্ট হন। ফলে, তিনি পাশ্চাত্য শৈলীতে চিত্র-লেখা একেবারে পরিত্যাগ করেন; এবং সেই সময় উক্ত প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের শৈলীতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার কতকগুলি স্থান ছোট ছোট চিত্র আঁকিত করেন। এই সকল চিত্র দেখিয়া ডাক্তার ফ্রান্সিস বার্নী মুখ ভাবে সংবাদপত্রে এই চিত্রের অল্প প্রশংসা প্রদত্তে এই কথা লিখিয়াছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে যেন হয় যেন বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছি।

শৌভাগ্যক্রমে সেই সময় অবনীন্দ্রনাথের একজন সহকারী মিলিল। কলিকাতা গভর্নমেন্ট শিল্পবিভাগের তৃত্বপূর্ণ প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীমুখ হু, কি, হাভেল সাহেবও ঠিক সেই সময় ভারতের নানা প্রাচীন শিল্পকীর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হন ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জনের সাহায্যে ভারতে ভারতীয় শিল্পের প্রবর্তন উদ্দেশ্যে শিল্পবিভাগে এক নতুন ভারত-শিল্পের বিভাগ খোলেন। কার্জন সাহেব এবিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তিনি ভারতের শিল্পোন্নতির উপায় সন্ধানে তাঁহার দিল্লী দরবারে পঠিত বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

“বিশেষতঃ ভাবপ্রবণতার কখনই ভারত শিল্পের পুনরুদ্ধার হইতে পারে না।”

সুদীর্ঘ বার, নতুন ভারতশিল্পের বিভাগ

খুলিবার সময় শিল্পশিক্ষার্থী নির্দোষ বাণকেকরা তাবিয়াছিল, ভারতীয় ছাত্রদের বিলাতী চাকশিল্প (fine art) শিক্ষা না দিবার ইহা এক অভিনব প্রতিলক্ষ্য। এই তাবিয়া অবিলম্বে একটামাত্র ছাত্র ভিন্ন শিল্পশিল্পের সমস্ত ছাত্র ধর্মঘট করিয়া এককালে শিল্পবিভাগের ভাণ্ডার করিয়া গেল।

যাহা হউক, হাভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথের ভারতশিল্পচর্চার কথা জানিতে পারিয়া তাত্ত্বিক উক্ত বিভাগের শিল্পপ্রকল্প পক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। একজন বিশেষজ্ঞ পক্ষে

আমাদের প্রতি এতদূর সহায়ত্ব ক্রম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। হাভেল সাহেব একজন যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থান দান করিয়া যিগুণ উৎসাহে ভারতশিল্পের সঙ্গীত উদ্ভূতকল্পে যশাস্বাদু বহু করিতে লাগিলেন। তিনি ভারতীয় চিত্রশিল্পের পক্ষে পাক্ষাত্য চিত্রকণ ক্রটিবিকারক ভাবিয়া কলিকাতা গভর্নমেন্ট চিত্রশালার যে সমস্ত পাক্ষাত্য চিত্র ছিল গভর্নমেন্টের অল্পমতিক্রমে সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিয়া ভারতীয় চিত্রকরের আকা যোগল আনন্দের হৃদয় হৃদয় চারু চিত্রশিল্প সংগ্রহ



অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণ।

করিয়া রাখিতে লাগিলেন। তাহাতে শিল্পশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা ভারতীয় চিত্র শীতিতে সম্যক সজ্জিত হইতে লাগিল। বিচক্ষণ হাভেল অবনীন্দ্রনাথের হাতে চিত্রের ধোমধূন বিচার করিয়া চিত্রশালার সস্ত্র চিত্র ক্রয়

করিবার ভার অর্পণ করিলেন। এইরূপে ভারত শিল্পবিভাগের অধুরোধাদায় হইল। কিছুকাল পরে মঙ্গলাল বহু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্রাবলী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার কাছে গভর্নমেন্ট শিল্পবিভাগের ভারতীয়

চিত্রশিল্প শিখিতে আগমন। পরে অগ্নীয়ায় হুইশ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি শিখরূপে গ্রহণ করেন। এখন তাঁহার নিকট নানা স্থানের ছাত্র ভারতীয় রীতিতে চিত্রাঙ্কন শিখিতেছেন। মহীশূরাধিপতি তাঁহার সভা-চিহ্নকরের পুত্র ভেঙ্কাটোলাকে মাসিক ৪০ টাকা বৃত্তি দিয়া অবনীন্দ্রনাথের নিকট সেশ্বর চিত্রবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। শিরডুক অবনীন্দ্রনাথের শিকার ফলে বিলাতে ভারতীয় চিত্রশিল্প-প্রদর্শনোত্তে বিখ্যাত শিল্পীদের নিকট ভেঙ্কাটোলা বহু প্রণালী লাভ করিয়াছেন। হাতেগ সাহেব তাঁহার বিখ্যাত Indian sculpture and Painting নামক গুণ্ডকে,—ডাক্তার জুমারামাও তাঁহার Selected Examples of Indian art নামক গুণ্ডকে এবং বিলাতের The Studio নামক এসিঙ্ক শিল্পবিষয়ক মাসিক পত্রিকার অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগমান ছাত্রগণের—তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপিলব্ধ যথেষ্ট প্রখ্যাত প্রকাশিত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ যে কেবল শিখ্যদের রেখাপাত বর্ণাঙ্কনের গুণ তাহা নহে,—তিনি তাঁহাদের সৰ্ব্ব বিষয়ের বঙ্গলা-কাজী। হুইশ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্যও করিতেন। তাঁহার প্রবন্ধে এখানে Indian Society of Oriental art নামক একটা সমিতি হাইকোটের মাননীয় অধ্যক্ষ উড্‌য়ক্‌, হোমউড্‌, প্রভৃতি শিল্পোৎসাহী মহাজনদের দ্বারা শিরশিকাগাঁ ছাত্রদের উৎসাহবর্ধন ও সাহায্যার্থে গঠিত হইয়াছে। বিলাতে India Society নামক

উক্ত সমিতির একটা শাখা দেখানকার হাতেগ প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীগণ কর্তৃক ঐ একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত।

অবনীন্দ্রনাথ যেমন সুকুমারকলার অশ্রুগলন করেন,—তাঁর মনও তেমন সুকুমার! তাঁহার সহিত যে কেহ করেক মুহূর্তমাত্র আলাপ করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন! তাঁহার চিত্রশিল্প ভারতের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের আধার! তিনি একবার আমাদের একটা নর্তকীর পরি-কল্পিত চিত্র দেখান। সেই চিত্রটিতে একটা নর্তকী দেবমন্দিরের, দ্বারে দেবতার সমুখে কোন একটা ভারতীয় নৃত্য-কলার বিশেষ ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়াইয়া প্রাচীন ভারতের বিশেষ বিশেষ নৃত্যভঙ্গীর নিগূঢ় ভাব অবগত আছেন, তাঁহারা সহজেই সেই চিত্রলিখিত নর্তকীর নৃত্যভঙ্গীটা দেখিয়া চিত্রের ভাবগ্রহণে সমর্থ হইবেন। অবনীন্দ্রনাথ সহজে দর্শকের মনে সেই চিত্রলিখিত ভঙ্গীটার ভাবপ্ৰাণা বিশদভাবে সুটাইয়া ফুটিবার জন্য নর্তকীর সমুখে তাঁহার সম্মিলিত একটা অর্ধ-তক্‌ দলজন্তু পশ্চের দ্বারা জগৎ অনিত্য,—আর নর্তকীর উচ্চ হস্তোত্তোলিত ভঙ্গীতে জগৎ-পাঠার কাছে সৃষ্টির জন্ত অশ্রুদের সত্যিক্‌ নিবেদন জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি একটা সামান্ত নর্তকীর চিত্র আঁকিতে গিয়াও তাঁহার মহত্ত্বাবকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অঙ্কিত সকল চিত্রই নিগূঢ় ভাবব্রাহ্মণের প্রতিকৃতি—সেইজন্য অনেক সময় ইহা সাধারণের প্রকোপ হইয়া পড়ে।

উহার চিত্রলব্ধে হাডেন সাহেব
 উহার বিখ্যাত Indian Sculpture and
 Painting নামক পুস্তকে অবনীন্দ্রনাথের লব্ধে
 যাহা বলিয়াছেন, তাহার সম্ভাব্য এই,—“আধুনিক
 ভারতের কলাগান্ধী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে
 উহার একজন উপযুক্ত মানসপুত্ররূপে
 পাইয়াছেন। তিনি . বাস্তবিকই ভারতের
 সুপ্রশাস্য শিমগাহিয়ার উদ্যোজনকল্পে স্থি-
 ত-প্রতিজ্ঞ। আমি এই Indian Sculpture
 and Painting পুস্তকে তাঁর চিত্রের সঠিক
 প্রতিমূর্তি দিতে অসমর্থ কিন্তু রূপতঃ
 সুসংহতরূপে লক্ষ্য . আমাদের এই পুস্তকে
 প্রকাশিত এই সামান্ত কয়েকটি প্রতিমূর্তির
 দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইতে পারে যে,
 একজন প্রকৃত শিল্পী ভারতের সুপ্রশাস্য
 প্রাচীন শিল্পের পদপ্রদর্শকের তার গ্রহণ
 করিয়াছেন। * * * তিনি সংযুক্ত ও
 পারিতোষিক সুশীলিত ও তগবদ্বত এক
 অসাধারণ হৃদয় অহুতবশস্তির প্রভাবে কালিদাস
 ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন
 কবিদের কাব্যরসে অল্পপ্রাণিত; সেইজন্য তিনি
 যতাবতই উহার পূর্ণশিল্পী রবীন্দ্রনাথ মত
 মহাত্মার প্রভৃতির আধ্যাতিকার বর্ণিত নরক
 নারিকাদের ছবি আঁকিতে গিয়া “খিত্তব্রতগী”
 ভসিতে ঐতিহাসিক কিংবা অলৌকিকসামান্য
 সাক্ষী নীতি দেখে ‘আর’, আর সাক্ষী
 চৌকীমুখ্য পরিবর্তে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ
 কলী-কলার ছবি আঁকেন নাই;—অধিকন্তু
 অনুশাসন সাহসী সেই আধ্যাতিক তাব ও
 প্রাচ্যের চিত্রপ্রসিদ্ধ গীতার তাবপূর্ণ কবির-
 রূপেরই সমাবেশ করিয়াছেন।”

Essays in National

নামক পুস্তকে ডাক্তার কুমারস্বামী
 রায় রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অবনীন্দ্রনাথকে
 শিল্পগণ্ডে অনেক উচ্চ স্থান দিয়াছেন।
 ভারত গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত ইংলান্ড
 ডাক্তার মিঃ লিওনার্ড বেনিন্স কথায় প্রসঙ্গে
 বলিয়াছিলেন “আমরা বিলাত হইতে
 তোমাদের এই স্থাপত্যগোষ্ঠীসমূহ ভারতবর্ষে
 বহন পদাৰ্পণ করি তখন এই ভারতের
 হস্তমল গিরিপ্রান্তর, কল্যাণিনী স্রোতধিনী,
 বহু স্থানীয় গগন, নিখুঁত চিত্রনাট্য, উজ্জ্বল
 নক্ষত্র কোষি প্রভৃতি আমাদের পেন্সেল
 কচিৎ উপভোগ্য প্রাকৃতিক দৌলভ্য দেখিয়া
 যে এক বর্ণবৈচিত্র্য, তাববৈচিত্র্য লক্ষ্য করি,
 তোমাদের আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে
 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রে যাতীত আর
 কাহারও চিত্রে ঠিক সেই তাব সাধুণ্য
 বজার থাকিতে দেখি না। তোমাদের
 আধুনিক শিল্পীরা যে সব পাশ্চাত্য ধরণের
 চিত্র আঁকিয়া নিজেরের কৃতকৃত্য জ্ঞান
 করেন, আমাদের দেশে (অর্থাৎ ইউরোপে)
 ছোট ছোট শিল্পকারা সাধারণতঃ তদপেক্ষা
 উৎকৃষ্টতর চিত্র আঁকিয়া থাকে। আমার মনে
 হয়, অপর দেশের শিল্পীর চক্ষে নিজের দেশের
 শিল্প দেখার চেয়ে আর সূর্য্যত কি আছে?”
 তিনি যোগ্য হয় বামিনীগ্রন্থকাল গলোপাত্যারের
 চিত্রাবলী দেখেন নাই।

বিলাত ও ভারতের বহু পত্রিকাধিতে
 শিমগুহ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত চিত্র-
 শিল্পের বহু প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে, এখানে
 আমরা সেই সকলের উল্লেখ প্রবর্ত তাবগ্রন্থ
 করিতে চাহি না। গত কেব্রারী মাসে
 ‘পাইওনিয়ার’ পত্রে এলাবারদ শিল্পপ্রদর্শনীতে

প্রদর্শিত অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদিগের শিল্পকলা-সম্বন্ধে যে একটা সুসীর্ণ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল আমরা এখানে তাহার একটা সামান্য অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

A poet or a writer of romance the arts of design and of painting are only means of expression by which every cultivated mind knows how to give to his thought a more exact a more delicate shade of meaning. And actuated by this impulse, with a profound reverence for their own classics and a delight in their own romantic history with a sound knowledge of all these, the new Indian art movement was brought into being, and on this broad foundation has taken its stand * * * * *

* * * In other words, these individuals drawn instinctively together by the magnetising influences of their artistic inspirations have combined in the most natural manner to prevent the art of their motherland from being swamped by the great surging wave of occidentalism

which has for some time threatened every national institution of India.

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা কেবল শিল্প-জ্ঞানেই পূর্ণাবলিত নহে, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার অংশ প্রতিভা। চিত্র ও সাহিত্য উভয় রম্ভে তাঁহার সম্মিশ্রিতাঙ্গন রচিত। তাঁহার স্বীয়ের পুত্রপু, শঙ্করা প্রভৃতি পুত্রকে তিনি প্রাচীন কথকতার বহু যে এক সরস ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, আদ্যকাল অধিকাংশ শিশুপাঠ্য পুস্তকাদি তাহারই অঙ্করণে রচিত হইতেছে। একদিকে তিনি প্রাচীন ভারতশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অন্তর্দিকে বঙ্গসাহিত্যেও পুরাতন কথকথাভাষার পুনঃ প্রচলন করিয়াছেন। ভারতী প্রাণী প্রকৃতি পত্রিকার প্রকাশিত তাঁহার লিখিত ছোট ছোট গল্প ও শিশুবিষয়ক প্রবন্ধ বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা কর্তৃক সাগ্রহে গৃহীত হইয়া থাকে।

• এই প্রবন্ধে দিবার মন্ত আমরা তাঁহার জীবনীর একই পরিচয় দিচ্কা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। এসম্বন্ধে তিনি যাহা উত্তর দিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রকাশিত হইল।

ঐকমিতকুমার হালদার।

অবনীন্দ্রবাবুর পত্র।

এ দেশের লোক ষাটটা থাকিতে নিজের একটা সঠিক ফোটো উঠাইতে বড়ই নারাজ। সুতরাং উত্তর কালে লোকটির চেহারা লইয়া একটা কিছুত কিম্বাকার ব্যাপার ষাটটা উঠে বিশেষতঃ লোকটি কিছু public spirited হইলে। কিন্তু জীবনী ও নিম্নসৃষ্টির হাঁত হইতে কলিকালে যখন কাহারও রক্ষা নাই

তখন পূর্ণ হইতে নিজেই সেটার খসড়াটা বেধিয়া গুনিয়া একটা হুবহোবস্ত করিয়া যাওয়াই সুবিবেচকের কার্য। সেকালে ইতিহাস জীবনী প্রকৃতির আচরণ ও চাটুনি প্রভৃতি করিয়া রক্ষা করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্যাপার ছিল। সে এক প্রকার ছিল ভাণ,—যাহ অদ্বিবার পূর্বেই রামায়ণ লিখিয়া গুণিও পালায়

হাজাও নিশ্চিত । কবি যেমনটি লিখিয়া গেলেন
স্নান ও ত্রিক তেমনটি করিয়া জীবনটি অতিবাহিত
করিলেন । আর তোমার আমার দত্ত লোক
তো জীবনের দার দিয়াই যাইত না । হুতরাং
তাহারা বেশ সুখে সম্বন্ধে দান দান,
পুকারী খনন, সন্দির প্রীতিভাষি করিয়া
টেকাল পরকালের দ্ব্যবস্থা করিয়া যাইতে
লাগিত । এই দেখনা সে কাণে ‘মনহর’
‘স্বকীয়া’ প্রভৃতি কত বড় বড় পেন্ডার
ছিলেন কিন্তু ছবিৰ উপরে নামটি পণ্ডার
তাহাদের সেই করিতে হইত না,—আর এখন
আমাদের নামখান গাই গোত্র,—কবেকি দিয়া
ভাত খাইলাম, কবে কপাটি খেলিতে খেলিতে
দাত ভাঙ্গিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি না লিখিয়া
গেলেন নিজের নাই ; হুতরাং লেখাই যখন
বার্ষিক তখন সেটা দত্ত সীম পাঠা যার শেষ
করিয়া দেওয়াই ভাল ।

দিন কতক নিষ্কর্মা দিন কাটাইব বলিয়া
সমুদ্র তীরে আলিরাছি, অল্পপত্রিকা সঙ্গে আনি।
হয় নাই—বহুল তারিখ ইত্যাদির প্রত্যাশা
করিও না । ভাল রং তুলিও আনো হয় নাই
হুতরাং হুএকটা কালীর আঁচড়ে নিজের
ছবিটা ঘনটা সস্তব লিখিয়া পাঠাইলাম ।

সেদিন মাথা ‘ওপ্তির সময় সমুদ্র
লিখিয়াছি ৩০ হুতরাং সেইটাই ঠিক বলিয়া
ধর । অল্পপ্রকার লিখিলে পরকারি হিসাবে
গোলযোগ বাগাইয়া দেওয়ার জন্য বিপদে
পড়া আশ্চর্য্য নয় । তা ছাড়া আর এক
কারণে বরদ ‘ও অম্ব তারিখাদির হিসাবে
দিতে আমি প্রস্তুত নই, অকস্মাত্তক আমি
চিরদিন বায় বেগি সেইজন্য অকস্মিত্তার
দিকও বাড়াইতে এখনও সাহস হয় না ;

কাবেই জীবনে আমার অল্পটা বাদ পড়িয়া
গেল এবং বলিলে বিধাণ করিবে না অল্পটো
কিছু কিছু বোধগম্য হইল ।

এই দেখনা কবে যে Entrance
পড়িয়াছি (পাণ কাটাইয়াছি) তাহার সঠিক
হিসাবে আমার নাই তবে একটা জুস্ট ছবি
মনে আছে—সে বৎসর দ্ব্যর্থ গরম, morning
class হইতেছে,—Headmaster মহাশয়ের
বাড়ি নিকটেতে কি নিকটেতে না,—আর
আমি বেধে খলিয়া গোলদিগির হির অণে
চোঁয়া আছি, বইখানার দিকে নয় ।

স্বপ্নের চতুর্থ প্রণীতে কবে পড়িলাম
মনে নাই কিন্তু সে সময় একটা ছবি
না কি হইয়াছিল আর সে উপলক্ষে যে
একটা মেডেল কিনিয়া পরিয়াছিলাম
তাহাতে সুইন ভিক্টোরিয়ার মুখটি আঁকা
ছিল তাহা এখনও আমার বেশ মনে আছে ।

এই মেডেল কিনিয়া পরার কথা আর
একটা কথা মনে পড়িল ।

অল্পপত্রিকার সস্ত্র আমি মাষ্টারদিগের
নিকট হইতে কোনদিন পুরস্কার পাই নাই
অথচ পুরস্কারের দিন নিয়মিত স্থলে হাজির
হইতাম । তখন কি জানিতাম যে আমার
সঙ্গে অল্পশাস্ত্রের যে সঞ্চয় স্ত্র মাষ্টারদিগের
সহিত অল্প শাস্ত্রের ঠিক সেই একই রকম
সঞ্চয় ! আমি বলিয়া এই একটিনাত্র সুহ
বাণ মাষ্টার মহাশয়ের উপরে নিক্ষেপ করিয়াই
স্বাত হইলাম, অল্প লোক হইলে পরশয্যা
রচনা করিয়া ফেলিত ।

স্থলে পুরস্কার নাতি বাটীতে তিরস্কার
বধেই ; এই একটা বালাজীবনের চুচ ছবি
দেওয়া গেল ।

উনচল্লিশ বৎসরের একটা হিন্দাব নিৰ্ভাশ করিতে বসিয়া সেখি দে মাত্র বছর বয়স বায়ে ছাড়া বাকী আর সবকুটাই খেলার কাটিয়াছে—২৫ তুলি গান বাজনা কণিতা প্রবন্ধ লইয়া খেলা করিয়া কাটাইয়াছি,— জীবনটা একবার এপথে একবার ওপথে।

২৪ বৎসরে আমার জীবনটা দরা পড়িল এবং পাঁচ হিটলীতে মিলায়া দেটা বিখকর্ম্যের মধ্যে ভুড়িয়া দিলেন। প্রথমটা খুব আনন্দে রথ টানিতে লাগিলাম, ক্রমে পূর্বে কশাঘাত—আর মাঝে মাঝে উৎসাহস্বক চাপড় খাইতে খাইতে পূর্বে কড়া পড়িয়া গিয়া এখন মনটা অনেক পোদ মানিয়াছে। এখন পুরস্কারেও যেমন তিরস্কারেও তেমননি বেশ একটু মানসিক স্থপ অগ্রভব করিয়া থাকি।

বর্তমানে এপণ্যস্ত। ভবিষ্যৎ বাণী করিতে আমার সাধ্য নাই তোমরা দেটা কোন স্থলেখককে দিয়া গণাইয়া লইতে পার আমার আশঙ্কি নাই।

তোমরা মানিয়া রাখ আমার জীবনীর এটা দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িতেছে। প্রথমবারের জীবনীটা ছাপা হইবার পূর্বে পোটে আকিস হইতেই হয় বিবাগী হইয়া গেছে—নরতো অকালে করা ফুলের জায়—বুঝিলে তো! তোমরা আমার লেখাটা পড়িয়া ভাবিতেছ ‘নাঃ! এ জীবনটা কিছু না!’ আর আমি আড়ালে গাড়াইয়া হাসিতেছি ও বলিতেছি কিছু না! কিছু না!’ এ ছবিটা কেমন বল দেখি?

ঐঅদনীপ্রনাথ ঠাকুর

চরন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

হুয়েনসাং।

হুয়েনসাং নাম। খ্রীঃ ৭০০ খৃঃাব্দে সি বিজিত। রাজধানী খ্রীঃ ২০ লিঃ হুই উর্কিয়া এবং পল্লোৎ-পাদিকার পক্ষে প্রাপ্ত; এছাড়া পক্ষ মস্কে। মলবার উপ হইলেও উপকোষ। লবিবানীয়া কপট। ইহারা মনো কিত অত্যন্ত বিপণী। ইহারা বারবিভার অসুস্থ কিত অত্যন্ত বিভার পারলনী ব্যক্তিবর্গকেও মস্কেই সম্মান করে। অধিকাংশ লোকই সাংসারিক উন্নতির লক্ষ্যে ব্রাহ্ম। অধিবাসীদের কেহ কেহ কৃষিকার্যে হস্ত থাকে। চতুর্দিকের মূল্যবান এবং দুপাশা পণ্যবর্গ এইখানে আসমানী হয়। তিনটি সম্ভারাবে ৭০০ বক্তি বাস করেন; ইহারা সকলেই

দীনদায়িত্ববাহিনী। আর পত্যাবিক

আছে অনেক ভুলি সম্প্রদায়ও আছে।

রাজধানীর চতুর্দিকে ২০০ পক্ষ লি স্থান লইয়া বাসকে লোক বর্গক্ষেত্র বলে। এ মধ্যে আটজন কিংবদন্তী এইরূপ :—পুত্রাকালে পক্ষ ভারতে দুই জন রাজা ছিলেন। উভয়ের সহিত অনবরত যুদ্ধ হইত। অবশেষে উভয়ে এইরূপ স্থির করিলেন যে, উভয়ে প্রত্যেক পক্ষ হইতে সমসংখ্যক সৈন্য নির্ধারন করিয়া তাহাদের যুদ্ধ করিতে দিবে। কিন্তু অবসারণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহাতে স্বাভাবিকের রাজ্য তিনটি করিতে লাগিলেন যে জন সাধারণকে সভ্য করা হু.সাং। কেবল বৈবশক্তি

বায়া চালিত হইলেই তাহার কার্যে লিপ্ত হইতে পারে ।

উক্ত বেলে তখন একজন বিদ্বান ও প্রতিভাবানী রাজ্যে বাস করিতেন । রাজা গোপনে এই রাজ্যকে কয়েকখানি সেনাদের কাগজ প্রেরণ করিয়া অনুবেশ করিলেন যে, তিনি যেন অস্ত্র-পুত্র মধ্যে থাকিয়া একখানি বর্ষগ্রহ প্রদান করিয়া পরিতত্ত্বার সুকাচিত করিয়া রাখে । কিছুদিন পরে যখন ওয়ার উপর তৃষ্ণা দিল, তখন রাজা ওয়ার বস্ত্রাঙ্গকে আহ্বান করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "দেখ রাজা 'ইঙ্গ' কীত হইয়া আমাকে যথেষ্ট আদেশ করিয়াছেন যে, অল্পকাল পরিতত্ত্বার এক বর্ষগ্রহ আছে ।"

ঐ পুত্রক অনুসন্ধানের মন্ত রাজ্যেণ প্রচলিত হইল এবং পরিতত্ত্বার তৃষ্ণা দিল। ঐ পুত্রক পাতক্য বেল। রাজ্যেণাভাগ রাজ্যকে জনসাধারণে করিতে লাগিলেন এবং অবিস্মরণ্য অস্ত্র প্রদত্ত হইল। রাজ্য পরে প্রেরণ করা সেনা দিলেন প্রেরণ করিলেন। "মন্ত সুভার নীচা নাই। যে অস্ত্রকার প্রেরণে আমায় নিমিত্ত আছি তাহা হইতে উদ্ধার নাই। কিন্তু এইকণ আমি এক অস্ত্রময় উপায়ের সকলকে বস্ত্রা হইতে রক্ষা করিতে পারিব। এই রাজধানীর চতুর্দিকে ২০০ লি লইয়া স্থানকে পুরাকালে সকলে পরিতত্ত্বার বলিত। এইকণ আর দে তিক নাই। বস্ত্রাঙ্গের এইকণ প্রেরণে পারাবার নাই। এইকণ কি করা কর্তব্য? এইকণ সকলকে আমি লানাইতেছি যে তোমাদের মধ্যে গাহারা বিপদের দৈত্যকে প্রেরণ করিয়া দুর্ভিক্ষে প্রেরণ করিয়া করিবে তাহার পুত্রের বস্ত্রা প্রেরণ করিবে। গাহারা অনেক লোক বিহত করিবে, তাহার বস্ত্রাই প্রেরণ করিবে। যে সকল অস্ত্রময় পুত্র ও পৌত্র তাহারের বস্ত্রা পিতৃপুত্রদ্বয়কে লানাইয়া করিবে তাহার অস্ত্রকাল স্থান প্রেরণ করিবে। লানাই কার্যে প্রেরণ পুত্রের গাহিবে। সুভার সকলেই কার্য করিতে প্রেরণ হইবে।"

রাজার এই কথা শুনিয়া সকলে দুঃখের মন্ত প্রেরণ হইল, কেননা তাহার বস্ত্রাই মুক্তি এইকণ

বলে করিতে লাগিল। রাজা আদেশ প্রেরণ করিয়া ওয়ার পারদী দৈত্যদ্বয়কে আহ্বান করিলেন। উক্ত দৈত্যে প্রেরণের বস্ত্রা হইল এবং সেই সময় হইতে এই দেশে দৈত্যদ্বয়ের অস্ত্রময় হইয়া বহিরাগে। অনেক দিন পূর্বে এই ঘটনা ঘটাইয়াছিল, তাই অস্ত্রময় অস্ত্র প্রেরণ। এই মন্ত এ বেগকে পরিতত্ত্বার বলে।

মাত্র ৪৭ লি উত্তর পশ্চিমে ৩০০ ফুট উচ্চ রাজ্য অস্ত্রময় নির্মিত পুত্রের ইষ্টকাল রক্ষণীয়, ও উচ্চ। মন্ত্রাঙ্গের বস্ত্রাঙ্গের মন্ত প্রেরণ। পুত্র হইতে প্রেরণ উচ্চকাল অস্ত্রময় বহিরাগে এবং অনেক অস্ত্রময় মন্ত্রাঙ্গের অস্ত্রময় হয়। মন্ত্রাঙ্গের দক্ষিণে ১০০ লি বাইরা আমায় প্রেরণ। মন্ত উপস্থিত হই। এই দৈত্যে অনেকগুলি প্রেরণ আছে, প্রেরণ মন্ত্রাঙ্গের স্থান মন্ত্রাঙ্গের প্রেরণ। প্রেরণ-মন্ত্রাঙ্গের প্রেরণ এবং মন্ত্রাঙ্গের। এই স্থান হইতে উত্তর পূর্বে ৪০০ লি বাইরা আমায় মন্ত প্রেরণ পৌছ।

প্রস্ত

এই প্রেরণ আর ১০০ লি। ইহার পূর্বে নীচের প্রেরণ। উত্তরে প্রেরণ পরিতত্ত্বার। নীচের প্রেরণে মন্ত্রাঙ্গের প্রেরণ। রাজধানীর পরিধি ১০ লি; বস্ত্রা রাজধানীর প্রেরণে বিরা প্রেরণ হইতেছে। রাজধানী মন্ত্রাঙ্গের কিন্তু প্রেরণ প্রেরণ প্রেরণ। মন্ত্রাঙ্গের ও উত্তর প্রেরণ প্রেরণের প্রেরণ। অধিবাসীরা মন্ত্রাঙ্গের ও মন্ত্রাঙ্গের। ইহার অধিবাসী এবং বিদ্যার প্রেরণ।

মন্ত্রাঙ্গের প্রেরণ পৌত্রী মন্ত্রাঙ্গের আছে, অধিবাসী প্রেরণ হইয়া মন্ত্রাঙ্গের মন্ত্রাঙ্গের। ইহার মন্ত্রাঙ্গের প্রেরণ করেন। প্রেরণ প্রেরণ হইতে প্রেরণ এই স্থানে প্রেরণ মন্ত্রাঙ্গের প্রেরণ করেন। প্রেরণ এককাল প্রেরণের আছে, অধিবাসী প্রেরণ মন্ত্রাঙ্গের প্রেরণ।

রাজধানীর দক্ষিণ পশ্চিমে এবং মন্ত্রাঙ্গের মন্ত্রাঙ্গের প্রেরণ পশ্চিমে এককাল প্রেরণ আছে। মন্ত্রাঙ্গের প্রেরণ

রাজধানীর চার লি দক্ষিণে আশ্রয় একটি ক্ষুদ্র সম্ভারাবে পৌঁছি, ইহাতে আর ৫০ জন পুরোহিত বাস করেন। পুখাকালে শাস্ত্রজ্ঞ গুণসত্তা, গুণবিশিষ্ট আশ্রয় একশত পাত্র প্রদান করেন। যৌবনকালেই ইনি বিদ্যে প্রতিভাচারে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পরে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ছিল না। ইনি বুদ্ধিমান ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং বেশ বেশান্তরে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে ইনি মহাবান ধর্মাবলম্বী বিশেষ কিত্ত কিছু দিন পরে বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ করিয়া ইনি হীনবানধর্মাবলম্বী হইয়া মহাবান ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক পাত্র প্রদান করেন। অপর পূর্ণবস্ত্রী পণ্ডিতপণের মতের বিরুদ্ধেও ইনি অনেক পুস্তক প্রদান করেন। বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াও তিনি অনেক বিষয় সম্যক জানিবার ক্ষমতা পাইলেন নাই।

এই সময়ে যেসবোরা মাদিক এক জংগ বাস করিতেন, ইনি ইচ্ছামত খর্গে গম্যমান করিতে পারিতেন। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি সাক্ষ্য করিয়া এই মঞ্চল সম্বন্ধে ভ্রমসংশয় উৎপাদিত হইয়া গাইবার ক্ষমতা গুণসত্তা দেখেমনেক অপ্রয়োজন করিলেন। সেসবোরা সিন্ধু নৈব বনে তাঁহাকে লইয়া খর্গে উপস্থিত হইলেন। গুণসত্তা বৈজ্ঞানিক দেখিয়া মন্ত্রণ মত করিলেন কিন্তু তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না। গুণসত্তা তখন বৈজ্ঞানিক প্রণাম করিলেন না দেখেমনা তঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। “যদি বৈজ্ঞানিকের বিকট উপকার দাত করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে ইচ্ছা না কেন?”

গুণসত্তা উত্তর করিলেন “মানবীয় মহাপ্রাণ, আপনি যোগেশ্বর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমি কিছু এবং শিষ্যরূপে সংসার পরিত্যাগ করিয়াছি; কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যৌবনবর্ষের প্রথম ভোগ করিতেছেন এবং সেই বস্তু লস্কান্যাত্মীয় সন্তোষী হইতে পারেন না। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম কিন্তু দেখিলাম উহা সম্ভব হইবে না।” যৌবনবর্ষ শেষিলে যে এ ব্যক্তি আত্মরূপে

পরিণত এবং সেহেতু তিনি শিকার উপভুক্ত পাত্র নহেন। এজন্য বহির্গত তিনি তিনবার খর্গে গম্যমান করিয়াছিলেন তদুপরি দিগ্গম সম্বন্ধে ভ্রমসংশয় হইয়াছিল। অবশেষে, তিনি পুন্ডরীক তাঁহাকে খর্গে লইবার ক্ষমতা দেখেমনার ক্ষমতা করিলেন এবং তিনি বৈজ্ঞানিক যৌবনবর্ষকে প্রণাম করিতে প্রস্তুত হইলেন, একথা নিবেদন করিলেন। কিন্তু দেখেমনা আর এ প্রকারে সম্মত হইলেন না। গুণসত্তা দিগ্গম সন্তোষীকৃত পূর্ণনা হস্তগত করিয়া লইলেন। তখন একা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পশ্চাদ্গমন করিয়া সমাধি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সন্ধানপূর্ণে পরিণত থাকার কোনই সম্ভাবনা পাইলেন না।

গুণসত্তা সম্ভারাবের চার লি দূরে একটি পুণ্ডরীক হীনবান মহাবানবর্ষী ২০০ পত্র দিয়া থাকেন। এই প্রকারে শাস্ত্রপ্রদানকারী সম্ভারজ্ঞ দেখে ভোগ করিয়া ছিলেন। তিনি কাস্ত্রীরহণী এবং মন্ত্র মন্ত্রসম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। যৌবনকালে তিনি উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সর্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞান শাস্ত্র কর্তব্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে বহুবস্তু যৌবনবর্ষীকৃত ছিলেন। যাহা যাহো প্রকাশ করা যায় না তিনি সমাধি হারা তাহাই ভাঙে করা হইতে ইচ্ছা করিলেন। বৈজ্ঞানিক সম্ভারজ্ঞকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমতা তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকৃত পাত্র প্রদান করেন। এই পাত্র সম্ভারজ্ঞ, মন্ত্র ও তাঁহার বিচার স্থান।

সম্ভারজ্ঞ এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিদ্যে কর্তব্য হইয়া করিলেন। যখন বহুবস্তু পুণ্ডরীক যৌবনবর্ষীকৃত পাত্র প্রদান করিলেন। এই পাত্র ২৫,০০০ প্রাক ৩৮ লক্ষ লক্ষ দ্বারা লিপিত হইয়াছিল। উহা পত্রের যৌবনবর্ষ ও পুণ্ডরীক বিদ্যাপূর্ণ। শিষ্যদিগকে সন্তোষিত করিয়া তিনি বলিলেন যে “যখন আমি পুণ্ডরীক বহিব। তখন আমার প্রধান শিষ্যপণ এই পুস্তক লইয়া বহুবস্তুকে আত্মদান করিয়া তাঁহাকে দেয়া যায়।”

ইহাতে সম্ভারজ্ঞের চার জন প্রধান শিষ্য সম্ভারজ্ঞ প্রদত্ত পুস্তক লইয়া বহুবস্তুকে অত্মদান করিয়া

হইলেন। এই সময়ে বহুবলু চেকায়েশে যান করিতেছিলেন। তাঁহার গাতি দিখাইবলু হইতেছিল। সন্ধ্যাত্তের আশ্বিন বার্তা জন্মিয়া বহুবলু তাঁহার শিষ্যগণকে একপের পরিচয় দিতে আবেশে গিলেন। ইহাতে বহুবলু শিষ্যগণ সন্ধ্যা চিত্তে তাঁহাকে দিগ্ভাস্য করিলেন, “আমাদের অঙ্গুর তুমি পূর্ণতর আঙ্গ ব্যক্তিদিগের অগ্ণেকা অধিক এবং বর্জমানে তাঁহার শ্রম সঙ্গত ব্যাপ্ত। একপক্ষেই তিনি সন্ধ্যাত্তের নাম দিয়া এক ভীত হইয়াছেন কেন? ইহাতে তাঁহার শিষ্যদের যদেই বর্ণ করা হইতেছে।” বহুবলু উত্তর করিলেন, আমি এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগ্যতা করিতেছি না কিন্তু এই বেগে এমন প্রজ্ঞানী কোন ব্যক্তি নাই যিনি সন্ধ্যাত্তের স্ত্রীর অনুমান করিতে পারিবেন। তিনি কেবলমাত্র আমার বার্তাকার নিম্না করিবেন। এক কণায় আমি তাঁহাকে পরিত্যক্ত করিতে পারি। তাঁহাকে সন্ধ্যাত্তের লইয়া যাওয়া হইক; তথায় বিধান ও প্রবণ ব্যক্তিগণের সমুখে বিচারে সত্য-নিষ্ঠা, জেতা বিজিতা নির্ভাঙ্কিত হইক।” এই বলিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে পুণ্যকদি লইয়া দুই মেনে গাইতে আবেশে গিলেন।

এই ঘটে উপস্থিত হইবার পরদিন শাস্ত্র সন্ধ্যাত্তের অকস্মাৎ যেন জীবনী পতি লোপ পাইতে লাগিল। ইহাতে তিনি বহুবলুকে এইভাবে পত্র দিলেন, তথ্যগতের স্ত্রীর পত্র তাঁহার শিষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন সমুদায় বুদ্ধ হইয়া বিজ্ঞ বিজ্ঞ সত্যমতের পরিচয়দিলেন এবং এতাকে নিজ নিজ শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ সন্তের গোপকতা করিয়া অপরের বত অভ্যাসমান করিয়াছিলেন। আমি অজ্ঞ হইয়াই হুঁতায় বসত; পূর্ণ পুণ্যগণের নিকট হইতে এই রীতি শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমি বিকাসিক সমুদায়ের স্ত্রীর পরামর্শ অধিকতর ভাষা প্রণয়ন করিয়াছেন। আমি পুত্রক পাঠে করিয়া নিজের ক্ষমতার বিচার না করিয়া অনেক বসন্ত চেষ্টা করিয়া এই পাত্র প্রণয়ন করিয়াছি। আমার ক্ষমতা সাধারণ, উদ্ভেদ বহন। আমার সময় লক্ষ্যে হই-

রাছে। বোমিদর বহুবলু যাব বলা প্রকাশে আমার এই কষ্টসাধ্য পুত্রকের বিজ্ঞে কিছু না বলেন, তবে আমি আমার স্ত্রীকে বিশুদ্ধাঙ্গত হুঁপিত হইব না।”

পরে তাঁহার শিষ্যদের সন্ধ্যা হইতে একজনকে নিপাচিত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন “আমি সন্ধ্যাত্ত বিধান হইয়া একজন প্রবণ বিজ্ঞকে পরামর্শ করিতে আশীর্বাদ হইয়াছিলাম। সেজন্য আমার স্ত্রীর পর তুমি এই পত্র শু শুধুই বোমিদরের নিকট কথা প্রার্থনা করিবে এবং আমার অনুভূতির কথা বলিবে।” এই কথা বলিয়া লক্ষ্যেই তিনি নিশ্চয় হইলেন: পরে একজন বলিল, “তিনি সন্ধ্যাত্ত করিয়াছেন।”

শিষ্য পত্র ও সমুদয় বর্জমানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সন্ধ্যাত্ত করিলেন “আমার স্ত্রী সন্ধ্যাত্তের আশীর্বাদ করিয়াছেন; তাঁহার পত্র কথোক্তি এই পত্রে লিপিত আছে, তাঁহার অপরাধের লক্ষ্য তিনি কথা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং যাহাকে তাঁহার স্ত্রীমত লই না হয়, তন্মত তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।” বহুবলু বোমিদর পত্র ও পুত্রকের বক্তব্যে পাঠে ক্রিয়া কিছুদিন চিত্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি শিষ্যকে বলিলেন “শাস্ত্র সন্ধ্যাত্ত চতুর ও উদ্যাবল্যক ছিলেন। তাঁহার বিচার শক্তি অপর ছিল না কিন্তু তাঁহার রচনাশক্তি মল্য নহে। সন্ধ্যাত্তের পাত্র ইচ্ছা করিলেই আমি এই ক্ষণেই পরিত্যক্ত করিতে পারি। তাঁহার স্ত্রীকালীন অনুভব আমার রক্ষা করবার বিশেষ কারণ আছে; কেননা এই শাস্ত্র আমার সমুদায়েরই বত ব্যক্ত করে। এই স্ত্রী আমি কেবলমাত্র পাত্রের নাম পরিবর্তন করিয়া তাঁহার নাম জামাতার নাম রাখিব।”

শিষ্য অধিবন করিয়া বলিলেন “সন্ধ্যাত্তের স্ত্রীর পত্র বহুবলু তাঁহার সঙ্গে যোগ্যতা হইয়াছিল। কিন্তু এইক্ষণ পাত্র হস্তান্তর হওয়াতে তিনি তাঁহার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব করিতেছেন, আমরা কি একপের এই অপমান সহ্য করিব।” বহুবলু বোমিদর সংশ্লিষ্ট পুত্র করবার লক্ষ্যে বলিলেন যে, “পত্রস্ত্রয় যদিও পুত্রকে বেশিরা পলায়ন করে তথাপি বুদ্ধিমান ব্যক্তি উভয়ের

বলের পার্থক্য আনেন।" সমাজতন্ত্রের চতুর্থ পর ভাঁহার
যেহ দায়ে করিয়া ভাঁহার অধি মধ্যে করিয়া আনবেন
এক তুণ নিশ্চিত হইল; বর্তমানের ঐ সকল
অধি দেখিতে পাওয়া যায়।

আসবনের দিকটাই অল্প একটা তুণে পাত্র সঞ্জন
কারী বিঘল হিসের পত্রীর চিত্র আছে। পাত্রজ বিঘল
দিত কাশ্মীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি দক্ষিণবাস
সংলগ্নায় ভূক হইয়া শিকালিও করিতে থাকেন।
তিনি অনেক পুত্র পাঠ এবং অনেক দায় অধ্যয়ন
করিতাহিলেন। তিনি পাত্রজের সমস্ত ত্রিপিটকে
পারদণী হইতাহিলেন। "পাত্রজ নামে করিয়া" তিনি
অনেক সভ্যতামনে উদ্ভূত হইয়া সমাজতন্ত্রের তুণের
সরিকটে ঘাইয়া দীপনিধান ত্যাগ করিয়া তুণের
উপর হস্ত রাখিয়া বলিলেন "সমাজের অন্তত জনী
ছিলেম। চতুর্দিকে নিজ স্থানই জ্ঞেয়, কিহা তিনি
অপর সমাজকে পরাজয়ে অভিলাষী হইতাহিলেন।
সুতরাং ভাঁহার নাম অধিবাস হইবে না কেন? আমি
তুণ হইলেও অনেক দায় ভাঁহার অত্র পাত্র অধ্যয়ন
করিতাহি। নহুংমু তুণ হইলেও ভাঁহার সমাজ
কীর্তি আছে। আমি যাহা জানি তাহাও লিখিত
হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য আমি এইতুণ পাত্র অধ্যয়ন
করিব যে অধুনা হইতে বহাধানের নাম বিস্মৃত হয়।
এই তুণ অধিবাস হইবে এবং আমার বহুদিন লুপ্ত
কাণ্ড শেষ হইবে।" এই কথা বলিযামাত্র ভাঁহার দুর্ধি
লোপ হইল; ভাঁহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল এবং
উক রক্ত স্রাবিত হইতে লাগিল। ভাঁহার মৃত্যু
সরিকট দেখিয়া তিনি অশ্রুভাগ্যতক দিয় লিখিত
পত্র লিখিলেন "কৌতুক সংক্রান্ত বহাধানেই সারলক্ষ
লিখিত আছে। ইহার প্রথম ভাগ হইতে পাত্র কিত্ত
ইহার বিচার পাঠ হুজের। আমি অজ্ঞতা-বশতঃ
ইহার অর্থ শিককবিশেষ পরাও করিত চাতিয়া-
ছিলাম। ইহার পুরস্তার সকলেই দেখিতেছেন। এই
অল্পই আমার আশ্রয় হইতেছে। আমার দুটো
হইতে সকল দুর্ধিধান ব্যক্তি শিকালিও করুন।"
ভাঁহার মৃত্যুকালে ত্রুটিবাক্য হইতাহি। যে দানে
তিনি মৃত্যুপূর্বে পত্রিত হন তথায় এক "পত্রীর পত্র" হয়।

ভাঁহার নিয়মণ ভাঁহার দেহ তদীয়ত করিয়া অধি
সমস্ত পুঙ্গব তথায় এক তুণ নিধান করিল।

এই সমস্ত একজন অধিবাস করিতেদ। তিনি
দীপনিধান ত্যাগ করিয়া বলিলেন "কি হুবে। কি
পত্রিতাণ; অল্প এই পাত্রজ ব্যক্তি বহাধানেকে দিগা
করিয়া পত্রীর বহাধানী হইলেন।"

এই অংশের উত্তর পশ্চিম জ্ঞেয় বহাধানীর
পুঙ্গবেরে হুজো (হরিবার) বহন; ইহার পত্রি
আর ২০ লি। বহন জনপূর্ণ। বহরের চতুর্পার্শেই
অজ্ঞানলিলা ঘনী প্রবাহিতা; বহরে তাম্র, অজ্ঞ
কাও তুণ্যবান পাত্র পাওয়া যায়। বহরের দিকটাই
পত্রজীরে দেবদলিরে নাম একাধি অধিবাসিক
বাপার সভ্যকীর্ত্ত হই। বহরের বহাধানে পুঙ্গব
আছে; ইহার পার্শ্বেই অত্র বিধিত। ইহার
বহা দিয়া ত্রুটিব দান যথা পত্র প্রবাহিতা।
পাত্রজের লোকে ইহাকে পাত্রজার। এই
দানে পুণ্য সকর তুণ্যকর হয়। নাম বেশ
হইতে লক্ষ লক্ষ লোক সমস্ত ইহা এই দানে
পুণ্যপালা স্থাপন করিতছেন; বিধাও আত্মরক্ষণ
উদ্দেশ্যে উত্তম দান্যাদি দিবার লক্ষ বশেই
পুঙ্গব অর্থ আছে। এই দান হইতে ৩০০ লি
বাইয়া আমরা ব্রহ্মপুত্র বেশে পৌছি।

ব্রহ্মপুত্র ।

এই রাজ্য আর ৩০০ লি; ইহার চতুর্দিকেই
পত্রিত। ব্রহ্মপত্রীর পরিব আর ২০ লি। অধিবাসীরা
ঘনী। অধি উপরী এবং অত্র সমস্ত উৎপাদন করে।
বেশে তাম্র তুণ্যকীর্ত্তি ত্রুটি পাওয়া যায়।
অন্যায় হুজিত; অধিবাসীরা অধিপতি এবং অত্র-
সরিক। অত্রজেরই বিভাজন করে, অধিবাসীরাই
বাণিজ্য বিহুজ। এই অংশের উত্তরে ভূগার
পত্রিত; ইহার বহাধানে প্রবর্তনগে বেশ। এই
বেশে এক একাধি উজ্জৈষ্ঠীর স্থবর্ণ পাওয়া যায় এবং
দেই অল্প বেশে। নাম স্থবর্ণ পোত্র। বহুদিন হইতেই
এই বেশে ব্রহ্মজের "ব্রহ্মজ করিতেছেন এবং দেই
অল্প এই বেশে "ব্রহ্মজের দান" বলে। ব্রহ্মজ

স্বাধীকে সান্না যথা হয় দ্বিতীয় সান্নাওয়ের সমিত
 তাঁহার কোন সন্তানই নাই। পুত্রসন্তান মুক্ত ও চান করে
 মাত্র। দেশে গম-এর পাওয়া যায়। অধিবাসীরা
 গরু-একটি। এই স্থান হইতে পূর্বদিকে ৪০০ পদ
 লি গাইয়া আসিয়া গোবিন্দনা দেশে পৌছি।

এই স্থান আর ২০০ লি এবং সান্নাও ১০১০
 লি। এই দেশ অত্যন্তই হ্রস্ব। কেননা
 চতুর্দিকে পর্বতভ্রমণ। জনসংখ্যা অত্যধিক।
 চতুর্দিকে পুষ্ক-সুন্দর এবং পুষ্ক-সুন্দর। জলবাণী
 এবং উৎসব তথা নতিপুত্রের জায়। অধিবাসীরা
 সন্তান ও শাব। ইহারা নিত্যভ্রমণে ও গরু-এ
 রত। অনেক অধিবাসী আছে। দুইটি সান্নাওয়ে
 ১০০ পদ যতি আছে; ইহাদের অধিকাংশই হীনমান
 সন্তানবলী। ৩০টি বেনবলির আছে; ইহাতে তির তির
 সন্তানসন্তানগত অনেক লোক বাল করে। সান্নাওয়ের
 নিকটেই জাতীয় সান্নাওয়ে সান্না অগোচর নির্মিত
 কুণ আছে। ইহা আর ২০০ পদ সুট উক্ত। মুক্তদেব
 এই স্থানে জন্ম করিয়াছিলেন। নিকটেই একটি
 স্থানে পূর্বদ্বীপে তারি জন বৌদ্ধের চিহ্ন আছে; তাঁহারা
 এই স্থানে সন্তান ও উপবেশন করিতেন। নিকটেই ক্রম
 দুইটি কুণে তথাগতের কুণ ও নথ আছে। এই দুইটি
 কুণ আর ১০ সুট করিয়া উক্ত। ৪০০ লি দক্ষিণ পূর্বে
 গাইয়া আসিয়া অধিকন্তু দেশে উপস্থিত হই।

অস্তিত্বের।

এই দেশ আর ৪০০ লি এবং সান্নাও ১০১০ লি।
 ইহাও চতুর্দিকে পর্বত। এদেশে গম উৎপাদিত
 হয়; অনেক বন ও জঙ্গল আছে। জলবাণী মুক্ত ও
 প্রীতিগম এবং অধিবাসীরা সন্তানবলী ও সন্তান।
 ইহারা বার্ষিক ও বিন্যাসভর্য রত। অধিবাসীরা চতুর্দিক
 চীনমানসন্তানবলী সন্তানগত যতি ১০টি সান্নাওয়ে
 বাস করেন। ১টি বেনবলির আছে। ইহারা
 পাশপাশ জলীকৃত এবং ইহাদের নিকটে বহিমান
 করে। নগর বহির্ভাগে মগ পুষ্ক-সুন্দর নিকটে
 অগোচর নির্মিত কুণ আছে। এই স্থানে তথাগত
 সন্তানগতের সন্তান সন্তান বহিরা সন্তান করিয়া-
 ছিলেন। নিকটেই ৪টি কুণ আছে। এই স্থানে

পূর্বদ্বীপে তারিজন মুক্ত উপবেশন ও সন্তান করিতেন;
 অধিবাসী তাহার চিহ্ন বর্তমান। এই স্থান হইতে
 ২০০ কি ২০০ লি দক্ষিণে গাইয়া এবং সন্তানবলী পাশ
 হইয়া আসিয়া বৌদ্ধের দেশে পৌছি।

বীরসেন।

এই দেশ আর ২০০ লি; সান্নাও ১০ লি।
 অধিবাসীরা জোনাল। ইহারা অধিকন্তু ও প্রদান
 বিহার অসুস্থ; অধিকাংশই অধিবাসী; কেননা
 কয়েকজন বৌদ্ধবর্গীয়বলী। সন্তান সন্তানচতুর্দিক
 ১০০ যতি দুইটি সন্তানগত বাস করেন। তির তির
 সন্তানবলী কুণ উপাশকবিধের বেনবলির আছে।
 নগরের নগরভাগে জাতীয় সন্তানগত ২০০ সুট উক্ত
 একটি কুণ আছে; ইহা অগোচর নির্মিত। সন্তান-
 কালে তথাগত সন্তান বিদ্যমান বহু উপাশক সন্তান
 এদের করিয়াছিলেন। নিকটে তারিজন মুক্ত
 উপবেশন ও সন্তানের চিহ্ন বর্তমান বর্তমান। এই
 স্থান হইতে দক্ষিণ পূর্বদিকে ২০০ পদ লি গাইয়া
 আসিয়া ভগিনী দেশে পৌছি।

কপিপা।

কপিপা দেশ আর ২০০০ লি, সান্নাও ২০ লি।
 জলবাণী ও উৎসব তথা বৌদ্ধের দেশের জায়।
 অধিবাসীরা কোমল একুশবিশিষ্ট এবং শিষ্টাচারী।
 ইহারা অধিকন্তু। হীনমান সন্তানগত এক
 সন্তান যতি ৪টি সন্তানগত বাস করে। তির তির
 উপাশক সন্তানগতগত অধিবাসীপুত্রের ১০টি বেনবলির
 আছে। ইহারা সকলেই নগরকে পূজা করে।
 নগরের ২০ লি পূর্বে মুখ্যগত সন্তানগত আছে।
 মুক্তদেবের সন্তান সন্তান বর্তমান আছে। আর এক সন্তান
 যতি আছে। নিকটবর্তী ঘটে অনেক বার্ষিক
 বাস করেন। সন্তানগতের নগরস্থানে তিনটি সন্তান
 লি দি আছে। তথাগত সন্তানগত সন্তান হইতে এই
 লি দি দিয়া পুণীতে অসুস্থ হইয়াছিলেন।
 পুষ্ক-সুন্দর তথাগত সন্তানগত বন হইতে সন্তান
 আসিয়া করিয়া সন্তান পুষ্ক-সুন্দর করিয়া তাহার
 সন্তান সন্তান এদের করিয়াছিলেন। তিন বাস
 অতিবাহিত হইলে পুণীতে সন্তান হইবার সন্তান

বেশরাস পক্ষ নিম্ন ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলে এই সিঁড়ি প্রস্তুত
করিয়াছিলেন। সম্রাটের সিঁড়ি পীঠবর্ণ স্বর্ণনির্মিত।
সামোহী ক্রান্ত ও দক্ষিণেটী ভঙ্গ যৌগ্য নির্মিত।

তথাপত স্বর্ণপুঙ্খ ইটরা দেবতাপন সমভিযায়ায়
মহা সিঁড়ি দিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সম্রাটদিগকে
তনুভাষয় হস্তে ধকিণ সিঁড়ি দিয়া ও দেবরাস পক্ষ
মুলাধার হস্তে বহিরা বাহের সিঁড়ি দিয়া অবতীর্ণ
হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে 'দেবতাপন পুঙ্খ বৃত্তি ও
ভাঃহার অরপান করিতে লাগিলেন। অনেক শতাব্দী
যদিয়া সিঁড়িগুলি অত্যাধিক ছিল কিন্তু স্বর্ণময় তাহার
কৃৎস্ন অল্পই হইত। পিকটবর্তী রাজ্যে সিঁড়ি
বা দেবগির্জা পাইয়া প্রাপ্ত হিত্তে অধিকৃত পোক্তিত
ইটক ও কংক্রিটাময়নির্মিত প্রস্তর দ্বারা ১০ ফুট
উচ্চ ভিনটী সিঁড়ি পাওয়াযে। ইহার উপরে তাহার
এক বিহার নির্মাণ করিয়া বুদ্ধদেবের প্রস্তর মূর্ত্তি
রাখিয়াছে এবং উত্তর পার্শ্বে সঙ্গত লক্ষের মূর্ত্তি ২১
সিঁড়িতে স্থাপন করিয়াছে।

বিহারের বহির্ভাগে রাজ্য অংশে নির্মিত ১০ ফুট
উচ্চ একটা প্রস্তরের গুহ আছে। ইহা দেবদেব রায়ের
এক উদ্দেশ্য। ইহা অত্যন্ত পুঙ্খ। ইহার উপরে
সিঁড়ির দিকে যুগ করিয়া উপবিষ্ট এক সিংহমূর্ত্তি
আছে। প্রস্তর চতুর্শাণে খোদিত মূর্ত্তি আছে।
সিঁড়িটবর্তী জন সাধারণ ধার্মিক হইলে মূর্ত্তিগুলি দেখা
যায়। সুকর্ণপায়ণ হইলে তাহার অঙ্গুল হস্ত।
সিকটেই পূর্ণহস্ত ও জন বুদ্ধের লক্ষণ ও উপবেশনের

চিহ্ন স্বর্ণময়ও দেখা যায়। সিকটেই অল্প একটা পুঙ্খ।
এই স্থানে তথাপত স্থান করিতেছিলেন। সিকটেই এক
বিহারে তথাপত সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। বিহারের
সিকটে ১০ হস্ত দীর্ঘ ও ১ ফুট উচ্চ একটা প্রস্তর
আছে; এইখানে তথাপত প্রার্থনা করিতেন। যে
স্থানে তিনি জগৎ করিতেন, তাহার পশ্চিমের দিকে
আছে। প্রস্তরের দক্ষিণ ও বামে সঙ্করাজ ও পক্ষ
নির্মিত ২১ ফুট পুঙ্খ আছে।

পক্ষ ও সঙ্করাজের পুঙ্খের সমুদ্রে উপবেশন
কিন্তুই বুদ্ধদেবকে সঙ্গলগমে দেখিবার সঙ্গ চন্দ্রবর্ত্তি
রাজ্যে গণ্য করিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দৌহৃতি
নিম্ন গুহে বসিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন,—
“বুদ্ধদেব এইরূপ সঙ্গলগমে সহিত বাস করিবার অল্প
প্রাণত্যাগ করিতেছেন। দেবদেবগণ তাহার পরিচর্যা
করিতেছেন। এইরূপ আদি কি সঙ্গ তাহার সিকটে
উপবিষ্ট হইব। তাহার সিকটে কি আদি ভাবি
নাই যে, কোন জিনিষেরই অস্তিত্ব নাই; যখন সকল
সবেরই এই অবস্থা তখন আদি পরোক্ষই বুদ্ধের
অবতীর্ণী বোধ দেখিয়াছি। এই ভাবিয়া যে স্থানে বুদ্ধদেব
বিলেন তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিন্তাশ্রম প্রাণ করিলে,
বুদ্ধ তাহাকে করিলেন যে, দৌহৃতি লগ্নেই সকলই
অনিষ্টা ভাবিতে পারিয়া সকলের বুদ্ধকেই দেখিতা হন।
এই স্থান হইতে প্রায় দুই পক্ষ লি যাইয়া
কাতমুকে পৌছি।

(চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত)

জন্ম-মৃত্যু ।

(সার উইলিয়ম গোল্ডের অনুবাদে)

মা'র কোলে সজ্জাত নিষ্ঠাট গধন
কাঁবিল অজানি ধুপে—সরন মেলিয়া;
চৌবিকে দিগিয়া তারে পরিজন লবে
রাজ্যের মঙ্গল লক্ষ আনন্দে মাতিয়া!

মুখে ধুপে কতদিন কেটে গেল ঘীরে;
নির্যত-বনায়ে এল! লব বেহা বিরে
আছাড়ি পড়িল লবে ধানি কর বৃকে,
—সৌম্যহাসি ফুটে গুহ ধানসম যুগে!
ঐ প্রবেশচক্রে ঘোব।

লীনার কাহিনী ।

(A. Kaempfen-এর কহানী হইতে)

লীনা, শেক্সপীর প্রতি ।

ব... ২৬ নভেম্বর ১৮৭০

আমাদের বাড়ীতে নতুন লোক আসিয়াছে । গুপ্ত রবিবারে, মেট্‌স (Metz) নৈশভরণের অন্তর্ভুক্ত ১২ জন বন্দী এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে । ইহারা সকলেই পেশা-নারক । আমাদের এই ক্ষুদ্র নগরের ভিতর পান্থশালাই কহানী নৈশিকের ভরিয়া গিয়াছে, কেবল কহানী সেনা-নারকদিগকে বাসিন্দাবিগের গৃহে স্থান দেওয়া হইতেছে । আমার কাকা একটা পত্র লাইয়াছেন, তাহাতে লেখা আছে :—তুমি ক্যাপ্টেন গার্মিগকে তোমার একটা কাম্বায়া রাখিবে, এবং দরকারী পরচে তাহার আচরণাদির ব্যবস্থা করিবে । আমার কাকা একটু দ্বিগত হইলেন ; কিন্তু ‘না’ বলিবার ভাৱ নাই—সরকারের হুকুম । অপরাহ্ন সময়ে ক্যাপ্টেন আমাদের এখানে আসিলেন । লোকটার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর, বেশ লম্বা, গোলা-খালা মুখের ভাব, অশ্রী না হইলেও প্রিয়বর্ধন । সাহসী পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ; চ’খের দৃষ্টি পূর্ণ বৃহৎ হইলেও, তাহাতে সংকল্পের দৃঢ়তা বিলক্ষণ প্রকাশ পায় । লতাত দ্বিগত ; আমার মনে হয়, এ বিষয়তা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে, স্বপ্নেরেণ জর্জরা, নিজের বন্দী-অবস্থা, এই ভীষণ গৃহে তাঁহার কোন আত্মীয়বর্গের দৃষ্টি—এই সমস্তই বেধ হয় ইহার কারণ । আমাদের মি সুইগা-বুড়ী আর আমি—আমরা এই কহানী ক্যাপ্টেনের লজ্জা, আমাদের নীলবস্ত্রের কাম্বাটা

সজ্জিত করিয়া রাখিলাম । এই কাম্বাটা হইতে নদী ও বৃহৎ স্রব্বান্যের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় । আমার কাকার ইচ্ছা ছিল—সাতার ধারের কাম্বাটা ইহার লজ্জা নির্দিষ্ট হয় ; কিন্তু সে কাম্বাটা ‘অন্ধকরে’ ও সাতাটাও পথিক-দুঃখ । এই কাম্বায়া থাকিলে বেচারা ক্যাপ্টেনের বিশদতা স্মরণও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা । কহানীবিগের প্রতি কাকার অত্যন্ত বিশেষ থাকিলেও, তাঁহার অন্তঃকরণটা দরলু ; তাই এই কথাটা তিনি সহজেই বৃক্ষিলেন ; এবং আমাদের ইচ্ছামত আমরা ক্যাপ্টেনের লজ্জা কাম্বা নির্দিষ্ট করিলাম । ক্যাপ্টেন কাম্বায়া আসিয়াই, তাড়াতাড়ি কাম্বায়া চাতিদিকটা এক-নজরে দেখিয়া লইলেন এবং আমাদের দিক দৃষ্টি করিলেন । আমি তাঁহাকে বলিলাম, তাঁহার বহি ইচ্ছা হয়, একাকীই আহার করিতে পাবেন । তিনি উত্তর করিলেন :—“আমি আপনাদিগকে কিছুমাত্র কষ্ট দিতে চাহি না ; তবে যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আমি আপনাদের সহিত একপক্ষে সাধারণ-ভোজন ও নৈশ-ভোজন করিতে ইচ্ছা করি । তাহার পর, তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন ; আমার নৈশ-ভোজনের সময় ফিরিয়া আসিলেন । আমাদের সহিত এই তাঁহার প্রথম আহার ; আহারটা নিতান্তভাবেই সম্পন্ন হইল । আমাদের অতিথি-সঙ্গে আমাদের সামান্তরকমের দুইচারিটা কথা হইল মাত্র । ভোজন শেষ হইবার পর তিনি

উত্তরা পড়িলেন এবং আবারের প্রতি শুভ-
রাত্রির শুভাকাঙ্ক্ষা জানাইয়া, “আপনার
কাম্যায় চলিয়া গেলেন ।

পরদিন, তার পরদিন, এই ভাবেই কাটিয়া
গেল । আমার তর ছিল পাছে আমার কাকা,
মুকের ঘটনাবি-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন ;
আমার বিশ্বাস, এই সব কথা উপাশন করিবার
তাহার যে একটু ইচ্ছা না ছিল এক্ষণ নহে !
কিন্তু, কি ভাগ্য, এ সম্বন্ধে কোন কথা
উপাশন করেন নাই ।

গত-কল্যা, সাভাহ-ভোজনের সময়, সুইশা-
বুকী কাপেনের হাতে একখানি পত্র আনিয়া
দিল । এই পত্রখানি Mayence-নগর হইতে
আনিতেছে । বন্দীনিগের প্রস্থান করিবার পরে,
এই পর দেইখানে পৌছিয়াছিল । ভাড়াভাড়ি
পত্রের নিম্নোক্তাংশ উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ
করিয়া ও আবারের নিকট পত্রপাঠের
অনুমতি লইয়া, তিনি আবারের বলিলেন
“আবার মারের চিঠি” । আমার কাকা
বলিলেন “কাপেন মহাশয়, পত্রখানি পাঠ
করুন” । তিনি পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে
লাগিলেন । পত্রের প্রথম কথাগুলি পড়িয়াই
তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, যেন তাহার
হৃদয় হইতে একটা তার নানিয়া গেল । তিনি
পত্রখানি হইবার করিয়া পাঠ করিলেন ;
প্রথমবার অপেক্ষা দ্বিতীয়বার আরও দীর্ঘ
দীর্ঘ পড়িতে লাগিলেন । তাকে স্থনী দেখিয়া
আমরাও স্থনী হইলাম । আমার কাকাকে
সংবাদন করিয়া তিনি বলিলেন,—“ভাড়া-
মহাশয় ! আমাকে মার্জনা করিবেন,—আমি
ভুলিয়া গিয়াছিলাম...”

কাকা বলিলেন :—“কাপেন, কিলের

হস্ত মার্জনা ? মার্জনা কবিবার ত কিছুই
নাই । সব খবর ভাল ত ?”

গার্মিয়ে উত্তর করিলেন—“এতটা ভাল
খবর পাছ নহে” আশা করিনি ।”

পূর্ণ-পূর্ণ দিনের মত, আজ আবারের
সময়, কাপেন ততটা চুপ-চাপ হইলেন না ।
নৈশ-ভোজনের সময় তিনি আমাদিগকে
বলিলেন ;—“তাহার মাতা পল্লীগ্রামে বাস
করেন, এবং তাহার দুইট ভগিনী তাহা
অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট এবং তাহাদিগকে
তিনি বার পর নাই ভালবাসেন । কাপেন
চলিয়া গেল, আমার কাকা বলিলেন :—
“ভাবি আন্ডার, নিজ পরিবারের উপর
শ্রমকটির বাস্তবিকই একটা টান আছে
যেখানি ।” আন্দর্য্য । আন্দর্য্য বিপের অজ্ঞ ?
মানব-জগতের যে ভাবগুলি অত্যন্ত বাস্তবিক,
সেই ভাবগুলির আভাস সম্বন্ধে, এই মর্যাদা
আতিথি কি ব্যতিক্রম-স্থল যে আন্দর্য্য হইতে
হইবে ? পত্রদের সম্বন্ধেও ভাববিচার
করা উচিত ; এইরূপ ভাববিচার করিতে
কোন আশঙ্কা নাই ; আমার মনে হয়, এইরূপ
না করিলে, একটা স্তম্ভুর ও বিভ্রান্ত
স্থবের সন্নিবেশ হইতে আপনাকে বঞ্চিত
করা হয় ।

১১ ডিসেম্বর

কিছুদিন হইল, জার্মান-লৈস্কের একটা
সুস্থ বল, আমাদের নগরের মধ্যে দিয়া চলিয়া
গেল । এই সকল লৈস্কিক, ফ্রান্সে আহত
হয়, আপনাদের পরিবারের মধ্যে থাকিয়া,
বাহ্যতে সম্পূর্ণরূপে স্বাভা লাভ করিতে পারে,
এই অল্প সময়ের নিকট হইতে অনুমতি
লইয়া, নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে ।

তাহারা অপরাক্তে এমন দিবা চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, এমনকি বলাগে তাহাদিগকে নানা প্রকার প্রণয় করিতে লাগিল। তাহারা যাহা বর্ণনা করিল তাহা বড়ই ভয়ঙ্কর; গ্রাম-সমূহের দাহন, গৃহের পুটপাট, অপরূপ দাহন, বনিতাদিগের নৃশংস হত্যা। এই সকল ভয়ঙ্কর কাণ্ডে লিপ্ত ছিল বলিয়া অনেক আবার গর্গ করিতেছিল। প্রত্যেকেই বলিতেছিল, তাহারা এক-একটা দানী পুটের জিনিস পাইয়াছে। উৎসাহের মধ্যে কতকগুলি যুবক ছিল,—তাহারা নারী-পরিচ্ছদ, রত্নালঙ্কার, জেবুঘড়ি ও গাড়ির চেন গল্লের সহিত সকলকে বেগাইতেছিল—এই সব জিনিস তাহারা তাহাদের বাগবত্তা প্রেরণাদিগকে উপহার দিবে। পুইলা-বুড়ী, তাহাদের বলিল “এই সব চোরাই মাংস দিবা তোমাদের প্রেরণা-দিগের অঙ্গ সাধাইবে—ইহাতে তোমাদের লজ্জা হয় না?”—সৈন্তদলের মধ্যে যে সর্কাসেফা অঙ্গবস্ত্র সেই এই কথা বলিয়া উঠিল।—“বুড়ীটা বলে কি?—চোরাই মাংস।” “ও সব জিনিস তো জাযাত: আমাদেরই; যুদ্ধলব্ধ অধিকারস্থই এই সকল জিনিস আমরা পেরেছি।” সেই সময়ে সেইখানে বাহারা উপস্থিত ছিল—সৈনিক, গ্রামালোক, এমন কি রমণী—সকলেই এই কথায় সারদিরা একথাকো বলিল:—“হা, তা ঠিক—ও সমস্ত যুদ্ধের অধিকার বটে।” হায়! কি সর্কাসেফা কথা। কে বিশ্বাস করিতে পারিত, পুটানেরা এই সকল নিষ্ঠুর বাগ্যারকে এত সহজ ভাবে গ্রহণ করিবে! তবেই দেখ, পুরাতন ধর্মপ্রাণ অধর্মণ এখন কিরূপ হইয়াছে। অস্ত্র সৈন্যের লোক এখন আদ্যাদিগকে কি ভাবিবে? যে

সময়ে সৈনিকেরা আদিদাঙ্গিল, তাহায়া সেই সময়ে ফরাসী ক্যাপ্টেন ওঁহার কাম্বার ছিলেন এবং তাহারা প্রস্থান করিলে পর, ওঁহার কাম্বার হইতে বাহির হইয়াছিলেন; যদি তিনি তাহাদের কথাবার্তা শুনিতে, তাহা হইলে আদিভারী লজ্জিত হইতাম। কেননা, তিনি অধর্মণ তাহা বুঝেন, এবং অধর্মণ ভাষায় একটু কথাও কহিতে পারেন।

গত শনিবারে লংবাৎসাদিতে আনা গেল, সশ্রুতি আবার আবার জিজ্ঞাসা। প্যারিসের সৈন্তদলের প্যারিস হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিয়াছিল; এবং দুই দিন যুদ্ধ করিয়া, শেষে ছুটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। অধ্যাপক হাইডেন্‌হাউসের আমাদের সহিত সম্মুখে ভোজন করিয়াছিলেন। প্রথমে, আমার কাকা ও অধ্যাপক, এই জরের কথা উপাশন করেন নাই, এবং আমাদের অভিপ্রেত শব্দে তাহাদের আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ভোজনের শেষ-ভাগে, আমার কাকা, স্পেনবের্গের মরিয়াপূর্ণ একটা পাত্র ভট্টবেশ পর্যন্ত উত্তোলন করিয়া, অধ্যাপককে একটু ইঙ্গিত করিলেন, অধ্যাপকও একটু চোপ্ টিপিয়া, একটা মরিয়াপূর্ণ পাত্র উত্তোলন করিলেন। এইরূপ কিছু একটা কাণ্ড ঘটবে বলিয়া সন্দেহ থাকায়, ক্যাপ্টেন গার্নিয়ে মরিয়া আদৌ গ্রহণ করেন নাই। একটু পরে, অধ্যাপক আর বাক্ লংব করিতে পারিলেন না। ফরাসী সৈন্তের বার্ম-ভেটোর মধ্যে একটা উল্লেখ করিলেন। তখন ক্যাপ্টেন উত্তরা পড়িলেন, এবং চিঠি লিখিতে হইবে এই ছুটা করিয়া আমাদের অজুহতি লইয়া নিজে কাম্বার

চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে পর, আশ্রয় কাফা ও অধ্যাপক পরস্পরের সহিত গরল-পূর্ণ একটা দ্বিত্বাতের বিমিশ্র করিলেন এবং ফ্রান্স লম্বা একমন অবজ্ঞাসূচক ও নিষ্ঠুর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, আমি আর থাকিতে পারিলাম না,—আমি বলিলাম, মজ্জা দেবীর লোকের সম্বন্ধে, বিশেষত একটা বিজিত দেশের লোক সম্বন্ধে কেন এত বিদ্বেষ পোষণ করা হয় আমি বুঝিতে পারি না। অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন,—“হাঁ হাঁ, এই উক্ত ও নীতিব্রত জাতি পরাজিত হইয়াছে, তজ্জন্ত ঈশ্বরকে বস্তুবাদ; কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে, উহার একেবারে ধ্বংস হইলেই ভাল হয়।—“ধ্বংস! অধ্যাপক মহাশয়, তবে কি আপনাদের বিবাল, আমাদের জিহ্বা মহাপ্রভু এই ইচ্ছার অঙ্গুদোদান করেন?”—“হাঁ, নিশ্চয়ই। যে জাতি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে অতিশয়গ্রস্ত এবং বিশ্বগ্রস্তের নিদার ভাঞ্জন, সে জাতি সম্বন্ধে এই ইচ্ছা ছাড়া আর কি করা যাইতে পারে?” কিন্তু আমি পূর্ব তেজের সহিত উত্তর করিলাম,—“কিন্তু, যদি এই করণী জাতি এতই ধারণা হইয়া গিয়াছে যে উহার ধ্বংস হওয়াই উচিত, তবে আমরা উহাদের ভাষা শিক্ষা করি কেন, উহাদের অর্থ পরীক্ষা করি কেন, এবং মানা বিষয়ে উহাদের অনুকরণ করি কেন? আমাদের মধ্যে বাহারা হুনিবিত ও সম্রাট তাহার উদ্ভাবের নীতিনীতি, উহাদের কৃতি, উহাদের ধর্ম, উহাদের কেতা অবলম্বন করে কেন?”—“অন্য কাকা, অন্য কথা শেষ না হইতেই, বলিয়া উঠিলেন—“তোমার এই সব “কেন” র কোন মানে-মোদ্দা নেই। এখন তুমি যা, আজ

সাত্রে একটা বেওয়ারী উৎসব কর্তে হবে, লুইসার সঙ্গে একত্রে তারই আয়োজন করবে।”

দুই ঘণ্টা পরে, ক্যাপ্তেন বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং সেই ঘরের মধ্যে দিবা, যখন তিনি রাত্তার দিকের দরজার নিকট আসিতেছিলেন, আমি তখন জানুয়ার বাহিরে রসিন লঠন লাজাইবার উত্তোগ করিতেছিলাম। বৈঠকখানা-ঘরের অধি-স্থাপক নিকটে আসিয়া তিনি একটু ধানিলেন, এবং আমি কি করিতেছি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া উঠিল; তাঁহার পর, একটি কথা না কহিয়া, দরজার অতিমুখে চলিলেন। তাঁহার মনে কি হইতেছিল, আমি বেশ অনুমান করিতে পারিলাম; আমি লজ্জিত হইলাম, শুধু লজ্জিত না, তাঁহার বিবরণ্য দেখিয়া ব্যথিতও হইলাম। আমার হাতে যে লঠনটি ছিল তাহা মাটির উপর রাখিয়া, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—“ক্যাপ্তেন-মহাশয়, আমি আপনাদের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, আজ সাত্রে আপনাদের কামরার জানুয়ার আমি কোন লঠন খুলাইব না।” একটু গদগদস্বরে তিনি উত্তর করিলেন,—“আপনাদের অত্যন্ত ধন্য, জব্বরের অন্ততল হতে আপনাকে আমি মন্তব্য দিতেছি।” এই বলিয়া তিনি গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইলেন।

আমির কাফা, একজন যোগ্যকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহার সমস্ত কিরীয়া আসিলেন; এবং বীণাবাদী-কিছুপ শোভা হইয়াছে, দেখিবার লজ্জা বাস্তব চারিদিকটা

একবার গুরিমা আসিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই আমাকে হিজালা করিলেন :—“নীল রঙ্গের কাম্বার আন্নার কোন লঠন নাই কেন ?” আমি উত্তর করিলাম—“তার কারণ,—ঐ নীল কাঁধরাহ ফরাসী কাপ্তেন থাকেন।”—“তাহে কি এল-গেল ? আমার ইচ্ছা, ‘অস্ত কাম্বারগুলির তার ঐ কাম্বাটাও আলোকিত হয়।’—আমি একটু দূরত্বের দৃষ্টি বজালাম (মনে করিমা আপনিই এখন বিস্মিত হইতেছি)—“মনে করুন যদি আমরাই যুদ্ধে পরাজিত হইতাম, আর আপনি যদি কোন ফরাসী নগরে বন্দীভাবে থাকিতেন, তা হইলে আমি আমাদের অতিথি খাতিরে যা করচি, তাম্বা যদি আপনার প্রতি সেদৃশ খাতির না করিত, তাহা হইলে আপনার কিরূপ মনে হইত ?”—“আ ! আ ! যদি আমরা পরাজিত হইতাম...সে কাল আর নাই, সে সব দিন অতীত হইয়াছে।” হাত ঘসিতে ঘসিতে আমার কাঁকা এইরূপ উত্তর করিলেন। ঘাই হোক, ঐ আন্নার আগে দিব্যর সম্বন্ধে তিনি আর বড় জেদ করিলেন না। আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন। আজ রাত্রে কাপ্তেন আমাদের গৃহে নৈশ ভোজন করেন নাই।

১৩ ডিসেম্বর।

প্যারিসের অমর্য প্রতিরোধিতা দেখিয়া, এখানকার লোকদিগের ক্রোধাব্যি প্রচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। যে দা লোককে আমি দয়াশূ ও কোমল-স্বভাব বলিয়া মনে করিতাম, তাহাদের মধ্যেও অনেকে বলিতে লাগিল, এই উচ্ছত নগরের প্রতি একটু বেশী সন্ত্রাস দয়া প্রদর্শন করা হইতেছে, বহু পূর্বেই

নগরটাকে বোম্বার ঘারা চূর্ণ করা উচিত ছিল, উহার ইমারৎ-সমূহের একখণ্ড ইটও অবশিষ্ট রাখা উচিত ছিল না। তাই যেদিন, তোমাদের ওখানেও বোম্ব হয় লোকে এই রকম তাবা ব্যবহার করিতেছে, আর আমি বেশ বৃদ্ধিতে পারিতেছি তুমি তাতে কতটা মগ্ধাভূত ও ব্যাপিত হইতেছ। আমার আশ্চর্য্য বের্ণা, গত রবিবারে, অপরাজিতা আমাদের এইখানেই কাটাইলেন। আমাদের একটু গান-বাজনা হইল। আমি যখন গান গাইতেছিলাম, সেই সময় কাপ্তেন গাণিয়ে গরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে অবশি আমাদের এখানে আছেন, তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া না গেলে আমি গিরানো বাড়ীতে গদি না; যে নিকিষ্ট সময়ে তাঁর গিরিব্যয় কথা, তাহার কিছু পূর্বে হইতেই আমি গান-বাজনা বন্ধ করিয়া দিই; আমার মনে হয়, গান-বাজনা শুনিয়া পাছে তাঁহার বিগর ভাবটা আরও বাড়িয়া উঠে। যখন মনটা ভাল থাকে না, তখন আমি গান-বাজনার একটু সাবনা পাই; কিন্তু একজনদের বাহা ভাল লাগে, কখন-কখন তাহাই আর একজনদের খারাপ লাগিতে পারে। রবিবারে, মনটা মেন শেখ কাটিয়া গেল; কত সময় হইয়াছে আমার কিছুই মনে ছিল না। আমাদের সহিত একটি কথাও না করিয়া, কাপ্তেন তাঁহার নিজ কাম্বার চলিয়া গেলেন। সাহায্যে, কাপ্তেন আমাকে বলিলেন :—“আমার দয়ণ কি আপনি তোমাদের পর গান গাইতে ক্ষাঃ হইলেন ?” আমি কোন উত্তর করিলাম না। তিনি আবার বলিলেন,—“আমার নিশ্চয় মনে

হয়, আগনি গান বাজনার আধেয়ে গান, কিন্তু আমি থাকলেই আগনি পে জ্বল হইতে নিষেধঃ পড়িত কবেন। আর আমি এই এখন আগনার গান শুনিলাম। আমার জন্ত আগনার যদি কিছুমাত্র বাধা মনে হয়, তাহলে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হব। আমি আপনাকে অগ্নিব্রত করছি, এখন ইচ্ছা আগনি গানবাজনা করিবেন, আমার জন্ত কিছুমাত্র বিঘা করিবেন না।” ঐ দিন হইতে, যখনই আমার বেগাল চাপে, আমি পিরানো বাজাইতে বলি। কেবল, কখনো “যখন তাঁর কাম্বোয় পাকেন, তখন আমি জয়ন্ত ভাবার কোন গান গাই না।” ফরাসী ভাণ্ডার গান গাই। কিন্তু ফরাসী উচ্চারণ আমার বড়ই বাধাপ, তাতে ফরাসীর কানে বাপা দিতে পারে; তাই আমি বাছিয়া বাছিয়া, পুরাতন ইতালীয় ওস্তাদদিগের জুর বাজাই, এবং বেগের ভাগ বর্ষের গান ও লাবণ্য ভাবেব মৰ্ম্পর্ষণী গান গাইয়া থাকি।

১৪ ডিসেম্বর

চন্দ্রানক চন্দ্ৰিন। আট দিন ধরিয়া বাবলা চলিতেছে। দুপুর আকাশের উপর দিগা কালো বেষ ধারে ধারে চলিতেছে—পড়িমের বাতাল মেঘগুলোকে চেলিয়া লইয়া গাইতেছে—অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ এমনই কুয়াশাচ্ছন্ন, যে আমাদের বাড়ী হইতে নদীর দেখা আর দেখা গাইতেছে না, যদিও নদী ও আমাদের বাড়ীর মধ্যে, একটি ক্ষুদ্র উদ্ভানের বাবধান মাত্র। মধ্যে মধ্যে, আবিল ধলের উপর দিয়া, এক একটি মৌন নৌকা অশ্রুত করিয়া চলিয়া গাইতেছে, বিগ্ন কলনার নিকট এই নৌকাগুলি অতীবতই শব্দধার

বলিয়া মনে হয়। কখন কখন মনে হয়, সুধা বৃষ্টি আকাশ হইতে চিরকালের জন্ত অস্তহিত হইল; পতঙ্গামলকেন্দ্র গড়কা, হস্তি শাখা পল্লব লইয়া, বিভিন্ন কুসুমতরক লইয়া হস্তময় বনভের ঘার দুই আনিষ্ঠায়ে হইবে না। আমার অতঃকরণের উপর যেন একটা পাবণ-ভার চাপিয়া রহিয়াছে...এবং এই বাহু অস্ততির নিশ্চয়তার মধ্যে, এই শোক-জ্বালায় মধ্যে,—গৃহবিগ্রহের কথা—কাটাকাটির কথা ছাড়া আর কিছুই শুনা যায় না!...

গত কথা, একজন ফরাসী সেনা-নাযক, হাসপাতালে অবরোধে মাঝা গেল। ইনি একজন সব-গেণটেলেন্ট ছিলেন—বয়স ২০ বৎসর মাত্র। বাহারা তাহার দেবাগুণা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই বলে, লোকটি বড় ভাল, অত্যন্ত ধীর ও মধুরস্বভাব। জেবেব প্রাপ্তে, কেবলই তার নাকে ডাকিতেছিল; মুহুর পূর্বরাহে তাহার মস্তক শান্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, সে আর বাঁচিবে না। সে একটা কাঁচি চাহিয়া লইল এবং তাহার কম্পান হস্তের ঘারা, একগুচ্ছ মাথার চুল কাটিল, পীড়ার আরম্ভে যে পুস্তকখানি কখন কখন পড়িত, সেই পুস্তকের দুইটি পাতার মধ্যে ঐ কেনগুচ্ছ রক্ষিয়া দিল। পরে তাহার শব্দের পাশে তাহার যে দৈনিক সন্ধ্যা বসিয়াছিল তাহাকে এইরূপ বলিল :—“দেখানে যখন তুমি নিদ্রিয়া গাইবে, তখন এই শব্দখানি আমার মাকে দিবে।” আজ প্রাতে তাকে কবরস্থ করা হইয়াছে। সব লইয়া অশ্রুধাতিগণ আমাদের ঘরবার সম্মুখ দিয়া গেল। শব্দাঘের পড়তে কালো কাপড়ে ঢাকা শব্দাঘর চারিজন দৈনিক

বহন করিতেছে—এবং তাহার পক্ষান্তে, আমার নগরস্থ সমস্ত বন্দী করানী সেনানায়ক অনাবৃত মস্তকে চলিয়াছে। কেহ কেহ কাদিতেছিল।

আকাশ মেঘে অন্ধকার, ধীরে ধীরে ডগি পড়িতেছে। একুশ শোকাবহ ব্যাপার আমি আর কখন দেখি নাই। তার পর, যখন বেচারীর মায়ের কথা ভাবিলাম, আমার হৃৎ কেন ফাটিয়া গেল, আমার চোখে ঘল আসিল।

সারাক্ষে যখন আমরা আত্মারের টেবিলে আনিয়া বসিলাম, আমার কাকা যে রোগ্নিব টিকিৎসা কবিত্ত্বিলেন, তাহার যোগে বুদ্ধি হরণের, আমার কাকাকে তাহার ডাকিতে আনিয়াছিল। “তোমরা আহ্বার করিও, আমার সন্ত অপেক্ষা করিও না” এই বলিয়া তখনই তিনি চলিয়া গেলেন। আমি একলা কাপ্তেনের সহিত রহিলাম—লুইসা-বুড়ী পরিবেষণ করিতে লাগিল। কাপ্তেনের বিস্তৃত মুখের তাব, মুখে একটি কথা মাই, গ্রাহ কিছুই আহ্বার করিতেছেন না। আমি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বলিলাম; “গে বুঝকটির অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়া আজ আপনারা সম্পন্ন করিলেন, সেই বেচারীর কথা বৃদ্ধি আপনি ভাবেন?”—“হাঁ, তাইই কথা ভাবি। আত্মীয় বন্ধন-হতে দূরে, একজন সৈনিক কি না সন্নে মায়া গেল—কি ভয়ানক! আরও না জানি কত লোকের অশ্রুতে এইরূপ মুকু আছে।” আমি বলিলাম;—“এই মুহূর্তে শীঘ্রই শেষ হইবে। আমি তখন তাবি নাই, এই কথাটা গার্ণিয়ের কিরূপ লাগিবে।—তিনি একটু কট-চোপা হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন; “আপনি

যাও বলিলেন তাহার অর্থ এই—ফ্রান্সের সৈন্ত-বল নিঃশেষ হইয়াছে, এবং তাহার চূড়ান্ত অপমানের সময় আনিয়াছে।” কাপ্তেনের সুপ একেবারে পাত্ত্বর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহার কণ্ঠস্থ কাণিতে লাগিল। আমি বলিলাম, “আমাকে দয়া করুন, আমি এই কথা বলিয়া আপনাকে কষ্ট বিধান—কিন্তু সে অভিপ্রায়ে আমি বসি নাই।”—“তা আমি নিশ্চয় জানি, —আমিই আপনার ক্ষমার পাত্র, আমার বৃদ্ধা উচিত ছিল, আপনি ভাল উদ্দেশ্যেই বলিয়া-ছিলেন।” এই কথাটা এমন মিষ্টভাবে তিনি বলিলেন, যে আমার আত্মার অন্ততল পর্গাঙ্গ বিকম্পিত হইল। আরও তিনি বলিলেন :

“আর কি উপায় আছে, প্রভাগাধের সন্ত একটু মমতা করা উচিত।” আমি একটু চুপ করিয়া রহিলাম, পরে তাঁহাকে বলিলাম :—“কাপ্তেন মহাশয়, যদিও আমি আমার দেশকে ভালবাসি, কিন্তু এ বেশ জান্বেন, আপনার দেশের উপর আমার কোন বিদ্বেষ নাই; আপনাদের দুর্দশার সন্ত আমি সহ্যহুত্ব করি; এবং সহ্যহুত্ব করি বলিয়া আমি নিজেকে একজন ধারণা জর্ডান-রক্ষী বলিয়া মনে করি না। আমার আন্তরিক টেক্সা, দরাসী ও জর্ষণ এই দুই জাতি সন্তভাবে একত্র বাস করে; আমার বিশ্বাস, এই দুই জাতি একত্র মিলিলে, অনেক ভাল কাজ করিতে পারে। কিন্তু হায়! এখন সে মিলন কি সম্ভব?” প্রথমে কাপ্তেন কোন উত্তর করিলেন না; কিন্তু তাহার জগুগল কুণ্ডিত হইল, তাহার গুণ্ণাধ কাণিতে লাগিল, তাহার চ’খে এমন একটা আন্তর অগ্নি উঠিল যে তাহাতে তাহার মনোভাব বিলম্বন প্রকাশ হইয়া পড়িল। কিরূপে নিস্তক থাকিয়া

ভীষণা চোখের দৃষ্টিতে আমার পূর্ণভাবে
কিরিয়া আসিল, এবং ভীষণা মুখমণ্ডল
আবার শাস্ত্যাব ধারণ করিল। আমাকে
তিনি বলিলেন, "আপনার কদরের উচ্চতা
ও উদারতা লম্বা কেমন লম্বা নাই।
আপনার জ্বরের ভাবগুলিকে আপনার অন্তরে
যে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, এবং আপনার
লম্বা আমি কি ভাবি, না ভাবি, সে বিষয়ে
নে আপনি উদাসীন নন, ইহাতেই প্রমাণ
হয় আমার উপর আপনার একটু স্নেহ আছে
আর এই স্নেহ আমার সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে।
আপনি একপলক হঠাৎ মনে করিয়াছিলেন,
ফ্রান্সের উপর যে দেশের বিষম বিষম, সেই
দেশে থাকিয়া ফ্রান্স লম্বা একটা
সহাবৃত্ততির কথা বলিলে, আমার বড়ই মিষ্ট
লাগিলে।—সে ভুল করিবেন না। কিন্তু
আপনার প্রতি আমার জন্ম যে কৃতজ্ঞতা
শোষণ করিয়া রাখিলে, তাহা কন্সনসলেও
অপনীত হইবে না।" এই কথা বলিয়া
তিনি উত্তীর্ণ পড়িলেন, এবং "গুডনাইট"
সম্বোধন করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমার
মনে একলা হইলাম, লুইসা বলিল, "একটি
বেশ তেজস্বী; কিন্তু আতিথেয় কদমী এই
আবেশ!" আমি বলিলাম :—"তুইও এইরকম
মনে করিস, ফ্রান্সে তেজস্বী লোক থাকতে
পারে না?" সে বলিল :—"না না, আমি তা
বল্ছিলাম।" আমি বলিলাম :—"তবে ও কথা
সলবার মানে কি?"—"মানে কিছুই না।"
আর একটি স্বাক্ষর না করিয়া লুইসা,
আহাৎয়ের পাত্ৰাদি, টেবিল হইতে উঠাইতে
লাগিল।

প্রাণের লবি বেতিনা, আমার লম্বা
কি তাৎপৰ্য বল দেখি? বাই ভাবনা
কেন, আমার ভাতে কিছু এসে যায় না।
আমি তোমার কাছে কিছুই লুকোণো না।
তুমি কি আমার পরম বন্ধু নও, আর স্বাভাবিক
ভূমি আমার কাছে তোমার জন্মের অন্তর্ভুক্ত
পৰ্য্যন্ত কি খুলে দেখাও নি? তাঁর সেই
বিত্ত ও সৰল জন্মে এমন কোন কথা নাই
যা তিনি গর্জের সহিত সকলের কাছে প্রকাশ
করতে না পারেন, কিন্তু আমার কথা যদি
মিথ্যালা হয়...বাই হোক, আমার কোন মনে
নাই, নিজেই আমার ভিত্তির কদমার কিছুই
নাই। এক সপ্তাহ হতে আমার মন বড়ই
নিম্ন ও অশান্ত হয়ে রয়েছে। কখন কখন
আমার মনে হয়, তাঁকে দেখতে পেলে
তাঁর কথা শুনে পেলে আমি বড়ই খুশী
হই; আর যখন তিনি না থাকেন, মনে
হয় কখন তিনি আগমন। দেখার ক্ষমতা
যেন অধীর হইয়া উঠে। তবু আমার
জন্মের ভাব তখনও স্পষ্ট বুঝতে পারিনি—
জন্মটাকে তলিয়ে দেখতেও সাহস করিনি।
কিন্তু কাল থেকে, আমার আর কোন সন্দেহ
নাই।

আমার কাকা কখন কখন আমার কাছে
ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর বন্ধু
অধ্যাপক হাইডেন মাউরায়ের ভাইপো অ্যাকব
স্বিৎসকে যদি আমি বিবাহ করি তা হলে
তিনি খুশী হন। অ্যাকব একজন তেজস্বী
ও সুবোধ ব্যক্তি। যদিও তাঁর উপর
আমার ভালবাসা পড়েনি, তবু মনে হয়
যদি সে কোনদিন আমার পাণিগ্রহণের ক্ষমতা

আমার কাছে প্রার্থনা করে, আমি তার প্রতি নিরুপ না হয়ে তার প্রার্থনা গ্রাহ্য করি। কাল অপরহ্নে আমাদের পুত্রকাগারের কতকগুলি বই সান্নিহে রাখছিলাম, এমন সময় কাকা দেখানে প্রবেশ করলেন। তিনি আমাকে বলেন,—“অযাপক, তাঁর ভাইপো দ্বিপের কাছ থেকে একটা সংবাব পেয়েছেন।” ঐ নাম উনিবামার আমার মনে কেমন একটা ভীতির স্কার হল। বই হোক, আমার মনকে কোন প্রকারে ধমন করে, কাকাকে বল্ল;—“ভয়না করি দ্বিপ ভাল আছেন?”—“হাঁ ভাল আছে, আর তার গয়ে তোর কথা উল্লেখ করেছে।”—“কাকা, আমার কথা?”—“হাঁ, তোর কথা—আর খুব ভালবাসার সচিত উল্লেখ করেছে। মিত্রই সে এখানে আসবে; তেন না, সেই একন্তরে পারিলের লোকেরা আর কতদিন শেষে উঠবে। হক ১৭ দিনের বাপাব, তার পরেই সে ফিরে আসবে; তখন আমার পুত্রাতন বঙ্গ হাইসেন মাটরার আমার কাছে একটা প্রস্তাব করবেন, সেই বিষয়ে তোর সঙ্গে আমার পরামর্শ করতে হবে; আর আমি নিশ্চয় জানি, সে প্রস্তাবটা তোর বাসাব লাগবে না।”—“কিন্তু, কাকা...” —“থাক্ থাক্ আজ সে বিষয়ে তোকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করচিনে, কিন্তু তুই ত জানিস্ থাকব দ্বিপ বেগ ভেজখী, সস্তমিত্র, কোমলদ্বয়, কাককর্ষ করতে খুঁ ভালবাসে; সেদিন হিয়েন্স আমারে বল্লছিলেন, আর কয়েক বঙ্গরম বধোই দ্বিপ একজন ভাল ব্যক্তিত্বী হয়ে উঠবে; তবেই দেখ্ তাঁর ভবিষ্যৎটা বেশ আশামনক, সে যে বেরেকে বিবাহ

কবে সে নিশ্চয়ই স্থখী হবে। তুই খুব সুযোগ মেয়ে, আমি যখন সে কথা তোর কাছে পাড়ব, তখন তুই বা উত্তর দিবি তা আমি বেগ জানি। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।” এই বলিয়া কাকা বৈঠকখানা-য় হইতে প্রস্থান করিলেন। যেন একটা প্রচলিত আঘাতে কংকের হস্ত আমি হত-হেতু ও স্তমিত হইয়া গা ডাইয়া বহিলাম—চিৎরা করিবার শক্তি পরিত্যক্ত ছিল না। গভীর নিস্তব্ধ নৈশ-অন্ধকারে যেন আমার শব্দর সাচ্ছর হইল।

তারপর যখন চৈতন্য হইল, গভীর নিদ্রা-য় আমার শব্দর অতিভূত হইয়া পড়িল। আমার মনে হইল, যেন আমার সুখদোভাগ্য চিরকালের জন্য অন্তর্ভুক্ত হইল। জীবন দ্বিপের সুখি আনবে মনে ক্রমঃগত উপর হইয়া যেন একটা আতঙ্ক স্কার করিল। তখন আমি বৃথিলাম, আমি আর একজনকে ভালবাসিরাছি। কে সে আর-এক-জন তা তুমি বুঝতেই পারচ। হাঁ, আমার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া তাঁকে ভালবাসিরাছি। কিন্তু কখনই তাঁর কাছে আমার ভালবাসা জানাতে পারব না, কখনই তাঁর পাণিগ্রহণের আশা করতে পারব না। অল্পসঙ্গে আমার বৃক্ ডানিরা গেল। কি মর্দভেদী সেই অল্পসঙ্গ। প্রাণের সপি বৈত্তিনা, সেক্ষণ চোখের জল তোর যেন কখন ফেলতে না হয়। তগুমান ভাংতে তোকে স্কা করুন।

সেই শোচনীয় দিনের অবশিষ্ট সময়,— যাতে আমার মনের কথা কাকা না টের পান, লুইসা-বুড়ি না টের পাব, তিনি না টের পান, তার মস্ত কত করে” আপনাকে সাম্প্রদে চলেতে হয়েছিল। হায়! তাঁকে আর

বসন্তা ভাগ মনে হল, ভাগশাগার বোগ্যপাত্র
 বলে মনে হল, এমন কার কোন দিন হয়নি।
 কি মিলি মিলি কথাই আল ভাগ যুগে
 কখন—এমন শু কখন শুনি।—কখন
 কখন তাঁহার কণ্ঠধরে, তাঁর চাহনীতে মনে
 হচ্ছিল যেন...হার! তা কি কখন সম্ভব?

আমার এ কি বাতুলতা! কা! যেতিনা!
 যেতিনা! আমি অস্বস্তি ক্রপাশায় হয়ে
 পড়েছি। লম্বি, তুমি আমাকে ভালবেসো,
 তোমার ভালবাসাই আমার এখন একমাত্র
 সাহায্য। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীমোতিবিস্ময়াধ ঠাকুর।

মাতৃঋণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

‘কণাগাচক।

প্রকাণ্ড একতলা বাড়ী—কোণাও একটি
 জানালা মাই—উপরে কীচের সার্ভি-ঘেমা
 আলোক-পথ—এটিই ছিল “লিখনেন্দ্র মণো-
 তাঁর” ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসের পাশে এস-
 ভাড়াটির গাড়ীর বোড়ার আত্মবল—তপাধ
 বিবারাত্রি বোড়ার পায়ে পথ হইতেছে—
 সুদূর বিরাম মাই। মণো মণো বাস্তব সহিত
 একটা উৎকট ভূর্ণক ভাসিতা আসে। ঘণ্টা
 পূর্বে এক কোটোগ্রাফার ভাড়া লইয়াছিল,
 এখন “লিখনেন্দ্র মণোতাঁর” অধ্যক্ষগণের
 হাতে পড়িয়া ইহা এক অপূর্ণ শিক্ষা-নিকেতন
 হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্যোৎস্না মণো মণো
 তেজ, শীতের রায়ে হিহের উৎপাত কোনটা
 হইতেই পরিচাল ছিল না। ছাত্রের দলকে
 এই দুইটা অস্থিবিধাই ভোগ করিতে
 হইত, উপায়ান্তর ছিল না।

এই ঘরে কুড়িখানি খাটিয়া, কিছু
 মল্লিতে বিছানায় সারি পড়িয়াছে। ঘরের
 নিকট একখণ্ড জীর্ণ কার্পেট বিছানো।
 মরোত্তী কবিত, ইহার অধিক ব্যবস্থা

ঠিক হইবে না,—ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য পালন
 করাই কর্তব্য।

কিন্তু এতখানি কঠোর ব্রহ্মচর্য বালকগণের
 সম্বলিত না—সংসারমতে ঘরে পোকা-
 মাকড়সের প্রাচুর্য ছিল—এবং হিম ও যোজের
 নিরবচ্ছিন্ন ষাটপ্রতিঘাতে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ
 হইয়াছিল। বাত, কালী, অথবা লগ্নিঘাট ছিল
 —তাঁহার উপর বোড়ার জ্বরের লক্ষে
 জ্বনিহারও বাধ্যত হইত। হাং, অলহাং
 শিতলীবনের সরল অনাড়ম্বরতা।

প্রথম রায়ে জ্যাকের চক্রে ঘুম আসিল
 না। বাড়ীতে তাহার দেই শ্রুতান্তপিত
 জু-উক আলোকোচ্ছল সঙ্গিত ছোট ঘর।
 তাহার কুলনাথ, এত এক অন্ধকারময় ভীষণ
 গল্পের।

বালকের দল শরম করিলে এক কাক্সী
 বালক আসিয়া ককের আলোক লইয়া গেল।
 লগ্নে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু জ্যাকের
 চক্রে নিশ্রা আসিল না।

তুষারায়ত কালের মধ্য বিরাট বেটুজ কীণ
 আলোক আসিতেছিল, তাহারই সাহায্যে
 জ্যাক দেখিল, পাশাপাশি খাটিয়াতে
 কতক শুলা বেন কবলের গুঁটিল পড়িয়া
 রহিয়াছে।

ভাষার মধ্য হইতে নিখাস ও নান্দিকার ধ্বনি এবং কাশির শব্দে জীবনের এক করুণ কাহিনী অভিনয়িত হইয়া উঠিতেছিল।

জ্যাকের ঐশ লগিত্তেছিল—এই অন-
ত্যাগ জীবনের প্রবেশ-বারে সে এক বিচিত্র
কোকুৎস লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দিনের
সটনাঙলা ভাষার স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল।
সরোভার সাগা টাই, হারজের প্রকৃত চন্দ্রা
এবং মশিন লামা, মর্কোপার ‘শব্দের’ গর্জিত
বিষদৃষ্টি—জ্যাকের প্রাণ ত্রাসিত হইয়া উঠিত-
ছিল! মার কাছে ছুটিয়া বাইবার জন্ত
আপটা আকুল হইয়া উঠিল। মা এখন কি
করিতেছে? ঘুরের বাড়িতে এগারোটা
বাঁজিল! মা তখন এখন নিচর খিচুটোরে, না
হয়, বলে! এখনই কিরিয়া আলিখে—
গলার কারের বেইনী, মাথার টুপিতে শেলের
কালর উড়িতেছে!

হাত্রে গুহে ফিরিয়া মা জ্যাকের বিছানার
পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া, ডাকিত; “জ্যাক,
সুমিগেছ ত?” কি মিষ্ট মধুর, সে স্বর!
নিজান্তেও জ্যাক মার উপস্থিত সহজে উপলব্ধি
করিতে পারিত। মার স্পর্শে তাহার দ্বাবা দুটি
ছুটিয়া উঠিত—এবং স্বপ্নপ্রাপ্তিতে মার মহিমা-
ময়ী স্মরণমুষ্টি তাহার চক্ষুর অগোচর
রহিত না। যেন একটা দীপ্ত ত্রৈলোক্য, যেন
বালস্বপ্নের একটা নিম্ন রশ্মিছটা গৃহিয়া
বেড়াইতেছে। যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবী
নামিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এখন?

দিনের বেশা অধ্যাক ও শিককবর্গের
অভিযুক্ত মনোযোগ ও অভ্যর্থনার বাড়ীর
অভাবটা জ্যাককে তত কাতর করিতে
পারে নাই। তাহার উপর নুতন সহচরণের

সহিত বেলা-পুণ্য সময়টুকু বেশই কাটিয়া
গিয়াছিল!

একটা কথা জ্যাকের মনে পড়িল।
রাজপুত্র কোথায়? দাহমির রাজপুত্র? ছুটিতে
কি সে বাড়ী গিয়াছে? রাজপুত্রের সহিত
একবার সাক্ষাৎ হইলে জ্যাক তাহার সহিত
ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিবেই—বন্ধুত্বের স্বর্ণ-
মৃৎলে আপনাকে সে দ্বারা দিবেই। বিছানার
তাই জ্যাক কেবলই ভাবিতেছিল, কোথায়
রাজপুত্র!

সহসা কক্ষ বাটির অপর কক্ষ হইতে তখন
বাত্তের কক্ষর উঠিতেছিল,—লাগান্দান্দর
অর্গিণ বলাইতেছিল—পার্শ্বে অথের
সুরোপিত শব্দে ঘরের বেওলাল অবধি
কাঁপিয়া উঠিতেছিল—জ্যাক শুইয়া তাহাই
শুনিতেন—ক্রমে চারিধার নিশ্চল হইয়া
আসিল।

এমন সময় সেই কাকরি বালক লঠন-
হস্তে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। জ্যাক
মাথা তুলিয়া দেখিতেই, কাকরি বালক
কহিল,—“এক সুমোও মি, তুমি?”

মুগ্ধ নিখাস ফেলিয়া জ্যাক বলিল, “কুম
আসছে না!”

বিজ্ঞের মত সুর করিয়া কাকরি বালক
কহিল, “নিখাস ফেললে অনেকটা হুঃখ কমে
বটে। গরীব লোক যদি এই নিখাসটুকু না
ফেলতে পারত, তা হলে হুঃখে কবে তাদের
বুক ফেটে যেত।”

লঠন রাখিয়া কাকরি বালক জ্যাকের
শয্যার পার্শ্বে একটা কবল বিছাইল—বসিয়া
কহিল, “উঃ, বাহিরে কি তরফর বরফ
পড়ছে!”

জ্যাক কহিল, “তুমি কি এখানে শোবে ?
তুমু কবলের উপর ? চাষের মেই ?”

কাকরি বালক উত্তর দিল, “না—আমি
কাণো মাল্লু, চাষেরের দরকার কি ?”

কথাটা বলিয়া কাকরি বালক মুহু
হাসিল। পরে বৃকের মধ্য হইতে হৃৎক
নির্মিত একটি ছোট কোটা বাহির করিয়া
সমগ্রমে সেটিতে চূষন করিয়া শুইয়া
পড়িল।

জ্যাক কহিল, “বাঃ—সেডেলটা ত তারি
মজার দেখতে !”

কাকরি বালক কহিল, “এ ত সেডেল নয়
—আমার গ্রিট্রি।”

“গ্রিট্রি”র অর্থ জ্যাকের ঠিক বোধগম্য
হইল না। সে ভাবিল, জাগা অগ্নসর
করিবার জন্য এটি বৃষ্টি কোন মন্ত্রশ্রুত
মন্ত্রিলি !

মাত্রলিট বদেপত্যাগ করিবার সময় পিনী
ভারিকা বালকের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছে !
পিনী ভারিকা—বাৎসকে ছাড়িয়া একদন্ত সে
ধাকিতে পারিত না—বে ভারিকা মাতৃহীন
কাকরি বালককে একান্ত মেছে বৃকের মধ্য
পুসিয়া রাখিয়াছিল—এং আবার একদিন
বিজ্ঞা শিবিয়া যে কারিকার কাছে সে করিয়া
ঘাইবে !

জ্যাক কহিল, “আমিও মার কাছে
যাব।”

বৃহত্তর মন্ত্র উত্তরে নিগূহ হইল—
উত্তরেই কারিকার কথা ভাবিতেছিল ! কি
মেহনলা এই নারীট—তিনি এখন কোথায়,
কি করিতেছেন ? প্রবাসী বালকের কুল
মাগিতেছেন ।

জ্যাক বলিল, “তোমার বাড়ী বৃষ্টি বেশ
ভাল দেখে ? সে কতদূর এখাল থেকে ?
সে দেখের নাম কি ?”

কাকরি বালক উত্তর দিল, “নাহি !”

জ্যাক বিছনার উপর উঠিয়া বলিল,
সাক্ষে কহিল, “ও-তামলে—তামলে তুমি
নিম্ভর তাকে জান ! তার সঙ্গেই ফ্রালে
তুমি বৃষ্টি এসেছ ?”

“কার সঙ্গে ?”

“রাজা—নাহিমির রাজপুত্রের সঙ্গে !”

“আমিই ত সে” বলিয়া কাকরি বালক
আবার হাসিল।

জ্যাক বিশ্বরে অভিভূত হইয়া পড়িল !
রাজা ! রাজপুত্র ! বাৎসকে সে সারাদিন মানা
ফরমান খাটিতে দেখিয়াছে, কাটা লইয়া যে
চারিধার পরিভার করিয়াছে, টেবিলে আহার্য
পরিবেশন করিয়াছে, সেট ম্যাদ লাক্
করিয়াছে, সেই কৃত্য—এই কাল কাকরি
বালক—নাহিমির রাজপুত্র ! আশ্চর্য ! কিন্তু
কথাটার তামালাও ত নাই ! বালকের চোখে
মুখে কেমন কোমল একটা ভাব ফুটিয়া
উঠিয়াছিল ! সে বৃষ্টি কোন মূহুর দেশের
পুন্ডর মতীতের মূখের দিনগুলির কথা
ভাবিতেছিল !

জ্যাক বিশ্বরের সহিত কহিল, “সে কি
রকম ?”

কাকরি বালক বলিল, “এই রকম !”
বলিয়াই সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া আলোটা
নিভাইয়া দিল—কহিল, “সারারাত আলো
অগলে কাল মার খেতে হবে আবার।”
তারপর নিজের বিছানা জ্যাকের বিছানার
নিকট টানিয়া বলিল, “তুমি ঘুমোবে

না ? হাহিমির কথা মনে পড়লে আমার
ত ঘুম পায় না—‘আজ আর ঘুম আসবে
না ! হাহিমির গল্প শুনেবে, তুমি ?’

“ভদ্রব !”

সেই নিমন্ত্রণ রাত্রে সুনিবিড় অন্ধকারে
কাকির বাগক তাহার জীবনের বিভিন্ন
কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল—উৎসাহে
তাহার চোখ হইতে যেন একটা আনন্দের
দীপ্তি ঠিকরিয় পড়িতেছিল । শ্রোতার আগ্রহ
আগ্রহে পূর্ণ হইয়াছিল :

বাগকের নাম বাহু । বিখ্যাত গোড়া রাক-
মাই গোবোর সে একমাত্র পুত্র !

রাক-মাই-গোবোর বীরত্বের কথা
চতুর্দিক পরিপূর্ণ । সুবৃহৎ অসংখ্য কামান,
অগণ্য বীরদৈত্য, ভীম-ধনুকাদি নানাবিধ
অস্ত্র-শস্ত্র, সুশিক্ষিত রণবৃত্তী, বাতকর, পুরোহিত,
মর্ত্যকী, দুই শত স্ত্রী—রাক-মাইর বিপুল
ঐশ্বর্যের চূড়ান্ত পরিচায়ক ! উচ্চ প্রাসাদ—
শাপিত বর্ষার সুশিক্ষিত, বিভিন্ন শস্ত্রেরে বসিত,
অসংখ্য মরুতপালে সম্বিত । এই প্রাসাদে
মাইর অক্ষর—হুয়ার কিরণে তখন চারি-
ধার বলমণ করিতেছিল—প্রাসাদ-চূড়ার
শতাকাশেই অধীর পনমে মুহুমুদ চলিতেছিল ।
শৈশবেই মাইর মা তাহাকে ছাড়িয়া গেল
শিশু কারিকা ছোট মাইকে বৃকের মতো
জুলিয়া গইল । মাই যেন মাকে আবার ফিরিয়া
পাইল । কারিকার জ্বরে যেমন মেহ, বাহুতে
তেমনই শক্তি ! হস্ত-পদে তবলকীর মালা
ঐতিহ্য মুক্তকণী কারিকা মক্তকে হরিণের
শুক্লবস্ত্র বহুট লাগাইয়া বখন রণক্ষেত্রে
নামিত, তখন বলবান শত্রুর জ্বরেও প্রাসাদের

সকার হইত । সেই কারিকার আদরে
শাপিত মাই যখন একটু বৃদ্ধ হইল,
তখন তাহার বিভা-শিক্ষার ব্যবস্থাও প্রয়োজন
হইয়া পড়িল । যেন সে সুবিধা নাই—
কাছেই বিশেষে আদিত হইল ।

যেন সে কি সুখেই দিন কাটিত ।
যেন কারিকার সহিত মাই শিক্ষার বাহির
হইত—সে কি নিবিড় জগৎ—গাছের পাতার
কোথাও ফাঁক নাট, কোথাও সূর্য্যকিরণ প্রবেশ
করে না—উপরে আগাগোড়া কে যেন পত্র
রচিত সুবিস্তৃত গোবোর খটাইয়া রাখিয়াছে—
কথা কহিলে প্রতিধ্বনি গভীর স্বরে রণিত
হইয়া উঠে । ফলজলেরও অন্ত নাই—বর্ণ-গন্ধের
কি বিভিন্ন লীলা ! কোথাও পারের কাছ
দিগা দিগ্বীর সাগ সরিয়া বাইতেছে, কখনও
কাহাকে আঘাত করে না ! শাবীর দল নানা-
ছন্দে গান গাহিতেছে, বানরওলা এগাছ-ওগাছ
লাকাইয়া খেড়াইতেছে, জলগাছের ধারে ভ্রমরের
দল গুড়িয়া ফিরিতেছে, কোথাও না সুদীর্ঘ
শুষ্করশ্মি—আকাশের এতটুকু ছায়া তাহার
বক্ষে প্রতিফলিত হয় না, যেন বনদেবীর
সুবৃহৎ দর্পণের মত পৃথিবী রহিয়াছে,—
যন সবুজ রঙের একটা প্রকাণ্ড কাচখণ্ড ।”

জ্যাক বলিল, “হাঃ, বেশ ত !”

“হ্যাঁ, সুন্দর !”

ভাষণর মাতৃ শৈশবের কথা বলিতে
শাপিল—অতিরঞ্জনের দলে কাহিনীটি পত্রের
দেশের কাহিনীর মতই সুন্দর হইয়া
উঠিয়াছিল—গর বলিতে বলিতে মাই
অভীতের দিনগুলি এক নুতন চক্ষে দেখিতে-
ছিল—অন্তর্গত কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে
বাহিরটা যেমন বিভিন্নবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া মনে

হয়, অতীতের স্মৃতিসুখ তেমনই বিচিত্র মধুর
হইয়া উঠিয়াছিল।

দল বাঁধিয়া সকলে শিকারে বাহির হইত।
বনের মধ্যে আগুনানিগের চারিধারে একাধি
অমিত্রুণ জাগিয়া তাহারই মধ্যে বসিয়া চন্দ্র
পত্নী হইতে হইতে সকলে আশ্রয় করিত।
কি সুখ, সে কি আনন্দ! তাই মাত্রকে এ
সব ছাড়িয়া বেদিন জালের সুবিধায় বন-
ফিলের স্থলে আসা হইল, তাহার আগুণটা
সেদিন হাছাকার ক্রিয়া উঠিল! কোথায় সে
স্বাধীনতার সম্পূর্ণ আনন্দ, কোথায়ই বা সরল
সদীর্ঘের সে আত্মরিক উল্লাস-ভীষণকার!

এখানে বাঁধা নিরবে বিছানা ছাড়িয়া
উঠিয়া পড়ন্তনা করিতে হয়! এক লম্বা বসিয়া
পরিমিত আহাত, ত্রমণ, বেলা—হুই দিনেই
অসহ্য হইয়া উঠিল! নেবে মাত্র একদিন
সকলের অভ্যাসে স্থল ছাড়িয়া পলায়ন
করিল।

কিছু খেচার ভাণ্ডা অগ্রসর—তাঁই সে
খা পড়িল। এবার বড়া পাহারা বসিল। সে
নিভা সেই বই খুলিয়া বি, এ—বে, বি আই—
বাঁই করিতে করিতে তাবিত্তে লাগিল, পড়া
চেরে মুকুণ্ড হুঁই তাল! মাত্র নীল আকাশের
দিকে চাহিয়া থাকিত—এই আকাশ কি তাহার
দেহে এমনি! পাখী উড়িয়া বাইতেছে,
দেখিয়া মাত্র ভাবিত পাখীট হইত, দাহমিতে
চলিয়াছে, সে যদি মাত্র না হইয়া পাখী হইত
ত, কতিন দেহের আড়ালে বসিয়া এমন
ভাবে চোখে মরিতে হইত না—কবে সে পিসী
কারিকার কাছে উড়িয়া বাইত!

একদিন সকলে মিলিয়া সমুদ্রের তীরে
জাহাজ দেখিতে গিয়াছিল। জাহাজে উঠিয়া

মাত্র মনে হইতেছিল, একদিন এই স্মৃতি
কলের গাখোটা নিচে বসাইয়া তাহাকে এখানে
পড়িয়া আনিয়াছে—আজ আবার ফিরাইয়া
গইয়া বাইবে না! সকলের চোখ এড়াইয়া সে
জাহাজের খোলে বসিয়া রহিল। তাবপর
জাহাজ যখন বহুবু ভাঙিয়া চলিয়াছে,
তখন জাহাজ কাতর মাত্র মার লুকাইয়া
থাকিতে পারিল না! জাহাজের কাস্টেন
সুবস্বেবের পোতে মাত্রকে আনিয়া
মনফিলের হাতে জুলিয়া দিয়া গেল! বনফিল
তখন আগুনের নিকট রাখা সুবিধায় নহে
তাবিয়া মাত্রকে জ্বলন্ত মরোভার তর্ক
করিয়া গিল।

তখন প্রথম-প্রথম এখানে সে কি আসল,
কি অত্যাধনা! জাহাজের আলর অত্যাধনার
চেরে অনেক বের! রাকপুত্র আসিয়াছে!
চারিধারে একটা ধূম পড়িয়া গেল!
মরোভার সহিত এক টেবিলে বসিয়া
মাত্র আহার করিত, অপরা বালকের
দল লুকাইয়া সহিত চাহিয়া দেখিত! মরোভার
আসাই বলিত, “মাত্র যখন রাজা হবে, তখন
সুদটা বাহমিতে উঠিয়ে নিয়ে যাব, মরোভার
বৃত্তিতে কোন দ্বন্দ্বকষ্ট থাকবে না—মনের
নত করে লেখাপড়া শিখিয়ে দাহমিকে শিক্ষিত
করে তুলব!”

হাস্ত-চিকিৎসানায়ে প্রতিভা খেলাইতে
পারিবে! নৃতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া
পরখের ত এখানে সুবিধা নাই—ঔষধ
খাইয়া কেহ যদি মরিয়া যায় ত পুলিশের
টানাটানিতে প্রাণ বাঁচবার উপক্রম। মাত্র
রাজ্যে সে নিভা নৃতন ঔষধের পরীক্ষা চালা-
ইবে, পুলিশ তখন কিছু করিতে পারিবে না!

লাবার্ণান্স্ দাহমির বর্ষের সূচীতলায়
সমুন্নত করিলে । সকলেই ভবিষ্যতের আশায়
মাঠকে আদর করিত, সম্মান করিত ।
সকলেই আশা করিত। বসিয়া ছিল, মাঠ
একবার রাত্ৰি হইলে হয়—চক্রে পলকে
জুগ যুগিরা দাঁটবে, এখন সেমন হাঙ্গামিগের
প্রতিভার আলোক লোকের অস্তর ঘেঁষে
তবে প্রজ্ঞার আছে, তখন অমূল্য পবনে
সে তখন রশি উড়াইয়া ছুড়াইয়া কি ভীত
ভেজে প্রতিভার অনল অগ্নি উঠিলে । এমন
সময় একদিন লাবাদ আশিল, আশাশিরা দাহমি
অধিকার করিয়াছে, মাহুঙ্গণ পিতা বুকে প্রাণ

দিয়াছে, পিনী কারিকা নিকছিটা—ভুলোক-
মুণে পিনী একটা সংবাদ পাঠাইয়াছিল, মাঠ
যেন মাহুঙ্গণিটি সংকেত রক্ষা করে, তাহারই
মাঠাঘো মঠে গাছা আগর ফিরিয়া পাইবে,
বৈবজের দল এ কথাটা বিশেষ করিয়াই
বিস্ময় দিয়াছে !

এ সংবাদে পর মাহুঙ্গণ আদর একটু
কমিলেও তেনন কিছু অমূল্য হইল না।
কিন্তু গণন এক বৎসর দুই বৎসর,—কেহ মাহুঙ্গ
হইয়া অর্থ বিল না, তখন ক্রমের ভুতাটিকে
ভাড়াইয়া দেওয়া হইল—ভুতাচার ব্যয়-নির্ভাট
করা রীতিমত কর্তন হইয়া পড়িয়াছিল—

এখন ভুতাচার স্থান
অধিকার করিল, মাহুঙ্গণ
মাঠ ! মাহুঙ্গ একবারে
বিদায় দেওয়া হইল না
—কারণ “মাহুঙ্গণ এগনে
পড়িতেছে” বলিয়া তাগ
হইলে বিজ্ঞাপন দেওয়া
যায় না ত !

মাহুঙ্গ একপমানে মাহু
দিল না । নানা ভাবে সে
ভুতাটিকে লাগিল, যে এতটা
চীনতা সে সহ্য করবে
না !—কিন্তু যেতর ব্যয়
নিত্য অক্ষয়িত হইয়া
একদিন সে বংশে
নাশিয়া পড়িল ! কোথায়
রহিল, তখন অত আদর,
অত মন !

এখন তোরে উঠিয়া
মাহুঙ্গ বাজার করিতে



যাত্রা, যত্র পরিহার্য কথ্যে, অর্থব্যতীতঃ ও পাচ-
কের কাছ তাহারে ধারণাই সাধিয়া লওয়া হয় ।

হার কারিকা—শিশী কাবিকা—কোথায়,
তুমি ? তোমার কত সাপেক্ষ, কত আদরের
মাহু—আজ তুচ্ছ হইয়া দিন কাটাইতেছে ।
একবার যদি সে রাধা ক্লিষ্টহিয়া পাণ্ডিত, মনের
থত কিছু আকোশ—কিন্তু না, গুণ মিষ্টকথার
আবর-অভ্যর্থনার সহিত জিন্দগীর দলকে সে
দাহমিতে গইয়া যায় ! তার পর এই মন্তোস্তা
হাস্তব্ধের দলকে জীবন্ত মটিতে পুঁতিয়া লণের
প্রাণে নিক্ষেপ করে, !

দারুণ অশমনে থাকিয়া থাকিয়া মাহু
বুঝানো সেন জগিয়া উঠে ! এই আন্তনে
মন্তোস্তার দলকে যদি সে পুড়াইয়া মারিতে
পারে, তবেই মনের কাগ্ন মিটে, চূড়ান্ত
প্রতিশোধ লওয়া হয়. ভগবান কি সে দিন
দিবেন না ?

মাহু চোখ দুইটা খাখের মত অলিতেছিল ।

জ্যাকের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল ! মাহু কাহিনী
শুনিয়া তাহার হৃৎক হইতেছিল—আহা, রাজ-
পুর মাত—আজ সামন্ত চাকরের মত লৈ
খাটিয়া সারা হইতেছে !

মাহু কহিল, “তোমার মা বেশ বড় লোক,
না ? অনেক টাকা আছে, ঠায় ?” জ্যাক
কহিল, “হ্যাঁ !”

মাহু কহিল, “তাই এম্মা তোমাকে এত
আদর করছে ! টাকা না থাকলে এম্মা বড়
অত্যাচার করে ! দেখছ ত, আমাকে !”

জ্যাক কিছু বলিল না । তখন দুই নৃতন
বন্ধুতে মিলিয়া গয় করিতে করিতে কখন যে
দুহাটয়া পড়িল, তাহা কেহই জানিতে পারিল
না । স্বপ্নের ঘোরে জ্যাকের মুখে হাসি
ফুটিয়া উঠিল । সে যন্ত্র সেপিতেছিল, যেন সে
মাহুকে লইয়া মার কাছে ফিরিয়া গিয়াছে,
মাহুকেও মা কত আদর করিতেছে !

(ক্রমশঃ)

ত্রিগৌরীজ্ঞানোদয় সুখোপাখ্যায় ।

মৃত্যুর পরেও আণবিক জীবন ।

একদিন কানিসার ঘরিলেই সব সুসাইল, আশা
বরণা সব দূর হইল । আজ বিদ্যাবর্ধিত বিশে
লতালী আশাবের সে চিহ্নাপন্ন বিখ্যাত বিজ্ঞানের
কুঠুমখাতে নির্মূল করিতে দিগাহে । একদিন মর্দ-
বের্ত্তৈ বৈদ্যবিক্রম বলিতেন যে, যে মূর্খের জগৎপতির
সামান্য গুণ হইয়া গেল, সেই মূর্খের হইতেই জীবের
মৃত্যু । সেই মূর্খের হইতে জীবনের কার্যকরী শক্তির
বিলোপ হইয়া ঐ বৈদ্য লক্ষ্যেতে মিলিতে আরম্ভ হয় ।
এখন শুনিবের্ত্তৈ আর এক ভদ্রত কথা । জগৎপিত
বিস্তৃত হইয়া গেল, বদনোক্ত শোণিত প্রবাহ
একবারে কণ হইয়া গেল, আদি মরিসান—নিজ
আবার সূক্ষ্ম পরীক্ষা মাঝ তখনো যেরে নাট ।

বৈদ্য মাঝ বলিতেছে “আবার পড়িতে দিত না,
বাহু জীবাত্মর আক্রমণ থেকে আবার রক্ষা কর,
উপযুক্ত বাহু বাও—আদি মরিস না ; মরিস না ।”
এ আবার কি ? তবে কি যখন ভ্রাতার জীবন
মিষ্টা দেয়, বাহু করিবার এক লোক ইত্যন্তঃ দুটা-
দুটা করিতে লাগিল, দুই একজন যন্ত্র উত্তঃবের
কেছ না মীর্ষে কাবিত লাগিল—তখন জীবের
পরীক্ষা অন্যত হইয়া পড়িয়া বসে যেমিতে থাকে ?
মার্কিনের দুইজন ব্যক্তনামা অধ্যাপক, ক্যাডেল ও
ব্রোডক, অনেক পরীক্ষার পর মাঝ এইজনই সাব্যস্ত
করিয়াছেন ।

প্রত্যাহ দুইজনকার জীবনের কথা বলিল । এখন,

যাঙ্গ সাধারণ জীবাণু জীবন, বাহার বলে যেহীত কার্য করিবার ক্ষমতা থাকে তাহা লইয়া যাহা অগত্যা চলিতেছে । দ্বিতীয়, এক অজ্ঞেয় জীবন (latent life) সকল বেহতত্বের ও সাংসর্গিকতাই এই জীবন আছে । এমনটির বহু তত্ত্ব সকল সম্বন্ধে বেহতত্ব অস্বীকৃত হইয়া কার্য করে, এবং দ্বিতীয়, অজ্ঞেয় জীবনের মতন এই তত্ত্ব সকল নিম্ন সত্তা বহুত্যাগিণী ব্যতিরিক্ত থাকে এবং স্বাধায়ে বর্ধিত হয় । এই অজ্ঞেয় জীবনেই এতদিন অজ্ঞেয় ছিল, আশা নাড়ি হ্রস্ব হইলেই স্মরণ্য । এখন জানিলাম যে যাহা জীবন পূর্ণ হইলেও বেহতত্বের এই অজ্ঞেয় জীবন অনেককাল থাকে ।

যাহুর বহুত্ব সর্বদা অনেক অকার্য জীবাণু (bacteria) ভাঙ্গিয়া বেড়ায় । ইহাদের অপর্যবসিত ক্ষুর যে অসুখীকরণ ব্যস্তের দ্বারা বহু পতন বর্ধিতাশ্রয় হইলে তৎবে উহার দৃষ্টিগোচর হয় । ইহাদের আকৃতিও যেনন বিভিন্ন, ক্রিয়াও তেমনই বিভিন্ন । যাহুত্ব এক কতকালের জীবাণু আছে তাহা আবিষ্কারে নিঃসন্দেহ নির্ভরিত হয় নাই । ইহাদের সকলেরই বংশবৃদ্ধি আর এক জাতীয় হইয়া থাকে । উপযুক্ত বাহ্যিক মধ্যে একটি জীবাণু ছাড়াই নিম্নে অতি মল সম্বন্ধে যাহা উচ্চ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে । পরে উহার পীত পানীয় বীরে বীরে ছই লম্বা তাবে বিভক্ত হইয়া ছইটি ক্ষুর জীবাণু সৃষ্টি হয় । এই ছইটি ছইতে উচ্চ জাতীয় বংশ অতি দীর্ঘ ছই ছইটি করিয়া অসংখ্য জীবাণু উৎপাদিত হইয়া থাকে । এইরূপ বৃদ্ধির লক্ষ অতি মল সম্বন্ধেই লক্ষ্য । এক একটি জীবাণু বহুদিন বাঁচিয়া থাকে । ছই সমস্ত বংশের ইন্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এক “মাতা”র মধ্যে সেই সময়ের জীবাণু জীবিত-বাহার পাতলা পিরায়ে । অসংখ্য বাহ্যিকভাবে উহার বৃত্তবৎ নিষ্কটে থাকে কিন্তু এর বিপুল উপযুক্ত রূপ পাইলে তাহাতেই জীবনযোগে বর্ধিত হয় । একটি সৃষ্টিকার অগ্রভাগে যতটুকু অসুখীকরণ দ্রুতিতে পারে সেইটুকুই অসুখীকরণ যোগে ৮০ কোটি পর্যন্ত জীবাণুর অবস্থিত দেখা পিরায়ে ।

এই জীবাণু সুলভ্য ছই বলে বিস্তৃত । এক স্রেণীর জীবাণু যোগাযোগিক—সংখ্যা বিপুলত্ব, বংশবৃদ্ধি,

সাংসর্গিক্য প্রভৃতি যোগের বীজাণু । যাহুর অসংখ্য যে কোন আশ্রয় বেহেই উহাদের ক্রিয়া সন্নিবেশ লক্ষিত হয় । আশ্রয় জীবনের বা উদ্ভিদে উহাদের কোনরূপ বিশেষ আশ্রয়তা নাই । আর সমস্ত ব্যাধিই এই জীবাণুর দ্বারা আশ্রিত হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ সংক্রমক রোগ । এই জীবাণু আশ্রয় পত্রীতে প্রবর্তিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং সেই রক্ত প্রবাহের দ্বারা জনিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভৃতি আক্রান্ত-রোগ বহু সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া উহাদের বিস্তৃতি সম্পাদন করে, যেরূপ রোগের লক্ষণ একত্র পায় । বেহতর রক্তই উহাদের বাসা, কিন্তু ছই এক জাতীয় জীবাণু আছে তাহারা পাকস্থলী ও অন্তের মধ্যেই বর্ধিত হয় ও অনিষ্ট করে । বৈদ্যিক্য এই আক্রান্ত রোগে । ওলাউটার সাহচর্যে বায়ু প্রাণিত হয় না—উহার বীর উৎপন্ন না প্রবেশ করিলে রোগ হইবার আশঙ্কা নাই । বহুত্ব প্রভৃতি অজ্ঞাত সংক্রমক ব্যাধির বীজাণু বায়ু দূষিত করে—নিঃসারের সহিত পত্রীরের মধ্যে পিরা রক্তের বর্ধিত মিলে । বহুত্বের মধ্যে, জনগণে ও তাৎপর্য রক্ষাযানের মধ্যে উহাদের জীবন বংশবৃদ্ধি হইয়া বহুত্ব সমস্ত রক্ত দূষিত করিয়া ফেলে । জীবাণু পত্রীর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই রোগ প্রকাশিত হয় না ; উহাদের অনিষ্টকারিতা কতকটা নিবারণ করিবার লক্ষ আশ্রয়ের প্রকৃতিগত একটি বস্তুই হইয়া থাকে । বাহ্যিক জীবাণুসংখ্যা বর্ধিত হইয়া থাকে, রক্ত অগত্যা সেই চেষ্টাই করে । অনবশেষে যখন রক্ত দূর্ণ হইয়া পড়ে তখনই এই রোগ প্রকাশিত । অনেক দূষিত বায়ুর মধ্যে থাকিয়াও বেশ স্থায় থাকেন ইহার কারণ তাহাদের “রক্তের কোর” বেশি—জীবাণুর বৃদ্ধি সময়ে ছইতে বেশি না । জীবাণুর মধ্যে অবশ্যকাল ছইতে উহা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বহন করিয়া এবং সমস্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যোগের প্রকাশ পাইতে সাধারণতঃ যে সময় লাগে তাহাকে Period of incubation বলা হয় । এই সময়ের মধ্যে যদি উপযুক্ত নিবারণ্য চিকিৎসক জীবাণুর আক্রমণ বৃদ্ধিতে পারেন, তাহা হইলে রোগ নিবারণ (Prophylactic) ঔষধাবির সাহায্যে উহার

বংশবৃদ্ধি বিবারণে রোগের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ চিকিৎসক বিরল। এই ক্ষেত্রীয় জীবাণুকে রোগোৎপাদক (pathogenic) কহে।

অপর ক্ষেত্রীয় জীবাণু যেহেতু উপর কোন অন্তর্য বিচার করে না। উহারা রোগোৎপাদক নহে— কেবল পচন-প্রবর্তক (ferment) মাত্র। হুহ মাসোবি প্রাণিক এবং উদ্ভিদ মল ইত্যাদি পচনশীল বস্তুতে উহারা সম্বিক পুট হইয়া ঐ সকল বস্তু গঢ়াইয়া ফেলে। পর্বরা বস্তুবস্ত মানক মতে, কিন্তু yeast নামক একপ্রকার জীবাণু দ্বারা উহা হইতে সুরা উৎপন্ন হয়। ঐ জীবাণু পর্বরা দ্বারা এবং উপর দ্বারা ঐ পর্বরকে দুইটি বিভিন্ন বস্তুতে বিভক্তি করে। একটি অক্সিজেন অনিল (Carbon dioxide gas) ও অপরটি সুরাদায় alcohol এই বিচ্ছেদনই ঐ জীবাণুর জীবনী দ্বারা। উহারা এই রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা ই কোবিত থাকে ও বর্ধিত হয়। গাছের ডালের মনে (তাদি) ঐ জীবাণু প্রচুর আছে; মধা বা স্থানিক খেউলা (starch) নামক এক খৌদিক পদার্থ আছে, উহা পর্বরা জাতীয় বস্তু এবং উহাও ঐ জীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঐ দুই ভাবে বিভক্তি হয়। পানকটীতে জাড়ি মিলাইবার কারণ এই যে তাপ সাহায্যে ঐ অক্সিজেন সম্বিক বর্ধিত্যন্তন হইয়া কুটি দাঁড়াইয়া তোলে। মনে মনে সুরাদায় ঐ বর্ধিতে থাকে কিন্তু যান হইলে অথবা শুক পায় তাহা হইলে ঐ সুরাদায় বাষ্পীভূত হইয়া যায়। টাটকা পানকটী না ভাঙিয়া খাওয়া উচিত নহে। উহাতে ঐ জীবাণু বোঝায়ে থাকে—হুহ অনেক জীবাণু বিচিরাৎ থাকে, কিন্তু তাহাতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই কারণ ঐ জীবাণু যাবৎ শরীরে কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না। পর্বরার এই ভগ্নপ্রবর্তকে Alcoholic Fermentation বা সুরা-পচন বলা বাইতে পারে।

একশ্রেণে অপর এক জাতীয় জীবাণু হুহ আশঙ্ক করিয়া থাকে। হুহকে ল্যাকটিক্ অয়ে পরিণত করে যদিও ঐ দ্বারা নাম Lactic Fermentation হুহদানী পচন দ্বারা। নিম্নরূপ এইরূপ পচন

ক্রিয়ার বল। উহাকে Acetic Fermentation কহে। সকলের জীবাণু বিভিন্ন। আর সমস্ত প্রাণিক ও উদ্ভিদ পদার্থই কোন না কোন জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়া যায়। উপস্থিত দ্বারা ও তাপ আবর্তক। বেনী উত্তাপে জীবাণু বহিরা যায় সুতরাং পচনও নিবাহিত হয়। এবং শৈত্যেও জীবাণু বিনষ্ট হয়। সাধারণতঃ বহু ও দুট জন্মে উত্তাপে আর সমস্ত জীবাণু মলে হইয়া থাকে।

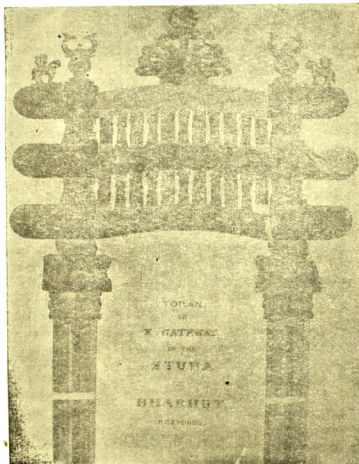
যদি কোন মদ পচনের বস্তু একপাত্রে রাখা যায় যে উহাতে বসন্ত কোনরূপ জীবাণু প্রবেশলাভ না করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ বস্তু বহন অনিষ্টক থাকিতে পারে। যখন উত্তপ্ত করিয়া এবং ঐ বস্তু জীবাণু নষ্ট করিয়া পরে জীবাণুনাশকারী কোন তরল বা অনিল পদার্থে রাখা হয়। লবণ ও লবণভেল উৎকৃষ্ট জীবাণুনাশক। "সোনা বাছ" তেলের আচার পদ্ধতি ইহার প্রমাণ। আইওডোফর্ম, কপূর, ইত্যাদি কঠিন—কার্বলিক এসিড, সিরোফোট প্রভৃতি তরল—আর পক্ষাকার, ক্রোমি প্রভৃতি অনিলও ঐ পদার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বায়ু নিকাশন যন্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে বায়ু বাহির করিয়া ফেলিলে জীবাণু নষ্ট হইয়া থাকে। জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপে পানকট বস্তুরাও ঐ মল প্রভৃতি অনেক বস্তু বহন হইতে বহন দ্বারা আনীত ও রক্ষিত হয়।

একশ্রেণে আবার অখাপক বস্তু কিরূপে প্রভুত ভাষা আবিষ্কার করিয়াছেন বুঝা বাইবে। মসোভাত জীবনের ত্রিভি ত্রি প্রবেশ আশ্চর্য্য লইয়া তাহা কোন বিশিষ্ট ভগ্নপ্রবর্ত তরল পদার্থে জীবাণু রাখিয়া তাহা কিছুদিন কোন পরিবর্তন বোধিতে পাইলেম না, পরে দেখা গেল যে ঐ অংশগুলি সর্বত্র বর্ধিত হইতেছে। প্রাণীর দেহে পুষ্কোভ (cell) গুলি যেমন ক্রম বিভক্ত হইয়া একটি হইতে বহুসংখ্যক স্তন পুষ্ক কোষের সৃষ্টি করে ও সেই সেই কোষ যেমন বাড়িতে থাকে, উপস্থিত আবার, উপস্থিত উত্তাপে যথোপযুক্ত পুষ্টিকর বস্তু দ্বারা রাখিয়া বহিঃ জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলে

ভারতীয় স্থানীয়; এখানেই বহুতল গুড়ি
মাইল। ভারতীয় স্থানের রাস্তার অপর্যন্ত। ইহার
প্রাচীন নাম বহুতল।

এক লক্ষ ১৫০০ রাস্তার মধ্যে

স্বতন্ত্রতা নথ্য ছিল। বিউটেন্সিও গভর্ণমেন্ট
বিশ্বের এক লক্ষ মাইল স্থানীয়। ভার-
তীয়ের স্থানে স্থানে, বিশ্বের শিল্পশিল্প, ভারতীয়,
ও দ্বারা প্রাপ্য স্থানে; ভারতীয় মধ্যে কতকগুলি



আমি যেই লক্ষ বহুতল গুড়ি। কতকগুলি,
ইহা অপর্যন্ত প্রাচীনতর স্থানীয় মনে হয়; অতএব
স্থানটি যে অতি পুরাতন সে সন্দেহ কোন ভুল নাই।

অপর্যন্ত লক্ষ একটা। প্রাচীন উপস্থানীয় বহুতল
ভিল্লা, রূপনাথ, ভারতীয়, ও কোণারী লক্ষ বিস্তৃত
ছিল। স্থানীয় বহুতল একটা লক্ষ প্রাচীন, ও আম

৩৫ বর্ষ, [বিত্ত] মংগল।

চরন—আচীন নগর প্রকৃতি।

একটি শাখা পাটনাপুর অবধি বিস্তৃত এই
আদিত্য সুর্য্যের পশ্চিম দিকের দক্ষিণে
সুন্দরোত্তর ছিল। এটি পথের উপর ৫১ নং



কঃহাটে স্থাপন দেবমূর্তি।

অবশ্যই আছে। কিন্তু ভাষ্কর্যের মস্তিষ্ক সত্য
বস্তুকাল পর্যন্ত কেহ জানিত না। অমর বিন সত্য
উৎস পরিচয় পাইয়া গিয়াছে।

ভাষ্কর্যে একতর আচীন ইতিহাস পাওয়া এক-
কণ অসম্ভব। আদি বঙ্গের পূর্বাধিক ইহার
সামান্য লোক চক্ষুর অধোভায়ে—একটি স্থিতি



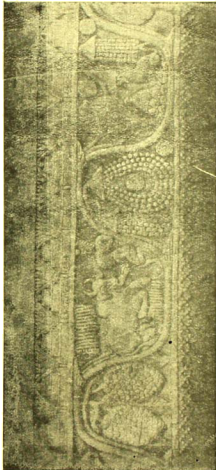
ଭାରତୀୟ ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି-ସ୍ତମ୍ଭ ।

ହିନ୍ଦୁ ମତରେ ଓ ଶକ୍ତିପ୍ରାୟ ଶକ୍ତିପ୍ରାୟ ପାତ୍ରା ପାତ୍ରା ପାତ୍ରା,
ତଥା ଶକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି । ଶକ୍ତି
ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି

ଆମେ । ଆମେ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି
ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି

ଏହି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି

হুগুয়ে, পুন্ডর, খোদিত মূর্তি ও অস্ত্রাস্ত্র বৃত্তান্তাদী
বিজ্ঞানসম্মত আছে। অনেকগুলি স্থানীয় চহর, সাতীয়া,
ইন্দোরা প্রভৃতি গ্রাম করিমার প্রস্তুত প্রস্তুত বৈদিক,
এমন কি হরকম্বের বহাদি কাতিয়ার মন্ত্র ব্যবহৃত
হুগুয়ে প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিস্মরণীয় বর্ণনায় আছে।



ভাংহাটে স্থানে স্মৃতিস্মরণীয় প্রমাণ।

কিছু কালের পর ভাংহাটে স্মৃতি স্মরণীয় একটা প্রমাণকে
আমাদের দেখানো হয়, তখন হইতে স্মৃতিস্মরণীয় হয়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মেমোরেল কনিংহাম সাহেবের রাজ্য
নিয়ন্ত্রণের কালে পুন্ডর প্রাচীন ভাংহাটের অস্তিত্বের
পর্যায় স্মৃতিস্মরণীয় দেখানো গিয়া গিয়া দেখিলেন,
ভাংহাটে বিশেষ সুখিত ও বিস্তৃত হইলেন। আর।
এই বিশেষ পরিবর্তনের স্মৃতিস্মরণীয় একটি প্রমাণ। ভাংহাট
স্মৃতিস্মরণীয় প্রমাণ।

পরীক্ষার পর তিনি জানিতে পারিলেন, যে
সেখানে একটা পুরাতন স্থাপত্য বিদ্যমান ছিল। দুই
দিনব্যাপী তিনি এই স্থানের পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ ঘনন
করাইয়াছিলেন। পরনের পর অনেক মূর্তি অনেক
উৎকর্ষ শিলাখণ্ড, প্রস্তর ও ভোম্বাখার কালাবর্ণের
বৈদিক শিল্প। শিল্প ভাংহাট খোদিত, কত পুত
শিলাখণ্ড, অনেক প্রস্তর, প্রস্তর, অমূল্যমূল্য,
বিশ্বকর্ষ স্মৃতিস্মরণীয় ভোম্বাখার প্রস্তর, পুত,
পুত, তখন স্থানে স্থাপত্যের প্রস্তর, পুত, পুত, পুত,
পুত পুত প্রস্তর, এবং পুতের পুতের প্রস্তর প্রস্তর
বহু মূর্তি খোদিত প্রস্তর প্রস্তর প্রস্তর। এই
মূর্তি দেখিলে মৌল্যবর্ণ স্মৃতিস্মরণীয় প্রস্তর
স্মৃতিস্মরণীয় প্রস্তর প্রস্তর।

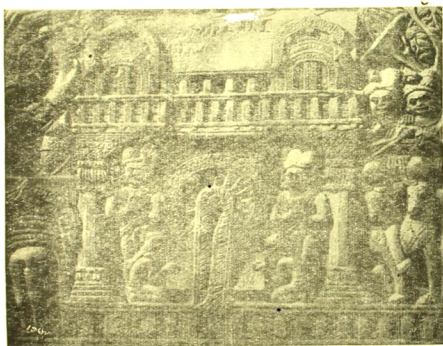
পরের পর সিদ্ধান্ত হইল, যে ইহার স্থান ৩০
ফুট, ও প্রস্থ ২০ ফুট। মৌল্যবর্ণের স্মৃতিস্মরণীয়
কাগজ মূল্য মূর্তিও প্রস্তর ও প্রস্তর মূল্যের উপর
খোদিত আছে। পরনের পর অনেক মূর্তি, মৌল্যবর্ণ
মৌল্যবর্ণ, মৌল্যবর্ণ ও মৌল্যবর্ণের বিভিন্ন মৌল্যবর্ণ
অন্যত মৌল্যবর্ণ প্রস্তর প্রস্তর। কনিংহাম সাহেব
এই সকল কথা কলিকাতার পাঠাইয়া দেন, ইহা
এখন মৌল্যবর্ণের মৌল্যবর্ণ সম্পাদন করিতেছে।

আতীত শিলাখণ্ড ও মৌল্যবর্ণ হইতে কনিংহাম
সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ভাংহাটের
স্থাপত্য প্রস্তর ২০০ বৎসরের পুরাতন।
তিনি এ মৌল্যবর্ণ এক মৌল্যবর্ণ প্রস্তর প্রস্তর করিয়া
প্রস্তর। প্রস্তর প্রস্তর ভাংহাটের নিকট প্রস্তর
প্রস্তর প্রস্তর প্রস্তর প্রস্তর প্রস্তর প্রস্তর
অমূল্য মৌল্যবর্ণ ভাংহাটের প্রস্তর প্রস্তর

অবস্থিত। এখানে অনেক পুরাতন সূত্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহার আতীততা প্রমাণিত হইতেছে। কয়েক রাজ্য ধনত্বের একখানি লিপি ভারতীয় স্তূপের এক ভোগের উপর খোদিত আছে। এই রাজ্য ২৪০ খ্রীস্টাব্দে রাজ্য করিয়া ছিলেন।

অতএব ভারতীয়ের স্তূপ ২১০০ কিম্বা ২২০০ বৎসরের আতীত বলিয়া যথেষ্ট। ধনত্বের বাসার

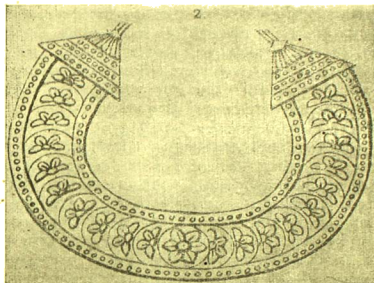
খোদিত লিপি ছিল ভারতীয় স্তূপের ভগ্নাংশটি প্রস্তরের উপর লেখিত বৌদ্ধধর্মের লিপি পাণ্ডি তাহা খোদিত খোদিত পাওয়া যায়। স্তূপের যে অংশে যিনি নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে নির্মাণ কর্তার নাম আছে। এবং যে সকল ব্যক্তি দেবদানে দিয়াছেন, তাহারা সকলেই আপন আপন স্তূপের উপর লিখিত কিংবা না কিছু মন্তব্য স্তূপ পাঠে খোদিত করিয়া আসিয়াছেন।



ভারতীয় যে কেবল একটি স্তূপের ছিল, তাহা নহে,—অনেক বিহারও ছিল। সমস্তই সুবিপ্লবিত ও বাণিজ্যপ্রধান ছিল। বৎ সমস্ত অট্টালিকা উহার খোদিত স্মৃতিস্মরণ করিত। অনেক ধর্মী অভিজাতবর্গ

এখানে বাস করিতেন। ইহার চতুর্পাশে একাত্ত লম্বা ভগ্নাট্টালিকাসকল এখানে ইহার আতীত বৈভব স্মরণ করাইয়া দেয়। এক সময় ইহা অল্প পতাকা বন্ধ লইয়া ভারতে পৌর্য জয়ভক্তি

ফরাসীরা—হায় এখন তারা শুধু খস। কালের অগতির বৃত্তিটুকু একে লইয়া ছুঁত তারিখটি
ফরাসীরা এখনও বসন্তের মতো ফেরে ফেরে টুকিটাকি আছে।
ঐক্যের চট্টোপাধ্যায়।



৩৪ খান্ডে পোড়িত আদীন কল্লুয়ন চিত্র।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

• প্রথম অধ্যায়।

ফরাসী সম্রাট লুইস পঞ্চদশ লুইস গোল্ডফ্রাইড লুইস-গোল্ডফ্রাইড মেরি অসম্মেনেভের পাণ্ডিত্য
গমন কালে তাঁহার পুত্র জীবিত না থাকায় লুইস-গোল্ডফ্রাইড মেরি অসম্মেনেভের অপূর্ণ রূপ
তাঁহার পুত্র যোড়ন লুই নাম ধারণ পূর্বক লুইস-গোল্ডফ্রাইড মেরি অসম্মেনেভের অপূর্ণ রূপ
১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। লুইস-গোল্ডফ্রাইড মেরি অসম্মেনেভের অপূর্ণ রূপ
ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি জার্মান লুইস-গোল্ডফ্রাইড মেরি অসম্মেনেভের অপূর্ণ রূপ
বসিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (১) কিন্তু দুর্ভাগ্য-

(১) "I saw her just above the horizon, decorating and cheering the elevated Sphere She had just begun to move in, glittering like the morning star, full of life and splendor and joy" Burke's Reflections on the French Revolution.

ক্রমে ইনি বিপুল ধনানী রাখার অসীমতা
হইয়া ফরাসী জাতিকে ভিন্ন দেশের লোক
জ্ঞানে অগ্রসর করিতে লাগিলেন । তাহাদের
চীতি, নীতি, প্রথা পদ্ধতি তাঁহার সর্বাঙ্গ দ্বারা
অথবা বৃথা উপাদান করিল । (২) তিনি
ফরাসী জাতির নব অক্লান্ত জাতীয় জীবনের
এতি সঙ্গীতজ্ঞতা প্রদর্শন না করিয়া বরং
তাহাদের উন্নতি যোগের কণ্টক হইয়া দাঁড়াই-
লেন । কতিপয় অগ্রগৃহীতজন মনসা
ন্যস্তির অদার দৃষ্টি গ্রহণে তিনি গুরুলভিত
নৃপতিতে করতলগ্রস্ত করিয়া রাজনৈতিক
সর্ববিধে হস্তার্পণ করিতে আরম্ভ করিলেন ।
যোড়ন লুই যথেষ্টতার নীতিপরাগ
হইলেও প্রজাপতির অহিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন
না । তিনি অল্প ফরাসী জাতির স্বাধীন
শাসনশালনা পরিচালিত করিতে অনিচ্ছুক
হইলেও তাহাদের প্রাথমিক পরিমাণে
বিস্তারিত করিতে অস্বীকারী ছিলেন । কিন্তু
রাজ্যের প্রয়োজনীয় তাঁহার সর্ব বস্তুই বিকল
হইল; রাজ্যের এতি প্রজাবর্গের বিষয়
কমণ; বনোন্মুক্ত হইতে লাগিল ।

গোড়ন লুই রাজত্বদে প্রতিষ্ঠিত হইলে,
যেখানে প্রধান মন্ত্রী এবং টার্মিট রাজত্ব
সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । যেরূপ
এবান মন্ত্রীপদের সম্পূর্ণ অধ্বাযোগী হইলেও,
টার্মিটের অধ্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরতা
নিবন্ধন রাজকাৰ্য্য অচলকল্পে পরিচালিত
হইতে লাগিল । টার্মিট রাজত্ব সচিবপদে
প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন যে আর অণেক
৪..... পাট ও পরিমাণে ব্যয় অধিক,
অন্তরঃ অচিরে তৎপক্ষে উপায় উদ্ভাবন

করিতে না পারিলে রাজ্যের রাজত্ব ও
প্রতিপত্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ।
রাজত্ব বিভাগে উন্নত শোচনীয় অবস্থা ঘটিলে
বহুদলীয় মন্ত্রীপদেরও অকল্প উপস্থিত হয় ;
কিন্তু টার্মিট রাজত্বের প্রাধান্যের
শিরে পুনর্বার প্রত্যাহার অর্পণ না করিয়া
মিতমারিতা অবলম্বনে রাজত্ব বিভাগে
শৃঙ্খলতা সংস্থাপন করিলেন । চূড়ান্তক্রমে
তিনি রাজত্বসচিব পদে দীর্ঘকাল স্থায়ী
হইতে পারিলেন না । রাজত্ব সংস্কার
কয়েকটি সু-প্রথা নিবারণে প্রায়শী হইয়া
তিনি পানিয়ারেটে, তুইমারী ও মন্ত্রণালয়পদের
কোপানলে পতিত হইলেন । অতঃপর রাজ্য
তাঁহাকে কৰ্ম হইতে অবসর প্রদান করিতে
বাধ্য হইলেন । (১৭৭৩ খৃঃ এপ্রিল)
টার্মিটের বলে ক্যালনি রাজত্বসচিবপদে
নিযুক্ত হইলেন ; কিন্তু ক্যালনির অনভিজ্ঞতা
প্রযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর
মেকোরের হস্তে রাজত্বসংস্কার সমগ্র ভার
অর্পিত হইল ।

মেকোর টার্মিটের প্রাথমিক নীতিপরাগ
ছিল । রাজনীতি অর্থনীতি ও দর্শন
শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অস্বীকার্য ।
তত্ত্বাচরিত্রবানপুরুষ সংসারে অতি বিদগ্ধ ।
তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনে শান্তি ও পবিত্রতা
নিরন্তর লক্ষ্যবিশেষ ছিল । ধর্ম বিধীন
ফরাসী রাজ্যে বাস করিয়াও তাঁহার ধর্ম
বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ভাবে বিস্তারিত ছিল । বাণি-
জ্যের সাহায্যে তিনি অপর্যাপ্ত ধন উপার্জন
করিয়া ধনী সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া-
ছিলেন, বিনোদন দরিত্র্যব্যক্তিগণকে সুস্থহস্তে

ধান করিয়া তিনি সেই ধনের সম্ভাব্যহার
করিতেন। ফরাসী জাতির জাতীয় উন্নতির
এতি জীহার আর্থিক সহায়ত্ব ছিল ;
তিনি সেই জাতীয় জীবনের পক্ষে যত্ন
কল্পে পরিশ্রমিক স্বরূপ কপর্দক গ্রহণ না
করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে রাজস্বসংক্রান্ত তত্ত্ব
কাণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। (১)

দটোনা ক্রমে এই সময়ে আন্তঃমহাদেশীয়
স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া ইংলণ্ডের সহিত
জুখুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে ফরাসী
জাতি আমেরিকাবাসীগণকে সাহায্য প্রদানের
নিমিত্ত নিরতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতে
লাগিল। ফরাসি-গবর্ণমেণ্ট মার্কিন জাতির
সাহায্যার্থে নৈক অর্থ ও রণতরী প্রেরণ
করেন এই ইচ্ছা দেশের সকল সাধারণের
জননে আগ্রহিত হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজস্ব-
সচিব মহামতি নেকার দেখিলেন যে,
মার্কিন জাতির সাহায্য কল্পে অর্থ সহজে
ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে
বিপুল অর্থের প্রয়োজন ; অর্থহীন ফরাসি-
রাজ কিপ্রকারে সেই অর্থ সংগ্রহ করিবে ?
যুদ্ধের ব্যয় বিপ্লব করিবেন ? এইরূপ চিন্তা
করিয়া সম্রাটর আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান
করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু
ফরাসী জাতি তাহাতে পরিতুষ্ট হইল না।
ফ্রান্স নিশিপ্র থাকিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত
মার্কিন জাতির পরাক্রম দৃষ্টি করিবে এট
চিন্তার সর্বসম্পাদায় উন্নত হইয়া উঠিল।
জাতির রাজ্যের এক ঐক্য হইতে অপর

প্রাক্ত পথান্ত পোষিতর আন্দোলন উপস্থিত
হইল। জুখারোগের ও দৈনিক বিভাগস্থ
কর্ণচারীস্বপ্নের মধ্যে সেই আন্দোলন ভয়ঙ্কর
আকৃতি ধারণ করিল। অন্তঃপ্রাণ হইয়া
যেতন সুই জাতীয় ইচ্ছা পূরণকল্পে আমেরিকা
সময়ে যোগদান করিলে বাধা হইলেন।

ভগবদ্বিচার ফরাসী জাতির সাহায্যে
আমেরিকা জয়লাভ করিল। স্বাধীনতা
প্রাপ্ত মার্কিন জাতি বীরদর্পে জগতে
মহিমাম্বল উত্তোলন করিল। লানা ও
স্বাধীনতার যুগোৎসব দৃষ্টে লানা ও স্বাধীনতা-
বাদীগণ ভূমণ্ডলের সর্বত্রই অধোমুখে উন্নত
হইল। সুদূর আমেরিকা হইতে ফ্রান্স-
বাসীগণ যশোভূমিত শিরে যুগে প্রত্যাপ্ত
হইয়া জয় জয় নামে দিগদিগন্তর নিনাদিত
করিল। ফরাসীজাতির আনন্দের পরিমীমা
নহিল না। কিন্তু মার্কিনের জয়লাভ
আমেরিকা ফরাসী বিপ্লবের মুখ্য কারণে পরিণত
হইল। মার্কিনের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান
হইয়া ফরাসিজাতি আশ্চর্যজ্ঞ উপলব্ধি
করিতে সমর্থ হইল। তাহাদের পক্ষে সামর্থ্য,
উৎসাহ, উন্নয় চতুর্ভুজ বৃদ্ধি হইল। মার্কিনের
আদর্শ তাহাদের জাতীয় আদর্শ গঠিত হইল।
সুতরাং মার্কিনসমর্থই যে ফরাসিবিপ্লবের
অন্ততম কারণ তাহা সন্দেহ নাই।

যাহা হউক মার্কিন সময়ের যোগদান
নিবন্ধন, ফরাসি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে
অশেষবিধ বিলুপ্তি উপস্থিত হইল। যুদ্ধের
ব্যয় নিকাষের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ক্ষণ বৃদ্ধি

(১) He refused the whole emoluments of office ; an example of disinterestedness which excited the jealousy, as it was beyond the power of imitation of the courtiers."

হইল। নেফার অনন্তোশায় হইয়া দিতব্যদিত্য
অবলম্বন করিলেন। স্তত্রায় মহামহোপাধ্যায়
বংশসম্বৃত্ত বৃত্তিভোগী মহোদয়গণের অন্তর্গত
উপস্থিত হইল। ধর্মবালকবৃন্দ ও তুহানীগণ
নেফারের ধর্মসমাধন করে সন্নিহিত হইলেন।
মন্ত্রীস্বর্য্যবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কোপানলে
পতিত হইয়া পদত্যাগপূর্ব্বক অব্যাহতি লাভ
করিলেন (১৭৮৭ খৃঃ)।

নেফার পদত্যাগ করিলে শাসন সংক্রান্ত
সর্ব্ব বিষয়ে রাজ্যী অব্যাহতি হস্তক্ষেপ করিতে
লাগিলেন। তাঁহারে মহাগুরুমে পর্যাৱক্রমে
কুরুর, অরমেছন, কলন প্রভৃতি নগর ব্যক্তিগণ
রাজস্ব সচিবদে নিযুক্ত হইয়া রাজস্ব বিভাগে
যোৱতর বিশৃঙ্খল উৎপাদন করিলেন।
অরমেছন রাজকাৰ্য্যের ব্যয় নির্ক্সাহের
নিমিত্ত ১৪০০০০০ পাউণ্ড পুণ্ড গ্রহণ
করিয়াও কাৰ্য্য পরিচালনে অসমর্থ হইয়া
পদত্যাগ করিলেন। অরমেছনের পদত্যাগ-
কালে দৃষ্ট হইল যে রাজকোষে মোট
১৪৪০০ পাউণ্ড মাত্র বিদ্যমান করিতেছে।
কলন রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত হইয়া অর্থসংগ্রহ
অথবা ব্যয় নির্ক্সাহ সংক্রান্ত সর্ব্বভিত্তি পরিহার
পূর্ব্বক বিলাসপরাৱণা রাজ্যের মনস্তত্তি
সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন। স্তত্রায়
রাজকাৰ্য্যসংক্রান্ত আবস্তকীয় ব্যয় নির্ক্সাহের
নিমিত্ত অর্থাতাব হইলেও, রাজ্যের বিলাস
পরিচর্য্যায় নিযুক্ত অর্থাতাব হইল না।
এইরূপে আর অপেক্ষা নাৱ দিন দিন বৃদ্ধি
পাইতে লাগিল। স্তত্রায় অত্যন্ত কালের
মধ্যেই রাজকোষ এককালে নিঃশেষিত
হইবার উপক্রম হইল। তখন অনন্তোশায়

হইয়া মন্ত্রীস্বর্য্য রাজকরের সাহায্য গ্রহণ
করিতে কৃতসম্বল হইলেন। কিন্তু রাজকরের
সাংগা গ্রহণও সম্ভব ব্যাপার নহে।
তুহানীগণ ও ধর্মবালকবৃন্দ সর্ব্বপ্রকার
দায় হইতে মুক্ত কিন্তু রাজকরের 'গুরুত্ব'কে
প্রতীকিত জনসাধারণের শিরে অতিরিক্ত
ভারপাণ্ড সম্ভবপর নহে। আবার
পক্ষান্তরে ধর্মবালকগণের ও তুহানীস্বরের
শিরে করতাব্দ অর্পণ আদৌ অসম্ভব।
উপাৱান্তর দৃষ্টি না করিয়া মন্ত্রীস্বর্য্য উত্তবংশীয়,
ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া এক বিরাট
সভার অধিবেশন নিমিত্ত রাজ্যকে অল্লম্বোষ
করিলেন (১৭৮৭)। সর্ব্বগুণসম্পন্নদের শিরে
সমতাবে করতাব্দ অর্পণের নিমিত্ত এবং
রাজস্ব সংক্রান্ত কয়েকটি কুপ্রথা নিবারণ
কল্পে এই সভা আহত হইল। কিন্তু
অভিজ্ঞাতগণ রাজ্যের কোন প্রস্তাবেই সম্মতি
প্রদান করিলেন না। উপাৱান্তর দৃষ্টি না
করিয়া কলন পদত্যাগ করিলেন। (৪)

কলন পদত্যাগ করিলে, ব্রাইন রাজস্ব
সচিব পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার কিয়-
দ্বিবস অগ্রে প্রধান মন্ত্রীস্বর্য্য পরলোকগত
হইলে তাক্সিনিচ্ প্রধান মন্ত্রীস্বর্য্যে অভিষিক্ত
হইয়াছেন। স্তত্রায় সর্ব্ব বিভাগের অভিনব
ব্যক্তিগণের সমাগমে, রাজকাৰ্য্য অভিনব
প্রকারে পরিচালিত হইতে লাগিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে করাদি রাজ্যের
মহারাণী দেৱি অন্তর্যন্তের বিচিত্র নীলা
জনসাধারণের ভিত্ত আকর্ষণ করিল। একদিকে
অৱাতাবে জুপীকিত মানবগণের মনস্তাত্তিক
আর্দ্রনাৱ, অপরদিকে সেই স্বন্দরীকুল দর্প-

৩২শ বর্ষ, ঘোড়ার সংখ্যা।

করাণী নিগ্গের ইতিহাস।

হাস্তিগী অষ্টাদশ নব্বিনীর অথবা বিলাপপরিচয়।
করাণী চিত্রে অপরিণীত মৃগা উপস্থাপন করিল।

প্রকৃতিপুঞ্জের অত্যন্ত অভিযোগ হুখ হুখ
পাতি অপাতির প্রতি সমভাবে ঐক্যমিত্ত
প্রদর্শন পূর্ণক অস্ত্রনেত্র অন্তর বেশভূষার
অহরহ বরষপূর শোভা সম্পাদন করিতেছেন।
ভাসেনিস্ ও জিহানন্ ভবনে অহনিশি
নৃত্যমিত্ত, সাক্ষ্য সন্নিগন, বন্ধু সন্নিগন প্রভৃতি
আমোদ উৎসব চলিতেছে। মহামহোপাধ্যায়
বংশসম্মত নরভূষণ রাজভবনের সেই
সন্নিগনে সেই আমোদ উৎসবে যোগদান
করিতেছেন। কাউন্ট ডি আর্ন্তর প্রভৃতি
হুখধর্ম সহ রাজী রাজার অবিভ্রমানে গভীর
নিম্নোপে প্রাদাপ নিগর নিদাষ সমীর সেবনে
চিত্তের প্রমুগতা সম্পাদন করিতেছেন।
প্যারিসবাসীগণ সেই সমস্ত আমোদ উৎসবের
তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া
রাজপরিবারবর্গের অশেষবিধ কুংসা ঘটনা
এবং পথে ঘাটে প্রতিগৃহে প্রতি দ্বানে সংস
বধনে সংস প্রকারে সেই সমস্ত ক্রিয়া-
কলাপের ভৌম মনোগোচনে করিতে লাগিল।
ইতি মধ্যে বিধির বিড়ম্বনার রাজীর
ভুক্তিগা বশত ঘটনাক্রমে একটি হীরক
হার এসদীর অদৃষ্ট রহতে সমগ্র প্যারিস-
নগরী আলোড়িত হইয়া উঠিল। যদিও
পরিশেষে প্যারিসমেটে বিচার সমিতি হীরক-
হার বিষয়ক ঘটনাবলীতে রাজীর নির্দোষিতা
অব্যাহার্য করিলেন, তথাপি উচ্চত করাণী
প্রতি ভাঙিতে পরিত্রুত হইল না। তাহাঙ্গের
এব বিশ্বাস জন্মিল যে হীরকহার এসদীর
ব্যাপারটি নীলাম্বরী অস্ত্ররনেত্রের অন্ত-
নীলাম্বরী একটি দৃষ্টান্ত হল। ঘটনাবলী এই:—

বোহেমার নামক প্যারিস নগরের সুপ্রসিদ্ধ
অলঙ্কার বিক্রেতা রাজপরিবারবর্গের বাবতীর
অলঙ্কার নির্মাণ করিতেন। তিনি বহু পরিশ্রমে
ও অশেষ গরুর একটি অপরূপ হীরকহার নির্মাণ
পূর্ণক বিক্রয়ার্থে রাজীর সমীপে আনয়ন
করিলেন। রাজী মৃগা বিজ্ঞানা করিলে তিনি
বলিলেন “৬৪০০০ পাউণ্ড”। মৃগা শুনিয়া
রাজী হার ক্রয় করিতে অস্বীকার প্রকাশ
করিলেন। অনন্তর বোহেমার হার বিক্রেতার
নিষিদ্ধ দেশবিশ্রান্তে গমন করিলেন কিন্তু
কোনক্রমে কৃতকার্য হইলেন না। কিয়দিবস
পরে মণি নারী সম্রাটবংশীয়া কোন মহিলা
বোহেমার সরিকটে আগমন করিয়া বলিলেন
“রাজী অনেক চিন্তার পর আপনার
সেই হীরক হারটি ক্রয় করিতে সম্মত হইয়া-
ছেন ; একথা আপনি কাহারও নিকট প্রকাশ
করবেন না।” এই বলিয়া মণি রাজীর
নামাঙ্কিত একখানি লিপি বোহেমারের হস্তে
অর্পণ করিলেন। পত্রখানি প্রকৃতপক্ষে রাজী-
কর্তৃক স্বাক্ষরিত অথবা প্রাধান্যময়ী মণির
দৃষ্টিসন্ধি প্রসূত তৎসম্বন্ধে সন্ধিহান হইয়া
বোহেমার কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন।
মণি বলিলেন “আপনার সম্মুখে ভ্রমনার্থে
আমি রাজতবনহু কঠিনক উচ্চ পদস্থ
কর্ণচাকরীকে সম্বরণী আপনায় নিকট প্রেরণ
করিল। তিনিই ক্রয় কার্য সম্পন্ন
করবেন।” কিয়ৎকাল পরেই কার্ডিনাল
রোহান্ নামক রাজীর দাতব্য বিভাগের
সর্বপ্রধান কর্ণচাকরী মণি সমস্তবিষয়ের
বোহেমার সমীপে আগমন পূর্ণক ৪৬০০০
পাউণ্ড মূল্য অবধারণে রাজীর নামে সেই
হার ক্রয় করিলেন। কর্ণচাকরী প্রবরের নির্দেশ

এম বিক্রীত হারট মণিও হস্তে প্রবত
হইল। মণি বোহেমারের চক্ষে রাজ্যের
নাশাঙ্কিত গণি প্রদান পুঙ্খক হার লইয়া
প্রস্থান করিলেন। মূল্য লব্ধে এইস্থল কথা
হিস হইল যে, বোহেমার সমগ্র মূল্য এককালে
প্রাপ্ত হইবেন না, আর্থশিকল্পে ভিন্ন ভিন্ন
সময়ে রাজ্যী ক্ষয় পরিশোধ করিবেন। মূল্যের
প্রথমমাংশে প্রদানের নির্দিষ্টকাল উপস্থিত হইলে
বোহেমার রাজ্যের কোদাধ্যক্ষ সমীপে গমন
করিলেন; কিন্তু কোদাধ্যক্ষ মূল্য প্রদানে
অস্বীকৃত হইলেন। বোহেমার বিক্রীত হারের
বিনিময়ে যত্নাকৃত মুদ্রা প্রাপ্ত না হইয়া রাজ
তখনই ভট্টনক মহিলায় নিষ্কট অতিযোগ
করিলেন। রাজা তৎক্ষণে অবগত হইয়া
রোহানকে তৎসন্না করায়,—রোহান্ উত্তর
করিলেন, “মণি আমাকে যে পর
দেখাইয়াছিলেন তাহা আমি রাজ্যী কর্তৃক
স্বাক্ষরিত বলিয়া বিবাস করিয়াছিলাম;
সেইজন্য আমি হার ক্রয় কালে
উপস্থিত ছিলাম।” রাজা বিরক্ত লহকারে
বলিলেন “আপনি রাজত্ববনের ভট্টনক
প্রধান কর্মচারী, ফরাসিরাষ্ট্রী কি প্রকারে
নাম স্বাক্ষর করেন তাহা অজ্ঞ অস্বা-
সেই অবগত হইতে পারিতেন।” ইহার
কিয়ৎকাল পরেই রোহান্ এবং মণি যুত হইয়া
বিচারমাণে পারিগ পানিরামেটে প্রেরিত
হইলেন।

হীরকহার প্রসঙ্গের অদূত বাপারে সমগ্র
কন্টাস্ত্রিমি আলোড়িত হইয়া উঠিল। কৌতু-
হলাঞ্জিত হইয়া পারিগের আবাল বৃদ্ধ, বনিতা
বিতার কালের আগমন প্রতীক্ষা করিতে
লাগিল। অনন্তর বিচারকালে এক অদূত

বহুত উদ্ঘাটিত হইল। হীরকহার প্রসঙ্গ
অব্যবহিত পরে মণি রোহানকে বলেন “হীরক
হার ক্রয় প্রসঙ্গে আপনি যে কাণ্ড করিয়াছেন
তৎক্ষণে রাজ্যী আপনাকে দণ্ডবাদ প্রদানের
নিমিত্ত ছদ্মবেশে রজনীযোগে আপনার লঙ্ঘিত
জিয়ানন্ উদ্ঘানে সাক্ষ্য করিবেন।” রজনী-
যোগে নিষ্কটে রাজ্যী দণ্ডন পাত গথকে কৃত-
নিষ্কট হইয়া রোহান্ মহানন্দে জিয়ানন্
উদ্ঘানে গমন করেন; তথায় উপস্থিত হইয়া
দেখিলেন যে মেরি অন্তরনেতঃ সঙ্গী অপর-
জ্ঞপণাণ্যসম্পন্ন মহিলা ছদ্মবেশে তাঁহার
নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। মহিলা বচন-
মুখা বর্ণনে রোহানের কণ্ঠগগল পরিতৃপ্ত করিয়া
বহুত তাঁহাকে একটি গোলাপ কুহুম দান
করিলেন। রোহান্ ক্ষণকালের নিমিত্ত অপর-
জ্ঞ উপভোগ করিয়া অপর আনন্দ উদ্ভান
হইতে নিজান্ত হইলেন।

সেই ছদ্মবেশধারিণী, কুজবিহারিণী,
মধুভাষিণী রমণী কে? ইনি কি সেই
অনিষ্টাক্রপিতী অঙ্গারানন্দিনী, ফরাসী মহারাজী
মেরি অন্তরনেতঃ? ইনি কি যথার্থই হীরক-
হার ক্রয় করিয়া রোহানকে অন্তরভাবে দণ্ডবাদ
প্রদানের নিমিত্ত ছদ্মবেশে নিশাকালে
নিষ্কটে জিয়ানন্ উদ্ঘানে আগমন করিয়া-
ছিলেন? রোহানের তৎকালে বিবাস
কক্ষাছিল যে ইনিই সেই আশ্বাশনন্দিনী
ফরাসী রাজ্যী। জনসাধারণের ক্রব বিবাস
যে তিনিই সেই মহারাজী অন্তরনেতঃ। যাহা
হটক পালিরামেটে বিচারলম্বিত প্রমাণের
অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খপে পর্যালোচনা করিয়া
হিস করিলেন যে, সেই জিয়ানন্ উদ্ভান-
বিহারিণী মহিলা মহারাজী অন্তরনেতঃ

সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার মিশ্রা আছে। দৃষ্টির আলোক বেগানে শ্রেণ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুপ্রবেশ করিতে পারেন, শক্তির শক্তি বেগানে স্রোতের শ্রেণ নীমার পৌঁছায় সেখানে হইতেও তিনি কল্পবানবানি আত্মরূপ করিয়া আসেন। একাশের অতীত দে রূপত একাশের আড়ালে নিহতরাজ্য কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকেই এর করিয়া প্রকৌণ্ড উত্তর বাহির করিতেছেন, এবং সেই উত্তরকেই মানব ভাষায় বখাখণ করিয়া বাস্তব করিতে নিযুক্ত আছেন। "বৈজ্ঞানিক ও কবি উভয়েই অসুখুতি, অসিঁপটনীয় বস্তুকে বাহির হইয়াছে এতেন এই, কবি গদ্যে কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক গদ্যটাকে উপেক্ষা করেন না।" (বিশ্বনাথদাস) সাহিত্যের যে মুষ্টি একাশ করিয়াছেন তাহা আকাশের জার নিবৃত্ত্যস্বরিত; তাহাতে অলপখা স্রব নক্ষত্র বিকিরণে নিরীকায়ে বাস করিয়া পৃথিবীকে স্পন্দ উৎসল ও অনন্তের গণে অঙ্গঙ্গ করিয়া লইয়া চলিয়াছে। এখানে চেহে বুঝির স্তম্ভ গভী স্তম্ভ সীমানা বিফল। আনন্দের বেগের সাহিত্য—আকাশের জার স্বাভাবিক প্রসারিত অনন্ত "হটক এবং তাহারি চম্পাতগ তলে দেশের সত্য সাধকগণ ধ্যাননিরন্তরিতে বর্ণনাভার অর্থ্য সত্য রচনা করিতে থাকুন,—সাহিত্য সন্নিধানী আনন্দের একতার বন্ধন বৃত্তের করিয়া জাতীয় জীবনকে বসন্তে বসন্তের আরো উন্নতিশীল এবং উপার করন ইহাই আনানিদের আত্মিক কামনা।

আবর বিস্ত্রোহ। আশ্বাসের পূর্বোক্তর সীমান্তে যে লক্ষ্য অদ্যকারিতি বাস করে, আশ্বাস তাহাশেষ অন্ততন। ইহায়া অন্তর কলহময় এবং লজ্জাই উত্তেজিত হইলে নরহত্যা করে। অনেকদিন হইতেই তাহাশেষ সহিত ভারত পত্ৰপত্রের বলাবিক সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। লজ্জাই আশ্বাস হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে সীমান্ত প্রদেশের পাশিয়া লক্ষ্য হুদেব রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষী কর্তৃক বেয়েল উইলিয়াম-লন লক্ষ্যবলে তাহাশেষ বারী নিহত হইয়াছেন। প্রথমে এ সংবাদ কেহই বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই;

কিন্তু এখন এমন সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিবার আর লক্ষ্য নাই। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহাশিপক্ষে বহুনের চৌঃ চলিয়া আসিতেছে। ঐ বৎসর আবার ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে আসিয়া অস্ত্রাচার করিতে তাহাশিপক্ষে লগন করিবার লক্ষ্য একতর লৈল প্রেরণ করা হয় তাহার ফলে কয়েক বৎসর আর কোন উপদ্রব ছিল না। ১৮৮০ সালে যখন সিপাহী বিদ্রোহ লক্ষ্য করিতে রাজপুত্রবল বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন সেই সময় আবার ইহায়া লক্ষ্য মুষ্টি বাহন করিয়া ঐক্যবৃত্তের তিনকোণ দুর্বলতী লগন পাশ্বব গোদেব বাবরীক অবিশ্বাসীদিগের জাণ সংহার করিয়া নিল—তাগাদিগের শাসনের লক্ষ্য এখানে যে বৈদ্রবল সোহিত হইয়া তাহায়া লগন করা হুইল থাক্ নিজেয়াই নিহত নিপুহীত হইয়া ভিত্তপড়ে দিহিয়া আসিতে বাধ্য হইল। পর্ববৈদ্র তখন কামান ইহাশিপ লক্ষ্য বহুনিরন্তর প্রেরণ করিলেন। বীর আত্মরূপ অলমলাগনের সহিত আত্মরূপ করিয়া পরিগণে লোকবল অভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আত্মরূপ পুনরায় ব্রিটিশ অধিকারে উৎপাত করে; তখন রাজপুত্রবল চিত্র-বিনেহ লক্ষ্য তাহাশিপক্ষে লগনানীল করিবার চৌঃ সীমান্ত প্রদেশে বহুসংখ্যক দুর্গ নির্মাণ করিলেন। অনেকগুলি গিরিগুর্ণ নির্মিত হইলে আত্মরূপ কিছু-দিনের লক্ষ্য শান্তভাবে বাহন করিল। এবং বলিল ইহায়া যদি তাহাশিপক্ষে নিহতরাজ্য প্রক্তি বৎসর লগন, অধিকেন তাহাশীপ প্রকৃতি যোগাশীতে পারেন তখন তাহায়া আর কোনরূপ উপদ্রব করিবে না। ভারত পত্ৰপত্রের এ প্রভাবে লক্ষ্য হইয়াছিল।

আত্মরূপ বাহিরে শান্তভাবে বাহন করিল বটে কিন্তু অন্তরে বিবেহ গোদন করিয়া রাখিল,—তাই ইহায়া প্রায় বন বার বৎসর পরে যখন একতর রাজপুত্র আশ্বাসের সীমান্ত প্রদেশ অতীত করিতে গেলেন এবং এই প্রভে যখন তাহাশিপক্ষে আত্মরূপভিতে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইতে হইল তখন তাহায়া তরালক মুষ্টি বাহন করিল, কাজেই রাজপুত্রবল কার্য অদম্যত বাহিয়া দিহিয়া আসিলেন। ১৮৮৪—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

আবহরণ মাঝাতাবে বাসা উপায়ে বিবেচ্য প্রকাশ
করিতে লাগিল—দেই সময় ঈজুত মৌজহাম সাহেব
সাক্ষাৎনৈতিক কর্মসূচী নিবৃত্ত হইলেন। তাহাবিবেচ্য
বালহামের সন্নিহিতে ইংরেজসাহেব বিচারালয় প্রাপ্তি
হাপন বিবেচ্য তাহাবিবেচ্য আশ্রিত উপায়ে
করিল—মৌজহাম তাহাবিবেচ্য সপ্ত ইংরেজ সন্নিহিতে
এবেশ করিতে বাসা বেওয়ার তাহাবিবেচ্য অত্যন্ত কষ্ট
হইল এবং বাসা প্রকার অত্যন্ত উপায়ে করিয়া ত্রিগুণ
অপায়ে বাসা প্রাপ্তিতে লাগিল। আসান চাক
কবিশব্দেবের চৌর্য দণ্ডিত তাহাবিবেচ্য কথকিৎ সাহেব
ধারণ করিল তবুও ঈজুত সে উপায়ে আহরণ করিলে
তাহা প্রাপ্তিতে বৃদ্ধিতে বাসা বহিল না।

এবেশ তাহাবিবেচ্য সন্নিহিতে দুইএকটি উপায়ে
বহিরা ত্রিগুণ অবিকারে প্রবেশ পূর্ণক প্রাপ্তিতে
লাগিল, পরে ১৮৯৩ খ্রীশাব্দে একজন সপ্ত পুণি
সিপাহীকে আহরণ করিল। এই স্তব বৃদ্ধে অবশ্য
সিপাহী নিবৃত্ত হইল,—তখন স্তবিত্ত লৈজবল
প্রেরিত হইল। আসানপন সাহেবের স্তবিত্ত বহিরা
প্রাপ্তিতে লাগিল; মৌজহাম সাহেব তাহাতে
পশ্চাৎপদ না হইয়া সপ্ত; অগ্রসর পূর্ণক চারিবিবেচ্য
আবহরণগুলি অবিকারে করিতে লাগিলেন—ক্রমে
বিবিধ অগ্রসর বাসা প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বিবিত্ত
আশ্রিত হইল। আসিয়া বেনিলেন তাহাবিবেচ্য
গ্রাম সপ্ত পুনরাগ বিবেচ্য হইয়াছে। তখন তিনি



আবহরণ

নিবৃত্তভাবে চারিবিবেচ্য গ্রাম প্রাপ্ত করিতে লাগিলেন।
—কর্তৃনকশে প্রাপ্ত হইয়া একাল পর্যন্ত তাহাবিবেচ্য
কেন্দ্রপ উপায়ে অত্যন্ত করে নাই। প্রাপ্ত
গেগ্রাসপ এবং উইলিয়ামসের প্রাপ্তি পূর্ণক
অত্যন্ত বর্ধবিবিত্ত। উইলিয়ামস, সহকারী
সাক্ষাৎনৈতিক কর্মসূচী এবং পুণিগের ডিষ্ট্রিক্ট
অপায়ে উন্নত হইলেন। তিনি কি অত্যন্ত আবহ-
বিত্তের বেবে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাবিবেচ্য
কারণ এখনও জানা যায় নাই। তিনি অত্যন্ত
উপগ্রহিত ছিলেন, সপ্তবৃত্ত: সপ্তগ্রাম স্তবিত্ত বৃদ্ধি
১৩

খোয়াসনকে সপ্ত করিয়া আবহ বেবে সিদ্ধান্তিলেন।
পশ্চত উইলিয়ামস অবশ্যগুলি স্তবী সপ্ত করিয়া
বাহ্য করিয়াছিলেন বেনিরা কেহ কেহ অগ্রসর
করেন যে তিনি অত্যন্তবেশ আবহিত প্রাপ্তি
অগ্রসর হইয়াছিলেন। সপ্ত প্রাপ্ত তাহাবিবেচ্য
গ্রামে বাস বেবে প্রাপ্তি সাহেবের তাহাবিবেচ্য
অগ্রসর করিয়াছিল। ২৮ মে বার্ডে চারিবিবেচ্য তাহাবিবেচ্য
প্রাপ্তিগে সপ্ত হইলেন, ৩০মে তাহাবিবেচ্য সপ্ত
আহাবিবেচ্য পর আবহবিত্তের তেলার বনী পর
হইলেন—বনী স্তবিত্ত হইলেও অত্যন্ত সপ্ত

এবং প্রোতঃ তরাসক গ্রন্থের। বেলা বশটার সময় উইলিয়ামসন রিউগ্রায়ে উপস্থিত হইলে আবারও তাঁহার অধ্বাঘেরে বস্তু স্থীত ঠিক করিয়া দিরাহিল,—তাহারি সমুখে তাণু ফেলিয়া তাঁহার্য্য বসের বন্দোবস্ত করেন। এইখানে রিউগ্রায়ে বসন্ত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসে এবং তাহারি সন্মুখে আস্থানে গ্রাহ এক সূত্র পূর্ববর্তী আবার জারি করিতে হইতে হুটুয়া আসিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার দলের অনেক লোককে হত্যা করে। কেবল যে তাহার্য্য একজন কহিল সে রাস্তা এখনও কেহ ভেদ করিতে পারে নাই।

আমেরিকার বিস্তৃত আপাততঃ অধিক সংখ্যক সেমা ও কাহাম শ্রেণিত না হইলেও আমেরিক পূর্বোক্তর সীমান্তে যে দীর্ঘ ইন্ডিয়ান সমগ্রাণি প্রসারিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সামান্য যুদ্ধের আয়োজনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে, ইহাতেও যদি আবারও লাভিত না হয় তাহা হইলে আমেরী ঈতকালে মহাযুদ্ধের আয়োজন হইবে—সেই প্রসারিত রণভঙ্গানে বহু সংখ্যক মানব হিন্দুরই পৃথকঃ প্রাণ ত্যাগিত হইয়া গাইবে।

আমেরিকার বর্ণসমস্যা। এক সময় যে আমেরিকা নিগ্রোদিগের বাসস্থানস্থল উচ্ছেদন করিয়া তাহাদিগকে আতীন করিয়া দিরাহিল, তাহাদিগকে অধিক বিঘ্নে বেতন স্বর্ণ বাণিকদিগের সমান অবিকার দান করিয়াছিল,—অনুগ্ৰহ সেই আমেরিকাই, পুণিবার সর্বপোষ্য স্বাধীন এবং সামান্য প্রভাবক আমেরিকাই, নিগ্রোদিগের প্রতি কি করায়ক অভ্যাস করিতেছে। নিগ্রোদিগের পক্ষে সে বেশে বদনাল অভ্যাস কটীলম্বা হইয়া উঠিয়াছে। অল্প দিন হইল নিউইয়র্কের প্রিকাথোজী কোম্পানী তাহাদের সমস্ত নিগ্রোকোচমানকে হাড়াইয়া দিতে যাসন করিয়াছেন। এই সকল কোচমান পরিদর্শী, বিদ্যাদী এবং কার্যক্ষম কিন্তু হোটেলদাশিণ্য নিগ্রোকোচমান দেখিলে গাড়ী ভাড়া লইতে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে দ্বাধিলে কোম্পানীকে লব্ধ কর্তৃত্ব হইতে হয়, কাজেই তাহাদিগকে হাড়াইয়া দেওয়া ক্রিয় উপায় নাই।

কিছুদিন পূর্বে কম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাঁহার আপন বোনা-হাউজে একটি সভা আহ্বান করেন—তাহাতে যেত ত্রুণ উত্তর বর্ণেরই নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু বাণীভাষা এ সংখ্যক অধিবাসিত্র তাঁহাকে বাল্য হাড়াইয়া দিবার যেটিন বিল—অধ্যাপক মহাপুরুষে যাহা হইয়া সভা বন্ধ করিতে হইল। নিউইয়র্কের কোম বিলো—তাঁহাকে বিনা অপর্যবে প্রস্তার করিয়া প্রোত্তর করিয়া আবার বস্তু আনালিতে বেসারতের দাবীতে বন্ধননা আনিরাহিল, কিন্তু বাণী ত্রুণবর্ণভাতি বলিয়া সুবিচারক তাহার দাবী অগ্রাহ করিয়া বলেন “কাল” অর্থনৌক প্রোত্তর করিলে সে বধনই সাধ; আনবীর বস্তু অপমান বোধ করে না—তাঁহার বোনারতের কোন দাবী থাকিতে পারে না।” নিগ্রোদিগকে বেসান্তরিত করিয়া আবার আফ্রিকার পাঠাইবার প্রস্তাব অনেকবার উঠিয়াছে। কিন্তু এখনত্তর অনন্তব ব্যাপার কোম্পানীই সাধারণতঃ নর প্রাণিরা এ প্রস্তাবের কোন দল হয় নাই। কোম্পানী সভাপতিত্ব কিংবা পাঠাগারে নিগ্রোদিগের প্রবেশ বিঘ্ন হইয়া দিরাহে। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে নিগ্রো স্ত্রীলোক অনেক উত্তরে আনিয়া ঢাকরি পাইতেছে, কেবল পূর্ববঙ্গেরই কোনো উপায় নাই। কলে তাহারা অপরূপাণে জীবিকা উপার্জন করিতে যাহা হইতেছে। যুদ্ধবিগ্নব আতীরবস্তুর রক্তপাতে যে উত্তর আমেরিকা একদিন নিগ্রোবানৌমতা প্রবাস করিয়াছিল আজ সেইখানেই লজ্জাতারের রাজ্য অধিক হইয়াছে— সামাজিক শিষ্টতা তো দূরের কথা,—রাজনৈতিক অবিকার হইতেও তাহার্য্য স্রষ্ট হইতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার নিগ্রোদিগের অবস্থা অবিকার পোতনীর—এমন কি তাহাদিগকে দিগাম্বিকার অধিকার্য্যমন্ত অনেকই বিদূষ। যিযাজ ইতিহাসিক এবং অর্থ নৈতিক অধ্যাপক ডু বোয়া ত্রুণবর্ণ এই বোনে আটলাণ্টার স্বাধিপা পাঠাগারে প্রবেশাবিকার হাড়াইয়াছেন; অপর তাহারি রচিত পুথকাবলী সেই পুথক বিপণ্য অর্ন্তভারবস্ত্র। দস্তাতি একজন নিগ্রো—সম্বতরী আটর্পি যেমহেশের পনে নিযুক্ত

হওয়াতে পণ্ডিত ভাষিকদিগের সংবাদেও এ বিষয় লইয়া যথা আশেপাশ চলিতেছে । এ বিষয় ব্যাপারের বিস্তৃত সকলই বর্ণনা করি ।

এইজন্য জনস্বাক্ষর সভার অনুদায় নীতির ক্ষয় ঘেঁষিলে ভয় দেখানো হুণ্ডে বিতুষ্ট হইয়া উঠে ।

বাংলাবিশ্ববিদ্যালয়ের অপকারিতা । বাংলাবিদ্যায় যে আদ্যের সোণের কত অপকার করিয়াছে এবং করিতেছে তাহা কিছু নতুন কথা নয় । কিন্তু আত্মা-অত্যাক ইহা দেখিয়া, আমিয়াও কেন যে তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রস্তুত হই না ইহাই অত্যন্ত বিশদ্রবলক নতুন কথা । বিশেষতঃ উদ্যোগে একজন আমেরিকান রসমহিলা । তিনি কিছুদিন হইতে এদেশে আসিয়া ইহার সংস্কারে আগ্রহ করিতেছেন । সম্ভ্রুতি তিনি এ বিষয়ে যে এতটী সারসর্গ বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার মর্ম এই—“বাংলাবিদ্যার বিচারণ করা এদেশের যুবকগুলোর একটি বিশেষ কর্তব্য, এই কর্তব্য প্রদর্শিত হইলে ভারতবর্ষের অপেক্ষা কম্যন হইবে । তখন বাঙ্গালী জনর উৎসাহে সজ্জমে পূর্ণ থাকে, এই সময়েই ভারতবর্ষীয় যুবকগণ যদেশীয় সারীপক্ষে শ্রেষ্ঠ আদর্শে পটীত এবং পরিণত করিতে চেষ্টা পাইলে সে এতদান কখনও ব্যর্থ হইবে না । উপযুক্ত শিক্ষাদানই এই পরিণতির প্রকৃষ্ট উপায় । বাংলায় এখনে বালিকাবিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহারা সকলেই এক থাকে। বলেন বাংলা-বিদ্যার ক্রীড়াকার প্রধান অন্তরায়, বালিকার বয়স বাসনাবর্ণ উত্তীর্ণ না হইতেই তাহার বিবাহ হয় এবং তা সহস্রাব্দ সহিত অন্তর্বিচ্ছেদ ঘটে । আধুনিক সকল চিকিৎসকই বলিয়া থাকেন অষ্টাদশবর্ষ পূর্বে সারী এবং পঞ্চাশের বয়স পূর্বে পুংসকের বিবাহ হওয়া কখনই উচিত নয় । যদি বালিকাগণ যথেষ্ট শিক্ষাগ্রস্ত না হয় তবে উপযুক্ত পরিণত বয়স হাতা, পাত্রী এবং ভগিনীলাভের আশা হুশাসী ।” এক কথা এবং প্রশ্নই সত্য । বড়ই দুঃখের বিষয় এই সরল সত্যের কথা আদ্যের বিশেষী বন্ধুদের হুণ্ডে ভসিত হইয়াছে । আমাধিগণ যথা বাংলায় দেশের অঙ্গল চেষ্টায় ব্রতী, বাংলায় সুবিবেচক তাঁহারা বহুপূর্ব

হইতেই আনন্দ যে বাংলাবিদ্যার সারী উন্নতির কি কতদূর অন্তরায়, কিন্তু তদুত্তর অবস্থাবৈকল্যে যথা যথো বাংলাবিদ্যার বহুদূর বাংলা আমিয়া পড়ে তাহা হাতা। তাহা হোণ করিবার বর্ত্তমানকাল সত্য চেষ্টা । এ পথায় দেখা যায় নাই । এখন পণ্ডিত শিক্ত সম্প্রদায় এই পুরাতন এমার অপকারিতা সম্যক স্বীকার করেন বলিয়া বোধ হয় না, অন্ততঃ তাহা দিয়ারণে বয় করিতে বিন্দু, সে বিষয়ে সন্দেহভার নাই । বিশেষতঃ উদ্যোগে যুবকগুলিকে এই কার্যে উৎসাহী করিবার চেষ্টা করিয়া আমাধিগণ যে কত উপকার করিতেছেন তাহা সুবিবেচক ব্যক্তি বাস্তবেই বুঝিবেন । অন্ততঃ বাংলাবিদ্যার অনিষ্টকারিতা সন্দেহজনক করিয়া যুবকগণ যদি ইহার প্রতিরোধে দৃঢ়পক্ষ হন তাহা হইলে অতি সহজেই এ এমার উচ্ছেদ সাধন হইবে । এ কর্তব্য পালন করা ভেদন করিব নহে—কেবলমাত্র একটুখানি দৃঢ়তার আবশ্যক ; তাহা হইলেই অতি সহজে তাঁহারা সফলকাম হইয়া দেশের একাংশের হারা উন্নতিসাধন করিতে পারিব ।

কবি সম্প্রদায় । যদিও আমাধিগণ দেশেরই স্বর্গভূমি—ববেশে পুজাতে রাজা বিধান সর্গের পুজাতে ; তদুত্তরামা এবং রাজকীয়তিনি দেশান্তর হইতে আসিয়া অনেক সময় লাভ করিয়া যান, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য অন্তর্ অর্থ ব্যয়িত হয়, কেবল দেশের বিধান কখনো বিশেষরূপে সজ্জিত হইয়াছেন বলিয়া যথেষ্ট পড়ে না । বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, অন্তরায়ের বয়, বক্সর, বীনবজ্জ, বিদ্যালয়, বীনবজ্জ আমাধিগণ দেশের আমাধিগণ গৌরব বর্জন করিয়াও কোন অপাধারণ ন্যায় লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই । যথেষ্টের জন্য তাঁহারা বয় সর্গ করিয়া গিয়াছেন আনন্দ তাহা কোণ করিতেছে ; কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতির সন্ধান হক্য করিবার উপায় উদ্যোগ কোথায় ?

এতদিয়ে আমাধিগণ যে আমাধিগণ এই ক্রটি অপসারণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, ইহা বড় আদ্যের কথা । ক্রীড়াকার বীনবজ্জ কেবলমাত্র দেশের শ্রেষ্ঠ কবি নহেন সামিক্যকরে তাঁহার সর্গভূমি স্মৃতি । কাব্য,

উপভোগ, নাটক, সঙ্গীত, এবং এবং বর্ণনামূলক বাস্তব-
তত্ত্বের ক্ষেত্রে অল্পমাত্রায় পরিচালিত করা হয়েছে।
উপভোগ দেশভিত্তিক তেজস্বী বর্ণনামূলক সঙ্গীত
রচনার পদ্ধতি হতে পারে। নিম্নলিখিত, অল্পমাত্রায়
অধ্যয়ন এবং একটি আন্তর্জাতিক তিনি বোলপুর
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উপভোগ পদ্ধতিগুলি
অন্যভাবে বোলপুরে উৎসর্গ করেছেন করিয়া শিক্ষক,

হাট, চক এবং অন্যান্য উপভোগ ক্ষেত্র ও
সীমিত জায়গাগুলি। কলিকাতার সাহিত্যপরিষদের
সংযোগে উপভোগ সর্বজনীন আয়োজন হইতেছে।
একান্ত মনে প্রার্থনা করি, কবিদের দীর্ঘজীবী হইয়া
বেশের মধ্যে কল্যাণসাধন করুন, উপভোগ উদ্ভব ও
বহন করার পরবর্তী সকলকে বহুতরূপে পথে অগ্রসর
করুক।

সমালোচনা।

জ্যোতিঃ। শ্রীমতি হেমলতা দেবী প্রণীত।
ইতিহাস পুথালিপি, চাইল হইতে প্রকাশিত।
কালিকাতা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বদ আনা মাত্র।
আমরা এই কবিতাপ্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া যথেষ্ট মুগ্ধ
পাইয়াছি। অল্পমাত্রায় 'জ্যোতিঃ'র কবি সাহিত্য-
ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছেন, উপভোগ যথেষ্ট তিনি এখানে
যেন একটি সুসংগঠিত হইল অধিকার করিয়া গিয়া-
ছেন, ইহা অল্পমাত্রায় পরিচালিত করে। 'জ্যোতিঃ'র
অধিকাংশ কবিতাই বর্ণনামূলক।—সর্বজনীন মূল
লেনার পাঠকের সর্বজনীন করে। তবেও একটি
প্রাণ আছে। পুথোর মধ্যে বেশিকার বহুতর
কয়েকটি সঙ্গীতের বর্ণালিপি প্রদত্ত হইয়াছে।
দেবী বীণাশাবির এই একমাত্র পুথালিপি-কবির
চরিত্র লক্ষ্য, এ কথা আমরা অন্যভাবে বলিতে
পারি।

এলোকেদী। গার্বা উপভোগ। শ্রীমত
বরেন্দ্র দাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।
কবিতার সিন্ধুস্রোত—উপভোগবাহি উপভোগ
বহন করিয়া রচনা—যেহেতু বর্ণনামূলক উপভোগ
প্রণীত করিয়াছেন এবং 'কালিকাতা বোলপুর' লিখার
প্রবৃত্তি বা কালিকাতা বহুতরূপী তথা রোগী
অধ্যয়ন বহুতরূপে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। বটে। ইহা
ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। উপভোগের যেমন ভাষা
তেমনি ভাষা, তেমনি উপভোগবহন, আবার প্রতিষ্ঠা

দেখিগুন।
গার্বা।

মস্তক। (সীমিতভাবে) শ্রীমত বহুতরূপ
মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য বদ আনা মাত্র।
কবির 'আত্মদে' জায়গাগুলি। 'উপভোগের অধ্যয়ন
চরিত্রের সংযোগে ও কবিতার উদ্ভব পাথে কবির
কবিতা কবিতা প্রাণ হারায়, এই ভয়ে বাহ্যিক বহুতর
কালিকাতা দিয়া বাহিরে আসিয়া গিয়াছে।' বহিঃস্থ।
'বাহ্য'বিশেষে যথেষ্ট লক্ষ্য দিবার লক্ষ্য কি কেবল
না? তাহা হইলে কবিতা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, তবে সত্য,
আমরাও এ 'মস্তক' কবিতা বহুতরূপে বহুতরূপ
হইতে মুগ্ধকর করিয়া দত্ত হইতাম।

ধর্মবীর্য সুশ্রীতি। শ্রীমত গোবিন্দ
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এখানে সুশ্রীতির চরিত্রের
সাক্ষ্য প্রমাণ। রচনার কোন বিশেষ্য নাই।

শেকালিগুচ্ছ। শ্রীমতী হুম্মী দেবী।
ইতিহাস, মেল, একাধার। একাধার শ্রীমত
মহনতরূপ মুখোপাধ্যায়। মূল্য বদ আনা মাত্র।
এখানে কবিতাপ্রবন্ধ। বেশিকার এবং উপভোগ বহুতরূপ
মনে হইল। রচনার একটি বিভা আছে। কয়েকটি
কবিতা কল্পনামূলক বর্ণনামূলক। বিদ্যাসাগর আর
কল্পনামূলক অবলম্বন করা উচিত ছিল। আমরা
বেশিকার উপভোগের উন্নতি কামনা করি।

শ্রীমতব্রত লক্ষ্য।

কলিকাতা, ২০ কর্তব্যলিপি ট্রিট কালিকাতা প্রেসে, শ্রীমতব্রত লক্ষ্য লক্ষ্য মুদ্রিত ও ৫৫, চক বাণেশ্বর রোড হইতে
শ্রীমতব্রত মুখোপাধ্যায় লক্ষ্য প্রকাশিত।



ভান্ডারী

৩৫শ বর্ষ]

আদ্য, ১৩১৮

[৩য় সংখ্যা ।

লক্ষার নটরাজ শিব ।

লক্ষার প্রকৃত বিভাগের বস্তুগতগণ
জগৎ খনন করিয়া একটা প্রাচীন ভাস্কর্য্য
আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা নটরাজ শিবের
মূর্তি। এই মূর্তি বস্তুক জটাজুটশোভিত।
দক্ষিণদিকের ভটার গজানদী স্রবাহিত ও
বামদিকের ভটার অনন্ত সর্প বিরাজিত।
নটরাজের তিন চক্ৰ ও গলবেশে নরকপালের
মালা। তিনি একাধারে পুন্স ও রমণী
এই হেতু নাম ও দক্ষিণ কর্ণে দণ্ডাক্রমে পুন্স
ও রমণীর জাপ কুণ্ডল ধারণ করেন। তাঁহার
চারি হস্ত। দক্ষিণ দিকের উপরিতল হস্তে
ডমরু। উহা দ্বারা তিনি অজ্ঞানমগ্ন লোক-
দিগকে জাগরিত করেন। দক্ষিণদিকের
নিম্নতল হস্তে দণ্ডারভ্যে লোকসমূহকে
অভয়দান করিবার নিমিত্ত ব্যাপ্ত। বামদিকের
উপরিতল হস্তে নিম্নাভিমুখ কিস্তি বাম চরণ
উত্তোলিত। ইহার সাংকেতিক অর্থ এই
যে তাঁহার বামচরণ কৌমার্যের অস্তিম
আশ্রয়। তিনি দক্ষিণচরণের উপর ভর
দিয়া দণ্ডারমান। এই চরণ মাগাজুতকে
দলিত করিতেছে। মাগাজুত অবিভার
নামান্তর। মূর্তিটি পদ্মাসনের উপর অবস্থিত।

নটরাজ শিবের এই মূর্তি লক্ষার পুলতাপুর
হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাবণের পিতা-

মহের নাম পুলতাপ। পুলতাপের সহিত
পুলতাপুরের কোন সম্বন্ধ আছে কি না
বলা যায় না। সিংহলীয় পালিগ্রন্থে পুলতাপুর
পুলতাপিপুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইংরেজী
গ্রন্থে এই নগর অধুনা পোলেপারুক নামে
পরিচিত। পুলতাপুর এক সময়ে লক্ষার
রাজধানী ছিল। মহাবংশের সর্গনা অষ্টদশের
জানি বার ৮৪৩ খৃঃ অব্দে শিলাদেববর্গ নামক
রাজা পুলতাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।
তদবধি চল্লিশ জন রাজা এই নগরে রাজত্ব
করেন। ১২১৫ খৃঃ অব্দে পুলতাপুরের
ধ্বংস হয়। অধুনা পুলতাপুর জনশূন্য ও
নিবিড় অরণ্যে সমাকীর্ণ।

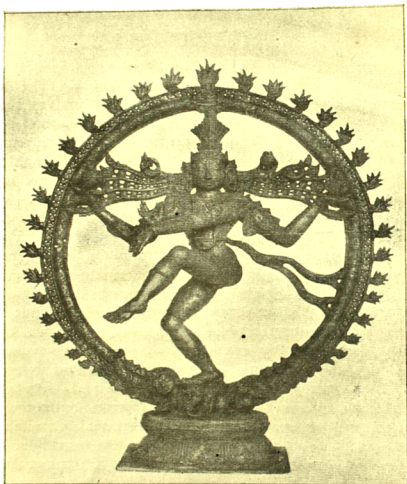
নটরাজের মূর্তি অতি মূল্যবান। আধ্যাত্মিকের
কোথারও এই মূর্তি দৃষ্ট হয় না। দক্ষিণা-
পথেরও কেবল একটা স্থানে নটরাজের মূর্তি
নিষ্ঠমান আছে। এই স্থানের নাম চিবদ্বারম্।
ইহা মাদ্রাজের প্রায় ১৫০ মাইল দক্ষিণে
অবস্থিত। চিবদ্বারম্ শৈবশাস্ত্রানুসারে সঙ্গ-
জধানী ভীর্ষ স্থান। ১১০২ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ
মাসে লক্ষা হইতে প্রত্যাগমনকালে আমি
চিবদ্বারম্ পরিদর্শন করি। চিবদ্বারম্ নটরাজের
একটি বৃহৎ মন্দির বিস্তারিত আছে। এই
স্থানের নটরাজকে দর্শন করিবার লক্ষ

ভারতী ।

আষাঢ়, ১৩১৮

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও লক্ষ্যবীণ হইতে
শত শত বাক্সী প্রতিদিন সমাগত হয়।
মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা যন্ত্রের সহিত আমাকে
সমস্ত প্রদর্শন করেন। দাক্ষিণাত্য ত্র্যম্বকগণ

নটরাগকে প্রণাম করিবার সময় নিম্নলিখিত
স্তোত্র পাঠ করেন :—
লোকানাহর দর্শনং ভবককনির্দয়ঃ শোভ
সুন্দর মরান্। পদ্মহস্তীতিঃ দক্ষিণঃ প্রপত-



ভয়হরঃ কুচিতপ্পাদিপদ্ম উদ্ধৃতোদঃ
বিমুক্তোরনমিত্তি করাধনধন ঐতাদর্থঃ ।। বিন্দু
বহিঃ সত্তাঃ কলহতি নটনঃ যঃ স
পারায়ণটোশঃ ৩ ৪

“যিনি ভয়হর পরিনিধারা ঘোর সংসারময়
লোকদিগকে আত্মান করেন, যিনি দয়া-
পরবশ হইয়া ঐগতভক্তের বিপত্তি নিবারণ
পূৰ্ণক অভয়দান করেন, যিনি কুচিত
পাদপদ্ম উত্তোপন করিয়া হস্তনির্দেশপূৰ্ণক
বলেন ‘ইহাই মুক্তির পথ’ এবং যিনি
কপালে ও হস্তে বহিঃ ধারণ করিয়া সত্তার
নৃত্য করেন, সেই নটরাজ আমাদিগকে
রক্ষা করুন।”

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পাঠেন কি
করিয়া লক্ষ্য নটরাজের মুক্তি প্রবেশ করিল।
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—লক্ষ্যর তামিল
অর্থাৎ হিন্দু অধিবাসিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই
শৈব। উহার দক্ষিণাংশ হইতে লক্ষ্যর গমন
করিয়া তথায় সটরাজের পূজা প্রবর্তিত
করিয়াছিল। উপরে যে মূর্তির বিবরণ
এদত্ব হইল উহা পুলশ্যাপুর প্রদেশের অগ্রে
অর্থাৎ অদ্য ৮০০ বৎসর পূর্বে লক্ষ্যর নির্মিত
হইয়াছিল।

কতকাল পূর্বে তামিলগণ লক্ষ্যর প্রথম
প্রবেশ করে ইহা নির্ধারিতরূপে বলা যায় না।
লক্ষ্যর অগ্রদিক রাজা বিজয়সিংহ ও তাঁহার
অজ্ঞেয়বর্গ তামিল কত্যা বিবাহ করিয়া-

ছিলেন। কথিত আছে লক্ষ্যের রাবণ
তামিলগণ সমুদ্ভূত। লক্ষ্যর অনেক তামিল
ক্ষত্রিয় আমাদিগকে রাবণের বংশধর বলিয়া
পরিচয় দেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে
কিরিয়া আলিবার কালে তৎসম্মিহিত পাণ্ডু
নামক স্থানে আমি একদিন অবস্থান করি।
তৎকাল জলযান পরিদর্শক (Steam agent)
তামিল ক্ষত্রিয়। তাঁহার সহিত আমার
নানা বিষয়ে কলোপকণন হয়। তিনি
আমাকে বলিলেন—“মহাপর, আমরা
রাবণের সুলে সমুৎপন্ন। রাবণ দক্ষিণাংশের
রাজা ছিলেন। বহু তামিল সৈন্ত সম্ভি-
বাহারে তিনি লক্ষ্যর গমন করিয়া ঐ দীপ
অধিকার করেন। রাবণ বহু লক্ষ্যর রাজ্য
করিতেন। তাঁহার প্রতিনিধি দক্ষিণাংশের
শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেন। বাস্তবিক
রূপে লক্ষ্যর বলিগাছেন বলিয়া আমরা
বঞ্চার্থ ইহা কক্ষল নহি। দক্ষিণাংশের তামিলগণ
কক্ষকার দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। কাহারও মতে তামিল
কাবা সংস্কৃতির অপেক্ষা প্রাচীন। তামিলগণের
সামাজিক ব্যবস্থা বহুতর। উজ্জরতারত হইতে
আযোগল দক্ষিণাংশে প্রবেশ করার তামিল
সভ্যতার লোপ ও বৈদিক সভ্যতার প্রচার
হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার প্রচারের সঙ্গে
সঙ্গে তামিল সাহিত্যের প্রচার ক্ষয়
হইয়াছে।”

ঐসতীশচন্দ্র বিদ্যাহরণ ।

তাপ ও উত্তাপ ।

আমরা সচরাচর যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই তাহাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতে পারে । কঠিন, তরল এবং অনিল ।^১ বর্ণ, গৌরব, প্রভৃতি প্রকৃতি বস্তু কঠিন ; পারদ, জল ইত্যাদি তরল ; এবং বায়ু, জলীয় বাষ্প, উদ্ভজন প্রভৃতি অনিল । এই তিন প্রকার অবস্থার বিশেষত্ব ও স্থল কারণ এই প্রবন্ধের আশেপাশে বিবরণ । প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে কি ধর্মের বিভিন্নতার পদার্থের এই ত্রিধা বিভাগ করা হইয়াছে ।

কঠিন পদার্থ আপন আকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বতন্ত্র রূপ ও আয়তনবিশিষ্ট হইয়া থাকে । এক বস্তু কঠিন বস্তু একবার যে আকৃতি প্রাপ্ত হয়, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইলে বা এক আধার হইতে অপর আধারে স্থানান্তরিত হইলে, সর্বদা সেই আকৃতির রূপান্তর হয় না । বিনা কারণে কঠিন বস্তুকে বক্রীকৃতও করা যায় না । সকল কঠিন বস্তুই একটা স্থায়ী আকৃতি থাকে । কিন্তু তরল পদার্থ সেরূপ নহে ; যে পাত্রে রাখা যায়, তাহা অবিলম্বে আপনাপানি সেই পাত্রের আকৃতি প্রাপ্ত হয় । গোলাকার পাত্রে জলের আকৃতি গোলা ; লম্বা নলের মধ্যে উহার আকৃতি এই নলের স্তম্ভ লম্বা । উহাদের নিজের কোন বিশিষ্ট আকৃতি নাই ; আধার পাত্রের আকৃতিই উহাদের আকৃতি । অপিচ, বিনা কারণে তরল বস্তুকে এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে

ঢালা যায় এবং ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করা যায় । কঠিন পদার্থে ছুরিকা দ্বিধিলে একটা বাধা অনুভূত হয়, কিন্তু তরল পদার্থে সেরূপ কোন বাধা নাই । কঠিন পদার্থে ছুরির দাগ বহুকাংশে স্থায়ী, তরল পদার্থে দাগ স্থায়ী হয় না । কঠিন পদার্থের ভগ্ন বিশেষ কোন আধার পাত্রের আবদ্ধক নাট, যেখানে রাখা সেইখানে থাকে ; কিন্তু তরল পদার্থ কোন পাত্রে না রাখিলে ছড়াইয়া পড়ে ও বিহীন যায় । এই বিহীন বাগড়াই তরল পদার্থের বিশেষত্ব । জল, চন্দ্র, পারদ প্রভৃতি তরল পদার্থের এই বস্তুগত চাকলাই প্রধান ধর্ম । কঠিন ও তরল হইতে অনিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । বায়ু, অল্পজন প্রভৃতি পদার্থ যদিও দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপি স্পর্শ দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে । গাছের পাতা নড়িলেই বায়ু আছে এ ধারণা সর্বত্রই চইয়া থাকে । অনিল পদার্থের কোন বিশিষ্ট আকৃতি নাই এবং উদ্ভুক্ত পাত্রে রাখিলে উহার নীচই অপরূপ হইয়া বস্তুগত সমস্ত বিস্তৃত বায়ুগত অধিকার করে—পাত্র হইতে স্বতঃ বিহীন হইয়া তাবৎ স্থানে ছড়াইয়া পড়ে । তরলের স্তম্ভ অনিলও এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিতে পারা যায়, এবং উহা আধার-পাত্রেরই আকৃতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অনিলের একটা বিশেষত্ব, ও তরল হইতে বিভিন্নতা আছে—তরল পদার্থ উদ্ভুক্ত পাত্রে

১ এই পরিভাষা আধার পূর্ণ প্রযুক্তে ব্যবহৃত হইয়াছে । উহা অধ্যাপক হিগ্গিন্স রিপোর্ট অনুসারে প্রস্তুত ।

(খোলা বোতলে বা বাটিতে) রাখিলে তৎক্ষণাত্ সেই পাত্র হইতে বাহির হইয়া প্রথম ছড়াইয়া পড়ে না ; ক্রমশঃ বাষ্পাকারে পরিণত হইলে, অর্থাৎ তবল হইতে অনিল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর তৎ প্রস্থিত বায়ু-মণ্ডলের সহিত মিশিয়া যায়, অনিলকে কোন পাত্রে কিছুকাল রাখিতে হইলে সেই পাত্রে বিন্দুমাত্র হিষ্টি থাকিলে চলিবে না ; সম্পূর্ণ-রূপে অবশুষ্ক পাত্রেই অনিল বিতৃষ্ণ অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। অনিল পদার্থের আরও এক বিশেষত্ব আছে। উহা প্রায়ই বায়ুর দ্বারা বর্ণহীন এবং অত্যন্ত লঘু।

জড় পদার্থের সাধারণ ধর্ম উহার গুণত্ব। অনিল অল্প পদার্থ—এবং উহার গুরুত্ব আছে। কিছু কঠিন ও তরল বস্তুর তুলনায় অনিল এত লঘু যে উহার ওজন সহজে করা যায় না। বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের দ্বারা একটা বোতলের সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া ফেলিলে ঐ বোতলের ওজন কমিয়া যায়। সাধারণ খালি বোতল বায়ুপূর্ণ থাকে। উহাকে বায়ুহীন করিয়া ওজন করিলে তার কম বোধ হয়। তার বস্তুটা কম হয়, সেইটুকু এক বোতল বায়ুর ওজন। মনে কর, একটা বোতল জল শুষ্ক ওজনে পাঁচ পোয়া হইল। জল ফেলিয়া দিয়া “খালি” বোতলের ওজন, খস আধ সের। তাহা হইলে যে জলটুকু ফেলিয়া দেওয়া হইল, উহার ওজন কত ? সাধারণতঃ বলিব, তিন পোয়া কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলেই তুল খস পড়িবে। যে বোতলটা আমরা “খালি” বলিলাম ও বাহার ওজন আধসের হইল, বস্তুর

সে বোতল পালি নহে। উহার

বোতল বায়ু আছে। সুতরাং,

বোতল + জল = পাঁচ পোয়া। (১)

বোতল + বায়ু = আধ সের। (২)

এই দুইয়ের এর অস্তর লক্ষ্য করিলে ওজন হইবে না। জলের ওজন তিনপোয়া অপেক্ষা বেশি—ঐ বায়ুর ওজন বস্তু ততটুকু বেশি। যদি দ্বিতীয় ওজনে কেবল বোতলের ওজন আধ সের হইত, তাহা হইলে জলের ওজন তিন পোয়া হইত। কিন্তু এখানে শুষ্ক বোতলের ওজন আধ দেহের অপেক্ষা কম, কারণ বোতলের সহিত বায়ু লইলে তৎ আধ সের হয়। সুতরাং বোতল ও জল পাঁচ পোয়া এবং বোতল আধসেরের কম হইলে, জল তিন পোয়ার বেশি। এ স্থলে (১) ও (২) বিয়োগ করিলে, জল-বায়ু = তিন পোয়া হয়। অতএব জলের ওজন = তিন পোয়া + বায়ু। কিন্তু বায়ুটুকু এত লঘু যে তিন পোয়ার সহিত যুক্ত হইলে বস্তু একটা বেশি পার্থক্য হয় না। তিন পোয়ার তুলনায় বায়ুর ওজনটি ছাড়িয়া দিলে বিশেষ ক্ষতিও হয় না। এক বড় জল হইতে যদি এক বিন্দু জল ফেলিয়া দিই তাহা হইলে বড় ও জলের ওজন কম বোধ হয় না। ইহা আমাদের বোধ শক্তির দোষ সন্দেহ নাই। স্বস্ত তুলানও আমাদের দ্বারা অক্ষর্য্যগা নহে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত লঘু বস্তুরও গুরুত্ব পরিমিত হইতে পারে। নিম্নে যে হিসাব দেওয়া গেল তাহাতে অনিলের লঘুত্ব বুঝা যাইবে।

যে আয়তন (১০০০ লিটার) জলের

০.০০ ইঞ্চি বা ১০ ফাট লম্বা $\times$ ১ ইঞ্চি $\times$ ১ ইঞ্চি আয়তন = ১১.২ ঘন ফাট বা আর ৩৭ ঘন ফুট ১০০ লিটার।
১ ঘন ফুট জলের ওজন আর ৩১০ সের। সুতরাং ৩৭ ঘন ফুট জলের ওজন আর ২৮ মণ। পরীক্ষা দ্বারা

ওজন ২০ মন দেই আরজন উদজনের ওজন দেড় ছটাক মাত্র! ইহা হইতে অনিলের লম্বা অস্বাস্থ্য হইবে। উদজনের অপেক্ষা দলীয় বালের ওজন প্রায় নয় গুণ অধিক ও বায়ুর ওজন ১৪ গুণ অধিক।

কঠিন তরল ও অনিল এট তিনটি অভিধা যে, কোন বিশেষ বিশেষ পদার্থের নাম তাহা নহে। উহারা পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার নাম মাত্র। একই বস্তু ক্রমাগত ঐ তিনটি অবস্থাই প্রাপ্ত হইতে পারে। বস্তুগত পরিবর্তন না হইয়া কেবল অবস্থার পরিবর্তন হইলে একই পদার্থ ঐ তিন প্রকার বিভিন্ন ধরণের হয়। জল কখন কঠিন তুষার, কখন তরল হাতি, কখন আবার অনিল বাষ্প—এই তিন অবস্থায় পাওয়া যায়। উহার বস্তু জল পাই থাকে। লবণ অবস্থাতেই উহা অস্বাস্থ্য ও উদজনের যোগিক; তুপারে, তরলে, বাষ্পে ঐ চুট উপাদান ও তাহাদের পরিমাণ সমান থাকে। নয় সের জল যে অবস্থা হইতেই বিশিষ্ট হইক না কেন, লব্ধি এক সের উদজন ও আট সের অস্বাস্থ্য উৎপন্ন করিবে;—বস্তুগত বৈলক্ষণ্য হয় না কেবল আকৃতিগত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে অনায়াসে আনিতে পারা যায়। এই অবস্থার পরিবর্তন তাপ সাহায্যে হইয়া থাকে। সামান্য তাপে এমন কি হস্তের উত্তাপে বরফ গলিয়া তরল

বারিক্রমে পরিণত হয়; যথেষ্ট তাপ দিলে ঐ বারি সূত্রিগ অনিল অবস্থায় বাষ্পাকারে পরিণত হয়। আবার যথেষ্ট শীতল করিলে (তাপ বাহির করিয়া লইলে) বাষ্প হইতে বারি এবং বারি হইতে বরফ পাওয়া যায়। এইরূপে অধিকাংশ পদার্থ তাপের তারতম্যে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাপের অল্প প্রবেশে কঠিন হইতে তরল ও অনিল, এবং তাপের নির্ভর্যে অনিল হইতে তরল ও কঠিন অবস্থান্তর হইয়া থাকে।

পদার্থের এই তিন অবস্থার মূল কারণ তাপ। তাপ কি? উহা যে জড় পদার্থ নহে তাহা সহজেই জানা যায়; কারণ তাপের গুরুত্ব নাই। একসের বরফ হইতে একসের মাত্র জল পাওয়া যায়, বেশিও নহে, কমও নহে। অথচ খানিকটা তাপ না দিলে বরফ গলিবে না। তাপশূন্য হইয়া যখন 'ওজন বাড়িল না, তখন অগত্যা বীকার করিতে হয় যে তাপ সাধারণ জড়পদার্থ নহে। যদি জড় পদার্থ না হয়, তবে তাপের প্রবেশ, তাপের নির্গম পরিচালন ইত্যাদি জড়জ্বলন্ত ক্রিয়া উহা দ্বারা কিরূপে সম্ভবে? এ স্থলে পরীক্ষা দ্বারা যতটুকু জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

আমরা তাপের সাধারণতঃ এই কর্তি ক্রিয়া দেখিতে পাই।

(১) পদার্থের উত্তাপ বৃদ্ধি।

(২) পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি ।

(৩) কঠিন, তরল, অনিল এই তিন অবস্থার পরিবর্তন ।

(৪) রাসায়নিক সংশ্লেষণ বা বিশ্লেষণ ।

(৫) বৈজ্ঞানিক প্রবাহ সৃষ্টি ।

একে একে এই কয়টি ক্রিয়া বিশদরূপে দেখা যাইক। যে শক্তির দ্বারা উপরি উক্ত ক্রিয়া সকল সম্বন্ধিত হয়, তাহার নাম তাপ । তাপ একটি ক্রিয়াশীল শক্তি ।

১। পদার্থের উত্তাপ। কোন পদার্থের তাপ সংক্রান্ত অবস্থার নাম উত্তাপ । তাপ কার্যকরী শক্তি, উত্তাপ সেই শক্তির পরিচায়ক অবস্থামাত্র । পদার্থ তাপসংযোগে উত্তপ্ত হয়, তাহার উত্তাপের বৃদ্ধি হয় ; তাপের নির্গমনে উত্তাপের হ্রাস হয় । জল যেমন সমদিক উচ্চ স্থান হইতে নিম্নতর স্থানে প্রবাহিত হয়, তাপও সেইরূপ সমদিক উত্তপ্ত বস্তু হইতে পরিচালিত হয় । সমতলের এক স্থান হইতে অপর স্থানে যেমন জল প্রবাহিত হয় না, সেইরূপ দুইটি সমান উত্তপ্ত বস্তুর কোনটি হইতে তাপ অপরটিতে বাইতে যেনা যায় না । এখানে তাপের উপমান জল এবং উত্তাপের উপমান ঐ জলের উচ্চতা বা নিম্নতা । জলের উচ্চতা যেমন জল নদে, জলাধারের একটা অবস্থা মাত্র, সেইরূপ উত্তাপ তাপ নদে, তাপাধারের অবস্থা মাত্র । তাপের গতি সর্বদা উত্তপ্ত বস্তু হইতে শীতল বস্তুর দিকে ।*

একটি উত্তপ্ত ও একটি শীতল বস্তু পরস্পর

সংলগ্ন করিয়া রাখিলে, তাপ উত্তপ্ত বস্তু হইতে বহির্গত হইয়া শীতল বস্তুতে প্রবিষ্ট হয় । ক্রমশঃ উত্তপ্ত বস্তুটি শীতল হইতে থাকে ও শীতল বস্তুটি উত্তপ্ত হইতে থাকে । তাপ যতই কমিতে থাকে, প্রথম বস্তুটি ততই শীতল হইতে থাকে, এবং ততই অল্পপরিমিত তাপ উৎস হইতে নির্গত হইতে থাকে । দ্বিতীয় বস্তুটিতে যতই তাপ বাহিতে থাকে, উঃ ক্রমশঃ ততই উত্তপ্ত হইতে থাকে এবং উৎসে ততই অল্পপরিমিত তাপ প্রবেশগত করিতে থাকে । পরিণামে যখন উভয়ের তাপিক অবস্থা (উত্তাপ) সমান হইয়া উঠায়, তখন আর তাপের পরিচালনা অসম্ভব হয় না । এইরূপ উত্তাপের সাম্যাবস্থারও তাপের গতি কিছু একেবারে বিনষ্ট হয় না । দুইটিরই উত্তাপ সমান, সেইজন্য দুইটি হইতেই সমান পরিমাণে তাপ নির্গত হইয়া একের উত্তাপ অপর দ্বারা কিছু সেই তাপের পরিমাণ সমান বলিয়া একটি বস্তু হইতে যতটুকু তাপ নির্গত হয়, ঠিক ততটুকু তাপ অপরটি হইতে নির্গত হইয়া উহাতে পুনঃপরিষ্ট হয় ; এইজন্য উভয় তাপের পরিমাণ অবিকৃত থাকে । এইরূপে যতগুলি উত্তাপ বিশিষ্ট বস্তু একত্র থাকে, কালে সকলের উত্তাপ সমান হইয়া যায় এবং প্রত্যেকটি যতটুকু তাপ অপরগুলিকে দেয়, ঠিক ততটুকু তাপ ফিরিয়া পায় । একত্র পক্ষে তাপের পরিচালনা হইতে থাকে, কিন্তু আশ্রয় নির্গমনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে হঠাৎ প্রত্যেকের

* এক বড় সূঁচের জল ও এক বাঁটি সূঁচের জল উভয়ের উত্তাপ সমান ১০০ ডিগ্রী) কিন্তু বড়ান জলে তাপ যে অনেক বেশি তাহা সহজেই বুঝা যায়। উভয়কে সমান উত্তাপে রাখা হইলে বড়ান জল হইতে বেশি পরিমাণ তাপ বাহির করিতে দিবে ।

তাপের সমষ্টি অক্ষর থাকিয়া যায়। এইরূপ তাপের উচ্চতা ও নিম্নতা বিপুল হইলেও, তাপ সমস্তে অবস্থিতি করিলেও, এক বস্তু হইতে অপর বস্তুতে তাপের চলাচল হইতে থাকে, কিন্তু মোটের উপর উভয়েরই লাভ লোকসান সমান হওয়ার সান্যাবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অবস্থাকে “উত্তাপের চলংসাম্যাবস্থা” (Mobile Equilibrium) বলিতে পারি।

প্রত্যেক নক্তির কার্যকারিতা দুইটি রানির গুণফলের উপর নির্ভর করে। একটি ঐ নক্তির পরিমাণ (Quantity factor) এবং অপরটি ঐ নক্তির প্রাপ্যতা (Intensity factor)। স্রোতের দ্বারা চালিত যন্ত্রাদির পক্ষে জলস্রোতের কার্যকারিতা জলের পরিমাণ ও স্রোতের বেগে এই উভয়ের উপর নির্ভর করে। স্রোতে জল যত বেশি পরিমাণে প্রবাহিত হইবে, ঐ যন্ত্রাদি ততই অধিক কার্য করিবে। সুতরাং ঐ যন্ত্রের কার্য ক্ষেত্ররূপে এবং সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে কেবল জল লইলেই চলিবে না, ঐ জলের একটা বেগও আবশ্যক। এক দের জল খটোর এক মাইল বেগে প্রবাহিত হইলে যে কার্য লাভ হইবে, দুই দের জলে সেই গতিতে তাহার বিগুন ফল লাভ হইবে; আবার যদি ঐ দুই দের জল খটোর দুই মাইল বেগে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে $(২ \times ২ = ৪)$ চতুর্ভুগ ফল লাভ হইবে। জলস্রোতের প্রাপ্যতা উহার বেগ; যত উচ্চ হইতে যত নিম্নে স্রোত বাইবে, ততই ঐ বেগ বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং ঐ প্রাপ্যতা-বৃদ্ধক রানি জলের উচ্চতা ও নিম্নতা লইয়া নিরূপিত হয়। তাপেরও অবিকল

ঐরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হয়। তাপ যখন কোন উত্তপ্ত বস্তুতে স্থিরভাবে থাকে, তখন উহার দ্বারা এতদিন প্রকৃতি কোন বস্তুই পরিচালিত হইতে পারে না। ঐরূপ বস্তু পরিচালিত করিয়া কার্যকর লাভ করিতে হইলে তাপকে উত্তপ্ত বস্তু হইতে শীতল বস্তুতে প্রবাহিত করিতে হইবে;—তাপেরও একটা স্রোত সৃজন করিতে চাইবে। উক্ত বস্তুদ্বয়ের উত্তাপের দূরত্ব যত বেশি হইবে, তাপ ততই বেশি কার্যক্ষম হইবে। প্রত্যেক এতদিন একটি উত্তপ্ত বস্তু, তাপের উৎস (Boiler or source) ও একটি শীতল বস্তু, তাপের নিরন্তর আধার (Condenser or Refrigerator) দ্বারা অপরিহার্য। সাধারণতঃ এতদিনে মণীর বাষ্পের আর-তন বৃদ্ধি ও হ্রাস লইয়া কার্য হইয়া থাকে। তাপ সাধারণতঃ ঐ বাষ্প সমধিক প্রসৃত হইয়া যে নলে উহা অবরুদ্ধ থাকে তাহার মুখরোধক দণ্ডকে (piston rod) ঠেলিয়া উহা আরম্ভনে বাড়়। তাহাতে ঐ মলদণ্ডের একবারমাত্র একদিকে একটা গতি হয়। ঐ মলদণ্ডের গতি ক্রমাগত অক্ষর রাখিতে হইলে ঐ দণ্ডকে পুনরায় উহার পূর্বস্থানে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাহাতে ঐ তাপের নির্গমন আবশ্যক, সুতরাং একটা শীতল বা শৈত্যাদার (refrigerator) আবশ্যক। ঐ দণ্ড পূর্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইলে তাপের আবার পূর্নক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং অবিরুদ্ধ গতিতে এতদিন চলিতে থাকে। যদি শৈত্যাদার না থাকে তাহা হইলে তাপ একবারমাত্র কার্য করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যায়। যতক্ষণ ঐ এতদিনের দ্বারা কার্য লাভ করিতে হইবে, ততক্ষণ তাপ, উত্তপ্ত

৩৪শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

তাপ ও উত্তাপ।

উৎস হইতে নৈত্যাধারে অবস্থিত গতিতে পরিচালিত হওয়া অপরিহার্য।

সূর্যে বলা হইয়াছে দুইটি বিভিন্ন উত্তাপ-বিশিষ্ট বস্তু নিকটে থাকিলে উভয়ে অবশেষে উত্তাপের সমতা প্রাপ্ত হয়। এই বিধান, কোন এক্ষিনু বস্তুই কার্য করিতে থাকিলে উৎস হইতে তাপ ততই বৃদ্ধীভূত হইয়া নৈত্যাধারে বাইবে। অবশেষে বস্তু উৎস ও নৈত্যাধারে এই দুইয়ের উত্তাপ সমান হইয়া পড়িলে, তখন আর এক্ষিনু চলিবে না। অগতে যে সকল পরিবর্তন হইতেছে, তাহাতে কালে সকল বস্তুরই উত্তাপ সমান হওয়াই সম্ভব। হ্রদে তথ্যেতে সকল পদার্থের উত্তাপ সমান হইয়া পড়িলে তাপসংক্রান্ত সনত ক্রিয়াই স্থগিত থাকিলে। গতি, ক্ষুধি, এমন কি বৃক্ষগতাদি ও জীবগণের অস্তিত্ব বিস্ময় হইবে। এ নিয়ম বারম্বারে সর্বিসেধ মালোচিত হইবে।

নির্দিষ্ট পরিমিত তাপ সংযোগে সকল বস্তুর উত্তাপ সমান পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় না। যে তাপে জলের উত্তাপ ০ ডিগ্রী হইতে ১০০ ডিগ্রী ওঠে, সেই তাপে সেই ওজন পানির উত্তাপ মাত্র তিন ডিগ্রী উঠে। সুতরাং সমান ওজন অশ ও পানির উত্তাপ সমানভাবে বৃদ্ধি করিতে হইলে পানি অপেক্ষা জল প্রায় ৩৩ গুণ অধিক তাপ দেওয়া আবশ্যিক। খালু মাত্রেরই বর উত্তাপে সমধিক উত্তপ্ত হয়। এইরূপে প্রত্যেক বস্তুরই একটা “আপেক্ষিক তাপ” (specific heat) আছে। সমান ওজন জলের সত্ত্ব সামান্য উত্তাপ আনিতে হইলে বস্তু তাপ আবশ্যক সেই অনুপাতে বস্তুর আপেক্ষিক তাপ নিরূপিত হয়। নিয়ে কতকগুলি বস্তুর আপেক্ষিক তাপ দেওয়া গেল :—

অশ	১
পানির	১
গন্ধক	০.১৭
সোহ	০.১২
মৌখ্য	০.১০
মস্তা	০.১২
তাম্র	০.১০
বর্ণ	০.১০

ইত্যাদি

তাপের এই বস্তুগত ক্রিয়া, উত্তাপ বৃদ্ধি, লইয়া তাপের পরিমাণ নিরূপিত হয়। কোন বেষার সৈধ্য মাপিতে হইলে যেমন একটা “মাপকাটি” থাকা আবশ্যক, তাপেরও সেইরূপ একটা আদর্শ পরিমাপক কিছু থাকা আবশ্যক। সেই সত্ত্ব যে পরিমাণ তাপ এক গ্রাম ওজন জলকে ০ ডিগ্রী হইতে ১ ডিগ্রী উত্তপ্ত করিতে পারে, সেই পরিমাণ তাপকে আদর্শ লইয়া উহার নাম এক “ক্যালোরী” তাপ রাখা হইয়াছে। তাপের পরিমাণ কত ক্যালোরী আনিতে হইলে, ঐ তাপে এক গ্রাম ওজনের বিতচ্ছ অশ ০ ডিগ্রী হইতে কত ডিগ্রী উত্তপ্ত হইতে পারে দেখিয়া, প্রতি ডিগ্রীতে এক ক্যালোরী হিসাবে, বস্তু ডিগ্রী কত ক্যালোরী ধরা হয়।

গন্ধকের আপেক্ষিক তাপ ০.১৭; ইহার অর্থ এই যে, এক গ্রাম গন্ধককে ০ ডিগ্রী হইতে ১ ডিগ্রী উত্তপ্ত করিতে হইলে ০.১৭ ক্যালোরী তাপ আবশ্যক, অর্থাৎ সেই তাপে সমান ওজন (এক গ্রাম) অশ ১ ডিগ্রীমাত্র উত্তপ্ত হয়।

ক্যালোরী তাপের পরিমাপক, উত্তাপের নহে। উত্তাপ তাপসম বস্তুর (thermo-

meter) দ্বারা নিরূপিত হয়। বহু পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে যে সত্ত্ব গলনশীল বস্তুক এবং স্ট্রটর জলের বাষ্প এই উভয়ের উত্তাপ বেশকালপন্যন্তভেদে বিকৃত হয় না ;—উহা কেবল বায়ুর চাপের উপর নির্ভর করে। প্রথম উত্তাপকে ০ ও দ্বিতীয়টিকে ১০০ এই সংখ্যা দিয়া উহাদের যে অন্তর হইবে তাহাকে একশত সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী উত্তাপ বলা যায়। “কোন বস্তুর উত্তাপ ৪০ ডিগ্রী,” ইহার অর্থ হইবে গলন-শীল বস্তুক ও সেই বস্তুর উত্তাপের বৃত্ত অন্তর, ঐ বস্তুক হইতে স্ট্রটর জলের উত্তাপ তাহার ৪০ বা ২ গুণ অধিক। তাপমাত্রা বস্তু ও তাহার ক্রিয়া পরে বিবৃত হইবে।

২। পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে তাপসহযোগে সকল বস্তু আয়তনে বাড়ে। কয়লার উন্নত তৈয়ারি করিবার সময় দোহার নিকতলি মাটিতে বেশ আঁটিয়া বসান হইয়া থাকে ; কিন্তু হুই একবার অগ্নি আলিলে ঐ নিকতলি চিলা হইয়া যায়। সময়ে সময়ে উন্নতনের স্তিতর হইতে শিকের গোড়ার মাটি বদিয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, তাপবৃদ্ধ হইলে লৌহশলাকা লম্বা বাড়িয়া থাকে এবং উত্তাপ হ্রাস হইলে আবার উহার সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বৃত্তিকাও আয়তনে বর্ধিত হয় বটে কিন্তু পৌর ভঙ্গপেক্ষা অধিক বর্ধিত হয় ; সূত্র্যঃ একটু স্থান লাগি পড়িয়া থাকার নিক চিলা হইয়া যায়। তাপের মাত্রা বেশি হইলে শিকের দৈর্ঘ্য এত বৃদ্ধি হয় যে তাহার চাপে কঠিন বৃত্তিকা ফাটিয়া স্থানচ্যুত হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গ লক্ষ্য হইট রেলের মধ্যে

একটু ব্যবধান ইচ্ছা-পূর্বকই রাখা হয়, কারণ গাড়ির চাকার ঘর্ষণে রেল উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে যদি প্রসারের স্থান না থাকে ত বেগ থাকিবে না। দিবসের উত্তাপে টেলিগ্রাফের তার বেশি ফুলিয়া পড়ে, প্রাতঃকালে বা শীতকালে তার বেশ টানা থাকে।

কঠিন, তরল ও অনিল সকল পদার্থই উত্তাপ সাহায্যে আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কঠিন অপেক্ষা তরল এবং তরল অপেক্ষা অনিল অধিক প্রসৃত হয়। অনিল পদার্থের বিবৃতি যেমন সর্বাধিক অধিক, তেমনি বস্তু তাপেই উহাদের আয়তনের বিশেষ প্রসার বৃদ্ধি দেখা যায়। প্রায় সমস্ত অনিল এই নিয়মে বাড়ে যে, ২৭৩ ঘন স্ট্রট, ১ ডিগ্রী হইতে উত্তপ্ত হইলে প্রত্যেক ডিগ্রী উত্তাপে আয়তনের বৃদ্ধি ১ স্ট্রট হয়। কঠিন বা তরলের বৃদ্ধি এক্ষণে কোন স্থানীয়তায় অবগত নহে।

যদি কোন উপায়ে উত্তপ্ত বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি নিবারণ করা যায় তাহা হইলে আহার পাত্রে পাত্রে উহার চাপ সমধিক বেশি হয়। এক্ষণের নলে জলীয় বাষ্প ক্রমাগত উত্তপ্ত হইয়া চাপ বৃদ্ধি করে বলিয়া নলদণ্ড গাঢ়িত হয়। বীশন উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে, চাপও এত বেশি হয় যে সময়ে সময়ে বগলার (boiler) ফাটিয়া যায়। বায়ুধের বানা অতি ক্ষুদ্র ; কিন্তু অগ্নি-সংযোগে ঐ বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন হইয়া এককালে এত বেশি অনিল উৎপন্ন হয়, যে, যে পাত্রে বায়ুদ রাখা হয় সেই পাত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। পটকা প্রভৃতি আতশবাজী এইরূপে কার্য্য করে। লৌহনলের মধ্যে ঐ অনিল

উৎপন্ন হইয়া বস্তুকেই স্তম্ভ জীবাণুবেগে বিদ্যুত করায়।

অনিলের এই উচ্চ প্রসারণশীলতা অনেক কাজে আসে। আরতনে সমধিক বর্জিত হইলে বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস হইয়া যায়। এক ঘন ফুট বায়ু উত্তপ্ত হইয়া যদি দুই ঘনফুটে পরিণত হয়, তবে সেই উত্তপ্ত বায়ুর এক ঘন ফুট ওজন পূর্ণ শূন্যত ঘনফুটের আর্দ্রক হইবে। স্তম্ভসং সন্ধান আরতন লইলে শীতল অনিল অপেক্ষা উত্তপ্ত অনিল অনেক লঘু। এক বোতল শীতল জল লইয়া উহার উত্তাপ বৃদ্ধি করিলে দেখা যায় যে বোতল ছাপাইয়া স্তম্ভ জল বাহির হইয়া গাইবে। অবশিষ্ট উত্তপ্ত জল যদিও বোতল পরিপূর্ণ করিয়া রাখা হইবে, তথাপি যতটুকু বাহির হইয়া গিয়াছে, ততটুকু ওজনে কম। ঐ জল আবার শীতল করিলে একটু স্থান খালি থাকিয়া গাইবে। এমন জ্রব্য অনেক আছে, যাহা শীতল জলে ভালে ও গরম জলে ভুবিয়া যায়। ইহার কারণ শীতল জল উত্তপ্ত জল অপেক্ষা ভারি।

একটা খালি (বাহুপূর্ণ) বোতল উল্টাইয়া উহার মুখ—একটা পাত্রহিত জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে যদি ঐ বোতল উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে দেখা গাইবে যে বোতলের বায়ু বুদবুদের আকারে মুখ হইতে নির্গত হইয়া জলের ভিতর দিয়া উপরে উঠিতেছে। কিরৎক্ষণ পরে অনেকটা বায়ু নির্গত হইয়া গাইবে। এ স্থলে উত্তপ্ত বায়ু যে আরতনে বর্জিত হইল, তাহা বেশ বুঝা গেল। পরে যখন বোতলটি শীতল করা যায়, আত্যন্তরীন বায়ুর সর্বোচ্চও দেখা যায়—জল বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়া, যতটুকু বায়ু বর্জিত হইয়া গিয়াছে, তাহার স্থান অধিকার করে। উত্তপ্ত অবস্থায় বোতলের ও আরতন বাড়িয়াছে, কিন্তু স্তম্ভ বায়ু বোতল হইতে নির্গত হইল বলিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, বোতল (কাচ) অপেক্ষা বায়ুর প্রসার বৃদ্ধি অনেক বেশি। এই পরীক্ষার ইহাও জানা গেল যে, উত্তপ্ত বায়ু আরতনে বাড়ি বলিয়া শীতল বায়ু অপেক্ষা ভারি অনেক লঘু।

যে ঘরে অনেক লোকের বাস সেই ঘরের বায়ু সহজেই উত্তপ্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত লঘু হয় ও উপরে উঠে। কবাত অর্ধ-উষ্ণক রাখিয়া একটা জলজ্বাতি ঘরের উপরি-ভাগে বসিলে দেখা যায় যে শিখা বাহিরের দিকে ঝাঁকিয়া থাকে, কারণ উত্তপ্ত লঘু বায়ু উপর দিয়া ঘরের বাহিরে যায়। ঐ বাতি ঘরের নিম্নদেশে বসিলে শিখা ভিতরের দিকে ঝাঁক, কারণ বাহিরের শীতল অপেক্ষাকৃত গুরু বায়ু নিম্ন স্থান দিয়া আসিয়া নির্গত বায়ুর স্থান অধিকার করে। ঘরের মধ্য দেশে দীপশিখা লম্বা ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। স্তম্ভসং বিতচ্ছ বায়ুর চলাচলের জন্য “কলু কলী” জানালা বা দার খুলিবার আবশ্যক নাই; একটা বড় জানালা বা দার উষ্ণক রাখিলেই যথেষ্ট। কারণ উত্তপ্ত বায়ু স্বীয় প্রসারণ বলে ঘরের উপরিভাগ দিয়া স্বয়ং বর্জিত হইয়া গাইবে ও বিতচ্ছ বায়ু নিম্নদেশ দিয়া তৎস্থানে আসিবে।

বিশাল প্রাকৃতিক জগতে বায়ুর এই প্রসারণশীলতার ফলে অসংখ্য মঙ্গল সাধিত হইতেছে। সূর্য্যভাগে দরা যখন উত্তপ্ত হয়, সেই সময় বায়ু উত্তপ্ত ধরণীর সংসর্গে উত্তপ্ত

হইয়া লব্ধ হয় ও উপরে উঠে। চতুঃপার্শ্বস্থিত শীতল বায়ু বেগে আনিয়া সেই উত্তপ্ত বায়ুর পূৰ্ণস্থান অধিকার করে। এইরূপে “বৃহৎ মলানিলি” হইতে ভীষণ ঝড়ের সৃষ্টি হয়। বায়ুর এই গতি আছে বলিয়াই এক স্থানের কম্প্রীত বায়ু সেই স্থান হইতে শীঘ্র বিদূরিত হইতে পারে।

৩। অবস্থার পরিবর্তন। যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলে কঠিন বস্তু তরলাবৃত্তি ও তরল বস্তু অনিলাবৃত্তি ধারণ করে। একখণ্ড বরফ ফ্রান্সেল, কবল অথবা কয়ালের গুঁড়ার মধ্যে রাখিলে উহাতে বহিঃস্থ তাপ গ্রহণে করিতে পারে না—বরফও গলে না। ইহার কারণ উক্ত ব্যবসকল তাপের অপরিচালক। তাপ নিলে তবে বরফ গলিতে আরম্ভ হয়; গলিবার সময় উহার উত্তাপ = ডিগ্রী। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত বরফ গলিয়া শেষ হয়, ততক্ষণ উহার উত্তাপ = ডিগ্রীই থাকে। তাপ বরফে অল্পপ্রাণিত হয় খটে কিছু উহার উত্তাপ বৃদ্ধি না করিয়া কেবলমাত্র অবস্থার বিভিন্নতা সম্পাদন করে। কঠিন হইতে তরল অবস্থার আনিতে হইলে সকল বস্তুরই ঐরূপ তাপ গ্রহণ ও প্রকরণভাবে বস্তুর অভ্যন্তরে উহা নকল ধর্ম দেখা যায়। এক গ্রাম ওজনের কঠিন, পানির গলনের উত্তাপে যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করিয়া উহা প্রকরণভাবে রাখিয়া সেই উত্তাপেই তরলীকৃত হইয়া থাকে তাহাকে ঐ কঠিনের “গলনতাপ” (Latent heat of fusion) বলিতে পারা যায়। মৌলিক ও বিশুদ্ধ যৌগিক কঠিন পদার্থসকলেরই বিশেষরূপে এই যে উহার নিদিষ্ট উত্তাপে গলিতে আরম্ভ হইয়া নিদিষ্ট পরিমিত তাপের সাহায্যে সেই উত্তাপেই

সম্পূর্ণরূপে গলিয়া যায়। নিম্নে কতকগুলি কঠিনের গলন-উত্তাপ ও গলন-তাপ দেওয়া গেল :—

কঠিন	গলনের উত্তাপ	গলনতাপ
বরফ	ডিগ্রী	৭২ ক্যালোরী
মস্তা	৪২০ .	২৮
সীসক	৩২৪ .	৪
রাং	২৩১ .	১৪
গন্ধক	১১৪৫ .	৯
মৌপ্য	১০০০ .	২১
লোহ	১৬০০ .	২৩ .

এই তালিকা দেখিলে বোধ হইবে যে বরফের গলন উত্তাপ যদিও অতি নিম্ন, উহার গলনতাপ সর্বাপেক্ষা অধিক। যে তাপে এক সের মাত্র বরফ গলে, সেই তাপে প্রায় পৌনে তিন সের মস্তা, সাড়ে পাঁচ সের রাং, নয় সের গন্ধক, ষোল সের সীসক, পৌনে চারি সের মৌপ্য ও সাড়ে তিন সের লোহা গলে। কিন্তু বরফের গলন উত্তাপ অতি নিম্ন (= ডিগ্রী) গলিয়া উহা শীঘ্রই গলিতে আরম্ভ হয়। ঐ সকল বস্তু গলিতে আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণরূপে গলিতে যত সময় ও তাপ লাগে, তাহার মধ্যে বরফের সর্বাপেক্ষা অধিক সময় ও তাপ লাগে। বরফ গলান সর্বাপেক্ষা শক্ত।

তরল বস্তু যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলে স্ফটিকা অনিলে পরিণত হয়। জল ১০০ ডিগ্রী পর্যন্ত তরল অবস্থায় থাকে। সেই উত্তাপে যদি উহাতে তাপ সংযোগ করা যায়, উহার উত্তাপ না বাড়িয়া উহা অনিল বাষ্প হইয়া পড়ে, উত্তাপ সেই ১০০ ডিগ্রীই থাকে। প্রত্যেক মৌলিক ও বিশুদ্ধ যৌগিক তরল পদার্থের

বিশেষণই এই যে উহারা নির্দিষ্ট উত্তাপে ছুটতে আরম্ভ হইয়া নির্দিষ্ট পরিমিত তাপ প্রদানভাবে লইয়া সেই উত্তাপেই সম্পূর্ণরূপে অনিলে পরিণত হয়। ঐ নির্দিষ্ট তাপকে ঐ তরলের ক্ষুণ্ণতাপ ও উত্তাপকে ক্ষুণ্ণতাপের উত্তাপ (Latent heat of vaporization and boiling point) বলা হইতে পারে। বতকণ একবিন্দু তরল অবস্থিতে থাকে ততক্ষণ উত্তাপ সমভাবে থাকে, সংযোজিত তাপ কেবল ঐ বতকে অনিল অবস্থায় আনিতে ও রক্ষা করিতে ব্যয়িত হয়। নিম্নে কতকগুলি তরলের ক্ষুণ্ণতাপের উত্তাপ ও ক্ষুণ্ণতাপ দেওয়া গেল :—

তরল	ক্ষুণ্ণতাপের উত্তাপ
জল	১০০ ডিগ্রী
মিথান (মিথেন)	৭৮
ইথিলিন	১৫৬
পাইথ	৩৫০
ফোরোফর্ম	৬১

এ স্থলেও জল সর্বাধিক অধিক তাপ লইয়া অনিলীভূত হয়। যে তাপে এক সের জল ছুটিয়া বাষ্প হয়, সেই তাপে নয় সের পান, আড়াই সের মুরারার সম্পূর্ণরূপে ছুটিয়া যায়। বরফ গলান যেমন শীত জল ফোটানও তেমন শীত।

এক দিকে যেমন তাপ দেওয়া আবশ্যক, অমিল হইতে তরল ও তরল হইতে কঠিন অবস্থায় আনিতে হইলে ঠিক সেই সেই পরিমাণ তাপ বাহির করা আবশ্যক। তাপ

বাহির করা অর্থে শীতল করা। উত্তাপ সমভাবেই থাকে গলনের ও জমান উত্তাপ এক। *

জলের অপর্যায়ন করিতে হইলে যে সর্বাধিক অধিক পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাহাতে এক মহান তত্ত্ব সাধিত হয়। শীতপ্রধান প্রদেশে রাত্রিকালে জলার পাত হইয়া পথ, মাঠ, গৃহস্থান আগুন ইত্যাদি সকল স্থানই বরফে ঢাকিয়া যায়। যদি সেই বরফ বহু তাপেই গলিয়া যাইত তাহা হইলে হৃৎযন্ত্রের সহিত সঙ্গেই সমস্ত দেশ জলে প্রাণিত হইয়া পড়িত। বৃক্ষ গতা পতাদির কথা পূরে থাকুক অনেক গৃহ প্রাসাদ ও জীবজন্তু সেই ভীষণ জনস্রোতে ডুবিয়া যাইত। তাপ অত্যন্ত অধিক আবশ্যক হওয়ার বরফ ঘীরে ঘীরে গলে ও জল কতক বাষ্প হইয়া যায়, কতক বা বহু বেগে নদীয়া প্রবৃত্তি প্রণালী দ্বারা স্থানান্তরিত হইয়া যায়।

৪। রাসায়নিক ক্রিয়া। তাপ রাসায়নিক ক্রিয়ার অঙ্গ। রাসায়নিক সংশ্লেষণে যেমন তাপ উৎপন্ন হয়, তেমনি তাপসহযোগে অনেক স্থলে বৌগিক পদার্থসকল বিসিষ্ট হইয়া পড়ে। তাপযুক্ত হইলে কাঠ জলিতে স্তম্ভিত হয়। জলন রাসায়নিক ক্রিয়া—ইহাতে কাঠের বিশেষণ হইয়া কতকগুলি বৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অনতিবিলম্বে অগ্নজনের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই সন্মিলনে এত তাপ জন্মায় যে কাঠখণ্ড ক্রমাগত জলিতে থাকে এবং সেই কাঠ সপের সমস্ত বরফ

* বরফ - ডিগ্রীতে ১৬ ক্যালো তাপ দোষে তরল হয়, আবার জলত সেই - ডিগ্রীতে ১৬ ক্যালো তাপবিহীন হইলে পুনরাবরত হয়। জল ও অমিশ্রিত জলভয়ে এইরূপ শীতল হইত।

উত্তপ্ত করে। সাধারণতঃ হুই বা ততোধিক পদার্থের সংমিশ্রণে তাপ উৎপন্ন হয় ও সেই তাপ আমাদের কাজে আসে। এ বিষয় বারাত্তরে আলোচিত হইবে।

৪। তাপের বৈদ্যুতিক ফ্রিরা। একখণ্ড ধাতুর দুই প্রান্ত অসমান উত্তপ্ত হইলে দেখা যায় যে একটি ভাঙিতপ্রবাহ ঐ ধাতুর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। ইহাকে (Thero-electricity) “তাপের-ভাঙিত” বলিলাম। এ বিষয়ও বারাত্তরে বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

আমরা মোটামুটি তাপের ধর্ম দেখিলাম। বুদ্ধিগাম তাপ নৈসর্গিক শক্তি, ফ্রিডাল দেখিরা উহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা বাইতে পারে। দেখিলাম জগতের বিরাট পরিবর্তন সকল তাপের দ্বারাই সংঘটিত হয়। সকল তাপের মূল উৎস সূর্য। ঐ গ্রহরাশি হইতে আমরা যে শক্তি পাই, তাপ তাহার অন্ততম। সেই তাপ সাহায্যে জগতের সমস্ত ফ্রিরা সম্পাদিত হইতেছে। আজ যদি সূর্য্য-দেব বীক্ষিকা বলেন ও তাপবানে বিদ্যুৎ ধন তাহা হইলে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে সমগ্র প্রাণীজগৎ ধ্বংস হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রথমতঃ বায়ুর গতি বন্ধ হইয়া প্রাণীর বাসস্থান বিহীন বাষ্পে পূর্ণ হইয়া উঠিলে শূন্যই প্রাণনাশ ঘটবে। জলীয় বাষ্পেব অন্যভাবে যেহ বৃষ্টি প্রভৃতি কিছুই হইবে না। তাপের অপর মুখ্য উৎস রাসায়নিক ফ্রিরা। এই ফ্রিয়ার কালে জীবসংহের উত্তাপ সংরক্ষিত হয়। মৃত্যু হইলে যখন দেহের মধ্যে আর রাসায়নিক ফ্রিরা হয় না, তখন দেহের উত্তাপ চতুর্দিকার্শ্ব কাঠ প্রভৃতির দ্বিত

সমান হইয়া পড়ে। আমরা মৃতদেহ “হিম” হইয়া যায় ইহাই জানি কিন্তু বস্তুতঃ উহা অপরাপর বস্তু অপেক্ষা যে নিম্ন উত্তাপ বিশিষ্ট তাহা নহে। আমরা অভ্যাসবশতঃ দেহকে উকই দেখি; স্তবরাঃ যখন সেই উকস্ব দূর হইয়া যায়, আমাদের একটা ধারণার অন্তর আনিয়া পড়ে ও শৈত্যবোধই তখন উপস্থিত হয়। অহোমাত্র আমরা দেহকে সজীবই দেখিবার ও উকবোধ করিবার অভ্যাস করিয়াছি—স্তবরাঃ সেই দেহের উত্তাপ চতুর্দিকার্শ্ব বস্তুর উত্তাপ অপেক্ষা উচ্চ না হইলে, (সমান হইলেও) অভ্যাস-বশতঃ শূন্য বোধ হয়। মানবদেহ কতকটা উত্তাপের প্রার্থী ও কতকটা শৈত্য সহ্য করিতে পারে। সহনের মাত্রা সীমিত হইলে মৃত্যু অবশ্যজারী। তাই যখন হয় আমাদের প্রাচীন নবিগণ অগ্নির পূজা করিতেন—তেন্নঃ পদার্থের জ্বলন্তি করিতেন—দেবতার দ্বার তাপকে ভক্তি করিতেন।

তাপ কি ও কিসে উহার উৎপত্তি হয় তাহা বারাত্তরে বলিব। এ প্রবন্ধে কেবল তাপের কার্য্য মূলতঃ বুঝাইবার চেষ্টা পাইলাম।

পরিভাষা

তাপ—Heat

উত্তাপ—Temperature

শুদ্ধ যৌগিক—Pure Chemical Compound

অবয়ব—Volume

অবয়ব—Expansion

অপেক্ষিততাপ—Specific Heat

গলনতাপ—Latent Heat of Fusion

ক উত্তাপ—Latent Heat of Vaporisation.

শক্তি—Energy

এক গ্রাম (Gramme) গ্রাম এক দেহের সমস্ত পদার্থিত ভরন।

১০০ গ্রাম=১ কিলোগ্রাম=২ পাউন্ড=১ সেহ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টাচার্য্য।

একাত্ত-ক্ষেত্র ।

প্রাচীন কলিঙ্গ আর নাই? উৎকলে তাহার কফল আছে। ইতিহাসে তাহার স্মৃতি আছে। লব-কর্তার বীঠভূমিতে লব তির আর কি দেখিতে চাও?

কিছু নগর বড় হুম্বর ছিল। তরুজায়া-হুণ রাজপথ, অমলজল জলাশয়, কার্যকার্যময় প্রাসাদ,—কলিঙ্গে কিছুই অস্তাব ছিল না। জগন্নাথের অনেক গৌরব-সমাধির উপরে নতুন করিয়া প্রমোদমালা নির্মিত হইয়াছে। কিছু কলিঙ্গের স্থান-ভস্ম সরাইয়া, আর কেহ তেমন করিয়া পোতার নগ্নন সাজাইতে পারে নাই। সে স্থান-ভস্মের উপরে এখন কেবল ডোলের আলো,—বিধবার জাগাধন্য জনের একমাত্র শিশুর মত খেলিয়া ঘর আবার ভয়া-অমানিশার ক্রক-বনিক। তাহার স্বেদ বিসর্পিত হইয়া গিয়া, সে মশানবৃত্ত ঢাকিয়া দেয়। হুঁসুকের আলো ও ছায়া!

বাস্তবিক, একাত্ত-ক্ষেত্রে যত ধ্বংসাবশেষ নজরে পড়ে, এমন আর উৎকলের কোথাও না। ঐতত্ত্ববিদগণ তাই বলেন, পাণিনিলালিপি-উক্ত কলিঙ্গরাজ্যের “রাজধানী কলিঙ্গনগর এখানেই ছিল। বুদ্ধের মধ্য-প্রচলিত যে সাম্য-নীতি বিজ্ঞান-বিষয় ভারতবর্ষে প্রেমের মোহনসদন রচনা করিতেছিল, কলিঙ্গ প্রথমযুগেই গায়ত্রি তাহা গ্রহণ করে। প্রাচীন বৌদ্ধগাহিত্যপাঠে আমরা জানিতে পারি, বুদ্ধদেবের পবিত্র চিত্রাত্মক হইতে কলিঙ্গপতি বঞ্চিত হন নাই। অমূল্য বুদ্ধদেবের রত্নগৌরবও কলিঙ্গের

(মহাবংশ)। একটী হুম্বর মন্দিরে সমস্ত এই মহাবংশ রক্ষিত ছিল। এখন তাহা সিংহলে। তিনিতে পাই, পুত্রী হইতে তাহা সিংহলে স্থানান্তরিত হয়।

“Buddha's sacred tooth had been removed from Puri to Ceylon.” (Statistical Account of Puri.—By Hunter Esq.—81, Vol XIX.)

অতএব বুঝা যাইতেছে কলিঙ্গরাজ্য বৌদ্ধভগবতে একটী শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। এবং সেই বৌদ্ধধর্ম,—দশ শতাব্দীকাল কলিঙ্গভূমিতে আপনায় গৈরিক-পতাকা উড্ডীন রাখিয়াছিল।

(Balfour's “Cyclopaedia of India.” Vol. III.—P. 48)

১. নির্জাপ-মূল বৌদ্ধধর্ম অনাচার-প্রাবল্যে আপনাই এখন নির্জাপোদ্ভূত হয়,—তখন তাহা দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া গেল। সেই বিচিত্রাণের নাম, মহাবাহু ও হীনবাহু। শেষযুগের অজ্ঞান এবং নামসম্বন্ধ বৌদ্ধ যতিগণ এখন দেখিলেন, অহিংসাবাদে জন-গণের তত্ত্ব আকর্ষণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, বিলাস-বিরোধী নির্জাপ-বাহী আর তাহার চটুল জনসাধারণের প্রজা উৎপাদন করিতে পারিতেছে না—তখন গৌরীয়া উপযুক্ত উপায় অব্যবহৃত করিতে লাগিলেন। আপন ধর্মের প্রকৃত মর্মবাহনটী সুরক্ষিত না করিয়া, গৌরীয়া প্রচলিত নব মতের সোতে গা ভাসাইয়া বিলেন।

“বৌদ্ধ সম্রাটরা দেখিলেন, যখন নির্জাপাধারকে সামান্য দিতে অক্ষম, ধানবের প্রতি পদখলনে

অবিগলিত নওহতে দেখে বল কর্তৃক এবং কলের মধ্যে
অন্যোদ্যম সমস্ত নির্দেশ করে। লোকের নিয়ম হইয়া
পড়ে। উহার সমস্ত বিধি নিয়ম, যামকমণী
সকলে হস্ত পীকার করিলেই হুঁকি। * * *
সম্রাটেরা মালাকপের ব্যবস্থা নিলেও, আদিপুত্রের
অন্যোদ্যম প্রতিপন্ন করিলেন এবং হুলনিপেদে বিশেষ
বিশেষ সমস্ত বিবেচনা করিলেন। * * * এইরূপে
শ্রীমতঃ মা হইলেও নিঃশেষে বৌদ্ধবংশ জ্ঞানদার্য্যাত
হইয়া ব্রাহ্মণের উত্তরাংশে অধিক হইয়া পড়িল।
* * * তত্ত্ব হইল,—বৌদ্ধতন্ত্র বাহ্য। অর্থাৎ বৌদ্ধ
তন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এখানে বৌদ্ধতন্ত্রের
কালসংক্রমণ।” (* বঙ্গলেন্সের প্রবন্ধাবলী। ৮৩১৮
—৪৬—৪৭২ পৃঃ)

“বৌদ্ধবংশ জ্ঞানদার নিম্ন বহু লক্ষ্যের বিনিময়ে
ব্রাহ্মণের বহু লক্ষ্যের হরণ করিলেন—ব্রাহ্মণ্য ও কতক
কতক বিধের প্রতিপক্ষের মত ও তার গ্রহণ করিলেন,
এইরূপে পরস্পরের দ্বন্দ্ব-প্রতিপাদিত কৌণ্ডিন্য বৌদ্ধ-
বংশ গ্রহণ প্রকৃতভাবে বিলীন হইয়া যায়।” (ঈশ্বর
সত্যোক্তিতে ঈশ্বর প্রাপ্ত “বৌদ্ধবংশ: ২১ পৃঃ)।

এই নবমুখী অপরূপ বৌদ্ধতন্ত্র, ভারতীয়
জ্ঞানবোধে ধর্ম বশিষ্ঠ। গ্রহণ করিল,—ভারতীয়
মহাবান-সম্প্রদায়বৃত্ত হইল। কলিকাতা,
সেই সাম্প্রদায়িকের হৃৎকল্লোল।

কলিকাতা বন কেশরী রাজগণের প্রবণ

আধিপত্য,—সেই সময়ে বিখ্যাত ভ্রমণকারী
হুয়ান-চুয়াঙ, এদেশে আসিলেন। কলিকাতা
তিনি উ-চা বা ও-চা নামে প্রবাস করিয়াছিলেন।
তৎকালে উৎকলের বিখ্যাত ছিল সাত হাজার
লি—অর্থাৎ ১১৬৭ মাইল। হুয়ান-চুয়াঙের
কলিঙ্গ ভ্রমণের কাল পৃষ্ঠীত সম্ভব শতাব্দী।
তিনি কলিঙ্গের যে উচ্ছন্ন বর্ণনা করিয়াছেন,
আমরা তাহার অনুবাদ হইতে হুলনিপেদ
উদ্ধার করিলাম :—

“A hundred monasteries with ten
thousand monks who study the law of
the Great Translation. There are many
parties who frequent the temples of the
Devas. The followers of error and truth
live pellmell.”

বর্তমান উৎকলই যে প্রাচীন ওড়,—

সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই,—অন্ততঃ জেনারেল
কানিংহাম সাহেবের এই মত। কেশরী-
বংশীয়গণ, কেশবমাজ যে শিরময়্য সৌধ-
মন্দিরমালা নির্মাণ করিয়া স্বাস্থ্য ছিলেন,
তাহা নহ, পরন্তু সে-সৌভাগ্য প্রচুর ভূমিদান
করিয়াছিলেন এবং সমস্ত কলিকাতা
মণ্ডলীর জন্ম স্থান ছাড়িয়া বিদ্যাছিলেন।*

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন :—“হুয়ান-চুয়াঙ যখন কলিকাতায় দর্শন করেন, তখন ইহা সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-
পশ্চিমদিকে ২০২—২০০ মাইল দূরে, ছিল। এবং ৮০০ মাইল পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি।”—(“South Indian
Inscriptions.”—P. 63)

মহাভারতের বনপর্বে এবং কালিদাসের মল্লবংশ—কলিকাতা নামোন্মেষ দেখা যায়।

মহাভারত ও মল্লবংশের বর্ণনা পাঠ করিলে, বর্তমান উৎকলই যে প্রাচীন কলিকাতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
থাকে না।

পণ্ডিত কোলকাতা বলেন, “যোদ্ধাবরী নদীতীরেই প্রাচীন কলিকাতার অবস্থান ছিল।”

* (Collbrook's Essays, Vol II. P. 179)

টলেমিও কলিকাতার অবস্থাননির্দেশ করিয়াছেন গঙ্গাসাগরের কাছে।

(Indian Antiquary, Vol XIII, P. 363.)

মঠে বসিয়া বৌদ্ধগতির আশায় গণিলেন।
 লব-বেবের বিলম্ব-মহিমা আকাশে বাতাসে
 বাজিয়া উঠিল—মন্দির-চূড়ায় সূর্য্যকরনীল
 দৌহ-ত্রিশূল ঘন তাঁহাদেরই বক্ষ-শোণিত-
 পানের জন্ত তৃপ্তি,—ভিক্ষার ভূমিতে
 আন কেহ তত্বলক্ষ্য দেব না,—নিবিগতকি
 আজ কেবল সুপ্ৰলোক নিরাট-রক্ত
 মন্দির-গর্ভে মুক্ত দেবতার পাগল-চরণে
 সঞ্জেহে নিবেদিত হইতে লাগিল—চাটিনা
 আমরা সন্ন্যাসদর্শক পুত্রবাদ, কিন্তু ধর্ম
 চাহি,—যাহা হিন্দুধর্মের সনাতন—যাহা
 ভোগে দাড়ে বেতন—কিন্তু জাগরণে
 নিত্য নুতন। পুরাতনকে তখন ধার হইতে
 নির্মোচিত কর—তাহার জরা, তাহার দৌর্লভ্য,
 তাহার কষ্ট-জুগ অগুট স্বাভাবিক নিরা দে
 বিলুপ্ত হইয়া থাক—উড়াই বিধর-নিধান
 বাজাও পিনাকীর বিধাপ! যতির আশ্রয়দেয়
 নিজ নৈলনিগণে কিরিয়া গেলেন—কেহ বা
 নুতনকেই বরণ করিয়া লইলেন। কিন্তু
 এমন যে ধর্ম,—যাহা জগৎকে ধারণ
 করেন,—তাঁহাকে লইয়া গিরিগুহার বসিয়া
 থাক চলে না। এটার চাই, কিন্তু সস্ত্রাঘে
 বতির অভাব এবং বেশে তুমিবার জন্ত
 লোকের অভাব। গিরিগুহাতেও বৌদ্ধধর্ম
 আশ্রয়লা করিতে পারিল না। এমনি
 অবস্থাতেই, সেই পবিত্র দেবতারানীর
 বৌদ্ধদত্ত,—একদিন বাহা হৃদয়নের প্রবল
 উজ্জ্বল এবং সর্ব্বনাশারণের আন্তরিক
 ঐকান্তিক ইচ্ছার মধ্যে মহাবৈজ্ঞানিক রক্তহর্মের
 দেহাণের পুত্রেবিকার উপরে রক্ষিত
 হইয়াছিল, তাহাই আজ অন্ধে, অনাগরে
 সূর্য্যের উত্তার লহিত লিংহণে স্থানান্তরিত

হইয়া গেল। এই পতনের ইতিহাস
 বিহোগান্ত নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব অপেক্ষা
 শোচনীয়, অধিক মর্শ্ববিদারী। হা মানবজন্য!
 অসাধারণ তোমার বৈচিত্র্য,—অলৌকিক
 তোমার প্রকৃতি!

কিন্তু এই পরিবর্তন একদিনে হয় নাই।
 শতাব্দীর বাবধান ইহার মধ্যে বিভ্রম-রেশমা
 টানিয়া দিয়াছিল।

জ্ঞানধর্মের নব স্বাক্ষরধর্ম প্রধান ক্ষেত্র,—
 এই একাত্তর-ক্ষেত্র। এই পূর্ণাত্মিক কেবল
 হিন্দু অপরূপ স্বপ্নাত্মকীর্তির জন্ত বিখ্যাত
 নর,—পরম্ব বিগত বৃগের ধর্ম-বিস্তারের
 একটা উজ্জ্বল দাক্ষিণ্য। এমন একদিন
 গিয়াছে, যখন সমগ্র উৎকলের ভাগা,
 —এই একাত্তর-ক্ষেত্রের শুভাভ্যুতের উপরে
 নির্ভর করিত। রাজধানী এবং দেবধানীর
 এমন স্তম্ভের মিলন, অজ্ঞাত আর গুপ্ত।
 এখন চারিদিকে তাহারই চিহ্ন পড়িয়া
 বহিয়াছে। একদিকে জুবনেখের বিরাট
 শিখর ঘন আকাশের নিলীমা বিবীর্ণ
 করিতে চাহিতেছে; অন্যে বনভ্রামণিত
 গুহাগিরি বক্ষে বৌদ্ধগতির বিঘন তপাল
 এবং পিচে জৈনমন্দিরের সুকুট পরিয়া ঘন
 নির্ভর মহাকালের পদাঙ্ক গণনা করিতেছে;
 এখানে প্রাচীন রাজবংশের প্রাসাদ-কঙ্কাল;
 ওখানে সুপ্রবল সামন্তিকগণের ধ্বংসস্থল
 ভবনাবশেষ; দ্বারে দ্বারে অধুনা-পলিত
 দিয়ারত জলাশয়—তাঁহার জগরে কৃত্রিম ধাঁপ,
 তাহার চারিদিকে অলংকার সোপান-স্তর,—
 এখন সে সোপানশ্রেণী পরম্পর বিচ্যুত,—
 জীব—গুহাবিহীন—কোন স্থানে বা একেবারে
 বিলুপ্ত! সবই গিয়াছে বা বাইতে বসিয়াছে

কিন্তু এখনো হুতি তাহার সেই বিরাট
মহিমার কথা লোকের দুঃখিত পায় নাই !
তাই আজও দেখানে নিত্য নূতন যাত্রী
ছুটিয়া যায়,—পাথর বেধতার চরণে কেহ
তরঙ্গ পসরা কেহ বা পাথরের পসরা
নামায়। তাই আজও দেখানে এতাত্তে
সম্ভার আশ্চর্যবান থাকিয়া উঠে,—
মহাকাশের গভীর বন্দনাগানে ঘটিমঠিবাট
ভরিয়া যায়। এবং এইজন্তই একান্ত-ক্ষেত্রের
এত গৌরব !

ভূবনেশ্বরের পরিচয় আগে দিয়াছি।
বক্ষ্যমান এক্ষেত্র একান্ত-ক্ষেত্রের অস্তিত্ব
কতিপয় বেধাশয়ের সংকল্প আভাস দিতে
চেষ্টা করিব।

একান্ত-ক্ষেত্রের অলংকার মন্দিরের মধ্যে
প্রাচীনত্ব গৌরব,—একমাত্র পরত্তরমেধের।
ইহাই এখানকার তিত্তরে—গুপ্ত এখানকার
তিত্তরে কেন—সমগ্র উৎকলখ্যাতি হিন্দু-
নির্মিত মন্দিরায়ণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা
পুরাতন। কান্তগান সাহেব বলেন,—
“প্রাথমিক কেন্দ্রীয়ত্বের সময়ে, উৎকলে
যে সকল মন্দির নির্মিত হইয়াছে, তাহার
নির্মাণকৌশল সে সকল হইতে বিভিন্ন।”
(History of Indian and Eastern
Architecture.)

খ্রীষ্ট ৪২০ অব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়।
ইহার বনিয়াদ চতুষ্কোণ—সকলদিকে ৩০
ফুট।

মন্দিরটী যেমন বড় নয়—উচ্চে ৩৮ ফুট
মাত্র। কাণ্ডগান আরো বলেন :—

“It may however, be that if this is
really the oldest temple of its class, in

Orissa, its design may be copied from a
foreign example.”

মন্দিরের আরতন বংশাব্যাজ বটে,—কিন্তু
কলিকার্য অসামান্য। আর সেই কারণেই
ইহার এত আদর ! ইহার আচ্ছাদিত-ভিত্তিতল
ক্ষেত্রিত্ত স্থিতি এবং বিভিন্ন পুণ্যলতার আকর্ষণ,
তাহার মাঝে অবকাশ নাই। আর সে
অতুল্য শিল্প,—যদিও তাহা সর্বত্র আভাবিক
নয়,—তজ্জাচ এমন হৃদয়ান্তিক্ষেপে ধোয়াপাতে
এবং সুগঠিতভাবে সম্পূর্ণ,—যে একবার
দেখিলে চোখ কঁরাইয়া লওয়া যায় না।
হিন্দুশিল্পীর ইহা এক বিশেষত্ব। আমি
এমন অনেক হিন্দুশিল্প দেখিয়াছি যাহা
প্রতীচ্য কলার সম্পূর্ণ বিরোধী। হরত
স্থিতির হাতখানা এমনভাবে বাকানো—
যে তোমার আমার মত সহজ মাছধ,
হাতখানা ধ্যানভ্রষ্টরীতে বাকাইতে গেলে,
অস্থিমাৎক কষ্টিন পদার্থটাকে রবারের মত
বিত্তিহাৎক করিয়া তুলিতে হইবে। হরত
শিল্পী, স্থিতির ভূক ছোড়া কুলাকার্যেগেমনে
এমন করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যে
পশ্চিমদেশীয় শিল্পী হাণ্ডিগাট পুন হইবেন।
হরত যে সব লতাপাতা পাণ্ডুরেব গায়ে
প্রকর্ণ রহিয়াছে, উদ্ভিদবিত্তার পাঠ আগা-
গোড়া গারিরা লইয়াও তাহার নামকরণ
করিতে গেলে লক্ষনৈজ্জিহটা আশ্চর্য্যকর
যির হইয়া বাইবে। তথাপি শেভলির
কোষনকৌশল, তাহারেব হুতাগ্রহস্তবৎ
পরম্পরবিযুক্ত রেখাবলীর মধ্যে এমন এক
দৌন্দর্য্য, এমন এক নুতনত্ব আছে, যে
সকল কথা তুলিয়া বাইতে হয়। আশ্চর্য্য কথা,
আর্ধ্য শিল্পের ভিত্তরে বিদ্যুত্তার যে একটা

শেলবাক্সির নজরে পড়িয়া যায়,—প্রতীচা
 শিল্পের সূত্রাঙ্গি তাহা দেখা যায় না।
 প্রতীচা নিম্ন অনাবৃত্তক স্বাভাবিকতার এমন
 ভীক,—যে, দৃষ্টিকে প্রতিপলকপাতে বিদ্ধ
 করিতে থাকে। আমি এখানে আদর্শের
 ঘোষ দিতেছি না। কারণ সকল দেশের
 শিল্পই আপন আপন আদর্শ লইয়া শ্রেষ্ঠ।
 যে ভীকতা—যে অতি পরিস্ফুটতা—
 যে স্বাভাবিকতা হিন্দুশিল্পে ধূলভ—হিন্দুশিল্পে
 ঘোষ বলিয়া কথিত,—তাহাই আবার
 অস্ত্রশিল্পের শিল্পে বলাতবা নিবিষ্ট হইয়া
 দর্শকের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।
 বৃত্তিতে পারি না, এখানে কাহার হুল—
 কাহার ঠিক! এবং সেইজন্যই ঘোষ হয়
 এক আদর্শের অগ্রপথ্যে অস্ত্র আদর্শের
 বিচার করিতে বসিলে, অবিচার করা হয়।
 জগতে সৌন্দর্য্য বলিয়া একটা যে বৃত্তি
 আছে, তাহার স্পন্দন সকলে একভাবে
 অগ্রসর করিতে পারে না। তাই মনুষ্য-
 জীবনেও দেখিতে পাই, কাহারো ভোম্ব
 কালো নমনতারাই বুদ্ধিহারা হইবার লক্ষ্য
 প্রচুর, আবার কাহারো কাছে বা কটা
 চোখের বক্স কটাক্ষই তরানক মারকবিশেষ।
 ফলে, হৃদয়ের শোকেই হৃদয়ের চোখকে
 নিম্মা করিয়া দাঁড়িতেছে, কিন্তু চোখের ক্ষতি
 কোথায়—তাহার কাজ সমানই চলিতেছে!
 এখন আদর্শের কথা থাক,—যাহা বলিতে-
 ছিলাম, তাহাই বলি।

পরমুরামেশ্বরের মন্দির-পরিমাপ ও
 তাহার কালনির্ভর সম্বন্ধ আলোচ্য বস্তু,—

"That called Parasurameswara
 ১০ feet square and ৩৪ feet high. "

It is supposed to have been built A.D. ১৩০
 or ৫০০. (Cyclopaedia of India.—Vol. III.)

ইহার চাঁদনীর উপরে আকাশের
 সুকালোক আলিঙ্গা পড়িয়াছে এবং তাহাতে
 বারোটা জানালা আছে। একমাত্র "বেতাল
 পেউল" ভিন্ন উৎকলের অস্ত্র কোন মন্দিরের
 বন্দোবস্ত একত্র নয়। চাঁদনীর দক্ষিণ
 দ্বারপথে একটা শিলালিপি আছে। তাহাতে
 মন্দিরনির্মাতা কোন কলিঙ্গ নরপতির বিষয়
 উল্লেখ। মন্দিরের অনেক গুহ তাড়িমা
 গিরিতে এবং মন্দির গাত্রেও কালের ক্ষতের
 অত্যাগ নাই।

পরমুরামেশ্বরের মন্দির-পথেও একটা গুহ
 আছে,—নাম গৌরীগুহ। তাহার চতুর্দিকে
 অনেকগুলি মন্দির, তথ্যে সর্বাঙ্গপেক্ষা ক্ষুদ্র
 এবং স্থান্য মন্দির সুত্রেখরের। ইহার কাঁথা
 গ্রাম পরমুরামেশ্বরের মন্দিরেরই মত,—
 কিন্তু আরো চমৎকার। ইহার চাঁদনীও
 উৎকলীর ছাঁচে গঠিত। ইহাতে স্তম্ভশ্রেণী
 নাই। এবং ইহার ছাদ, ভূবনেশ্বর ও কণারক
 মন্দিরের মত। মন্দিরের উচ্চতা ৩২ ফুট।
 চাঁদনী ২৫ ফুট। চাঁদনীর ডানদিকে একটা
 পথোপরিহা বিলান আছে,—তাহা ১২ ফুট
 উচ্চ। সুত্রেখরের মন্দির বিষ্ণু সাগরের
 ঈশান কোণে। ইহার পূর্বাঙ্গিকেও "শিখ
 গুহ" নামে এক গুহ আছে। এবাৎ,
 ঐ গুহের জল পান করিলে বক্ষা রক্ষণও
 পুত্রস্বপ্নাদে বঞ্চিত থাকেন না এবং
 যুতৎসার সম্মান নষ্ট হয় না। কিছু দূরেই
 এন্ড্রিক আশ্র-বন। তাহার পোতা অত্যাৎ
 এবং স্থানটির চারিদিকে যে অবিদ্যা তত্ত্বতা
 বিরাট করিতেছে, তাহাও সাক্ষ্য

উপভোগ্য। বঙ্গের স্বর্গীয় ছোটগাউ উভয়গণ সাহেব, এখানকার নিষ্কলিতা এবং মন্দিরের কারুকার্য দেখিয়া মুগ্ধভাবে শতবৃথে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ডাঃ ব্রাহ্মজ্ঞানাল দ্বিত্য, মুক্তেশ্বর-গাওঁয় কারুকার্যের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধার করিলাম।

“একটি মহিলা, এক দণ্ডারমান হস্তীর উপরে আবেশণ করিয়াছেন এবং সমুখস্থ এক অগিচর্চবারী অস্ত্রের বক্ষণ্ডে তাঁহার ভরবার উদ্যুত। এক ব্যক্তি ভগবান শিবের উদ্দেশে দান করিতেছেন। হস্তিগুণের লহিত লিহনলের সংগ্রাম হইতেছে। কোথাও যুবতী রমণীগণ। কেহ নৃত্যপরিচালনা, কেহ ক্রীড়াবিলম্বিতা এবং কেহবা যুদ্ধ বা তানপুরা বীণাবাদননিরতা জীবনধর্মণ জীবনমুখগ বিপুল ভার সকল বহন করিতেছে। শাখুগণ নিবান্ধনার ভগ্নততিত! একজন সন্ন্যাসী শিখরে উপদেশ দিতেছেন। আর একজন ভালপত্রে লিখিত পুস্তক পাঠ করিতেছেন। বইখানি একটি টুলের উপরে স্থাপিত। একটি ছাত্তির নীচে এক মহিলা ঝাঁড়াইরা আছেন। আর একজন একটি সন্ন্যাসীর কাছে দাঁড়াইরা,—তাঁহার হাতে একটি পাররা। আরো কতকগুলি রমণী, কেহ তরুণ্য উপভোগ করিতেছেন এবং কেহবা কল্পের উপরে দাঁড়াইরা আছেন। শেখোক্ত মৃষ্টি পৃথিবীদেবীর।” (*Antiquities of Orissa Vol. II.*) রাজারানী মন্দিরও উৎকল স্থাপত্যের আর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার ভিত্তের নীচে তিনটি হাতী হাঁটু গাভিরা বসিয়া আছে।

তাহার উপরে তিনটি সিংহ,—কেশরীভান-বংশের বিশেষ চিহ্ন। আরো উঁচুতে একটি নাগিনী তাঁহার সন্তানগণকে মাথা লইয়া,ভক্তের উচ্চারণ অঙ্গুত করিয়াছে। এই নাগিনীসের মূর্তি উৎকলের সমস্ত মন্দিরেই সংখ্যাজীত। শুধু উৎকল বলিয়া নয়, সমগ্র ভারতের স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে এবং ভিত্তমালায় নাগ নাগিনীর মূর্তি বোদিত বা অঙ্কিত দেখা যায়। এদিকে আর্ঘ্যশ্রমিগণের একটা অহেতুক প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্তি মাহুদেরই বত,—কেবল শিরস্থ লক্ষন-সর্প তাহাদের পূজক জাতিবৈশ্যের একমাত্র পরিচয়। কাহারও মাথার একটির অধিক সাপ নাই; আবার কাহারও মস্তকোপর সর্প সংখ্যা একাধিক।

ধারপথের উপরে নবগ্রহ শিলা। তাহাতে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এইটী নরটী গ্রহের প্রতিনিধি। উৎকলের মন্দিরমালায়, এই নবগ্রহশিলার প্রাচুর্য্যও বড় কম নয়। নাগনাগিনীর মূর্তি অপেক্ষাও ইহার সংখ্যা বেশী। এবং কি শৈব, কি বৈষ্ণব,—সকল পন্থাবলম্বীর মন্দিরেই ইহার ক্ষোদন-ভিত্ত নগ্নের পড়িয়া যায়।

উদ্ভিদ্ভার মন্দির নির্মাণের আদর্শ বিবিধ। প্রথম আদর্শ,—যাহা আমরা মুক্তেশ্বর ও পরমেশ্বরমন্দিরের দেবালয়ে দেখিতে পাই। আর ভুবনেশ্বরের মহামন্দির বিস্তার আদর্শ-স্থপারী। এই আদর্শের বিস্তার ধরিয়া বিচার করিলে, মন্দির নির্মাণের কালনির্ণয়-সম্বন্ধে কোন গোপনালের ভয় থাকে না।

অনন্তবাসুদেবের মন্দির, মুচন করিয়া মেহাস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু শিল্পাত্ত-গণের সতর্ক দৃষ্টি ইহার উপরে পড়িবার

মাগেট, মন্দিরের নিরাংশের কতক শিল্পকার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ মন্দিরটি বেশ বড়। ইহাতেও চাঁদনী আছে, ভোগশালা আছে, নাটমন্দির আছে। উচ্চতা, প্রায় ৬০ ফুট। মন্দিরের একটা শিলালিপি দেখিয়া জানা যায়, যে এই দেবালয়, রাজা হরিব্রহ্মের মন্ত্রী, রাঢ়ী ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত ভট্টভব কর্তৃক নির্মিত হয়। বাচস্পতি দ্বিতীয় নামক এক ব্যক্তি এট শিলালিপিটি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

অতএব, জানা যাইতেছে যে এ মন্দিরটা বড় খেস্তিদিমের পুরাতন নয়। মন্দিরাবস্থান বিষ্ণুপার্শ্বের পূর্ব্ব ভাগে। মন্দির এবং তাহার চাঁদনী,—উভয়ই শিল্প-কর্ম্মের ক্ষোভন কার্য্যে সমন্বিত। দেখিতেছি, উৎকলের রাজগণই কেবল শিল্প কার্য্যে উৎসাহী ছিলেন এমন নয়; তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণও, শুধু রাজকার্য্যের হিসাবনিকাশের খুঁটিনাটি লইয়া ব্যাপ্ত থাকিয়াই মানব জীবনের সকল সমাজ মিটাইয়া দিতেন না; পরন্তু তাঁহাদের কর্ম্ম চিন্তার অবসরও দেবতার সন্ত কাক-শিল্প-কর্ম্ম বিস্তার জবন নির্মাণে অতিবাহিত হইত। এবং এই সমবেত চেষ্টার ফলেই, উৎকলভূমি আজ জাগতিক স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে বরনীয়া হইয়াছেন। আবার বিজয়নগরে, তাঁহাদেরই বংশপরগণ, সম্রাট ও শিল্পীর ভারত-বর্ষের সকল জাতির পঞ্চাভ্য! আশ্চর্য্য!

অনন্তবাহুদেবের মন্দিরে যে খামালটা আছে—জুবনেশ্বরের সকল মন্দির অপেক্ষা তাহা উচ্চ। মন্দির অত্যন্তই বৃহৎ ও বলসাহেবের মূর্ত্তি। একাত্তর-ক্ষেত্রের অনেক দেবতার মত, তাঁহারা আশ্রয় ভক্ষণপ্রসক্ত

খাত্তের অতীবে অনাহারা হন নাই—তাঁহারা নিরন্তরভাবে ভোগ পান।

“বেতাল-বেউল” মন্দির, উৎকল-স্থাপত্যের আর একটা গ্রেট নিদর্শন। ঐ মন্দিরটার অবস্থা, তেমন মন্দ নয়। ইহার নির্মাণাদর্শ, উচ্চতার অজ্ঞাত মন্দির হইতে কিছু ভিন্ন। মন্দিরগাত্রে,—বহির্দেখে নয়ন-ধ্বজন চাক্ষুশ। ইহার চাঁদনী নগনির্মিত। একাত্তর-ক্ষেত্রের সকল মন্দিরের পরিচয় এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমরা যে কয়টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম,—ভ্রমভিত্তিক দর্শন যোগ্য অজ্ঞাত পুঙ্খ মন্দিরগুলির নাম এখানে দেওয়া হইল।

- ১। ব্রহ্মেশ্বর। ২। গৌরেশ্বরের। ৩। কলিেশ্বরের। ৪। কোটিভীর্ষেশ্বর। ৫। ঈশানেশ্বর। ৬। গোপালিনী। ৭। বসেশ্বর। ৮। যোগমাতা রান। ৯। কলেশ্বর। ১০। নাগেশ্বর। ১১। সিদ্ধেশ্বর। ১২। একাশ্রেশ্বর। ১৩। গোমেশ্বর। ১৪। অলাবুেশ্বর।

ইহার মধ্যে ব্রহ্মেশ্বরের নির্মাণকাল, রাজেন্দ্রবাহুদেব মতে নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ। চাঁদনী আছে। একটা ছাদাকৃতি উচ্চ বাঁধের উপরে মন্দিরটা স্থাপিত। জুবনেশ্বরের অস্ত্র কোন মন্দিরে তিতর ও বাহির ছুঁ অলভ্য নয়, একমাত্র ব্রহ্মেশ্বরে তাহা আছে। কোটিভীর্ষেশ্বরও একটা খুব পুরাতন মন্দির। ৪০ ফুট উচ্চ। চাঁদনীর অস্তিত্ব নাই। নাগেশ্বরের মোহনটা খুব উচ্চ। অলাবুেশ্বর রাজার নাম পাইরাছে। খুবই সাধারণ এবং মোহনটা নাগেশ্বর হইতেও ছোট।

হিন্দু দেবতাগণের মধ্যে মন্দিরমা

সৌভাগ্য শিবেৰ সেমন,—তেমন আর কোন দেবতার না। যেমন কান্দীয়ে অমরনাথ, চট্টগ্রামে সঙ্গনাথ, মগুরার সুন্দরেশ্বর, বারাগনীতে বিবেশ্বর, কলিকাতার অনন্তিদুৱে তারকেশ্বর, দেওঘরে বৈষ্ণনাথ ও সেতুক্ষে রামেশ্বর! শিবালয়ের নিপেনে নামোন্মেষ করা সহজ নয়। গোমনাথ এখন অতীতকৃতি। তাহার পন্থাবলেন নাত্র এখনো পড়িয়া আছে।

হিম্মতের পুনরুত্থান কালে নৈব বশষ্টে তার প্রধান সহায় ছিল। হয় ত তারতর্ঘ্যে শিবপাখীগণের প্রভুত্বের কারণ তাহাই। আর তদুত্তর তারতর্ঘ্য কেন, ঠিকতায় আনাদিগকে জানিবারা মিতেছে, যে এককালে আর প্রাচীন সভা বেগমহাৱেই শিবপূজা প্রচলিত ছিল। এখানে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে তরঙ্গা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রাচীন মিশরে,—এই লিঙ্গপূজা একটা বিশেষ সমাজোপযোগী ব্যাপার ছিল। মিশরের সংস্কৃত নাম মিশ্রদেশ। কবেন বাহো বলেন, “মিশর দেশের পিরামিডগুলিও নৈবমন্দির ভিন্ন আর কিছু নয়।” এ নতের মধ্যে সত্যের অস্তিত্ব কতটুকু, আমরা তাহা বলিতে পারি না। তবে মিশরে যে লিঙ্গপূজার অভাব ছিল না,—তাহার একাধিক প্রমাণ আছে। প্রাচীন কাহিনী বলে, টাইকনের অগ্রে খণ্ডী-কৃতদেহ অগ্নিরূপে বিদ্যমান হইয়া আইদিস্ কর্তৃক এই লিঙ্গপূজা সৰ্ব্ব প্রথমে মিশরে প্রচলিত হয়। তাহার পর, মিশর হইতে এসেও এই পূজার প্রচার হইয়াছিল। গ্রীক কবি অরিস্টোফেনিসের টীকাকারের কথায় জানা যায় যে এই পূজার একটি বিশেষ উৎসবও

এটি পাঁচ বৎসর পরে এক একবার হইত। মিশরে এই লিঙ্গ পূজার নাম ছিল, “ক্যালিক ফেটিডাল।” গ্রীকবাসিগণ ইহাকে “ডাইও-নেসিয়া উৎসব” বলিতেন। মনসী স্তর উইলিয়াম জোন্স বলেন, “সংস্কৃত ঈশ ও ঈশানী বা ঈশ্বর ও ঈশী শব্দ হইতে মিশরের অদিবিল ও আইদিস্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।” কিন্তু উক্ত দেশবধে, এই পূজার সমারোহ এমনি অপ্রীণতাকলুষিত ছিল,—যে এখানে তাহাব বিবরণ দেওয়া সম্ভব।

একান্ত-ক্ষেত্রও এই ভগ্নম্যাপী মহাদেশের একটা প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। এখানে শিবেৰ অবস্থান সংক্ষেপে পট পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তর হইতে একটী উল্লেখ করা গেল।

বিবাহ ত হইয়া গেল,—কিন্তু মহাদেশে স্বত্তরবাড়ী আর ছাড়িতে চান না। স্বকি সমাজের সে কঠোর সংঘম দেবদেবিত্বের কাছে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি যৌবনপূর্ণতা পার্শ্বতীর পেলব প্রেমের মধ্যে আপনার চিন্তাবিশুদ্ধ মানসকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার বড় সুখেই কালাতিবাহন করিতে ছিলেন।

এদিকে পার্শ্বতীর লাজনার আর সীমা নাই। অকস্মিন পুরস্কৃত্য তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন “মতি! তোমার ভাগ্য ভাল! স্বামী পাইয়া তুমি দিনরাত বেশ সুখেই আছ! আর তোমার স্বামীরও লক্ষ্য নাই—তিনি ব্রহ্মচর্য্য ছাড়িয়া স্বত্তরবাড়ীতে দিয়া রান্নার হালে আছেন—যে ক্রিয়াবার নামটী নাই!”

পার্শ্বতী কহিলেন, “কত তপস্বী করিয়া তব আমি এমন পতি পাইয়াছি। আমি

ভাড়াহে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না,—তাই তিনি এখানে আছে—নহিলে কবে চলিয়া যাইতেন !”

তখন মা আসিয়া ঘেরেকে বলিলেন,—
“বাহা! তোমার পতির কি গুণে তুমি ভুলিয়াছ ? ও ছাইমাখা ছাইগুণ নিয়া তোমার স্বামী নিজের বাড়ীতে কিরিয়া যান—তুমি গহনা পরিয়া, ভালো কাপড় পড়িয়া আমার কাছেই রুখে থাক ।”
স্বামীর নিদ্রা! ঘেরের অভ্যস্তান উত্থলিয়া উঠিল। এদিকে বিবাহের পর, ঘেরেকে ঘনোকার পা দিয়া পাড়োতে হয়। স্বামী নিদ্রাও সহ্য হয় না—বাগ্ন মাকেও কথার দ্বার হইতে নিরাপদ রাখিয়া চলিতে হয়। কাজেই সতী স্বামীর কাছে গিয়া মনের নাম না করিয়াই বলিলেন “এক! তোমার কি অস্ত্র কোথাও থাকিবার যোগ্য নাই ? স্বতন্ত্র বাড়ীতে বেশীদিন বাস করা উচিত নয়।”

দিকি থাইলেও, শিবের বুদ্ধি ঠিক ছিল। তিনি সমস্ত বুঝিলেন। বুঝিয়া, স্বীকে লইয়া ব্যাড়ে চলিয়া গন্ধার ভীমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সেখানে পক্ষক্ষোশখাপী পুত্রী নির্দ্বাণপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন। ইহাই বাগ্নপন্য।

বাগ্নপন্যের রাজার গুণে তুট হইয়া শিব স্বীকার করেন, যে সেখানে যুদ্ধ বাধিলে তিনি রাজার হইয়া নিজে যুদ্ধ করিবেন। কিছু দিন পরে, বিষ্ণু, কানিরাজের উপরে ভয়ানক চট্টা, তাহার প্রতি চক্র মর্দন করিলেন। এদিকে পূর্বপ্রতিজ্ঞানুসারে, শিবও রাজাকে বাটাইবার জন্য, চক্রবেগ প্রতিরোধার্থ আপনাত পাতপাত অস্ত্রত্যাগ করিলেন। কিছু পাতপাত বিহুচক্রেরূপে কিছু করিতে পারিল না। চক্র

সমস্ত কাশীধাম পর্য্যন্ত করিতে লাগিল। অগত্যা, মহাদেব বিষ্ণু গুণে বলিলেন।

তখন বিষ্ণু গুণে তুট হইয়া শিবকে ধুব বহু তিরস্কার বলিলেন “যদি কাশীত্যাগ করিয়া তুমি আমার পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাইয়া বাস করো—তবেই আমি তোমার প্রাণনাশ তথাস্ত বলিব—নহিলে নয়।”

কাজেই, শিব আর কি করেন—বিষ্ণুর আজ্ঞামত একাম-ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

(ভক্তপুংগব—উৎকলগুণ্ড।)

আর কিছু নয়,—ভক্ত ভগবানের মাগ্ধ্য বর্ধনচেষ্টাতেই এই কাহিনীর উৎপত্তি।

উৎকলের মধ্যে, চিরশিখিতব্য প্রাকৃতিক শোভা যদি কোথাও থাকে,—তবে তাহা এট একাম-ক্ষেত্রে। মানবের করুণ কোলাহল প্রকৃতির সকল কবিত্ব নষ্ট করে। একাম-ক্ষেত্রে তাহার একান্ত অভাব। ইহার একদিকে ধাতু-হস্তিত্ব সমস্ত তুমি। মাঝে মাঝে রত্নপ্রবল বর্ষ্যকরোচ্ছল বায়ুকাহিনীভবন। তটিনী; তাহার আবেশে যেদিনীযুক্তপ্রতিম গ্রামজলধি গিরি-বেগা। কোথাও দুঃখনিবন্ধন তাহা জলদ লেগাং। এবং প্রান্তর-প্রান্তভাগে শান্ত-ভ্রামলিত কাতার-অস্তরে যে অপ্রান্ত অনন্ত দর্শন-ময় ছুটিয়া উঠিতেছে, তাহা যেন ঐ নীলগন্ধ-নীল অম্বর চরণে নন্দিত বন্দনা-গাথা!

মন আপনাকে তুলিয়া ধরি,—প্রবণ তখন পরিতৃপ্ত—নয়ন তখন নিম্পলক—যেন মোহন-নন্দনের একটি মূর্ত্তমল্লিত এখানে কান্নার মতো প্রত্যবে মুর্ছিত হইয়া রহিয়াছে—সমীর-তালে তাহার ছন্দ এবং পাখীর ডাকে তাহার মুচ্ছনা।

ঐশ্বৰ্য্যময় কুমার রায়।

যীশুর জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ।

ইতিহাসের কটি পাথরে যীশুর জন্ম, তাঁহার কাৰ্য্যকলাপ প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে গিয়া অনেক আশ্চর্য্যকাল এই কথা বলিতে-ছেন যে, যীশু বলিয়া কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া, যীশুর পুত্রদিগকে তাঁহাদের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুবর্তী হইতে বলেন নাই; বা রোমানদিগের ক্রুশকাণ্ডে গুরুহস্তে প্রাণবিসৰ্জ্জনও করেন নাই; ওদকল গ্রীকদিগের পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছে। সে বাহাই হউক, বাইবেল-বর্ণিত যীশু মধ্যযুগের চূড়ামণি ও প্রেমের অবতার। সে যুগমাগা জীবনীপাঠে আমরা ঈশ্বর চর ও প্রাণ মধুর হস্তে উঠে ।

উনবিংশ শতাব্দীর কিছু অধিক হইল, যীশু প্যাগেটাইনের অন্তর্গত বেথলহেম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্যাগেটাইন তখন রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। আগষ্টাস সিংহার তখন রোম রাজ্যের সম্রাট। বৃদ্ধ প্রভৃতির দ্বারা যীশুর জন্ম কাহিনীও অলৌকিক ঘটনার পূর্ব। তাঁহার জন্ম দেবপ্রসাদে। সূর্য্যের জ্যোতিষের সহিত যেরূপ বিবাহের প্রস্তাব চণ্ডিত্ত্বল, এমন সময়ে মেবী গর্ভবতী হইলেন। এমন নারীর পাণিগ্রহণে জ্যোতিষ অনশ্রুতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রমোদিত নির্ভক কে এতাইতে পারে? জ্যোতিষের স্বপ্রবন্ধার এক স্বর্ণীর দূত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মেবী পবিত্র আত্মা বাধা গর্ভবতী হইয়াছেন, জুদি উহাকে গ্রহণ কর।

আগষ্টাস সিংহার সে সময়ে এই আত্মা প্রচার করেন যে, প্যাগেটাইন নগরে সকল নরনারী উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের নাম ধার লিখাইয়া দিবে। জ্যোতিষের বেরীকে সঙ্গে লইয়া প্যাগেটাইনে যাওয়া করিলেন। পবিত্রমেবীর আত্ম সত্য প্রকাশের সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইল, সত্যইতলি জনতাপূর্ব, এতদ্ব্যতীত এক অশ্বপাণেয় তাঁহারা প্রবেশ করিলেন। এই খানেই শতিন্দ্রী নবজন্মের যুগ বর্ণন করিলেন।

প্রচলিত নিয়মের বিহীনতা কাৰ্য্য জীবনে প্রকাশ না পাইলে, পূর্ব ব্রহ্ম ভগবানের আত্মার হস্তে যায না, এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের জন্মের আত্মলক্ষিক ঘটনার আশ্রয় অলৌকিক কাৰ্য্যেরই অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হই। বৃদ্ধ জন্মের পূর্বে বাহাদেবী স্বপ্ন দেখেন যে, একটি যেতনুতী তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। সংসারত্যাগী রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম সম্বন্ধেও ঐরূপ এক অলৌকিক কাহিনী শুনা যায়; তাঁহার কোন এক বিপাত শিখা আঘাতে বলিয়াছিলেন যে, কোন মানবের ঈশ্বরে তাঁহার জন্ম হয় নাই। পরমহংসদেবের জন্মের কোন শিব মন্দিরে শিখার দ্বারা গমন করেন, এমন সময়ে এক অলক্ষিত শক্তি তদীয় জন্মের গর্ভে প্রবেশ করিয়া তাঁহার জীবনের সঞ্চার করিয়াছিল।

এই সকল ঘটনা আরোপ করিয়া অসত্যবাদ প্রতিপন্ন করিতে বাওয়া, অতীত জ্ঞানের কাৰ্য্য বলিয়াই আমাদের মনে হয়। রোমের কোন কোন সম্রাটও মানব দৃষ্ট নহেন বলিয়া

৩৫শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। বীজের জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

বর্ণিত হইয়াছেন। বীজের মধ্যে আরো একটু বৈশিষ্ট্য আছে। বীজ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আকাশে স্রাব্যেণ উদিত থাকিলেও তারকা দেখা গিয়াছিল। শাস্ত্রবিদেরা বিনা সংবাসে তাঁহার এই অস্বকথা অন্তরে বুঝিতে পারিয়া মানবের এই পরিজ্ঞাতাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কংগের খ্রীষ্টক বসের চেষ্টার জার হেবদরানাও তাঁহার প্রাণসংগে অস্ত্র উত্তর হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইলেন নাই।

বীজের বাণ্যজীবনের ঘটনা, সৃষ্টির ধর্ম-প্রাণে অতি অল্পই দেখা যায়। শৈশব হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কেবল তাঁহার চৌদ্দ বৎসরের সময়ের কথা কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়। তিনি একদিন গ্রীষ্মদিনের কোন ধর্মধর্মিনীর গ্রীষ্ম শাস্ত্রাধ্যাপকদিগের সহিত ধর্মালোচনার প্রবৃত্ত ছিলেন। সে সময় তাঁহার জননী তাঁহার অস্থলদানে আসিয়া-ছেন। এই কথা শুনিয়া বীজ বলিয়াছিলেন, “কে আমার পিতা, কেই বা আমার মাতা, যিনি সেই সর্জনজীবনের পূর্ণা করেন তিনিই আমার পিতা এবং তিনিই আমার মাতা।” এ কথা উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ডের একেশ্বর-বাদী কোন ধর্মবাহক বলিয়াছিলেন, “যুগের মাতা পিতার উপর এই উপেক্ষার ভাব হইতেই খৃস্টীয় সমাজে অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, সংসারের উপর বীজমাতার ভাব বর্জিত করিয়াছে।

বীজ চৌদ্দ বৎসর বয়স্কত্বের পর, ত্রিশ-বৎসর বয়স্ক পর্বাত, কোথার কাটাইয়া-ছিলেন, আর কি করিলেন, বাইবেল গ্রন্থে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে

অনুলক্ষিত্র ব্যক্তিদ্বিগের অনুলক্ষনে আশ্রয় তুলিতেছি যে, বীজ জন্মের কোন বৌদ্ধবর্ষে প্রথমদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। বীজ ‘এন’এর নিকট বীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়াই কেহ কেহ বিখ্যাস করেন।

বীক্ষা গ্রহণের পর যখন এন্টারের মন্ত্র প্রবর্ত হন, তখন তিনি নির্জন স্থানে গমন করিয়া ৪০ দিন ও ৪০ রাত্রি সাধনার রত ছিলেন। বাইবেল গ্রন্থে লিপিত আছে যে, পরতান আসিয়া তাঁহাকে নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে, তাঁহাকে সংসারের ধনবস্ত্র প্রদানের কথা বলিয়া তাঁহার উত্তর করিতে উত্তর হয়, এবং বলে, “যদি তুমি আমার পদতলে পতিত হও, আমি তোমাকে এ সকলই প্রদান করিব।” বীজ তৎক্ষণে “পর-ত্মন পশ্চাতে রাখ” বলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেন। পরনারীর চিত্ত অত্যন্তই দুর্বল, বাহ্যতে রসনার হৃষ্ট হয়, বাহ্যতে নরন মন চরিতার্থ হয়, বাহ্যতে শাস্ত্রিক জ্ঞান হয় সে সকল বিষয় উপেক্ষা করিয়া জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য লাধনে সফলতা লাভ করা সাধারণ সমুদায়ের দ্বারা সম্ভব নহে। সাধারণ লোকের সঙ্গে মহাত্মাদিগের এই পার্থক্য প্রত্যক্ষ। বীজ এক মহৎ আদর্শ ধরিবার জন্য প্রস্তুতমান হইয়াছেন; দ্বাধাধানে এক নবযুগের স্বপ্রাপ্ত করিবার জন্য অগ্রগম হইতেছেন, তাঁহার পক্ষে অন্তরের দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি সমন ও বাহ্যের জ্ঞান সম্পদের প্রতি বীজরূপ প্রকাশ বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। এই প্রলোভন দূর বীজ চরিত্রের একটা অতুতপূর্ণ ঘটনা বলিয়া বাইবেল

এবং ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু কেবল যীশুই যে নরকুলের মধ্যে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা নহে। এই পুত্রের পুত্রের অনগ্রগণ্যের ৪০০ শত বৎসর পূর্বে কপিলবস্তুর রাজকুমার, সুন্দরী ভাৰ্যা ও ভবীয়া ক্রোড়স্থ নবজন্মের ও অল্পলবন ঐশ্বর্য্য পরিচয়্য করিয়া গরাধানে গিয়া কঠোর সাধনার রত হন। সেখানে তাঁহার সমুখে সপোর-বাপনা। নানাজ্ঞপ যোহিনীমুক্তিতে তাঁহাকে প্রোক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছিল।

যীশু নির্জন প্রদেশ হইতে অস্তরে পশ্চিমাভ করিয়া সময়ে আগমন করিলেন। তখনও বোধ জনন যোহন জর্দান নদীতীরে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার বার্তা ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেন। যেহেতু একদিন সকলের নিকট যীশুর আধ্যাত্মিক শক্তির বিশেষ প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহা দ্বারা যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এ কথাও সকলকে বিদিত করিলেন।

যীশু কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। যীহার জনসাধারণের মধ্যে কোন বিশেষ মত বিস্তার করিতে চাহেন, তাঁহাদের অজ্ঞাত পিতৃের প্রেরণন। যীশু আপনাব কার্য্যের শুদ্ধ স্বীকৃতি, অনতিবিলম্বেই শিশু নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে বাদ্য শিশু মনোনিত করেন; তদ্বাথে চারিজন বীর স্তান। ইহারা নৌকা করিয়া গ্যালালীর সমুদ্রবক জাল ফেলিয়া বাছ ধরিতেন, যীশু ইহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার অজ্ঞগমন কর, এবং প্রেযের জাল বিস্তার করিয়া নরনারীর মন প্রাণ প্রেমাবীন করিয়া ফেল। ম্যাট্‌থ্‌ থালা

আবার করিতেন, অপর অস্ত্রাজ্যে দিগ্ধ ছিলেন। যীশু শিক্ত ও ধনী লোকদিগের মধ্য হইতে শিশু সংগ্রহ করেন নাই। গীহার লবল, সামাজ্য অরব্ধে সন্তষ্ট, এমন সকল লোকদিগের মধ্য হইতেই তিনি শিশু সংগ্রহ করিয়া, বিবাসের ও প্রেযের রাজ্য সংস্থাপনে উলোপ্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা বিকলে যায় নাই।

যীশু এই সময়ের মধ্যে একদিন পর্ব্বতের উপর গিয়া উপবেশন করিলে, তাঁহার শিষ্য-বৃন্দ তৎপরীণে উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন তাঁহাবিগকে সংক্ষিপ্ত কথায় কয়েকটি উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশগুলি তাঁহার উপদেশের সার। এই সকল কথার মধ্যে সমাজ বা বিজ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই নাই; সকলি আধ্যাত্মিক উপদেশ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যদিও কোন স্থলে, তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, “দেখ সরোবর বক্ষে শতদল প্রস্ফুটত রহিয়াছে, ইহারা বহন করেন না, তথাপি ধনশালী সলসনও উহার একটির দ্বারাও স্পোষিত হইতে পারেন নাই।” কিন্তু এটি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও গাভীর অজ্ঞতব করিবার অস্ত্র নহে, মানবকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিবার অস্ত্র।

যীশুর উপদেশগুলির মধ্যে একটা প্রধান কথা, “স্বর্গরাজ্য”। স্বর্গরাজ্য কি, এ সম্বন্ধে সকলে একমত নহে। কেহ কেহ বলেন, স্বর্গরাজ্য অর্থে যীশু অধ্যাত্মজগতের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহাঃসারে নরনারী যাহাতে সুখে সুখন্দে বাস করে, এ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই তিনি স্বর্গরাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

৩৪শ পর্ব, তৃতীয় সংখ্যা। বীতর জীবন লব্ধকে কয়েকটি কথা।

আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান-চার্চের কোন সুবিখ্যাত ধর্মযাজক বলিয়াছিলেন “This Kingdom of God is nothing else, but perfect human conditions.” এ ধর্মাবাসে নরনারী সুখে বাস করিবে। বীতর প্রচারিত ধর্মব্রজা ইহা ভিন্ন অস্ত কিছু নহে। বীত তাঁহার প্রচারের মধ্যে প্রেমকেই সর্কোপরি স্থান দান করিয়া গিয়াছেন। অগে নরপ্রেম, তৎপর ভগবৎপ্রেম। আমরা পৃথীক বাইবেলে তাঁহার কথার এইরূপ প্রমাণ দেখিতে পাট,—

যখন জুদি বেদীর সমুখে পূজার লজ কোন উপহার আনিবে, তখন যদি তোমার মনে হয়, যে কোন লোকের সঙ্গে তোমার অসম্বাদ আছে, তাহা হইলে অগ্রে গিয়া তাহার সহিত দ্বিত হইয়া মনোমানিত্ত্ব লুপ্ত করিবে তৎপর পূজার উপহার বেদীর সমুখে প্রদান করিবে।

কিন্তু রীটির সমাজে অধিকাংশ স্থলেই ইহার বিপরীত ভাবই দৃষ্ট হয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার; দরিদ্রদের অর্থ লইয়া অনেক স্থলে অকর্মণ্য পৃথীক ধর্মযাজক-দের বিলাসিতা বৃদ্ধি করা—যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা রক্তস্রোতে দ্বারা অল্পহস্তিত করা, এ

সকল মানব-প্রেমের পরিচয় নয়—বীতরও শিক্ষা নহে। এ বিশ্বের আলোচনার কোন একজন বিখ্যাত তত্ত্বাবলী ব্যক্তি বলিয়াছেন, “Christianity has sadly misrepresented Jesus. Jesus puts love for man, first, not love for God.”

বীত যে অগ্রে মানবপ্রেম, তৎপর ভগবৎপ্রেমের কথাই বলিয়াছেন, -পৃষ্ঠপর্দ সে তার প্রকৃতরূপে মানবজাতির সমুখে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই।

মাধু অমাধু সকলের উপর তাঁহার কি প্রেম! একবার কয়েকজন লোক তাঁহার নিকট এক স্রীলোককে দরিদ্র আনিয়া বলে, এই নারী হৃৎকণ্ঠে লিপ্ত থাকে। বীত অভিযোগকারীদের কথা শুনিয়া বলিলেন, “এ নারী পাপ করিয়াছে; বেশ, তোমাদের মধ্যে যে কখন পাপ কর নাই সে উহার গায়ে তিল নিক্ষেপ কর।” বীতর এই কথা শুনিয়া সকলে ঘীরে ঘীরে চলিয়া গেল। তৎপর তিনি সেই স্রীলোকটিকে বলিলেন “হবে বাও, আর পাপকারীর রক্ত থাকিয়া জীবন কলঙ্কিত করিও না।”

একবার একবার বীতকে আনিয়া বলে, আমার পুত্র কিন্তু হইরাছে, কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছে না। বীত সেই ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন। জননী পুত্র লইয়া উপস্থিত হইলে, বীত তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহার ক্ষিপ্ততা দূর করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা শুকর এই আশ্চর্য শক্তি দর্শন করিয়া কিরূপে এ ঘটনা সম্পন্ন হইল, জিজ্ঞাসা করার বীত তাহা দ্বিতীয়কে অবিশ্বাসী বলিয়া তৎসমা করিয়াছিলেন।

যীত অনেক সময় গরেরক্ষেণে উপদেণ
প্রদান করিতেন। তাহার মধ্যে অপব্যায়ী
পুত্রের গরুটি অতি উৎকৃষ্ট। কোন ধনশালী
ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের
মধ্যে বিবর বিভাগ করিয়া দিবার জন্য পিতাকে
অনুরোধ করে। পিতা উত্তরের মধ্যে সম্পত্তি
বিভাগ করিয়া দেন। কনিষ্ঠ সম্পত্তি প্রাপ্ত
হইয়া কিছু উপস্থল হইয়া পড়িল। পিতার
অধীনে থাকিতে সম্মত হইল না। পিতার
বাটা পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইল, এবং
কোন দুঃবেশে গিয়া অসংসদে নিশিরা, অসং
কার্যে লিপ্ত হইয়া, পিতা-প্রদত্ত সকল ধনই নষ্ট
করিয়া ফেলিল। ধনীর সম্বান তখন পথের
ভিখারী হইয়া অস্বাভাবে কোন শূকর
ব্যবসায়ীর শূকর চরাইবার তার গ্রহণ করিল।
রীহদি জাতির মধ্যে একাধা অতি নিষ্ঠুর
কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। বিপথগামী
পুত্র অপকৃষ্ট কার্য গ্রহণ করিয়াও, উপযুক্ত-
রূপে অন্নবস্ত্র প্রাপ্ত হইত না। অস্বাভাবে
তাহার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। এই
নিপাকর্ণ কঠোর মধ্যে মনের দুখে গৃহত্যাগী
পুত্র একদিন নির্ঝঞ্জে বসিয়া এইরূপ ভাবিতে
লাগিল, হায়! আমার পিতা ধনী, আমার
বাড়ীতে কত দাসদাসী কার্য করিতেছে,
আমি এমন পিতার সম্বান হইয়া আজ শূকর
চরাইয়াও ক্ষুধানিযুক্তি করিতে পারিলাম না।
এই আত্মদানিতে তাহার অন্তর যেন জ্বলিয়া
উঠিল। পিতার অবাধ্য হইয়া বিপথগামী
হওয়ারই যে তাহার এই শাস্তি তাহা সে তখন
বুঝিতে পারিল। এবং মনের ক্লেশ পিতাকে
জানাইয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে
বলিয়া নিজ গৃহের দিকে অগ্রসর হইল। পিতা

শূকর হইতে সম্বানের আগমন বার্ষিক তিনবার,
বছরদিন পরে পুত্রদ্বয় দেখিবার জন্য বাটা
হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলেন। দূর হইতে
সম্বানকে আসিতে দেখিয়া, তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ে
অগ্রসর হইয়া পুত্রের বাক্যসুধনের পূর্বেই
দুইহাতে সম্বানের কর্তৃ মড়াইয়া ধরিলেন;
উত্তরের চক্ষের জল একলক্ষে মিশিয়া
উত্তরের বক্ষস্থল ভিজাইয়া ফেলিল; পুত্র গৃহে
আগিল। পিতা, পুত্রের জন্য দাসদাসীদিগকে
পরিচ্ছন্ন আনিতে বলিলেন, এবং তাহার
আগমনের জন্য সেদিন রাত্রিতে প্রীতিভোজনের
আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

যীত অনেক অশৌকিক কার্য করিয়া-
ছিলেন বলিয়া কথিত আছে; ইহাতে আমরা
বিস্মিত নহি, কেন না একজন ঘটনা
আমরা আদৌ অসম্ভব বিবেচনা করি না।
একজনের শরীর মনের উপর আর
একজনের আধিপত্য বিস্তারের কথা
ভারতবর্ষে নূতন নহে। অতিরিক্ত মড়াবাদী
পান্ডিত্য জগতেও এই আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছা-
শক্তির প্রভাবের কার্য অনেক প্রত্যক্ষ
করিতেছেন, এবং ভারতের অধ্যাত্মতাব্যাপার
ব্যক্তিয়া পূর্বে যে শক্তিসম্পদের কথা
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আজ প্রতীচ্য
জগতে বাহ্যিক প্রাকৃতিক বিভ্রমে উল্লেখ্য
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার এই শক্তি পরি-
চালনের কার্য প্রত্যক্ষ করিয়া, অধ্যাত্ম
শক্তিরই জয় ঘোষণা করিতেছেন।

এই মহাপুরুষ কার্য করিতে করিতে
শত্রুবিগের চক্রান্তে পতিত হইলেন। আলম
বিপদ বুঝিতে পারিয়া তিনি অদৃষ্টান্ত নিষ্ঠুর
গেণসিমান উত্তামে গমন করেন। অজ্ঞান

চরণ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

মহাত্মা খুঁটের একটি উপদেশ।

রজনীই তাঁহার জীবনের শেষ রজনী।
কৃশের বয়স, রক্তমাংসের বেহা কল্পে নহন
করিবে এই ভাবনা তাঁহার চিত্তকে ঢকল
করিয়াছিল। যে প্রার্থনাকে তিনি জীবনের
একমাত্র সঞ্চল করিয়াছিলেন, আর সেই
প্রার্থনার সাহায্যেই অস্তরে বলপাত করিবার
জগৎ এই নির্জন প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছেন।
যামিনীর অন্ধকার পোহাইতে না পোহাইতে
জুডাস ইফেরিহট পক্ষবিলে সুত্রার লোভে
এক মশাল হস্তে সেই উজানে প্রবেশ করিয়া,
মানবজুলের চিত্তেবী, বিনয়ের অধস্তার,
তত্ত্বচূড়ামণী বীণকে শতহস্তে তুলিয়া দিল।
পারলোন্টের বিচারে রোমান আইন অঙ্গুপারে
তাঁহার প্রাণকণ্ডের আত্মা প্রদত্ত হইল।
বীণ কুণ্ঠকণ্ঠে আবদ্ধ হইলেন।

খুঁটানিগের পরিজ্ঞাতা বীণ ও এ সময়
যথার্থ রক্তমাংস বিশিষ্ট মানবের স্তায় এই কথা
বলিয়া ছিলেন, “পরমেশ্বর! তুমি কি এখন

আমার পরিত্যাগ করিলে?” কিন্তু পেরেকের
আগাতে বক্ষস্থল হইতে যখন দ্রবদর ধারে
রক্ত বহিয়া বাইতে লাগিল, তখন হত্য-
কারীগণের লগ্ন এই বলিয়া প্রার্থনা করি-
লেন, “শিতা! পক্ষা কয়, ইহারা জানে না
যে ইহারা কি কার্য্য করিতেছে।” যিনি
জীবনে মানব-প্রেমকেই একমাত্র নিয়ামক
করিয়াছিলেন, আর জীবনের অন্তিম-
কালে সেই কথা উচ্চারণ করিয়াই প্রেমের
জয় ঘোষণা করিয়া গেলেন।

এমন লোকের চরণে দ্ববরের ঐতিহ্য
কুহ্মন অর্পণ না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকি যায়?
না করিলে মানবের সমুদায় পক্ষে না—
যাতীর গৌরব বৃদ্ধি হয় না। তবে তখন এই;
ব্রাহ্ম মানব তাঁহাকে মহান্ পরমেশ্বরের
সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারই প্রকৃত গৌরব-
বিস্তারে বিয় উপস্থিত করিয়াছে।

ঐশ্বর্যবিশ্বব্রহ্ম বহু।

মহাত্মা খুঁটের একটি উপদেশ।

মহাত্মা খুঁট তাঁহার শিষ্যদিগকে হৃদয়
ছোট ছোট গল্পে উপদেশ দিতেন। তিনি
এক সময় তাঁহার শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া
বলিতেছেন, “কোন নগরে সাতটি স্তম্ভ ও
সাতটি কুমতি জীলোক থাকিত। তাহার
একদিন শুনিল ‘অস্ত্র এক বয়স যাইতেছেন।’
ইহা শুনিয়া তাহার ও ঐ বয়সের সহিত যাইবার
সংকল্প করিল। স্তম্ভজীলোকগুলি অস্ত্র হইতে
তৈল, প্রদীপ প্রভৃতি সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া
বয়ের প্রতীক্ষার গন্তব্য স্থানে বসিয়া রহিল।
আর স্তম্ভজীলোকগুলি তাবিল, বয়ের

আগিতে অনেক বিলম্ব হইবে, ততক্ষণ একটু
সুখাইয়া লইয়া কেন? দোকান ত নিকটেই,
বয়স আসিবার কিঞ্চিৎ আগে উত্তীর্ণ হইল,
প্রদীপ প্রভৃতি কিনিলেই চলিবে। এইরূপ
ভাবিয়া তাহার, স্তম্ভজীলোকের পার্শ্বে শয়ন
করিয়া দ্রষ্টব্য সুখাইয়া পড়িল। এদিকে বয়ের
যাত্রার শব্দ শুনা গেল, স্তম্ভজীলোকের
প্রদীপ উদ্ভাসিয়া বায় হইয়া গিয়া রহিল,
কুমতি জীলোকেরা বাস্তবশ্বে উত্তীর্ণা দেখিল
যে বয়স অতি নিকটে—তখন তাহার স্তম্ভজী-
লোকগুলিকে বলিল, “তাই তোমরা

আমাদের কিঞ্চিৎ তৈল খার দিতে পার?"
সুমতির উত্তর করিল, "তাঁই আমাদের তৈল
অতি অল্প পরিমাণে আছে, তোমাদের খার
দিতে পারিব না।" তখন তাহারা তাড়াতাড়ি
বোকানে তৈল কিনিবার নিমিত্ত গেল।
ইতিমধ্যে বর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।
সুমতি স্ত্রীলোকেরা সমাগ হইয়া বসিলা ছিন্ন,
বর আসিগামাত্র তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল।
সুমতিয়া বোকানে হইতে ফিরিয়া আসিলা
দেখিল বর অনেককণ চলিয়া গিয়াছেন। তখন
তাহারা সুমতিদিগের পৰিচয় অতুলরণ করিয়া
বরের বাটীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।
তখন বরের বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

তাহারা ঘরে বার বার করাঘাত করিতে
লাগিল। ভিতর হইতে বর উচ্চঃস্বরে বলিলেন
‘তোমরা চলিয়া যাও, আমি তোমাদের
চিনি না।’

আমাদেরও সেই বরের মত সর্বনাশ প্রাপ্ত
থাকিতে হইবে। তিনি কখন আমাদের
লইতে আসিবেন তাহার হিমতা নাই। তিনি
কখনই আসিবেন, তখনই যেন আমাদের
দেখিতে পান। আমরা যেন সুমাইয়া না
শক্তি, বিষয় না করি। তিনি যেন আমাদের
কখনও না বলেন “আমি তোমাদের
চিনি না।”

ঐতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সমাধি-সাধ।

সেবার পানিরা সনে,
গাছে নদী জুপু তানে,
মুখরিত ডারিদ্রিক সুমধুর গানে ;
পরে পরে আজি সাধি, দিও ঘোরে সেথা বাধি,
চির জীবনের সেই অনন্ত শরানে।
বেথা জ্যোৎস্না নিরমল,
সলসিছে স্নান মল
সুবিমল নির্ঝরন্তি সহস্র পারাবার ;
বড় সাধ বার মনে, আমি সেথা সন্ধানপনে,
কাটাও জীবন মোর অনন্ত শব্দাধ।
বেথার ফুলের গন্ধে,
গাছে নব নব ছন্দে,
দৌরভ-মদিরা-প্রায় বিহগ লকণ ;

বিকশিত বনবল, প্রশোভিত তরুণল,
আমার সাধের সেই সমাধির স্থল।
বেথার শেখর ধরি,
শিবী নাচে শাখা-পরি,
স্নায় গুণ্ডতে, বেথা শিকের স্রুতান ;
বেথা শতবল শত, ঢালে স্থা অবিরত,
সেই ত আমার শির সমাধির স্থান।
বেথার মলরা সনে,
স্রব্রভিত কুলবনে,
চৌকিক ছাইরা হালে দুপের স্রাবণ ;
সেই স্বপনের বেশে, সমাধি স্থাপিরা শেষে,
তচিব অনন্ত শব্দা এই অতিশায়।
ঐপ্রসন্নপঙ্কজ গুহ।

জাপানে অতিথিসংকার ।

জাপানে অতিথিসংকার ।

অতিথিসংকারের উৎসল দৃষ্টান্ত ভারত-
ইতিহাসে যতটা দেখিতে পাওয়া যায়
অপর কুজাপি তেমন নাই বলিয়া আমার
বিশ্বাস। সমস্ত দিনের তিক্তাঙ্গক অগ্রে
অতিথিকে পরিভোজনপূর্বক ভোজন করাইয়া
নিজে সম্পূর্ণ উপবাসী থাকা, এবং অতিথির
মনস্কটির মত একমাত্র পুত্রের মতক হেদন
করায় দিবরণ কেবলমাত্র ভারতেই দেখা যায়।
ভাতিবর্ণনির্ধিংশে অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে
পূজা করা আমাদের শাস্ত্রেরই উক্তি। অধুনা
জনসাধারণের অধিকাংশই উদয়ানচিহ্নভার-
ত্বে;—হর্ষিত প্রসীড়িত বলিগেও অকৃষ্ণ হই
না; তাই পূর্বের ভাষ্য তেমন ভাবের
অতিথিপরিচর্যা আমাদের ভিতর না
থাকিলেও পল্লীর স্থানে স্থানে আজ
পর্যন্তও কাহারো কাহারো ভিতর প্রাচীন
অতিথিপেরতার আভাসমাত্র দেখিয়াই আমরা
মুগ্ধ হইয়া যাই।

জাপানের কৃতপূর্ণ প্রধান মন্ত্রী, কুটনীতিজ্ঞ
কাউন্ট ওকুমােক বক্ষ্য গীত করিয়া কোন
কোন সভায় বলিতে শুনিয়াছি—প্রাচ্য-
সভ্যতা এশিয়ার পশ্চিম প্রদেশ হইতে ক্রমে
জাপানে আসিয়া উপস্থিত হয়, বিশাল প্রশান্ত
মহাশাগর অতিক্রম করিতে না পারিয়া সে
সভ্যতা জাপানেই বনীভূত হয়। তারপর
শান্তাত্য সভ্যতা সেই বিশাল প্রশান্ত
মহাশাগরে বাধা প্রাপ্ত হইয়া আমেরিকায়
আসিয়াই বনীভূত হইয়াছিল। হঠাৎ বাধ
কাটরা দিলে বজ্রের মল যেমন চক্কর
পলকে নিমগ্নে প্রানিত করিয়া ফেলে
তেমনি আমেরিকায় সে সভ্যতার বাধ ছিল

হওয়ায় আর জাপান নব্য শান্তাত্য সভ্যতার
দুবু দুবু। হুতরায় জাপান আজ প্রাচ্য এবং
শান্তাত্য সভ্যতার চূড়ান্ত শিখরে।

কাউন্টের ঐ উক্তির প্রতিবাদ করা এ
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমার মনে হয়
জাপানে কোন সভ্যতাই তেমন বনীভূত
অবস্থার পরিণত হইতে পারে নাই; কেবল
দুই সভ্যতার অপরূপ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।
উহাদের অতিথিসংকার হইতেই ইহার
বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার
নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আজ দুই একটা
ঘটনার উল্লেখ করিব। প্রথম ছয় মাস ভাষা-
জ্ঞান নিত্যই কম ছিল বলিয়া জাপানীদের
সহিত ততটা মেলামিশি করিতে পারি নাই।
গাকোয়া ইংরাজী বলিতে পারিতেন এমন
কতকগুলি বন্ধু নাকি মাঝে আমাদের বাড়ীতে
আসিয়া ঘর ভর করিতেন। সাত আট মাস
অতীত হওয়ার পর উত্তর জাপানে সর্জনপ্রথম
এক ভ্রমণবিধানে নিমন্ত্রিত হই। বাড়ীর
কর্তা সেনাবিভাগের একজন কান্তান, তাঁহার
ছেলে আমাদের বন্ধু। তিনি ক্লিগিভিভাগের
একজন গ্রাফরেট এবং আমাদের ক্যামেরার
জটনক অধ্যাপকের ভ্রাতাতা। তিনি
হোকাইদো বীপের গভর্নর জেনারেলের
অফিসে কাৰ্য্য করিতেন। তাঁহার মহাবিশি
ভ্রমণোক্ত। সহর হইতে তিন মাইল রেল
গিরা তাঁতাদের প্রায়েই ট্রেনে নামিতে হত।
জাপানে স্ত্রী পুরুষ সকলেই চিৎ-বিভার
নিম্বেস্ত; বন্ধু পূর্বেরই ট্রেন হইতে রাক্তা,
ঘাট, বাড়ীর গেট, ঘর দরজা প্রভৃতি হ্রস্ব
ভাবে কাগজে অঙ্কিত করিয়া পাঠাষ্টাছিলেন।

সে চিত্র হাতে লইয়া যে কোন ব্যক্তি অপরকে
 জিজ্ঞাসা না করিয়া অনাধায়েই গল্পনা বানে
 উপস্থিত হইতে পারে। আমরা কেবলমাত্র
 দুইটা ভারতবাসীই তখন সে খোঁপে বাস
 করিতাম, উভয়ে নিমগ্ন রম্যর মস্ত আনন্দ
 হইলাম। আমরা বিদেশী, কোনরূপ অসুবিধা
 হইতে পারে তাবিয়া আমাদের বোঝিঃ এর
 একজন সহাধারী বন্ধু যেজ্জারই আমাদের
 সঙ্গে চলিলেন, তিনি ইংরাজী জানিতেন।
 আমরা বন্ধুর হারিদেশে 'মাগ কলম' বলিয়া
 উপস্থিত হইলাম। বন্ধু বাহির হইয়া হাটু
 গাড়িয়া অভিযানন করিতে করিতে
 আমাদেরিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং
 বলিবার ঘরে ধরিয়া লইয়া গেলেন।
 ভাপানী বর তাতামি অর্থাৎ এক প্রকার মাহুর
 খাঁটা খড়ের গদিতে আবৃত। তাহার
 উপর কয়েকখানা ভদ্রকর চামড়া বিছান
 ছিল। চামড়ার উপর আবায় প্রত্যেকের
 মস্ত এক একখানা আসন রাখা হইয়াছিল।
 বড় লোকের বাড়ীতে সাধারণ ব্যবহারের
 মস্ত এবং গরীবের বাড়ীতে অতিপরি
 অভ্যর্থনার মস্ত রেশমী আসন ব্যবহৃত হইয়া
 থাকে। উপবেশন করিলে মাথা হেঁট করিয়া
 পুনঃ পুনঃ কতকগুলি অভিযানের গব
 আগুতি করিতে করিতে আমরা পরস্পর
 পরিচিত হইতে লাগিলাম। সহাধারী বন্ধু
 অনাহৃত হইয়া, কেবল আমাদের সাহায্যের
 মস্ত, তথায় গিয়াছেন বলিয়া ঐটি
 স্বীকার করিলে পর তিনিও পরিচিত
 হইলেন। দুইটারি কথার পর বন্ধুর স্ত্রী হাটু
 গাড়িয়া কয়েক পাচ চা আমাদের মন্থনে
 রাশিয়া পুনঃ পুনঃ অভিযানন করিতে করিতে

পরিচিত হইলেন। আর সকলের বাড়ীতেই
 প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি মশটা পর্যন্ত চায়ের
 মস্ত মলের কেটলি আগুনের উপরই চাপান
 থাকে। কোন আগন্তুক বাড়ীতে আসিগামাত্রই
 গরমমলে শুক চা-পত্র ছাড়িয়া দিয়া সবুজ চা
 (Green tea) দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়;—
 আমাদের বাংলা দেশে যেমন পান তামাক
 দেওয়া রীতি। প্রথম প্রথম ঐ চায়ের
 আবাদন আমরা টমিক ঔষধের মত মনে
 করিতাম। ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেলে
 বেশিলাম শীতপ্রধান দেশে উহার প্রক্রিয়াও
 অনেকটা টমিক ঔষধের মত। চা আমাদের
 সমুখে রাখা হইলে পর বন্ধু এক ভগিনী
 এক বৃদ্ধি আগল, নানপাতি এবং কয়েক-
 খানা ছুরি রাশিয়া হাটু গাড়িয়া অভিযানন
 করিতে করিতে পরিচিত হইলেন, এবং
 অপর এক ভগিনীও কেক বিক্টিটের পাত্র
 রাশিয়া পুর্কোক্তভাবেই পরিচিত হইলেন।
 এইরূপে সকলে পরিচিত হইয়া আমাদের সমুখ
 হইতে গিয়া পাশের ঘর হইতে উঁকি মারিয়া
 আমাদেরিগকে দেখিতে লাগিলেন। বন্ধুর মা
 ও ঠাকুর মা পানিকটা ঘুরে পুর্কার আড়াল
 হইতে অতি সজোচের সহিত এক একবার
 আমাদেরিগকে দেখিতে ছিলেন। তাহার
 বৃদ্ধা, স্ত্রীনের মস্ত স্নান পর্যন্ত ও তাহার
 ভিতর অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। বন্ধু
 গ্রাফ্রেট হইলেও নিজে ইংরাজী বলিতে কিঞ্চিৎ
 অপরের ইংরাজী বুঝিতে পারিতেন না, শুধু
 বই পড়িয়া বুঝতেন। তাহার স্ত্রী তাহার চেয়ে
 বেশ ইংরাজী জানিতেন। আমরা ইংরাজীতেই
 কথাবার্তী করিতে লাগিলাম। সহাধারী
 তাহা ভাপানীতে শুদ্ধমা করিয়া বন্ধুকে

বুঝাইতে পারিলেন। শুধু কখন কখন ইংরাজীতে দুই এক কথা বলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে শিতর কথা কহিবার মতো চেষ্টা, অপর কক্ষ হইতে রমনী কঠোর হাত তরফে ডুবিয়া গেল। এইরূপে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনে উপবেশন করিলাম। বড়ব তৃতীয় অর্ধাং কনিষ্ঠ তগিনী অন্ন, ব্যঞ্জন, ভাজা, মিষ্টি প্রাকৃতি সামগ্রী পুনঃ পুনঃ হাটু গাড়িয়া পরিবেশন করিলেন। তিনি অলযোগের সময় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া এই উপলক্ষে পরিচিত হইলেন। জীবনের সর্বপ্রথম সেই দিনই জাপানীদের দ্বারা দুইখানা কাঠ শগাকার সাহায্যে আহাৰ্ণা মুখে তুলিতে প্রয়াস পাইয়া-ছিলাম। আহাৰ্ণাত্রে এক বটাকাশ বিস্রাম করিয়া পুনরায় মানাতাবে অভিবাদন করার পর সহরে চলিয়া আসিলাম। বলা বাহুল্য যোড়শোপচাবে পরিতোষপূর্ণক ভোজন করাইলেও প্রতি বিধে ত্রুটি স্বীকার করা ইহাদের অভ্যাস! আমরা সেদিন তাঁহাদের ভিতর গ্রাম্য সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া-ছিলাম।

মাঝে মাঝে আমরা ঐ গ্রামেরই অপর এক বাড়ীতে নিয়ন্ত্রণ গাইতাম। এই বাড়ীতে সহরের আড়ম্বরমিশ্রিত অভ্যর্থনাত্রেও গ্রাম্য সরলতা উপলব্ধি করিয়াছি। বুঝা মাঠে কৃষিকর্ম করিতেন; তিনিই বাড়ীর কর্তা। তাঁহার ছেলেমেয়েরা রাজধানী ভোক্তিও সহরের স্কুলগুলো পড়াশুনা করিতেন। সেখানেই তাঁহাদের সহিত আমাদের আনাতনা। এক ভাই আমেরিকার সামরিকবাহিনীতে সহরে পড়িতেন, এক বোন

তিনে শিক্ষকতা করিতেন এবং আর এক ভাই ইঞ্জিনিয়ার। তাঁহাদের সেখানে গেলে গান বাজনা ও খেলার যোগাড়বস্ত্র যেমন থাকিত খাওয়াপাওয়ার বন্দোবস্তও তেমনি হইত। বুঝা আমাদের আগমনবার্তা জানিতে পারিলে মাঠের কাণ বন্ধ করিয়া গুল্পী, বেক প্রভৃতি কৃদি বস হাতে গাইয়াই আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ছুটয়া আসিতেন। তাঁহার সরলতার এবং আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের বুঝাদের সরলতার যেন কোন পার্থক্য দেখিতাম না। বুঝা তাঁহার ছেলেমেয়েদের গল্প করিয়া আনন্দে আটখানা হইতেন। একদিন বুঝা সন্ধ্যার প্রাকালে মাঠ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেই হঠাৎ আমরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন তাঁহার ছেলেমেয়েরা কেহ বাড়ীতে ছিল না। আমরা বাড়ীর বাহির হইতেই কিরিতেছিলাম কিন্তু বুঝা কিছুতেই কিরিতে দিলেন না। তিনি বলিতে পারিলেন যে যদি তোমরা বাড়ীর বাহির হইতেই কিরিয়া বাও তাহা হইলে আমরা ছেলেমেয়েরা মনে করিবে যে আমি তোমাদিগকে অভ্যর্থনা করি নাই; তাহারা হরত ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়াই দিবে। অগত্যা তাঁহার অহুতোধে আমরা ভিতরে গিয়া বসিলাম। তাঁহার আঠ বহুরের ঘোঁসীটিকে কেক বিক্টি প্রকৃতি আনিতে দোকানে পাঠাইয়া তিনি আমাদের সহিতনানা স্বকম গল্প করিতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য, জাপানের যে কোন পল্লীতে কেক, বিক্টি, দোড়া, লেননেড, ল্যাম্প, চিমনি, শাক তরকারী প্রকৃতি নিন্দা আবস্তকীয় জবোর দোকান আছে। অলযোগ করিয়া এখন আমরা

ঘরে ক্রিড়েছিলাম তখন বৃদ্ধা ১২টি ডিম আনিয়া জোর জুগুন করিয়া আমাদের পক্ষেটে দিলেন। আমরা কিছুতেই লইতে রাজী না হওয়ার বৃদ্ধা বড় হুঃখিতা হইলেন। তিনি বলিলেন, বাবা তোমরা খেড়িয়ে থাক। মাবোনের মত কেহ তোমাদের খাওয়া দাওয়ার ~~কাজকানুন~~ কছিতে নাই, তোমরা ঠোঙে নিরের ঘরেই তাজিয়া কিংবা গিদ্ধ করিয়া খাইতে পার। আর যদি তাহাতেও সম্মতি নাহি মনে কর কাঁচা ডিম শুধু তাজিয়া মুখে ঢালিয়া বিশেষ অনেক উপকার। আমরা কথা রাখ, ডিম কয়েকটি লইয়া যাও। আমরা বৃদ্ধাকে খুশ্বাঙ্গ দ্বিতে দিতে এবং অভিযাদন করিতে করিতে ডিম কয়েকটি লইয়া আহ্বান করিলাম। জাপানী ছাত্রগণ প্রতিদিনই কাঁচা ডিম খাইয়া থাকে। পরীক্ষার সময় এতথ্যকে বৈদিক ৪৩ টা ডিম যায়। উত্তর জাপানে এক একটা ডিমের দাম পাঁচ পয়সা।

কলেজের ছেলেদের সহিত দল বাঁধিয়া যদি কখনো কোনো বাগানে গিয়া আপেল, আঙ্গুর কিংবা মালপাতি প্রভৃতি ফল খাইয়া আসিতাম অত্যন্ত সকলে ভাগে উহার দাম দিত কিন্তু আমাদের দাম বিতে দিত না। উহার বলিত তোমরা আমাদের অতিথি, তোমাদের নিকট হইতে দামের অংশ লইতে পারি না। কয়েকজন মিথিয়া পার্কের পুকুরে নৌকা চাপনা অভ্যাস করিতে গাইতাম, তাহাতেও আমাদের নিকট হইতে ভাড়া লইত না। প্রথম বৎসর জাপানের উত্তর ভাগে সকলের কাছে আমরা ঠিক অতিথির স্তায় বিবেচিত হইতাম।

বুদ্ধদেবের তিরোধান দিবসে প্রতি বৎসর

মন্দিরে মন্দিরে পূজা অর্চনার বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। আমরা কয়েকজন জাপানী বন্ধুর সহিত সে সমারোহে যোগ দিতে মন্দিরে গিয়াছিলাম। মন্দির লোকে পূর্ণ; মোমের বাতি জালিতেছিল, দুগ্ধদ্বার গন্ধে চৌদিক আমোদিত। পুরোহিতগণ একটি বাজঘরের সহিত তাল মিলাইয়া পালি, চীন, কোরিয়া এবং জাপানী ভাষা মিশ্রিত মন্ত্র উচ্চস্বরে গাহিতেছিলেন। আমরা গিয়া তথায় উপবেশন করিয়া মাত্রই কয়েক জন অত্যাধীন্য কমিটির লোক আসিয়া আমাদেরকে মন্দিরের পশ্চাৎভাগে প্রাঙ্গণের মত এক স্থানে ধরিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে দুইটি বৃদ্ধা অতি নতভাবে আমাদেরকে অভিযাদন করিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে বাইতে অহুত্যাগ করিলেন। আমরা ওকণ খাঙে অভ্যস্ত না থাকায় শুধু সবুজ চা গ্রহণ করিলাম। আমাদের জাপানী বন্ধুগণ প্রাঙ্গণে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধার হাটু গাড়িয়া আমাদের চক্ষু, মুখ, নাসিকা, জু প্রভৃতি ওছাকা ছামার (বুদ্ধদেবের) ভায় বলিয়া হুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। আমাদের দুই একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা জাপানী কথা শুনিয়াই যেন উঁহারা উঁহা-বিগকে ধষ্ট্র মনে করিলেন। আমরা রাক্ষা ঘাটে নব্য-জাপানী কর্তৃক নিরোধে নামে অতিহিত হইলেও পল্লীর বৃদ্ধাদের নিকট আজ পর্যন্তও যেন অনেকটা দেববংশে লম্বুত বলিয়া বিবেচিত হই।

গায়ধানী ভৌকিও সহরের আতিথেরতা কৃত্রিমতা পূর্ণ, পাশ্চাত্যের আভ্যুত্থানে অলঙ্ঘ্য; স্বার্থে বিভ্রান্ত এবং সাহিত্যিক নিষ্ঠাচায়ে মুগ্ধিত। ভৌকিওর জাপানী বন্ধুগণ উত্তর

অফলের বন্ধনের তাহা নহে । উহাদের সঙ্গে কোন উৎসবে যোগ দিলে উহারাই আমাদেয় দৃষ্টি চাপিত । বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতেও অনেক সময় নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিয়াছি বহুবিধ লগুক্রিয়া । সদাগরের জাতিতে যেরূপ আশাকরা যায় তাহাই উপলব্ধি করিয়াছি । ঐহারা স্বাবদানাগিলে ভারত হইতে অর্থ লাভের লজ্জা উৎসব অথবা ঐহাদের অল্প কোন রূপ অভিসন্ধি আছে উহারাই মহা সমাদরে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া পরিতোষপূর্ণক ভোজন করাইতেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্যাহুসন্ধান যথাসাধ্য প্রদান পাইতেন । আর্থবিশ্বাস স্থলে প্রায়ই বৌদ্ধিক আত্মীয়তা দেখা যাইত । সহরে বহুবাৎসবের সমাগমে গান বাজনা, হালি-ভামালার কোয়ারা ছোটো । কোন বহু দেখা করিতে আসিলেই বৃষ্টিতে হইবে যে তাহার সহিত যে একায়েই হউক তিন চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেই হইবে । আমরা অনেক সময় উহাতে বিরক্তি এবং ক্রান্তি বোধ করিতাম । অনেকে বহুত্বের ভাগ করিয়া আমাদেয় নিকট ইংরাজী শিখিতে আসিত । জাপানে পুলকলেজের সহপাঠী কিবা বহুদিগের পরস্পরের মধ্যে কেহ অপরের বাড়ীতে গেলেই চা বিকিট দ্বারা অভ্যর্থনা করা হইয়া থাকে । তারপর গল্পসপক্ষে যদি আহারের সময় উপস্থিত হইয়া পড়ে তবে বহুকেও আহ্বান করাইতে হয় । দিনে উহাদের তিনবার প্রধান ভোজন—প্রাতে সাড়ে ছয়টায়, মধ্যাহ্নে বারোটায় এবং সন্ধ্যায় ছয়টায় ।

অপরের গল্পগ্রহ হইয়া জীবন কাটাইতে

আমরা এতটুকু দিবা বোধ করি না । আমরা পিনতৃত তাইয়ের শ্রালকপুর জেলের উকিল, মাসে তিন চারি শত টাকা উপার্জন করে, তাহার বাড়ি চাপিলে অল্পতঃ চকুলআর খাতিরেও অল্পতঃ না দিবা পারিবে না ; —এই ভাবে আমরা দলজন এক জনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছি ; কিন্তু জাপানীরা অতি নিকট আত্মীয়ের বাড়ীতেও একদিনের বেশী ভ্রমিন থাকিতে গেলেই লজ্জা এবং ঘৃণার স্রিয়বাপ হইয়া পড়ে । আমি কয়েক জনকে জানি বাহাদিগকে মাঝমাঝকদমা এবং উদেবারী উপলক্ষে কয়েক দিনের লজ্জা মক্কা হইতে তোকিও সহরে আসিতে হইয়াছিল । স্বতঃ প্রমুখঃ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ী ঐ সহরে রহিলেও হোটেলের থাকিয়া উহার কায করিত । দেখাশাফাতের লজ্জা কেবল একবেলা আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়াছিল ।

গ্রামের অনেক ছেলে সহরে পড়িতে যায় । সহরে বাহাদের আত্মীয় আছে তাহার আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিয়াই পড়াশুনা করে ; যেহেতু আত্মীয়েরা অভিভাবকের ভ্রাণ তবাব-ধান করিয়া থাকেন । বলা বাহুল্য, বোর্ডিং কিবা হোটেলের ভ্রাণ নির্দিষ্ট হারে খরচ দিয়াই এতোককে আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিতে হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অথবা হাউস অব লর্ডের মেম্বরের বাড়ীতেও এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি । ইউরোপ এবং আমেরিকার ভ্রাণ জাপানে এ পর্যন্ত বিশিষ্ট ভদ্র পরিবারে কোন ভ্রাণতীর ছাত্র থাকিতে পায় না । একাই কাওরাগুটি মাঘক দাজক বংশীর অনৈক ভদ্র জাপানী কয়েক বৎসর

কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে রাখার হাণ্ডে অবস্থান করেন। আমাদের কাশিম্বা কোন ভারতীয় বন্ধুর আশ্রয় স্বরূপ উক্ত কাগজগুটি মহাশয়ের নিকট অনেক অনুরোধ করিয়া উহাকে তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিবার বন্দোবস্ত করেন। ছেলেটি জাপানী কাঁচা এবং পচা খাওয়া অভ্যস্ত না থাকায় প্রায় দুই সপ্তাহেই স্তম্ভতর আমাশয়ে আক্রান্ত হইলেন। অগত্যা তিনি উক্ত বাড়ী ছাড়িয়া পুনরায় ভারতীয় ছাত্রদের মেলে আসিয়াই বাস করেন। যথা নির্দিষ্ট হারে হিসাব পরিষ্কার

করিয়া কাগজগুটি মহাশয়ের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিবার কালে উঁহাদিগকে বলিয়া কহিয়া করেন দিনের অস্ত্র একটি বাস সেশানে রাখিয়া আসেন। কয়েক দিন পরে বাসটি আনিবার সময় জানা গেল বাক রাখিবার ভাড়া চুকাইয়া না গিলে বাক উদ্ধার হইবে না। যাকই হউন আর বর্ডেই হউন সকলের ভিতরই সন্মত হইল। কেহ অপরের নিকট হইতে; বিশেষতঃ বিদেশীর নিকট হইতে জ্বালাপাইলে এক কপর্দকও ছাড়ে না।

বিবাহ অতি সংক্ষেপে বাড়ীতে সম্পন্ন



খালিকার অতিপিতব্যার।

করা হয়। বিবাহাদি ব্যাপারে নির্দিষ্ট সংখ্যক আশ্রয় স্বরূপ এবং অগাধ নিমন্ত্রিত বঙ্গবান্ধব যথাসময়ে কোন এক হোটেলে গিয়া ভোজন এবং আমোদ উৎসব সমাধা করিয়া আসেন। বিবাহস্থলে নিমন্ত্রিতের উপস্থিতি প্রায়ই দেখা যায় না।

উহাদের আতিথেয়তা নব্য এবং পাশ্চাত্য ভাষাপন্নই হউক আর বার্ষ বিজ্ঞিতই হউক উপসংহারে উহাদের একটি বিবরের প্রাংশ

না করিণী পাশ্রি না। সেটি বড় লোকের সহিত নিঃসর গরীব লোকের মিলন। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখিতে পাই নিঃসর গরীব লোক দূরের কথা নিক্ত মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্মান যদি কোন বড় লোকের সাক্ষাৎ অভিলাবী হইয়া এক সপ্তাহ কাল হাবুচুচু থাইয়াও তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য হইলেন তবে তাঁহার অষ্ট জুগলর বলিতে হইবে। জাপানীসের অতি বড় লোকও

৩৫৯ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

অপূর্ব সোনার মেয়ে।

সামাজিক ব্যক্তিকে বিশেষ সমানেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা ভারতীয় ছাত্রগণ তথাকার বড় বড় ব্যক্তির তুলনায় অতি নগণ্য ছিলাম বলিলেও অত্যাঁজি হই না, অথচ কাউন্ট ওকুনা, ধনকুবের ব্যারন শিশু ছাওয়া, এবং স্থপিত্ত ব্যারন আন্দা, এম, এ, প্রমুখ্যৎ লর্ড এমং পালিষ্টামেন্টের মেম্বরগণের দ্বারা আমরা যে ভাবে অভিযুক্ত হইতাম তাহাতে মনে হইত, যেন আমরাও তাঁহাদেরই সম্পদ্য ব্যক্তি! বৃদ্ধ কাউন্ট ওকুনা এক পদে ভর করিয়াই ঘরের দরজা পর্যন্ত আসিয়া আমাদের জায় নগণ্য ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন। রাজ-নৈতিক প্রতিযোগিতার জনৈক দুই লোক লোক কড়ক আহত হইয়া কাউন্ট এক পা হারাইয়াছেন।

সময় সময় কলেজের অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ী বাইতাম; অধ্যাপকপত্নী দরজার হাটু গাড়িয়া অভিযাদন করিতে করিতে আমাদেরিগকে অভিযর্থনা করিতেন। অবস্থাপর ব্যক্তির দ্বারদেশে বৈজ্ঞানিক খণ্টা এবং সাধারণ লোকের দ্বারদেশে ক্ষুদ্র পিতলের খণ্টা লাগান আছে; আগন্তকের আগমন-আতাল পাওয়ারমাত্রই বাড়ীর কেহ না কেহ বোঁড়িয়া আসেন। সাধারণতঃ "রমণীরাই

অভিযর্থনা করিবার জন্য চাটু পুঁলিয়া থাকেন।



দ্বারদেশে হাটু গাড়িয়া অভিযর্থনা।

আজ যদি আমরা কাহারো বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হই তবে ঘরে গিরিয়া কাণই আমাদের তাঁহার সময় অভিযর্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে, এমন কি লছপাত্তিদিগের ভিতরও এ প্রকার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যদি পরম্পরের বাড়ী অতি নিকটেই হয় তাহা হইলে সমস্তোরে গিয়া কৃতজ্ঞতাসূচক অভিযাদন করিয়া আসিতে হয়। অধিব্যাপন সঙ্গকার।

অপূর্ব সোনার মেয়ে।

(১)

আমার সোনার মেয়ে, তোর পানে চেরে চেরে,
আজি আমি বৃষ্টিরাছি বেশ,
চাঁদের চিত্তুর কেশে নয়ন ভুলানো বেশে
নাই, নাই—সৌন্দর্যের লেশ!

চোপার মতন কারি তা' শুধু আপির রাশি;
নিষাদর, তাও মাগো কারি!
কে তবে রূপসী মেয়ে বুকেছি মা তোরে পেয়ে!
—বুকেছি মা তোর কাছে থাকি!

(২)

যে রূপলী কহিছুর তাখো রূপ হয় চুর,
কাচ সম তেজে চুরে যায় ;
চপলা চন্দক সম কাঙ্ক্ষি যার অঙ্গশম,
তাও মাগো আঁখারে মিশাম ।

সৌন্দর্য-ভরঙ্গ হার বরিষা-বুধুদ গ্রাম
মিশাইতে নাহি থাকে বাকী !

কে তবে রূপলী মেয়ে বুঝেছি মা তোরে পেতে,
বুঝেছি মা তোর কাছে থাকি !

(৩)

অণেকনামাক্তা কজা, লো বরেণ্য, ওলো খজা,
ওলো কজা শতপুত্র মিনি,
যারে হেরি অহরাগে শ্রীতি পবিত্রতা লাগে,
সেই কজা জুবনমোহিনী ।

বিশ্বপ্রেম ভোগে উঠে, আনন্দ লহরী ছোটে,
ইজ্জা করে সবে ভালবাসি ;
হেরি যার মুখকান্তি ঘোচে আঁখপর জাক্তি,
সেই কজা শাবণের রাশি !

(৪)

তোরে হেতি, নমুন, ছনয়নে প্রেমাজন
মাঝিরাছি—যেই দিকে চাই
হবিমর, হরিমর, রামমর, কৃষ্ণমর
জামদর দেখিবারে পাই ।

তাই তুই রূপলী মা ! কি মহিমা, কি গরিমা !
দীপ্তিছটা খদনে প্রকাশে ।

দেখ সবে বরা করি, রূপে বিশ্ব আলো করি,
জুবনমোহিনী কজা হাসে !

ঐশ্বেশ্বরনাথ লেন ।

শাটপু-বর ।

১

নিখিলবাবু ও সতীশবাবু দুইজনে
কলিকাতার এক বড় আপিসের মালিক ।
উপেক্ষ সেই আপিসের অন্ন বেতনভোগী
সামাজ্য কেরাণী ; রামবাবু লেখানকার
বড় কেরাণী । বহুদিনের পুরাতন কর্ণচারী
এবং খুব বিখ্যাত বলিয়া আপিসের মালিক
দুইজন, আপিসের বেখাতনা প্রভৃতি সমস্ত
ভারই রামবাবুর উপর স্তব্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত
ছিলেন ! রামবাবু লোকটি একটু কড়া ।
তিনি নিজে বড় একটা কিছু করিতেন না,—
অদৌমদ কর্ণচারীদিগকে ঘানি বদলের মত
খাটাইয়া মনিবদের মনোরঞ্জন করিতেন ।

উপেক্ষ এইজন্ত রামবাবুকে আদর্শেই
দেখিতে পারিত না । সে মনে মনে ভাবিত,
“রামবাবুরই বা এত প্রতিপত্তি কেন ?
তিনি মোটে হুঁতিন বটো কাজ করেন,
আর আমি সেই দশটা থেকে ছটা পর্য্যন্ত
একটানা পরিশ্রম করি—একই জল খাবারও
অবশর পাই না । রামবাবু পান পাঁচশত টাকা,
আর আমার মাহিনা মোটে কুড়ি টাকা !”

সেদিন উপেক্ষ কাজ শেষ করিয়া,
টেবিলের উপর কাগজগুলি ভাল করিয়া
গুছাইয়া রাখিয়া একবার ঘড়ির দিকে
চাহিল—সাতটা বাজিয়া গিয়াছে । আশিমে
আরু কেহ নাই । কাজকর্ম শেষ করিয়া

• কজাটির নাম “মর্দন”, আদর আদর করিয়া তাহাকে “নমুন” বলিয়া ডাকি ।

বাড়ি ফিরিতে উপেক্ষের প্রায় প্রত্যাহাই এইরূপ দেবী হয় । কিন্তু আজ উপেক্ষের মনটা কি আনি কেন বড়ই খারাপ ছিল ।

উপেক্ষা যখন বাড়ি ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ । গৃহে গৃহে দীপ জালা হইয়া গিয়াছে । কর্ণক্লান্ত উপেক্ষা জামা কাপড় ছাড়িয়া এক-পানা মাদুর টানিয়া থানিকক্ষণ এম্বিক ওদিক গড়াইয়া, হাতস্থ থুইল । তাহার পর কিছু জলযোগ করিয়া আবার রাত্তার বাহির হইয়া পড়িল ।

পথে বাহির হইয়াই সে একটি চুকট কিনিল ;—চারি পরসার একটি চুকট কেনা আজ তাহার প্রথম । চুকটটি ধরাইয়া, অবসর মনে নিরুদ্দেশভাবে উপেক্ষা যখন রাত্তার বেড়াইতেছে তখন হাওয়ার মত যেনে একটা জুড়ি গাড়ি তাহার পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল । উপেক্ষা চাছিয়া দেবিল, গাড়ি নিখিলবাবুর । তাহার দৈহিক আরও হুটিয়া উঠিল—মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল ।

বেড়াইতে বেড়াইতে উপেক্ষা একটা চায়ের দোকানে প্রবেশ করিল । পূর্বে সে কখনও এরূপ স্থানে আসে নাই । অনেকই দোকানে বসিয়া চা পান করিতেছিল । উপেক্ষা কি করিবে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দোকানের এক কোণে গিয়া ঝাঁড়াইল । তাহাকে সেইরূপভাবে ঝাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দোকানদার নিকটে আসিয়া গভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “মশাইয়ের কি চাই ?”

অপরায়ণ মত আস্তে আস্তে উপেক্ষা কহিল, “এক পেরালা চা !”—ভাবিয়াছিল

এক পেরালা চায়ের দাম ত আর দু’পয়সার বেশি নয় ।

দোকানদার জিজ্ঞাসা করিল, “কত দামের দিব ?” একটু ইতস্ততঃ করিয়া উপেক্ষা কহিল, “কম দামের যা আছে তাই দিন ।”

দোকানদার বলিল, “কমে নাই ।”

উপেক্ষার কাছে মোটে দু’পয়সা ছিল । সে তখন কি করে ? অশ্রুস্ত হইয়া বলিল “না মশায়, আমার চা চাইনে ।” বলিতে তাহার আকর্ণ লাগ হইয়া উঠিল ।

কোনরকমে বাহিরে আসিয়া উপেক্ষা হাঁফ ছাড়িয়া বাটিল । এমন বিশদেও লোকে পড়ে ! সে রাতে উপেনের ঘুম হইল না—চায়ের দোকানের ঘটনা কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল ।

পরদিন আসপে আসিতে উপেক্ষার প্রায় একঘণ্টা দেবী হইল । ইতিপূর্বে এত দেবী তাহার আর কখনও হয় নাই । কান করিতেও সেদিন তাহার অনেক ভুল হইল ।

একবার রামবাবু আসিয়া কক্ষবধে বলিয়া গেলেন “উপেন, আজ তোমার কাজে বড়ই অমনোযোগ দেখ্‌চ্চি—এরূপ হইলে চলিবে না ।”

এক উপেক্ষা রামবাবুকে মোটেই বেথিতে পারিত না, তাহার উপর রামবাবুর এই কথাগুলি তাহার আগে বড়ই লাগিল । রামবাবু চলিয়া গেলে সে ক্রোধকম্পিতস্বরে আপনমনে বলিয়া উঠিল, “হী, কাজ এবারে ভাল কোরেই করব ।”

সেদিন জলপাবারের দুটির সময় উপেন

ডাকঘর হইতে তাহার বহুক্ষেপোপাধিচ্ছ
দেড়শত টাকা উঠাইয়া লইল এবং আপন
হইতে ফিরবার সময় ভাল ভাল জামা,
কাপড়, বড়ি, ঘড়ি চেন ইত্যাদি কিনিল
এবং কিছু টাকা হাতে রাখিল।

দৈনিক শুক্রবার। আপিসের কাজ
শেষ করিয়া উপেক্ষা দেখিল, আপিসে সে ছাড়া
আর কেহই নাই। আপিসের চারিদিক
ভাল করিয়া পূরিয়া দেখিল—সত্যই কেহ
নাই। উপেক্ষা তখন ঘরে ঘরে রামবাবুর
বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। দু'একবার
খসিকিয়া পাড়াইয়া, একটি চাবি দিয়া
রামবাবুর ডের পুন্নি। ডের পুন্নি
আপিসের চেক-বই বাহির করিতে তাহার
হাত কাঁপিল। আপনাকে যথাশায়া লব্ধ
করিয়া, আর একবার ভাল করিয়া চারিদিকে
চাহিয়া দেখিয়া, একখানি পুঁবাতন চেকের
উপর নতুন বইয়ের একখানি চেক রাখিয়া
উপেক্ষা কোনমতে আপিসের নায় জাল
করিল। চেক দু'খানি পাশাপাশি রাখিয়া
উপেক্ষা দু'তিনবার ভাল করিয়া দিলাইয়া
লইল। তাহার পর চেক লইয়া সে যখন
বাজার বাহির হইল, তখন তাহার মূখ
শবের স্তায় বিবর্ণ।

কতদিন উপেক্ষা এই পথ দিয়া গিয়াছে
কিন্তু আজ সেই চিরপরিচিত পথও যেন তাহার
পায়ে ঠেকিতে লাগিল। একটু দখ হইলে
উপেক্ষা চমকিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখে।

উষেগ ও আশঙ্কায় উপেক্ষা কোনরকমে
বাড়ি পৌঁছিল।

৩

পরদিন আপিসে আসিয়া উপেক্ষার
বোধ হইতে লাগিল যেন সকলের দৃষ্টিই
তাহার দিকে। যেন সকলেই তাহার দিকে
চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।
অজ্ঞান উপেক্ষা কেমন হাসিমুখে সকলের
সঙ্গে কথা কহে, আর সে ভাল করিয়া
কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া চাহিয়া কথা
কহিতে পারিল না। উপেক্ষার ভাবান্তর
দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল।

বেলা তিনটা পর্যন্ত নানহাত্রে কাজ করিয়া,
উপেক্ষা একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল।
সতীশবাবু, নিখিলবাবু, ও রামবাবু তিনজনেই
আপিসে রহিয়াছেন। এই ত চেক ভাঙাইবার
সময় অবশ্য! অসহ্যতার ভাণে করিয়া
উপেক্ষা রামবাবুর কাছে ছুটি গেল।

উপেক্ষার মুখের দিকে তাকাইয়া রামবাবু
বলিলেন, “সত্যই উপেক্ষা, দু'তিনদিন থেকে
তোমাকে কেমন কেমন দেখাচ্ছে। কাজ
করতেও তুমি মন নেই।” কি হয়েছে
বল দেখি?”

উপেক্ষা ঘাড় হেঁট করিয়া কেবল বলিল,
“পত্নীরা ভাল নেই।” রামবাবু তাহাকে
ছুটি দিলেন।

৪

পরকপেই উপেক্ষা ব্যাঙ্কের সমুখে
উপস্থিত। দু'একবার ইতস্ততঃ করিয়া,
একবারে দোকা ব্যাঙ্কের ভিতর প্রবেশ করিল।
অনেকেই চেক ভাঙাইতেছে—সেও চেকটি
ব্যাঙ্কের কেরানীর হাতে দিল। চেকটি হাতে
পাইয়াই কেরানী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
উপেক্ষার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল;

তাঁহার পর ব্যাকের বড়বানুকে চেকখানি দেখাইয়া উপেক্ষকে ভিজালা করিল, “আপনি নোট নেবেন; না টাকা নেবেন?” উপেক্ষা কহিল, “নোট।”

নোট হাতে পাইয়া ‘না’ শুনিয়াই উপেক্ষা তাড়াতাড়ি ব্যাক হইতে সাঁহির হইয়া পড়িল। ব্যক্তি ফিরিয়া উপেক্ষা রামবানুকে এই অর্থে একখানি চিঠি দিল—ডাক্তার তাঁহাকে কিছুদিনের অল্প স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। সে আশ্বই স্বত্রিকালে রওনা হইবে। কবে ফিরিবে তাঁহার ঠিক নাই।

৫

সন্ধ্যাকালে নববনে সজ্জিত উপেক্ষা একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া ট্রেনে উঠিল—ভাবিল এইবার তাঁহার মনের সফল, চকণ্ডা দূর হইবে। কিন্তু ট্রেনও সেমন ছাড়িল সঙ্গে সঙ্গে একটা বিবাদ ও চিন্তার ছায়া তাঁহার মনকে ছাইয়া ফেলিল। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, “কেন এ কাজ করিলাম?”

পকেট হইতে নোটগুলি সাঁহির করিয়া, শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আবার পকেটে রাখিয়া উপেক্ষা মনে মনে বলিল, “না, এত অশান্তি কে জানিত!”

৬

পরদিন প্রাতে গন্তব্যস্থলে পৌছিয়া, উপেক্ষা একটু এদিক হোটেলের বাসা লইল।

সন্ধ্যার পর উপেক্ষা বেড়াইতে বাহির হইল। অশান্তমনে একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া তখনই আবার হোটেলের ফিরিয়া আসিল।

হোটেলের ফিরিয়া আসিয়া উপেক্ষা একটু সুমাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না,—ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সে এখন কি করিবে?

ভাবিতে ভাবিতে উপেক্ষা যেন একটা কিনারা পাইল—সে এক মুহূর্তের বিধ করিল মনিবদের নামে সমস্ত টাকা ব্যাংকে আবার জমা দিবে।

পরদিন হোটেলের সমস্ত পাওনা চুকাইয়া দিয়া উপেক্ষা কলিকাতার ফিরিয়া আসিল এবং ব্যাংকে সমস্ত টাকা মনিবদের নামে জমা দিল।

৭

উপেক্ষাকে আশপাশে দেখিয়া রামবানু ভিজালা করিলেন, “কি উপেন, শরীফ কেমন? কোথাও যাও নাই?”

উপেক্ষা কহিল, “আজ্ঞে না। টাকার অভাবে যাওয়া হয় নাই।”

পেরিন মনিবদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপেক্ষার কোনো সুবিধা ঘটিল না। পরদিন আশপাশের সমুখে উপেক্ষা গব্য নিধিলবানুব দেখা হইল।

নিধিলবানু ভিজালা করিলেন, “কি উপেন, কেমন আছ?”

অভিবাদন করিয়া উপেক্ষা বলিল, “ভাল আছি।” তাঁহার পর একটু পারিষা পুনরাবৃত্তি বলিল, “আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।”

নিধিলবানু কহিলেন “কি কথা উপেন?”

উপেক্ষা বলিল, “একটু নিষ্কর্মে হলেই সুবিধা হয়।”

“আচ্ছা, আমি এখন একটা বরকারী

কাজে ব্যক্তি, অতঃ সময়ে দেখা কোরো।”
বলিয়া নিখিলবাবু চলিয়া গেলেন।

সমস্তক্ষণ নিখিলবাবু সহিত দেখা
করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে উপেক্ষা অপেক্ষা
করিতে লাগিল। কিন্তু উপেনের কথা
নিখিলবাবুর মনে না থাকায়, তিনিও
উপেনকে ডাকেন নাই, উপেনও তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে সচেষ্ট কবে নাই।

৮

ইহার পর তিনদিন কাটা গিয়াছে।
নিখিলবাবুর সহিত উপেনের সাক্ষাতের
কোনও সুযোগ ঘটে নাই।

চতুর্থ দিনে নিখিলবাবু চেকবই পত্রিকা
করিতে গিয়া দেখিলেন যে, ১২শে তারিখে
কুড়ি হাজার টাকা একখানি চেক লেখা
হইয়াছে। তিনি ত দেখিয়াই অবাক!
নিখিলবাবু শুখনই জমার খাতা বাহির করিয়া
দেখিলেন, সমস্ত টাকাই আবার দু’তিমদিন
পরে ব্যাংকে জমা দেওয়া হইয়াছে। নিখিলবাবু
মনে মনে কহিলেন, “এত কাণ্ড হইয়া গেল,
অথচ আমি কিছুবিসর্গও জানিতে পারিলাম
না। কে ইহা করিল? আপিসের বাবুরা
কখনই এরূপ কাজ করিতে সাহসী হইবে না।
নিশ্চয় তঁহা সতীশবাবুর কাজ। সতীশবাবুর
এ কি অস্ত্রায়। আমাকে না বলিয়া এরূপ
কাজ করা তাঁহার কখনই উচিত হয় নাই।
আপিসের বাবুরা জানিতে পারিলেই বা
কি মনে করিলে! ওহো, ঠিক কথা!
উপেক্ষা বোধ হয় এই বিষয়ই আমাকে
নির্জ্ঞানে বলিতে চাহিয়াছিল। তারি
হঁসিয়ার লোক!”

উপেক্ষার ডাক পড়িল।

নিখিলবাবু ডাকিতেছেন শুনিয়া উপেক্ষা
চমকিয়া উঠিল। তবে তব্দে সে নিখিলবাবুর
সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার
কেবলই মনে হইতেছিল এইবার বুঝি
ধরা পড়িলাম!

নিখিলবাবু যখন বলিলেন, “উপেন,
তুমি কি সেদিন আমার সঙ্গে চেক স্বত্বকে
কোন কথা কইতে চেষ্টা করিলে?”

উপেন ভড়িতকণ্ঠে উত্তর করিল,
“নাহে হাঁ।—”

উপেনের কথার বাধা দিয়া, নিখিলবাবু
টেবিল চাপড়াইয়া, চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন,
“ও বিষয়ে আমি সব জানি। ও টাকা
আমিই ব্যাংক থেকে নিয়েছিলাম, আমার
দু’দিন পরেই জমা দিবে নিশ্চয়। তোমাদের
ওসব কিছু দেখবার দরকার নেই। আর
খাতার বেন ওটা তোলা না হয়। বুঝলে?”

এখনে উপেনের বড় ভয় হইয়াছিল
কিন্তু এখনে সে একেবারে অবাক হইয়া
গেল। সে বলিল “কিন্তু—”

“কিন্তু আমার কি? যা বলব তাই
করবে। যাও এখন।” বলিয়া নিখিলবাবু
বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে সতীশবাবু সেই ঘরে
আগিয়া দেখেন যে, টেবিলের উপর
চেকবইখানি এবং জমার খাতা এলোমেলো-
ভাবে থোলা পড়িয়া রহিয়াছে। পাতা
উন্টাইতে উন্টাইতে চেকবইয়ের একটি
পাতার তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি ত
একেবারে অবাক। কুড়ি হাজার টাকা
লওয়া হইয়াছে অথচ তিনি কিছুই জানেন না।
এ কারার কাজ? নিশ্চয়ই নিখিলবাবুর।

৩৫শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

তাহা না হইলে কে এমন কাজ করিতে সাহসী হইবে! বাবুয়া জানিতে পারিলে আপিসের উপর তাহাদের ক্রোধ করিয়া বিদ্রোহ থাকিবে। যা'হোক কেহ টের না পায়—উপেনকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত।

এই ভাবিয়া সতীশবাবু উপেনের নিকট গিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, “দেখ উপেন, ১২শে তারিখে ব্যাঙ্ক থেকে আমি কুড়ি হাজার টাকা ধার করেছিলাম; আবার সমস্ত টাকাই জমা দিয়ে দিয়েছি। পরচাকার ওটা বেশ তোলা না হয়—কারবারের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই।”

বিষয়ের উপর বিষয় আসিয়া উপেনের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে সতীশবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “দে আজে।”

আপিলে সেদিন উপেনের কেবলই মনে হইতেছিল “এ কি কাত! আমি করিলাম চুরি কিন্তু মনিবরা নিজেই ষাড়ে পোষ নিলেন।”

৯

ইহার পর সতীশবাবু ও নিখিলবাবুতে একটু মনোমালিঙ্গের হ্রস্বপাত দেখা গেল। সতীশবাবু মনে মনে ভাবিতেন “আমি যে নিখিলবাবুর কাণ্ড জানিতে পারিগাছি, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।” নিখিলবাবুও মনে হইত, “আমি যে এ বিষয়ে সমস্ত জানি তাহা সতীশবাবুও অজান্তে নাই।” নিখিলবাবু মনে মনে বলিতেন “একথা সতীশবাবুর আমাকে এতদিনে জানান উচিত ছিল।” সতীশবাবুও তাহাই

মনে করিতেন, “একপা নিখিলবাবুর আমাকে এতদিনে জানান উচিত ছিল।”

কিন্তু কাহারও কাছে কেহ এসবকে কোন কথায় উপাশন করেন না। এমন করিয়াই বা কতদিন চলে? সতীশবাবু ঠিক করিলেন, তিনিই এ কথা প্রথমে নিখিলবাবুর কাছে ভাঙিবেন। এই স্থির করিয়া, সতীশবাবু, একদিন নিখিলবাবুকে বলিলেন, “দেখুন নিখিলবাবু, ১২শে তারিখে ব্যাঙ্ক থেকে কুড়ি হাজার টাকার একখানি চেক ভাঙান হয়েছিল।”

সতীশবাবুকে প্রথমে এই কথা উপাশন করিতে দেখিয়া, নিখিলবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সতীশবাবুই এই কাজ করিয়াছেন। উত্তেজিত হইয়া, নিখিলবাবু উত্তর করিলেন, “এবং সে টাকা দু'দিন পরেই আবার জমা দেওয়া হয়েছে।”

“নিখিলবাবুকে এইরূপ উত্তেজিতভাবে কথা বলিতে শুনিয়া সতীশবাবুর মনে হইল, তাহা হইলে নিখিলবাবুই এই কাজ করিয়াছেন। গম্ভীরভাবে সতীশবাবু বলিলেন, “আমাদের মতন লোকের কারবারে এমন না হওয়াই কি অভিশ্রুত নয়?”

“নিশ্চয়ই—সর্বতোভাবে।”

এইরূপ কথাবার্তার মনের ভার লাগব হইয়া উভয়ের মনোমালিঙ্গ দূর হইয়া গেল। কিন্তু কে এ কাজ করিয়াছে তাহার কিছু টিকানা হইল না।

১০

এই ঘটনার একমাস পরে, বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব শেষ হইলে দেখা গেল, আপিসের বিস্তর লাভ হইয়াছে। একদিন

কথা শ্রবণে সতীশবাণী নিঃশব্দবানুকে বলিলেন,
“উপেন গুণ বিবাদী লোক।”

নিখিলবাণু তত্বতরে করিলেন, “নিশ্চয়ই—
তাঁহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।”

সতীশবাণু করিলেন “তাহার মাহিনা
কিছু বাড়াইয়া দেওয়া উচিত।”

নিখিলবাণু বলিলেন, “আমিও এতদিন
মনে মনে তাহাই ভাবিতে ছলাম। কত টাকা
বাড়ান যাইবে? কুড়ি না ত্রিশ?”

“গরীব মানুষ—ত্রিশই বাড়ান যাক।”

উপেনের ডাক পড়িল।

উপেন বিপদ গণিমা কল্পিতপথে
ননিবদের লক্ষ্যে উপস্থিত হইল।

উপেনের মুখেব দিকে তাড়াইয়া
সতীশবাণু বলিলেন, “দেখ উপেন, তোমার
কাজকর্ম বেখেয়া আমরা খুন খুনী হইয়াছি।
তোমার মাহিনা এ মাস থেকে বাড়াইয়া
দিলাম। তুমি কুড়ি টাকা বেতন পাইতে,
আগামী মাস হইতে পঞ্চাশ টাকা করিয়া
পাইবে।”

উপেন মনে মনে কাহাগৃহের যে চিত্র
বেশিতেছিল, তাহার পরিবর্তে এ কি!
আনন্দে উপেনের সর্কাস পূর্ণকিত হইয়া
উঠিল। কোনরকমে মনিবদের খজবান দিয়া
সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।*

ঐক্যগারজন চট্টোপাধ্যায়।

কল্পণ-কঠোর

শ্রমের মুক্তি ধরিয়া এসেছ তুমারে ;

কষ্ট, ভীষণ, নমি বার বার তোমায়ে !

দুর্জট তব গুটালাল উড়ে গগনে,

মাতে উদ্গাদ নৃত্য স্বকঃ পবনে,

ললাট নেত্র চমকে আঁধার ভেদিয়া !

হে ঐশান, তব শ্রমের বিধান সুকায়ে ;

কষ্ট, ভীষণ, নমি বার বার তোমায়ে !

হে নিচুর, এলে কল্পণ মুরতি ধরিয়া,

সব ভাপনাই নিমেবে লইলে হরিয়া !

করিছে তোমারে বেদনা বরষা স্রাবনে,

কষ্ট তুমারে করিছ আঘাত সঘনে ;

মধুরে ভীষণে মিলন নেহারি অশ্রুপ ;

শ্রমের, স্বপ্নের, নাটিকে বিশ্ব পাখায়ে !

কষ্ট, দয়াল, নমি বার বার তোমায়ে !

অথর ঘেরি ভবক তব বাজে হে ;

এস হে ভিখারী, এস মলল লাজে হে !

এমনি দুগার দুগর করিয়া লহ গো,

আনন্দে তোমার বজ্রের রবে কহ গো,

দণ্ড করিয়া লকল অশিব সংসার

দ্রিস্ত করিয়া করহে পূর্ণ আবারে !

হে শিব, কঠোর, নমি বার বার তোমায়ে

ঐদীনেশনাথ ঠাকুর

অভিমান ও মিলন।

অসিগর্ভ গিহি যথা অনল পুষ্করি,

ধূসরাগ্নি করে পরিহার,

অভিমনে দৃষ্ট দগি গুমরি গুমরি,

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগে বারবার।

যথা স্বভা তীর্থ মেঘগর্ভনের শেতে

বর্ষণেতে দীপ্ত লগন,

উগ্র বাগ্‌মুদ্র শেষে, প্রিয়জন সহ

আঁখি জলে তেমনি মিলন।

ঐক্যাদিশৈব রায়।

ব্যক্তি ও সমাজ ।*

একটি হিন্দুমহিলা একবার এক নিক্তি নির্জন এখানে গিয়াছিলেন, কিন্তু বেশদিন সেখানে থাকিতে পারেন নাই। অতঃপর কিরীয়া আশিনার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, “দেখ, সেখানে অশুবিধা কিছুই ছিল না, সব রকমেই ভাল, কিন্তু মাছ সেখানে নাই, সেখানে থাকিতে পারি না।” তাহাতে বলা হয়, “আপনি কলিকাতার গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিয়া কাহারও বাড়ী যািতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে হুই একটা কুইব ভিন্ন আর কাহারও সহিত ত’ আলোশের অশুবিধা হয় না, তবে কলিকাতার আর সে বানে কি তফাৎ হইল?” তিনি উত্তর দিলেন, “নাহুয়ের গায়ের বেন একটা খাঁচ আছে। চেনা-শোনার বরকার নাই, আমার চারিধারে মাছই আছে, এটা জানিলেই সব বেশ থাকে।”

কথাটি মানব-চরিত্রের একটি অস্ব-নিহিত গুণ সত্য প্রকাশ করিতেছে। একটা না একটা সমাজ না হইলে আমরা থাকিতে পারি না। সমাজের মধ্যেই আমাদের ভগ্ন, ক্ষুণ্ণ ও লব। সমাজের বহির্ভূত হইলে বেন দিগ্ভ্রম আশ্রয় উপস্থিত হয়। এই ভিত্তিই কোলমারী দণ্ডবিধিতে এবং দণ্ডতথের মধ্যে যুদ্ধকে নির্জনকারাবাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে। ইহাও দেখা যায় যে, নির্জন কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা আরই উদ্ভাসপ্রাপ্ত হয়, অথবা আত্মহত্যা করে। আরও দেখিতে পাই যে, সমাজসঙ্গ হইতে কোন প্রকারে

বঞ্চিত না হইলে এত সন্তোষ উপলব্ধি আরই আমরা করিতে পারি না।

ইহা বাস্তব আরও অনেকগুলি সামাজিক সত্য আছে, যেগুলিকে, ঘটনাবিশেষের সাহায্য না পাইলে বা অস্বাভাবিক পণ্ডিত না হইলে, আমরা বুঝিতে পারি না। অথচ এই সমস্ত বুঝবার উপর আমাদের শুভাশুভ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। কারণ, ভাল করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, সমাজ ব্যতীত আমাদের অস্তিত্বই নাই। আমাদের পূর্ণবর্তী সমাজ না থাকিলে আমাদের অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। এইরূপ আমাদের পূর্ণবর্তী সমাজের অস্তিত্বই তৎপূর্ণবর্তী সমাজের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা এই অগণ্য সমাজ পরম্পরার আধুনিকতম ফলস্বরূপ। আমরা, সমাজ যে শুধু আমাদেরকে জীবন দান করিয়াছে, তাহা নহে, আমাদের জীবন রক্ষাও করিয়াছে। জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণ হইতে যত দিন আমরা য’ জীবনোপায় সংগ্রহক্ষম হইতে না পারি, ততদিন সমাজ আমাদের আশ্রয়িতার ব্যবস্থা ও বিশদাশি হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করে। তাহার পরও, জীবনধারণের উপাযোগপার্জনক্ষম হইলেও, সমাজ সেই উপায়ের অশুবিধা করিয়া দেয়, বাহ্যিক আমরা পারীক্ষিক ও মানসিক শক্তির সকলেনে কর্তৃ করিয়া তথ্যের জীবন যাত্রা নির্ভর করিতে পারি। আমরা আমরা আজ যে এ স্থলে

* তবাবীপুর সাহিত্যসমিতির দশম বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তুত, ১লা বৈশাখ ১৩১৮ ।

সমবেত হইতে পারিরাছি, তাহাও সমাদেয়
আগ্রহণ্য। আমাদের অপেক্ষা নিরন্তরের
সমাজে একজন সমবেত হইবার তাবই হয় ত'
নাট। পাকিলেও একজনভাবে বশ একর ভিন্ন
ভিন্ন মত নির্ভয়ে বাদপ্রতিবাদ দ্বারা বিচার
করা সম্ভব নহে। আরও, আমি যে আজ
আপনাদের নিকট এই প্রথম পাঠ করিতেছি
এবং আপনারা যে আমার কথাগুলি শ্রুতিতে
পাঠিতেছেন, ইহাও সমাজের দয়ার। আমরা
বালাবধি আমাদের পূর্ববর্তী সমাজকর্তৃক
বাবল্লত কথা শুনিয়াই এইরূপ কথা বলিতে
ও লিখিতে সক্ষম হইরাছি। ইহাব সত্যতার
প্রকট নিদর্শন মুকগণ। আপনারা সকলে
জানেন যে মুকগণের মুকগ প্রায়ই মুখ্যভাবে
বাগ্ম যন্ত্রের বৈকল্যের জন্ত নহে; প্রায়
সকল মুকই জন্মাবধি বধির; সেই জন্ত
তাঁহারা কোন প্রকার শব্দই শুনিতে
পার না; শুনিতে না পাইলে স্বাভাবিক
অসুস্থরূপ-প্রকৃতির এই বিঘটতার অন্তর
প্রসূক্ত কোন শব্দই উচ্চারণের চেষ্টা করিতে
পারে না। সেই জন্তই তাহাদের বাগ্মর
কার্য্যভাবে বর্ধিত হইতে না পাইয়া ক্রমে
কার্য্যক্ষম হইয়া পড়ে (atrophy)। সমাজ-
দত্ত সাহায্য গ্রহণ করিতে না পারিরাই
মুক, অন্ধ প্রকৃতির দূরবস্থা; আমরা সে
সাহায্য লইতে সক্ষম হইরাছি বলিয়াই
আমাদের সে দূরবস্থার পতিত হইতে হয়
নাই। সমাজ যদি আমাদেরকে এইরূপ
সাহায্যদানে পরাধীন হয়, তাহা হইলে আমরা
অজ্ঞিতে বা বাঁচিতে পারি না। ইহা ব্যতীত
আর একটা সত্য আমরা দেখি যে, এ
পৃথিবীতে অস্তিত্ব সব বস্তুর জ্ঞান আমাদের

অগ্রিমও আপেক্ষিক (relative)।
আমাদের বিবেকাদি বৃত্তি প্রকৃতি
থাকা লব্ধও, আমরা সমাজের মধ্যে আছি
বলিয়াই আমরা মাহুণ। বস্তুতঃ
আমাদের অনেকগুলি বৃত্তি সামাজিক
সম্পর্কাদি হইতে সম্ভব। যদি হঠাৎ আমরা
এমন কোন স্থানে গিয়া পড়ি, যে স্থানে
কোনরূপ সমাজ নাই, তাহা হইলে আমরা
আর তখন পূর্ণ মহাশয় থাকিব না, মহাশয়
হইতে কিকিরা ন এক প্রকার জন্তমাত্র
হইয়া পড়িব।

কিন্তু যদি সমাজটা কি তাহা বুদ্ধিবার
চেষ্টা করি, তাহা হইলে প্রথমতঃ দেখিতে
পাই যে, সেটা একটা হস্তপদগ্রাহ্য কিছু
নহে, ধরিতে গিয়া দেখি যে সেটা যেন
হস্তাঙ্গুলির মধ্য দিয়া গলিয়া যায়। হস্তাঙ্গ
হইয়া বিরোধ করিতে গিয়া বোধ হয়, যেন
সেটা কতকগুলি ব্যক্তির একত্র সমাবেশ
ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপে ব্যর্থ
প্রচেষ্টা হইয়া মাহুণ কখনও একেবারে হস্তাঙ্গ
হইয়া পড়ে, কখনও না অঙ্কের হস্তী দর্শনের
মত ঐকদেশিক জ্ঞান লাভ করে, এবং এই
প্রকার জ্ঞানকে কণ্ঠধারা লাফলো আনিবার
চেষ্টা করিয়া বহুপ্রকারে বিভ্রান্ত হয়, ও
'হর ত' আপনাদের ও অনেকেই প্রাণদানের
পর্য্যন্ত করে।

এই কথাটি বেশ ভাল করিয়া বুঝা
আবশ্যক। ইহা যে শুধু তথ্যমাত্র আবিষ্কার
করিবার জন্ত, তাহা নহে, এই তথ্য আবিষ্কৃত
হইলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আমাদের অনেক
প্রকার উপকার হইতে পারে।

উপরে বাহা বলিরাছি, তাহা হইতে

আমরা দুইটি প্রধান বস্তু পাইতেছি—“ব্যক্তি” এবং “সমাজ”। জ্ঞাতঃ এ কথা আমাদের মনে আসিতে পারে—এই দুইটির মধ্যে প্রধান কোনটি? কোনটির স্থান অগ্র, কোনটির পশ্চাতে? এই বিষয়টি গত শতাব্দিক বৎসর দ্বিবিদ্যা পাক্তান্ত্য প্রদেলে বিশেষভাবে আন্দোলিত ও আগোচিত হইতেছে। তাহার ফলে ব্যক্তিবাদ (Individualism) ও সমাজবাদ (Socialism) নামক দুইটি বিশেষ মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দুইটি মতই এত তীব্র ভাবে সমর্থিত হয় যে, উভয় দলই প্রকৃত অর্থ ও লোক সংগ্রহ করিয়া আপন আপন মত প্রচার ও লোকসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এবং যেহেতু এই সমাজবাদীদের একটা শাখা, শান্ত উপায়ে আপনাদের মতের সাধন (অর্থাৎ সমাজের প্রাক্তান্ত-স্থাপন) অসম্ভব ভাবিয়া তদুদ্দেশ্যে একান্তে বিদ্রোহাদি প্রচার ও তৎসঙ্গ লোক সংগ্রহ করেন, ঠিক সেইরূপ বিখ্যাত Anarchist গণ বিদ্রোহ দ্বারা সমাজ, শাসনতন্ত্র প্রভৃতির বিরোধান ঘটাইয়া ব্যক্তির প্রাধিক্ত্য স্থাপন করিতে চাহেন। এই এক Anarchist গণকে বৈপ্লবিক ব্যক্তিবাদী বলা উচিত।*

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে শুধু যে দুইটি বিরুদ্ধ মত আবিস্কৃত হইয়াছে তাহা নহে, উভয়েরই বিশেষরূপ চরমপন্থী দলও আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহাতে দ্ব্যতঃই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়—দুইটিই কি সত্য? তাহা বোধ হয় হইতে পারে না। তাহা হইলে সত্য কোথায়? এই সত্য জানিতে চাইলে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে

পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয় করা আবশ্যিক। সে একজন্য সমাজের উৎপত্তি ও তাহার ইতিহাস কথকিং আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

মানবসমাজের একেবারে প্রথমাবস্থা কি ছিল, তাহা স্থানচিত্তভাবে বলা কঠিন; তবে সমাজতত্ত্বনিপুণ জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সভ্য ও অসভ্য জাতির অবস্থা-দর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা তির্য্যকরিয়াছেন, তাহা হইতে অল্পমান হয় যে, পোথ হয় প্রপথে সমাজ বলিয়া কোন কিছুই অস্তিত্ব ছিল না। মানুষ বোধ হয় অজ্ঞান অনেক পশুর জায়গায় বসে বসে রূপ করিয়া বেড়াইত, এবং সে অবস্থার অজ্ঞান পশুগণ অপেক্ষা যে বিশেষ উন্নত অবস্থায় ছিল, তাহা নহে। ক্রমে কিছু অজ্ঞান মানবমিথুন ও হিংস পশুদের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দুই বা ততোধিক মানবমিথুন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে কৃষিকার্য্যের আবিস্কারের পর তাহার কোন কোন স্থানে কিছুদিন করিয়া বাস করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে গ্রামের উৎপত্তি হইল। এই সময়েই বিশেষতঃ বিপদনিবারণের জন্য, সামাজিক কর্তব্যের উৎপত্তি হইল। তখন গ্রামরক্ষণ ও শত্রুর আক্রমণ-নিবারণের জন্য অবিনাশীগণকে পর্য্যায়ক্রমে রক্ষার কার্য্য করিবার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এখনও ইহাকে ঠিক “সমাজ” বলা যায় না; বোধ হয় “সমাজ” বলাই উচিত। কারণ, এখনও পর্য্যন্ত ঠিক সামাজিক কর্তব্য ও দ্ব্য (Duty and Right) মানুষ পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে নাই। তাহার কারণ এক সঙ্গে পাকে তাহা

কঠকালে জীবনযাত্রার জন্য, কিছু বিশেষ ভাবেই নিরাপদে থাকিবার জ্ঞান। তাহার। এ সময় বাহা কিছু কবে, তাহা বিশেষভাবে বর্তমানের জন্য; অম্ব বাহা ভবিষ্যতের জন্য কবে, তাহা "নিকট" ভবিষ্যতের জন্য। পূর ভবিষ্যৎ বা কোন সামাজিক আন্দোলনের ভাব তাহারের মধ্যে পাকা সঙ্কর লগিয়া মনে হয় না। এই সময়ে প্রথমতঃ নিরাপদে থাকিবার ব্যবস্থা হইতে ক্রমে পরম্পরের সহায়তার ভাব আসে। তাহা হইতে আরে আরে সমাজের অসুযোগসমূহ হইতে ক্রমে বর্তমান সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহাৱই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উৎপত্তি, পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং ব্যক্তির বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে। হুইএকটি দৃষ্টান্ত দেখিবার পর ইহার সন্মুখে আমরা কিছু আলোচনা করিব।

আমরা প্রথমে ইউরোপেও মানব-সমাজের ইতিহাস কিছু দেখিব। ইউরোপে মানবসমাজসমূহকে আদিমতম ঐতিহাসিক তথ্য আবার সীজার (Cesar) ট্যাসিট্‌স্‌ (Tacitus) হইতে পাঠ। সীজার জার্মান অসভ্যজিগের সন্মুখে বাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বুঝতে পারি যে, উক্ত জার্মান-গণ বস্ত্র ও গুহর্ভপ্রকৃতির ছিল। পুরোঁক লেপকগণের সময়ে তাহাদের জাতিগুলি কথকিত গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যতদূর জানা যায়, তাহা প্রধানতঃ লুণ্ঠনাদিয়ার জীবিকানির্ভার ও অপর জাতি কর্তৃক আপনাদিগের লুণ্ঠন নিবারণের জন্য। তাহারা একপ্রকার তরঙ্গুয় বণ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সীজার ও ট্যাসিট্‌স্‌ বর্ণিত বিবরণ হইতে উহাও জানা যায় যে, যদিও শান্তি ও

যুদ্ধের সময় অল্ডারমান (Alderman) ও হেরেটোগ (Heretog) নামক দুইজন সমাজের নেতা থাকিতেন, তাহা হইলেও সমাজতন্ত্র কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা অধিকারের উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না। বস্ত্র, ব্যক্তি ও ব্যক্তি এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বন্ধন এত শিথিল ছিল যে তাহারা একত্র বাগ প্রত্টি করিলেও তখনও প্রকৃত প্রভাবে সমাজের উৎপত্তি হয় নাই। ইহাকে সমাজের সমাজের বলিতে পারা যায়।

ইহার পরবর্তী আর একটা স্তর আমরা গ্রীকদিগের মধ্যে দেখিতে পাই। তখন সমাজ বেশ পুষ্টিগত করিয়া ব্যক্তিকে স্তম করিয়া ফেলিয়াছে। সমাজই সর্বোৎকর্ষী, ব্যক্তি যেন কেহই নহে। সমাজের স্বার্থ, সমাজের নির্দেশ, ব্যক্তির স্বার্থ ও ব্যক্তির নির্দেশের উপরে ও অগ্রে। সমাজের স্বার্থের নিকট ব্যক্তির স্বার্থ দাড়াইতে পারেন না। ব্যক্তি বাচে, কাজ করে, মরে, সমাজের জন্য। সমাজের হইতে প্রাপ্ত, ব্যক্তির আধাতের নিদর্শনস্বরূপ প্রকাশ্যভাবেও সামাজিক প্রাণাতের চিহ্ন দৃঢ়রূপে অঙ্কিত। উন্নতিশীল এথেন্স (Athens) রক্ষণশীল স্পার্টা (Sparta) অপেক্ষা এ বিষয়ে কিছু উদার হইলেও, দুই ভাবে দেখিলে যেন বৃথা যায় যে, দুই স্থানেই সামাজিক ভিত্তি প্রায় একই। দুই স্থানেই ব্যক্তি সমাজের সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত ও আচ্ছাদিত।

• ইহার পর আর একটা স্তর দেখি যখন ইউরোপে খ্রীষ্টপূর্বের অভ্যুত্থানের ঠিক পূর্বে সমাজশৃঙ্খলা অনেক স্থানে ভাঙিয়া

পড়িতেছিল। তখন পৃষ্ঠীয় মিশনরীগণ ইউরোপে আসিয়া তাঁহাদের ধর্মের ভিত্তর দিয়া পুনর্জীব সমাজ গঠন করিয়া দিলেন। কিছু এবার সমাজ গঠিত হইল হিন্দু প্রাণীতে। ইহার অল্পকাল পূর্বে ইউরোপের উপর দিয়া বর্ষরপ্রবাহ চলিয়া গিয়াছিল। তাহাতে অনেক স্থানেই প্রাচীন সভ্যতা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রাথমিক স্থানে স্থানে বর্তমান বাক্তিগণও প্রকৃতপক্ষে কার্যাক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাচর্চাও প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন কি বর্ষরদিগের অভ্যাসের লোকের মনে পূর্বের সাংসারিক জীবিত হইয়া তাহার স্থানে কাপুখোচিত ভীষণতার সঞ্চার হইয়াছিল। এই সবট সময়ে পৃষ্ঠীয় মিশনরীগণ আসিলেন। তাঁহারা সকলেই ভাগ্যী সন্ন্যাসী ছিলেন, কাজেই সম্পূর্ণ নিষ্ঠুর, এবং সমগ্র সমাজের মধ্যে একমাত্র তাঁহাদেরই বিভাগিকা ও অস্থায়ীত্বের সুবিধা ও শক্তি ছিল। তাঁহারা ই সমাজের নেতৃত্ব লইয়া সমাজকে প্রায় অবশ্যস্তানী বিনাশের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। তাঁহারা এক্ষণ অকৃতজ্ঞতার সমাজ শাসন করিতেন যে এক্ষণ সময় গিরাজে যে সময় তাঁহারা, সামাজ্য পরিষ্কার সন্ন্যাসী হইয়াও, গর্জিত ও প্রকৃত-শক্তিমানী রাজ্যমহারাষ্ট্রের গলদেশে পদমদিত করিতে ভীত হন নাই। তাঁহারা যে, সমাজের কার্য হাতে লইয়াছেন ও তাহারই অস্তিত্বটিতেছেন, ইহা জানিতেন, এবং যতকাল তাঁহারা পৃষ্ঠধর্মের প্রকৃত মর্ম স্বরূপে বহন করিয়াছিলেন, ততকাল তাঁহারা তাঁহাদের এই কর্তব্য, নিজ জীবনে কর্তব্যে ব্যস্ত, এবং সামাজিক জীবনে উপদেশ-নিদেশের দ্বারা,

সকল করাইয়া লইয়াছিলেন। কিছু সংসারে সব বস্তুই অবনতি ও ক্ষয় আছে! তবে ইউরোপে পৃষ্ঠধর্মেরও সেই দশা হইল। তখন ধর্মের স্থানে পৌরোহিত্যের, দ্বিধার স্থানে কুসংস্কারের, এবং কর্তব্যের স্থানে ভোগবিলাসের আধিপত্য হইল, এবং পুরোহিতের উপদেশ দান-পতির আবেশে পর্যাবসিত হইল এবং সেই সময়ে আবেশ পারলৌকিক ধর্মের বিজ্ঞানিক দেখাইয়া পালন করায়া লওয়া হইতে লাগিল। তবে আরও এক কারণে এই অবস্থা জটিলতর হইয়া উঠিল। অভিজ্ঞতাদিগের জ্যেষ্ঠত্বের উত্তরাধিকার হস্তে তাহাদের স্থানে অধিষ্ঠিত হইত, কিছু কনিষ্ঠেরা, অনেক স্থলেই জ্যেষ্ঠত্বের নিয়ম প্রচলিত থাকায়, পিতৃদম্পতি হইতে বিশেষ কিছু পাইত না। সেজন্য তাহারা সৈন্ত-বিভাগ বা পুরোহিত শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইত। ইহার মধ্যে পুরোহিতপন্থী বিশেষ শোভনীয় বোধ হইত, কারণ এই শ্রেণীতে প্রবেশ করিলে, যিনি পরিশ্রমে দায়কপরিদম্পতকে প্রকৃত ভূদম্পতি এবং উত্তমোত্তম ভোগবিলাস মিলিত। অভিজ্ঞত-শ্রেণীরাই পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে সর্বোচ্চ পদভাগ পাইত। ইহাতে সেবে এক্ষণ দাঁড়াইল যে অভিজ্ঞতবর্গেরাই সৈন্তবিভাগ, রাজকর্মচারীবিভাগ প্রভৃতি দিয়া এক দিক হইতে, এবং পুরোহিত শ্রেণী দিয়া অন্য দিক হইতে, সমগ্র রাজনৈতিক সম্পূর্ণ-রূপে করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়া রাষ্ট্রীয় বিধি-সামান্য আপনাদের সুবিধায়ত করিয়া গড়িয়া লইল। রাষ্ট্রের কর্তব্যাকার ও স্বয়ংসমূহ তাহাদেরই মনোমতভাবে বটন করিল:— কর্তব্যভার পাইল সাধারণ জনসমূহ এবং

দ্বন্দ্বগুলি পাইল অভিজাতশ্রেণী। সাধারণ জনসমূহ পরিশ্রম করিবে, এবং তাহার ফল-ভোগ করিবে ভূম্যধিকারীশ্রেণী সমভিব্যাহারে পুরোহিতগণ, ইহাই যেন শেষে নির্দ্ধারিত হইল।

কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী করিতে হইলে জনসাধারণকে অস্ত্র ও দরিদ্র করিয়া রাখা প্রয়োজন। তাহাও ভূম্যধিকারী ও পুরোহিতের সমবেত চেষ্টায় সম্ভব হইতে চলিল। প্রত্যেকে সৰ্ব্বপ্রকারে পীড়ন ও শোষণ করিয়া ভূম্যধিকারী তাহাকে দরিদ্র করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পুরোহিত ও রাজপুরুষের সাহায্যে স্বাধীন চিন্তা অসম্ভব করিয়া মানুষকে পততে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ব্যাপার কিছু-কাল বেশ দ্রোহের সহিত চলিয়াছিল বটে, কিন্তু অস্ত্র চেষ্টা কখনও সফল হয় না এবং এ ক্ষেত্রেও হইল না। জনসাধারণের অস্বস্তির অশুভধ্বনি ক্রমে ক্রমের ক্রমশঃ পরিণত হইল; তাহাতে কেহ কর্পণাত করিল না, বরং পতনপ্রদোগে এই ক্রন্দন আরু করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। তখন তাহারা অনবরত উৎপীড়নে উদ্ভ্রান্তপ্রায় হইল। তাহাদের ক্রমশঃ ক্রন্দন বৃদ্ধিক্রমে পরিণত হইয়া জার্মানীতে লুথারের ধর্মবিপ্লবের ও ফ্রান্সে ফরাসীবিপ্লবের অবতারণা করিল। এই শেষোক্ত বিপ্লব যেরূপ উদ্দাম বেগে এক চরম হইতে আর এক চরমে গিয়াছিল, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি জনসাধারণের মন কিরূপভাবে দ্রুত হইয়াছিল। এই বিপ্লবের সুখে শুধু যে ধর্মস্থানাপহারী পুরোহিত, সমাজস্থানাপহারী ভূম্যধিকারী এবং রাজস্থানাপহারী অত্যাচারী তাগিয়া গেল, তাহা নহে। বর্ধের জাতি

স্থানে অর্থের তাণ্ডব নৃত্য দেখা গেল। ব্যক্তি আশ্রিত সমাজের স্থান অধিকার করিল; লোকে সমাজের অস্তিত্বটুকু একেবারে অস্বীকার করিল; ব্যক্তির স্বার্থ সকল স্বার্থের উপর স্থান লাভ করিল। রাজার স্থানে স্বাধীনতার নামে অরাজকতা বিরাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু ক্রমাগতেরই প্রতিক্রিয়া আছে। বিপ্লবের প্রথম বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে লোকে ক্রমে বৃত্তিল বে, অত্যাচারী বিনাশ ঘোগা বটে, কিন্তু সমাজ যেরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দ্বারা গঠিত ও পৃথিবীতে তাহার যেরূপ কর্তব্য, তাহার অরাজকতা ও চালনার ভুল একটা কর্তৃত্ব-শক্তির প্রয়োজন; বর্ধের ভাব কখনও থাকিতে দেওয়া উচিত নয় নটে, কিন্তু কোন না কোন প্রকার ধর্ম ব্যতীত মানুষ থাকিতে পারে না; ব্যক্তি আছে বটে, কিন্তু সমাজের অস্তিত্ব আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না; উপেক্ষা করিলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে ব্যক্তিরই পুষ্টি অসম্ভব শুধু তাহাই নহে, অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি হইলে একসঙ্গে সমাজের ও ব্যক্তির বিশেষ অনিষ্ট হয়। সমাজকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাকে যথোচিতরূপে নিয়োজিত করিলে মহত্ত্বজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। উপযুক্ত স্থলে সমাজই শাসনশক্তির স্থান অধিকার করিতে পারে; তাহা না হইলেও সমাজ যে শাসনশক্তির সহায় ও পরিচালকের কার্য্য করিতে পারে, তাহা স্থির। এমন অবস্থার সমাজকে ব্যক্তির উপরে স্থান দেওয়া প্রয়োজন কারণ কর্তব্য যেরূপ বিঘাট, তাহাতে সমাজ ভিন্ন ব্যক্তি কখনই সে কর্তব্য সাধন করিতে

পারে না। এই সমস্ত কারণেই ইউরোপে সমাজবাদের পুনরুৎপত্তি হইয়াছে।

ভারতবর্ষে সমাজের প্রথম স্তর আমরা বলের উত্তরপূর্ণ সীমাত্তর আদিম অধিবাসী-দিগের মধ্যে আঙ্গ ও বেথিতে পাই। আর্ঘ্য-দিগের মধ্যে, বোধ হয়, ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেই সমাজ গঠিত হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের ভারতবর্ষ-অবস্থার সময় তাঁহাদিগের উপনিবেশ-ভালি এক একটী পেনানিবারের মত ছিল এবং এই জীবনসংগ্রামের সময় প্রত্যেক উপনিবেশের ব্যক্তিগণকে উপনিবেশের আপদ-নিবারণের জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইত। উপনিবেশের জন্য চিত্রা ব্যক্তিগত চিত্রা প্রভৃতিকে দূরে রাখিত। তখন তাঁহাদের মধ্যে বর্ণবিভাগ ছিল—আর্ঘ্য ও পুত্র। তখন সভ্যতার নিরবস্থায় সমাজে কন্যাবিভাগ উপস্থিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে জাতিবৃত্তি হয় নাই। শেষে এই কন্যাবিভাগ জাতিবিভাগে পরিণত হইল। এ দেশেও ক্রমে পুরোহিত শ্রেণী উৎপন্ন হইল। ঘটনাচক্রে পুরোহিত বৃত্তি ক্রমে ক্রমে বংশাধিকারিক হইয়া পড়িল। প্রথমে পুরোহিতগণ রাজাদিগের পারিষদ ও মন্ত্রণাবাদ্য ছিলেন এবং এই স্থান অধিকার করিয়া সমাজের অনেক উপকার-করিয়া-ছিলেন। তাঁহারাষ্ট লোকপ্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রাদি রচনা করিয়া-ছিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রে বাহা দেখি, তাহা হইতে বেশ অনুমান হয় যে, সেই সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের রচনাকালে আমাদের দেশে সমাজ বেশ সুষ্ঠুলাভ করিয়াছিল। আমাদের সমাজে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ব্যক্তির জীবন

মরণ সমস্তই সমাজের জন্ত। রাজ্য হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেরই সামাজিক হিলাবে কর্তব্য ও স্বয়ং নিদ্ধারিত আছে এবং সমাজ-নিয়মে সকলেই তদনুসরণ করিতে বাধ্য। সমাজ যদিও সুশাস্ত্রাবে শাসনশাস্তি নহে, তথাপি লোকমত এবং ধর্ম্মের ভিত্তর দিয়া রাজশাস্তির উপর যথেষ্ট প্রভাব দেখাইত। ব্যক্তির উপর সমাজের প্রাতি কর্তব্য স্তত্র করিয়া সমাজ যেমন ব্যক্তিকে আপনায় নিজে আনিত, তেমনি ব্যক্তিকে বহুপ্রকার স্বয়ং দিয়া বহু উপায়ে তাহার সুসম্পাদন করিত। কিন্তু ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত শ্রেণীর কর্তব্যবানস্বভাব হ্রাস দেখা গেল। সামাজিক ব্যর্থের সংরক্ষণ ক্রমে ক্রমে পুরোহিতশ্রেণীর গোণকর্তব্যে পরিণত হইল। তাহাদের হস্তে স্তত্র শক্তির দ্বারা নিজ শ্রেণীর আশঙ্কাস্থাপনই তাহার মূখ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। দেনতা সাহায্যে তাহা সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে দেখিয়া পুরোহিতশ্রেণী দেবতাদিগের সহিত সন্ধন ও তাঁহাদের উপর শক্তির দাবী করিল, এবং এই সমস্ত অস্বুত দাবীর ভিত্তর দিয়াই সমাজে নিজের জন্ত বহু অকার স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া লইল। ক্রমে পুরোহিতশ্রেণী আর সমাজের স্থানই অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। সমাজস্থ অবশিষ্ট শ্রেণী ও ব্যক্তিগণ পুরোহিতশ্রেণীর দান ও তাহার মতের পরিপোষকরূপে পরিণত হইল। শ্রেণী ও শ্রেণীগত ব্যক্তি, শ্রেণী-অপেক্ষা-বৃহত্তর সমাজ ও শ্রেণীগত-ব্যক্তি-অপেক্ষা-বৃহত্তর সমাজগত ব্যক্তির উপর এইরূপে অনার্য্যে প্রভাব করিল। তাহাতে শ্রেণী ও শ্রেণীগত ব্যক্তি প্রকৃত শক্তিশালী হইয়া

উঠিল বটে, কিন্তু তাহা সমাজ ও সমাজগত ব্যক্তির বাহ্যে। ইহার ফলে সমাজ ক্রমশঃই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় পতিত হইয়া শ্রমী ও ব্যক্তি উভয়কেই হীনদশায় টানিয়া আনিতে লাগিল।

সমাজের এই বিপদ দেখিয়া তির তির সময়ে শ্রেণীর আধাত্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিবাদ সাম্প্রদায়িক মতমাত্রের পথাবলি হইল, পৌরোহিত্য শক্তির বিশেষ কিছু করিতে পারিল না। এইরূপে বহুকাল চলিয়াছিল। ভারতে মুসলমান-প্রবেশেও ইহার বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই! কিন্তু এদেশে ইংরাজ আধিকার পর পৌরোহিত্য শক্তি অনেকটা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে ইংরাজশাসনের আমরা দুইটি প্রধান ফল দেখিতে পাই—অবোধ শিক্ষা এবং ব্যক্তিবাদের প্রভাব। ইহার ফল কতকালে ভাল ও কতকালে মন্দ। পুরোহিত-শ্রেণী উৎসাহের সহিত বিভাগ্য করিলেও স্বার্থসাধনের জন্য নিজ শ্রেণী মধ্যেই তাহা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই জন্য সমাজ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পৌছিয়াছিল। অবোধ শিক্ষা এখানে সমাজের অবস্থা অনেক প্রকারে উন্নত হইয়াছে এবং তাহা হইতে ভবিষ্যতের মধ্যে অনেক উন্নতি আশা করা বাইতে পারে। ব্যক্তিবাদের প্রভাবে (গুণগতবৎ) বংশগত সামাজিক স্বভাব বড় কমে আর বিশ্বাস করিতে চাহে না। স্বয়ং পাইতে হইলে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও কর্তব্য পালনই যে প্রধান ও প্রকৃত উপায়, তাহা আর কেহ সন্দেহ করে না। ব্যক্তিবাদ সমাজে প্রত্যেককে বড় হইবার,

ভাল হইবার সুবিধা ও উপায় দেখাইয়া দেয় এবং আত্মপথে সমাজে এই ব্যক্তিবাদের প্রবেশে যে কত প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা নিম্নরোজন।

কিন্তু এই ব্যক্তিবাদ সমাজের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেককেই আজ স্বয়ং প্রধান। ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে পূর্বে যে বন্ধন ছিল আজকাল তাহা চলিয়া গিয়াছে এবং অনেক স্থানেই পরম্পরের প্রতি সহানুভূতির অভাব দেখা যায়। সামাজিক স্বার্থ প্রায়ই উপেক্ষিত হয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ (ও সময়ে সময়ে, ব্যক্তিগত অভিমানও) সর্বদা সমাজকে তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যায়। পুরোহিত শক্তি অল্পরূপে অনিষ্টকারী হইলেও সমাজের উপর তাহার নৈতিক শাসন দুর্ভাগ্য করিয়া রাখিত। ব্যক্তিবাদের প্রভাবে সে শাসন আর তিরোহিত, এবং উচ্ছৃঙ্খলতা আর সমাজের প্রতিকূল রূপে না করিয়া, এবং সময়ে সময়ে রূকুটি করিয়াও, সমাজকে কলঙ্কিত ও বিপন্ন করিতেছে। বোধ হয় যেন পুরাকালের একটি বিচিত্র দৌর যুগবৎ প্রভাব পড়িতেছে।

উপরে যাহা গণিত হইল তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রথমে সমাজ বলিয়া কোন কিছু থাকে না, ব্যক্তিই প্রথমে থাকে। ক্রমে ব্যক্তির অস্বাভাবিক পরিবর্তন হইলেই সমাজের উৎপত্তি হয়। সমাজের প্রাথমিকাবস্থায় ব্যক্তির ক্ষমতা অল্প থাকে, কিন্তু সমাজের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির ক্ষমতার হ্রাস হয়, এবং ক্রমে সে সমাজের নিয়মে আসিয়া পড়ে। তাহা ব্যক্তিগত ক্ষমতার কিয়দংশ সমাজ হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি স্বয়ং ও সুবিধার

বিনিময়বন্ধন সমাজের হস্তে অর্পণ করিতে হয়।

সমাজের উৎপত্তি প্রায় সম্পূর্ণই ঐশ্বরিক প্রয়োজনাদি হইতে। সে সমস্ত প্রয়োজনের বাণী হইলে ক্রমে মানসিক প্রয়োজনাদিও সমাজের দৃষ্টিগোচর হয়। এ স্থানে দেখা উচিত—আমরা “সমাজ” অর্থে কি বুঝি। “সমাজ” অর্থে—সমাজভুক্ত কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিমাত্র নহে। সুলভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, “সমাজ” অর্থে প্রায় এক নিরম্বাদির বশবর্তী কোন জনসমষ্টি ও তাহার সাধারণ ইচ্ছা বা মত; ক্রমে ইহার মধ্যে রীতি-নীতিও আসিয়া পড়ে। পরে এই সমস্ত রীতি-নীতি ঐকান্তিক উদ্বেগ বিবেচিত হইলে দেখা যায় যে, সমাজ যে শুধু কোন অতীত সমাজের বর্তমানবিশিষ্ট ফল, তাহা নহে। ইহা বিশেষভাবে জীবন্ত ও বৃদ্ধিশীল। অতীত হইতে যেমন আমরা এই বর্তমান সমাজকে পাইয়াছি, তেমনই আবার এই বর্তমান সমাজ ভবিষ্যতে আর এক রূপ ধারণার লক্ষ্য অগ্রসর হইতেছে। এই রূপকে সামাজিক আদর্শ বলে এবং ইহা প্রতি সভ্য সমাজে ভাবরূপে (Idea) বর্তমান।

এই ভাব দুই প্রকার—অভ্যাত্তরিক (Absolute Ideal) ও আপেক্ষিক (Relative Ideal)। “অভ্যাত্তরিক” বলিলে একটা সার্বজনীন ভাব মনে আসে এবং তাহার সঙ্গে প্রতি ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের কথা মনে আসে। মনস্তত্ত্বে একটা বিশ্বদমাজের চিত্র আদিয়া উঠে, যে বিশ্বদমাজে প্রতি মনুষ্য যে উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহাকে “পূর্ণতম

মহাব্যাক্ত” ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। “পূর্ণতম মহাব্যাক্ত” অর্থে বৃদ্ধি, যে অবস্থার তাহার সমস্ত মহাব্যাক্তিতে বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সূচনা ও মিশ্রন হইয়াছে। সমাজ ও শাসন-শক্তির বর্তমান সমস্ত বাধা অপসৃত করিয়া দিয়া উপরি উক্ত অবস্থায় পৌঁছাইবার উপায় স্থির করিয়া দেওয়া। “আপেক্ষিক” অর্থে বৃদ্ধি, যে আদর্শ দেশকাল পরোক্ষভাবে। দেশকাল পরোক্ষভাবে এই আদর্শ বিস্তার হয়, এবং একই দেশে কাল ও পাত্রের পরিবর্তন ঘটিলে আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটে। সেই লক্ষ্যই বাহ্যিক এক যুগের কর্তব্য, তাহা প্রায় অস্ত্র কোন যুগের কর্তব্য হয় না। আবার যখন কোন আপেক্ষিক আদর্শ সাফল্যে নীত হয়, তখন আবার সমাজকে আরও উন্নত করিবার লক্ষ্য সমস্ত আদর্শের সম্মুখ আসে। এইরূপে আমরা আপেক্ষিক আদর্শ “পরম্পরায় ভিত্তি দিয়াই আত্যাত্তরিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

এই দুই ভাব আমাদের মধ্যে সর্বদা বর্তমান থাকিলেও যুগসন্ধির সময়েই আমরা ইহাদিগের অস্তিত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। যখন এক যুগ শেষ হইতেছে এবং তাহার পরবর্তী যুগ আরম্ভ হইতেছে, সেই সন্ধিকাল সমাজের জীবনে একটা অতি লক্ষণীয় সময়। সে সময় পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীই আপেক্ষিক আদর্শ নির্ধারণ করিয়া দেয় এবং সেই সময়ে আত্যাত্তরিক আদর্শও উদ্ভূত হইয়া আপেক্ষিক আদর্শে সাময়িক উত্তেজনা-জনিত বাধা কিছু ভুল বা অশুভ থাকে, তাহা সংশোধন করিয়া দেয়। এই সময়ে, সমাজকে বিশদ হইতে রক্ষা করিয়া

ভক্ত ও প্রকৃত পণে লইয়া ঘাটবীর ভক্ত, সমাজে বিশেষরূপে শক্তিশালী ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। এই সময়ে দেখিতে পাই যে, যেমন ব্যক্তি, পুরু পূর্ণ সমাজের ফলস্বরূপ, সেই রূপ ব্যক্তিই অনেকাংশে ভবিষ্যৎ সমাজের জননিষ্ঠ। এই সঙ্কট সময়ে দেখা যায় যে, সমাজের জার সমগ্র শক্তিই অতীত সমাজের আদর্শের দিকে, এবং ভবিষ্যতের আদর্শের আবশ্যকতা নৃশিঙে ইচ্ছুক নহে। এই সময়ে হয় ত' কোন এক অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তি উদ্ভিগ্ন—অতীত সমাজের আদর্শ যে গতজীব, ও তাহার স্বল্প সমাজের সমূহ বিপদ, এমন কি বিমানও ঘটিতে পারে, এবং ভবিষ্যৎ সমাজ যে নূতন আদর্শ চাহে—তাহা অমিত সাহসে প্রচার করেন। তিনি এই কার্যে অনেক সাধা প্রাপ্ত হন বটে। কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মে সেসে তাহার জয় অসম্ভব। এইরূপে তিনি যথোদ্যম সমাজের ধ্বংসসাধন করিয়া ভবিষ্যতের নূতন সমাজের সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। এইরূপে তিনি সমাজকে আভ্যন্তরিক আদর্শের দিকে এক পর অগ্রসর করাইয়া দেন।

তাহা হইলে দেখিতেছি যে, ব্যক্তি ও সমাজ এট দুইয়ের মধ্যে কাটাকটে ও আভ্যন্তরিক প্রাধান্য দিতে পারে না। সমাজ বড় বলিয়া ব্যক্তি ক্ষুদ্র নহে। আদিম ব্যক্তি যেমন বর্তমান সমাজের স্বীয়স্বরূপ, সেইরূপ বর্তমান ব্যক্তিও অনেক অতীত সমাজের ফলস্বরূপ, এবং বর্তমান ব্যক্তিও সমগ্রবিশেষে সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে পারে ও গড়িয়া থাকে। সামাজিক কর্তব্য খুব বৃহৎ বটে, কিন্তু তাহার প্রকাশ, ক্ষুর ও

সাপাশা ব্যক্তির ভিতর দিয়া, এবং সেই প্রকাশ, ক্ষুর ও সাপাশা সমাজের বহু পরিবর্তন ঘটাইয়া, সমাজের ভিতর দিয়াই, ব্যক্তিরও বহু পরিবর্তন ঘটায়। এইরূপে আশ্রয় দেখে যে, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, যাতপ্রতিযাতের দ্বারা দূরবর্তিত আভ্যন্তরিক আদর্শের দিকে অগ্রে অগ্রে অগ্রসর হইতেছে।

আবার দেখি যে সামাজিক আদর্শ এত বৃহৎ যে, কোন ব্যক্তিই একজন সামর্থ্য নাই যে, তাহাকে একাকী কার্যে পরিণত করিতে পারে; সেজন্য সমগ্র সমাজের সমবেত চেষ্টা ও শক্তির প্রয়োজন। আবার ব্যক্তির মত অনেক সময় তৃণ হইতে পারে, কিন্তু সমাজের সাধারণ মত প্রায়ই ঠিক হইবার সম্ভাবনা। আবার, সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা অব্যাহতভাবে হইতে দিলে দেখা যায় যে, তাহাতে অনেক সময় সমাজ ও তৎসংলগ্ন ব্যক্তির বিশেষ হানি হয়। আরও সমাজে ব্যক্তিবাণ চরমরূপে গৃহীত হইলে সমাজশাসন শিথিল হইয়া যায়, এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজে প্রচুর পাইয়া সমাজকে বিনাশের মুখে অগ্রসর করে। কখনও বা সমাজের প্রত্যাশীশেষ ছলে বলে কৌশলে সমগ্র সমাজের স্বয়ং অপহরণ করিয়া সমাজের অবশিষ্টাংশকে আপনাদিগের দাসরূপে পরিণত করে। এই সমস্ত অবস্থা যে শুধু অস্বাভাবিক, তাহা নহে। ইহারা সামাজিক আদর্শের পথ হইতে সমাজকে পিছাইয়া দিয়া ক্রমে তাহাকে মুহূর্ত্ত পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। আবার দেখা যায় যে, সামাজিক কার্যকরী শক্তি হৃদে পাইলে ও তাহা উপযুক্তভাবে

বাবুজি হইলে ব্যক্তিরও কার্য্যাকরী শক্তি বৃদ্ধি পায় ও তাহার অনেক উপকার হয়, এবং ব্যক্তি এইরূপ উচ্চতর স্তরে নিজে পৌছিয়া পরবর্তী সমাজের আরও উচ্চতরে পৌছাইবার সুবিধা করিয়া দেয়। এইজন্য ব্যক্তির উপর সমাজের নিরামক শক্তির প্রয়োগ অনেক সময় বিশেষ আবশ্যিক বলিয়া ঘোষ হয়।

তাহা হইলে আমরা বেশিতে পাইতেছি যে, ব্যক্তি সমাজের বীজস্বরূপ হইলেও ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ একমাত্র সমাজের ভিতর দিয়াই সম্ভব। সমাজের কার্য্যের পরিসমাপ্তি পূর্ণবিকশিত ব্যক্তির সৃষ্টিতে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সাফল্য উচ্চতরের

সমাজ-গঠনে। এই মহৎ কার্য্যের জন্য সমাজ বিশেষরূপ শক্তিশালী হওয়া উচিত; কিন্তু আবার সমাজের শক্তি বাহ্যতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের হানি না করে, তাহাও দেখা আবশ্যিক। এইজন্য যোগ্য হয় যে, ব্যক্তিকে তাহার ব্যক্তিত্বের গুরুত্বের যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিয়া এবং আপন শাসনশক্তির সাহায্যে সেই স্বাধীনতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা নিরোধ করিয়া দিয়া যদি সমাজ সেই পুষ্ট ব্যক্তিত্বের সমর্থন করে, ও তাহার সাহায্যে আপনায় আভ্যন্তরিক আদর্শের নিকে অগ্রগতি হইবার চেষ্টা করবে, তাহা হইলে মানবসমাজের গভীর মঙ্গলের সম্ভাবনা।

শ্রীবিমলাচরণ দেব।

অচেতন।

ছিন্ন হীন নৌকা পানি

বাঁধা থাকে ঘাটের কিণারে

সারা দিন কত বাজী

করে যার এপারে ওপারে

নদীর আনন্দ শ্রোত

তারি নীচে বহে কলসরে

তরঙ্গেরা ছুটে এসে

বেগ দিয়ে যায় সমাবেশে।

এক পারে কত লোক

তারি পরে বাজী হ'য়ে যার

অন্ত পারে আরো কত

বেগ থাকে তারি প্রতীক্ষা,

পার মানি মহানন্দে

নৌকা বাহি চলে ভারানীয়ে

তাক্তা ছিন্ন নৌকা পানি

পড়ে থাকে শুক নদীতীরে ;

বৃকের পত্রর বত

সবগুলি দেখা যায় তার

তুলে কত তার পানে

চাচেনাক কেহ একবার।

পার নৌকা নাহি জানে

আপনার গৌড়াগা যেমন

ভয়তবী হতভাগো

সেই মত নিভা অচেতন।

শ্রীমতী প্রিয়দর্শনা দেবী।

ভারতী ।

সবুজ সমাধি ।

(একখানি চীন খেলার নাটকের ইংরাজী অনূবাদ অবলম্বনে)

পাত্র ও পাত্রী ।

ইরত চীন সম্রাট ।
হান্‌চীন্‌ খাঁ .. তাতির সর্দার ।
মোংহু চীনসম্রাটের একজন অমাত্য ।
শাওকীন্ ক্রমক কস্তা ; গিরে রাণী ।
মুগা অনাতা, তাতির দূত, পতিচাৰী পত্নী ।

প্রস্তাবনা ।

হান্‌ চীন্‌ খাঁ ।

নৌতের দাতাগ এগেছে আদিকে
কাপারে বাসের বল
পশ্চিম আমার শিবিরের মাঝে
পশিছে অশ্রুক্ষণ ।
নিশীথ চাঁদেরে বিরহী সিপাহী
শোনার ব্যাকুল বীণী,
কুৎসিত দ্যত কুটিরের গণ্ডে
ষোড়শার মন হালি ।
আমি সর্দার, হুকুমে আমার
শিঙা বাঁকাইয়া ধরি'
লাথ লোক ছোটে যুদ্ধ করিতে
মরণ কুঙ্ক করি' ।

আমি দুই বংশের হান্‌চীন্‌ খাঁ ; এই
বেলে মাটির মূলকের প্রাচীন বাসিন্দা ;
উত্তর খণ্ডের আমি একলা মালিক । নৌকার
আমাদের বাবসা, যুদ্ধ আমাদের নিত্যকর্ম ।
চীনসম্রাট উৎকং আমাদের কাছে পরাজয়
শীকার করেছিল, উইকং আমাদের ভয়ে দ্বিধি
প্রার্থী হয়েছিল । চীনে দুগে শেরগার যে বুদ্ধটা
হ'য়ে গেছে সেই বুদ্ধে হার সেনে চীন সম্রাট

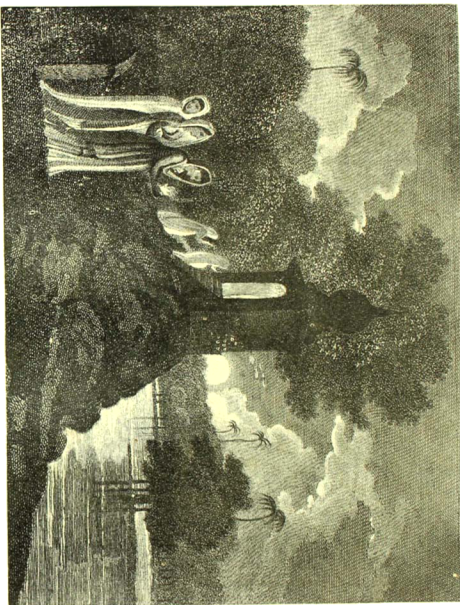
আমার পূর্ণপুরুষকে কস্তাবান ক'রে বিনাশ
মিটিয়েছিল । এমন কতবার হ'য়েছে ।

সম্রাতি গৃহবিনাশে আমাদের কিছু
কানু চ'তে হ'য়েছিল ; যা' ছোক শেষে
সকলে আমাদের সর্দার বলে মেনে নিয়েছে ।
আমার চাতে এখন লাখো লোক । এবার
রাজবংশের সঙ্গে পরিবার-বৃত্তে আবদ্ধ হবার
টঙ্কার দক্ষিণে আসা গেছে । সম্রাটের
কাছে কস্তা প্রার্থনা ক'রে কাল এক দূত
পাঠিটটি । বলতে পারিনে তিনি আমাদের
প্রাচীন নাবী বার্ষিকেন কি না । আমার
গোকেয়া লগ শীকারে বেরিয়েচে । কিছু
হুটে গেলেই মঙ্গল ; আমরা তাড়াতের
লোক,—ক্ষেতও নেই, বাসারও নেই, যা
ক'রে তীর ধরুক । (গ্রহান)

(মোংহুর প্রবেশ)

মোংহু । কলিঙ্গা শিকারী বাজের মতন
চাঁদের মতন চক্কু বার,
নষ্টামি, লোভ, তোষামোদ আর
চঁচো কথা বার গলার বার,
ঐতুর চোখে যে মূলা দিতে পারে
অমোনের পারে টিপিতে গলা
আজীবন তার কত যে সুবিধা
এক মুখে তাহা যায় না বলা ।

এই মোংহু যে সম্রাটের অমাত্য হ'য়েচেন
সে তো এমনি ক'রেই । চাই অস্ত্র এমনি
পটুতার সঙ্গে প্রয়োগ ক'রে আলা হ'য়েচে যে
সম্রাট এখন আর আমাদের একদণ্ড চোখের
আঁড়াল করতে চান না । আমি নইলে



ସିଂହ ଶାସନ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ୧୮୮୫

ভীরু আমোদই হয় না। আমার কথায় ওঠেন বলেন। এখন এ রাজ্যে এমন কে আছে যে মোংহুকে দেখে মাথা না নোহায়? কে না খাতির করে? ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক মোংহুর সমাদর এখন সর্বত্র।...কি বললে?...কেমন ক'রে এমন হ'ল? মন্ত আছে, মন্ত আছে।

বুদ্ধ, বিজ্ঞ, দিগ্ভাবানের

নীতি উপদেশ করিয়া বেলা,

আমার কথার বশবর্তী হইল।

প্রাণাবে সমশীর্ণের মেলা।

উম্! এই যে মহাশয়!

(নারী ও মণ্ডলক বেষ্টিত মনোহর প্রবেশ)

মনাট। সাত পুরুষের রাজ্য আমার

রাজ্যে আমার সাত খ' বেলা,

সবার সঙ্গে সন্ধি আমার

জীবন সেনাপি স্রবের মেলা।

শোক নেই, উবেগ নেই, কোনো স্বকাট নেই; সাত পুরুষ কেন—মশ পুরুষ এমনি চলে আসছে। আমার পূর্বপুরুষ মহাজ্ঞা, কোৎ যে দিন এই রাজ্য অধিকার করেন সেই দিন থেকে চতুঃসীমান্তের কোথাও কোনো গোলমাল নেই, আট দিক একেবারে ঠাণ্ডা। এতে আমার নিজের বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই; আমার রাজতন্ত্র রাজপুরুষদের কল্যাণেই শান্তি স্থাপিত হ'চ্ছে। প্রাণাবে -কিন্তু আর প্রবেশ করতে ইচ্ছা হয় না; পিতৃদেবের সর্গারোহণের পরে অস্তঃপুরিকায়া স্থানভ্রষ্ট হওয়ার অস্তঃপুর একেবারে শ্রীহীন হ'রে পড়েছে। আর এই একঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না।

মোংহু। দেবপুত্র। আপনি এ কিম্বদ

আজ্ঞা করতেন? গরীব চাষাও ইচ্ছামত পরী গ্রহণ করতে পারে, আর আপনি—মিনি অষ্টমিকপালের মধ্যে একজন, সাক্ষাৎ দেবতার অংশ, সমস্ত পৃথিবী আপনার অধীন, আপনি পাববেন না? অধীনের নিবেদন—রাজ্যের বিকে বিকে বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে জাতি কুল নির্জিচায়ে, পনের থেকে কুড়ি বছরের বয়সে বয়স হ্রাস হয়ে আছে সকলকে রাজ্যহরণের চাচার আনা হোক; অস্তঃপুর আবার আনন্দের পুখী হ'রে উঠুক।

মনাট। ঠিক ঠাউরেচ, মোংহু, ঠিক ঠাউরেচ। নির্জিচনের ভাব তোমার উপরেই অপ্রতি হ'ল; হুকুমনামা আজই লিখে দেওয়া থাকে। দেখ, পাকা জহরীর মত বেশ তর তর করে অধঃগণ করবে, উপযুক্ত রত্নের লঙ্কান পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব এখানে তা'র একখানি আভিরূপ পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। কপর্দে গুণপণ্য দেখাতে পারলে, চাই কি তোমাকে, পুরস্কৃত করবার অবদরও আমাদের দিতে পার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মোংহু। সোনালো ঘোড়া হাতে এসে পড়ে নিজের ঘরেই ভরি, পাতকের স্রোত বহাই রাজ্যে আইন আমি না ভরি।

শান্ত্রে বণেচে 'সকরী নাবসীদতি', টাকা কোনোরকমে একবার হাতে এসে পড়লে আর তারে হাতছাড়া করতে আছে?... মবে গেলে লোকে নির্দা করবে? উত্তিহাসে মন্ত বলবে?... তারি তর আমি রাখিনে।

রাজার হুকুম মত নিতানকইটি স্থানবী রাজ্য
পূজ্যে আবিষ্কার করা গেছে। যারই কঙ্কাকে
রাজার কস্তে নিকীচন ক'রে সম্মানিত
করেছি সেই আমাদের সাধামত অর্থ দিয়ে
খুশী করেছে। এই সুযোগে যে ধন
সমাগম হ'রেছে—তা' মেহৎ মন্দ নয়।
কিন্তু এটা পাড়্যাগে চাষাটার কাছ থেকে
কিছুই যা'র করতে পারা গেল না! মেয়ে
স্থানবী!—আরে তাতে কি? চীন সাম্রাজ্যে
এক জোড়া নেই! যদি তা' বরেন তে আর
আমার পেট ভরবে না। আমার এক ল'
ভরি সোনা দাও,—সম্রাটের কাছে যেমন
ক'রে উপস্থাপনা করতে হয় তা করছি।
গরীব? নিতে পারবে না? নিজেই
মেথেকে নিয়ে রাজবাড়ীতে কাজির হবে?
যাও, গিয়ে একবার দেখ। আমিও বিনা
সম্পদে পথ চলিনে। (৩ কুণ্ডিত করিয়া)
আমিও মেয়েটার একখানা ছবি বিকৃত করে
সম্রাটের কাছে সন্দের পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুলির
ভ'এক টানে এমনি মুক্তি বদলে দেব যে বাসু,
—প্রাসাদে গিয়ে দরবার দিয়ে পড়ে থাকলেও
সম্রাট তর দিকে দিগন্তে চাইবেন না। দেখি
চাষার মেয়ে কেমন রাজারাই হয়। হুঁ!
যে নিজের কোট বজার রাখতে না পারে
সে আমার মাহুদ?

(প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

চীনের রাজপ্রাসাদ। রাত্রি।

শাওকীন ও পরিচারিক।

শাওকীন। রয়েছে রাজার প্রাসাদে,—

পেরেছি ঠাঁই,

রাজ দরশন তবু মিলিল না হার।

সেতারটি বিনা সাধী বেধা কেহ নাই,
এখন রাত্রি একাকী কাটিয়া যায়।

হার বুধে ভনেছিলুম আমার যেদিন লজ
হয়, সেই দিন যা আগে দেখেছিলেন, যেন
জ্যোৎস্না এসে তাঁর বুকে নেমেচে; ঋণিক
পরেই সে জ্যোৎস্না আর বুকে রইল না,
মূল্যের উপর পড়িয়ে পড়ল। আমি গরীবের
মেয়ে রাজার প্রাসাদে উঠিচি, হয় তো আগের
সেই জ্যোৎস্নার মত আমার ঐ মূল্যেতেই
আমার নামুতে হ'বে। তার আগে যদি
একবার তাঁকে দেখতে পেতুম। বাবা আমার
টাকার মাহুদ নম্, রাজার লোককে টাকা
দিতে পারেন নি, তাই সে কুৎসিত ব'লে
আমার রাজার কাছে বর্ণনা ক'রেচে; আমার
চনিখানা পণ্য বিগড়ে দিয়েচে; পোড়োফেই
রাজার মন ভাঙিয়ে নিয়েচে। রাজা যখন
এদিকে আসেন লোক আমার সাবধান ক'রে
দিয়ে যার, আমার সঙ্গে যেতে বলে। আমার
রাজা,—তথু হুচকীর চক্ষে পড়ে,—আমার
পানে এ পণ্য একবার ফিরেও চাইলেন না।
আমি কী ওষ্ঠাঙ্গা,—কী ওষ্ঠাঙ্গা! সমর আর
কাটতে চার না। এই নিস্তক রাত, এই
জ্যোৎস্না,—কেউ নেই। তাগো সেতারটি
সঙ্গে এনেছিলুম, এখন এই আমার বন্ধ,
এই আমার সোনার।

(সেতার বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান)

(সম্রাটের সঙ্গে কাগড়ের লঠন হতে

প্রতীহাচার প্রবেশ)

সম্রাট। প্রায় পতাধিক কিশোরীকে

প্রাসাদে আনা হ'রেচে, কিন্তু, কই? তেমন

তর স্থানবী একজনও দেখা গেল না।

মাঝবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন

একজনও নেই। নাঃ, বিরক্ত হ'রে গেছি,—
সমস্ত ব্যাপারটার উপর বিরাট হ'রে যাওয়া
গেছে। (নেপথ্যে দেতারের 'আওয়াজ')
ওকি? কোনো নবাবগত স্পন্দিত দেতার
বাঝাচ্ছেন নাকি?

—প্রতীহারী। ঠিকই অনুমান করা
হ'য়েছে। আমি এখান থেকে মহারাজের
আগমন সংবাদ দিয়ে আসছি।

সন্ন্যাসী। উহঁ, দাঁড়াও; স্বর্ণ তোরণের
প্রতীহারী, তুমি খোঁজ নিয়ে এস দেখি উনি
আমাদের প্রাণদের কোন্ মহলে বাস
করেন? নাঃ, থাক, ওকে এই খানেই আসতে
বল।

প্রতীহারী। (শব্দের অভিমুখে) ওগো!
কোন্ ঠাকুরাণী দেতার বাজাচ্ছেন? সন্ন্যাসী
আগত, তাঁকে বিধিশূন্যক অভিবাদন করতে
আজ্ঞা হোক। (‘কাউ-তাউ’ করিতে
কমিতে পাওকীনের প্রবেশ।)

সন্ন্যাসী। স্বর্ণ তোরণের প্রতীহারী!
তোমার সন্মেলের গঠনটা ভাল জন্মে না;
একটু এই দিকে নিয়ে এস দেখি!

পাওকীন। দানী যদি একটু আগে
জানতে পারত মহারাজ আসবেন, তবে তার
এটুকু বিলম্বও ঘটত না; দানীর অজ্ঞানত্ব
অপরাধ মার্জনা করুন।

সন্ন্যাসী। নিষ্পত্ত। চমৎকার!—অপূর্ণ
জুহুরী! এমন সৌন্দর্য্য এতদিন কোন্
অঙ্ককাণ্ডে কেনন করে লুকিয়ে ছিল?

পাওকীন। দানীর নাম পাওকীন,
চিন্তা সহরের কাছে আমাদের বাড়ী, আমার
পিতা দরিদ্র, কিছু পৈতৃক জমী আছে, তাই
চাখে লাগিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। আমি

গরীব গৃহস্থের ঘরে, রাজ প্রাণদের শিষ্টাচার
কিছুই জানি নি।

সন্ন্যাসী। আশ্চর্য্য! এই অসাধারণ
সৌন্দর্য্যরাশি এত কাছে রয়েছে অথচ আমরা
তের শাহিন, আমাদের চোখেই পড়ে নি?—
এতো ভারি আশ্চর্য্য!

পাওকীন। অমাত্য মোহু আমাকে
পছন্দ ক'রে আমার ছবি আঁকতে নিচ্ছে-
লেন; সেই সঙ্গে তিনি আমার পিতাকে
বলেছিলেন “তোমার মেয়েকে রাজদ্রাঘি
ক'রে দিচ্ছি, তার সঙ্গে আমাকে একশো
ভরি পোনা দিতে হ'বে।” বাবা গরীব
মাস্তুল,—বিত্তে পারলেন না। অমাত্য সেই
সঙ্গে স্বাগ ক'রে, সন্ন্যাসীর কাছে পাঠাবার
সঙ্গে আমার যে ছবি আঁকতে ছিলেন, সেট
ছবিতে, আমার চোখের নীচে একটা বিস্ত্রী
কাটা পাগ একে দিলেন।

সন্ন্যাসী। স্বর্ণ তোরণের প্রতীহারী! এঁর
ছবিখানি আমার চোখের সামনে ধর, দেখি।
(প্রতীহারী অনেকগুলি ছবির ভিতর হইতে
বাছিয়া একখানি বাহির করিল।) ইল, এমন
সুন্দর সৃষ্টি এমনি ক'রে দানী করেছে,—শরৎ
শেষের নির্বল ধাত্রী একেবারে খোলা ক'রে
একেচে! (প্রতীহারীর প্রতি) স্বর্ণ তোরণের
প্রতীহারী! কোতোয়ালকে জানাও যে
আমি অমাত্য মোহুরের ছিা স্তম্ভ দেখতে
ইচ্ছা করিচি।

পাওকীন। দেবপুত্র! আমার পিতা গরীব—

সন্ন্যাসী। ভবিষ্যতে তাকে কোনো
খাদ্যনাই বিত্তে হ'বে না; আজ থেকে সে
রাজার স্বত্তর। পাওকীন! আজ থেকে
তুমি দ্রাঘি।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

হান্‌চীন্‌ খাঁ। চীন সম্রাট কজাদানে সম্মত হ'লেন না; দূত ফিরে এসেচে; রাজকন্ডার বরস অন্ন, হাঁ, ও একটা ছগ্ন মাত্র। ইচ্ছা থাক্‌লে সম্রাট অস্ত্রত: তাঁর নিক্ষাচিত স্তম্ভরোধের তিতর থেকে একজন কাউকে পাঠাতে পারতেন। তা' পাঠালেও আমাদের সম্মানের হানি হত না। না, লোক পাঠিয়ে দূতকে ফিরায়ে আনা যাক্‌; বুড়ই করতে হল দেখ্‌চি। এতখিনকার সন্নিবিষ্ট করতেনও মন উঠে না। বাপার কোন দিকে গড়ার দেখা যাক্‌; হাল্‌টা ভাল ক'রে বুকেই চাল্‌টা চালতে হ'বে।

(প্রস্থান)

(মোংহুর প্রবেশ)

মোংহুর। সম্রাটের জন্তে স্তম্ভরোধী বাছতে গিয়ে বেশ জ্বায়ে নেওয়া গিইছিল; আগের দারে সব ফেলে আসতে হ'ল। জাগিয়দ্‌ টাকার জমাতে পিছেছিলাম, টাকার ঘোরেই রাজরোধ থেকে মাথা বাঁচিয়ে পালিয়ে আসতে পেরিচি, কিন্তু এ মাথা এখন রাখি কোথায়?...শাওকীন্‌টা সব ফাঁস ক'রে দিয়েচে, সব মাটি, সব মাটি। আচ্ছা, শাওকীন্‌, দেখা যাযে, পেয়ে কে হারে আর কে জেতে।...ও: কি হাঁটাই হেঁটিচি, কতদূর যে এসে পড়িচি তাও ঠিক বুঝতে পারিচিনে। এই যে--সেলাই ঘোড়া, সেলাই লোক! তাড়ারদের তাঁবু নাকি? হাঁ, তাই বটে। (পরিভ্রমণপূর্ণক লেশখোর দিকে চাহিয়া) ওহে বাঁটিদার! তোমাদের

সদার হান্‌চীন্‌ নাকে বল, যে চীন সম্রাটের একজন অমাত্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

(হান্‌চীন্‌ বীর প্রবেশ)

হান্‌চীন্‌। এই দিকে এস; ভূমি কে? মোংহুর। আমি চীন সম্রাটের একজন অমাত্য, আমার নাম মোংহুর। দেখুন সম্রাটের পশ্চিম প্রাসাদে সম্ভ্রান্তি অবস্থান পরমা স্তম্ভরোধী কিশোরীকে এনে রাখা হ'য়েচে, তার নাম শাওকীন্‌। আপনার দূত এখন আমাদের সম্রাটের কাছে আপনার জাঘা প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন এবং সম্রাট রাজকুমারীর বরসের অন্তর অছিলায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তখন আমি এই শাওকীন্‌কে আপনার কাছে পাঠাবার কথা সম্রাটকে বলেছিলাম। কিন্তু সম্রাট রাজী হ'লেন না, দেখলাম গতিকটাতে তাঁর নিজের একটু দরদ কম্বচে। আমি তাঁকে অনেক গুন্‌গিরে বলেছিলাম,—বলেছিলাম যে তুচ্ছ একজন স্ত্রীলোকের জন্তে, অশান্তি আনুবন্‌ না, তাড়ার সদারকে চটাবেন না, বুড় বাধাবেন না। তাতে তিনি উল্টে তরানক রেখে আমার প্রাণধনের আদেশ দিলেন। আমি তোপালিয়ে কোনরকমে এগে বৈচে এসেচি; আমবার সনর তাকাতাভিতে নজর দেখার মত কিছুই আনতে পারিনি, কেবল শাওকীন্‌ের এই ছবিখানি আপনার জন্তে, জামার ভিতরে লুকিয়ে, অতি সাবধানে নিয়ে এসেচি। (চিত্র প্রদর্শন)

হান্‌চীন্‌। চমৎকার—চমৎকার! এমন রূপ হয়? এমন রূপসী পৃথিবীতে জামার? একে পেলে আমি রাজকন্ডাকেও চাই নি।

এলনি পত্র লিখে দূত পাঠাচ্ছি। আপনার সন্নাটী রাণী হন ভাল; নইলে বাধা হ'রে আমার লক্ষ্যভঙ্গ করতে হ'বে। রসদ জুরিরে এসেচে,—আজ্ঞা, আমার দৈন্তেরা শীকার লক্ষ মৎস্যের উপর নির্ভর করে অভয়ান করতে পারবে। তারপর একবার সীমান্তটা পার হ'রে লোকালয়ের কাছাকাছি গিয়ে পড়তে পারলে রসদ জুটিয়ে নেওয়া শক্ত হ'বে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

সন্নাটের প্রাঙ্গণ ।

শাওকীন ও পরিচারিকা।

শাওকীন । যতদিন চূর্ভাগা ছিলুম ততদিন সবাই দরার চক্ষে দেখত। সন্নাটের জনজরে পড়ে পর্যন্ত লক্ষণেই মনে মনে আমার প্রতি বিরক্ত। সন্নাট আমার ভাল-বালেন, আমার কাছে কাছে রাখেন, অস্ত্রপুত্রের বাইরে যেতে চান না, রাজকাৰ্য্য দেখেন না,—সে কি আমারি দোষ। আমি কি বারণ করি। দেখ্ দেখি, আজ তো আমিই উত্তোগ ক'রে, মিনতি ক'রে রাজ-সভায় পাঠিয়ে নিলুম, নইলে কি যেতেন? কিন্তু পাঠালে কি হয়, হয় তো এখনি কিরবেন। (আশীর সঙ্গুথে আসিয়া আপনাকে দেখিতে দেখিতে) না প্রায় ঠিকই আছে। (বেশ বিতর্কে প্রবৃত্ত)

(সন্নাটের প্রবেশ)

সন্নাট । পশ্চিম প্রাঙ্গণে শাওকীনের বেণে অবধি যেন সাতাল হ'রে থাকা গেছে, বিনশুলো দখ খেয়ালের কোঁকে কেটে থাকে। কতদিন যে দরবারে যাওয়া হয় নি

তা মনেই নেই। আজ, তার উপর, দরবারের শেষ পর্যন্ত হাজির থাকতে গিয়ে একেবারে বিরক্ত হ'রে যাও গেছে। আর অপেক্ষা করতে পারা গেল না, দেহী সইল না; সত্তার গোথাকেই একবার ওকে দেখে যাওয়া থাক। ঐ যে; কাছে যাওয়া হ'বে না, এইখান থেকে লুকিয়ে দেখা থাক। (দীর্ঘে দীর্ঘে ক্রমশঃ শাওকীনের পিছনে আশিরা, বসন্ত) বাঃ! গোণ আশীশানির ভিতরে প্রতিবিশ পড়েচে, মনে হ'চ্ছে যেন চাঁদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রমণ্ডলে বিরাজ করচে। (তত ভাবে নিরীক্ষণ)

(প্রধান অমাত্যের প্রবেশ)

প্রধান । মন্ত্রীর কাজ মতগা দেওয়া

কেলে রেখে পাশা দাগা,

মন্ত্রীর কাজ দরবারে বসি'

দেশের ভাবনা ভাষা।

এখন এদের আনাগোনা হার

কেবলি প্রমোদ বনে

রাজ্য ও রাজা—কাহাবো কথাই

পড়ে নাক' আর মনে।

এদিকে হঠাৎ হানুতীন পার হুত এসে হাজির। হানুতীন খাঁ রাজকুমারীর বদলে শাওকীন দেবীর পাণিগ্রহণ করতে চায়; সহজে হানুদা না হ'লে হুত করবে। কাজেই বাধা হ'রে একরকম মহারাজের পিছনে পিছনেই, আমাকে অস্ত্রপুত্র প্রবেশ করতে হ'ল।

(সন্নাটকে দেখিয়া) মহারাজের কাছে নিবেদন এই, যে উত্তরবাসী বিদেশীদের সর্দার হানুতীন না, পলায়মান মৌজুর কাছে শাওকীন দেবীর চিত্র দেখে একেবারে হুত হ'রে পড়েছেন, এবং বিবাহের প্রস্তাব ক'রে

মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়েছেন। মহারাজ যদি শাওকীন দেবীকে তাঁর হাতে অর্পণ করতে সম্মত না হন তো তিনি যুদ্ধ করবেন—চীনসাম্রাজ্য হারবার করবেন, লিখেছেন।

সম্রাট। চীনসাম্রাজ্য হারবার করবেন ? ...লিখেছেন ? বটে ! সৈন্য সামন্ত রয়েছে কি জেতে ? তাম্রা রক্ষা করবে না ? সুবাই তাতারের ভয়ে আড়ট ? কারো ক্ষমতা নেই ? কেউ এই অসভ্য বক্সরগুলোকে দূর ক'রে তড়িৎে দিতে পারবে না ! এই অপমান ঘাড়িয়ে দেখবে ? রাজপুত্রের লাহুনা অনার্যে সম্ব করবে ? আশ্রিত জীলোককে শত্রুর হাতে গণে ধরে কাপুরুষের মত বেঁচে থাকবে ?

প্রধান। মহারাজ মাজিনা করবেন, অধীনকে রাজকাণ্ডের অজুহাতে বাধ্য হ'রে বাচালতা অবলম্বন করতে হতে। মহারাজের এই অভিজ্ঞতার কাহিনী দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হ'রে শেঁড়ে ; সুবাই জানতে পেরেচে আপনি অকণক্ষীর স্রোতে রাজলক্ষীকে অবহেলা করতে আরম্ভ করেছেন। আপনি রাজকাণ্ডা দেখেন না বলে রাজপুত্রেরও বেজ্ঞানী হ'রে উঠেচে, রাজ্যময় বিপৃথগ। কাজেই বিদেশী বক্সরেরা সাহস পেয়ে গেছে, ভয় দেখিয়ে কাল হাণ্ডিল করার চেষ্টা করচে। এখন, এ অবস্থায়, শাওকীন দেবীর মাতা ভাগ করা তির আর কী উপায় আছে ? আম্রদেশের সৈন্য অশিক্ষিত নয়, উপযুক্ত সেনাপতির অভাব ও অনেক দিন মহারাজকে জানিরেচি। এই বিপৃথগার মধ্যে তাতারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উত্তম হ'লে পরামর্শ

অবশ্যস্বাবী। আর, তাঁর উপরে, তাতারেরা একবার লুটপাট আরম্ভ করলে হৃদশার আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। অতত প্রজাদের দূখ চেয়েও শাওকীন দেবীকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী। তাতার দূত -রাজদর্শনের জেতে বাইরে প্রতীক্ষা করচে।

সম্রাট। আসতে আদেশ কর।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। তাতার সর্দার হান্‌তীন্‌ খাঁ মাননীয় চীন সম্রাটকে এই কথাতলি জ্ঞাপন করার জেতে আমাকে পাঠিয়েছেন। প্রথম কথা, -এই যে, চীন সম্রাট তাতারদের সঙ্গে সন্ধিহুত্রে আবদ্ধ ; সেই সন্ধির সর্ত্ত অহুনারে, তাতার সর্দার চীন রাজবংশের কোনো সুলতরী মহিলার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হ'রে চীন সম্রাটের কাছে প্রস্তাব করে পাঠালে সম্রাট ই প্রস্তাবে সম্মত হ'তে বাধ্য। দ্বিতীয় কথা এই, যে, এইরূপ প্রস্তাব নিয়ে তাতার সর্দারের পক্ষ থেকে হু'বাব জ'লান দূত এসে নিরান হ'রে কিংব গেছে ; চীন সম্রাট কস্তাপানে সম্মত হননি। এই ঘটনার পর চীন সম্রাটের তৃতপূর্ণ অমাত্য মোংহু তাতার সর্দার হান্‌তীন্‌ গাকে শাওকীন নারী রাজ্যতঃপুংখামিনী কোনো সুলতরী মহিলার একখানি জালেখা দেখিয়েছেন। তৃতীয় কথা এই, যে, তাতার সর্দার এই সুলতরীর পাণিগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হ'রে তৃতীয়বার দরবারে দূত পাঠিয়েছেন। এখন সম্রাট যদি প্রাচীন সম্ভাব রক্ষা করতে চান তবে শাওকীন দেবীকে তাতার শিবিরে পাঠিয়ে

দিতে বিধা করবেন না। সম্রাট যদি এ প্রস্তাবে সম্মত না থাকেন তবে হামতীন্দ্র, তাঁর সমস্ত দাবী বজায় করবার জন্তে চীনরাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য হ'বেন। ভাগ্য নির্ণয় অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেই হ'বে। মহারাজ যৌরভাবে চারিদিক গিবেচনা ক'রে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে আমরা সন্মত হ'ব।

সম্রাট। দুতকে এখন বিশ্রাম গৃহে নিয়ে যাও। হোক। (দুতের প্রস্থান)

অমাত্য প্রধান! সেনাপতিকে পবর দিন, সাক্ষিবিশ্রাহককে পবর দিন; সম্রাট একত্র হ'য়ে, পরামর্শ ক'রে এমন একটা পণ্য স্থির ক'রে ফেলা হোক,—যাতে তাতার সৈন্তের তুচ্ছনও নিরস্ত হয়, শাওকীন দেবীকেও না বর্ষরের হাতে সঁপে দিতে হয়। ...ভেবে দেখুন, তেবে দেখুন।...হ'ল না? পারলেন না?...আমি সহজেই লোকের প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে এসেছি, নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে কারো প্রতি কখনো কঠোর ব্যাভার করিনি,—তার ফলে সকলেই কি আমায় ইচ্ছার বিরোধী হ'রে উঠল?...যখন আমার পিতামহী সাম্রাজ্যী দুঃখও বেঁচেছিলেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কইতে পারি এমন দুঃসাহসী একজনও ছিল না; তাঁর মুখের কথাই ছিল আইন।...ভবিষ্যতে দেখছি সাম্রাজ্যের ভার এতগুলো পুরুষ মাহ'বের হাতে না রেখে একজন মাত্র স্ত্রীলোকের হাতে রাখলেই সমস্ত হুশুখল হ'রে উঠবে।

শাওকীন। মহারাজের বেহেদ প্রতিদান নেই; তাঁর অহুগ্রহের প্রতিদান—তাও

নেই। তবে তাঁর মঙ্গলের জন্তে, তাঁর প্রজাবের কল্যাণের জন্তে দাবী সূচনুখে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু...এই অহুগ্রহ...এ আমি কেমন ক'রে ভুলব? রাজা। তোমার কি বলব? আমিই যে ভুলতে পারব তা কোর ক'রে বলতে পারিনে।

প্রধান। মহারাজ! অধীনের নিবেদন, শৈতুক রাজ্য বাতে পরজন্তে না গিয়ে, পুত্র পৌত্রের ভোগে আসে সেই পছাট অবলম্বনীয়। দেবীকে অনিলবে তাতার শিবিরে পাঠিয়ে দেবার আয়োজন করাট হুযুক্তি।

সম্রাট। তবে তাই হোক। দুতের হাতে সঁপে দাও।...আমরা সন্নে সন্নে ঘাব,... শাওকীনকে একদিনের পথ এগিরে দিবে আসুব;...শাস্ত্রিং সেতুর এ পারে শেষ ত্রিয়ার নিয়ে কিরব।

প্রধান। সর্জনাপ! এতে যে সম্রাটের মর্যাদার ছানি হ'বে; এমন কি, এর জন্তে এই বর্ষর তাতার গুলো পর্বাত টিটকারী দিয়ে হাসবে।

সম্রাট। হাহুক। আমরা আমাদের অমাত্যের সকল অহুগ্রহই আজ রেখেছি, অমাত্য কি আমাদের এই অহুগ্রহাটোও রাখবেন না?...যে ঘাই বলুক, আমরা শাওকীনকে একটা দিনের পথ এগিরে দিবে আসুব...বিদায় নিয়ে আসুব। তার পর শূত্র প্রাসাদে ফিরে আমরণ বিধায্যাতক মৌহুর বাভার স্রলন করতে থাকব।

প্রধান। আমাদের মজাগত এই অক্ষমতার জন্তে নিবেদনের দ্বিতীয় দিতে দিতে, নিতান্ত অনিচ্ছাস্থে, কেবল লোককর বনকর

নিবারণ করবার জন্তে, মহারানকে আশ্রিত-
বর্জনের মনো দিতে হ'ল। উপায় নেই,—
তার উপর এই স্ত্রীজাতির জন্তে—বিশেষতঃ
রূপবতী রমণীর জন্তে অগতে এপারী অনেক
শুদ্ধ চ'রে গেছে, অনেক রাজ্য ধ্বংস হয়েছে,
অনেক জাতি উৎসন্ন হয়েছে।...সাহস কর না—
সীলোকের জন্তে লোককরে প্রস্তুত হ'তে
সাহস কর না।

শাওকীন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্তে
বর্জনের চাতে আত্মসমর্পণ করতে চলেছি।
শুদ্ধ বাপলে কত লোকের সর্জনাশ হ'ত,
কত নারী পতিপুত্র হারাত, সে সর্জনশয়ের
পথ আমি বন্ধ করতে যাচ্ছি।...তারা কি
আমায় নেন করবে?...তারা কি আমায়
আশীর্বাদ করবে?...হয়তো করবে; তবু
মহাত্মাভাব কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার
বুজ চেতে থাকে। (প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাখিঃ দেখু।

শাওকীন, দূত ও অমৃতচরণ।

শাওকীন। (স্বপ্ন) ওঃ! এই আমি,...
মহারাজের কাছে নান পেয়েছিলুম, মর্যাদা
পেয়েছিলুম, অমৃতচরণ পেয়েছিলুম, দেহ
পেয়েছিলুম।...তাতার সর্দার লিখেচে, আমায়
না পাঠালে রাজ্য ছাড়াবার করবে, কি
সর্জনশয়ের কথা! একজননের জন্তে রাজ্যের
লোককে পুনঃপুন করবে!...এই সব বর্জর—
এদের কাছে আমার যেতে চ'বে...এদের
সঙ্গে থাকতে হবে,...এদের খুশী করতে
হ'বে! শুনেছি, এরা যে দেশের লোক

সে দেশ তারি ঠাণ্ডা, বরফ পড়ে; কেমন
ক'রে সে দেশে থাকবে! ভগবান! হাকৈ
রূপ বিরহ তার কপালে লুপ্তাশ্রি লিপ্তে
একেবারে ভুলে গেছে!...কি করবে?...
নিরুপায়, নিরুপায়।

(সন্ন্যাসী ও অমৃতচরণের প্রবেশ।)

সন্ন্যাসী। বিদায় নেবার সময় এসেছে—
এই আমাদের শেষ দেখা। (অমৃতচরণের
প্রতি) পারলে না? শাওকীনকে বর্জনের
হাত থেকে বাঁচতে পারলে না? পত্নী-বর্জন
ভিন্ন রাজ্যরক্ষার কোনো উপায় নেবে
নেলে না?...অকর্ণণা। (ঘোড়া চটতে
নাছিয়া শাওকীনের হস্তধারণপূর্বক
অশ্ববিলম্বন ও নাট্যের দ্বারা পরাম্পরের
হৃৎপ্রকাশ।)

দূত। দেবি, একটু বরাবিত হ'তে
অজ্ঞা হোক; আকাশ অন্ধকার হ'বে এল,
সন্ধ্যার আর বিশেষ নেই।

শাওকীন। প্রভু! আর কবে আপনাকে
দেখতে পাব! কেমন ক'রে দেখতে পাব!...
আজ যে রাজার রাণী কাল সে বর্জনের
বঁাদী হবে। প্রাসাদের বেল এটেনেই ছেড়ে
যেতে চাই, এই উজ্জল সাজ চানকার তাঁবুতে
একটুও মানাবে না।

দূত। দেবী, আমার আপনাকে বিরক্ত
করতে হ'ল—একটু বরাবিত হ'ল অত্যন্ত
দেবী হ'বে থাকে।

সন্ন্যাসী। না, আর দেবী কিসের?
শাওকীন! অনেক দূরে চলে যাক, কিন্তু
দেখ, আমাদের অমৃতচরণের এই পেলব স্বতি
যাদের আগুনে যেন নীরস ক'রে না ওঠে,
অতিমানের স্পর্শে যেন মলিন হ'বে না যায়।

আমার অক্ষমতা স্বরণ ক'রে কখন কোরো,...
মনে রেখো।

(শাওকীন ও সূতের প্রস্থান)

আমার লোক বলে সন্ধ্যাটী চীনরাণীর
ভাগ্য বিধাতা !

প্রধান। আশুত হোন্,
আশুত হোন্।

সন্ধ্যাটী। চলে গেল...তাসিরে বিতে হ'ল !
এই অগভিখাত আঁচীর, এই দুর্ভাগ্য ভাগ্য স্রোতী,
এই সহন সৈন্ত সামন্ত...সব বিখ্যা !
তাতারের নামে কল্পমান ! এতগুলো
পুরুষের বুদ্ধিবল এবং বাহুবলে রাজ্য রক্ষা
হ'ল না, একটা আশ্রিত স্রীলোককে বলি দিয়ে
রাজ্যরক্ষা করতে হ'ল। বীরপুরুষেরা
কাপুরুষের মত বেঁচে রইলেন !

প্রধান। মহারাজ আসানে প্রত্যাধর্ষন
করতে আজ্ঞা হোক। আপনি বিজ্ঞ, গতাশু-
শোচনা যে নিষ্কল দেকখা আপনায় অজানা
নেই। শাওকীন দেবীর কথা এখন বিস্তৃত
হওয়াই শ্রেয়।

সন্ধ্যাটী। স্তব্ধ যদি লোহার হ'ত তাহ'লে
বিস্তৃত হওয়া যেত, অঘাত্য প্রধান, তাহ'লে
ভোলা যেত। অজ্ঞত গোপের জল...যুঁছে
শেখ করতে পারতিনে।...আজ, আসানে
ছিরে গিয়ে, তার পরিত্যক্ত পরধানিতে,
হাজার শোণ্য অসীপ আলিয়ে, তার
ছবিখানিকে সামনে রেখে তার কল্যাণে
সামর্য্যাত আমি দেবার্জনা করব।

প্রধান। এখন তবে আসানে ছিরে চপুন,
দেবী একজন বহুদূর চলে গেছেন।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভাতার শিবির। হান্‌চীন্‌ খাঁ, শাওকীন
ও তাতারগণ।

হান্‌চীন্‌। চীন সম্রাট সর্বমুখ প্রস্তুত
শাওকীন দেবীকে আমার হাতে সমর্পণ
করেছেন। একে আমি দেশে ফিরেই,
সম্মানে পত্নীরে বরণ করব। দাঁক, দুই
দেশের প্রজাই অশান্তির হাত থেকে নিস্তার
পেলে। (একজন তাতারের প্রতি) ওহে
ছোকরা, সকলকে তাঁরু ওঠাবার হুকুম জানিয়ে
দাও, আজই উত্তরে ফিরতে হ'বে। (সকলের
প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

আমুর নদীর উপর নৌকা।

হান্‌চীন্‌ খাঁ, শাওকীন।

শাওকীন। এ কোন্‌ জায়গা ?

হান্‌চীন্‌। এই হ'ল দুই রাজ্যের সীমানা
এই যে নদী একে আমরা বলি কাল-
নাগিনী। এর একূল চীন সম্রাটের অধীন,
ওকূল তাতার সর্দারের আয়ত্ত।

শাওকীন। তাতার সর্দার, এইখানে,
আমি আমার দক্ষিণের আশ্রয়কের উদ্দেশে
এক অজলি কূল তাসিরে দিতে চাই।
(দ্বারে গিয়া) আমার দেবতা, যমুনা-উদার-
প্রকৃতি চীন সম্রাট ! তোমার উদ্দেশে এ
জীবনে আমার এই শেষ পূজাঞ্জলি। (নদীতে
পতন) পরলোকে তোমারি প্রতীক—
(জলে অদৃশ্য হইয়া গেল।)

হান্‌চীন্‌। (ধরিতে না পারিয়া) গেল
—গেল ঘূর্ণিলে পড়তে না পড়তে একেবারে
তলিয়ে চলে গেল ! প্রতিজ্ঞা ক'রে বসছিল

—বিশেষী তাত্ত্বিককে বিবাহ করবে না। আর উপায় নেই। নৌকা ভিড়ানো, এই নদীর তীরে শাওকীনের স্মৃতিস্মারক প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে; তার আগে বেশে ফিরব না। মন্দিরের নাথ হবে সবুজ সমাধি।... আর সে নেই; চীন সম্রাটকে অকারণে উৎপীড়ন করা হল। কুচক্রী, হতভাগা মোহাই এই অনর্থের মূল। (একজন তাত্ত্বিকের প্রতি) দেখ, মোহাইকে, এখনি বন্দী করে, চীন সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দাও, সেট খানেই ওর উচিত শাস্তি হ'বে। 'ওকে এককণ্ঠে আর আমাদের মধ্যে রাখা হ'বে না। মোহাইর মত কুটিল লোককে যে আশ্রয় দেবে তার বিপদ পড়ে পড়ে।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

পশ্চিম প্রাসাদ ।

চীনসম্রাট ও প্রতিহারী ।

সম্রাট । শাওকীনকে পরের হাতে তুলে দিবে পর্যন্ত আর দরবারে যুব দেপাট নি।... রাজ্যের নিয়ন্ত্রণতাও ভাল লাগে না, মন ঘেন আরো হতভাল হ'রে পড়ে। সাহসার মধ্যে তার এই ছবিখানি, এই খানিকে সামনে রেখে, একপুটে চেয়ে চেয়ে রাত কেটে যায়। (প্রতিহারীর প্রতি) স্বর্ণ ভোরণের প্রতিহারী! বেখ, বেখ, এদিকের দৃশ্যটা একেবারে নিবে গেছে, আর একটা ঘেলে দাও দেখি।...সে চোখের আড়াল হ'রে চলে গেছে, তাই বলে তাকে প্রাণের আড়াল করতে পারব না; তার এই ছাড়াখানিই এখন আমার জীবনের অবলম্বন।...ক্রান্তিতে শরীর ভেঙে পড়চে,

অথচ যুব আসে না। দেখি একটু যুগ্মাবার চেষ্টা ক'রে দেখি। (স্বপ্ন ও নিশ্চাকর্ষণ। স্বপ্নে শাওকীনের আবির্ভাব।)

শাওকীন। বর্জর তাত্ত্বিকের আমার উত্তর দেশে নিয়ে যেতে চার,—আমি তাদের তাঁবু থেকে লুকিয়ে চ'লে এসেছি।...এই না মহারাজ! রাজা আমার! আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এসি।

(স্বপ্নে একজন তাত্ত্বিকের সিপাহীর আবির্ভাব) সৈনিক। একটু বস্ত্র। এগেছে কি অমনি পালিয়েচে! স্রীলোকের এত সাহস! আমিও ধড়মড়িয়ে উঠে তার পিছন পিছন ছুট। ছুটতে ছুটতে একেবারে পশ্চিম প্রাসাদের দরবারে এলে পড়েছি...এই না সে? হঁ, যুব পালানো হয়েছে যে! এখন চল। (শাওকীনকে প্রেস্তার করিয়া অন্তর্ধান।)

সম্রাট। (জাগিয়া), বা, অদৃষ্ট হ'রে গেল। দিনের বেলায় জেগে থাকতে, থাকে এত ডেকেও সাড়া পাইনি, স্বপ্নের রূপার তাকে পেয়েছিলাম,...রাখতে পারিনি না,...স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।...ওই!...বিরহী চক্রবাক্য চাৎকার করতে; আমার এই বেননার মর্মে শুধু ওই বনের পাখীই বুকতে পেরেচে!...চক্রবাক্যের মতন হতভাগা আর কারো নেই;...উত্তরে ওর তাত্ত্বিক সিপাহীর তীরের ভয়, দক্ষিণে ফলিবাংদের জালে পড়বার ভয়। নাঃ, আবার ডাকতে শুরু করলে, এই পাখীগুলোর আলার মনটা আরো খামোশ হ'রে উঠল।

• প্রতিহারী। মহারাজ, আপনি দেবভুল্য, আপনি শোকে মলিন হ'রে থাকেন এ জীবনের সঙ্কল্প হয় না।

সম্রাট। এ শোক দমন করবার ক্ষমতা ...আমার নেই। আমাকে তোমরা সবাই মিলে কেন এই এক কথা বারবার দাব্বাং বল ? তোমরা কি শোক হুংসের মর্ঘ জান না ?...ওই যে পাখীর আওয়াজ এখন শুনে ওতো মুকুলভোজীর আনন্দ কণরব নয়।...শাওকীন আমার গৃহপুত্র ক'বে চলে গেছে।...হর তো ঠিক এই মুহূর্তে বুনোপাখীর হাঙ্কার শুনে আবারি মত সে আকুল হ'রে উঠেচে। স্বর্ণ তোরণের প্রভীহাতী ! বলতে পার—লে এখন কোথায় ? বলতে পার ? জান ?

(প্রধান অমাত্যের প্রবেশ)

প্রধান। মহারাজ, এইমাত্র তাতার সর্দারের হু'লন গোঁক মহারাজের ভূতপূর্ণ অমাত্য যৌত্তকে শূন্যগাবন্ধ অবস্থায় রাজ-ধানীতে এনে হাঙ্কার করেছে। তাতার সর্দার গিগেচেন,—এই বিশ্বাসঘাতকই সকল অনর্থের মূল ; এ আপনার আত্মা অমান্য ক'রে পাশিয়েছিল,, সেইজন্তে আপনার হাতেই একে প্রত্যাৰ্পণ করা হ'য়েচে। নইলে, সর্দারই একে সমুচিত শাস্তি দিতেন।

আবাতে।

নবীন ধূল মেঘে মেঘের অন্ধর।
গিরি কটিদেশে বেড়ি গর্জি শুধ শুধ
নিরে তপোবনশির ছায় বনস্তর
অশ্রম পালিত যুগ কীপে ছক ছক।
বজ্র সাধে অস্তে গুণি পশিছে কুটীরে
হোমধূম বিপে বার নীরবের গার
চকল বশাকা মাগা শোভে অস্ত্রি শিরে,

তাতার সর্দার চীনম্রাটের সঙ্গে সত্বে রাপ্তে ইচ্ছুক, সম্রাটের অভিপ্রায় আনুগার অস্ত্রে দৃত অপেক্ষা করচে। সর্দার এই চিরিতিে আর একটা সংবাদ দিয়েছেন—শাওকীন দেবী আর ইহলোকে নেই।

সম্রাট। (অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া)
বাও, সকল অনর্থের মূল বিশ্বাসঘাতক মোংহুর মৃত ছিন্ন ক'রে অগ্নিনি শাওকীন দেবীর অতৃপ্ত প্রেতাত্মার তৃপ্তার্থে দান করগে।...আর, তাতার দূতের সম্মানার্থে সমারোহ পূর্ণক প্রাসাদে ভোজের আয়োজন করতে ভুলনা, বাও। (অমাত্যের প্রস্থান)

চক্রবাকের জন্মন তনি' কানে,
কত না স্বপন ভেগে উঠেছিল আগে !
সারাস্ত শুধু ভেবেছি তাহারি কথা,
সে যে বেঁচে নাই আশি নাই সে ব্যর্থতা।
সবুজ সমাধি* আছে শুধু নদী তীরে,
সিদ্ধ তাতার চীনের অস্ত্রমৌবে।
যে পটুগা তার ছবি ক'রেছিল মাটি,
স্মৃতি সে দিবে নিজের মৃত কাটি'।

যবনিকা

ঐশতোজনাথ দত্ত।

হোমধূম সচকিতে আগ্রমেতে ধার।
ব্রহ্ম কেশ সনে উড়ে বক্ষণ অক্ষয়
প্রত্যাগির মেঘগাজে রাণি নেত্র দুটি
অক্বেতে আশ্রিত যুগ পাবক চকল
কজ্জল বলর পড়ে প্রথ হরে টুটি
মণিবন্ধ হ'তে, তপঃকোণ তম্বুলা
তনে মেঘমস্ত্রে আজি আপার ব্যর্থতা।
ঐনিকশমা দেবী

* আত্মর নবীন বাপুসার তটের কেবল একটি নাম অংশ নন্দ-সমাজের, এই অপেক্ষিক লোক এখবত শাওকীন রাণীর সবুজ সমাধি বলে।

ভারতী।

সুন্দর।

পশ্চিম আকাশের পরে তখনো সূর্য্যোস্তের
দগর আভা ছিল; আমাদের আশ্রমে
শালবনের মাথার উপরে সন্ধ্যাবেলাকার
নিম্বক শান্তি সমস্ত বাতাসকে গভীর করে
তুলছিল। আমার জন্ম একটি বৃহৎ সৌন্দর্য্যের
আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমার
কাছে বর্তমান বৃহৎ তার নীমা হারিয়ে
ফেলেছিল, আলোকের এই সন্ধ্যা কত
সুগের সুস্বাদু অতীতকালের সন্ধ্যার মধ্যে
প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। তারতবর্ষের
ইতিহাসে যেদিন ঋষিদের আশ্রম সত্য ছিল;
যেদিন প্রত্যহ সূর্য্যের উদয় এবেশে
তলোবনের পর তলোবনে পাখীর কাকলি
এবং সারগানকে আগিয়ে তুলত; এবং
দিনের অবসানে প্যাটলবর্ণ মিশ্রক গোধূমি
কত মদীর তীরে কত শৈলপদমূলে প্রান্ত
হোমধেয়গুলিকে তপোবনের গোষ্ঠিগুহে
ফিরিয়ে আনত, তারতবর্ষের সেই সরল
জীবন এবং গভীর সাধনার দিন আলোকের
শান্ত সন্ধ্যার আকাশে অত্যন্ত সত্যরূপে
প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

আমার এই কথা মনে হচ্ছিল, আর্ধ্যাবর্জের
দিশন্তপ্রসারিত সমস্ত ভূমিতে সূর্য্যোদয়ে
সূর্য্যোস্তে যে আশ্রম সৌন্দর্য্যের মহিমা
প্রতিদিন প্রকাশিত হয় আমাদের আর্ধ্য-
পিতামহের তাকে এক দিনও এক বেলাও
উপেক্ষা করেননি। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সাং-
সন্ধ্যাকে তাঁরা অচেতনে বিলাস দিতে
পারেন নি। প্রত্যেক যোগী এবং প্রত্যেক

গৃহী তাকে জগতের মধ্যে গ্রহণ করেছেন।
কিন্তু কেবল ভোগীর মত নয়, তারকের
মত নয়। সৌন্দর্য্যকে তাঁরা পূজার মন্দিরে
অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন। সৌন্দর্য্যের মধ্যে
যে আনন্দ প্রকাশ পায় তাকে তাঁরা ভক্তির
চক্ষে দেখেছেন—সমস্ত চাকলা দমন করে,
মনকে স্থির রাখ করে উবা ও সন্ধ্যাকে তাঁরা
অনন্তের ধ্যানের সঙ্গে মিলিত করে নিয়েছেন।
আমার মনে হল নদীসঙ্কমে সমুদ্রতীরে
পর্লতপিত্বের বেখানে তাঁরা প্রকৃতির স্নান
প্রকাশকে বিশেষ করে দেখেছেন সেইখানে
তাঁরা আপনাদের ভোগের উত্তান রচনা
করেননি; সেখানে তাঁরা এমন একটি
তীর্থস্থান স্থাপন করেছেন, এমন কোনো
একটি চিহ্ন রেখে দিয়েছেন, যাতে স্বভাবতই
সেই স্নানের মধ্যে জুয়ার সঙ্গে মিলনের
মিলন হতে পারে।

এই স্নানের মহানুভবকে সহজ দৃষ্টিতে
বেন প্রত্যক্ষ করতে পারি এই প্রার্থনাটি
আমার মনের মধ্যে সেই সন্ধ্যার আকাশে
ধেগে উঠেছিল। অগতের মধ্যে স্নানকে
আপনাদের ভোগবৃত্তির দ্বারা অসত্য ও ছোট
না করে, ভক্তিবৃত্তির দ্বারা সত্য ও মহৎ
করে বেন জানতে পারি। অর্ধ্য
কেবলি তাকে নিজের করে নেবার বার্থ
বাসনা ত্যাগ করে, আপনাকেই তাঁর কাছে
দান করবার ইচ্ছা বেন আমার মনে আত্মিক
হয়ে ওঠে।

তখন আমার এই কথাটি মনে হল,

সত্যকে হৃদয় ও প্রাণকে মহান বলে জানবার অসুস্থিতি সহজ নয়। আমরা অনেক জিনিসকে বাদ দিই, অনেক প্রতিশ্রুতকে পূরে রেখে, অনেক বিষয়োপেক্ষে চোখের আড়াল করে দিয়ে নিজের মনোমত একটা গভীর মধ্যে সৌন্দর্যকে অত্যন্ত সৌখীন রকম করে দেখতে চাই;—তখন বিশ্বলক্ষ্যকে আমাদের সেবাদাসী করতে চেষ্টা করি, পেই অপমানের বাবা আমরা তাঁকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে লুপ্ত হারিয়ে ফেলি।

মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিই দেখলে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ঊর্ধ্বলতা নেই, এই ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে হৃদয়কে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ। ছোট করে দেখতে গেলে তার মধ্যে যে সমস্ত বিরোধ বিকৃতি চোখে পড়ে সেগুলিকে বড়র মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে দেখতে পাওয়া আমাদের মধ্যে ভেদন করি।

কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে এটি আদর্য পেরে উঠিলে। মানুষ আমাদের এত অত্যন্ত কাছে যে, তার সমস্ত ছোট্টকে আমরা বড় করে এবং সুত্তর করে দেখি। বা তার অণিক ও তুচ্ছ ভাও আমাদের “বেদনার মধ্যে অত্যন্ত স্তম্ভকর হয়ে দেখা দেয়, কাছেই লোভে ক্ষোভে তরে ভাবনার আদর্য সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারিনে, আদর্য একাংশের মধ্যে বোলারিত হতে থাকি। এইক্ষেত্রে এই বিশাল সঙ্কটাকাশের মধ্যে যেমন সহজে হৃদয়কে দেখতে পাচ্ছি মানবদলারো ভেদন সহজে দেখতে পাইনে।

আজ এই সঙ্কটাবলার বিশ্বজনগতের মুক্তিবেশে এমন হৃদয় করে দেখছি এর ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সাধনা নেই। বার এই বিশ্ব তিনি নিজের হাতে এই সমগ্রকে হৃদয় করে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। সমস্তটাকে বিশ্লেষণ করে যদি এর ভিতরে প্রবেশ করতে বাই তা হলে এর মধ্যে যে কত গভীর ব্যাপার দেখতে পাব তার আর স্তম্ভ নেই। এখনি অনন্ত আকাশ জুড়ে তারার ভাঙার যে আয়ের বাষ্পের ভীষণ বড় বইতে তার একটি সামান্য অংশও যদি আমরা সমুখে প্রত্যক্ষ করতে পারতুম তাহলে শুধে আমরা তস্তিত মুক্তি হয়ে যেতুম। টুকরো টুকরো করে যদি দেখ তাহলে এর মধ্যে কত ব্যত সংঘাত কত বিরোধ ও বিকৃতি তার কি সংখ্যা আছে! এই যে আমাদের চোখের সামনেই ঐ গাছটি এই তারাবর্তিত আকাশের গায়ে সমগ্রভাবে হৃদয় হয়ে গাড়িয়ে রয়েছে এঁকে যদি আনন্দিক ভাবে দেখতে বাই তাহলে দেখতে পাব এর মধ্যে কত প্রীতি, কত বিকটোরা, এর স্বকের উপরে কত বলি পড়েছে, এর কত অংশ মরে গুঁড়িয়ে কীটের আবাদ হয়ে পড়ে থাকে! আজ এই সঙ্কটের আকাশে গাড়িয়ে অগতের যতখানি দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা এবং বিকারের কিছু অত্যন্ত নেই, কিন্তু তার কিছুই বাদ না দিয়ে সমগ্রকে স্বীকার করে নিয়ে, বা কিছু তুচ্ছ বা কিছু বার্থ বা কিছু বিকল্প লবই অবিলম্বে আশ্রয় করে এই বিশ্ব অসুষ্ঠিতভাবে আপনায় সৌন্দর্য প্রকাশ করতে। সমস্তই যে হৃদয়, সৌন্দর্য যে কাটাছাঁটা বেফা-দেওয়া গভীকটা জিনিস নয় বিশ্ববিদ্যাতা

তাই আজ এই নিরুজ্জ্বল আকাশের মধ্যে অতি অনায়াসে দেখিতে দিচ্চেন ।

তিনি বেশিরে দিচ্চেন এত বড় বিশ্ব যে এত সময়ে স্থলর হয়ে আছে তার কারণ এর অণুতে পরমাণুতে একটা একটা শক্তি কাজ করচে । সেই শক্তিকে দেখতে পাই সে অতি ভীষণ, সে কাঁটের ভাঙে টান্চে জুড়ে, সে তীব্র নৃত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক রেখাকে নিত্য নিরন্তর কম্পাঘিত করে রেখেছে, তার প্রতি পদক্ষেপের সংঘাতে যোদসী যোদন করে উঠেছে ; ভাবাদিশ্রুতব্যাকৃত মৃত্যুধাবন্তি ! যাকে কাছে এসে ভাগ করে দেখলে এমন ভয়ঙ্কর, তারই অগুণ্ড সত্যরূপ কি পরম শাস্ত্রময় স্মরণ ! সেই ভীষণ যদি সর্বত্র কাজ না করত তা হলে এই রমণীয় সৌন্দর্য থাকত না । অবিশ্রাস অনোধ শক্তির চোঁটার উপরেই এই সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত । সেই চোঁটা কেবলি বিচ্ছিন্নতার মধ্যে থেকে গাবহা, বৈষম্যের মধ্যে থেকে হৃদয়মাকে প্রবল বলে উদ্ভিন্ন করে তুলে । সেই চোঁটাকে যখন কেবল তার গতির দিক থেকে দেখি তখন তাকে ভয়ঙ্কর দেখি, তখনই তার মধ্যে বিরোধ ও বিকৃতি—কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থিতির রূপটিও রয়েছে সেইখানেই শান্তি ও সৌন্দর্য । জগতে এই দুইটাই যেমন আকাশলোভা ভাঙাচোঁটার বর্ষাকলনি এবং মৃত্যুবেদনার আর্তধ্বনি রয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্তকে নিয়ে পরিপূর্ণ সঞ্জীত অবিভাব ঘনিষ্ঠ হচ্ছে ; সেই কথাটি আজ সন্ধ্যাকালে বিশ্বকবি নিজে পরিষ্কার করে বলে দিচ্চেন—তার ভয়ঙ্কর শক্তি যে অধিময় তারার মালা গাঁখে তুলে দেই মালা

তার কণ্ঠে মণিমালা হয়ে শোভা পাচ্ছে, এতদিন এ আমরা কত সহজে কি অনায়াসেই দেখতে পাচ্ছি—আমাদের মনে তর নেই, তাবনা নেই, মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে ।

মানবলগ্নারের তেমনি একটি ভীষণ শক্তির ভেজ নিত্যনিরন্তর কাজ করচে । আমরা তার স্তিতরে আছি বলেই তার বাশ্পরাশির ভয়ঙ্কর ষাটসংঘাত সর্বদাই বড় করে প্রত্যক্ষ করছি । আদিব্যাধি দ্বিতিক দারিদ্র্য হানাহানি কাটাকাটির মতন কেবলি চারিদিকে চলছে । সেই ভীষণ যদি এর মধ্যে রূপরূপে না থাকত তাহলে সমস্ত শিথিল হয়ে বিশ্রী হয়ে একটা আকারমারতনহীন কদম্বতার পরিণত হত । সংসারের মাঝখানে দেই ভীষণের রূপলীলা চলছে বলেই তার দ্বন্দ্ব দীপ্তভেদে অত্যন্ত থেকে পূর্ণতা, অসাম্য থেকে সামঞ্জস্য, বর্জরতা থেকে সত্যতা অনিবার্যবেগে উপস্থিত হয়ে উঠে ; তারই ভয়ঙ্কর পেথনে বর্ষণে রাজ্য সাম্রাজ্য শির সাহিত্য ধর্ম কার্য উত্তরোত্তর নব নব উৎকর্ষ লাভ করে জেগে উঠে । এই সংসারের মাঝখানে আছেন মহত্তরং বজ্রমুখতং—কিন্তু এই মহত্তরকে ধীরা সত্য করে দেখেন—ঐরা আর ভয়কে দেখেন না, ঐরা মহানৌন্দর্যকেই দেখেন—ঐরা অমৃতকেই দেখেন—যে এতবিদ্রমমুতায়ে অবন্তি ।

অনেকে এমন ভাবে বলেন, যেন, প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে অভ্যর্থন আদর্শ ; যেন, যা আছে তাই নিজেই প্রকৃতি ; প্রকৃতির মধ্যে যেন উপদে গঠবার কোন বেগ নেই ; দেই জগতেই মানবপ্রকৃতি

বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক্ করে দেখবার চেষ্টা হয়। কিন্তু আমরা ত প্রকৃতির মধ্যে একটা তপতা দেখতে পাচ্ছি—সে ত সজ্জবস্ত্রের মত একই বীণা নিয়মের বোঁটাকে অনন্তকাল অঙ্কভাবে প্রদক্ষিণ করচে না। এ পর্যন্ত তাকে ত তার পথের কোন একটা জায়গায় থেমে থাকতে দেখি নি। সে তার আকারহীন বিপুল বাশ্পসংঘাত থেকে চলতে চলতে আজ মাথুবে এসে পৌঁছেছে; এবং এখানেই যে তার চলা শেষ হয়ে গেল এমন মনে করার কোনো ক্ষেত্র নেই। ইতিমধ্যে তার অবিরাম চেষ্টা কত গড়েছে এবং কত ভেঙে কেলেছে, কত ঝড়, কত প্রাবন, কত ভূমিকম্প, কত অগ্নিউজ্জ্বালার বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ পরিশুট হয়ে উঠেছে; আতপ্ত পঙ্কের ভিতর দিয়ে একদিন কত মহারণাকে সে তখনকার ঘর মেঘাবৃত আকাশের দিকে আগিয়ে তুলেছিল আজ কেবল কমলার খগির ভাণ্ডারে তাদের অম্পট ইতিহাস কালো অক্ষরে লিখিত রয়েছে; যখন তার পৃথিবীতে জলরলেব সীমা ভাল করে নির্ণীত হয় নি তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ, কত অজুত পানী, কত আশ্চর্য্য জন্ত কোন নেপথ্য গূহ থেকে এই হট্ট-রক্ত-ভূমিতে এসে তাদের জীবনীলা সমাধা করেছে, আজ তারা অর্দ্ধবাত্রির একটা অজুত স্রোতের মত কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে অস্তিত্ব হবার অবিভ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে ত যায় নি। থেমে যদি যেত তাহলে এখন যা কিছু সমস্তই বিলিষ্ট হয়ে একটা অসি-অস্ত্রহীন বিশৃঙ্খলতার অশুশকার হয়ে উঠত।

প্রকৃতির মধ্যে একটি অসিদ্ধ অস্তিত্ব কেবলি তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে চলেছে বলেই তার বর্তমান এমন একটি অস্বার্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারচে। কেবলি তাকে সামঞ্জস্যের নন্দন ছিন্ন করে করেছে এগতে হচ্ছে। কেবলি তাকে গর্ভাবরণ বিনীর্ণ করে নয় নব জন্মে প্রবৃত্ত হতে হয়। এই জন্মেই এত তপ এত বৃত্ত্য। কিন্তু সামঞ্জস্যের একটা হুমহৎ নিভা আদর্শ তাকে ছোট ছোট সামঞ্জস্যের পেটনের মধ্যে কিছুতেই হির হরে থাকতে দিচ্ছে না, কেবলি ছিন্ন করে কবে কেড়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে এই দুইটিকেই আমরা এক সঙ্গে অবিল্লিগ দেখতে পাই। তার চেষ্টার মধ্যে যে তপ, অপচ তার সেই চেষ্টার আদিত্তে ও অন্তে যে আনন্দ উই একত্র হয়ে প্রকৃতিতে দেখা দেয়,—এই জন্ত প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি অনবরত অতি ভীষণ ভাণ্ডা-গড়ার প্রবৃত্ত তাকে এই বৃহৎই হির শাস্ত নিত্যক দেখতে পাচ্ছি। এই সন্ধ্যের তপতার সঙ্গে সন্ধ্যের নিকটিক অবিচ্ছেদ্যে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে হুম্মরকে দেখা—এর একটিকে বাব দিতে গেলেই অস্তুটি অর্থহীন হুতরাং ঐহীন হয়ে পড়ে।

মানবসংসারে কেন যে সবদমরে আমরা এই দুইটিকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পারিনে তার কারণ পূর্বেই বলেছি। সংসারের সমস্ত বেদনা আমাদের অত্যন্ত কাছে এসে বাজে; যেখানে সামঞ্জস্য বিনীর্ণ হচ্ছে সেই-খানেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে কিন্তু সেই

সমস্তকেই অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিয়ে
বেখানে অনন্ত সময়ের বিলাস করতে সেখানে
সহজে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এমনি কবে
আমরা সত্যকে অঙ্গুর্ণ করে দেখতি বলেই
আমরা সত্যকে হৃদয় করে দেখতিনে,
সেই ক্ষেত্রেই আবিঃ আমাদের কাছে আবিস্কৃত
হচ্ছেন না, সেই ক্ষেত্রেই সত্যের দক্ষিণ মুখ আমরা
দেখতে পাচ্চিনে।

কিন্তু মানবসংসারের মধ্যেই সেই
তীব্রকে হৃদয় করে দেখতে চাও ? তাহলে
নিজের বার্ষিক ছয়টিপুচালিত ক্ষুদ্র জীবন
থেকে দূরে এস। মানবচরিত্রকে বেখানে
বড় করে দেখতে পাওয়া যায় সেই
মহাপুরুষের সামনে এসে দাঁড়াও। ঐ
বেশ শাক্যসিংহের তপস্বী। তাঁর পুণ্য-
চরিত্র আজ কত ভক্তের কর্তে কত কবির
গাথার উজ্জারিত হচ্ছে—তাঁর চরিত্র ধ্যান
করে কত মনোহর! ব্যক্তিরও মন আজ মুগ্ধ
হয়ে থাকে! কি তার দীপ্তি, কি তার
শৌন্দর্য, কি তার পবিত্রতা! কিন্তু সেই
জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ
করে দেখ! কি হৃৎসহ! কত হৃৎসহের দক্ষিণ
মুখে ঐ সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে!
সেই হৃৎসহলিকে বস্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত
করে দেখানো যেত তাহলে সেই নিষ্ঠুর দৃষ্টে
মাহুদের মন একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে যেত।
কিন্তু সমস্ত হৃৎসহের সঙ্গে সঙ্গে তার আশিতে
ও অস্ত্রে যে ক্রমান্বয়ে আছে তাকে আমরা
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলেই এই চরিত্র এত
হৃদয়, মাহুদ এ'কে এত আদরে অঙ্গুরের
মধ্যে গ্রহণ করেছে।

ভগবান ঈশাকে দেখ। সেই একই

কথা। কত আশা, কত বেদনা! সমস্তকে
নিরে তিনি কি হৃদয়! শুধু তাই নয়;
তাঁর চারিদিকে মাহুদের সমস্ত নিষ্ঠুরতা,
সঙ্কীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিত্রবৃত্তির
উপকরণ;—পক্ষকে পক্ষ বেদন সার্থক করে
তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অবলম্বকে তিনি
আপনার আবির্ভাবের দ্বারা সার্থক করে
দেখিয়েছেন।

তীব্র শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আজ
আমরা যেমন এই সঙ্কীর্ণতায় শক্ত হৃদয়
করে দেখতে পাচ্ছি, মহাপুরুষের জীবনেও
মহাদুঃখের তীব্র লীলাকে সেই রকম সূত্র
করে হৃদয় করে দেখতে পাই। কেননা
সেখানে আমরা হৃৎসহকে পরিপূর্ণ সত্যের
মধ্যে দেখি এইজন্য তাকে হৃৎসহকে দেখিনে,
আনন্দরূপেই দেখি।

আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে,
কতের যে দক্ষিণ মুখ তাই আমরা দেখব,
তীব্রকে হৃদয় বলে জানব, মহত্ত্বং বজ্র-
মুগ্ধতাং বিনি, তাঁকে ভরে নয়, আনন্দে,
অমৃত বলে গ্রহণ করব। প্রিয় অগ্রিয়,
হৃৎসহ, সম্পদ বিপদ সমস্তকেই আমরা
বীণের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমস্তকেই আমরা
কুমার মধ্যে অধঃ করে এক করে হৃদয়
করে দেখব। বিনি কহান্নাং তহঃ তীব্রং
তীব্রান্নাং তিনিই পরমহৃদয় এই কথা নিস্তর
মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই হৃৎসহেবস্ত্র
ভাঙাফড়ার সংসারে সেই কতের আনন্দলীলার
নিজস্বচরিত্র হবার জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হচ্ছে
থাকুক—নকুল, ভোগেও জীবনের সার্থকতা
নয়, বৈরাগ্যেও নয়। মটলে সমস্ত হৃৎসহ
কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা

দৌন্দর্য্যকে যখন আমাদের চর্ছল আশ্রমের উপযোগী করে ভোগস্থলের বেড়া দিয়ে বেটন করব তখন সেই দৌন্দর্য্য ভূমিকে আশ্রিত করতে থাকবে, আপনার চারিদিকের সঙ্গে তার সহস্র স্বাভাবিক যোগ নষ্ট হয়ে যাবে—তখন সেই দৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে বিকৃত হবে কেবল উগ্রগন্ধ মানকতার স্রুটি করবে, আমাদের গুণ বুজিয়ে ফলিত করে তাকে ভূমিদাত্য করে দেবে—সেই দৌন্দর্য্য ভোগবিলাসের বেটনে আমাদের সকল পেকে বিচ্ছিন্ন করে কলুণিত করবে, সকলের সঙ্গে

সরল সম্বন্ধে মুক্ত করে আমাদের কল্যাণ করবে না। তাই বলছিলাম হৃদয়কে জানার ক্ষেত্রে কঠোর সাধনা ও সংযমের পরকার, ঐশ্বর্য্যের মোহ থাকে হৃদয়ের বলে জানার সে ত মরীচিকা। সত্যকে যখন আমরা হৃদয়ের করে জানি তখনই হৃদয় করে সত্য করে জানতে পারি। সত্যকে হৃদয় করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্বল, যার জন্ম পবিত্র, বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না।

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

নির্বাসন-কাহিনী। ঐযুক্ত মনোজ্ঞান গুহ ঠাকুরতা গণীত। একাদশ, ঐযুক্ত বিহারজ্ঞান গুহ ঠাকুরতা। খ্রিষ্টাব্দ। মূল্য আট আনা মাত্র।
নির্বাসনকালে লেখকের অন্তরে বাহিরে যে যে অবস্থা ঘটছে, তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র লেখক এই গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন। বর্ননা শুভী যেমনই সরল, বিবরণটুকুও তেমনই চোখুহলোকাগমক। এমন বিপর্য্যে বসিলে যবের উজ্জ্বল অন্তঃই একটু হাল্কা ছাড়াইয়া পাঠকের ক্রান্ত পীড়িত করিয়া তুলে, কিন্তু মনোজ্ঞান বাহু কোথাও ভাবান্তরণে অসম্মত হন নাই, তাহারই কলে পাঠক বহিঃপাণি উপভোগের মতই একান্ত আগ্রহে পড়িয়া ফেলিবে—কোথাও বিরক্তি ধরিতে না। সত্যায় কোম কৃত্রিমতা নাই, আড়ম্বর নাই—বল শুধু স্বরূপে তাহার আন্তরিক কথাগুলি লেখক গুহাইয়া বলিয়া গিয়াছেন। বহিঃপাণি উপভোগ্য।

ভারতীয় বিদ্রূপী। ঐযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কাব্যিক গ্রন্থে মুদ্রিত।

ইতিহাস পাঠকগণিঃ হাউস হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য মণ আনা মাত্র। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আশ্রয় কথোই প্রকাশ্যে করিয়াছিলেন, এখনও তাহার অতিরিক্ত পরিচয় বড় কিছু নাই। এই সংস্করণে বহু স্থল পরিমার্জিত ও পরিমার্জিত হইয়াছে তাহার ফলে উপবেশতা কথোই বর্ধিত হইয়াছে, এবং বহু অপূর্ণ-প্রকাশিত বিদ্রূপ পরিচয় সুসুহীত হইয়াছে। এ গ্রন্থের উপকারিতা সন্দেহে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

ভেলোদের চণ্ডী। ঐযুক্ত অতুলচন্দ্র মল্লোপাধ্যায় প্রণীত। একাদশ, সিন্ধুক সোসাইটী। বিবর্তন গ্রন্থে মুদ্রিত। মূল্য বাহো আনা মাত্র। চণ্ডীর কাহিনীটি লেখক বেশ গুহাইয়া শিখিয়াছেন—অনেকগুলি রচনা ভিত্তিরে সমাবেশে ভেলোদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। তবে তাহার প্রাথমিকভাষণ বোধটুকু পরিচয় করিলে ভাল হয়। প্রথমে ছাপা কামত ও বাবাই বেশ পরিপাটি হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব পর্যা।

চন্দন ।

লীনার কাহিনী । (পূর্বাশ্রয়িত)

১২ ডিসেম্বর, ১৮৭০

তুমি বড় লক্ষী, তুমি আমাকে নোদী করনি; আমার প্রতি তোমার কি গভীর ভালবাসা তা তোমার পরে বেশ প্রকাশ পায়। প্রাণের সখি বেতিনা, তোমাকে পত পত ধন্যবাদ। তুমি আমাকে খুব সহ উপদেশ দিয়েছ; সে উপদেশের মর্গাম্বা আমি বেশ অনুভব করছি। সেই উপদেশ অনুসারে চলবার চেষ্টা করব;—সত্যি চেষ্টা করব। কিন্তু পাব কি? কিন্তু বড় দুর্ভাগ—বড়ই দুর্ভাগ।

গত বঙ্গের গ্রীষ্মকালে, একটি গোক মারা যায়। তার স্ত্রী তিনটি অনাথ শিশু সন্তানকে নিয়ে এখন একেবারে নিরুপায়। আজ প্রাতে সেই যেচরীর জন্ত কতকগুলি পুরাণো কাপড় নিয়ে গিয়েছিলুম। সে আমাকে বলে,—‘হ দিন হ’ল, একজন কল্যাণী পেনা-নারক তার কাছে এসেছিলেন। তার পোচনীর অববাসবন্ধে অনেক লিজাসাবাদ করে’ বেশ একটা খোকা টাকা তাকে দিয়ে গেছেন। আমি তাকে লিজাসা করলুম, সে পেনা-নারকের নামটা কি; সে তার নাম জান্ত না। কিন্তু সে ধেরকম তাঁর বর্ণনা করলে, তাতে তিনি কাণ্ডের গাণ্ডিয়ে বলেই মনে হল। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি পূর্বাশ্রয়ে কাণ্ডেমের কাছে সেই হতভাগিনীর অবস্থার কথা বলেছিলুম, তিনি সে লক্ষ্যে কিছুই বলেননি, কিন্তু এটা আমি লক্ষ্য করছিলাম, তিনি আমার

কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। আজ রাতে ভোজনের সময় আমি তাঁকে বসুম, আমার আশ্রিতা বিধবাটির জন্ত আপনি যা করেছেন, তার জন্ত আপনাকে ধন্যবাদ। তাঁর দুখ লক্ষ্যের লাল হবে উঠল।—“কোন আশ্রিত বিধবা? তার জন্ত আমি কি করেছি?”—এই কথা তিনি একটু অব্যবহারে বলেন। আমি বসুম—যার কথা আমি বলছি আপনি বেশ জানেন। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে, অজ্ঞ কথা পাড়লেন। আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি বেতিনা, কাল থেকে আমি খুশী হই হইছি; হুণী এই মনে করে যে, আমার হুমনেই একটা সংকরণে বিশিত হয়েছি। হার! এতে আনন্দ প্রকাশ করাও কি আমার পক্ষে নিষিদ্ধ? শুধু তা নয়। আমি ভাবছিলাম,—এই রকম মনে করে আমি যে রকম হুণী হয়েছি, হয়ত তিনিও এই রকম মনে করে’ হুণী হয়েছেন। আমি ঐ হতভাগিনীর জন্ত ভাবি বলে, হয়ত তিনি ঐ জন্তই তার সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। আমার ‘এক অদ্বিত কল্যাণ! তিনি কি দ্বাভাবিক দয়ার বশবর্তী হয়ে এ কাজ করতে পারেন না? অজ্ঞ কারণ বর্ণালে, তাঁর পুণ্যের লাভন করা হয় না কি? কিন্তু সে বাই হোক, যদি সেই জন্ত কারণটা সত্যি হয়, তাহলে, সখি, তাতেই আমার স্বর্ণ-স্বপ্ন।

২২ ডিসেম্বর

তুমি ঠিক বলেছ; এই প্রেম একটা স্বপ্ন বই আর কিছুই হতে পারে না।

বিবাদময় আগরগের পরেও এই স্বপ্ন আমাকে অতুলন করবে, তুমিই মতমই আমি সব বুঝি; আমি এটাকে মারাবিষয় বলেই জানি। কিন্তু এই বিস্ত্রমেণ প্রোভে ভেগে না যাওয়ার বল আমার নেই। কয়েক সপ্তাহ আমি খুব সুখে ছিলাম—সিঁটাই খুব সুখে ছিলাম। আমি জানি পরিণামে আমি নিশ্চয়ই কষ্ট পাব, তবু সেই কষ্ট পরিহারের মূল্যে আমার জীবনের ঐ কয়েক সপ্তাহ বিক্রয় করতে আমি ইচ্ছা করিনে।

গত সাত্রে, এই প্রথমবার, ক্যাপ্টেন গার্নিয়ে আমাদের সঙ্গে ঠেঁককথানা ঘরে ছিলেন; আর এই প্রথমবারই আমাকে গান গাইতে অগ্রোধ করেছিলেন। আমি পিগানোতে গিয়ে বসলাম; আমার জ্বর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল; আমাকে একটা-কিছু কববার লজ্জা অগ্রোধ করেছেন। আমি একটা ইটালীয় গান গাইলাম—তারপর একটা ধর্মের গান গাইলাম। ভাবের আগে আমার কণ্ঠের একটু কপিত হল। গোধ হর ভাতেই গানগুলি আরও একটু মর্যপণী হয়ে উঠল। গার্নিয়ে আমার পিছনে, চিম্পার দক্ষিণে একটা কেদারায় বসেছিলেন। ইটালীয় গানটা গাওয়া হয়ে গেলে, তিনি একেবারে নিশ্চল হলেন; তারপর সেই ধর্মের গান। তিনি বললেন:—“কি চমৎকার ভাবের উজ্জ্বল!” আরও তিনি এই কথা বললেন:—“আপনি যেমন সমস্ত প্রাণ দিয়ে, দরদের সঙ্গে এই গানটি গাইলেন একপ আর কোথাও তানি; আপনাকে ধন্যবাদ; সঙ্গীতের কি বোহিনী নকি, আজ যেমন বুলুণ, একপ আর

কখনও বুঝিনি।” এই কথাগুলি আমার কাণে ও আমার জন্মের ঘেন মধু ঢেলে দিলে। তাই তাঁর কথাগুলি অবিকল উদ্ধৃত করে দিলাম। ওপেক্ষে আমার গর্ভের ভাব মনে আসিল। আমি বেশ জানি আমি সঙ্গীতের একজন ওস্তাদ নই; কিন্তু এ আমি বেশ জানি, তিনি যা আমাকে বললেন, তাই তাঁর সাক্ষরিক বিশ্বাস; যেহেতু যের তিনি কথাগুলি বলেছিলেন, তাতে জ্ঞান হবার জো নেই। তবে হরভো... না, তা নয়, তা নয়, তবু আমার কণ্ঠেরে তিনি পূর্ণী হয়েছিলেন, আর আমার গান গাওয়াটাও নেহাৎ মন্দ হয়নি।

৩৪ ডিসেম্বর।

আমি কি সুখী হয়েছি! এই পুটমাগ-দিনের জ্বরের স্মৃতিটা বরাবর থেকে বাবে, আমার মন থেকে কখনই অপনীত হবে না। পুটমা-বুড়ী আর আমি দুজনে মিলে একটা ছোট পুটমাগ-গাছ নানাপ্রকার টুকিটাকি জিনিস ও খেলনাতে বিভূষিত করে রেখেছি। আজ সাতাহলে, ছেলেরের বাপ মারা গেলে ছেলেরের পাঠাবে তাদের লজ্জা এই অগোচর। আমার কাণ, আমার পুটুতুতো ভগিনী আগাগু ও দেবীকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আজ সকালে ক্যাপ্টেন আমাদের বরেন, যদি তিনি সারাক্ষ-ভোজনের সময় বাড়ীতে না থাকেন তাহলে আমরা যেন তাঁকে ক্ষমা করি। তিনি যে বাড়ী থাকবেন না, তার দুই কারণ হতে পারে। তিনি হয়ত মনে করছেন, তিনি থাকলে উৎসবটা বিবাদময় হয়ে উঠবে, কিংবা মনে করছেন, এই উৎসবে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে

শোভন হবে না। আমার মনে হয়, আজ খুইমাসের বাড়িটা তিনি নির্ধনে কাটাবেন; তাই আমার মনটা খাপ খাচ্ছে। অপরদিকে, আমি বাগানে নামলুম। কয়েক সপ্তাহের বৃষ্টিবাহনের পর আজ পরিষ্কার হয়েছে, নীল আকাশে সূর্য্য উজ্জল কিরণ বর্ষণ করছে। বাতাসটা বেশ মিঠে; মনে হয় যেন বসন্তকাল। কাশ্মির গানিরকে ঝড়ের গলি দিয়ে যেতে দেখলুম। যে ধরকার সম্মুখে নদীর দৃষ্ট, তিনি সেই ধরকার দিকে গেলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে অভিযান করলেন। আমি কোন রকম ভাবনা-চিন্তা না করেই তাঁর নিকটে গেলুম। তিনি একটা বড় ভালগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে বললুম :—“আজ রাত্রে, এই প্রথমবার, আমার মনে খুইমাসের আনন্দের সঙ্গে একটা বিবাহ এসে মিশ্রিত হবে। আমার মনে হবে, আমরা ভাগ্যক্রমে যে অভিযিকে পেরেছিলাম, খুইমাসের দিনটা এসে তাঁকে আমাদের বাড়ী থেকে দূরে নিয়ে যাবে; আর তাঁর পক্ষেও আজকের দিনটা অতদিনের চেয়ে আরও খোর অক্ষর বলে মনে হবে।” গানিরে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে, পরে আমাকে এই কথা বললেন : “কিন্তুতেই যেন আপনার আনন্দের ব্যাঘাত না হয়; আপনি যে কথাগুলি বলেন, সেই কথাগুলিই আমার আজকের দিনের সমস্ত বিবাহ অপনোত করবে।” আর একটুক্ষণ তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পরে আমাকে এই কথা বলে প্রস্থান করলেন :—“আজ তবে বিবাহ হই, কাল দেখা হবে।” “আপনার কথাগুলি,

আমার আজকের দিনকার সমস্ত বিবাহ অপনোত করবে”—এই কথাগুলি আমি ক্রমাগত আবৃত্তি করছি। আমার মনে এই কথাগুলির কি মধুর প্রতিধ্বনি হচ্ছে! কি অলম্ব্যগের স্বরে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন। আর তাঁর দৃষ্টিতেও কি মধুর্য্যই প্রকাশ পাচ্ছিল! একথা বোলানো, প্রিয়সখি,—তাঁর কথাগুলিতে কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেরেছে; তুমি যদি তাঁর কণ্ঠস্বর ও চাহনী লক্ষ্য করে দেখতে, তাহলে ও কথা বলতে না। তাহাড়া, উত্তর দেবার আগে ওরূপ নিস্তব্ধতা কেন? আমার উত্তর দেবার পূর্বেও কণ্ঠকের মত একটু ইতস্তত ভাব, তার পরেই হঠাৎ প্রস্থান—পাছে আরও কিছু বলে ফেলেন এই ভয়ে। না, না, আমি ভুল বুঝিনি; আমি শপথ করে বলছি, আমি ভুল বুঝিনি। আমি চক্ৰ বৃত্তিত করে, এখনও যেন সেই ভাল-ভরসার তগীর আমার সম্মুখে তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তিনি যখন কথা কচ্ছিলেন, অজগামী সূর্য্যের আলো তাঁর মুখের উপর পড়েছিল, আর সমস্ত উদ্ভানটি জীবন ও উল্লাসে যেন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ওরে ক্ষুদ্র উদ্ভান। শীতকুহুতে হস্তপ্রী হরও আমার চক্ষে আজ তুই বৈরাগ্য হ্রস্ব, তোর বসন্তকালে সেই হরিত ক্ষেত্র, তোর সেই তরুজালের হাতমর শাখাপল্লব, সেই বিচিত্র বর্ণের সুস্বাদুশাশি, এসমস্ত মিলেও তোকে এক হ্রস্ব করতে পারেন। আজ তুই আমার মূঢ় মেয়ের সম্মুখে, মূঢ় চিত্তের সম্মুখে বৈরাগ্য উল্লাসময় হয়ে উঠেছিল, তোর সেই বসন্তকালের পানীর ক্রন্দন, সেই আলির গুহ্মনেও

তোকে এত মধুর
হয়নি!

২৬ ডিসেম্বর

তিনি চলে গেলেন...আজ তিনটের সময়
হুতুম এসেছে। একজন সৈনিক সেই হুতুম
নিরে এসেছে। তখন আমি বাড়ীতে একলা
ছিলুম। সে এই কথা বলে আমেরপত্র-
খানা আমার হাতে বিলে,—“এই চিঠি ফরাসী
ক্যাপ্টেনের লেখা”। আমি জানতুম না এ পত্রে
কি আছে, তবু পত্রখানি দেখে আমার মনটা
আঁহুর হল। একটু পরেই, গার্মিগে এলেন;
আমি সেই পত্র তাঁকে দিলাম। আমি তখন
আমার কাকার সঙ্গে বৈঠকখানা-ঘরে ছিলাম।
গার্মিগে কাকাকে বলেন,—“ভাঙ্কার, আমি
কাল চলে যাচ্ছি; সমস্ত ফরাসী সেনানায়ক
এই নগর ছেড়ে চলে যাবে; তাদের লজ্জা
লজ্জা বাবা নির্দিষ্ট হয়েছে।” আমি আর
ধাড়াতে পারছিলাম না; পাছে পড়ে পাই এই
লজ্জা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রইলাম। কাকা
জিজ্ঞাসা করলেন—“এই নতুন বাবাটা
কোথায়?”—“তা আমি জানি না”। আমার
কাকা ছ-চার পা চলে হঠাৎ ধমকে ধাড়া-
লেন, আর গার্মিগেকে এই কথা বলেন,—
“ক্যাপ্টেন, যদি আমার বাড়ী থেকে মুক্তি
লাভ করে তুমি দেশে ফিরে যেতে তাহলে
তোমার প্রস্থানে আমি থুঁদী হুতুম; কিন্তু
যখন তা হচ্ছে না, তোমাকে বিদায় দিতে
আমার কষ্ট হচ্ছে।” একটু দৃঢ় অথচ চাপা
স্বরে ক্যাপ্টেন উত্তর করলেন,—“ভাঙ্কার
মহাশয়! আপনাকে ধন্যবাদ”। তার পর, তাঁর
নিজের কামরায় ঢুকলেন, সমস্ত দিন কামরা
থেকে আর বেরোলেন না। রাত্রির ভোজনের

সময় সবাই নিশ্চল। সন্ধ্যার সময়, অর্থাৎ
দশটাকাল তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন।
যেন এত অলস? তিনি আমাকে গান
করতে অনুরোধ করলেন না; তাগিয়া করেন
নি আমি বেশ বৃষ্টি পেয়েছিলাম, গানের
একটা কথা গাইলেই চোখের লগ্নে আমার
বৃষ্টি ভেঙ্গে যেত...তবু—তবু...আমার ইচ্ছা
হচ্ছিল, তিনি গাইতে আমাকে যদি একবার
অনুরোধ করেন।

কাল তিনি চলে গেলেন। এ কি সম্ভব?
হায়! যন্ত্র ভেঙ্গে গেল, এর মধ্যেই ভেঙ্গে গেল!
গত কল্যাণের সেই দিন—আর তার পরেই
কিনা...হা ভগবান! আমার বৃষ্টি ভেঙ্গে
যাচ্ছে। কাল, মধ্যাহ্নে! তিনি আমাকে
একটি কথা না বলেই চলে গাবেন?

২৭ ডিসেম্বর

তিনি চলে গেছেন! ওরা তাঁকে কোথায়
নিরে গেল? আমি তা কিছুই জানি নে,
কখনও যে জানতে পারব তাও মনে হয় না।
যাও তাঁর প্রতি উপাশী, তাইই তাঁকে
দেখবে, তাঁর সঙ্গে কথা কবে। তাদের
মধ্যেই তিনি থাকবেন; হয় স্থায়ী হবেন, নয়
স্থায়ী হবেন। আর আমার সঙ্গে তাঁর জন্মের
মত বিচ্ছেদ! এই কয়েক ঘণ্টা মাত্র তিনি
এখান থেকে চলে গেছেন, কিন্তু আমার মনে
হচ্ছে যেন এক শতাব্দী!

রায়ে নিজা হয় নি, দুঃখকষ্টে গাতিটা
কাটিয়েছি, আজ সকালে উঠে আমার ঘরের
জালার ধারে গেলুম। আকাশ আবার তার
সেই নীরব অবস্থার পরেছে, আর দরক-দরক
কোড়ো বাতাস উঠে দৌঁ-দৌঁ শব্দ করছে। আমি
বাগানে নেমে এসেছি। হায়! আজ বাগানটির

কি উদাস ভাব, কি উদাড় ভাব, কি পরিবর্তন! আমি বাগানে আশ্বস্তি কাল ছিলুম; আমি তাঁর জন্ত প্রতীক্ষা করছিলাম; হ্যাঁ, আমি তাঁরই প্রতীক্ষা করছিলাম। আমি তোমার কাছে একথা স্বীকার করছি। আমি ত বলছি, তোমার কাছে আমি কোন কথাই লুকোবো না। আমি প্রত্যাশা করছিলাম, তিনি আসবেন। তিনি এলেন না। তবে কি সেদিন, তাঁর কণার, তাঁর কণ্ঠ-স্বরে, তাঁর দৃষ্টিতে আমি তুমি বুঝেছিলাম? হ্যাঁ! তাই বটে; আমার স্বপ্নই ভালোবাসার মোহে, ঐশ্বর্যের মন-গড়া অর্থ করেছিল। আমার গুণগত লক্ষিত হয়ে আমার ঘরটিতে আমার প্রবেশ করলাম।

মধ্যাহ্নে, কাল্পনিক গার্মিষের ট্রেনে পৌঁছ-বার কথা। আমরা ১১টার সময় আহা করলাম। ভোজনের সময় তিনি কাকার সঙ্গে বেশ স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা কটিলেন। তবু আমার মনে হচ্চে, সন্ধ্যার ঠাঁকে বেরকদ দেখা যায়, তার চেয়েও যেন বেশি পাণ্ডুর। নিশ্চয়, এটাও আমার একটা বিভ্রম। পৌনে বারোটোর সময়, “কুরোন” নামক পাহালাদ একজন ভ্রাতা তাঁর তোরঙ্গ বাগ্ আদি নিতে এল। আমার কাকাকে তিনি বলেন, “বিদায় হলুম ডাক্তার মহাশয়, আপনার এই হৃৎকথা অভিযন্ত্রিত প্রতি আপনার যথেষ্ট কৃপাশ্রী ছিল, আপনাকে ধন্যবাদ।” কাকা গমগম করে উত্তর করলেন “যেখানেই যান ঈশ্বর যেন আপনার সঙ্গে থাকেন।” তার পর কাল্পনিক আমার দিকে ফিরে বলেন, “আপনার কাছেও বিদায় হলুম।” আমি কিন্তু তার উত্তরে বলতে পারিলাম

না, “আজ্ঞা তবে আনন্দ,”—এইকু বগও আমার ছিল না। আর কর্মফলের জন্ত হাত বাড়াতোও সাহস হল না। তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। কাকা ও সুইসা, রাস্তার দরজা পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এল, আর আমি বৈঠকখানা ঘরের জানলার মাঝে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাঁকে দেখতে লাগলাম। আমার মনে হতে লাগল, আমার জন্ম যেন আমাকে ছেড়ে তাঁরই অঙ্গুলন করেছে। সন্ধ্যার চেয়ে এখন আকাশটা আরও ঘোর হয়ে এসেছে, ঝুটি পড়ছে। সেই তরল সেনা-নারককে যেদিন গোর দিতে নিয়ে যাচ্ছিল আজ অনেকটা সেই দিনকার মত। হ্যাঁ! যেদিনা এখন আমার মরণ হলেই ভাল।

(গার্মিষের বিদয়া নাতার প্রতি গার্মিষের পত্র।)

২৮ ডিসেম্বর ১৮৭০

মা,

আমি স...রে পৌঁছেছি। অশ্রুত সাম-রিক কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে সমস্ত ক্রান্তী সেনা-নাশক, যত দিন না দেশে ফিরে যাবার অনুমতি পায়, ততদিন আমি এইখানেই বাস করব। আমার গভকলা মধ্যাহ্নে, ব...হতে ছেড়েছি।

আর সেখানে না যাওয়াই আমার পক্ষে ভাল। আমি কখন কিছু তোমার কাছে লুকোইনি। আমি তোমাকে ঠিক কথা বলব। কখন কখন আমার পক্ষে, ডাক্তার র—এর মেয়ে কুমারী শীতার কথা তোমাকে লিখেছি। মা, তুমি যদি তাকে একবার দেখতে, তার কি চমৎকার রূপলাবণ্য, তার মনটা কি স্নান, কি নির্মল। আমি তাকে ভালবেসেছিলাম, এখনও ভালবাসি। তার

প্রতি আমার বেরকম মনের ভাব, সেই রকম মনের ভাব তার মনেও কি আমি উদ্ভেক করতে পেরেছিলাম ? না আমার কর্তব্যবুদ্ধি ভ্রমণ চেষ্টা করতে আমাকে নিবারণ করেছিল । সেই কুমারী আমার পত্নী কখনই হতে পারেন না । তাঁর কাকা কখনই তাঁকে একজন ফরাসীর হাতে সমর্পণ করতেম না । আর আমার জন্মভূমির রূপে থেকে আমি একটা মত্ সুখলাভ করলাম, একথাটি কি আমার মনের ত্রিশীমার আস্তে দিতে পারি ? এ সুখ-লৌভাগ্য যদি আমি গ্রহণ করতুম, তাহলে আমার মনে হত আমি জন্মভূমির একজন বিধবাসন্তক সন্তান । তাই আমার ভালবাসা আমার অন্তরের মধ্যেই বন্ধ করে রেখেছি ; আর আমি আশা করি একথা কুমারী ল... কখনই জানতে পারেন নি । কেবল একবার, —আমার সেখান থেকে চলে আসবার দুদিন

আগে,—আমার মন একটু হুঁসল হয়ে পড়েছিল, আর আমার প্রতিদ্বন্দ্ব মনে হচ্ছিল, এইবার বুদ্ধি আমার মনের কপাটা প্রকাশ হয়ে পড়বে । যাহোক ঐখবরের কপার আমি সেই সময় কোন প্রকারে বাকসংবদ করতে পেরেছিলাম । হায় ! কাল বিদায় নেবার সময় কত কষ্টে যে আমার কর্তব্যের দৃঢ়তা রক্ষা করেছিলাম, কত কষ্টে যে আমার চোখের জাব গোপন করেছিলাম তা আর কি বলব । আমি হাওট পথায় বাড়ালুম না পাছে কয়-মর্দনের সময়, আমার অন্তরের কথাটি প্রকাশ হয়ে পড়ে । জীবনে এমন কতকগুলি মুহূর্ত আসে যা বড়ই নির্ভর মা ! আমি বড় কষ্টে পাচ্ছি, বড় কষ্টে পাচ্ছি । তোমার কাছে এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই । কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাক,—আমি একজন নৈনিক । জন্মভূমির তুল সন্তান !

জীবোত্তিরিক্তনাথ ঠাকুর ।

মির্জার স্বপ্নদর্শন ।

(জ্যোতিষ জ্যোতিষ রচিত 'জিন্দা অব মির্জা'র অনুবাদ ।)

[প্রায় কারোতে অবস্থানকালে কতকগুলি পূর্ণ-মেনী পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হইয়াছিল । সেগুলি এখনও আমার নিকটে আছে । তাহার মধ্যে 'মির্জার স্বপ্নদর্শন' শীর্ষক একখণ্ডি পুস্তক পুস্তক পাঠ করিয়া আমি গরব দস্তোলাভ করিয়াছি । সাধারণের মনেরজনকারী বিষয়ভূতের অভাবে আমি সেই স্বপ্ন বিষয়গুলি সাধারণে প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছি । এখন বয় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার এটি কথার অনুবাদ করিয়া দিতেছি ।]

"বংশপরম্পরাগত এখানুগারে ভ্রমণকের পক্ষীয়

দ্বিন আমি অতি শুদ্ধাচারের সহিত যাপন করিতাম । সর্বাঙ্গ ঐক্য করিয়া প্রাণত্যাগ দয়াদয় করিতাম । তাহার পর, দ্বিষের অবশিষ্ট ভাগ চিত্তা ও পশুপাশ-দমার অভিযাচিত করিবার অভিচারে বোশাবের পৈলপুস্ত্রে আরোহণ করিতাম । পৈলপুস্ত্রোপরি বাহু সেবন করিতে করিতে মনুষ্যজীবনের অসারতা লক্ষ্যে প্রগাঢ় চিন্তার মগ্ন হইতাম এবং চিন্তা করিতে করিতে মনে হইত,—'মহুবা হাফাওরপ, মনুষ্যজীবন নীর্থকালব্যাপী একটি হুঃখ' ।

"একদিন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যজীব

পাহাড়ের পূর্বদিকে আবার দুটি নিপতিত হইল।
বেথিলান, যেখানকেই বেথবাধী এক ব্যক্তি, যত্নে
একটি পুত্র বন্দী ধারণ করিয়া, সেই পুত্রোপরি
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতি দুটিপাত
কিবাযাত্রা তিনি বন্দীটি অধঃসল্য করিয়া
বাধাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বন্দীজনী করিয়া
অতি মধুর শিথিল হ্রস্ব সঃসূক্ত অধঃসল্যের স্তম্ভিত
সজীত লহরী স্রুতি করিতে লাগিলেন। এতদুপ সজীত
আমি জনন ভনি নাই। আমি বিদোহিত হইলাম।
বর্জনিত ব্যক্তিগণ পতাসু হইলে তাঁহাদের আত্মা স্বর্গা-
রোহণ সময়ের বেকশ বন্দীর সজীত বাহা উপবেশিত হইলে
তাঁহাদের সূতাকালীন মগ্নগায় 'ভুত' বিনষ্ট হয় ও
তাঁহারা স্বর্গপ্রাপ্যোক্তাধের অধিকারী হন, সেইজন্য
সজীতের কথা আবার মনে পড়িল। নিরতিশয় আনন্দে
আবার জ্বর গলিয়া গেল।

"আমি ভূনিয়াহিলাম ঐ পাহাড়ে কোন সূতযোনির
আশাসন্যান আছে। অনেক ঐ পাহাড় অতিক্রম করিবার
সময় সজীত শ্রবণ করিয়াছেন, ইহাও ভূনিয়াহিলাম।
কিন্তু সজীতকবীকে কেবল বর্জন করিয়াছেন, এ কথা
কাহারও মনে ভনি নাই। সজীত শ্রবণ করিয়া আর
বিস্তৃত হইয়াহিলাম সূতরাং তাঁহার সহিত কথোপ-
কথনজনিত প্রথ মন্তোপার্ণ আবার তিত আঁহির হইয়া
উঠিল। আমি বঙ্গানিষ্টেও স্তার তাঁহার প্রতি এক-
দুই চাহিয়া আছি বেনিরা হত সত্যানুপূর্ণক
তিনি যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেই স্থানে অঙ্গন
হইতে আমাকে সংকেত করিলেন।

"প্রশ্নাত ভুক্তিভাষে আমি কীরে কীরে তাঁহার
সম্মুখিটখর্তী চইলাম। তাঁহার চিত্তহারা
বন্দীদ্বায়ন শ্রবণ করিয়া আমি এতদুপ সূত হইয়াহিলাম
যে তাঁহার সখীপদ হইবাযাত্রা আমি তাঁহার পদতলে
নিপতিত হইয়া রোহণ করিতে লাগিলাম। তিনি
প্রশ্নাত ও অস্বাভিকভাবে ইবং ব্যক্ত করিলেন। পূর্ণে
যে বনিটানকা করিয়াহিলাম, তাঁহার সূত ও সৈন্য
ভাব দর্শনে ভাষা একেবারে বিবৃতিত হইল—এবং
তাঁহাকে চিত্তপরিচিতির সত মনে হইতে লাগিল।
তিনি হস্তধারণপূর্ণক আমাকে তাঁহার পদগাত হইতে

উত্তোলন করিলেন। বলিলেন, 'নির্দী, আমি তোমার
নিভৃত চিত্তার সিন্দ অবগত আছি। আবার অনুদয়ন
কর।'

"তিনি পথপ্রদর্শনপূর্ণক আমাকে সর্দোক্ত পূর্ণত
পূর্বে লইয়া গেলেন। বলিলেন,—'পূর্ণবিত্তে দুটি
পাত করিয়া কি কি বিবরণ তোমার নরনখোচর হয়
ভাষা আমাকে বল।' আমি বলিলাম,—'একটি সূতযোনি
উপত্যকার মধ্য দিয়া একটি মনো ভরসভয়ে প্রবাহিত
হইতেছে।' তিনি বলিলেন,—'তুমি যে উপত্যকা
দর্শন করিলে, উহা হুঃ-উপত্যকা এবং সে
প্রবাহিনী মনো সম্মর্শন করিলে, উহা অনন্ত কাল-
প্রোক্ত।' আমি বলিলাম,—'ঐ মনো, এক প্রোক্ত
যন সূতযুক্তিকার মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছে এবং
অপর প্রোক্ত সূতযুক্তিকার মধ্য অদৃষ্ট হইতেছে, তাঁহার
কারণ কি?' তিনি উত্তর করিলেন,—'মনীর
পতিভূতমানে অংশ অনন্তকালের সে ভাব সূতের
পতিভাষা নিপতিত হয় তাহাই। ঐ সময় পূর্ণিবার
প্রায় ও প্রলয়ের মধ্যবর্তীকাল।'

"সূতযোনি বলিতে লাগিলেন,—'উত্তর পার্বে
তিনিয়াজর এই মনু পরিদর্শন করিয়া কি দেখিতে
পাইলে বল।' আমি বলিলাম,—'মনু প্রবাহের
মধ্যস্থলে একটি সেতু দেখিতেছি।' তিনি বলিলেন,—'ঐ
সেতু মনুয়া দীপন, মনোযোগের সহিত উহা পরিদর্শন
কর।' পূর্ণাংগকা দীপতাবে পূর্ণাংগকণ করিয়া
আমি দেখিতে পাইলাম, সেতুটি সত্যতঃ সম্পূর্ণ
এবং অনেকগুলি ভাষা বিলাসের উপর অবস্থিত।

ভাষা ও অন্তঃবিলাসের সংখ্যা প্রায় একশত হইবে।
আমি বিলাসগুলি পূর্ণন করিতেছি বেনিরা সূতযোনি
বলিলেন,—'ঐ সেতু অধমতঃ এক সহস্র বিলাসের
উপর অবস্থিত ছিল। একটি প্রোক্ত অলোঙ্কাস
বিলাসগুলি ভাবিত্য মনু-পূর্ণে নিপাতিত করিয়াছে।
সেইজন্য সেতুটি বর্তমান ভাষাব্য প্রোক্ত হইয়াছে।'

"তিনি বিলাস করিলেন,—'ঐ সেতুর উপর কি
দেখিতে পাইতেছ?' আমি বলিলাম,—'মনুযোগ্য
লোক তাঁহার উপর দাড়াইয়া করিতেছে এবং সেতুর
উপর দিকে দুই খণ্ড স্তম্ভবর্ণ বেগ লবমান আঁকিয়া

দৃষ্টিগোচর করিতেছে।' অধিকতর মনোযোগের সহিত পরিদর্শন করিয়া দেখিতে পাইলাম বহুসংখ্যক পখিক সেতুর মধ্যদিগা অবাধিত প্রত্য একটা এখার মধ্যে নিশ্চিত হইতেছে। আরও মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণে দেখিতে পাইলাম ঐ সেতুর মধ্যে অসংখ্য ছুই ছুই শব্দকার রহিত্য। তাহাদের উপর পরিশ্রমণ করিতে না করিতে পখিকগণ এবাহরণে নিশ্চিত হইয়া অন্তত হইয়া বাইতেছে।

‘সেতুর অংশে যুখে এই দ্বিগুণিত অতিশয় বন-সম্মিষ্ট, প্রত্যেক বাতীপন মলে মলে সেতুর ভিত্তি-জগৎ ভাগ অতিশয় করিবামাত্র দ্বিগুণে নিশ্চিত হইতেছে। সেতুর বহুভাগে ঐ সকল দ্বিগুণে লগ্না। অধিক নহে, কিন্তু সেতুর যে অংশে অসুট বিলাসিতা পেন হইয়াছে, সেই অংশে দ্বিগুণে সংখ্যা লগ্না। এবং অতিশয় বনসম্মিষ্ট।

‘দেখিলাম, অভ্যন্তর মধ্যে লোক বোড়াইতে বোড়াইতে ভরবিলাসের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে-ছিল। তাহারা অতিশয় প্রান্ত এবং দীর্ঘ পখ-পাটনঃবন্তু অবাধবেদ। তাহারা আশিরা একে একে এখার মধ্যে পতিত হইল।

‘সেতুর নির্মাণ এগারী অন্তত এবং বহুবিধ পদার্থ যাহা ভগ্না দিয়া পরিদৃষ্ট্যাব হইতেছিল তাহা দেখিয়া আমি কিয়ৎকাল চিন্তায় থাকিলাম। বহুসংখ্যক লোক আশোবদ্ব্যবস করিতে করিতে লগ্না সন্তুষ্টগর্ভে পড়িতেছে দেখিয়া আমার জ্বর অপ্রাণ বিধানে পূর্ণ হইল।’ দেখিলাম, পতনোদ্ভূত ব্যক্তিগণ আশ্রয়কারী ভক্ত বাতুলতাবে সন্তুষ্টিত ব্রাত্তিগণি দ্বিগুণে বুঝা চোঁড়া করিতেছে। কতকগুলি লোক চিন্তামিষ্ট ভাবে উর্ধ্বাভিমুখে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ব্যান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে এবং লগ্না বোঁট লাগিয়া নিশ্চিত ও অন্তত হইতেছে। বহুসংখ্যক লোক তাহাদের সন্তুষ্টের নর্তনশীল পুস্তকঃ দীপ্তিশালী বুধভগ্নির পশ্চাৎগমনে যত। অতীতমাত্র আশ্রয়ের মধ্যে আশিরায়ে ভাবিতেছে এমন সময়ে পদধ্বলন হইয়া তাহারা সন্তুষ্ট-গর্ভে নিশ্চিত হইয়া বাইতেছে।

‘দেখিলাম, এই বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ এদেশে কতক-গুলি লোক বস্ত্র ভরবারি হতে সেতুর উপর ইতস্ততঃ বোঁড়াইয়া বোঁড়াইতেছে এবং অনেকক ভরবারি প্রান্তভাগ-ভাঙ্গা লগ্নে দ্বিগুণে ঐগিয়া দিতেছে। উক্ত পখিকগণ যে লগ্ন অগ্রসর করিয়াছিল তাহা দ্বিগুণে। বহুসংখ্যক নিশ্চিত না হইলে সন্তুষ্টঃ তাহারা বন্ধা পাইত।

‘সুত্রোবর্তী এই বিশৃঙ্খলতাক্রম দৃষ্ট সন্দর্ভন করিয়া ছুঃখাভিহৃত হইয়াছি দেখিয়া স্তূতযোনি বলিলেন,—‘বহীর্ষকাল সেতু পরিদর্শন করিয়া, এক্ষণে সেতুর উপর হইতে দৃষ্টি অসম্মারিত কর এবং উর্ধ্ব দৃষ্টিগত করিয়া যাহা জনগণন করিতে না পার তাহা আশ্রয়কে বল।’ উর্ধ্ব দৃষ্টিবিক্ষেপ করিয়া আমি বলিলাম,—‘একটি পুস্তকঃ পক্ষীর ঝাঁক সেতুর কাছ কাছ অদ্বারত উড়িয়া বোঁড়াইতেছে। এবং মধ্যে মধ্যে সেতুর উপর বসিতেছে। ঐ পক্ষী ঝাঁকের মধ্যে পুস্ত, হাশিণি, কাক, অস্ত্রতঃ সামুদ্রিক পক্ষিবিধি ‘জীব, বহুসংখ্যক পক্ষবান পুস্ত পুস্ত বালক—লগ্নে লগ্নে বহা বিলাসের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখি-তেছি। তাহাৰ ভাবগর্ভা কি।’ স্তূতযোনি বলিলেন,—‘ইহারা বেষ, অংশিলা, কুলঃকার, নৈমাত্ত, ইন্দ্রিয়পরভা প্রভৃতি ছুঃখলগ্ন অবাধ প্রস্তুত। বহুহা জীবন এই সকল ছুঃপ্রস্তুতি পরিপূর্ণ।’

‘মামি কয়েকটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। বলিলাম,—‘হাঃ, বহুহা জীবন কি অসার। মানব, ছুঃখ ও সন্তুষ্টার সম্পূর্ণ লবনঃ মানব জীবিত লগ্নে অনন্ত ব্রতঃ ভোগ করে অকপণে সন্তুষ্ট তাহাকে প্রাণ করে।’

‘স্তূতযোনি আমার প্রতি কতপাপসংকল্প হইলেন, এবং আশ্রয়কে এই সর্গভেদী দৃষ্ট সন্দর্ভে দ্বিগুণ হইতে আশ্রয় করিলেন। বলিলেন,—‘ইহা মানবের অদ্বারকাল বিস্তৃত বহাভ্যন্তর প্রসারবহামাত্র। উহা হইতে চক্ষু অগম্যতঃ কর এবং এই লগ্নপ্রোক্ত, ত্রিগুণিত পুস্তকগণকে বোঁধানে ভাসাইয়া লইয়া বাইতেছে সেই স্তূতপাশ্চর্য্যে অসম অলোকন কর।’

“ভাষার আবেশ অনুসারে আমি দুইটিকে ফেলিলাম। এমত ভূতযোনি কোন আন্দোলিত শক্তি দ্বারা আমার দুষ্টিভাবকে সুস্থ, তটিকা ক্রিয়ণপরিমাণে অপসারিত করিবে। নিয়ন্ত্রিতলেন কিবা আমি না : কিম্বা বেশিতে পাইলাম, উপত্যকার দূরতরভ্যন্ত বিবৃত হইয়াছে, হৃতভায়ে সখীটি অনীম দগ্ধের আকার ধারণ করিয়াছে। বঙ্গদগ্ধ একটি একতর পার্বত্য ভাষার মধ্য দিয়া বিবৃত হইয়া সমুদ্রকে দুইটি সমান আবেশ বিভক্ত করিয়াছে।

“সমুদ্রের একাধিক এখনও এত ঘোষণার যে, তাহার দ্বারা কিছুরই বেশিতে পাইলাম না। অপসারিত অনাথ্য বীণপুঞ্জ অনীম সমুদ্রতটে প্রতীক্ষমান হইল। ঐ বীণপুঞ্জ মূল ও ফলে প্রণোদিত এবং পত পত সমুদ্রল ক্রুর উপদ্রাবেরে বেষ্টিত। দেখিলাম সমুদ্রগগন হীরকাকুল বিবিধবর্ণের পরিচ্ছদে ভূষিত ও বিভিন্ন ভূমতি পুষ্পবাণো প্রদানিত হইয়া গুচ্ছ-শ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করিতেছে। শব্দকৃত নিবৃত্তির পার্শ্বে শব্দান বহিরাগত, এবং সুকোমল সুন্দর, বিকিরিত সূর্য্যবাসের উপর বিশ্রাম করিতেছে। বিহঙ্গমের সূক্ষ্মশীতি, জল প্রপাতের দুর্ভঙ্গললসি, স্বকর্ষ মানব কঠোরিত স্রাব্য কলরব, এবং বাতাসের মধুর নিবৃত্ত একটি বিভিন্ন সঙ্গীত প্রচার দৃষ্টি করিয়াছে।

“এই রমণীয় দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমি অতিশয় আশ্বস্ত হইলাম। সাধা থাকিলে আমি তদন্তেই ঐ রমণ্যানে বহন করিতাম।

“ভূতযোনি বলিলেন,—‘দেখু উপর যে সকল সূর্য্যবাস উদ্ভূত দেখিয়াছ তাহা উত্তর’ বা হইয়া ঐ রমণীয় বানে ঘাইবার উপায়ান্তর নাই।’

তিনি বলিতে লাগিলেন,—‘দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া মধ্যবর্ণের বতস্বর দুইপাশে গতিত হয় ততদূর প্রসিদ্ধ ভাবল ততলভ্যমর বীণশ্রেণী দেখা ঘাইতেছে। সমুদ্রোপস্থল বালুকায়ণির স্তার উচ্চাও সম্ভবতীত।

যে বীণসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহাদের পশ্চাতে আরও অনাথ্য বীণ আছে। ঐ বীণগুলি দৃষ্টি ও কল্পনারও দীপ্য বহিভূত। বর্ণনিত ব্যক্তিগণ যে পরিমাণে বিবিধ বর্ণোৎকর্ষ দানন করিয়াছেন তাহারা তদনুসারে ঐ সকল পারমিত স্রাব্যবাসের আধিকারী হইয়াছেন। ঐ সকল গৃহ ব ব আধিকারী হইত ও পুণ্যের স্রাব্য অতুল্যেরে বহুবিধ স্রাব্যকর পদার্থসমূহের পরিপূর্ণ। প্রতি বীণ ব ব আধিকারী উপযোগী। নির্ভা। এই সকল স্রাব্যবাস মানবের সৌন্দর্য্যের সামগ্রী মধে কি। যে জীবনে আমরা এই পুণ্যের স্রাব্য করিবার অবসর পাই, সে জীবন কি কেবল দুঃখময়? যে সূর্য্যবাস আমরা এই পারমিত সৌন্দর্য্য স্রাব্য করি, সে সূর্য্যকে ‘স্ব’ করিবার কারণ কি। সে মানবের জ্ঞান অবসরময় ও সমস্তজীবন নিশ্চিষ্ট হইয়াছে, সেই মানবের জীবন অসার কে বলে?’

“আমি ঐ বীণের শোভা ও বীণবাদ্যীগণের মূখ দেখিয়া অবর্ণনীয় সন্তোষ লাভ করিলাম। বলিলাম,—‘বঙ্গদগ্ধটিক পর্ত্তের অপসরণেরে যে ঘোষণার প্রবেশ পশ্চিমে হইতেছে, আমি স্মৃতিরভাবে অনুভব করিতেছি তদুপায় হইতদগ্ধ আমার দৃষ্টিগোচর করুন।’

ভূতযোনি কোন উত্তর না করায় ভাষার বিবেচনা পুনরায় উক্ত প্রস্ত বিজ্ঞান করিতে উদ্যত হইয়া দেখিলাম তিনি আমাকে পরিচয় করিয়া গিয়াছেন। তখন, আমি যে দৃশ্য দলপর্ণ করিয়া, স্বর্গকাল ভিত্তিমর হিলাস তব্ধিগুণে নান কিরাইয়া প্রবাহমান দলী, বিলাসোপরিবিত্ত সেতু, স্রবণর বীণপুঞ্জ প্রভৃতি কিছুই বেশিতে পাইলাম না। দেখিলাম, ঘোষণার স্বর্গীয় স্রবণীয় উপত্যকা এবং তাহার উত্তরণেরে গো, বহিষ, মেঘ, উষ্ট্র স্রবণ করিতেছে।

ঐশ্বর্য্যবীণায় গুণ।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

পঞ্চম ভাগ।

কান্যকুম্ভ।

কাকটুম্বের পরিধি আনু ৩০০ লি। রামধানী সদানবীর উপর। উহা ২০ লি দীর্ঘ এবং ১৫ লি বিস্তৃত। রামধানীর চতুর্দশে জনপুত্র পরিধা এবং উহা দ্বর্গবেষ্টিত। চতুর্দিকে পুষ্পোদ্যান, পুষ্করিণী-গুলি বহু কাচের স্তম্ভ দেখা যায়। মূল্যবান পদ্ম প্রভৃতি দেখতে পড়িলেই আশ্চর্য্যজনক। অবিবাসীরা সমুদ্রশালী এবং নিম্ন পিঙ্গ লব্ধ হয়। পূর্বাংশে স্থান্য। সকল স্থানেই প্রচুর পরিমাণে ফল ও পুষ্প পাওয়া যায় এবং তুবি উপযুক্ত সময়ে কৃষি হয় জন বায়ু মনোরম। অবিবাসীরা সজ্জিত মাঝু এবং দেখিতে সুন্দর। পরিধানের জস্ত উহারো চিত্রিত এবং উজ্জল বর্ণাদি ব্যবহার করে। ইহারো বিন্যাস্যাদী। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং অবিবাসীগণের সংখ্যা সমুদ্র। আর একপুত্র সম্মুখায়ে বর্ণ সহস্র সতি বাস করেন। ইহারো হীম ও বহা উভয় বাসাবলম্বী। ছই দশ মন্দিরে কয়েক সহস্র অবিবাসী বাস করে।

পূর্বাংশে রামধানীকে লোকে পৃথকপৃথক বলিত। ব্রহ্মবস্ত্র নামে রাজ্যে রাজ্য করিতেন। বর্তমান রাজ্যে বর্ধবস্ত্র বৈজ্ঞান্য। রাজকর্ণচর্যাপন রাজ্যে পাদন করে। বর্ধবস্ত্রের পূর্বে রাজ্যে রাজ্যবর্ধন রাজ্য করিতেন। প্রত্যেক বর্ধন নামে তাঁহার এক কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন।

রাজ্যবর্ধন বর্ধনপ্রায় ছিলেন। এই সময়ে পূর্বে ভারতবর্ষে কর্ণবর্ধন নামক যেনে পঞ্চক নামে এক রাজা তাঁহার সন্তানগণকে সর্বাংশে করিয়াছিলেন,— “সীমান্ত প্রদেশের রাজ্যে বর্ধন হইলে রাজ্যের অবলম্বন হয়।” ইহাতে তাঁহার সন্তানগণ তাঁহাকে বিবর্ত করিল।

রাজার সন্তান হইলে রাজ্যে অবলম্বন হইল। তখন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ভক্তি সমাপন করিয়াছিলেন

কহিলেন, “রাজ্যের অবলম্বন অন্য বিধাচিত হইবে। পূর্বেই রাজ্যের পূর্ব প্রদেশে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু রাজ্যের প্রধান পুত্রের বর্ধন এবং কর্ণব পুত্রের। বিবেচনা, তিনি নিজ পরিবারের প্রতি অগ্রগত, যেহেতু রাজ্যের তাঁহাকে ভক্তি করে। যদি প্রত্যেক করিতেনই যে তিনিই রাজ্যে হইত। প্রত্যেকে নিজ নিজ ভক্তি সমাপন করত।” এ প্রকারে সকলেই এক মত হইয়া নীকার করিল যে বর্তমানই তিনি অন্যন্য ভক্তি সমাপন।

ইহাতে প্রধান প্রধান মন্ত্রীগণ এবং পাদনকর্তারা সকলে তাঁহাকে রাজ্যের প্রধান ভক্তি উৎসাহিত করিতে লাগিল। রাজ্যের প্রধান কর্তা। পূর্বেই রাজ্যের পুত্রের ভক্তি সমাপন এবং রাজ্যের রাজ্যে পুত্রের ভক্তি সমাপন হইয়াছিল। পদব রাজ্যবর্ধন রাজ্যের পাইয়াছিলেন তখন আরও বর্ধন করিলেন যে তিনিও পূর্বেই রাজ্যের প্রধান ভক্তি সমাপন করিতেন। কিন্তু তাঁহার সন্তানের বোনে তিনি পদব করতলপুত্র হইয়াছিলেন এবং সেই জন্ত রাজ্যে এই ভক্তি সমাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা মন্ত্রীগণেরই বোনে। রাজ্যের প্রধানের ভক্তি সমাপিত এই যে আগনি রাজ্যে হইত এবং বর্ধনের ভক্তি সমাপন করত। আগনির পদ পুত্রের ভক্তি সমাপন। আগনির বর্ধন হইয়াছে তাহা বোঝ করত। ইহাতে আগনির বর্ধন ভক্তি সমাপিত। আগনির প্রার্থনা পূর্ণ করত।

রাজপুত্র উভয় করিলেন “বৈশ্যসেন ভক্তি সমাপিত-পূর্ণিমা এবং উহাতে দেখে নিশ্চয় আছে। একপ কামান্ডার বর্ধনের পূর্বে ভক্তি সমাপিত। যদি নিজে ক্ষুদ্রভক্তি সমাপিত কিন্তু বর্তমানে আগনি পিতা ও সন্তান দেখা করিয়াছেন, প্রত্যেকে একপ করে পৈতৃক রাজ্যে প্রায় না করিলে উহাতে আগনির কোণেই উপকার হইবে না। বিশেষ অবলম্বন বিস্তৃত

হইয়া অগ্নের নভাঙ্গুদ্বারা তপাই সমীচীন। এইকণ পকাত্তরে অবলোকিতের বোধিদেবের সৃষ্টি আছে; ইহা হইতে অনেক অসংসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে। আমি ইহার নিকট হইয়া পানমন গ্রহণ করিবা” যে হানে বোধিদেবের সৃষ্টি ছিল তথায় তিনি উপস্থিত হইয়া উপবাস ও আর্চনা করিতে লাগিলেন। বোধিদেব তাঁহার অগ্নের অকণটকা সৃষ্টিতে পারিয়া তাঁহার লক্ষ্যে সপত্নীয়ে উপস্থিত হইয়া দিক্কাপা করিলেন “তুমি কি বর আৰ্থ্য কর?” রাজপুত্র উত্তর করিলেন “আমি অত্যন্ত মানসিক ক্রেশ পাইরাছি। আমার রজাগ পিতা প্রাণত্যাগ করিরাছেন এবং আমার ভ্রাতৃ ও বহীষুভ্রাতৃ অস্ট্রিকর উপরে হত হইরাছেন। এই সকল বিপদের ভ্রত আমি নিজেকে অত্যন্ত দীন বিবেচনা করিতেছি; তজ্জাপি অমসাহা-র্য পিতৃশিহাসনে বসিবার অস্ত্র আমাকে অসুযোগ করিতেছেন। কিন্তু আমি এসুত পক্ষে অজ্ঞ ও দুর্ব; এইজন্য আমি বোধিদেবের আবেশ আৰ্থ্য্য করিতেছি।” বোধিদেব উত্তর করিলেন “সুস্কন্ধে তুমি এই বনে সম্ভ্রান্তীর ত্রাণ বাস করিতে এবং তোমার গভীর অধ্যবসায় ও অত্যন্ত পরিভ্রমে বারা তুমি যে বর্ধাঙ্গন করিয়াছিলে তাঁহার ফলে রাজপুত্র হইয়া লক্ষগ্রহণ করিহ। কৰ্ণস্বর্ণাঙ্গন বোধদেব বিদাই করিয়াছেন। এইকণ তোমার রাজ্যলাভ হইলে তুমি বোধদেবের প্রতি দয়া ও কৃতজ্ঞা প্রকাশ করিবে। যদি তুমি আতের দুখে দুঃ করিয়া তাহারিগকে সালমপালন করিতে থাক, তবে অবিলম্বে তুমি পদ ভাঙের উপর রাজত্ব করিতে পারিবে। যদি তুমি তোমার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, তবে আমার আবেশ গ্রহণ কর, আমার শুভ ক্ষমতা বলে তুমি এমন শিকলানত করিবে যে তোমার প্রতিবেশী কোন রাজাই তোমার উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইবে না। শিখোপদ অগ্নিগোহণ করিত না এবং নিজেকে মহারাজা নামে অভিহিত করিত না।”

এই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া রাজপুত্র পরাভো-প্রত্যাগমন করিয়া রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেকে কুমার নামে আখ্যাত

করিলেন; তাঁহার উপাধি ছিল শিলামিতা। তিনি তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডকে নিরূপিত প্রকৃতি আবেশ করিলেন “আমার জাত্যের লক্ষণ এইকণও পাতি পায় নাই; নিকটবর্তী বেষণ্ড অদীন হয় নাই। গতদিন এই অম্বাখ্য খ্যাকিবে, ততদিন আমার বক্ষণ হত আমার দুখে আত্যা তুলিয়া দিবে না।” ইহাতে মন্ত্রীগণ রাজ্যের সকল সৈন্ত একত্র করিলেন এবং দুন্দুভীত্বিখাঙ্গন শিককাপকে আহ্বান করিলেন। পাঁচ সহস্র হস্তী বিসংহ অবাচীরা ও পলাপদস্ত্র পনাতিক একত্রিত হইল। কুমার পশ্চিমধ্যে সন্ধ্যাক পনাতিক করিয়া সন্ধ্যাক পূর্ণ হইতে পনাতিক অগ্নয় হইতে লাগিলেন। হস্তীগণ ও সৈন্তগণ কোন প্রকার অবসর পাইল না।

প্রথম বৎসরে তিনি পকতায় বসীভূত করিলেন। এই প্রকারে রাজ্য বৃদ্ধি করিহ। তিনি সৈন্ত বৃদ্ধি করিলেন; তাঁহার ৬০ হাজার দুন্দুভী ও একশত অম্বারোহী হইল। দ্বিতীয় বৎসর পরে তিনি দুই কাণ্ড হইতে দ্বিতীয় হইলেন এবং রাজ্য সকল পনাতিক পালন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দিক্কাপের নিম্নাঙ্গনী প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এবং আহাৰ দিক্কাপ বিপ্লব হইয়া বর্ধাঙ্গপালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আবেশে পদবৃত্তা বসোহায পকতায়তে দিখিত হইল এবং এই নিবেশ অম্বাক করিলে আবেশও হইবে এইকণ আবেশ প্রচারিত হইল। তিনি পরাতীরে ১০০ দুই উচ্চ কয়েক সঙ্কট পুণ্য নির্মাণ করিলেন। সমুদ্রার নগরে প্রায়ে তিনি আহাৰ ও পানীর পরিপূর্ণ নতবা ভিকিংদালার তামন করিয়া তথায় চিকিংদক দিখুক করিলেন এবং পণ্ডিত ও কহিবিগকে পণ্ডিত পরিমাণে ঔষধ দিবার আবেশ প্রচারিত করিলেন। যে যে হানে দুইসেবের অরণ চিক ছিল সেই সকল হানেই তিনি সম্ভারাম নির্মাণ করিলেন।

এতি পাঁচ বৎসরে তিনি বোকা দানক বৃহৎ পরিমাণ আহ্বান করিতেন। সেই সময়ে সৈন্তরক্ষার ব্যয় ব্যতীত তিনি কোথাখায়ের সমস্ত ধন হানে যার করিতেন; এতি বৎসরে তিনি সকল বেষ

হইতে প্রণয়নকে একত্রিত করিতেন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে তাহারিগণকে আহার্য্য, পানীয়, ভোজন ও বস্ত্র দান করিতেন; দেগী সম্বন্ধিত করিতেন এবং ভজবালয়গুলিকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিতেন। তিনি যতিগণকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিতেন এবং নিজে বাধ্যমানের বিচার করিতেন। তিনি ধার্মিককে গৃহস্থ, দুঃস্থের দত্তপ্রদান, মন্মথাক্রমে গব্ভাত ও যোগ্যের সম্মান করিতেন। নীতিগম্যায় ধার্মিক যতিকে শিলাদিত্য সিংহাসনে উপবেশন করাষ্টা তাঁহার নিকট পরীক্ষণ শিক্ষা করিতেন। যদি কেহ দ্বাচ্যাক্ষী হইয়া বিদ্যমান হইতেন, তবে তাহারকেও সম্মান প্রদর্শন করা হইত, তবে তিনি যথেষ্ট সম্মানিত হইতেন না। যদি কেহ দুর্নীতিগম্যায় হইতেন, তবে তাহার মূখ ঘর্ষণ বা তাহার সহিত বাস্তবায়ণ করিতেন না; অধিকন্তু তাহারকে নির্দোষন করা হইত। নিকটবর্তী কোন রাজা বা তাঁহার মন্ত্রী পরীক্ষায় হইলে তিনি তাঁহার সহিত একাগনে উপস্থিতি হইয়া তাহারকে “সম্মানীয় বস্তু” বলিয়া সম্বোধন করিতেন কিন্তু তির তরিত লোকের প্রতি মৃতি নিক্ষেপও করিতেন না। রাজকর্মে নির্দোষ করিতে হইলে তিনি দূত নিয়োগ করিতেন—ইহারা অনবরত দেশদেশান্তরে যাতায়াত করিত। কোন সখের জনসাধারণের বর্গ বাবদ্যে স্ত্রী পৌত্রকে তিনি তাহাদের নিকটে বাহিতেন। যেহায়ে তিনি অর্থ করিতেন সেখানে তিনি দত্ত প্রদত্ত আবাদে দান করিতেন। বর্ষাকালের তিন মাস তিনি অর্থ করিতেন না। সদা-সর্ব্বদাই তাঁহার অর্থ-প্রদানে তিনি সজ্জিত সকল বর্গবাল্য ব্যতিক্রমের দত্ত উত্তম খাদ্য সহস্রাহ করিতেন। আর এক দ্বন্দ্ব যৌক্তিক পুত্র দত্ত প্রদান একত্রিত হইতেন। দ্বিভাষ্যকে তিনি অংশে বিভক্ত করিতেন। প্রদানে তিনি রাজকর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। দ্বিতীয়ভাবে তিনি অনবরত পরীক্ষণ করিতেন। আদি-যখন প্রথম সূত্রায়কের নিবৃত্ত পাইলাল, আদি বলিলাস যে আদি যখন হইতে কালক্রম বাই। এই সময়

শিলাদিত্য তাঁহার সাম্রাজ্যের তির তির দান পরিদর্শন করিতে ছিলেন; তিনি এই সময় কলিগ্রাহ ছিলেন এবং তৎকালে সূত্রায়কের নিকট এই আবেশ প্রেরণ করিলেন “আমার ইচ্ছা যে তুমি দালন্যবর্তে যে বৈদেশিক প্রণয় আক্রিয়াময়কার করিতে তাহারকে লইয়া অগ্নিগে এই পরিবেশ প্রদান কর।” ইহাতে সূত্রায়কের সম্মতিসাধ্য হইয়া শিলাদিত্য অগ্নি করিলেন। পদপ্রদ ব্রহ্মইলে রাজা শিলাদিত্য বিজ্ঞান্য করিলেন “আগনি কোন দেশ হইতে প্রদান করিয়াছেন এবং আশার পণ্যটিকে আগনি কি অঙ্গলক্ষ্য করিতেছেন?”

উত্তরে বলিলাস “আগি ট্যাং দেশ হইতে প্রদান করিতেছি এবং বৌদ্ধবর্গ সংক্রান্ত পুস্তক সংগ্রহে অনুবর্তি আশ্রয় করিতেছি।”

রাজা বলিলেন “ট্যাং দেশ কোথায়? আগনি কোন পথ দিয়া অর্থ করিয়াছেন? ঐ দেশ কি আমাদের দেশ হইতে দূর না নিকটে?”

উত্তরে জানাইলাস “আমার দেশ এই দেশ হইতে কোটি কোটি লি উত্তর পূর্বে; আরও বর্গে এ দেশ বৈদ্যটান নামে কথিত হইয়া থাকে।”

রাজা উত্তর করিলেন,—“আগি অর্থ করিয়াছি যে মহাতীনে বেশে নীল নামে এক রাজা প্রদেয়। পূর্বে এই রাজ্যে অস্ত্র বিশৃঙ্খল ছিল; সর্ব্বত্রই দলাদলি ছিল; সৈন্তগণ অধিকতর দুঃস্থ করিত এবং দেশবাসী নানাক্রমে রোষণ করিত। তখন স্বর্গের পুত্র সীল তাঁহার করুণা প্রেরণে রাজ্যে সর্ব্বত্র সন্তোষ ও শান্তি প্রদান করিলেন। সকল নিকেই তাঁহার দান ত শিক্ষা ব্যাপৃত হইতে লাগিল। অতঃপর অধিবাসীগণ তাঁহার প্রজা হইবার দত্ত আরহ প্রদান করিতে লাগিল। জনসাধারণ তাঁহার গুণে প্রীত হইয়া তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল। অনেক দিন পূর্বে আগি তাঁহার এইরূপ প্রশংসা অবগত হইয়াছি। এই সকল প্রশংসা-হুতক প্রদানে তিতি কি সত্যমুদক? আগনি কি এই রাজার কথা বলিতেছেন?” তৎপরে আগি

মানাইলাম "মানবের পূর্ববর্তী জ্ঞানপথের
দেখের মান চীন কিছু টাং বেশই চমকেছে বর্তমান
জ্ঞানকে দেখ ।" মারাক্স এতিমিত হইবার পূর্বে
আবদেহের রাজ্য নৌম রাজ্যের অবস্থিত বলিয়া খ্যাত
ছিলেন । পূর্ববর্তী রাজ্যবৎ লোণ পাইলে, মেঘে
রাজ্য ছিল না, মেঘে চতুর্দিকে অগ্নিবির্গোষ
এবং বিশুদ্ধতা ছিল ; এই সময়ে নৌমের রাজ্য
উহার অষ্টমদর্শিক ক্ষমতা বলে চতুর্দিকে
উহার ভাবনাগা ও অশুদ্ধতা বিচার করিতে
লাগিলেন ; উহার ক্ষমতা খাড়া তিনি চতুর্দিক
বিশদ্য করিয়া সর্বদিকে খাতি আসেয়ন করিলেন এবং
২৫ সহস্র রাজ্য উহারকে কর গ্রহণ করিতে
লাগিল । তিনি এতাবস্থার হুংব হুংব করিলেন ;
দত্তের উপদেষ্ট করিলেন এবং এই কারণে রাজ্যের
ঐক্যিক এবং এতাবস্থার শাসিতোপ করিতে লাগিল ।
তিনি যে সকল কথো সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা
বর্ণনাতীত ।"

শিল্পিতা রাজ্য উত্তর করিলেন "অতি সুন্দর ।
এতাবস্থার নিম্নতম এইরূপ শাসিত রাজ্যের শাসনে
হলে আছে ।"

শিল্পিতারাজ্য কান্তকূটে এতাবস্থার পূর্বে
বর্ণনায় আসিয়া করিলেন । কতক কোটি লোকসহ
তিনি প্রকার দক্ষিণ তীরে এবং কতক লক্ষ লোকসহ
দুবারাজ্য পক্ষের উত্তর তীরে দিয়া উহার লোক ও
বলপণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । সুসজ্জিত সৈন্তা-
বলসহ ই হই রাজ্য অগ্রসর হইলেন । সৈন্তেরা
কেহ নোকাহ, কেহ হতীতে, কেহ চতাবিনাশ করিতে
করিতে, কেহ বা বস্ত্রাবধান করিতে করিতে অগ্রগামী
হইল । সকল দিন পরে উহার কান্তকূটে পৌঁছিয়া
পক্ষের পশ্চিম পার্শ্ব পূর্ণবাটিকার অবস্থিত
করিতে লাগিলেন ।

তৎপরে, যিস্মিত রাজ্যের সর্বভাগ পূর্ণবাট
শিল্পিতা রাজ্যের নিম্নতম হইতে আবেশ প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন উহার নিম্ন নিম্ন বৈশিষ্ট্য অসিদ্ধ সময় ও

অশ্লিষ্টপথের এবং শাসনকর্তা ও সৈন্তসহ তথায় সমবেশ
হইলেন । রাজ্য ইতিপূর্বেই পক্ষের পশ্চিম তীরে
হুংব সজ্জাযান এবং ইহার পূর্বদিকে ১০০ শত কুট
উক্ত সজ্জাযান চৈত্যা নিষ্কাশন করিয়াছিলেন । চৈত্যের
দক্ষিণাংশে তিনি বৌদ্ধবৃত্তি বৌদ্ধ করিবার ক্ষম
সজ্জাযান বৈদ্য স্থাপনা করিলেন । এইরূপ বসন্ত
কালের দ্বিতীয় বার চলিতেছিল । শাসনের অর্থন বিবদ
হইতে একদিনে বিবদ পঞ্চাঙ্গ রাজ্য, শ্রবণ ও তাক্ষণ
বিবদে নামাশ্রমকার স্থাপনা বান করিয়া আসিতে-
ছিলেন । অশ্রমী রাজ্যশ্রমকার হইতে সজ্জাযান
পঞ্চাঙ্গ সুসজ্জিত হওগে যাক্যকরণ তাহারের যত্নাশি-
সহযোগে নামাশ্রমকার বান্দ করিতেছিল । রাজ্য
বিজ্ঞানপথের পরিচাল্য করিয়া সুসজ্জিত একাত্ত হস্তীর
উপর তিন কুট উক্ত সজ্জাযানের সুবর্ণবৃত্তি স্থাপন করি-
লেন । বৃত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে ইজ্ঞ বৈদ্য রাজ্য শিল্পিতা
স্থাপনা চলিতে পারদ করিয়া ও দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান-
রাজ অগ্নিবির্গোষে বৈদ্য চামর দায়ন করিয়া অগ্রসর
হইতে লাগিলেন । এতাবস্থার সবে অগ্রগণ্যে
সুসজ্জিত পাঁচ শত সজ্জা হস্তী ছিল ; সজ্জা বৃত্তির সপক্ষে
ও পক্ষান্তে যাক্যকরণ বান্দ করিয়া একপক্ষ হস্তী
বাইতেছিল । রাজ্য শিল্পিতা অগ্রসর হইবার সময়
চতুর্দিকে সজ্জা ও সজ্জাযান সজ্জাযান, সুবর্ণ ও
কৌণার পূর্ণ সজ্জাযানে সজ্জাযান, সুবর্ণ ও
সজ্জাযান সজ্জাযান বৌদ্ধ বৃত্তি রাজ্য নিম্ন
অগ্রসর উপর করিয়া পশ্চিম পার্শ্বে লইয়া গেলেন
এবং তথায় তিনি শত সহস্র লক্ষ সজ্জাযান
সেপথের বসন্ত বৃত্তি ক উপহার প্রদান করিলেন । এই
শোভাবাত্রীতে ফেললাত্রী সজ্জাযান অর্থন এবং
মানবদলীয় সজ্জাযান সহস্ররূপে সজে ছিলেন ।
ভোজনান্তে বিধান লোক সকল একত্রিত হইয়া
অর্থ কামার গুহ বিদ্যে যাক্যযান করিতে লাগিলেন ।
সজ্জাযানে রাজ্য সপারিবন নিম্ন অর্থন-প্রদানে
এতাবস্থার করিলেন ।

মাতৃখণ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সাহিত্যিক মকলিস ।

মাতৃখণ ঠেকিয়া শিবিতে চার, দেবিয়া
নচে । শিশু প্রকৃতিতেও এ নিরমের
বাস্তবিক দেখা যায় না ।

মাতৃখণ কাহিনী শুনিয়া আক প্রথমটা
অত্যন্ত তার পাঠাইছিল কিন্তু মরোত্তার
আদরে ও শিক্ষকগণের সুমধুর বাবচরে
সে তার হৃৎসংগেব মত কোণার মিলটিয়া
গেল ।

প্রথম কয়েক মাস আক এতখানি
আদর সোহাগ ভোগ করিল যে সে ভুলিয়া
গেল অত্যাগা মাতার ভাগ্যও গোড়ার এমনই
আদর সোহাগ একদিন ঘটাইয়াছিল, কিন্তু
বেশী দিন রহে নাই !

লাবাস্যাদর হারজ, আর্জেক্ত সফলেই
আকের হৃৎকের জন্ত শনবাত ! মরোত্তার
তাহাকে পাশে বসাইয়া ভোজন করান !
ছাত্রেরা খেল দ্বারা করে, গান গায়ে, সে
সব আকের তৃষ্ণার জন্ত !

আক্ মফা সফট !

আকের এই অবস্থা দেবিয়া মাতৃখণ ভারী
গুণ হইত । সে আকের পানে কেমন এক
করণার দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে চাহিত—সে
চাহিনীর অর্থ, হার অবোধ ! এ হৃৎ, এ
সোহাগ কর যিনের জন্ত ? এমন আদর
বহু আমিও একদিন পাইয়াছিলাম, কিন্তু হার,
—আজ !—

এমন ভাবেই কয়েক মাস কাটিয়া গেল ।

আকের মা প্রায়ই আককে দেখিতে

আসিত । সে সময় আকের মার পাতির
কত ! তাহার সামাজ্য একটা কপাৎ
বিষমেনের সকলে নিবিষ্ট মনে তনিত !

দেবিন সহিদের তেলেরা দল বাদিয়া
খেলা করিতেছিল । বরের মধ্যে কানাকার
ধারে বসিয়া আক খেলা দেখিতেছিল ।
মরোত্তার আদিয়া ডাকিল, “আক্, আক্,
তোবার মা এসেছেন !”

মা ! আক লক্ষ্যটিয়া মরোত্তার
নিকট আসিল, সাগ্রহে করিল, “কোথায় ?”

অবেশে সজ্জিতা ঠমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ
করিল । হাতে ছোট কুড়ি—মিষ্টান্নে পরিপূর্ণ ।
ঈদা ছাত্রদের ডাকিয়া পাঠাইল । ঈদার
জীবন্যেব বালকের দল সমুখে আসিলে,
ঈদা মুষ্টি ভরিয়া সকলকে প্রচুর বিস্কুট কেক
প্রকৃতি বিতরণ করিল । ছাত্রের দলে
উৎসব পড়িয়া গেল ! মার কোলের কাছে
বাড়াইয়া আক্ অপূর্ণ গর্কোন্নানের সন্তিত
ভোজ দেখিতেছিল !

এট রকম ব্যাপারে ঈদা বশন-তপন
অত্যন্ত অর্থবার করিত । মরোত্তার গাটা
“রিব-রিব করিত—অনর্থক এই সব ব্যয়ে
পরচ—এই টাকাকল্যা যদি কোন উন্নত
সদাশর ব্যক্তির সাহায্যে পরচ করা হইত !—
এই যেমন মরোত্তার একজন ! বেচায়াব
কেবল টাকার অস্তাব !

মরোত্তার অনেক সময় ইচ্ছা হইত, মনের
ভাবটা ইদাকে ডাকিয়া বলে, কিন্তু সে পারিয়া
উঠিত না ! তাহার চোখে মুখে কেমন
একটা ভারী দৃষ্টি উঠিত এবং তাহাট যে

ইহার বৃথাবার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে না
ইহাতেই মরোভার কেনন রাগ হইত !

মরোভার অনেক দিন হইতে সাধ—
একখানি কাগজ বাহির কবে ! নিজেদের
একখানি কাগজ না থাকিলে কি আপনাদের
স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করা যায় !

মরোভার ভাচার 'হলে হতে পারতুম-
মন্ত-একজন' বক্তৃতাধবের কাছে যখন-তখন
এই কাগজ বাহির করার কথা পাড়িত।
ভাচার লকলেই উৎসাহ দিত।—বলত কথা !
—একখানি কাগজ বাহির করিতে পারিলে
বড় সুন্দর হয় !—কত নূতন ভাব, নূতন চিন্তা
ভাচারের বাহির আসে—বাচা এ পর্য্যন্ত
কেত ভাবে নাই—প্রকাশ করা শু নূর
কথা ! আল, কেবল একখানি নিজেদের
কাগজের অভাবে সে সব চাপা পড়িয়া
রহিয়াছে !

মরোভার মনে কেনন একটা ধারণা
বহুদূর চটয়াছিল—যদি তাহার কাগজ বাহির
করে, জাতির মা নিশ্চয় খেচ যোগাইবে
কিন্তু তাই বলিয়া ইহার নিকট মরোভার
কথাটা চট করিয়া তুলিল না।—কি জানি,
ভাচার সংলগ্নে ইহা যদি কোন সন্দেহ করে !
তাহা হইলেই সব মাটি ! সে ধীরে ধীরে
সমস্ত কাগ ওছাইয়া গইবে ঠিক করিল।

মরোভার স্ত্রী নানা কথার পর ইহাকে
দ্রবৎ সন্তুষ্ট ভাবে করিল, "মুর্দো মরোভার
ভাচার একটা অল্পতোষ করতে চান কিন্তু
একটু কুণ্ঠিত হইলেন।"

বাকী কথাটুকু শেষ না হইতেই ইহা
সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কি ?—কি ?....."

ইহার কথার এতখানি সাক্ষ্য উচ্ছ্বসিত

হইয়া পড়িয়াছিল যে মরোভার একবার
ইচ্ছা হইল সে কাগজের দ্রষ্টা কিছু টাকা
চাহিয়া বসে ! কিন্তু সে একজন বিলম্ব
চতুর লোক—অবিদ্যৎ বুঝিয়া কাজ করে !
সুতরাং মরোভার আল কথার কিছুই পাড়িল
না—সে ইহাকে শুধু করিল, "আমাদের
একটা সাহিত্য-সভা আছে, এই রবিবার
একটা অধিবেশন হইবে, অগ্রগাহ করে আসবেন
কি ?"

ইহা জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে কি কি
হবে ?"

"প্রবন্ধ-পাঠ, আবৃত্তি, গান—"

"আর কে কে আসবেন ?"

মরোভার একটু কাশিয়া উত্তর দিল,
"আরও অনেক ভক্তলোক আসবেন।—
মহিলাসভাও নিমন্ত্রিত হইবে।"

ভক্তসমাজে বিশিষ্ট একটা উৎকট
বাগনাথ ইহা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে একমুহূর্ত
ইতস্তত করিল না।

মরোভার ভাচার পুনী হইল। সভাপতি
বহুদূর সাধা ভাল করিয়া সাক্ষাৎ ইহার বন্দোবস্ত
করিল। বক্তৃকের সমুখে দুইটি বসিন
আলোর ব্যবস্থা হইল। বাতিদান করা
নাই বসিনা মাঝিরা পরিচাল্য করিয়া তুলিল।
কল্লের আসবাবগুলি মাধু বালসাধা সাজিত
করিল। রাত্রি আটটার ময়লিল।

মরোভার আঁবনে ইহা এক মহা উৎসব।
ভাচার পরিচিত বড় বার্থ-কবি বার্থ-শিল্পী
সকলেই আর নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

আটটার সময় বালকের দল বেঁকে
নিজেদের আরগার বসিল।

নির্দিষ্ট সময়ে নিমন্ত্রিত লোকেরা হলে

বলে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের
তিতর কবি আছে, শিল্পী আছে, চিত্রকর আছে,
দার্শনিক আছে, বৈজ্ঞানিক আছে—কিন্তু
ভাষালক্ষী কাহারও প্রতি প্রগল্ভ্য নিক্ষেপ
করেন নাই!—অনাদৃত প্রতিভার সমষ্টি!

তাহাদের শূণ্যতার জীবনকে কোটরগত
চক্ষু—দারিদ্ৰ্য-পীড়িত বিষমভাগ দেখিলে
ক্রোধ হয়!

প্রতিভাশূন্যতা তাহাদের কবর, লোকে
বুঝিল না, এই দুঃখই যেন তাহাদের হাড়
হাড় বিঁধিয়া আছে!

সকলেই আশিরাছে কিন্তু জাহাঙ্গীর মা
ইদা কৈ?—বাহার গজ মরোভাঁর এত
আয়োজন!

ইদার বিলম্ব দেখিয়া মরোভাঁর বিশেষ
উদ্বেগ হইয়া পড়িল, শুধু মরোভাঁর কেন,
সকলেই একটু ক্ষুব্ধ হইল।

মরোভাঁর সকলের কাছে-কাছে গিয়া
বলিতে লাগিল, “কাউন্সেলের গজই একটু
অপেক্ষা করছি!”

অংশেবে, ইদার আসিবার সম্ভাবনা নাই
দেখিয়া আর্জেন্টকে তাহার কবিতা পাঠ
করিতে বলা হইল।

আর্জেন্ট তখন কত কাষনার সহিত
কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল! যেমন
অগজ কবিতা, তেমনই অগজ তাহার আবৃত্তি
ভঙ্গী! কিন্তু তবু ঘন-ঘন করতালি পড়িতে
লাগিল। কেহ বলিল, “বাহবা!”

“অতি সুন্দর!”

“অপূর্ণ!”

এইরূপ অংশসিহ হইয়া আর্জেন্ট আরও
উৎফুল্ল হইয়া কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

এমন সময় ইদা দীরে দীরে সেই-কক্ষে
প্রবেশ করিল।

আর্জেন্টের দৃষ্টি তখন উজ্জ্বল। সে ইদাকে
দেখিল না। কিন্তু ইদা তাহাকে দেখিল—
নতন চোখে! সেই মুহূর্তেই ইদার ভবিষ্যৎ
বিপর্যাস হইয়া গেল! তাহার মনে হইল,
যেন তাহার সাগর জীবনের সকল সাধ, সকল
আকাংক্ষা আগ ঐ মাহুঘটির মুক্তি পরিগ্রহ
করিয়া ইদার সমুখে ভুটিয়া উঠিয়াছে। এক
মুহূর্তেই ইদা আপনাকে তাহার পাশে ঢালিয়া
বিল!

ইদাকে দেখিয়া জাহাঙ্গীর ব্যস্ত হইয়া উঠিল,
মরোভাঁর শব্দবাতে উঠিয়া অস্বার্থনা করিল।
আর, আর্জেন্ট তির কক্ষর সকলেই ইদার
মুখর লাগিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু ইদা
কাহারও পানে চাহিল না!—সে শুধু
আর্জেন্টকে তাহার জীবনের স্বপ্ন—স্বপ্নে,
স্বপ্নের স্বপ্ন কবি আর্জেন্টকে দেখিতেছিল!

মরোভাঁর ইদাকে কহিল, “আপনার গজই
আমরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম.....সময়টা
নেহাৎ আড়ষ্ট হৈকবে বলে কাউন্সেল আর্জেন্টের
কবিতা পোনা যাচ্ছিল!”

ইদা আনন্দে শিহরিয়া উঠিল—কাউন্সেল!
সবই জ্ঞান!

ইদা তখন সগজ্বল বাণিকার মত তরল
কণ্ঠে আর্জেন্টকে কহিল, “খাম্বলেন যে?—
যেন চাচ্ছিল!”

আর্জেন্ট কিন্তু রাজি হইল না। কবিতার
খুব প্রেষ্ঠ অংশটা আবৃত্তির সময় ইদার
আগমনে বাধা পাইয়া সে মনে মনে চটরা-
ছিল। আর্জেন্ট কহিল, “আর ত নাই!—
পেন হয়ে গেছে।” ইদার প্রিয় কবি ইদার

পানে ক্রক্ষেপ না করিয়া অস্ত্রান্ত লোকের
সহিত আলোচন করিতে লাগিল। ইদা যেন
মুহুরে মরিয়া গেল। প্রথম দর্শনেই সে তাহার
প্রিয়তমের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে !
ইদার মুখপানি এতটুকু হইয়া গেল !

তারপর সত্যের কত কাজ হইয়া গেল—
ইদার চিত্ত আর কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না !
সে শুধু তাহার কনিকটে দোঁপিতেছিল !—
কি স্বন্দর তাহার পাঁড়াইবার তরী !—কি
উদাস তাহার চোখের দৃষ্টি—কবির উপগুক্ত
বটে !—এ অগতে তাহার মন নাই ;—কোন
স্বপ্ন বজনা স্বর্ণে তাহার চৈতন্যকোর কি এক
অপার্থিব সুখের আশার তখন ঘুরিয়া ফিরি
তেছে। ইদা মনে মনে আর্দ্রেষ্ঠের কত প্রশংসা
করিতে লাগিল। এইরূপে বহুদণ কাটিয়া
গেল। আবার আর্দ্রেষ্ঠের পালা আসিল।

ইদা ভূমিতভিতে ভূমিতে লাগিল। ভূমিতে
ভূমিতে “কি সুন্দর”, “কি সুন্দর” বলিয়া সে
বারবার মরোত্তার পানে চাহিল !

মরোত্তা বিমলগর্জনের দ্রব্য হাঙ্গিল।
ইদা মরোত্তাকে কহিল, “এমন লোক
আপনাদের সভার সভ্য ?—আপনি
ভাগ্যবান !”

আশুতি সনাত হইলে ইদা জিজ্ঞাসা
করিল, “কোন কোন কারণে এঁর কবিতা
ছাপা হয় ?”

“কোথাও নয়।”

মরোত্তার মনে হইল, ইদা যেন এই প্রশ্নে
তাহার কত স্থানে আঘাত করিল। কিন্তু
এই সুযোগে মরোত্তার খুব কাণে আসিল।
সে বর্তমান কবির নিন্দা করিয়া কহিল,
“নাহিত্যের এমনই হৃদয় হয়েছে যে ভাল

লেখা এখন আর সম্পাদকের পছন্দ হয় না !
যত পড়া লেখারই এখন আদর। ঐতিহ্যের
যুগ চলে গেছে এখন সুপারিশ তোষামোদের
কাণ পড়েছে।” মরোত্তা একটা নিশ্বাস
ফেলিল।

“যদি

পাক্ত !”

ইদা কহিল, “আপনাদের একখানা
কাগজ থাকা খুব দরকার !”

“নিশ্চয়ই !—কিন্তু টাকা কোথায় ?”

“টাকার ভাবনা কি ? সে যেমন করে
হোক হবে।—এমন হৃদয় জিনিষগুলো তা
বলে চাপা পড়ে পাক্ত !”

“কখনই উচিত নয়।”

মরোত্তা ভাবিল, আর ভাবনা কি ?—
এইবারে কাজ বাগাইতে পারিব !

মরোত্তা তখন আর্দ্রেষ্ঠের সখকে নানা
কথা বলিয়া ইদার মনটুকু আকর্ষণ করিবার
চেষ্টা করিল। আর্দ্রেষ্ঠের কথা ভূমিতে
ভূমিতে ইদা মুগ্ধ হইয়া গেল ! দেই সময়
জ্যাক মাকে কি বলিতেছিল, ইদা বিরক্ত
হইয়া বলিল, “জ্যাক, ছিঃ, চুপ কর—ব্রটাসি
করোনা !”

প্রথমে আর্দ্রেষ্ঠ বুঝিতে পারে নাই যে
তারারই সখকে মরোত্তার সহিত ইদার এত
নিম্নিতভাবে কথাবার্তা চলিতেছে। অবশেষে
সে জানিতে পারিয়া নিম্নেকে আরও জাহ্নি
করিবার চেষ্টা করিল। বথম সে আন্তের
সহিত কথা কহিতেছিল, তখন সে বেশ
বুঝিতেছিল, তাহার দিকে ইদার পিঠাঙ্গী চকু
হুইট মস্তবুদের জাহ্নি আকর্ষণ হইয়া রহিয়াছে।

দাঁও এখন একটু সুস্থিরাছিল যে তাহার

উপর আর্জেন্টাইন সে মোটেই লক্ষ্য ছিলনা
এমন নহে !

আর্জেন্টাইন কথাবার্তা শুনি দেয়না
সকলেই বলাবলি করিতেছিল—“কি ভয়ব !

—এখন আর দেখা যায়
ইনা ?—

অন্তাগিনী আত্মহারা ! তখন অনেক
বাঁধি—শতা ভয় হইল ।

শ্রীমদ্রামোহন রূপোপাধায়ক ।

রাজকন্যা ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

(মহারাণী মণিসুন্দরোভিত
স্বকোমল শয্যার দিক্‌দিক্‌ করিতেছেন ।)

ম। শুভক্ষিপকন্যের রাজকুমার তার
হস্তপ্রার্থী,—সে রাজরাণী হবে ! উঃ মনটা
এ কি করে উঠেছে !—

শেষ ত যাবে থাক না ? আমার
চোখের বাঁশি, বুকের শেল দুই হবে থাক—
ভালই ত ! নাঃ ; তার অত সুখ কিছুতেই
সহ হইবে না। আমি চাই বাঁদীর মত
হুটি হুটি অন্ন খেব,—ছ চার খানা ময়লা
পুরাণ কাপড় পরাব—আর উঠতে বলতে
মনের আঁলা দেখ—তবু সে ছেঁড়া বাঁশির
মত আমার পায়ের কাছে গোটায়ে । নিজে
যদি দিতেই হয়—সেবে আমার ভাইয়ের সঙ্গে
বিয়ে দেব,—চিরকালই আমাদের চরণভঙ্গার
পড়ে থাকবে ।—কিন্তু এতদিন ধরেও ত এ
ইচ্ছা পূর্ণ হোল না, আমার বাগের মধ্যে
কিছুতেই ত তাকে আনতে পারিছিনে । আজ
আবার একবারে ফাঁকি দিয়ে পালাতে
চলো—উঃ—উঃ ।

(কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া)

রাজরাণী সে—রাজরাণী ।—আমি নোঙগে

নোঙগিনী—পুত্রগরবে গরবিনী ! আর
পারিনে । হঠাৎ দেখে ছেলেই একদিন আমার
বুকের উপর বসে—আমার রাজ্যে রাজত্ব
করবে ; একজন গিরেও নক্ষা নেই ; আর
একজন আবার,—উঃ কি সহ্য !

মা চাবুতে আমি তোমার চরণে কি এত
অপরাধ করেছি, এত দিগেও আমাকে তুই
সুতান দিগিনে ! এ ছেন ঐশ্বর্য সম্পদ সব
যে বুঝা শুনি ! উঃ—আমি যে পাগল
হয়ে গাছি । শত ছাগ শত মহিষ ও চরণে
বলি দেন—নরবলি—ঐ কুমারীর রক্তেই
তোমার রাজ্যচরণে রাঙিয়ে তুলব—মাগো,
প্রাণ হও—আমাকে—”

(নেপথ্যে হুসুফি বাদন ।)

এ কি এরই মধ্যে কি বিশ্রাম গ্রহণ করিয়ে
গেল ? সন্ধ্যার কাল এগে পড়লো ? মনে
যে নরক আগা—কি করে এখন দেখ
সাতান—?

(রক্তহারিণীর প্রবেশ ও
নমস্কার পূর্বক)

এ। মহারাজ আজ সন্ধ্যার পূর্বেই
এখানে আসবেন ; সংবাদ পাঠিয়েছেন ।

সংগী।

জানাত।

এ। যে আছে। (নন্দকার পূর্ণক প্রস্থান)
(সখীগণের ধালিকাসজ্জিত রত্নালঙ্কার
ও অলঙ্কারাদি বহন করিয়া আগমন ও
ধালিকা নামাইয়া নন্দকার করিতে করিতে)

সকলে। কয় হোক মহারাণীর।

প্র-স। আমরা আজ সপ্তম দিক্‌কেই
অলঙ্কার আপনার সজ্জার সজ্জা এনেছি—
আদেশ হলেই সাঝাতে আরম্ভ করি।

রাণী। (উত্তিরা ছেলান দিচ্চা বসিচ্চা)
সাজা তবে তোরা সাজা, নিখুঁত করে সাজা!
মহারাজ আজ বিকালেই আসবেন।

(সখীগণ একে একে ধালিকা হইতে এক
একখানি রত্নালঙ্কার হস্তে তুলিয়া)

প্র। এই রত্ন মুকুট বড় রাণীর মাতার
ছিল—তিনি কতায় বিবাহের সময় নিজের
মাথা থেকে কতাকে এইটি পরিয়ে দিয়েছিলেন।

ধি। এই হীরকহার সিংহলরাজ বড়
রাণীকে যৌতুক দিয়েছিলেন।

তু। এই রত্নবলর—এই মণিখচিত
মেখলা—মাগর রাজরাণী রাজকন্ডার
অশ্রোপহার পাঠিয়েছিলেন।

রাণী। এ সবতাই এখন আমার—
আমারই,—

সকলে। আছে ইয়া। এ সকল এখন
আপনারই। আর আপনায় একে এই
সকল মণিরত্ন যেমন শোভা ধারণ করে
—এমন পূর্ণক কারো অঙ্গেই শোভা পায়নি।

(অলঙ্কার পরাইতে পরাইতে গান)

সাজাব তোমারে আজি মোগা বসনে,
জ্বলয় জ্বলোহন বেশ তুংগে।

কুছুম চন্দনে,

অলঙ্কার রঞ্জনে

জগজ্জ উৎখলিত চাক বসনে !

তারকা বিমোহন মুকুট হুশোভন

দ্বিগন্ত কলকন মণি রতনে

মুক্তা হীরক মালা, মরকত মেখলা

বিভূষা বাজু, বালা, ফুল কাঁকনে !

বাগিনী করত নুপুর চমকিত

কনক গয় পীত দিব চরণে !

মাধুরী উৎখলিয়া— হাঁসি বিকালিয়া

উৎখলিবে রূপ ছটা দিকে গগনে !

(সজ্জা শেষ করিয়া।)

প্র। কি সুন্দরই দেখাচ্ছে !

ধি। আঃ ময়ে যাই !

তু। বর্ণের অশ্রদ্ধা বিভাধরীও কি এত
সুন্দরী

(রাণীর উত্তিরা ভাবভঙ্গী সহকারে

আরনার আপনাকে নিরীক্ষণ)

রা। এইবার কুছুমালঙ্কার পরিয়ে দে
দেখি তোরা।

প্র। মাতঙ্গিনী দিদি এখনো
পৌছেন নি।

রা। এত দেরী যে আজ !

"(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

ধি। এই যে নাম করতেই।

তু। মাতঙ্গিনী দিদি আমরা তোমারই
সজ্জা অপেক্ষা করছি,—চল—কই ?

প্র। এ কি শূত্র হত যে !

মা। মহারাণী তবু কণ—না নির্ভরে
কর ?

রা। অবস্তা নির্ভরে। ব্যাপার খানি কি
বল দেখি ? সজ্জার সময় তুমি অজ্ঞানত আর

৩৪শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

এলে যখন তখনো—জল নিয়ে এলে না!
হেঁরাশি বলে নেন হচ্ছে বে!

মা। রাজকন্ডার দামী এলে তাঁর জন্তে
সব অলঙ্কার—সব জল নিয়ে গেছে।

রা। রাজকন্ডার জন্তে? আমার অলঙ্কার
—আমার জল সমস্ত তার জন্তে নিয়ে গেছে!
ভুমি কি প্রাণপ বকছ—মাতঙ্গিনি?

মা। প্রাণপ নয়—সত্যি কপাই বলছি
মহারান্নি।

মা। (ক্রুদ্ধকৃত্ত্ব মুক্তি ধারণ করিয়া)
একি আমাকে যে পাগল করে তুমি?
মালিনীরা দিলে কেন?

মা। তারা বলে—হাসি এসে সপ কেড়ে
কুড়ে নিয়ে গেল; হাছার হোক রাজকন্ডার
দামী ত—তাই তারা কিছু বলতে সংল
গেলে না।

রা। কি আশ্চর্য!—অসহ্য অসহ্য! (বগত)
—দেবীর কাছে গলি বিলেই এর সমুচিত শাস্তি
বিধান হয়। (প্রকান্তে) বন্দী করে আনতে
বল মাতঙ্গিনি,—তুধু তাকে না তার
কর্জীকণ্ড।

মা। ক্ষমা করবেন,—একটি
বলতে দিন —

রা। কি বলবে বল, আমি কিছু
কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না।

প্র। প্রেমোদ ভবনে মালী যে জল রেখে
গেছে তাই কি নিয়ে আসবে?

রাণী। হ্যাঁ দেই রকম দশাই বাড়িরেছে
বটে। পুশ্পালঙ্কার বত রান্নার ঘরের, আর—

মা। আর বাগান খাঁটান অরাদুল বত
রাণীর—? এ কথা বুঝে আনিস কি করে
গো?

রাণী। না আমার জলে দরকার নেই।
(মাতঙ্গিনীর ইঙ্গিতে) পরিচারিকাগণ তোমরা
এখন যাও আমার সমস্ত দেশ হরেছে।

(সবৌগণের নমস্কার পূর্ণক প্রণাম।)

না। মহারান্নি—দেখা ধরন; প্রকান্তে
এ রকম কোন শাস্তির আজ্ঞা দিলে আমরাই
শেষে হেরে গার। হাজার হোক তিনি
রাজকন্ডা, কোন গ্রহণী বা দৈনিক কেহই এ
আজ্ঞা সহসা পালন করতে চাইবে না।

রা। তুমি কি জলে গাঢ়—সেনাপতি
আমার ভ্রাতা; সেনাপতির হুকুম কেউ পালন
করবে না!

মা। কিছু নিশ্চয়ই অসহ্য হেরে পালন
করবে,—আর রাজার কানে কথাটা উঠলে
ক্ষতি হবে আমাদেরই।

রা। তুমি শুবে কি পরামর্শ দাও বল,
আমার এখন মাথার ঠিক নেই। তুমিই
একটা উপায় উদ্ভাবন কর। প্রতিশোধ
আমি চাই ই চাই—এ রকম অপমান সহ
করে ছুপ করে থাকি আমার কণ্ঠ নয়!

মা। আপনার অপমান—আপনার
চেষ্টাও আমার অসহ্য। আমি নিশ্চয়ই
শোধ তুদুব—হাসিকে লক্ষ করবই—আর
তাকে লক্ষ করলেই রাজকন্ডা লক্ষ হবেন।

রা। উপায় কি ঠাওরান্না বল দেখি?

মা। ছুপে ছুপে হাসির বাড়িতে আশ্রয়
ধারিয়ে দেব—সবংশে সব নিরক্ষণে হবে।

রা। হ্যাঁ তাতে হাসির বত হবে বটে,
কিন্তু আমি রাজকন্ডারও বত চাই—পকনদের
রানপুত্র এসে যে তাকে বিধে করে নিয়ে
যাবে—এ আমার সহ্য হবে না।

মা। তা যাতে না হয়—তার ত সহ্য

উপায় পড়ে আছে, আপনার তাইয়ের সঙ্গে
তার বিয়ে দিয়ে দিন না—

রা। রাজা কি রাজি হবেন ?

মা। আপনার কথাই রাজা রাজি
হবেন না—কি বলেন ? কিন্তু আগে দেখা
বলবেন না,—আগে বিয়েটা ঠিকের দিন !
পঞ্চদশের রাজা এঁদের অপমান করেছিলেন,
এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেই এটা সহজে
সিদ্ধি হবে।

রা। যদি না হয় ?

মা। তখন অল্প উপায় ভাবা যাবে, —
আমি থাকতে আপনার কোন ইচ্ছাই বিফল
হবেনা—এ বেশ জানবেন। দেখুন না
এখন আমি কি কাণ্ড করে আমি !

রানী। যাও মাতঙ্গিনী, তুমিই আমার
প্রকৃত সখী, বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষিণী—তোমার
উপকার জীবনে ভুলব না।

মাতঙ্গিনী। (স্বগত) রাজারানীর কথাই

যে ভোলে দেও নির্দোষ—আর আপনার
লাভটুকু বুকে যে তাঁদের মন সুগিরে
না চলে—সে আরও নির্দোষ ! (প্রকাশে)
মহারাজি, আপনার কাছেই যেন একোবনটা
কাটিয়ে যেতে পারি ! তাহলেই জীবনটা
সার্থক জ্ঞান করব। চলেম তবো—

(মাতঙ্গিনীর প্রস্থান ও প্রতিহারিণীর প্রবেশ)
প্রতি। মহারাজি, মহারাজ সমোদভবনে
এলে আপনার অপেক্ষা করছেন।

রানী। এবই মধ্যে ! যাও প্রতিহারিণি
—সংবাদ দাও—আমি এখন আসছি।

(প্রতিহারিণীর প্রস্থান।)

(রানীর আদনার সম্মুখে ঝড়োইয়া
গালসজ্জা নিরীকণ করিতে করিতে)

কিছুই শুষ্কট মনে হচ্ছে না, আদনার
ত রূপটা ঝগদলই করে উঠেছে—এখন।—

—যাই—আর দেখী করব না।

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য ।

[পুষ্পসজ্জিত প্রবেশ গৃহ ; ফুল রচিত সিংহাসনে রাজা রানী উভয়ে উপবিষ্ট। নিকটে
সখীগণ নৃত্যগীত করিতেছে। রাজা সতৃপ্ত নরনে রানীর দিকে চাহিয়া উভয়ে গুণগুণ
করিয়া কথা কহিতে কহিতে মাঝে মাঝে সম্মুখে সজ্জিত পুষ্পরূপ ধ্বজে পুষ্প গ্রহণ করিয়া
নৃত্যকারিণীদিগকে পারিতোষিক বর্ষণ করিতেছেন।]

সখীগণের গান।

অর অর অর অর

গাও আমাদের রাজা রানীর জয় !

এমন সুখের রাজা কোথা ত্রিভুবনময় !

ফুলে হেথাই নাহি কাঁটা, মেঘে নাহি আঁধার ঘটা

আলোক মধুর যিহু ছটা, প্রথম তপ্ত নর।

অর অর অর অর

৩৪শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ।

রাষ্ট্রকথা ।

গাও আমাদের রাজ্যরাজ্যের জয় !

এমন সুখে আমরা আছি—নাহি হুঃ স্তব্ধ ।

হেথা, সগাই খাজে মধুর বাণি,—শুধুই সমোদ শুধুই হাসি,

মগর বায়ু দিবানিশ, অধা গাকে বহ !

জয় জয় জয় জয়

গাও আমাদের রাজ্যরাজ্যের জয় !

(মূল বর্ণনের মধ্যে নৃত্যসীত করিতে করিতে সন্ধ্যার প্রভাঙ্গন ।)

মহা । (রাজ্যের দিকে মুখ করিয়া চাহিয়া)
স্বগত—কি সুন্দর ! যেন চমকে যেতে হয় !

রা । মহারাজ আজ আমার পরম
মোভাগ্য । তুমি রাজ্যকার্যে ব্যস্ত থাক—
আমি আদি দিবানিশ—তোমার অপেক্ষায়
তোমারি ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকি ।

রাজা । কি মনোমোহিনী সৃষ্টি ধারণ
করেছ মহিষি ! তোমাকে দেখলে আমার
কেন কার্য্যই—কেন কথাই মনে থাকে
না । অতৃপ্ত জ্বরে ঐ রূপসুধাসমুদ্রে মগ্ন
হয়ে পড়ি ।

রাণী । মহারাজ আমি পরম মোভাগ্য-
বতী ।

রাজা । তুমি মোভাগ্যবতী—না আমি
মোভাগ্যবান ?

রাণী । হি হি ও কথা বলনা প্রহরতম ;—
এখন বল অসময়ে কি সংবাদ দিতে এনেছ ?

রাজা । একটি সুসংবাদ এনেছি
মহারাজি । পুকুরের রাজপুত্র, কল্যাণের
হস্ত প্রার্থনা করে দূত পাঠিয়েছেন ।

রাণী । খুশি আশ্বাসের কথা । পুত্রকার্য
কিছু দেবার থাকলে বিত্তম—মনোপ্রাণ
আগেই ত সব দিবে ফেলেছি । অমন
আবর্তা লাভ মোভাগ্য বটে—কিছু—

মহা । কিছু কেন মহারাজি ?

রাণী । ঐর পিতা শুনেছি মহারাজের
পিতাকে পাণ্ডকা পাঠিয়ে অপমানিত
করেছিলেন ।

মহা । এ কি কথা !

রাণী । (স্বগত) সব আগে বার্ষ
বুঝি ! (সকাত্রে)—কিন্তু এট রকম ত সবাই
বলে ।

রাজা । কে বলে—নামটা কর দেখি ।
আমার পিতাই বরফ অস্ত্র করেছিলেন ।
পুকুরের তিনি বশন অস্ত্রি—দেই সমস্ত
রাজার পিতৃব্যকে তিনি বান্ধ কয়েন, তাইতে
উভয়ের স্বন্দুহু বাধে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার
পিতাই পরাজিত হন, ঘাইনাটা হচ্ছে এই,—
ঠিক বিপরীত ।

রাণী । (স্বগত)—বাঁচা গেল তবু একটা
স্বত্র পাওয়া গেছে । (সকাত্রে) ওঃ
বুঝি—এই পরাজয়ের অপমানটা—লোক
পাণ্ডকাবাস্ত বরে নিয়েছে । এখন কথা
হচ্ছে—এই ঘটনার পর জাতীয়ের হস্তে কত
সমর্পণ কত কি দেই অপমানকে স্বীকার
করে নেওয়া নয় ? সে বাপের কত আনা
স্বতন্ত্র কথা—তাতে বরফ অপমানের শোধ
নেওয়া হয়, কিন্তু অপমানিত হয়ে কতাবান
বোয় অপমানজনক !

ম । প্রথমতঃ দোষ আমার পিতারই ;

অপচ—তিনি-অরিগি বলে—পকনদরাজই এই ঘটনার যথেষ্ট লক্ষ্য হইবে কহা প্রাণনা কয়ে-
ছিলেন। এখানে—কিছুতেই আমি সে বংশের
প্রতি সন্তোষাব রাখতে পারিনে। দ্বিতীয়তঃ
সে বহুদিনের কথা, আমার পিতার ও
পকনদের পিতৃবংশ সুতরাং সঙ্গ্রে সঙ্গে—সে
ঘটনার বিস্তৃতি মধ্য হইবে।

রাণী। কিন্তু কোকে ত তা বলে না,—
তা বোঝে না।

রাজা। লোকের অধঃপাতে থাক।

রাণী। কিন্তু তোমার কস্তার বে রক্ষম
দত্ত সেও যেও বংশে আত্মদানে সন্ত হইবে
—তাও ত মনে হয় না।

মহা। তার মতামত কে বিজ্ঞান করবে ?
—আমার আজ্ঞাই কি এখানে যথেষ্ট নয়।

রাণী। তাহলে ভাবনা কি ছিল
মহারাজ ! যে কি এতদিনেও আমাকে মা বলে
স্বীকার করেছে—আমার অপরিণীত দেহও
কি তার গর্ভকে নষ্ট করতে পেরেছে !

রাজা। মহারাজি, ও কথা আর বলো
না—আমার রক্ত আশ্রয় হইবে ওই।

রাণী। আমি কি তোমাকে সব কথা
বলি মহারাজ। তোমার মনে পাছে অঘাত
লাগে, পাছে তার প্রতি দেহ তোমার কসে
যায়—এই ভয়ে বহুক্ষণ পারি—হিঙ্গের মনে
আমি সব সহ্য করি—।

রাজা। তুমি ঐশ্বর্যের প্রতিমূর্তি—

রাণী। এই আরই আমার অন্তে সুল
আনন্দের গিরে ফিরে এল। আমাকে অপ-
মানের জন্তই রাজকুমারের দানী সব ছুণ
লুট করে নিয়ে গেছে।

মহা। সেই জন্তই বুঝি তোমার অন্তে

আজ স্ফুটন নেই ! তুমি দেখি—তুমি
মৃতিমতী কমা।

মা। মহারাজ সে আমার সন্তান—
সুলসন্তান হলেও কুমাতা হয় না। আমাকে
হাজার অসম্মান, অবজ্ঞা করলেও—তবু তাকে
আমি কিছুতেই পর্য্য করতে চাইনে,—তার
ভেজ গর্ভ তার বংশেরই গোপাণ্ড।

রাজা। রাণি—তুমি যা বলছ—এতে
তার গুণ কিছুই প্রকাশ পাত্বেনা—তোমার
মহত্বই উজ্জ্বল হইবে উঠছে। তাকে বিদায়
করে দাও—এ বিয়েটা শীঘ্র শেষ করে ফেলা
যাক—তোমার পরগা ঘুচুক !

রাণী। (অগতঃ) আমি যে তা চাইনে—
কিন্তু আজ দেখছি বৈদ্য বলা ভাল নয়—সময়
বৃক্ষে বলতে হবে।

রাজা। মহিষি—তোমার প্রতি যে
একুণ ব্যবহার করে তার মুখ দর্শন করতে
আমার ইচ্ছা হয় না। ভগবান আমার সন্তান
ভাগ্য বড়ই মন্দ করেছেন ! যাকে নিয়েছেন
তার পরিবর্তে যদি একে গ্রহণ করতেন—

রাণী। মহারাজ—আমি যদি প্রাণ
দিয়েও সে শোক নিবারণ করতে পারতুম—

রাজা। স্তম্ভন যদি তোমার গর্ভে
আমাকে *একটি সন্তান দিতেন—তাহলেই
আমার সব শোক নিবারণ হোত !

(অভিনয় শিকড়িয়ার প্রবেশ ।)

শি। (নন্দভারপূর্বক) জর হোক ! আমরা
প্রস্তুত—আদেশ হলেই দৃষ্টিপট উন্মুক্ত করা যাবে।

রাজা। কণকাল বিলম্ব কর !—এ কি !
এখন চীৎকার দানি উঠছে কেন ?

(নেপথ্যে—আজ্ঞান আজ্ঞান—রক্ষা কর
রক্ষা কর,—মহারাজ মহারাজ—)

নি। তাই ত—এ কি ব্যাপার !
রাজা। যাও,—দেখ—প্রতিহারিণীকে
ডাক, আমি ক্ষণবিলম্বে অভিনয়ের আদেশ
পাঠাইব।

(বখাশে বসিয়া অভিনাদনান্তে শিক-
রিত্রীর প্রস্থান)

(প্রতিহারিণীকে আকুলভাবে প্রবেশ)

প্র। মহাবাহু—বিশ্ব অগ্নি কাত !
পশ্চিম প্রজাবান সংগে পুড়ে ছারখার হয়ে
যাচ্ছে !

মহারাজা। মন্ত্রী, সেনাপতি—এঁরা সব
কোথায় ? তাঁরা অবশ্যই নির্দোষ প্রমাণ
করছেন।

প্র। মহাবাহু ! প্রজাগণ আপনায়
দর্শন চাচ্ছে—আপনার নিকট হুংস নিবেদন
করতে এসেছে।

র। মহারাজ কি নিজে অগ্নি নির্দোষিত
করবেন—এইরূপ তারা প্রত্যাশা করে !

রাজা। রাণী সূত্রির হও, আমি সব
বন্দোবস্ত করছি—প্রতিহারিণী সেনাপতিকে
ডাকতে বল।

প্র। বে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

রাণী। মহারাজের মত করুণহর
রাজা পেয়েই তারা এমন অসমর্থ অদক্ষ
প্রস্তাব করে। তারা কি মহারাজকে একটু
নিজামেরও অবসর দেবে না ?

(প্রতিহারিণীর পুনঃ প্রবেশ)

প্র। মহারাজ, রাজকক্সা আপনার
দর্শনে এসেছেন—এখানে আসতে চান।

মহা। রাজকক্সা—কল্যাণী।

প্র। আজ্ঞে হ্যাঁ—আমাদেরই রাজকক্সা !

মহা। এখানে আসতে চার ! কখনই

না। এমন অবাধ্য কক্সার সুখদর্শন
করব না।—যাও প্রতিহারিণি এখানে আসতে
তাকে নিষেধ কর।

প্র। তিনি বলছেন পুনঃ জরী—

রাজা। তুমি যাও আমার লক্ষ্য প্রতি-
পালন কর। (প্রতিহারিণীর প্রস্থান)

রাণী। (স্বগত) দর্শনাগে ! কল্যাণী এখানে !
একবার পিতাপুত্রীতে দর্শন হলে আমার
মহল সবই ব্যর্থ হবে। (প্রকাশে) বোধহয়
তিনি আমার নামেই কিছু বলতে এসেছেন।
দাদী তুল লুট করেছে তুলে মহাবাহু পাছে
অসঙ্কটে চান—হয়ত তিনি তার গাফি
করতেই আসছেন।

রাজা। আমি চলেম—বহির্বি—স এখানে
এসে পড়তে পাবে—তবে সুখদর্শন আমি
করতে চাইনে !

(প্রস্থান—ও পশ্চিমদে কক্সাকে বসিয়া

তরুণভাবে দণ্ডায়মান)

কক্সা। (প্রণাম করিয়া) অগ্নিগ্নী কক্সার
প্রণাম গ্রহণ করুন মহারাজ।

রাজা। (স্বগত) দেই বকমই প্রতি-
কৃতি ! প্রণত স্মরণমুষ্টি ! দেখলে ক্রোধ
বিরাগ সব দূরে চলে যায়। এমন অধুরতার
মধ্যেও এত ঈর্ষা বিবেক !

(নেপথ্যে—আগুন—আগুন—ইত্যাদি)

রাজকক্সা। মহারাজ, পিতা,—আমি
প্রজাদের হুংস নিবেদন করতে এসেছি।
প্রজামণ্ডল অগ্নিদাহে ভয়ভূত। ঐ তুলন
কিরূপ ক্রন্দন কোলাহল উঠছে !

রাজা। সেজন্য ত তোমার চিন্তার কোন
কারণ দেখি না ! মন্ত্রী, সেনাপতি এঁরা সকলে
নির্দোষ ব্যবস্থা করবেন।

কহা। আমি সেই কথাই নিবেদন করতে এগেছি ;—আপনি যাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নিশ্চিত আছেন—তারাই প্রতাপীড়ক ।

রাজা। তুমি কি বলতে চাও, তাহাই আস্তন লাগিয়েছে ?

কহা। মহারাজ কমা করবেন—প্রজারা তাই বলছে—আরো বলছে—

রাজা। কি বলছে আমি শুনেচ চাইনে—
তুমি হরত বলবে—মহারাজার আসেনেই
একপ খটেছে—তোমার পকে কিছুট
অসম্ভব নয় !

কহা। নিরীহ প্রজাদের অসুযোগ

আপনি না শুনলে—কে শুনবে ? কে তাদের প্রতি হুঁসিয়ার করবে ?—সত্যই তারা মহারাজাকে—

রাজা। কান্ত হও, মাতৃনিদ্রা মহা অধর্ম,—তোমার এই ঈর্ষা আমার অসম্ভব !
তুমি আমাকে রাজধর্ম শিখিও না, তোমার কর্তব্য তুমি পালন করে চল ;—তাতেই রাজ্যের সমস্ত অশান্তি অমঙ্গল দূর হবে ।

(লজ্জাপথে প্রস্থান)

রাজকহা। উঃ কি করে আমি মহারাজার অঙ্ক নগ্নন কোটাইব ! কি করে দুর্ভাগা প্রজাদের হৃৎকেন্দ্র দূর হবে !

[পটক্ষেপ । প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ।]

জীবন ও মৃত্যু ।

জন্মের মাঝে মৃত্যুর বাস,
অথের মাঝেরে ধূপ—
ওরে মন, তুই ভেদে শুনে তবু
কেন বিষয় সুখ ?
মূলের কোরকে ফলটি হেরিরা
যাখা পেয়েছিস্ কবে ?
জীবনের মাঝে মরণে দেখিরা
নগ্নন মুছিতে হবে !
চন্দ্র তারকা অজ বাগ সে,
আবার কিরিয়া উঠে ;
ফলটি ফলারে ফুল কহে' ঘাঘ,
সেই ফলে ফুল ফুটে ।
দিবসের শেষে রাত্রি আসেই
দিন আঁর ফিরে নাকি ?
তোরি সে মৃত্যু-রাত্রির শেষে
বিবস রহিবে বাকী !

মৃত্যুর মানে শেষ নয় শুধু—
নবজীবনের পূত্র ;
জন্মের কোল ভরি দেখা দেয়
আনন্দ নবপুত্র ।
রে অবিশ্বাসি, সৃষ্টির বিধি
তোরি ভরে নয় ভিন্ন,
বিশ্ববিধানে চুনে' চুনে' নেয়ে
এক-ই সে চরম-ভিৎ ।
জীবন মৃত্যু, তাহারি সে দান,
তারি দান জ্ঞপ্ত গ্রহ ;—
ওরে মন, তুই সেই বিশ্বাসে
বৈধে নেয়ে আজ বুক ।
অর্থ ও ধূপ, চড়া আঁর খাধ
উঠে নামে বুয়ে-বুয়ে—
বেলে উঠে তার পূর্ণ রানিগি
জীবন-বহু-হুয়ে ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

রাজকোট।

বিগত বৎসর রাজকোটে গিয়াছিলম—
ভজরাতি সাহিত্যপরিষদের তৃতীয় সাপ্তাহিক
অধিবেশন দেখিতে। রাজকোট বোম্বাই
হটেতে রেলযোগে ২০ ঘণ্টা পথ এবং
কাটিওয়ারের কেন্দ্র বিন্দু। অধিবেশনের
কাজ অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।
গোষ্ঠণের উদ্যোগ সুশীলতা মহারাষ্ট্র নন্দ-
সুমানীকে অভ্যর্থনা কমিটির সভানেত্রী পদে
বরণ করা হইয়াছিল। রাজকোটের সুবিন-
গার্জোদ্বিত বিদ্যুত 'ফোন' অধিবেশন
হইয়াছিল। সভাপতি অতি সুন্দর ও পরিপাটি-
রূপে সজ্জিত হইয়াছিল। লতা প্রায়শ্চৈ
একদল বালক "অম্ব কান্তিবারী সরল সৌরাষ্ট্র
বানী" 'ললিত কবির' তৎকালোপযোগী
গানটী গাহিলে পর আর একদল বালিকা
আর একটি সুন্দর গান করিয়াছিল।
প্রতিনিধি ও বর্ষকবর্গের মধ্যে বহুসংখ্যক
মহিলা সভ্যমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।
মহারাষ্ট্রের অভ্যর্থনা পাঠ সমাপন হইলে
দেওয়ান বাহাদুর আবদুল্লাহ সাকর লাল
দেসাই এম এ, এল এল, বি মহোদয়
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কাটিওয়ারের গবর্নর দে স্তার উপস্থিত
হইয়া ইংরাজীতে সাহিত্যসেবীদিগকে ধন্যবাদ
দিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

চারিদিন ধরিয়া অধিবেশনের কার্য
চলিয়াছিল। অনেক বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি
পঠিত হইল। মহিলাদিগের মধ্যে জীমতী
বিভাগোবী নীলকান্ত বি, এ, সাহবা সুন্দর
বি, এ, ও নানীবেন করকটি প্রবন্ধ পাঠ

করেন। সাহিত্যে মহিলাদিগের কীর্তি,
স্রীসাহিত্যকগণ, স্রীকবিত্ত, চিন্মুখনে এক
ভাষা, প্রভৃতি বিষয়ের প্রবন্ধ এবং প্রভুত্ব ও
ঐতিহাসিক লঙ্ঘন নানা প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

এই সাহিত্যপরিষদের সংগঠে একটি
প্রদর্শনী খোলা হয়। তাহাতে পৌরাণিক
পুঁথিগর, শিলালিপি, মুদ্রা, চিত্র, সাজসজ্জা
প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য নানাবিধ হইতে সংগ্রহ
করিয়া আনা হইয়াছিল।

পুণ্যর গোষ্ঠী পুস্তকাগার হইতে বিবিধ
সংস্কৃত, শির্দান, ভজরাতি ও মাগাঠী পুস্তক
আনিত হইয়াছিল। হস্তি তালপত্র
লিখিত অনেক প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি,
তাম্রলিপি ও মুদ্রা বহুল পরিমাণে ছিল।
প্রাচীন কতকগুলি চিত্রও নানাবিধ হইতে
সংগৃহীত হইয়াছিল। শিবাজীর বাসন
অস্ত্র, সাতারার রাণীর পরিচ্ছদ, পৃথিবী
ও গ্রহ উপগ্রহগুলির স্থান নির্ণয়ের
জড় অপূর্ণ যন্ত্রসমূহ আনিত হইয়াছিল।
বস্ত্রসমূহ ১২ বানি 'প্রেট' আছে। সেই
'প্রেট'গুলি গুয়াইয়া পৃথিবী ও নানা গ্রহ
উপগ্রহের স্থান নির্ণয় অতি সহজে হইয়া যায়।
এইরূপ আর একটা যন্ত্র মিলয়ে পাওয়া
গিয়াছে বলিয়া শোনা যায়।

বক্তাবতার পরস্পর সাহেব পটাকাগের
অতি নীর্থ, সুবর্ণমূলেপিত ও চিত্রাঙ্কিত
একটা রামায়ণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, ইহা
বড় চমৎকার।

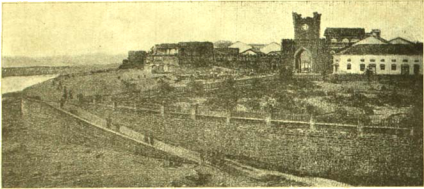
শিলালিপি, তাম্রলিপি, পুস্তক ও মুদ্রা-
গুলির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অসাধ্য।

অধিবেশনের শেষ দিনে গোপালের মহারাণী সাহিত্যপরিষদের হস্তে ৪০ টী স্বর্ণপুত্রা বিতে প্রতিষ্ঠিত হন ।

চতুর্থ দিনে গোপালের মহারাণী প্রতি-নির্ঘণ্টা লইয়া একটি সাঙ্ঘাসমিতির অঙ্কটান করিয়াছিলেন । সেখানে একজন

ডাট, কনমাস অম্বাণী নানা ছন্দে কবিতা আগুস্তি করিয়াছিল । সাঙ্ঘাজেন ও বিবিধ আনন্দেব প্রভু বাবদ্য ছিল ।

রাজকোটে কাঠিওয়াহের গবর্ণরের বাগডবন । ইনি কাঠিওয়াহের সমস্ত রাজস্ববর্ণেব 'বেসিডেন্টের' কাজ করেন ।



এখানে রাজকুমারদের একটি 'কলেজ' আছে ।

রাজকোট সহবতীর ঐতিহাসিক দৃষ্ট বৈশ্ব রমণীয় । একটি ক্ষুদ্র জলস্রোত সহরের পার্শ্ব দিয়া, পাৰ্বাণ তলদেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে ।

দিগন্ত প্রসারিত মাঠ,—সৌর্য্যোস্তের প্রাচীন ছবি, প্রকৃতির তরুলতার মধ্যে বোধ হয় একই ভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে । রাজকোটের তিন মাইল দূরে একটি সুসজ্জা স্থান আছে ।

ঐরবীন্দ্রনাথ লেন ।

পূর্ণিমায় ।

হৃদ-হৃৎ এ ধরায় চুহ-অশ্ব বধু-বার
আবেশ বহিয়া আনে বীরে—অতি বীরে ।
বাসন্তী পূর্ণিমা নিশা পরিপূর্ণ বননিশা ।
কি আনন্দ,—কি আনন্দ ! হৃৎপিণ্ড সনীরে
দূর হ'তে আসে বহি' 'হৃৎ'পিণ্ডি রহি রহি' ;
বিষ কোথা যুগে গেছে,—নাহি আর দেখা !

যোৎস্না-প্রাত বহুবার নিষিদ্ধ প্রকৃতি কহা :
আর কোথা কিছু নাহি, শুধু আদি একা ।
অনন্ত মরুত' পরে ভাব-সমীকরণ তরে
অসীম অসুচ-দিল্লী আনন্দে মগ্নিয়া,
অস্বাভ-এ "হৃৎ"-তাল, তার লনে এবি আশ,
—দুইটি প্রাণবাসন চলিল তাহিয়া !

ঐশ্বর্য্যসুখায় আর ভৌমুহী ।



সম্রাজ্ঞী মেরী

সরটি পঞ্চন কুত

জান্নতী

৩৫শ বর্ষ]

শ্রাবণ, ১৩১৮

[৪র্থ সংখ্যা ।

বৈশাখী বাড়ের সন্ধ্যা ।*

কণ্ঠ করত করত কণ্ঠস্থের এক এক
আঁখিগায় গ্রহি পড়ে,—তখন তাই নিয়ে
কাজ অনেক বেড়ে যায়। সেইটে ছিঁড়তে
পুলেতে পেরে নিতে চারদিকে কত রকমের
টানাটানি করতে হয়—তাতে মন উত্থাপ্ত
হয়ে ওঠে ।

এখানকার কাজে ইতিমধ্যে সেই রকমের
একটা গ্রহি পড়েছিল—তাই নিয়ে নানা
দিকে একটা নাড়াচাড়া টানাছেঁড়া উপস্থিত
হয়েছিল। তাই তেবেছিলুম আজ মন্দিরে
বলেও সেই জোড়াতাড়ার কাজ কতকটা
বুঝি করতে হবে, এ সবকে কিছু বলতে
হবে, কিছু উপদেশ দিতে হবে। মনের
মধ্যে এই নিয়ে কিছু চিন্তা কিছু চেষ্টার
আশ্বাস ছিল। কি করলে জটা ছাড়ানো
হবে, জঙ্গল দূর হবে, হিতবাক্য তোমরা
অবশিতভাবে শুনে পাবে সেই কথা আমার
মনকে তিতরে তিতরে ভাঙনা দিচ্ছিল।

এমন সময় দেখতে দেখতে উত্তর পশ্চিমে
ঘন ঘোর মেঘ করে এসে সূর্য্যোত্তের রক্ত
আভাকে বিলুপ্ত করে দিলে। মাঠের পর-
পারে বেধা গেল সূর্য্যক্ষেত্রের অখারোহী দূতের
মত পূনার ধারা উড়িয়ে বাতাস উন্নত ভাবে
ছুটে আসচে ।

আমাদের আগ্রমের শালতর প্রেয়ী এবং
তালবনের শিপরের উপর একটা কোলাহল
জেগে উঠল; তার পরে বেগতে বেগতে
আমবাগানের সমস্ত ডালে ডালে আশোষল
পড়ে গেল—পাতার পাতার মাতামাতির
কলমর্দনের আকাশ ভরে গেল—ঘন ধারার
বৃষ্টি নেমে এল ।

তার পর থেকে এই চকিত বিস্তারের
সঙ্গে থেকে থেকে মেঘের গর্দন, মাতামের
বেগ, এবং অবিরল বর্ষণ চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন
সন্ধ্যার অন্ধকার রূপে নির্দিষ্ট হয়ে এসেছে।
আজ যে সব কথা বলবার প্রয়োজন আছে
মনে করে এসেছিলুম সে সব কথা কোথায়
যে চলে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই ।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির খবরতাপে চারিদিকের
মাঠ শুক হয়ে দৃড় হয়ে গিয়েছিল, জল
আমাদের ঈশ্বারের তলায় এসে ঠেকেছিল,
আগ্রমের খেজুরল ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।
ধান ও পাণের জলের কি রকম ব্যবস্থা
করতে হবে সে অঙ্কে আমরা নানা ভাবনা
ভাবছিলুম, মনে হচ্ছিল যেন এই কঠোর
শুষ্কতার দিনের আর কোনোমতেই অবদান
হবে না ।

এমন সময় এক সন্ধ্যার মধ্যেই নীল

দ্বিত্ব দেব আকাশ ভেবে ছড়িয়ে পড়ল—
বেধতে বেধতে জলে একেবারে চারিদিক
ভেসে গেল। ক্রমে ক্রমে নর, কণে কণে
নর—চিন্তা করে নর চেঁচা করে নর—
পূর্ণতার আবির্ভাব একেবারে অব্যাহত ঝাঁক
দিয়ে প্রবেশ করে অনায়াসে সমস্ত অধিকার
করে নিলে।

ঐশ্বর্যাকার এই অপরিণাম নরও এই
নিবিড় স্রব্ধ দ্বিত্বতা আঘাত মন থেকে
সবস্ত প্রারম্ভ সমস্ত ভাবনাকে একেবারে
বিলুপ্ত করে দিয়েছে। পরিপূর্ণতা যে আশারি
কুস্ত্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে দীনভাবে বসে
নেই, আমার সমস্ত অস্ত্র:করণ যেন এই কথাটা
একদৃষ্টে অহুত্ব করলে। পরিপূর্ণতাকে নষ্ট:
নষ্ট: করে', একটুই সঙ্গে আরেকটুকে ছুঁড়ে
গেছে কোনোকালে পাবার গো নেই।
সে মোচাকের মধু ভরা নর, সে বসন্তের এক
নিখালে বনে বনে লক্ষ কোটি ফুলের নিপুট
মর্দকোবে মধু স্ফারিত করে দেওয়া।
অস্ত্রস্ত শুষ্কতা অস্ত্রস্ত অভাবের মানবানেও
পূর্ণব্রহ্মের শক্তি আমাদের অগোচরে
আপনিই কাজ করছে—যখন তাঁর সমস্ত হয়
তখন নৈরাশ্রের অগ্নির মক্কনিকেরও পরমতার
অভিযুক্ত করে' অকস্মৎ দেখি আশ্চর্যরূপে
বেধা বের! বহুদিনের মৃত্যুর তখন এক
দৃষ্টে যেটিরে কেল, বহুকাণের শুষ্ক
পুলিকে একদৃষ্টে জ্বাল করে তোলে—
তার আঘোজন যে কোথার কেমন করে
হজিল তা আমাদের বেশতেও বের না।

এই পরিপূর্ণতার প্রকাশ যে কেমন,
সে যে কি বাবাহীন, কি প্রচুর, কি মধুর,
কি সমস্ত সে আজ এই বৈশাখের দিবানদানে

সহসা দেখতে পেয়ে আমাদের সমস্ত মন
আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে; আজ অস্ত্রের
বাহিরে এই পরিপূর্ণতাই সে অস্বাভাবিক
করছে।

সেইজন্তে, আজ তোমাদের যে কিছু
উপদেশের কথা বলব আমার সে মন নেই—
কিছু বলবার যে দরকার আছে সেও আমার
মন বলতে না; কেবল ইচ্ছা করছে বিশ্বব্রহ্মের
মধ্যে যে একটি পরম গভীর অন্তরীম আপা
ভেগে রয়েছে, কোনো কৃপাবিশিষ্ট অভাবে
থাকে পরাস্ত করতে পারতে না, গানের স্রবে
তার কাছে আমাদের আনন্দ আজ নিবেদন
করে দিই। বলি, আমাদের ভয় নেই,
আমাদের ভয় নেই—তোমার পরিপূর্ণ পাত্র
নিরে বধন বেগা দেবে, সে পাত্র উজ্জ্বলিত
হয়ে পড়তে থাকবে—যে দীনতা কোনো দিন
পূরণ হতে পারে এমন কেউ মনে করতেও
পারে না সেও পূরণ হয়ে যাবে। নাম্নে
তোমার বর্ণণ, একেবারে স্বব স্বর করে স্বরতে
থাক্বে তোমার প্রসাধনারা—গহ্বর বচ
গভীর তা ভরবে তেমনি গভীর করে।

আজ আর কিছু নয়, আজ মনকে সম্পূর্ণ
নিঃস্রব্ধ করে পেতে দিই তাঁর কাছে। আজ
অস্ত্রের অস্ত্রতম গভীরতার মধ্যে অহুত্ব
করি সেখানটি ঘিরে ধরে ভরে উঠে।
বারিগার স্বরতে স্বরতে—সমস্ত মূর্খে থাকে,
দ্বিত্ব হয়ে থাকে, সমস্ত নবীন হয়ে উঠে,
জ্বাল হয়ে উঠে। বাইরে কেউ দেখতে
পাচ্ছে না, বাইরে সমস্ত মেঘাবৃত, সমস্ত
নিবিড় অন্ধকার—তার মধ্যে নৈসে আনন্দে
তাঁর নিঃসঙ্গরূপ দৃষ্টান্তি; ভরে ভরে নিয়ে
আনন্দে তাঁর স্ফাপান।

আজ যদি এই মন্দিরের মধ্যে যদে সমস্ত মনটিকে প্রসারিত করে দিই—এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, এই অন্ধকারে ঘেরা আশ্রয়ের তরুণাশক্তির মধ্যে; তবে প্রত্যেক মূলিকাটির মধ্যে কি গুঢ় গভীর পূজক অহুতব করণ; দেহী পুনরুজ্জ্বলিতের সঙ্গে আকাশের সঙ্গে গিরেছে;—প্রত্যেক তৃণ প্রত্যেক পাঠাটি আজ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে—তাদের সংখ্যা গণনা করতে কে পারে! পৃথিবীর এই একটি পরিবাশ্র আনন্দ নির্ভর মেঘাচ্ছন্ন লক্ষ্যাকানের মধ্যে আজ নিঃশব্দ রানীকৃত হয়ে উঠেছে। চারিদিকের এই মুক অশান্ত প্রাণের পূরির লক্ষ্যে নাহয় তুমিও পূর্ণি হও! এই মহলা অতাবনীরকে পূজ তরে পাবার যে পুনি, এই এক সূর্যে সমস্ত অতাবের দানতাকে একেবারে ভাসিয়ে দেবার যে পুনি—সেই পূরির সঙ্গে মাথায়

তোমার সমস্ত মন প্রাণশরীর আজ পুনি তরে ঝুঁক! আজকের এই গগনব্যাপী বোর ঘনগটাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করি। বহুদিনের কণ্ঠকোভ হতে উন্মিত গলির আশ্রয় ধূরে আজ ভেগে যাক—পবিত্র হই, বিহ হই। এস, এস, তুমি এস,—আমার দিক্দিগন্ত পূর্ণ করে তুমি এস! হে গোপন, তুমি এস! প্রান্তরের এই নির্জন অন্ধকারের মধ্যে বিহে, আকাশের এই নির্ভর স্তুতিধারার মধ্যে বিহে তুমি এস! সমস্ত গাছের গাভা সমস্ত তৃণধনের সঙ্গে আজ পূর্ণকিত হয়ে উঠি। হে নীরব, তুমি এস, আজ তুমি বিনা সাধনের ঘন হয়ে যরা দাও—তোমার নিঃশব্দ চরণের স্পর্শগতের গুস্ত আজ আমার সমস্ত জ্বরকে তোমার সমস্ত আকাশের মধ্যে খেলে দিয়ে শুক হয়ে বসি।

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইংলেণ্ডের ট্রেনিং কলেজ।

শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনার্থে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করাই ট্রেনিং কলেজের উদ্দেশ্য। কেবল আইন পড়িলেই যেমন নিপুণ উকীল হওয়া যায় না, বিচার্য বিষয়ের ক্ষমতা ব্যাচারাণের কার্যকালীন আইনজ্ঞান প্রাপ্তিতে জানা চাই এবং সে সম্বন্ধে যতামত ফৌশলে প্রকাশ করা চাই, সেইরূপ কেবলমাত্র বিভাজ্ঞান থাকিলেই যে কেহ হৃদয় শিক্ষক হইতে পারিবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই; এই জ্ঞানের সহিত তাহার আরও কিছু থাকা আবশ্যিক;—ছাত্রছাত্রীগণের সম্বন্ধে

কি প্রকারে পাঠা বিষয়ের জ্ঞান ধরিলে সহজে ও অনায়াসে তাহারা জ্ঞানার্জনের পথে চলিতে পারে তাহা তাহার জানা চাই। অবশ্য এখানে বলা বাহুল্য যে, ছাত্রের পারোক্ষ মানসিক ও নৈতিক জীবন গঠনের নিমিত্ত শিক্ষকের অগ্রান্ত জ্ঞানও থাকা চাই, কিন্তু উহা আমার অস্তকার আলোচ্য বিষয় নহে।

১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমরা দুইজন ভারতীয় ছাত্রী লণ্ডনের ট্রেনিং কলেজে শিক্ষার নিমিত্ত ভর্তি হই। এই কলেজ ইংলেণ্ডের

প্রথম প্রতিষ্ঠিত ট্রেণিং কলেজ। “মেমোরি
গ্রে ট্রেণিং কলেজ” নাম জনিটা অনেক
মনে করিবেন যে ইহা কাপলিক সম্প্রদায় দ্বারা
প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত; কিন্তু তাহা নহে।
খ্রীষ্টীয় মেমোরি গ্রে নামী জনৈক দলী মহিলায়
যত্ন ও অধ্যবসাতে ইহা স্থাপিত হয়, এই
নিমিত্ত তাঁহার অধ্যবসায় কলেজের উত্তরঙ্গ
নামকরণ হইয়াছে। কলেজের ছাত্রোনিয়াম
স্বাক্ষর অপর পার্শ্বে বিহিত।

সেপ্টেম্বর ১৯শে প্রাতে ছাত্রাবকাশের পর
কলেজ খুলিল। ছাত্রোনিয়ামে ৩৬ জন ছাত্রী
ছিলেন সকলেই প্রাতে আহার টেবিলে আসিয়া
আমাদের সহিত পরিচয় করিয়া লইলেন এবং
কয়েক জন আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া কলেজে
লইয়া গেলেন। কলেজের চতুকে যে বারগান
দাঁড়াইয়া ছিল আমাদের সহচরীগণ সকলেই
তাৎক্ষণিক “ওড্ মার্শিং মিটার ফুট” বলিয়া শুভ
প্রাতঃকাল ধোষণা করিলেন। প্রাতঃকাল
মিঃ ফুট ও “ওড্ মার্শিং” বলিয়া সকলকে
অভিবাদন করিলেন। আমাদের কাছে
ইহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হইল এবং
মিঃ ফুট বাস্তবিক ধারবান কি না সে
সময়ে তখন সন্দেহও উপস্থিত হইয়াছিল।
কারণ ধারবানও “মিটার” নামে অভিহিত
হইবে ইহা ইতিপূর্বে কখনও মনে করি নাই।
ইংলেণ্ডে থাকিয়া দেখিলাম, এখানে সর্বত্রই
চাকর চাকরাস্থির সহিত ঘণোচিত সম্মানের
সহিত কথ্য বলিতে হয়—কোন জিনিস
আনিতে বলিলে বা চাহিলে “অজুগ্রহ” কপাটা
ব্যবহার করিতেই হইবে।

ফটক পার হইয়া আমরা একটি চক্রে
পড়িলাম উহার দুই পার্শ্বে কলেজের উত্তান।

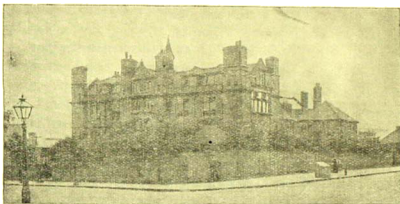
ফটকের দুই পার্শ্বে দুইটা “মে” ব্লক।
সেপ্টেম্বর মাসে সকল ব্লকই লোহিতাভ রঙের
পত্রে সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহা
আমাদের চক্ষে এক অভিনব দীক্ষণ
প্রদর্শিত করিতেছিল। চক্রেয় মধ্যস্থল
ফুটে সোপানশ্রেণী দেখা যাইতেছে, তাহা
অতিক্রমপূর্বক আমরা কলেজের “হলে”
উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই কলেজের
মূল বচন “দানন্দে শিক্ষা গ্রহণ ও দান করা”
—(Gladly learn and Gladly teach)
বর্ণাক্ষরে এক কাঠকলকে লিখিত রহিয়াছে।
প্রতিদিন প্রাতে ইহার উপর ছাত্রীদিগের
চক্ষু পতিত হইয়া উৎসাহ পূর্ণ করিত কি, না
জানি না, কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের
তারে যখন আমি ক্রান্ত হইয়া পড়িতাম তখন
কত সময় ইহা আমায় মনে উৎসাহ ও
নবশক্তি প্রদান করিয়াছে। চমকের এই
হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

১০ টা বাজিলে কলেজের প্রিন্সিপালের
নিকট সকল ছাত্রী সমাগত হইলেন, তিনি
প্রত্যেক ছাত্রীর কর মর্দনপূর্বক কুশল
জিজ্ঞাসা করিলেন। বীহার্য পুরাতন ছাত্রী
তাঁহাদের সহিত আরও দুই একটা বাক্যালাপ
করিলেন। প্রিন্সিপালের দক্ষিণ পার্শ্বে
কলেজের মহিলা অধ্যাপকগণের বসিবার
স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এই প্রকার পরিচয়াদি
লইতে ১২টা বাজিয়া গেল। তখন কলেজের
যে গৃহে ছাত্রীদের লজ কাগজ খাতা
পেনসিল রবার প্রভৃতি সজ্জিত থাকে সেই
স্থানে উপস্থিত হইবার লজ বট্টা পড়িল।
কলেজের মিথমাছদারে প্রতি টার্মে প্রত্যেক
ছাত্রীকে খাতাপত্রের লজ পাঁচ শিলিং করিয়া

বিত্তে হয় এবং প্রতি সপ্তাহের বৃত্তস্পর্শিত নামে একজন শিক্ষার্থী ছাত্রদের প্রোগ্রামনাটুসারে তাহাদিগকে এই সকল ঠেঁশনারী দ্বিতরণ করেন। সকল ছাত্রকেই এক আকাবের খাতা পত্র দেওয়া হয়। ১টার সময় লাকের বা মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা পড়ে। ২টা পর্যন্ত ছুটি। যে সকল ছাত্র কলেজের ছাত্র-নিবাসে থাকেন তাহাদের তথায় গিয়া আহার করিতে হয়, অবশিষ্ট ছাত্রীগণ কলেজেই আহার করেন। এ সম্বন্ধে

কলেজ ঘূষে হৃদয় ব্যাপ্ত আছে। যিনি যে প্রকার খাদ্য পছন্দ করেন তিনি সেইরূপ পাইতে পান। মাছ, ডিম, মাংস, হুপ, ম্যাকারোনি, শাকসবজী, কচী মাখন, চিন্ পুডিং ফল রুপ, কোকো, চা সবই থাকে। কলেজের ছাত্রবানের স্ত্রী (মিসেস্ বট) হস্তে আহার তথাবধানের ভার।

কলেজ ঘূষী চারিত্রা। প্রথমতঃলাগে অধাৰণালা, পাকশালা, ক্রোক ও ক্ষতা



ট্রেনিং কলেজ

রাখিবার ঘর, কিতাবগাটেন শ্রেণীর পত্ৰালা এবং লাইব্রেরী ব্যারাম বা ড্রিং-ক্লবরা।

দ্বিতীয় তলায় প্রিন্সিপালের বসিবার ঘর, তাঁহার অফিস, প্রকাণ্ড হল, এবং হলের পার্শ্ববর্তী ঘরগুলিতে বিভাগদের ছাত্রদিগের পাঠঘর। তৃতীয় তলায় কলেজের ছাত্র-দিগের পাঠাগার। চতুর্থ তলায় সঙ্গীত ও অঙ্কন শিখিবার ক্ষত বস্তর দুইটি বড় ঘর, অবশিষ্টগুলি কলেজের চাকর চাকরাণীদের।

মেসার্স এ ট্রেনিং কলেজের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার সহিত কিতাবগাটেন লিভ শ্রেণী হইতে লঙ্ঘন ম্যাট্রিকুলেশান শ্রেণী পর্যন্ত সংযুক্ত আছে। যাহাতে হাইস্কুল ও কিতাবগাটেন শ্রেণীতে ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীগণ অধ্যাপনা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন এই নিমিত্তই ইহা কলেজের সহিত যুক্ত রাখা হইয়াছে। লঙ্ঘনের ইরক প্রেসে যে বেডকোর্ড ট্রেনিং কলেজ আছে তাহাতে এ গ্রন্থি নাই। দ্বিতীয়তঃ আর

একটা স্থিতি যা যে ইহা শব্দন সহজের মধ্যে অবস্থিত না হওয়ায় দিব্যাত্মি গাড়ীর কর্ণভেদী শব্দ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কণ্ঠের সমুদয় দিকে সমসুবেই রোড, দক্ষিণে কুইন্স পার্ক নামক উদ্যান, পূর্বাংশে কণ্ঠের উদ্যান ও টেনিস কোর্ট, এবং পশ্চিমে চিভনী রোড।

প্রত্যেক ছাত্রী হাতে কণ্ঠের নিয়ম অবগত হন এবং তাহা পালন করেন ততদন্ত প্রথম দিন লাফের পথ প্রসঙ্গিণী ছাত্রীদের সম্বন্ধে সমুদয় নিয়মগুলি পড়িলেন এবং কি উদ্দেশ্যে নিয়ম করা হইয়াছে ও উহা ভঙ্গ করিলে কি ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা সবিশেষ ব্যাখ্যা দিলেন। অবশেষে হাতে ছাত্রীগণ আশ্রয়মালা অংশ পূর্ণক নিয়মগুলি পালন করেন তদ্রিমিত্ত অগ্ররোধ করিলেন। অন্ত ইহা বলা বাহুল্য যে ইংরাজ ভাষা নিয়ম পালনে সঙ্গী তৎপর, এবং আমি দুই বৎসরের কলেজ জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাতে কহাৎকই নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখি নাই এবং নিয়ম পালন যে কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে এমন ভাবও কেহ প্রকাশ করেন নাই।

ইহার পর নতুন ছাত্রীগণকে তাঁহাদের শরীরের মাপ ও ওজন লইবার জন্য অস্ত্র লইয়া যাওয়া হয়; বাহার বয়স ওজন তাহা কলেজের রেজিস্ট্রী খাতায় ছাত্রীর নামের সহিত লেখা থাকে। তৎপরে প্রাঙ্গণিককে একটা ছোটখাট পরীক্ষা দিতে হয়— ইহা বড় নতুন ধরণের পরীক্ষা।

এ, বি, সি, ডি, শিখিয়া অবধি কোন দিন মনে এতটুকু সম্বোধ আসে নাই যে আমি

ইংরাজী বর্ণমালা কোন বর্ণ সঠিক উচ্চারণ করিতে পারিব না; কিন্তু, যখন এই Voice Production বা কর্ণভেদের পরীক্ষা দিতে হইল তখন বেশিলায় যে এমনও বর্ণ আছে যাহা যথাস্থান হইতে সঠিক উচ্চারণ করিতে গম্ভীর হইতে হয়। ভাল, কঠ, মুক। প্রভৃতি স্থান হইতে বর্ণগুলি ঠিক উচ্চারিত হইতেছে কি, না তাহা আনিবার জন্য এই পরীক্ষা গ্রহণ। যাহা যে বর্ণ উচ্চারণে নোবে আছে তাহাকে সাম্প্রতিক Voice Production রূপে ঘাইতে হইত। আমাদের হস্তে একটা করিয়া অনন্ত মৌমবাতি দিয়া পরীক্ষক বলিলেন যে, দক্ষিণ নাগরিক বন্ধ করিয়া বাম নাগরিকের সাহায্যে—আবার বাম নাগরিক বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাগরিকের সাহায্যে একবারমাত্র সূচকাবেয় ধারা বাতি নিগাইতে হইবে। যে ছাত্রী উভয় প্রকার করিতে সক্ষম হইলেন তিনি পাস! ছাত্রী সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষণ তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত নতুন ছাত্রীগণকে কলেজকর্ত্রী কলেজের মহিলা ডাক্তারের নিকটে প্রেরণ করেন। যদি খাতি বা পরিভ্রম সম্বন্ধে কিছু পরিবর্তন আবশ্যক হয় তাহা হইলে ডাক্তার সে বিষয় কলেজের অধ্যক্ষকে জানাইয়া থাকেন এবং সে সম্বন্ধে নতুন সমস্ত কর্তৃপক্ষগণ গম্ভীর হইতে ক্রটি করেন না।

ইংলণ্ডের শিক্ষাবিভাগের অগ্রজ কলেজের আর ট্রেনিং কলেজেও তিনটা টার্ম—সেপ্টেম্বর মধ্য হইতে ডিসেম্বর বড় দিনের ছুটির পূর্ণ পর্যন্ত মিকেলসবোর্ন টার্ম। বড়দিনের অগ্র এক মাস ছুটি হয়। তারপর ইষ্টার টার্ম।

৩৭শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

ইংলণ্ডের ট্রেনিং কলেজ।

গুডফ্রাইডের অনতিপূর্বে চারি সপ্তাহের ক্ষুদ্র ইষ্টারের ছুটি হয়। এই টার্মই তিনটির মধ্যে দীর্ঘ। ইহার পর গ্রীষ্ম টার্ম। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে গ্রীষ্মাবকাশের নিমিত্ত কলেজ বন্ধ হইয়া পুনরায় সেপ্টেম্বর মাসে কলেজ খোলে।

ট্রেনিং কলেজে তিনটা বিভাগ আছে, ১ম,—লন্ডন সাটিকিটেকটপরীক্ষা—২য়,কেম্ব্রিজ সাটিকিটেকটপরীক্ষা, ৩য়—ফ্র্যাংকফার্ট ইউনিয়ন সাটিকিটেকটপরীক্ষা।

শেষোক্ত পরীক্ষার ফ্রেডরিক ফ্র্যাংকফার্ট মতে শিক্ষাবিগের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ শিক্ষাবিদ্ভিগকে তাহারই পরীক্ষা দিতে হয়। উপরিউক্ত দুইটা পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত কঠিন, বৃটশ্ বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট বা বি, এ, উপাদিপ্রাপ্ত ছাত্রগণই এই দুইটা পরীক্ষায় সাধারণতঃ প্রেরিত হন।

লন্ডন সাটিকিটেকট পরীক্ষা ও কেম্ব্রিজ সাটিকিটেকট পরীক্ষার মধ্যে অতি স্নগ্ধই প্রভেদ।

লন্ডন ও কেম্ব্রিজ সাটিকিটেকট প্রাপ্ত ছাত্রী হাইস্কুলের উচ্চ শ্রেণী বিভাগে কাৰ্য্য আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যতে কোন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষাবিদ্ভী অথবা কোন কলেজের অধ্যাপক হইতে পারেন। আন্যেবং এই ট্রেনিং কলেজের কর্ত্তা ও অধ্যাপিকাগণ সকলেই কেম্ব্রিজ টাইপন্স ও ট্রেনিংকলেজে শিক্ষালভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের মধ্যে কেহ কেহ কেম্ব্রিজ টাইপন্স ও এম, এ, উপাধিধারিত।

উক্ত দুই বিভাগের শিক্ষার্থীর বিষয় যথা, Theory of Education, History of Education and Practice of Education. এতদ্ব্যতীত অঙ্কন ও ব্যাকরণ শিখিতে হয়। তদ্ব্যতিরিক্ত কোন একটা শতাব্দীর শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশেষ ঘটনা পড়িতে হয়। আন্যেবং সপ্তদশ শতাব্দীর শিক্ষার বিষয় নির্দিষ্ট ছিল; অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশে শিক্ষার কিরূপ অগ্রগতি ছিল এবং কোন্ কোন্ মনীষী কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে প্রযুক্ত হইরাছিলেন তৎসম্বন্ধে আত্মোপাত্ত জানিতে হইরাছিল। এইরূপ প্রতিবৎসর কোন এক শতাব্দীর শিক্ষা বিষয় কেম্ব্রিজ বা লন্ডন দিষ্টিক্টের মেম্বরগণ কর্ত্তৃক পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হইয়া থাকে।

ফ্র্যাংকফার্ট ইউনিয়ন্ সাটিকিটেকট পরীক্ষার উপরিউক্ত তিনটা বিষয় অতি অল্প পরিমাণে পড়িতে হয়; কিন্তু তুলির ভাষা চর্চ্চিত চিত্রাঙ্কনে এবং সূক্ষ্ম পদার্থাদির গঠন ইত্যাদিতে অধিক সময় ব্যয় করিতে হয়।

শ্রাণিবৃত্তান্ত, উদ্ভিদ, সাহিত্য ও গ্র্যাফিটিকেল জ্যামিতি ট্রেনিং কলেজে শিক্ষার প্রধান বিষয়।

জিণ বা ব্যাকরণ ইংলণ্ডের সমুদায় বিদ্যালয়ে সব শ্রেণীতেই হয়। ইহা ব্যতীত বিবিধ খেলার আয়োজনও আছে।

ঔপনিবেশিক বিদ্যালয়।

আমাদের বিনোদন ও উদীয়মান যুগ।

নাম নহিলে পরিচয় দেওয়া যায় না, অতীত প্রত্যেক বিষয়েরই একটা স্বতন্ত্র আত্মগত নামের দরকার। সাহিত্যে এই নাম প্রসারণের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত, পুষ্প যেমন বৃত্তকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হয়, সাহিত্য সেইরূপ নামকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। নামপ্রসারণের এই অপরিহার্য নিয়ম বশে সম্ভাব্য প্রত্যেকটি উপরিণিধিত প্রকারে অভিহিত করা গেল।

বিষয়টি প্রচুর ভ্রূহোদর্শন সাপেক্ষ। বিনি এই নিশাশব্দন ও উদায়নের মাঝখানে গীড়াইয়া উত্তরকালই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই এইভূতের মধ্যে যে অবস্থান্তর ঘটতেছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠুর রূপে বলিতে পারিবেন। কল্পনার গৃহের পশ্চাতে বাস্তব-ছিত্রের নয়া সফলিত বৃষ্টি যেটুকু বিবরণ সংগ্রহ করিবে, হয় তা তাহাতে বহু ভ্রমপ্রসাদ পরিলক্ষিত হইবে, কিন্তু তবুও এই উত্তরভূতের সন্ধিক্ষেপে গীড়াইয়া আমরা যাহা হারাইতে বসিয়াছি তাহার বেদনা বহিরা ও বাহ্য লাভ করিতেছি তাহার আনন্দ লইয়া চূপ করিয়া থাকি যাইতেছে না!

প্রাচীন ভারতে সমাজ রচনা।

প্রাচীন ভারতের প্রথম সমাজ রচনার মধ্যে আমরা একটি একান্ত স্থগত ভাব দেখিতে পাই, একটি শোভন পারম্পর্যগত সূক্ষ্মতার দ্বারা তালি প্রণিত ও সজ্জিত। সমগ্র সমাজকে চতুর্ভুজের ও চতুর্দশের বিভক্ত করিয়া দিয়া এবং প্রত্যেক আশ্রয় ও বর্ণের পৃথক কর্তব্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া গেল।

তবেই প্রথম অধিকারী হইয়াছিল। তাহার জীবন-ব্যাপার কোনো স্থান দিয়া কোনো ব্যক্তি সংঘাত ছিল না, একটি প্রবল নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিঃশেষ মনুষ্য গমনে রণক্ষেত্রের শোণিত চিহ্ন দোহ করিয়া ও ধান-নিষ্কাশন কবিত্বের আশ্রয় তরুণ অভিযুক্ত করিয়া নীরবে বহিরা চলিয়াছিল। নিশাশব্দন যে আলোক-দ্বারা বিধের প্রাচীরে অবতরণ করিতে থাকে, তাহার অনাহত অকুটিত বিপ্লবের মত সে প্রত্যেককে নীরবে পরিণতি দান করিয়াছিল, উচ্ছন্নতামণ্ডিত করিয়াছিল, ঐ বিকৃত করিয়াছিল! বিচারনিষ্ঠ হইয়া আজ আমরা ক্রুদ্ধ করিয়া বলিতেছি যে “চতালের বংশধরকে যদি আবহমান কাল চতালের কাজেই আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে তাহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের সম্ভাবনা কোথায়? প্রতিভা কখনও স্থান কাল পাত্র বিবেচন করে না,—চতালের বংশেও প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির উদ্ভবের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং তাহা প্রতিনিহিত ঘটতেছে। কিন্তু প্রতিভাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া যদি সামাজিক শাসনের আঁটার মধ্যে ঘর্ষণস্বতন্ত্র পাপের চাপা দেওয়া যায়, তবে সমাজকে অবশ্যই একদিন তাহার অস্ত্র কতিপয় হইতে হইবে এবং সে কতি তখন পুণ্ডরীক কাহারো সাধা থাকিবে না।” কঠিন যুক্তি! এবং ইমারতের কঠিনতর রচনা ভেদ করিয়া বৃক্ষাচ্ছন্ন বন তাহার কোমল অপরিত স্তম্ভ নির ব্যতির করে, তখন তাহাকে যেমন দাবিয়া রাখা যায় না, তেমনি প্রতিভাকে সমাজ কখনও তাহার

কৃত্রিম অল্পশাসনের ভাৱে নিষ্পিষ্ট করিতে পারে নাই, প্রতিভার আঘাত যে বিশেষ শক্তি আছে, তাহা চিরদিনই তাহার অঙ্গ অঙ্গাঙ্গের বিক্ষেপে তুহণির পৃষ্ঠীভূত প্রতিবন্ধকতার শিলাস্তূপকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া দিয়া আপনার পথ বাহির করিয়া লইয়াছে। সেখানে ক্ষত্রিহের তপস্রা অধিকার ছিল না, তবু জনক রাজা রাজর্ষিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং বিশ্বামিত্র মূনি যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়াও মুনীগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। নিষাদপুত্র একলব্য যখন ব্রাহ্মণ্য গৌরবদর্শিও যোগের নিকট অন্নবিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, তখন সে প্রত্যাখ্যান তাহার রণশাস্ত্রে পারমশিতা লাভেচ্ছাকে বিলুপ্ত ও পূর্ণ করিতে পারে নাই, পরন্তু তাহার ধর্ম্মবীর্য্যের নিকট একদিন যোগোপার্জ্যকে তাহার পলিতশির মত করিতে হইয়াছিল। এই রকম, সাধারণের জন্য একটা সাধারণ বিধি প্রচলিত থাকে। সেবেও যেখানে নিয়ম উচ্চতরকে বিস্তার প্রাপ্ত করিয়াছে সেখানে উচ্চতর নিয়মের কাছে শিষ্য বীকারে হুস্তিও হয় নাই, মহাভারতে একদা বৃষ্ঠীভূত অনেক।

এই সব পরম্পর বিকৃত বাণীর হইতে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে, তখনকার যুগে উপায় উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারিত না এবং উদ্দেশ্য কখনও উপায়ের দ্বীপ বাহুল্যের ভাৱে জল হইয়া পড়িত না। যেখানেই উত্তরের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইত সেখানেই উপায়কে ছাটিয়া উদ্দেশ্যের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া

হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিকতায় যে একান্ত সরল সরল গতি—তাহাকে একদা অনারামকৃত চেষ্টার মধ্যে হস্তাতিষ্ঠিত করার তাহা কখনও বন্ধ হইয়া পাইতে পারে নাই, তাহার নিত্যোৎসাহিত নিখুঁত জলধারা দৌলধর্মে ও পোভাষ চারিদিক্ তরঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষণ। এই ত গেল প্রাচীন ভারতের প্রাচীন চিত্র। যথা- যুগে ভারতের যে চিত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহা বিশ্লবৎগে একান্ত সংক্ষুব্ধ। ভারতের নিম্নপগঠন সমাজ-দোষ তখন অনাধ্যাত্মিক সমূহের সহিত সংমিশ্রণে উদ্ভূত নবধর্ম্ম সমূহের সংঘাতে বিপরীত; ধর্ম্মাবিধি সমাজবিধি লোকবিধি— চিরচরিত আচার অহুতান নবযুগ সমুদ্ভূত তরঙ্গবেগে কম্পমান। নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরিক কেতু সমুদ্র বেবমন্দির সমূহের চূড়া ভেদ করিয়া তখন প্রবল শক্তিতে উচ্চীহমান;—নিয়মনিষ্ঠ তত্ত্বাচারী ব্রহ্মণ্যকে পদতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া একজাতিবৈষ্য ও একধর্ম্মের সামাগানে ভারতের আকাশ প্রতিধ্বনিত। ভারতের উলৌহমান বৌদ্ধযুগ ও বিলৌহমান ব্রহ্মণ্যযুগ হই আখ্যাতপ্রাচীন প্রবল প্রতি-ধ্বনী পরম্পরের সহিত অবিরত যুদ্ধ নিরত। প্রাচীন ভারতবর্ষের অবনতির ইহাই প্রারম্ভযুগ।—কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম, উভয় পক্ষই এ সময় ধর্ম্মশক্তিকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রাধিক্যের জন্য চেষ্টিত এবং পরম্পরকে পরাজিত করিবার জন্য বহু কৃত্রিম উপায়ে আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে বহুশরিকর। ইহার ফলে বৌদ্ধ-

ধর্ম ও ব্রহ্মণ্যধর্ম উভয়ই বহন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল, এবং ধর্মের যে অলুপনীয় আদর্শকে পন্থে নিষ্ঠার সহিত তাহার অভিমুখ রাখা করিয়া আনিতেছিল তাহা একেবারে বিকৃত হইয়া গেল। উভয় দিকের এই সময়ে যে ভগাবলোপ (degeneration) ঘটিল তাহা ভারতের ভাগ্যাকাশে ভূতলনের রূপে লক্ষ্য হইয়া রহিল। সাকারোপাসনার বহু বিক্রম ও আশ্রয় হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা বুদ্ধদেব ইহরীর প্রবেশের উত্তরে তৃক্ষীভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার নির্দিষ্ট পথ শুধু সাধনের দিকে ছিল, ভ্রমের লব্ধ তাহার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার গেম-প্রদান মনোবৃত্তি লইয়া বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত একমাত্র সাধন-পথ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না। প্রাপণ্য ব্যাকুলতা লইয়া সে চাহিতে লাগিল সাধ্য বস্তুকে, বৌদ্ধ ধর্ম যখন তাহা দিতে পারিল না তখন তাহার বুদ্ধদেবকেই তাহাদের শূন্য পাদশীঠে স্থাপন করিয়া অস্তরের কুখা নিবৃত্তি করিল। ফলে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম প্রবল সাকারোপাসনার পরিণত হইয়া চৈতন্য বিহার পিঠিত্বহার সমাজের হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের শীঠস্থান, কিন্তু সেই ভারতবর্ষে আজ বৌদ্ধধর্মের কোনো কিছু নাই, তাহা সমুদ্রপারবর্তী হুদুস্তর দেশদেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহার মূলে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই চিরপ্রম-প্রবণতাকেই দেখিতে পাই। যে ধর্ম শুধু অহুতানে—তাহাকে সে জগৎ বান করিতে পারে নাই, প্রেমাম্বদের মজ তাহার যে চিরন্তন আকুলতা,—তাহা তাহাকে শুধু জানের

ও কণ্ঠের রসহীন বৈচিত্র্যহীন ভূমির বেঠান হইতে বাহিরে আনিয়া গাড় করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। ভারতের এই প্রেম প্রবণতার যখন নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম আত্মোপাশ্রয় দেখর হইয়া উঠিল, তখন প্রাচীন নৈদিক ধর্মও আত্মল পরিবর্তিত হইয়া গেল। বর্তমান যুগে গীড়াইয়া ভারতের অতীতকে যে তিনটি বিশেষ যুগের দ্বারা বিভক্ত করা যায়—তাহা সত্য ত্রৈতা ধাপ। এই তিন যুগেই ব্রাহ্মণ তাহার ধর্মসৌধের স্তম্ভ স্বরূপ, ব্রহ্মণ্যধর্মই তাহার ধর্মের মূল ভিত্তি। গতযুগে পরন্তরাম অবতীর্ণ হইয়া যখন তাহার কুঠারবাতে বহুক্ষমকে ধাদনবার নিঃকরিয় করিলেন, তখন তিনি প্রচার করিলেন ব্রহ্মণ্য ধর্মের নিরুৎপন্ন স্রষ্টা। তাহার পরবর্তী যুগে শ্রীরামচন্দ্র কৈশোর হইতে সমস্ত বিপদ ও ক্রোধ তুচ্ছ করিয়া যখন ব্রাহ্মণের কাছে আপনায় জীবন নিবেগন করিলেন তখন তিনি পরন্তরাম প্রতিষ্ঠিত এই ব্রহ্মণ্য প্রাধাত্যেরই প্রতিষ্ঠা করিলেন। আবার তাহার পরে ঐক্যক আনিয়া যখন ব্রাহ্মণের পদাধাতের চিত্র আপনায় বন্ধে ধারণ করিলেন তখন তিনি সেই প্রাধাত্যেরই দোরব বোধনা করিলেন। কিন্তু ইহার পরে বুদ্ধদেব যখন তাহার সাম্যবাদের কুঠার দ্বারা এই প্রবলপ্রতি ব্রহ্মণ্যকে আঘাত করিলেন, তখন তাহা পরন্তরামের কুঠারমূখে পতিত কত্রিয়বংশের মতই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িল। পরে শঙ্করাচার্য্য তাহার স্মৃতিমহে প্রাপদান করিলেন ও তাহার পূর্বতন বাহ্যশ্রী অরি মিথাইয়া আনিতে সমর্থ হন নাই। শুধু প্রভৃতি বহু উপধর্ম ও উপশাস্ত্রের এই দ্বয়ে

উদ্ভব হইল, বৌদ্ধধর্মের ভিতরে বাহ্যিক কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া যোগসিদ্ধি অর্জন পূর্ণক ভাহার অর্পণাবহারে প্রস্তুত হইল, নির্জ্ঞানাদ্যক বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে আপনাদের নৈরিক পতাকার তল হইতে পৃথক্কৃত করিয়া দিল এবং তাহার প্রতিযোগী ব্রহ্মা ধর্ম আপনাদের বস্তুত্বের অন্তই হউক অথবা তাহার চিরন্তনত উপায়তা অথবা সদাশরিতার অন্তই হউক, তাহাকে বহু প্রদারণ করিয়া আলিঙ্গন করিয়া লইল। ফলে যে হিন্দুধর্ম প্রকৃতির ভিতরে পূর্ণত্বকে উপলব্ধি করিয়া একেই উপর একেই অকারণ তুলিতেছিলেন সেই হিন্দুধর্ম তেজস্বিনীকোটা দেবদেবীর স্বকণোলকরিত মূর্তি গঠন করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল, এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ বহুবিধ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের আঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতের ফলে বহু পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

এই সুদূরগত যুগগুলির সহিত বিংশ শতাব্দীর লোক আমরা কোনো বনিষ্ট সম্পর্কের দাবী করিতে পারি না। তাহার সহিত আমাদের দৃঢ় বন্ধন বহুকাল হইল বিমুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের কল্পনা ও কামোদ যত্ন লোকের ভিতর একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত, স্মরণ্য তাহাকে লইয়া যদি আজ আমরা বিচার করিতে যগি তবে তাহা একেবারেই ব্যক্তব সীমার বহির্ভূত হইয়া পড়িবে।

আমাদের বর্তমান হিন্দুধর্মকে অপর তিন যুগের মত ঠিক ব্রহ্মাধর্ম নিশ্চয়ই বলা যায় না। বরঞ্চ শুভযুগে ব্রহ্মাধর্মের প্রাধান্যের যে আভিস্য বটিকাছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে তাহার প্রতিক্রিয়া

একপ ক্ষতবেগে আরম্ভ হইয়াছে যে আজ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই কোনো কোনো স্থলে ব্রাহ্মণ-নিরপেক্ষ বেদতাপুত্রা পর্যায় প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে! যে জিনিষটা যত উপবে উঠান যায় তাহার পতন বেগ তত প্রবল হইবেই। যে ব্রাহ্মণ—আগে সমস্ত ভারত-বর্ষীয় লোকের শার্বহান অধিকাংশ করিয়াছিল, এবং সমস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজ বাহার অঙ্গুণি হেলনে চালিত হইত, তালোখ্য তুপাণ যাহার পদরস মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যখন প্রকার উত্তম পিণ্ড হইতে অলিঙ্গিত হইয়া নিরে পতিত হইল, তখন ভারতবর্ষ সেই চূর্ণাবশেষ বিকৃতবেহ প্রাণ-মোক্ষার্থ আকৃতির নিকে চাহিয়া যুগাব নিঃশ্বাস উঠিল!

উনবিংশ শতাব্দীর ভারত। উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা ভারতের যে চিত্র দেখিতে পাই, তাহা মধ্যযুগের বিপ্লব চিত্র অপেক্ষা বহু পরিমাণে শোচনীয়। কারণ বুদ্ধধর্মের বিরোধানের পর বাহার্য যৌগিক ক্ষমতা লাভ করিয়া বীতংগ বামাচারে প্রস্তুত হইয়া ভারতের শাস্তিহীন উৎসাদন করিতে-ছিল তাহারো সম্প্রদায়ের সর্কার গতির ভিতরেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী যখন অস্বাভাবিক আলোড়নের অবশাদ ভারতের তন্ত্রান্ত্রিমিত চকের কাছে তাহার বহির্ভগনের চিরফল কপাট খুলিয়া আদিয়া দাড়াইল, তখন এই আসমুদ্র হিমালয়ে কুমারিকা ভারতবর্ষ তাহার অপকল্পের মোহে আশিষ্ট হইয়া পড়িল। তাহার নিম্নের বাহা কিছু ছিল তাহা লক্ষ্য তাহার কাছে বিবর্ণ ও হতশ্রী

হইয়া উঠিল, তাহার আভ্যন্তরীণ তাহার কাছে নগ্ন হইয়া গেল, তাহার সত্যতা তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল, সে তখন নিজের ঘাড়া কিছু তাহাই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে উত্তত হইল ।

কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে প্রাচীন ভারতবর্ষ যখন এইরূপে তাহার অগাধ তত্ত্ব সমস্তই অবহেলে বিলক্ষণ দিতে প্রস্তুত তখন তাহার জরাজীর্ণিত দুর্জল শক্তি তাহাকে সে প্রয়োজনীয় দান করে নাই; দীর্ঘকাল আচার পালন করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ভোগ নিরত থাকিয়া কর্ণে উদ্যোগী হইয়া পড়িয়াছিল, ইঞ্জির নিরোধ করিয়া জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল । সে চাহিয়াছিল একবার নড়িয়া বসিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতে; আপনাব্যয় নিঃশব্দ নিঃশব্দ কঠিন উচ্চতাকে বর্জন করিয়া তাহার পারিপার্শ্বিক সমস্ত সফল ভূমিবাস একবার সমান হইতে; যে নিঃশব্দ ধানের আশ্রমে বসিয়া সে আপনাব্যয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অগাধ করিয়া ফেলিতেছিল, তাহা হইতে আপনাকে একবার উত্তীর্ণ করিতে! কোথায় সে দুর্গম শিলা-গহবরের নীচে ভোগবস্তুর পূর্ণা ধারা—পলিতকেশ জড়িতা-বিশ্ব-অঙ্গ প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহার সন্মুখে ব্যস্ত করিতে পারিল না । তাহার কাছে দিয়া কখনো যে উত্তমঃ প্রাচীন চলিত-ছিল, তাহার জলেই সে গাহন করিতে নাশিল ।

উনবিংশ শতাব্দী বঙ্গদেশের পক্ষে অতি বিচিত্র কাল । রামমোহন, রামকৃষ্ণদেব-প্রমুখ ধর্মোন্মাদগণ, হরিশঙ্কর, কৃষ্ণদাস, ব্রহ্মসং-নাথ, শিবরামনার প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতৃগণ

উদ্যমশ্রমে, তারকনাথ প্রভৃতি মনসী বাসনার-ছোঁয়াগণ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি মনসী সাহিত্যিকগণ এমন কি কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই শতাব্দীতেই অদ্বৈত হইয়াছেন । আবার এই যুগই নৃতন পাকাতা শিক্ষার দীক্ষিত সমগ্র বঙ্গবাসীর যুবকবয়সে আবির্ভাবলাভ । তাহাদের প্রাণে তখন যেন বহু “তাক্সি বাপার” অভিনীত হইতে লাগিল । ফল যখন বোটা ছাড়িয়া মাটিতে পড়ে, তখন তাহা তাহার অসুপকতার অনিবার্য কারণ বশতঃই পতিত হয়, এবং তাহার সেই স্বাভাবিক যে চরম পরিণতি—তাহা প্রাপ্ত হইয়া সে আপনি ধস্ত হয় এবং নিখলোককে তৃপ্তি দ্বারা ধস্ত করে । কিন্তু একদিন সহসা এক আকস্মিক স্মৃতির উল্লেখের দ্বারা তাহাকে অপরিসৃত অবস্থার বৃত্ত হইতে পৃথক করা যায়, তবে তাহার যিনিই স্বাভাবিক কারণ ও তত্ত্ব রূপের দ্বারা ভোক্তাকে পীড়িত করিতে থাকে । ঠিক এইরূপ একটা আকস্মিক আকাঙ্ক্ষাবোধে চকল হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর অপরিণামদর্শী ইহা বৈদ্য অধঃপতনের নিয়মে মাঝি পড়িতে লাগিল । ভারতের যুগ যুগাঙ্কিত পূর্ণা পদরা হ্রাসপ্রোচে নিম্নমান হইয়া, তাহার পৌরুষত্ব হরণ করিয়া কর্তব্য বৃত্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, তাহার নির্মাণ নিরাস্তর ধ্বংসে ভোগাভ্যাসের বীজ অকস্মাৎ মাথা পল্লব মেলিয়া তাহার তিরস্কৃত নভস্বল ভ্রমোতিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া দিল ।

উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চরূপ উৎকৃষ্ট ও নিকট পাতার শক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্করণে সম্বন্ধিত ও অতিষ্ঠ বিচার শক্তিতে আগ্রহিত বিংশ শতাব্দী যখন ভারতে অদ্বৈত হইল,

৩৭শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

বিলৌহমান ও উদৌরমান যুগ।

তখন সে গভ পতাকী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর
চিত্র তাহার সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পাইল।
পানবোধ এবং তাহার আত্মপরিচয় স্থগিত
কৃত্বশিত পাপ প্রায় এককালীন দূরীভূত,
ছাত্রসমাজ চরিত্র-নীতিতে সজ্ঞাবান ও
নৈতিক সঙ্গীতের পালনে উৎসাহিত,
বহুবিবাহ, প্রভৃতি বহু সামাজিক কুসীতি
সম্মুখে উজ্জ্বল ও অবশিষ্টগুলির বিদগ্ধনে
চেষ্টা এবং বিশেষায়ণ সঙ্গীতির সংরক্ষণের উগ্রম
আগরিত। হামমোহন প্রমুখ ধর্ম্মাঙ্গারের
কৃপায় ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম (ব্রহ্মবাদ
নদি ও নদ) পুনর্বিকাশের পথে অগ্রসর,
পরমহংসদেব প্রমুখ যুবক-সমাজ প্রভীচা
দর্শন-শাস্ত্র-সমুদায়িত সংস্কার ও নাস্ত্র-
কর্তার জড়িত শোচনীয় বিশ্বাসহীনতা হইতে
মুক্ত হইয়া ভারতের সেই নব-সমুদিত
পতাকা মূলে সম্মিলিত। নুতনধর্ম্মের
মোহ ও অপরূপের কৃষ্ণ কটাইয়া
বর্ত্তমান ভারত নিজে কর্তব্যকর্ম্মসমূহের কলাকল
নির্ধারণে সক্ষম হইয়াছে। সেই অরু অহু-
করণ—বাহা শুধু পশ্চিমের ধারণাতে
পরিভাস্ত আবেশমাত্রাপেক্ষা তিতর দ্বিগুণ
তাৎপর্য্য একদিন পক্ষে অক্ষর করিয়া
দিয়াছিল—তাহা হইতে সে এখন মুক্ত হইয়া
মান-নির্মূল বেশে ধাঁড়াইয়াছে। তাহার
সম্মুখে আবার তাহার সেই পুণ্য বজ্রাঘি
অলনোদগুণ, তাহার শরিতাক্ত উত্তরীর আবার
তাহার স্বকো বিলম্বিত, তাহার লগাট আবার
সেই পুণ্য চন্দনের কলাপ লগাটিকার
বিস্তৃষিত, তাহার কণ্ঠ আবার সেই দেবতার
প্রদীপ্ত মূলের আশ্রয়পূত মালো অলঙ্কৃত।

একাল ও সেকাল। প্রাচীন

সম্প্রদায়ের মুখে আরকাল একাল ও সেকালের
প্রথম সমালোচনা ক্রান্তিতে পাওয়া যায়।
ঔহাদের সময়ে বাহা ছিল, তাহা যে বুদ্ধিহীন
বর্ত্তমান ভারত সব খোঁজাটয়া বসিয়াছে—তাহা
বিশ্রা ঔহারা বিবম শ্রোত প্রকাশ করিয়া
পারেন। এখন দেখা যাক ঔহাদের উক্ত
অভিযোগের ভিতর কতটা সত্য নিহিত আছে।
কিছু একথা কেহ যেন বিস্মৃত না হন যে, এই
তুলনার সমালোচনা আমাদের উদৌরমান এবং
বিলৌহমান যুগের মধ্যেই,—যে যুগ আমাদের
অপোহীত দিবসের প্রথের মত বহুকাল অস্ত
গিয়াছে—সেই একান্তগত অতীতের সহিত নয়।

শোনা যায় যে, আমাদের এই বিলৌহমান
যুগে ধর্ম্ম নিষ্ঠার খুব প্রাবল্য ছিল। কথাটা
ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া যাক। খ্রীষ্টোত্তর
যেবের আবির্ভাবের পর ভারত যখন কর্তব্য
উপেক্ষা করিয়া তাবের আতিশয্যের দিকে
অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ধর্ম্মচর্চা ও কর্তব্য
সাধন সমান ভাবে পরস্পরের সহিত খলিত
হইয়া পড়িল। এদিকে বৈষ্ণবধর্ম্ম তখন
তাহার হরিনামাঙ্কিত পতাকা উড্ডীরমান
করিয়া বিশ্বমর প্রচার করিয়া দিল যে একবার
মাত্র হরিনামে লভ অম্বের কলুষ ক্ষণিত হয়।
তৎপর জনসাধারণ সে আশ্রমে প্রেরণালনের
কঠোরতার দ্বারা হইতে আপনাদিগকে মুক্ত
করিয়া লইল। পৃথিবীতে যত কিছু নিম্ননীচ
বিষয় আছে, যত কিছু বর্জ্যনীয় পাপ আছে
—তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবত্তত্তির চর্চা
চলিতে লাগিল। উন্নত অল্পতর ঘনী নির্ধন
জ্ঞানী অজ্ঞানী আপামরসাধারণ তাহাদের
জীবনের অকুণ্ঠিত চর্চিত পাণরানি তুলনীর
তলে এবং জাহ্নবীর স্রোতধারার নিক্ষেপ

করিয়া পরম নিষ্ঠুরতা লাভ করিতে লাগিল। আমাদের বিনোদনময় গৃহে বৈষ্ণবধর্মের এই কদমার্জিত ভাবাভিযোজ্য তৎক্ষণাৎ বিলক্ষণ বহিতেছিল, ধর্মের খাতিরে মনুষ্যের বিরোধী কোনো কাণ্ড হইতে বিরত থাকা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। ত্রাণনাথ ধর্মের মধ্যমাখা দ্বিধার বহুই ক্ষম না রাখিত হউক, তখনকার গাহবা জীবন প্রাপত্য পাপে জড়িত ছিল। শতকরা একজন লোককেও চরিত্র গোঁরবে গম্ভীরান দেখা যায় না। দাসপ্রথার তখনো একরূপ আশ্রয় উদ্ভব ঘটে নাই। অপরূপ প্রত্যেক গৃহেই ক্রীত অংগা পালিত দাস দাসীর বিলক্ষণ আচরণ ছিল। এই সমস্ত দাসদাসী প্রভৃতি দাসপণ্য সম্পর্কের একটি বিশেষ দিক্ অধিকার করিয়া থাকিত। তাহাদের গর্ভোদ্ধৃত সামাজিক ভাবে অব্যক্ত হীন সত্যানুগত চন্দ্রের সমুদ্রে দেখিয়াও পিতৃগণ লজ্জাবোধ করিতেন না। যে সমাজে—যে গৃহে—দেবমুর্খির সমুদ্রে (তখন প্রত্যেক গৃহেই আভ্যন্তরে দেব দেবীর পূজা হইত) এইরূপ পদ্ধতির ও নিষ্ঠুরতা সর্ব সমক্ষে অস্তিত্ব হইতে পারে, জানি না সেই সমাজে ও সেই গৃহে কর্তব্য ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন! অগতঃ ইহা প্রত্যক্ষ, অবিকৃত, অতি-শয় বর্জিত সত্য, এবং সে সত্য স্বীকার করিতে বর্তমান প্রবন্ধলেখিকার হস্তের লেখনী লজ্জার কণাভাতে নিচল হইয়া আদিতেছে। জননী, মায়ী, ভগিনী, হিতার সমুদ্রে,—পিতা পিতামহ, পিতৃব্য, পুত্র, জামাতার পার্শ্বে, গুরু, গুরোহিত, পণ্ডিত, গ্রামবাসী বৈষ্ণব হইয়া বৃদ্ধাশ্রমী লোকচর্য

বৃদ্ধ অসহোচ্রে অকুণ্ঠিত চিত্তে এইরূপ জীবন গাপন করিতেছেন। তখন লজ্জার অধোমুখ দেখতা কি সে জান হইতে বিবাহ গ্রহণ করেন নাই?

উনিবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের দক্ষিণাঞ্চল ছিল সে সময়ে দাহ বলা গেল, হর ত তাহা না বলিলেই ভাল হইত, কিন্তু হার যে হতভাগা সমাজোচ্চের দ্বিধা। যেখানে তাহার বাণী নিষিদ্ধ, সেখানে হইতে তাহার কিরিয় আদিবার ঘো নাই, যেখানে তাহার আঘাত পাইবার সম্ভাবনা, সেখানে হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার তাহার পণ নাই, যেখানে তাহার উপর অভিযান উত্তর, সেখানে হইতে তাহার মস্তক অপসারিত করিবার উপায় নাই! আমরা যখন কোনো প্রান্তিকে কিবা কোনো সমাজকে, অথবা কোনো সম্প্রদায়কে বিচার করিতে বসি, তখন অবশ্য আমরা তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিকে লইয়া করি না; ভালই হোক আর মন্দই হোক, সেই বিশেষ দিকের বিশেষ সংখ্যার দ্বারা তখন আমাদের বিচার নিষ্পন্ন করিতে হয়, এক্ষেত্রেও বাহ্যিক এই অভিযোগের বাহিরে, তাহার আমাদের নম্র, আমার এই প্রবন্ধের এই পৃষ্ঠান্তলি তাহাদের অস্ত নয়।

অবশ্য এমন কথা আমরা বলিতে পারি না যে তখনকার সময়ে গাহবা জীবন একেবারে সম্রীতি ও গদ্যতার বর্জিত ছিল, কিন্তু তাহা সন্দেহ এই যে একটি বৃহৎ কল্যাণ সমস্ত নীতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াই-রাছিল, আর আমরা তাহার দিকে চাহিয়া অনিবার্য ভ্রমের শিহরিয়া উঠিতেছি!

৩৫শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

বিলীয়মান ও উদীয়মান যুগ।

বিশেষ অগ্নিধান করিয়া কেবিলে দেখা যায় যে মেঘেরেব অবস্থাও এই সময়ে নিত্য হীন হইয়া পড়িয়াছিল।

ঐশীম ভারতবর্ষ তাহার কত্যাগের সম্বন্ধে যে একান্ত মধ্যাহ্ননিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, মূলমন্তন রাজ্যের সময় তাহার এককালীন বিলোপ ঘটয়াছিল, পরে উনবিংশ শতাব্দী যখন সেই বিশ্রামপূজ্ঞ পূজ্যমানিবে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আপনায় বিলাস ও যথেষ্টাচারের রক্তকেত্র করিয়া লইল, তখন শক্তিহীন ভারতবর্ষ তাহাতে কোনো আশ্রিত করিতে পারিল না। এই সময়ে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা হইতে বার্ষিক হুচতুর চাপকোর দ্রোণ তাহার কাণে পহঁছিল, এবং ঐগণের কর্তৃত্ব প্রলম্বিত হুঁদীর বিভীষিকা এত ভারতবর্ষ তাহার অস্তঃপুরিকাগণের মানসিক শক্তি হোলনার পণ একেবারে কুণ্ড করিয়া দিয়া মনোভগ্ন হইতে তাহাদের সমস্ত অবিকার কাড়িয়া লইল।

আমাদের পিতামহীগণ পতিগৃহের স্বরূপী গৃহিণী হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বাহ্যের অর্জাবিনী হইতেন, তাহাদের সহিত প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের জীবন মনের (বাতাবিক অশ্রুধাগ ও বরকরা ছাড়া) কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হইত না। এমন কি পতিপত্নী পরস্পরকে বার্কো ছাড়া আর চিনিবার অবকাশ পাইতেন না। স্বামী তাঁহার ইচ্ছা প্রসূতি ও সাময়িক নিয়ম লইয়া যে জীবন

যাপন করিতেন, পত্নীর সহিত তাহার কোনে সম্বন্ধ ছিল না, এবং পত্নী তাহার কুটি ও সংস্কার লইয়া প্রকৃত বৃদ্ধ ভাবে দিনান্তিপাত করিতেন, স্বামী তাহাতে ইন্তকেন্দ্র করিবার কোনো আবশ্যক বোধে পাইতেন না। বিশ্রম নিষ্ঠে, পরিবারস্থ সকলে নিস্তিত হইলে, নির্দোষতদীণককে পত্নী স্বামী-সম্বন্ধে গমন করিতেন, এবং দিবা প্রকাশের পূর্বে শয়ন। ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। স্ত্রীর অদিকায় হলেই তাঁহারা স্বামীকে চিনিতে পারিতেন না, তখন অবস্থা প্রকৃত দাঁড়াইত যে স্বামীও পরিবারে যদি অপর কেহ শয়ন। গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আমাদেব পরম শুচিশালিনী পাতিত্রতাব্যবহারগণ পিতা-মহীগণ সহসা সে প্রোভদ নির্ণয় করিতে পারিতেন কিনা সম্ভব। *

তাদের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহাতে স্ত্রীটা গৃহস্থী খালুক না কেন, মাগুদের বিধা গতিত সংসার সঙ্গল কর্তৃকটিন জীবনে ইহা বহু অনর্থপাত করিয়াছে। পতি পত্নী পরস্পরের বিধি সমস্ত সাংঘর্ষ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পল্লীগ্রামে একটি প্রায় প্রচলিত আছে "প্রতিশব্দ কোনো কর্ম না করিও তাই।" * শাস্ত্রের এই বিধা অতিশয় তখনকার দাম্পত্য সম্পর্কে শোচনীয়রূপে হৃদয়গ্রস্ত করিয়াছিল।

বিলীয়মান যুগের সহিত আমাদেব

* অনেক মনে করিতে পারেন যে ইহা আধুনিক অথবা অতিশয়োক্ত বাক্য, কিন্তু যিনি একথা বলিয়াছিলেন তিনি আত্মকীর্ণ হইতেই বলিয়াছিলেন। অল্প আমাধেই পূর্ববর্তী যদি শব্দেও আশ্রিত পারিতেন যে তাঁহার সেই গৃহ বাসত্য তাহিনী প্রকৃতভাবে দর্শনমকে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তবে নিশ্চয়ই এক বর্ণিত প্রকাশ করিতেন না।

অন্তঃপুর হইতে আব যে দুইটি বৃহৎ
অশুভ বিদার গ্রহণ করিতেছে, তাহা কলহ-
প্রসূতা ও পরনির্বাচনেচ্ছা। আমরা সাহস
করিয়া বলিতে পারি যে আমাদের শিতামহী-
গণ উদার সহানুভূতির বৈরাগ্য কাৰ্ণগা প্রকাশ
করিয়াছেন, আমাদের বর্তমান নবীনা ভগিনী-
গণ লক্ষণ করেন না।

আমাদের বিলীৰ্ঘমান যুগে কনিষ্ঠাগণ
বিশেষতঃ গৃহবধূ এবং দাসদাসীরা সামাজ্য
অপরাধে বা নিরপরাধে দারুণ লাঞ্ছনা ও
তাকড়া ভোগ করিয়াছে। ছেলেবেলায় যখন
“অঙ্কল টম্‌স্‌ ক্যাবিন” পড়ি তখন হতভাগ্যা
দাসগণের জাতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতার চিত্র
দেখিয়া কত না অশ্রুপাত করিয়াছিলাম।
কিন্তু আমাদের নিচ্ছেদের পরে কি তাহারই
মত ভয়াবহ অতিনয় হইয়া যায় নাই!
বিধাতার আনৌর্কাবে বর্তমান ভারতের
ভারুণ্য প্রভাবীশ্রু লগাট হইতে সেই দারুণ
কলঙ্ককালিনা অপনোদিত হইয়াছে। তাহার
মুখে লুপ্ত মহাব্যথার গৌরবশ্রুতি পুনর্বিভাসিত
হইয়া উঠিতেছে!

কলহপ্রসূতা ও পরনির্বাচনেচ্ছার সঙ্গে
সঙ্গে অশ্রুবিধ হইতেও আমাদের উদীয়মান
হৃগ অনেক পরিমাণে মুক্তিপাত করিয়াছে।
সেকালে সপত্নী ও তাহার গর্ভজাত সন্তান
কিছুপ নিষ্ঠুরতা ও ছৎসহীনতার সহিত
নির্বাণীভূত হইত তাহা অনেকেরই জানা
আছে। আমাদের গর্ভাশ্রিত কাহিনী
ভিতর আমরা দেখিতে পাই, বিদাতা
সপত্নী-সন্তানের কষ্টিত ছৎসিগ্ধের রক্ত-
ধারার দান করিতে চাহিতেছেন। কি
ভয়াবহ রাক্ষসী হিংসা এ! ক্রুপতার কি

অমানুষিক এ চিত্র! সদাগর বাণিজ্য
বাইবেন, তিনি মমতা সুদী গোরালা প্রভৃতি
সকলকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের
গহ্বর ধন দান করিয়া গেলেন, তাহার
অবর্তমানে তাহার প্রথম পক্ষের পুত্রকন্তাকে
তাহারা জ্বলন বগন যোগাইবে। পরে
তাহাদের বিদাতা—কি জানি, যদি সে
তাহাদের হিংসা করিয়া বাইতে না দেয়!
কিন্তু সদাগরের সতর্কতার কোনো ফল
কলিল না, সদাগরের বাণিজ্য তরনী
নীলোপরি চকল সমুদ্রের পারে অশুভ হইয়া
বাইতে না বাইতে হিংসা বিদ-জঙ্ঘরা বিদাতা
বাড়ী বাড়ী গিয়া সেই সব ধন কাড়িয়া লই-
লেন এবং ছিন্ন বস্ত্রপণ্ড পরাইয়া অন্যথ
বালকবালিকা দুটিকে মৌত্র-দারুণ মাঠে
ছাপল ভেড়া চরাইতে পাঠাইয়া দিলেন।
বৈশাখের দীর্ঘ বেলা অনাহারক্লান্ত ছেলে-
মের দুটি গাছের কল পাইয়া কুম্ভাবরণ
করিতে লাগিল, বিদাতা সন্ধান লইয়া সে
গাছ কাটিয়া দিলেন। কপিলা গাতীর
দুঃখ পান করিয়া তখন তাহাদের জীবনোপায়
হইল, বিদাতা সন্ধান লইয়া তাহাও কাড়িয়া
লইলেন। সেদিন কুম্ভাব মুর্ছাপন্ন হইয়া
তাহারা ছাগল ভেড়া হারাইয়া কলিল এবং
অবশেষে “শ্রবতের তীতচিহ্নে পিতৃগৃহের
আশ্রয় ভাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এই যে চিত্রটি আমরা দেখিতেছি, ইহা
তথু আমাদের বিদ্যাসনা কুমারীগণের
শ্রমলভ্যের পুণ্ডা কাহিনী নয়, ইহার ভিতরে
আমরা আমাদের তদানীন্তর সমাজের চিত্র
দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমাদের এই
উদীয়মান যুগে আমাদের গর্ভজন-নিমিত্ত



মা অশোদা।

শ্রীযুক্ত অদিত্যকুমার হালদাস অঙ্কিত চিত্র।

৩২শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

কাসিমের মুরগী।

‘একেলে মেরে’ শুনি সপত্নী-সন্তানের প্রতি
একপ প্রশংসিত বেহে-শ্রুততার পরিচয় প্রদান
করিতেছে যে গিলীচমান শতাব্দী যদি আজ
তাহার বিরাম নথা। হইতে আগিয়া বর্তমান
ভাষ্যের এই অভিনব চিত্রের দিকে চাহিতে

সমর্থ হইত তাহা হইলে সে নিশ্চয় বিমুগ্ধ
হইয়া বাইত এবং এই নারীমণ্ডলীর অপূর্ণ
চরিত্র গোঁববে তাহার অভ্যকার মূখ
প্রোক্ষল হইয়া উঠিত।

শ্রী.আবোদিনী খোন্দকার

কাসিমের মুরগী।

কাসিম ছেলেবেলা থেকেই জানোয়ার
পাখী পুণ ভালপাসিত। রাজ্যের কুহুর বেনিলে
কাসিম তাহার দুই পা দাঁক করিয়া তাহাকে
নুকের উপর চড়াইয়া তাহার মুখে মূখ খসিতে
থাকিত, ছাগল বেনিলে গাছের ডাল ভান্দিয়া
পাতা ছিঁড়িয়া খাওয়াইত, রাত্তা দিয়া গরুর
পাল চলিরাছে—কাসিম তাহাদের গিঠে হাত
বুলাইতে বুলাইতে সঙ্গে সঙ্গে অনেকদূর পর্য্যন্ত
চলিরাছে। কাসিমের পানীরও পূব মধু
ছিল।

মুগলমান পরিবারে জতগ্ৰহণ করিয়াও
দাদনখবীর বালক কাসিম বাছমাংস কিছুই
খাইত না।

সাঁওতাল পরগণার মধুবনী গ্রামে
কাসিমের ঘর; কাসিমের উর্দুদুন তিন-
পুরুষ এইখানে বাস করিয়া আসিতেছেন।

ছোট একতলা বাড়ি; বাড়িতে থাকিবার
তিনটি মাত্র ঘর, দুই উঠানের এক কোণে
রান্নাঘর, ও বাড়ির বাহিরে পাঁচিচের গায়ে
ছোট একটা কুঠারী;—এইখানে ঘরের ঘর
ভাঙা তিনিসপত্তর, কাটিকুঠা গড়ত থাকিত।

কাসিমের পিতার অজ্ঞানদেহই মৃত্যু হইল।
সংসারে থাকিবার মধ্যে কাসিম নিজে, ভাতার

মা, ও কাকা আবুছল। আবুছল দেখিতে
যেমন লম্বাচোড়া ছিল, তাহার দেহানটাও
তদনুরূপ কড়া ছিল। কাসিম কাকাকে
বাগেব মত ভয় করিত;—কাকা একবার
হাঁক দিলে আর রক্ষা ছিল না, কাসিম ভয়ে
জড়মড় হইয়া কি করবে তাবিয়া ঠিক করিয়া
উঠিতে পারিত না। আবুছলার চামড়ার
বাবসার ছিল, তাহাতেই সংসার একপ্রকার
অশেষজ্বলে চলিয়া বাইত।

বিপদার একমাত্র ছেলে—কাসিমের
আদববস্ত্রের আর সীমা ছিল না। লোক
থাকিতেও ছেলেকে দান করান, খাওয়ান,
ছেলের কাপড় কাটা, ছেলের মেটটি গেলানটি
বাঝা বিধবা নিজ হাতেই দব করিত। ছেলে
মাছমাংস পাইত না, বিধবা ছেলের জন্ত নিত্য-
‘নুতব’ কতরকমের চোটিন খাটান তৈয়াবি
করিত তাহার আর তিনু ছিল না। লম্বা
দিনই ছেলের কান লাইয়াই বাজত। বিপদার
নিচের কিছুই ছিল না—সংসার-খরচের পয়সা
হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া সে ছেলের লম্বা
লম্বা এটা-ওটা কিনিয়া দিত।

এইরূপে দিন যায়। একদিন এক
সাঁওতাল হুখের মত খবববে শাবা তিনটি

মুন্সীগী লইয়া কাসিমমেব বাড়ির সমুখ দিগা চাটে বিক্রয় করিতে হইতেছিল। কাসিম তাহার কণ্ঠে ছুটিয়া গিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, “কি মুন্সীর মুবগী মা ! কি মুন্সীর ! আমাকে কিনে দাও, আমি পূর্ণব। আমার কাছে তুমি আনা পরমা আছে, আর চায় আমি বিশেষ চলে। দাও মা কিনে !”

মা বলিল, “তার আর পরমা দিতে হবে না, আমিই দিচ্ছি।”—তুমি আনা পরমা দিয়া মা তিনটি মুবগী কিনিয়া দিল। কাসিমের আর আনন্দ ধরে না।

ছোট কুটুমিটী পরিচর্য করিয়া কাসিম তাগাতে মুবগীদের থাকিবার স্থান ঠিক করিল ;—সেজের খড় বিছাইয়া দিল, একটা ভাঙা প্লেটে চারটি চাল রাখিল, একটি ছোট গামলায় জল রাখিয়া দিল। স্থানান্তরিতঃ অপরিচর্যের তরফে আব্দুল্লাহ এপর্যন্ত বাড়িতে কখনও মুবগী পোষেন নাই। বালক কাসিম সমস্ত ত্রিষ্টম্ভ করিয়া গেল।

ইহা পূর্ব কাসিমের আহারমিত্রা ভাগে চটল। ভোর হইতে না হইতে মুবগীঃ যখন কৌশল—কৌ—কৌ করিয়া ডাকিয়া ওঠে, কাসিম আর বিছানার থাকিতে পারে না—তাকাতা উঠিয়া ছুটুর দণ্ডা খুলিয়া মুবগীঃ দেহ বারিষ করিয়া দেহ, মাটিতে ধান ছড়াইয়া দেহ, তাহার পুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়, কাসিম একমনে তাহাই দেখে; কোনটা বা একটু দূর চলিয়া যায়, কাসিম তাড়াইয়া লইয়া আসে,—কোনটা বা চালের উপর গিয়া ওঠে, কাসিম নানা উপায়ে তাহাকে নানাইয়া দেহ। প্রাতে পড়া শেষ হইতে না হইতে কাসিম বই

কেনিয়া মুবগীদের দেখিয়া আসে, স্থল বাইবার সময় একবার দেখে, স্থল হইতে ফিরিয়া তাহারে খোঁজ লয়, সন্ধ্যায় পথ মাঠ হইতে খেলা দেখে করিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ঘরবন্দ করে।

একদিন আব্দুল্লাহ কাসিমকে ডাকিয়া কহিল, “কাসিম, মুবগী পুথিচ্ছ ?”

কাসিম ভয়ে ভয়ে কহিল, “হাঁ।”

আব্দুল্লাহ কহিল, “যদি ঘর অপরিচর্য হই তো দেখবি।”

কাসিম আশে আশে কহিল, “কাকা।”

আব্দুল্লাহ আর কোন কথা বলিলেন না। কাসিম সে দিন এক সন্ধ্যা অব্যাহতি পাইয়া হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

একমাস কাটা গেল। কাসিম রাজাই তাহার মুবগীর ভিমের প্রতীক্ষা করে।

সে দিন সন্ধ্যাকালে কাসিমের মা পাশের বাড়ি গিয়াছিলেন। কাসিম অজান্তে দিনের প্রায় মাঠ হইতে ফিরিয়া মুবগীদের ঘরবন্দ করিতে গিয়া দেখিল, একটি মুবগী মাই। গাছের ঝোপঝাড় পাঁচিলের আবগাণ, ফুরের ধার কাসিম তার বস করিয়া খুঁজিল, কোথাও পাইল না; উঠানে একবার দেখিল, দেখেনেও নাই। অবশিষ্ট মুবগী দুইটিকে ঘরে বন্ধ করিয়া কাসিম হতানন্দে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। হঠাৎ রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি পড়ায় কাসিম বাহা দেখিল তাহাতে সে আর তাড়াইয়া থাকিতে পারিল না, আশে আশে বিছানার আসিয়া শুইয়া পড়িল।

মা আসিরা কাসিমকে শুইয়া পাতিতে দেখিয়া কহিলেন, “কাসিম, বাবা, এ’র মধ্যে তরে কেন ? অনুগ্রহ করিতে না কি ?”

কাসিম কোন উত্তর দিল না।

মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হ’বেচে বল না বাবা,—মাথা ঝগা ক’বু’তে ?”

কাসিম কোন কথা কহিল না।

মা তখন বিছানার উপর উঠিয়া ছেলের মাথা কোলের উপর টানিয়া লইয়া মুখদুব-পূর্ব্বক কহিলেন, “বল না বাবা, কি হ’বেচে,—লজ্জাটি ?”

কাসিম আর থাকিতে পারিল না, হুঁপিয়া হুঁপিয়া কাদিয়া বলিয়া উঠিল, “আমি এত করে’ মুরগী পুখুম—কাকা আমার একটা মুরগী কেটে যারা ক’বু’তে—মা, আমি এত করে’ পুখুম!”

মা’র চোখে জল আসিল, কোনমতে রোধ করিয়া ছেলের মাথার হাত ঝুলাইতে ঝুলাইতে মা কহিলেন, “এতে এত কাজ ! ছিঃ কাসিম, কাদিসনে, চুপ্ কর, আমি কালই তোকে আর চারটে মুরগী কিনে দেব।”

কাসিম কাদিতে কাদিতে কহিল, “না, আমি আর মুরগী পুখু না।”

সে রায়ে কাসিম কিছু খাইল না—তাহার ভাল ঘুম হইল না।

ভোর হইতে না হইতে কাসিম উঠিয়া নয়না খুলিয়া মুরগী দুইটিকে বাহির করিয়া দুইহাতে বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া উক্কাসে রক্তা মিহা ছুটিতে লাগিল। তখন তরানক রুখোপ, মুললবারে বৃত্তি পড়িতেছে, বাতাসে জলের কাপুটার গাছের মাথা দুইয়া পড়িতেছে ; গধ জনপুত্র। কাসিম নোড়াইতে নোড়াইতে

আর একমাইল দূবে তাহার এক লমপাতি হিন্দু বন্ধু’র বাড়ি আসিরা উপস্থিত হইল। বাহির চাইতে কাসিম ডাকিল, “জীবন, ঘরে আছিস্ ?”

কাসিমের সম্বন্ধে একটি বালক বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, “কি রে, এত বুদ্ধিতে ?”

কাসিম কহিল, “এ’ মুরগী ত’টি ত’ট তোকে দিতে এলাম। পুখিম্ ; দর করিম্ কিছ।”

জীবন কাসিমকে ঘরে আনিতে বলিল। কাসিম কহিল, “না চাই, আমাকে এখনি ফির্ন্তে হবে, কাকা টের পেলে আর রক্ষে রাখ’বে না।”

কাসিম ফিরিয়া আসিয়া নাকে চুপচুপ লমত কথা জানাইল, কহিল, “মা, কাকা যেন টের না পায়।”

কিন্তু মুরগী’র ডাক শুনিতে না পারিয়া, কাসিমকে ও আর সুটেরীর দিকে ঘাইতে না দেখিয়া আব’জ্ঞান মনে লসেহ হইল। সেই দিন অপরাক্তে আব’জ্ঞা কাসিমকে ডাকিয়া কহিলেন, “কাসিম, মুরগীগুলো গেল কোথায় ?”

কাসিম চুপ করিয়া রহিল।

“বল কোথায় গেল,—পেছালে যেন’ না কি ?”

কাসিম তবে তরে কহিল, “জানি নে কাকা, দেখ’তে পাঞ্জন।”—বলিতে কাসিমের একটু গলা কাঁদিল।

“তিন্ বলচিস্ ত ? দেখিস্!”—গলিয়া আব’জ্ঞা কাসিমকে দিখায় দিলেন।

উপর বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন ।
প্তহাত্রে ধানের টাকা লইয়া কোন এক
কৰ্মচারীর পলায়নস্বার্থে তাহার মেজাজটা
বড়ই খারাপ ছিল ;—মুহূহ পূম-উল্লসিত
চিত্তান্তরীকে কোন একটা কৃল-কিনারায়
লইয়া যাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন ।

এমন সময়ে কাসিমের বন্ধু জীবন একটি
পাণ্ডা করিয়া দুইটি মুরগী লইয়া পেশানে
আগিয়া উপস্থিত হইল ।

আবদুল্লাহ বলকের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত
করিয়া কহিলেন, “ও কি ! কা’র মুরগী ?”

বালক কহিল, “কাসিম এট মুরগী দু’টো
আমাদের বাড়ি রেখে এসেছিল । বাবা
কোনমতেই রাখতে দিলে না, তাই ফেরৎ
দিতে এসেছি ।”

আবদুল্লাহ ডাকিলেন, “কাসিম !”

“কাকা !” বলিয়া কাসিম ঘরের বাহির
হইয়া আসিল । জীবন ও তাহার সঙ্গে মুরগী
দুইটি দেখিয়া কাসিমের মুখ শুকাইয়া একটুকু
হইয়া গেল ।

আবদুল্লাহ কহিলেন, “এ কি !”

কাসিম সবে কাদিয়া ফেলিল ।

আবদুল্লাহ কহিলেন, “আচ্ছা ! বাঃ
রেখে দে—আমি দেখছি !”

কাসিম কানিতে কানিতে মুরগী দুইটি
লইয়া কুটুরিতে রাখিয়া আসিল ; গ্রেটের
শুকুনো চাল ফেলিয়া আগার ভাল চাল
রাখিল, গাবলার বাসি জল ফেলিয়া দিয়া
আবার টাটকা জল রাখিয়া দিল ।

সমস্ত দিন কাসিম একটা অসম্প্রতি
আলকার হুটুকটু করিতে লাগিল ; কুলে গিয়া
পড়া বলিতে না পারিয়া হার খাইল ;

সে দিন কাসিম মাঠে আর খেলা করিতে
গেল না ।

শুভ্রা হয় হয় এমন সময়ে আবদুল্লাহ
কাসিমকে ডাকিয়া তাহার মুরগী দুইটি
আনিতে বলিলেন । কাসিম মুরগী দুইটি
লইয়া তবে তবে কাকার সমুখে আনিয়া
দাড়াইল । আবদুল্লাহ কাসিমের হাত হইতে
মুরগী দুইটি লইয়া রান্নাঘরে এবেণ করিলেন ।
কাসিমও সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকিল ।

আবদুল্লাহ দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একটি
মুরগীকে ছাড়িয়া দিল—সে উড়িয়া চৌকর
করিতে করিতে কাসিমের বুকের উপর গিয়া
কুটপটু করিতে লাগিল ; কাসিম তাহাকে
দুই হাতে চাপিয়া ধরিল ।

আবদুল্লাহ তখন উনানের পাশ হইতে ছুটি
তুলিয়া লইল,—কাসিম চৌকর করিতে
লাগিল, “যেহে না কাকা, যেহে না ! আমায়
পোনা মুরগী ! দু’টি পায়ে ধরি ! আমাকে
মায়ে কাকা,—আমি তোমার পায়ে ধরি,
যেহে না !”—

সে চৌকর আবদুল্লাহর পাশাপাশি ভেদ
করিতে পারিল না । “কেয় মিথোকখা
বল্‌বি, বল্‌বি !”—বলিতে বলিতে আবদুল্লাহ
হাতের মুরগীটিকে চাপিয়া ধরিল, ছুটি উঠাইল,
—মুহূর্তে পক্ষীর অর্ধছিন্ন কণ্ঠ তুলিয়া পড়িল,
—কম্বুদ্বন্দ্ব রক্ত করিতে লাগিল ।

আবদুল্লাহ এখন কাসিমের হাত হইতে আর
একটি মুরগী লইতে গেল, তখন কাসিম
“মাগো !” বলিয়া চৌকর করিয়া তুলিতে
মুছিত হইয়া পড়িয়া গেল ।

‘আবদুল্লাহ দরজা খুলিয়া দিল ।

কাসিমের মা তখন কুহোর দার হইতে

কাপড় কাচিয়া ফিরাইয়া আসিতেছিলেন,—
কাসিমের চাঁৎকার শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া মুজিত
ওনথকে গুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া “কাসিম !
বাবা কাসিম !” বলিয়া কাসিতে লাগিলেন ।
আবতুল্লা অনেক কষ্টে তাঁহাকে উঠাইয়া
কাসিমকে কোলে করিয়া ঘরে আনিয়া
শোয়াইয়া দিল ।

আবতুল্লা যখন নান্য উপায়ে কাসিমের
চৈতন্য উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, তখন
কাসিমের মূৰ্গটি আদিয়া বরের মধ্যে অস্থির
ভাবে ঘুরিয়া বেড়াতে লাগিল ;—তাঁহার
আর ভয় নাই, সে আবতুল্লার গায়ের

উপর দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কাসিমের হাতে
পায়ে গায়ে মাথায় ছোট বসিতে লাগিল—
তাঁহার বৃকের উপর গিয়া বসিয়া রহিল ।

জনে হইয়া কাসিম বলিয়া উঠিল, “আমার
মূৰ্গটি !”

সে কহিলেন, “এই যে বাবা, এইখানে !”

—আবতুল্লাও তাড়াতাড়ি মূৰ্গটিকে

কাসিমের হাতের কাছে সরাইয়া দিল ।

কাসিম মূৰ্গটিকে গুইহাতে ঢাপিয়া ধরিয়া
সমস্ত রাত তাঁহাকে বৃকের কাছে রাখিয়া
শুইয়া রহিল ।

ঐহীক্ষনাগ ঠাকুর ।

চারিটি উপমা ।

হালিহীন সুখ যেমন চন্দ্রহীন নিশার মতন,
গানহীন প্রাণ যেমন মৌন-সুখ কায়ার ভগ্নন,

অশ্রুহীন আঁধি যেমন বৃষ্টিহীন অঁচের নিদ্রাধ,
দীর্ঘবাসন্ত ছদি চিরকাল পড়িল তড়াগ ।

ঐকালিদাস রায়

আবিভূতা ।

যোর স্বপ্নলোক হ'তে কোন পথ ধরি
কেমনে আসিলে দেখা, ভগ্নো মাঝবিনী,
হে যোর ঘোবন-স্বপ্ন-স্বর্ণ বিলাসিনী,
মনসিদ্ধা চিত্তলক্ষী, হে মূৰ্খমন্ডলী,
চক্ষে আসি দিলে দেখা ? ধান-নিমীলিত
জাঁধি মোর বিবেচনার কেলি যবনিকা
নিভৃত আঁধার রচি একান্তে হেরিত,

সুত্রযিৎ দোষি তব,—জ্যোতিঃশ্রমী শিখা
বর্ণদীপ সুখে যথা মণির তিমিরে !
বর্ণের মূহুর মাঝে মৌনমুষ্টিখানি
ছিল ছায়া মাত্র শুধু, আসি শরীরে
চক্ষে বন্ধে বিলে পরা । সোহাগের বাঁধি
তনি কানে, স্রাণে পাই সৌরভ ঘেহেত,
অশ্রুর আঁধার হ'লে দেখে অস্তরের ।

ঐহৃৎকথন শর্মা ।

জাপানে স্নানাগার ।

আমরা গত বৈশাখের ভারতীতে আমেরিকার ঐশ্যবাক্যল সম্বন্ধে অসমতা আমেরিকাবাসীরা জানেন সীতিনাতি সম্বন্ধে কিংকি আভাস পাইয়াছি । উহাতে দেখি যাহি—“গা খুলিয়া কলের নীচে বসিয়া দান করা দেখের রীতি- ও আইন বিকল্প,— অথচ মজা এট প্রানাগারে বা নদীতে কিখা করণাতলে সকলে একত্র উপলব্ধি আহার দান করা দেখের নচে ; কলেজে, ব্যাংক মন্দিরে কলের জলের সরণার নীচে লুকণে একত্র উপলব্ধি আহার দান করিখা থাকে । কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ বানধা । প্রত্যেক মেয়ের লজ স্বতন্ত্র স্নানাগার আছে, মেয়েরা কেহই ছেলেদের মত একসঙ্গে দান করে না ।”

প্রজ্ঞানন্দ ডাক্তার ইন্দুমতী মলিক মহোদয়ের লিখিত তকীর প্রাইউইন খাট বিবরণীতে ইংরাজ নরনাগার সমুদ্র স্নানের বিবরণ কিংকি অসংগত আছি । কিন্তু আজ নুতন অসমতা জাপানীগণ এই বিদগম সত্যতার ইউরোপ আমেরিকাকেও পরাস্ত করিয়াছে ।

জাপানে গিরা প্রথম ভ্রমণে আমরা কতকগুলি ভারতবাসী ছাত্র একসঙ্গে একটি মেলে বাণ করিয়ায় । তখন আমাদের ইচ্ছাঙ্কুর স্নানাগারের বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইত । আমাদের বাড়ীর স্ত্রী স্নানাগারে ঢুকিয়া একে একে সকলে দান করিতা আসিতাম । জাপানী পাবলিক-স্নানাগারের

কণা শুধুমে তপনও লক্ষ্য ও স্থনা মিশ্রিত একটা ভাবে আমাদের শরীর বোধাকিত হইয়া উঠিত । দুট এক জন নুতন অভিজ্ঞতার লজ কখন কখন পাবলিক স্নানাগারে ঘাইতেন ।

ছয়মাস পরে আমি অপর এক বছর সহিত জাপানের উত্তর অঞ্চলের কৃষিকলেজে প্রবেশ লাভ করিলাম । সে সহরে কেবল মাত্র আমরা দুইজন ভারতবাসী । কাজেই বেশ করিয়া থাকা অনন্তর হইয়া পিড়াইল । আমরা কলেজ বোর্ডিংয়ে ঢুকিলাম । কঠোর অধ্যাপক আমাদিগকে বোর্ডিংয়ের আকিল, লাইব্রেরী, ছাত্রদের প্রাইভেট ঘর, খাওয়ার ঘর ইত্যাদি দেখাইয়া স্নানাগারে লইয়া গেলেন । দেখানে ঘাইয়াই আমরা উত্তরে অথাক । অনুান ১৪২০ জন ছাত্র উপলব্ধি হইয়া গর শুভবে দান করিতেছিলেন ! অধ্যাপকমহোদয়কে দেখিয়া কেহ একটুকু লক্ষ্য বা সঙ্কোচের ভাবও দেখাইলেন না, বরং তাহার সহিত কাহারও কাহারও কিছু কিছু কথাবার্তীও চলিল ।

আমরা স্নানাগারী হইতে তিন চারি দিন রেলে এবং জাহাজে চলিয়া লেবানে উপস্থিত হইয়াছিলাম ; কাণেই দান করা নেহাৎ আবশ্যক হইয়া পিড়াইয়াছিল । অথচ স্নানাগারের যেরূপ অবস্থা দেখিলাম তাহাতে আর স্নানের প্রস্তুতি রহিল না । ১৪ দিন মাথা ধুইয়া ভিজে তোলাগে দিয়া শরীর রগড়াইয়া কাটিইলাম । প্রতিদিন বাছাবেশ

মানের অভাব, তাহারা এভাবে আর কত দিন কাটাইতে পারে? তাই আমরা দুজনে কয়েকদিন পরামর্শের পর গারগে ভব করিয়া একখানা বড় ভোরাণে পরিধান করিয়া এবং অপর কয়েকখানা স্বল্পে রাগিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে মানিগারে ঢুকিলাম। হাট ভিতরে প্রবেশ অবশিষ্ট চারিদিকে চাঙ্গির রোগে আক্রান্ত হইল।

অনেকে অনেক প্রকার প্রশ্ন তিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন ইউরোপ আমেরিকাতেও কি এতরূপ? একদল ভরসা তৎপর্য কি? * * * ইত্যাদি। কেহ কেহ ভাড়াভাড়ি দান লম্বাধা করিয়া ঘরে কিরিয়াই বোর্ডিংয়ের আর আর ছেলেম নিকট লম্বাধা দিলেন, তাহারা নোড়িয়া দান করিতে গিয়া আশ্বাসদেয় দেখিয়া লইলেন। প্রায় ৩০ দিন আমাদের মানের সময় মানিগারে বড় ভিড় হইত। আমাদের বোর্ডিংয়ের মানের জল ইঞ্জিনে গরম করা হইত। ঠাই তিন মাস পরে চঠাং ইঞ্জিন খাণ্ডন হইয়া ঘাওয়া পুনরায় নুন বিপদে পড়িল। কতদিনে যে ইঞ্জিন পুনরায় প্রস্তুত হইবে তাহা কেহই বলিতে পারিলাম। বোর্ডিং আপিস হইতে সকলকে পাবলিক মানিগারে বাইতে আতিথি দান এক একখানা টিকেট দেওয়া হইল। আমরা দুজনে পুনরায় সংক্ষেপে মাথা মুটরা পূর্বের স্তায় কয়েকদিন কাটাইলাম। দীর্ঘকাল অস্বাস্ত অবস্থায় থাকিলে ব্যায়াম পাড়া হইবার সম্ভাবনা এই ভবে কয়েক দিন পরে অগ্রে পাবলিক মানিগারে বাইতেই বাধ্য হইলাম। এতবাব ভাবন পরীক্ষা।

পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষা মন্ত্রকের বিবরণ জানিতে চরিত পাঠ্যমাধ্যমের কোর্সে জড়িত পাই। মহতের স্থানে স্থানে দুই তিন রাত্তার লক্ষ্যমূল্যের নিকটেই এক একটি পাবলিক মানিগার। মানিগারের দুইটি দেরা, একটি জীলোকের জন্ত এবং একটি পুরুষের জন্ত। দুই দরবার মাঝখানে কেবলমাত্র মানিগারের মালিক কিংবা তাহার পত্নী অথবা তাহাদের নিয়োজিত জনৈক ব্যক্তির উপবেশনোপযোগী উচ্চ স্থান। আগন্তকের অভ্যর্থনা করা তাহাদের সুবিধা অনুবোধ প্রতি স্তম্ভ স্থা এবং নির্দিষ্ট স্থানে তাহাদের নিকট হইতে খরচ আদায় করা উক্ত উপনির্ভ ব্যক্তির প্রধান কার্য। ঘরে ঢুকিলেই দুই দরবার দুইটি প্রকোষ্ঠ—একটি জীলোকের অপরটি পুরুষের বস্তুত্যাগের জন্ত। মাঝখানে কাগজ কিংবা কাঠের বেঞ্চাল, -এই দুই প্রকোষ্ঠের বেঞ্চালে কয়েকখানা বর্ণ জ্ঞান আছে এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই ১৪২০টি বাণ কিংবা বেষ্ট নির্মিত ডালা হ'ইয়াছে। এই দুই প্রকোষ্ঠের অব্যবহিত শানের দুই প্রকোষ্ঠেই মানের জন্ত গরম এবং ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চ, কাঁঠ নির্মিত চোটে ছোট গামলা সজ্জিত হ'ইয়াছে। ইহার একটি প্রকোষ্ঠ জীলোকের এবং অপরটি পুরুষের। এই সকল মানিগার কোন ব্যক্তি বিশেষের অথবা কোম্পানী বিশেষের। বড় বড় মানিগারে অল্প অথবা ষ্টম ইঞ্জিন এবং ছোট মানিগারে কয়লার সাহায্যে জল গরম করা হয়। নিজ নিজ কাপড় এক একটি ভালার রাগিয়া মানিগারগণ সকলেই উল্লস চর এবং

তারপর ছোট ছোট এক একখানা নতুন-
জুকের গামছা ও সাপানের বাস লইয়া
ঘানের ঘরে প্রবেশ করে।

আমরা অগত্যা উত্তরে অত্যাশ্চর্য ছেলেদের
সহিত মিলিয়া একদিন পাবলিক সানাগারে
টুকলাম। এ ঘাত্রের কোনরকমে আলগা
আলগা ভাবে তোরাশে খাবা শরীরে ঢাকিয়া
অস্ত্রোত্তর ছাত্র কাপড়চোপড় ছাড়িয়া সান-
গারে টুকলাম। দেখানে অনেক অপরিচিত
জ্ঞাত অজ্ঞাত সহিত একই সানাগারে ঘান
করিতে হইল। আমাদের যেমন নীচ জাতীয়
বাক্তির ছাত্র শরীরে লাগিলেও ঘান করিতে
হয় দেখানে তেমন নহে। এক সঙ্গে একই
চৌবাচ্চার টুকিয়া জুতা, জুতা, খোপা, নাপিত,
চামার, বেগুন, হাকিম, বাইটোর, শিখক, ছাত্র,
লর্ড জুটি অবগাহন করিয়া পবিত্র হইতে-
ছেন। সানাগারে টুকিয়াই প্রত্যেকে এক
একটি কাঠের গামলা হাতে লইলাম। কলে
শরীর ধুইয়া গরমজলের চৌবাচ্চার টুকলাম।
শে ফুট জল গ্রহণ প্রথম আমাদের নিকট
নিত্যই অসহ বোধ হইত। ক্রমে উহাতে
অত্যন্ত হইয়া আসিয়াছিল। চৌবাচ্চার
ভিতর ১০১২ জন উল্লস ব্যক্তি গা ডুগাইয়া
আর ১০ মিনিট কাল বসিয়া থাকে। তারপর
চৌবাচ্চা হইতে উঠিয়া এক এক জন এক এক
জারগার বসিয়া সাবান লাগহার করিতে থাকে
কোন কোন জারগার গাভাসার্কনার জুতা
চাকর চাকরাণীও ত্যাগ করিতে পাওয়া যায়।
আন্তর্ধোর দিবর যুগান্ত মেয়েটা সাবান এবং
জোরাগের সাহায্যে উল্লস পুরুষদের শরীর
পরিস্কার করিয়া বিতর্কে, আবাস স্নানস্থান
কোন কোন সানাগারে পুরুষ চাকরগণও

উল্লস মেয়েদের শরীর পরিস্কার করিয়া দেয়।
শরীর পরিস্কার করার পর জল জলে গা
অশ্বরূপে খোঁচ কাঁচরা পুনরায় গরমজলের
চৌবাচ্চার কতকগুলি শরীর ভুইয়া গিয়া
পাকে। তারপর চৌবাচ্চার বাহিরে আগিয়া
ঠাণ্ডা জলে কিংবা ঠাণ্ডা ও গরম জল মিশাইয়া
তাহাতে মাথা এবং শরীর প্রক্ষালণ করার
পর গায়েছা খারা বেশ করিয়া শরীর
রগড়াইয়া ফেলে। তারপর পরিচ্ছদের ঘরে
আইলে। অনেকগুলি গরম জলে পাকার
বরুণ ঘানের অব্যবহিত পরে উহাদের
শরীরের রং অনেকটা অপেক্ষের জ্বালা লাল
হয়। পরিচ্ছদের ঘরে আগিয়া উল্লস অশ্বরূপ
আরনা চিত্রশিল্পে বেশ বিস্তার করে।
পুরুষদের ঘরে পুরুষগণ এবং স্ত্রীলোকের ঘরে
স্ত্রীলোকগণ একই ভাবে বেশ লাল করে।
আমরা যে সানাগারে গিয়াছিলাম তথাকার
দুই পরিচ্ছদ-প্রকোষ্ঠের ভিতর যে দেওয়ালের
উল্লস করিয়া—তাহার উচ্চতা ৩৪ ফুটের
অধিক নহে। সামনাসামনি তাকাইলে কাঁহারও
কোন দৃষ্ট দেখিতে বাকী থাকে না, আর
যাহারা সামনাসামনি তাকাইতে কিকিৎ
মুকেত বোধ করে তাহারাই দুই প্রকোষ্ঠের
দেওয়ালে স্থান আরনারি প্রতিকণিত চিত্রেই
ঘরের সমস্ত দৃষ্ট দেখিয়া লয়। পরিষের গ্রহণ
করার পর লকলেকের পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে
নির্দিষ্ট শব্দ দিয়া চলিয়া যায়। উক্ত ব্যক্তি
ধন্যবাদ প্রদানান্তর পুনরায় তাহাদিগকে
সানাগারে আলিঙ্গন জ্ঞাত অহুবেদ করিয়া
দেয়। গ্রাহকগণও ধন্যবাদ দিতে দিতে
চলিয়া যায়। অনেকট দিনের বেগার কাব
কর্ণে ব্যস্ত থাকে, তাই লক্ষ্যাবেগার

মান করিতে অবকাশ পায়। সন্ধ্যা ১টা হইতে মাত্র ১০ টা পর্যন্ত মানাগারে খুব ভিড় হয়। রানের পর পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি সকলে এবিকে ওবিকে কিফিং খুঁরিয়া ফিরিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে আর প্রায়শঃ খল পার্কে, নদীর ধারে অথবা সমুদ্রতীরে হাওয়া পাইতে বাহির হয়। কেহ কেহ কেহ বা পিরাটোরে চলিয়া যায়। পরমের দিনে অধিকাংশ মানাগারের প্রবেশ ঘরেই কেবল একখানা মাত্র বাতানে মোহলামান কাপড়ের পর্দা টাঙ্গাইয়া রাখা হয়। অনেক সময় চলিবার পথেই মানাগারের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য রাস্তার লোকজনের দৃষ্টিগোচর হয়।

অধিকাংশ নয়া শহরের মানাগার প্রায়ই উল্লিখিত ৫ নং। তবে কোনও কোনও শহরে প্রাচীন ধরণের মানাগারও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ধরণে শ্রীপুরুষ এক লম্বা একই মানাগারে উপলব্ধ অবস্থায় দান করিয়া থাকে। আগামি নাবক একটি প্রকাণ্ড শহরেও এই পদ্ধতি দেখিরাছি। দশ বায় ফুট লম্বা এবং পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ চৌবাচ্চার ভিতর ১২১০ জন নর শ্রীপুরুষ এক লম্বা ঢুকিয়া পড়ে। অধিকাংশ গরীব প্রাণে শ্রীপুরুষের জন্ত মাত্র এইরূপ একটি মানাগারই দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃশ্যে আমাদের সর্বপ্রথম স্থাপত্যকার শিহরিয়া উঠিত। মনে মনে এই সভ্যতাকে চূড়ান্ত অসভ্যতার স্থানান্তরিত করিয়া শত দিকার দিতাম।

পরম জন ভিন্ন ঠাণ্ডা জলে দান করা দ্বিতীয়স্থান লেগে একপ্রকার অসম্ভব। বাড়ীতে

একটি মানাগার করিতে অনেক খরচ। যে সকল মধ্যবিত্ত পরিবারে লোক সংখ্যা বেশী তাহাদের বাড়ীতে বাড়ীতে একটি করিয়া মানাগার আছে। বলা বাহুল্য যে মানাগারের পিতা মাতা ভগিনী, ভ্রাতৃবৎ পুত্রবৎ প্রভৃতি সকলে এক সঙ্গে উপলব্ধ হইয়া দান করিতে একটু ফুৎ লক্ষ্য বোধ করেন না। এ সকল দৃশ্য দেখিলে বাস্তবিকই স্মৃতির প্রথম অবস্থার কথা মনে হয়।

তোকিও শহরের আইচেউ বোর্ডিং হাউসেও একবছর ছিলাম। সেখানেও একই ভাব। সেখানে আমি একবার ভারতবাসী ছিলাম। আমি তোরাগে পরিবাহী অত্যন্ত বন্ধুত্বের সহিত মানাগারে ঢুকিতাম। কখন কখন চাকরাণীও লি আনিয়া ছাত্রদিগের শরীর পরিষ্কার করিয়া দিত। বস্ত্রপরিহিত বলিয়া অনেক সময় মানাগারে বন্ধুগণ আমাকে বিদ্রূপ করিত। তাই প্রায়ই আমি সর্বোচ্চ অবস্থা সর্বশেষে একাকী দান করিতে প্রয়াস পাইতাম। উহাদের কেহ কেহ নীচের তলার দান করিয়া কত বর অতিক্রম করিয়া উপলব্ধ অবস্থাতেই উপরের নিজ নিজ ঘরে চলিয়া যাইত।

কোন কোন ভিন্নশাখার মানাগারের আভ্যন্তরীণ চিত্র গোপনে গোপনে দিল্লীতে হইয়া থাকে। শুনিতে পাই প্রকাণ্ড গল্প চিত্রের বিক্রয় নাকি আইনবিদক। চারি বৎসর পূর্বে জটনৈক বৈদেশিক ভ্রম্মহিলা ক্যানেরার সাহায্যে জাপানের উত্তর প্রদেশে এক মানাগারের আভ্যন্তরীণ চিত্র লইতে উপক্রম করেন। অধিকাংশ জাপোনাই উহাদের কোটো লওয়া চাইবে

বলিয়া উল্লস অবস্থাতেই ৭৭ একটু কায়দার সহিত ঠাড়াইতে প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় একজন বিশিষ্ট মহিলার উদ্দেশ্যে আপত্তি থাকায় তিনি আর হুই এক জন স্ত্রীলোকের সহিত কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই নিকটবর্তী পুলিশ বসে থবব পাঠান, অবিলম্বে একজন পুলিশ আসিয়া মেঘ সাহেবকে থানায় লইয়া যায়। ফোটের বিচারে ক্যামেরা এবং নেগেটিভ সরকারে ব্যাকরণস্থ হইয়া গেল। কোন কোন গটান পত্রীতে অনেক সময় খেলা; যাহাগাতেও স্ত্রী পুরুষকে উল্লস অবস্থার স্থান করিতে দেখা যায়।

সমুদ্রে এবং উচ্চ প্রান্তরে স্থান আত কালে একটা বিশেষ ক্যালানোর মধ্যে ঠাড়াইয়াছে। গরমের দিনে সুন্দর যুবতী, ছেলে বড়ো অনেক দল পাঁচ দিনের জন্ত সমুদ্র তীরে বাস করিতে যান। এ দৃষ্টে অনেকটা তর্কীয় আইটন ঘাটের কথা মনে পড়ে। সমুদ্র তীরে যে স্কল জাহাজ প্রাকৃতিক দৃষ্ট মনোরম তথায় যানার্পীদের সুবিধার জন্য স্থান স্থান হোটেল সহিয়াছে। যানার্পণ হোটেলের অবস্থান করে। আন্তে ৬টা ৭টার মধ্যে প্রান্তর্ভেদন সমাপন করিয়া একঘণ্টা বিশ্রাম করার পর তাহার সমুদ্রে নামে। পুরুষগণ ল্যাপট ও ক্রুজ জামা এবং মেয়েরা জামিরা গেজি পরিধান করে। অনেককাল যৌদ্ধে বাহিতে থাকিতে হয় তাই হুই তিন পরমা সুগোয় এক একটা কাঠ নির্মিত টুপি ঐ কয়েক দিনের জন্য কিনিয়া লয়। সস্তরগাদি নানারূপ জলজীৱার ক্রান্ত হইয়া পড়িলে তীরে উঠিয়া কতক্ষণ বালিতে গড়াগড়ি দিয়া বিশ্রাম করিয়া লয়। আবার

জলে নামিয়া পড়ে। এইরূপে ৮টা হইতে ১২টা পর্যন্ত কাটিয়া গেলে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্ত হোটেলের ফেরে। ভোজনের পর সস্তরক জাতীয় কোন খেলা কিবা তাগধোলায় কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া পুনরায় ৪টা



জাহাজবাহিনীর সমুদ্র স্থান।

সময় সমুদ্রে নামে, লক্ষ্য পর্যন্ত সস্তরগাদি স্ত্রীমত চলে। তারপর হোটেলের কিরিয়া আইসে। এইভাবে কয়েক দিন সমুদ্রতীরবাস সমাপ্ত করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করে।

পূর্বেই বলিয়াছি একদল সত্যতা আমাদের নিকট অদভুতা বলিয়াই মনে হয়। চীন-বানীরাও এ অতিনব দৃষ্টে অবাক হয়।

আমি যখন মেনে প্রত্যাশিতন করি আমার কানিনে দুটি ইংরেজ পুরুষ ছিলেন। একজন বহুশে কতকটা প্রাচীন। তিনি লক্ষ্যবশে কয়েক বসন্ত চা বাগানে চাকুরী করিয়া যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার তাহা করিয়াছেন। তিনি একজন রমিক পুত্র এবং ভারতবাসীর শিক্ষাবশে তিনি পঞ্চমুখ। সুবসিতপাড়াবসন্তঃ তাঁহার এক হাত ও এক পা নিকল। লাঠিভয় করিও তিনি চলিতেন এবং সমস্ত সময় তাঁহার গৌরবের

অলৌকিক বীর্য কাহিনী বর্ণনা করিয়া আনন্দে গল গল হইয়া উঠিতেন। অনেক গরীব ভারত সম্মান তিন চারি হাত কাপড়ে অঙ্গাঙ্গ মাত্র আবৃত করে এই বলিয়া ভারতবাসীকে অসভ্য বর্কর বলিতে বড় আঘাত বোধ করিতেন। অপর ব্যক্তি তাঁহার উল্টা—তিনি অতি ভদ্র যুগ। পড়া-শুনা শেষ করিয়া তিনি ভূগোলক্ষেপে যাহার হইয়াছেন। জাপান চীন এবং সিচাপুরে তিনি যাচা কিছু ভাল বেশিতেন তাহারই



সহরবাসিনী বালক বালিকাগণ।

বিস্তার প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার শিষ্টাচারে আমি নিরন্তর মুগ্ধ হইতাম। তিনি কয়েক-দিন কনোমো সহরে অবস্থান করিয়া ভাবত সম্বন্ধে কিকিং অভিজ্ঞতা অর্জন করিবেন এই তাঁহার ইচ্ছা। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আমরা তিন জনে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। আমাকে ভারতের আশা লইতে হইল। যুবকটির একটি অভিপ্ৰায় পুনঃ পুনঃ জাপানের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। যানাগার ১০।১০ ছুট ঘুরে হইলেও কানরার তিতরেই তিনি

উগল হইতেন এবং তোরাণে হাতে সেই অবস্থাতেই কত আরোহীকে অভিজ্ঞতা করিয়া 'জানাগারে চলিয়া বাইতেন। অনেক দিন গর করিতে করিতে ঘানে ঘাইতে প্রস্তুত হইতেন। সে গর শেষ না হওয়া পর্যন্ত হরত মাথ বট্টা নগ দাঁড়াইয়া আমানের সহিত গর চাপাইতেন। তথাপি তাঁহার প্রস্তুতা আর আমাদের গরীবেরা ছোট কাপড়ে শরীর আবৃত করে অতএব আমরা অসভ্য বর্কর! প্রিয়জনাব সরকার।

রাজকন্যা ।

নষ্ট দৃশ্য ।

অতাপুরে রাণীর চারি জন সখী—

বাতা, পাতা, কুল, রেণু ।

লতা । পাতা তাই, এক দণ্ড আর
আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা নেই ।

পাতা । চল তাই আমরা রাজকুমারীর
কাছে যাই—সেখানে ঐতর্য্যপন্ন নেই, বিখ্যাত-
খ্যাতকতা মেই ; কেবল ঘেহ শ্রীতি ভ্রম
প্রবচন ।

কুল । ঠিক বলেছিস তাই ; এখানে এই
ঐশ্বর্য্য সম্পদের মধ্যেও হাহাকার— !

রেণু । কখন কি ব'লে বিধ নজরে পড়ল
—সেই তরুই অধির ।

লতা । এ মিথ্যা জীবন আর সহ হয়
না— !

পাতা । চল তাই আমরা রাজকুমার
কাছে যাই ।

(আলো হারান প্রবেশ—)

আ । তোরা যে কেপলি দেখছি !
আমাদের ত স্নেহের অভাব নেই—অন্ত ভ্রাতা-
ভ্রাতা পীড়ন—সমালোচনার দরকার কি তাই
আমাদের !

লতা । হ্যাঁ স্নেহ ! গরীবের খার কাটা
শোনটা খুবই স্নেহ বটে !

পাতা । তোরা তখনই পারিস্ শোন ।

কুল । থাকে হুচকে দেখতে পারিনে
তাকে রোজ চার বেলা বুখে ভালবাসা দেখান
নিশ্চয়ই মহা স্নেহ !

রেণু । আর ত পারা যায় না !

আলো । তাতে হয়েছে কি—চুট মিটি
কুটো বলে যদি কান আঁদায় হয় তাতে
কুটিত হওরাইত সূচতা ।

লতা । তা যাই বল তাই—আর
কিছুতেই সহ করতে পারিনে ।

পাতা । আমিও না—

কুল । আমিও পারি না—

রেণু—তোরা গেলে কি তাই আমি
একলা থাকব না কি ?

ছায়া । তবে যা—সেখানে এক মুঠো
খেতে যদি বনের মোষ ডাড়াতে চান্স জ
যা ।

আলো । আমরা তাই তা পরিষদ না
—যাবও না ।

পাতা । হাজার কষ্ট
সেখানে পাপের কষ্ট মেই ।

ছায়া । আরে দেখা যাবে ধর্ম্মখির
কদিন থাকে— !

আলো । আবার সেই আসতে হবে গো
হবে,—এই বলে বিলুপ্ত—এখন অভিনয়ে
যানি কি না বল দেখি ?

লতা । না তাই আমি যাব না । ও সব
রঙ্গের গান আমার যুগ দিয়ে বেগোবে না
এখন ।

পাতা । আমরাও না— ।

আলো । কিন্তু বুঝে দেখ—রাণী কি
তাহ'লে রন্ধে রাখবেন ?

ছায়া । সেবে ঘনে আগে রাখা যানি ।

কুল । তবে তাই থাক্ আর রাজকুমার
কাছে গিয়ে কাজমেই,—কি বলিস !

এমু। চল ভাই তবে অগ্নিনগ্নেই যাওয়া থাক ।

লতা।—তা তোরা যে ঘাবি না, আমি অগ্নিনগ্নে যাব না—আমি রাজকত্তার কাছেই যাব—মরি দেও তাল ।

পাতা। আবারও ভাই অসহ্য হয়েছে—আমিও যাব।—এখন আমিটিকে কেবল বাগাতে পারলে হয়। সেই নিরাস্ত্র ভীষটিকে পবাস্ত্র যখন এই নরক চক্রে ঘুরতে দেখি তখন একদণ্ড আমি আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা হয় না ।

আম্বা। তা তোরা যা হয় কর—আমরা চন্দ্র ।

আলোছাবার প্রস্থান—

লতা। চল ভাই আমরাও রাজকত্তার কাছে বাবার উত্তোগ করি—

পাতা। চল ভাই,—আমার আবার আমিটিকে বাগাতে হবে।—

প্রস্থান ।

অশ্রুজ্বলিত কক্ষ । বিদূষক আঘনার সম্মুখে
দাঁড়াইরা গোপে ঢাড়া দিতে দিতে ।)

বি। গৃহিণী যা বলে তা কিছ ঠিক ! রাজার ঘেন সন্তোষের পরেছে—প্রজামণ্ডলে আঙন লাগলো—আর রাজা কিনা অতঃপরে প্রেমোদয় ! সন্ন্যাস অবলম্বনই শ্রেয় হয়েছে ! রাজকত্তারই আশ্রয় নিতে হোল দেখছি ? কিছ হানিটা শুনেছি খুব কঠোর ! কেবল চালকলা খেয়ে কি কাটাতে পারব ? সেইটাই ভাবছি । তা ব্রাহ্মণীও ত সঙ্গে থাকবে ? তাবনা কি ? সে নিশ্চয়ই আমার লজ্জা মিটানোর ব্যবস্থা করবে । ডান চোখটা নাচেছে যে !

হানিটা যেন সতাই হানি ! তাকে দেখলে স্ত্রী তৃপ্তাও থাকবে না আর ! গিন্নি তুমি কিছ ঠাকরণ নিজের পাশ নিজেই ছুড়োল মারছ—আমি এট বলে খালাস ! আচ্ছা—সেই আশ্রয় গৃহ থেকে ঘেরেরা দেখছি সমান বোকা ! রত্নাবলীকে ঘরে এনে রাজার হাতে সঁপে দিলে তখন কান্দলে কি আর কেউ চ'খের জল মোছায় ! এ লক্ষ্যকে দেখে যে, সে রত্নাবলীটও মন ঠিক রাখতে পারবে—তাত কিছুতেই মনে হয় না ।

(মাথা নীচু করিয়া অবলোকন পূর্বক)

গুঁতের মধ্যে এট ঠাকটুকু—তা সহজেই বাগাতে পারব ।

(পাখের চুল ধরা মতর টাক আচ্ছাদনের প্রকাশ,—এমন সময় পাতার প্রবেশ । তাহাকে দেখিরা টাক ছাড়িরা তাড়াতাড়ি পুনরায় শুষ্ক অজবনে যায়)

পাতা। গোপে যে খুব চাড় পড়েছে—এবিকে রাসো ছলখুল !

বি। সে এল শ্রেয়সি—আমার প্রাণ সমুজ্রে বাণ—আমার জীবন মার্চে ধান— ! (স্বগত, তাকে এই ভকম করে বলেই বোথ হয় ঠিক হবে ।)

(আনমনে পুনরায় টাক বিক্রাস —)

পা। দেখ মত করে আর চুল বাগাতে হবে না—যে রূপ আছে তোমার,—তাতেই মরে আছি !

(হাত দিরা চুলগুলি লগতও করণ ।)

বি। (শব্দবাক্তে অর্ধ হাত দূরে গিয়া) আরে কর কি কর কি ? (স্বগত) (তের পরেছে দেখছি) প্রকাত্তে—ভেন প্রেমসি—

তোমরা ক্রমে শান দাও তাতে দোষ নেই
আর আমাদের বেলাতেই মানহানির দর !

পাতা । তোমাদের এখন তরবারে শান
দিতে হবে—দেখছ কি সমর বড় ধারণ
পড়েছে ।

বি । তবেই হয়েছে—আমি তাণ তরবার
ধরলেই রাজা লাগড় !

পাতা । আজ্ঞা মহারাজকে তুমি একটু
দুঃস্বপ্নে বলতে পার না ?

বি । সর্জন্য ! এতদিন হাটির সখিগিরি
করে তোমার একপ বৃদ্ধি করেছে ? ওরা
বদি বলেন—সূর্য্য পশ্চিমে উঠেছে—তা
কখনই মিথ্যা ধ্বংস নয়—বৃক্লে ত ?

পা । তবে চল সখিগিরি সখাগিরি
ছেড়ে রাজকন্ডার আশ্রমে যাওয়া যাক ।
তোমাকে নিয়ে যেতেই আমি এসেছি ।

বি । (স্বগত) তা একবার গিয়েই
বেশা যাক না,—তেমন তেমন বেশি—গরে
পড়তে কতক্ষণ ? (প্রকট) তা চলনা
—তুমি যে পথে যাবে শর্যা হোমার আঁচলে
বাধা ।

গান

কীৰ্ত্তনের স্বর ।

মান যাও তুলে—চাও সুখ তুলে

ওগো গরবিনী-ধনী-রাধা— !

হের বৃন্দাবন ঘন গোপীমোহন,

তোমার অকলে বাঁধা—

ঐ শ্রীচরণমূলে বাঁধা ।

হের—ভূমিতে দুটার ব্রহ্মাখানি,

নীলব সয়ন রাগরাগিণী

সপ্তস্বর ললিত যমুধর—

তব নামে যে গো সাধা— !

ওগো ভূমি রাধা তার সংখ্যামনি—
আমাদের শ্রম রাজা সে তোমাতে ধনী,

তুমিই তার পরমা কামনা—

ধরমে কতঃম বাধা— ।

গান করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান ।

সপ্তম দৃষ্ট ।

সেনাপতির কক্ষ ।

(কক্ষে পদচারণা করিতে করিতে)

সেনা । এত দিনে আত্মাকাপূর্ণ করার
স্বযোগ উপস্থিত ! প্রজাদের বিস্ত্রোহী করে
ভুলতে আর বেশী প্রয়াস পেতে হবে না ।
তামসর তারা যদি যেতে শু আমি সিংহাসনে
উঠবই, আর যদি হারে তাহলেও মহারাজ
জানবেন—আমিই বিস্ত্রোহ ঘবন করেছি ।
এ চালের আর মাম নেই !

(অধীনস্থ সেনানায়ক প্রবন্ধুমারের প্রবেশ ।)

প্রব । নমস্কার সেনাপতি ।

সেনা । নমস্কার প্রবন্ধুমার—যদি কি
বলদেখি ?

(স্বগত) এই লোকটাকে দিচ্ছেই আমার
কার্য্যসিদ্ধি করব ! লোকটা অত্যাচারবিরোধী,
কিন্তু প্রকৃত বীর, এ যদি একবার নেতা হয়ে
দাড়ায়—তাহলে প্রজারা সহজেই বিস্ত্রোহী
হতে দাড়াবে ।

প্রব । সেনাপতি শুনেছেন—যদি আশুপ
লাগার যে সব প্রজা সর্জন্য হ'য়ে রাজদরবারে
অভিযোগ করতে গিয়েছিল—তারা বিস্ত্রোহী
ব'লে বন্দী হয়ে'ছে ! উঃ কি অমান্যতা !
শাসনের নামে কি অশাসন—বিচারের নামে
কি অবিচার !

সেনা। সেটা তুমি আর নতুন ক'রে বুঝ—আমরা অনেক দিন থেকেই মর্মে মর্মে এই আশা ভোগ করছি—কিছু কি করব বল ?

ঈব। কি করবেন ?—মহারাজকে বুঝিয়ে বলবেন ! তিনি ত দেখতে পাট, আপনাদের কোন কণাই অগ্রাহ করেন না ; তিনি ত ঘোঁষ আপনাদের উপরই সবত তার বিচরছেন,—আপনি যদি প্রজাদের একটু আশ্বাস দেন—যে তাদের উপর আর অত্যাচার হবে না, তা হলেই তারা শান্ত হয় । একটু পরা একটু অহুসেব উপর রাজ্যের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করছে । অত্যাচারের সম্পর্ক ঘুড়ির মেঘের সম্পর্ক তাদের আবহ কখন—দেখবেন রাজ্য মঙ্গল-ঐতে ত'রে উঠেছে ।

সেনা। (স্বগত) রাজ্যের মঙ্গলে আমার মঙ্গল হয় কই ? (প্রকাশে) বোঝনা যে একটু অত্যাচার না দেখালে প্রজারা ঘাথাও চড়ে বসে ; অত্যাচার তাই হচ্ছে রাজ্য শাসন ।

ঈব। আপনি কি সত্যি তাই মনে করেন ?

সেনা। আমি কি মনে করি না করি তাতে ত কাজ চলে না—মহারাজা তাই মনে করেন । আমি তাঁর দাপ ।

ঈ। এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারিনে—আমি বেশ বুঝতে পারছি তিনি প্রকৃত কথা কিছু জানেন না । আপনি সাহস করুন—তাকে বুঝিয়ে বলুন—বেশ রক্ষা করুন ।

সেনা। তুমি নিতান্ত অক্সাটোন ! আমি

দয়াকর তাঁর আশা পালন করব—ততক্ষণই তাঁর সেনাপতি— ।

ঈব। তবে কি আপনি বলতে চান—আমাদের রাজ্যে সত্যি এত নিষ্ঠুর—এত অত্যাচারী—এত—

সেনা। তা আমি বলছি নে । আমি বলছি—রাজ্যে রক্তম করে রাজ্য শাসন করতে চান, অবনত মস্তকে তাই তোমাকে জ্ঞাপন বলে মেনে নিতে হবে ।—

ঈব। তা আমি পাব না, তাহলে আমি নৈনিক পর ত্যাগ করব । অত্যাচারে মনে পুণ্য দ্বারফে আমি অসি কলঙ্কিত করতে পারব না ।

সেনা। তা হলে তুমি বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করবে ?

ঈব। তাহা বিদ্রোহী সুবিচার প্রাপ্তি !

সেনা। তথাপি রাজ্যে তুমি বন্দী—রাজবিচারে তারা বিদ্রোহী, তাদের পক্ষ গ্রহণ করাই বিদ্রোহিতা ! তুমি বিশ্বাসই করবে না—একটি আদেশ পালন আমার পক্ষেও কিস্তি কষ্টকর !—সময় সময় বিদ্রোহিতা তাবে আমার রক্তও স্ফোটারে ছার হুটে উঠতে থাকে, তবু আমি নিরুপায়,—আমি দাপ ।

ঈব। হা ভগবান ! এই রকমেই—রাজতন্ত্র প্রজারাও অবশেষে সত্যি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে !—আমার কথা শুনুন—আপনি মহারাজকে সমস্ত দ্ব্যাপার বুঝিয়ে বলুন ?

সেনা। নিষ্ঠুর কোনো—তাতে আমিই কেবল বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে । তখন কি তোমরা আমাকে রক্ষা করতে পারবে ?

ঐব। যক্ষা কর্তে পারব কি না জানি না,—তা যদি হয় আমিই নেতা হয়ে রাজ বিকছে ধাঁড়াব। থাকে ভগবান প্রভা যক্ষার ভায় নিরেছেন—তিনি যদি প্রজা-পৌন করেন—তখন আর তাঁকে পিতা মনে করতে পারিনে। কিন্তু তার আগে—আমি নিজে মহারাজকে সব জানাব—!

সেনা। (হাসিয়া) বেশ তাই কর, দেখ কি কল লাভ হয়।

ঐব। হালবেন না! আপনার এই অবিখ্যালে আমার অন্তরেই হল ঘেন সব নিঃশেষ হয়ে আসে! অগচ্চ আমার অন্তরাত্মা ফলছে, গুণের জয়—বর্ধের জয় অব্যর্থ, মহারাজা লতাই নিরুহ নন। বস্ত্রকণ দেহে এক কোটা রক্ত থাকবে, আমি এই অমূল্য দ্রব্য করতে চেষ্টা করব। ঘাই,—বেশি কি উপায় করতে পারি!

প্রস্থান।

সদ্রী। না:—যা আশা করেছিলেন বোলনা, এ'কে বিস্তারী করা দেখছি সহজ নয়। বেশ বুঝছি এ-ই আমার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে ধাঁড়াবে। কণ্টকটাকে যে এখন সন্মতে পারলে হয়! গে কচ্চ

ভাববাই কি এত! একটা কুটাকে বচ্চ কর্তে বেশী বলের আবশ্যক করে না। তারপর রাজলক্ষ্মী যে আমার অকপায়িনী হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।—কিন্তু রাজাই বুঝা—যদি না রাজকন্তাকে লাভ করি।—এত চেষ্টাচেষ্টেও তাঁর একদিন দর্শন পেলাম না! অগচ্চ আর সকলে অন্তরালেই তাঁর দর্শন পার! বধন সিংহাসনে অজ্ঞাত হয়ে বন্ধিনীকে সম্মুখে ধাড় করা—তখন? তখনও কি ভিত্তিক রমণী আমার দহিনী হতে লাগা অহতব করবে না! তা যদি হয় তখন সহস্র উপায় উদ্ভাবিত হবে। এখন রাজ্যধ্বংসের উপায় দেখা যাক।

প্রস্থান।

(রাজপথে ঐবকুমারের প্রবেশ)

ঐ। উঃ কি বড়দয়! লতাই বিস্তে- বিস্তার আরোজন হচ্ছে! আর সেনাপতিই তার মূল! কি করে মহারাজকে লাভ্যমান করা যায়! তিনি দেখছি এখের হাতে বয় বস্ত্র! হার হার! কি উপায়ে তাঁকে সব জানাব! রাজকন্তার কাছে গেলে হয়ত কোন উপায় হতে পাবে! দেখি যদি তাঁর দর্শন পাই।

বর্ষা-মধ্যাহ্নে ।

সূক্তি নাই আজ তবু মেঘ ঢাকা পদমবতল
দিকে দিকে ক্রস-কটা উড়ে ঘেন অশিত-পিরল।
রান দিবসের আলো—মধ্যাহ্নে কি পোখলি-লগন—
কপলী প্রকৃতি বাংলা অজ-বাতা বিরল বন!

সমুখে সরলী ঘোর নীরগুণ বৌবদ-তকলা
তীর-চুখী ধান-ক্ষেতে রত্নিরথে আগুন কমলা।
কপলীর কৃত্ত তীরে—কপলগনে ঘোরা চারিধার—
উদ্যানী সলীল কিরে কিত্ত ঘেন ঘনি হাফাকার!

এক আনি পুষ্ক-পুষ্ক বসি বুক বাতায়ন-পথে
লাগা প্রাণে চাখিতেছি—সূক্তি তব লভ বিক হতে
অড়ারে বসিতে বকে, জুড়াইতে বিরলী জনন—
বুঝ কেটে যায় আনি বিলনের নিতৃত্ত সনন।

প্রেমসরলী বেলী সূক্তি, বীন কক্ষে পাশের কেমনে
উদ্বিগত বসন্তের অমহার আনন্দ-অননে।

ঐশ্বর্যবেলকুমার দত্ত ।

শুজরাত কৃষক-পল্লিচিত্র ।

শুজরাতের শুজরাত নিবাস অলস প্রকার মাঠের উপর দিয়া গোশকট রেপাঙ্কিত আঁকা বাকী দুল্পূর্ণ জল দ্বারা ধরিয়া চলিতে চলিতে প্রান্তরের কোন এক দিক হইতে বন্দীধ্বনির দ্বারা কখন মধুস্পন্দী একটা আন্তর্নিবাস আপনাত কর্তৃত্বের প্রবেশ করিলে বৃত্তিতে পারিবে—পল্লী হই তিন মাইল ব্যবধান যাত্রা । কিয়দূর অগ্রসর হইলেই শতশ্রমল ক্ষেত্র সকল নখন গোচর হইবে, এবং ক্ষেত্রসমিহিত বিভিন্ন স্থান হইতে দড়ি ও চাক সংযোগে বলদ বা মহিষ দ্বারা গুল উত্তোলন করিয়া কৃষকবৃন্দ শতক্ষেত্রে দিকন করিতেছে দেখিবেন ;—কিরতকণ পূর্বে এই গুল উত্তোলনের শব্দই আপনাকে উৎকর্ণ করিয়া বিরাটিল ; যাহা আপনি পানীর ডাক বলিয়াই হস্ত দ্বিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । সে স্থান হইতে পল্লী অভিমুখে কিয়দূর অগ্রসর হইলেই সারল, মগুর, টিহা তিস্তির প্রভৃতি নানা জাতীয় পানীর হুখোয়া বিন্দু কাকলীকলাপে আপনাত কর্তকে মদীর করিয়া তুলিলে এবং অনুধে বহুল নৃক্ষজায়াসমাচ্ছন্ন অবস্থিত পল্লীচিত্রপানি আপনাত নখনবস্তিনী হইয়া উঠিবে । বিস্তীর্ণ প্রান্তর তরিত কোথাও এলাটি বনগুহের হরিজাবর্ণ কুহ্মের সমাচ্ছাদন, কোথাও রবিশালশীর্ণ শুক জুগাচ্ছাদন, কোথাও বনসমাচ্ছন্ন শ্রমল পত্র-বহুল বাবলাগাছের কটকাকীর্ণ শাখারাজি তরিতা হরিজাবর্ণ কুহ্মের শোভা । নিম্ন অশ্বখ, তেঁতুল প্রভৃতি নৃক্ষরাজি দখ

প্রান্তরের স্থানে স্থানে ছায়া-সেহ-শিখ কৌল পাতিয়া দিয়াছে । এক প্রকার তৃণ সজ্জী ও অসামান্য নামা নীলকুহ্মবোধী একরূপ শুণ্য প্রান্তরের কোথাও কোথাও হাক্ষরেশ্বর বৃষ্টিয়া উঠিয়াছে । চতুর্দিকের হস্তামল ক্ষেত্রগুলি মধ্যস্থল নতনয়া পল্লিহননী কতকগুলি মনোবীৰ অগ ওদের সহিত অচ্ছিন্ন বন্ধনে বিভক্ত হইয়া তাহাবিগকে বৃক লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ।

পল্লির অতি সরিকতর্জী স্থানে আদিলে সরোবর বা জলাশয়আকাবের একটা কিছু দেখিতে পাইবেন । এই জলাশয়ই পল্লির জীবন । সমস্ত পল্লিগুলি এইরূপ একটা জলাশয় উপযোগী স্থান ও তৎপার্থবর্তী উপর ভূমি দেখিয়া অত্যন্তকালে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল । পল্লিমাধ্য পথে পৌছিয়া আপনি পদপ্লির উপর বিহগরচিত চরণচিহ্ন দেখিতে পাইবেন ;—একখানি হুচিহ্নিত হারের মত শ্রেণীবদ্ধাকারে দুলিলাহিত চিহ্নগুলি কোন বিভক্ত চিত্রকরের অনিপুণ তুলিকা স্পন্দ-পল্লী চাক চিত্রেব বিব্রম জন্মাইবে । প্রত্যন্তে এই চিহ্নগুলি দেখিয়া মনে হয়—বনদেবী বৃষি বামিনীতে পল্লির এই দুলিময় পথে বিচরণ করিয়াছেন । অগণিত পানী পল্লির চিরবৃদ্ধ সহচর । পল্লির চারিদিকে অনেক মগুর অসংকেতে পুচ্ছ বিস্তার পূর্ণক পুনকরোমাকে গলিত নৃত্য করিতেছে, আর ক্ষেত্রবনে বিভ্রমগুল পূর্ণ হইতেছে । পল্লির বন সন্নিবিষ্ট খোলায় বরতলি আপনাত চক্রে অভিনব বোধ হইবে ।

পল্লির ভিতরে প্রবেশ করিয়া আপনি প্রমকিধা
দাঁড়াইবেন—কোন পথে আপনি চলিবেন
নৃক্ষিতে পারিবেন না;—পল্লির প্রতি গৃহস্থের
বাড়ীর উপর দিগ্বাই পথ, বহিরাণী ও
অন্তঃপুর কিছুই নাই,—পল্লির একটা
লোককে সঙ্গে করিয়া আপনি পল্লির
সর্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন; এই
পল্লিতে কতগুলি পরিবার তাহা আপনার
পক্ষে নির্ণয় করা দুর্ভর, কারণ বিভিন্ন
পরিবারের মধ্যে আঁড়ানার কোন ব্যাধান
নাই; সকলই এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত
মনে হয়। পল্লির প্রতি চালে চালে
অধমিত ক্ষুদ্র মসুরী দেখিতে পাইবেন;
নয়নারী সকলকেই সমভাবে চলা ফেরা
করিতে দেখিবেন; পুরুষগণের সকলেরই
বস্ত্র পাগড়ী বা টুপি ব্যাধা আবদ্ধ, আঁঠীর
মুঠার পর তাহারা অগ্নানবাক্ষর হইবার
সময় কেবলমাত্র টুপি পাগড়ী পরিচ্যাগ
করিয়া গৃহের বাতির হয়; জীলোকগণের
পরিধানে নানা বর্ণের বাগ্‌রী, তদুপরি
নানা রঙিন শাড়ী ও বন্ধে ঝাঁটলী;
হস্তে বালা, কর্ণে মাছড়ী পদে গুড়রী
মলা জীলোকগণ নৌঠমরী, সবলা
ও নিবিধ গৃহকর্তৃপরিচয়। পল্লির মধ্যে
একটা বোকান পল্লির সমুদ্রের প্রবেশনীর
প্রমাণি সরবরাহ করে; এই বিলাস ঘোড়ে
ভাসমান অগতে তাহাদের প্রাধান্যের শুধু
ডাল, চাল, শুদ্ধ বাজরি ও তেল নুন
কাপড়,—ইহাই তাহাদের জীবন পরিপূরকরক
ও নৌঠমের সকল উপাদান ও উপকরণ।
হিন্দু, জৈন ও মুসলমানগণ একত্বেভাবে
অবস্থান করে, ইহাদের মধ্যে সৌখ্যস্বস্ত্রের

কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এই পল্লির
উপর বিরাট কালের কত স্বাধীনতা বহিয়া
গিরাছে, তত্ত্ব ও ইহা অটল স্থির একত্বেই
বসতিমান। প্রতি পল্লিতেই জৈন চৈত্র্য, হিন্দু-
মন্দির বা মুসলমান মসজিদ দেখিতে পাইবেন।
দেখানো ক্ষুদ্র পল্লির প্রাচীন ইতিহাসের
জীর্ণ কথাগুলির পুনরাবৃত্তি চলিতেছে।
এখানে নূতন উদ্ভেদনার কিছুই নাই—পুরাতন
কথাগুলিই একমাত্র সঞ্চল;—মাঠের কথা,
ফসলের কথা, সঞ্চয়নের অবস্থার কথা
তাহাদের নিত্য আলোচনার বিষয়।

কৃষকের সম্পত্তির মধ্যে তাহাদের জীর্ণ
কুটার, লাঙ্গল এবং কয়েকটি মহিষ বা বলদ।
কোন কোন স্থলে কোন কোন পল্লিবারে
ছই একটা গরু বা মহিষের গাড়ীও দেখিতে
পাইবেন। কনুদীগণই গ্রামের কৃষিকারী;
তাহারা ভিন্নভাবে বিভক্ত—শেখা, ককরা ও
আজান। তাহারা নিম্নলিখিত ক্ষত্রিয় বলিয়া
পরিচর দেয়; কালের পরিবর্তনে এখন
হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাণিজ্যগণ
গ্রামোৎপন্ন স্রোত বাণিজ্য করিয়া বিদেশ
অর্থপালী।

গ্রামের “পটেল” বা পকারিত গ্রামের
সর্বেস্বকী; তিনি গ্রামের সমস্ত বিচার
নির্ধার করেন, শরী রক্ষার্থ চৌকিদার নিযুক্ত
করেন; গ্রামের বাণিজ্য শান্তি রক্ষার
অবশ্যবস্তু ও কৃষিকারীদের সকল প্রকার
বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করেন।

গ্রামে আদিম অমর্ত্য জাতি ভৌল, ব্রহ্মি,
মীন, মীর প্রভৃতি কৃষি কার্য বা অস্ত্রাস্ত্র বিধি
কার্য নিযুক্ত থাকে।

গ্রামে ‘শৈবায়িত’, ‘বৈষ্ণবায়িত’ ও ‘শ্রাবক

(জৈন) ভিন শ্রেণীর হিন্দুধর্মাবলম্বী দেবা-
ষায়। ভীল, মৌর কুলি, মৌর প্রভৃতিগণ
অনেক স্থলে কবীরপন্থী ।

“পটেল” গ্রামের সর্ব প্রধান ব্যক্তি, তাহা
যাহাই গ্রামের বাবজীর বিষয় নিশ্চিত হয়।
এতি গ্রামের রসক, নাশিত, কুস্তকার তৈল-
কার, চৌকিদার মেদর সকলেই স্বয়ং কণ্ঠে
নিযুক্ত আছে। এতিগ্রামে গ্রামের উন্নতি
বিধান জন্ত একটা ধনভাগার আছে। পটেল
সময় অতিবাড়ী হইতে পথ সংগ্রহ করিয়া
এই ধনভাগারটী পূর্ণ হয়। সেই অর্থে
গ্রামের কর্ত্তারী সকলকে নিয়মিত বেতন
দিয়াও তাহা যথেষ্ট উৎকৃষ্ট থাকে।
তদ্বারা আত্মকাল সহরের পুলিশ কর্ত্তারী-
গণের বৃত্তান্তিত জুখা নিবৃত্তি করা হয়।
এইরূপে গ্রামের কত অর্থ যে অনর্থক
ব্যরিত হইতেছে, তাহা বলা সুকঠিন। এই
অর্থে গ্রামের কত মহৎকাণ্ডের অহুতান
হইতে পারিত। এই অর্থের দাতাগণের
কিন্তু পরিধানে ‘টট’ সমতুল এক দুতি ও
হুখে এক লাঙ্গল মাত্র সঞ্চয়। তাহাদের
এই কষ্টমুক্ত অর্থগুলি তাহাদের কোন
কাজেই ব্যয়িত হইতে না।

গ্রামে একটা ক্ষুদ্র পাঠশালা আছে,
তাহাতে গ্রামের নয়, শ্লিখুসরিত বালকবৃন্দ
শিক্ষালাভ করিতেছে। এই স্থলের কোন
মাহিনা নাই। পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়
মাসে একদিন মাত্র অংশিক, ক্রান্তিযুগকে
সঙ্গে করিয়া এতি বাড়ী হইতে এক
এক দুটি চাউল সংগ্রহ করেন। ছাত্রগণ
“একরে একরে এক” একরে বেকরে-বে
একরে তেকরে জাপ” করিতে করিতে

পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে
থাকে।

কৃষকগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টমুহিত।
কৃষিগণ বিশেষ সাহসী বলিয়া পরিচিত।
কৃষকগণ অতি প্রাচ্যে শখা হইতে গাজোখান
করিয়া বন্দগুলিকে কিছু আহার্য্য প্রদান
করে। অত্যন্ত সময়ের মধ্যে পরিবারের কিছু
কাৰ্য্য করিয়া বন্দগুলিকে লইয়া মাঠে চলিয়া
যায়। বেলা ১০টার সময় কৃষকসমষ্টিগণ
তাহাদের আহার্য্য লইয়া মাঠে গমন করে;
সেখান হইতে সমষ্টিগণ করিয়া আনিয়া আহার
সমাপনান্তর—গমচূর্ণ করা চাউল প্রস্তুত
করা প্রভৃতি গৃহের বিষয় কাৰ্য্যে নিযুক্ত
পাকে। তৎপর সন্ধ্যায় রাত্রির আহার্য্য
সামগ্রী প্রস্তুত করিতে থাকে।

একবার রজনশালার দৃষ্টটা দেখুন ;—
তথার তৈলসম্প্রদায় কিছুই নাই, গোমরশিষ্ট
মুয়ের এক কোণে উনানে একখানা কাঁচ মিট
মিট করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার উপর ‘তাওয়া’
চড়ান; কৃষক পত্নী কিছু বাজায় আটা হাতে
মর্দিষ্ট করিয়া তাওয়াতে অঘ্রিতপ্ত করত
“চোটনা” প্রস্তুত করিতেছে। মুখে কৃপাকন্বীর
ভজন গান চলিতেছে।

পরতে সন্ধ্যায় পর কৃষকপত্নীগণ একটা
এদীলের চতুর্দিকে গুরিয়া হেলিয়া চলিয়া
করতালি দিতে দিতে কি গান গাইতেছে
সুহন :—

গরবী

“ও ঈশ্বর অরলী উর খারো,

হুনিরানো হুখ নিবায়ো মাত,

দয়া করা হবে বীনবন্দু।

সারাজন শঙ্কটমঃ পড়িবা।

নরসান্না ছাড়া নড়িরা রাজ ।

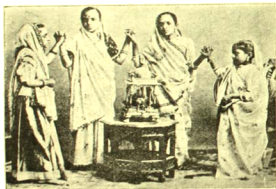
দগা কর হরে নীন বন্ধ ।”

হে ঔষধ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর,
হে রাজ হুনিবার হুঃখ নিবারণ কর, এখন
নীনবন্ধ দগা কর । অসং লোকের সংসর্গে
পড়িয়া ভাললোক লঙ্ঘ্যে পড়িয়াছে এখন
নীনবন্ধ দগা কর ।

“বে পরোপকারী ছে পুত্র,

এ পণ লিখি দক্ষা অধুরা রাজ ।”

বে পূর্ণ পরোপকারী ভাগ্যরও এখন দক্ষা
নাই ।



গরুড়টি মহিলাদি মার্মা করিতেছে ।

বে গুপ্তের উপর অগত হিত তর্ক
ভাগিলে অগত কিসের উপর রহিবে ।

ফরিষি মনমা কোই নহি কুলে

ভবনা আত্মা নহী ভলে রাজ ।

জুধ পামো নো গামো গামে

দিবি আনৌব দলপত নামে রাজ ।

পুনঃবার কেহই মনে অহঙ্কার করিবে না,
সেজন এই পুণিনীতে হুঃখ প্রাপ্ত হইবেনা,
প্রতি পলিতে পলিতে হুঃখ প্রদান কর,
দলপত নাম এই আনৌব দিতেছে ।

কৃষ্ণাণ কবি কৃষ্ণা কন্বী বিরচিত
“কন্বীর হুঃখ” নামক গান হইতে তাহা-
দেব লব্ধদরের সকল হুঃখ হুঃপের কথা
জানিতে পারিবেন । শুদ্ধরাতের প্রতি পলিতে
কৃষ্ণক বাণিকা দৃশ্যতী বৃদ্ধা সকলেই অতি
উৎসাহের সহিত এই গানটী গাহিয়া থাকে ।

“গামল রে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি

কন্বী কেতা হুঃখনী কহু কথাব জো ।

দে হুঃখ ঢালৌ অবনীনা আধার জু ;

অমলী রাণো তমে রাম রেহি বার জো ।

গামলের শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি ।”

হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের
প্রার্থনা শ্রবণ কর কন্বী
কোরার হুঃখ বর্ণনা করিতেছি
আমাদের হুঃখ পূর্ণ কর,
তুমিই অবনীর আধার ; রাম
তুমিই আমাদের একমাত্র
সাম্রাজ্য, তাই আছি । হে
শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা
শ্রবণ কর ।

চড়ে বাপলা মাল আবারো আওতা

মেঘ তছতে পড়বা মাড়ো নীর জো ;

হাল পরোনো কন্বী কেতা হাধমা

ভিলী জায়েছে কন্বী কেতা শরীর জো ।

গামল রে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি ।

আবার মাল আসিতেই মেঘ দেখা দেয় ;

মেঘতছ পড়িতেই জল হইতে আরম্ভ হয় ;

কন্বী ও কেরা হস্তে হাল ও পাটন গ্রহণ করে,
কন্বী করর শরীর জলে ভিজিয়া যায় ।

হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর !
প্রাণ মানে মেঘলো বরণে শরৎকে,
লক্ষ্য লক্ষ্য জীবন নর নে নার জো ;
দীক্ষা দ্বারা বহু লক্ষ্য পাশে জই কহে,
“সমগ্র জো কই বাণে তার জো জো” ।

সামগ্র্যে শ্রীকৃষ্ণ অমরো বিনতি ।

প্রাণ মানে মেঘ হইতে বৃষ্টি মারে মাঝে
হয় ; নরনারী পরিপ্রবেশ ঘণ্টা হইয়া যায় ।
পুত্রবধু গুণের নিকট বাইরা বলে—বস্ত্র
মহাশয় কিছু লক্ষ্য বপন করুন । হে শ্রীকৃষ্ণ
আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর ।

“ভগ্নে আবিষ্কারে তার মরিনো হবে ;
কন্বী কেরা নারী লক্ষ্য বাহ জো,
চার তনো ভাণে মাগে জেনো গলে,
ছে’রা জেড়ে রক্তা পল্লভা বার জো ।

সামগ্র্যে শ্রীকৃষ্ণ অমরো বিনতি ।

ভাষা মানে খুব ভাগ্যবান বৃষ্টি হয়, কন্বী
কেরা নারী ভিজিয়া যায় ; কৃপা সমষ্টি ভেদ
করিয়া জল জলনরত বাগকের মাগার উপর
পড়িয়া ভিজাইয়া দেয়—হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের
প্রার্থনা শ্রবণ কর ।

“মাগোমা মাগা জো বানী মতি ঘনী,
বাট জোরগো মেঘ বহনগা কাল জো ;
জার বাজারী জুড়ে অরী বেলগা,
ভাঙ্গর পাণি বিনা গুকায়ে আজ জো ।

সামগ্র্যে শ্রীকৃষ্ণ অমরো বিনতি !

অধিন মানে অত্যন্ত আশা করি
মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইবে । জোয়ার এবং
বাজারী মাগার করিয়া লগ্না হয় । জল
অভাবে খাঁজ শুষ্ক হইয়া যায় । হে শ্রীকৃষ্ণ
আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর ।

“কার্তিক মা গুরুত্বপূর্ণ তে আবিষ্কার ;
করে আবিষ্কারে গৌরবাহ ঠেহার জো,
“এক সিদ্ধ কে কণ নব কই উপাধি শো”,
এবং বাহ্যতরী আজা নো নার জো ।

সামগ্র্যে শ্রীকৃষ্ণ অমরো বিনতি ।

কার্তিক মাগে গুরুত্বপূর্ণ জো আদিল,
গ্রাম গ্রামে বসিয়া হিলাব ঠেহার করিল—
“এক কণা লক্ষ্য কেহ উত্তোলন করিল না”
এই প্রকার রাজার আজা শ্রবণ কর । হে
শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর ।
মাগার মরিনো আবিষ্কারে কড়া রীতবী,
মেঘলো হপ্তো গুরুত্বপূর্ণ গুণা জো ;
মুখী তলাটা চোরে বেগে জই চড়া
কন্বী বিচারো বহু রীতে জুটায় জো ।

সামগ্র্যে শ্রীকৃষ্ণ অমরো বিনতি ।

অগ্রহারণ মাগ ভাগ্যবানই আদিল ;
বাজনার প্রণববারের টাকা পরিপ্রবেশ করা
হইয়াছে । প্রধান ও তহসিলদার গাড়ীতে
লহরে গমন করিল ; কন্বীর অনেক গুণ
লক্ষ্য করিতে হইল । হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের
প্রার্থনা শ্রবণ কর ।

গোবে বীজো পাক নবীনে পাছছে,
কণা কণা ফাটা বার লক্ষ্য জো ;
“মুখী বহু দূর করীছে আ লম্ব,
পন তে মা এল নবী চলাবা কাল জো ।

সামগ্র্যে শ্রীকৃষ্ণ অমরো বিনতি ।

দৌব মানে দ্বিতীয় বার লক্ষ্য বপন
করা হয়, কাপালের জট জুটিতে আরম্ভ
করে । সেই সময় গুহাতন লব দূর করা
হইয়াছে । কেবল নৃতনের জন্ত কালে
প্রস্তুত হইয়াছে । হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের
প্রার্থনা শ্রবণ কর ।

আমো মাঝে মহিনো কড়ী রীতনী ;
দোলা কঠ দো খেতর তো দেখায়ে কো,
রাজানো তে কর তে দেখায়ে আশিহো,
পন মাগাপর হোম তহু ভর পার কো ।

সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি ।

মাঝে মাঝে ভাগ রূপই আসিল ;
সকল ক্রমল দেখাইতে লাগিল ।
সামলরে কর সকলই দেখায়ে হইয়াছে কিছ মাগাপর
উপহ হিমকণা তহু দেখাইতেছে ।
হে শ্রীকৃষ্ণ
আমাদের প্রার্থনা প্রবণ কর ।

“কামল মহিনো আমো কড়ী রীতনী
হোমে থকুনো কীষো পুরো মাগ কো
“চালো আশন দটি থে” পন না কাহনু ।

মুখিয়ে মুকী চোকা চারে পাগ কো

সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি ।

কামল মাগ ভাগ রূপই আসিল ।
হিনে শক্ত সমুদ্র নষ্ট করিয়া দিয়াছে ।
“চল পলায়ন করি ?”—কিছ কেননে !
মোড়ল চারিদিকে পাহারা বসাইয়াছে ।
হে শ্রীকৃষ্ণ
আমাদের প্রার্থনা প্রবণ কর ।

“চোরে তো দো খাধ একটা চৈতন্য ;
মাগে “লাবো কর মেতম পর পার কো,
কামলারী বিধবাণী মজুতী লে লুটী,
সবের কোর জুলমণী লুটী লার কো ।

সামল রে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি ।

চৈতন্যমাগে সকলে সহবে একত্র হয় ।
বলে “তোমার উপর যা কর হইয়াছে আন ।”
নিরাস্রর বিধবা নারীর উপাঙ্গন লুটিয়া লয় ;
সবই কোর করিয়া লইয়া যায় ।
হে শ্রীকৃষ্ণ
আমাদের প্রার্থনা প্রবণ কর ।

“জানিনদার বৈশাখে আনোনে লুটে,
মাগ তেলনা জ্বল বহীছ কো কার কো ;

হার পিনা হৈয়া দো লেবল বহু করে,
পন পাশিহো চাপু লুটে মাগ কো

সামল বে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি ।

বৈশাখ মাগে জানিনদার আশিহা গর
মহিনের জ্বল দই সব লুটিয়া লয়—জ্বল মাখন
বিনা সন্তানগণ পূর্ণ ক্রমল করে কিছ পাশিহা
লুটিয়া লইয়া চলিয়া যায় ।
হে শ্রীকৃষ্ণ
আমাদের প্রার্থনা প্রবণ কর ।

“কোই মহিনো আমো কড়ী রীতনী,
চোড়াই গরে দো কনবী বন্দো পার কো ;
সম খাতানে আনা তেনে আশতা

পেতর মা খাতর তে জ্বরবা লার কো ।

সামল রে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি ।

জোঠ মাগ ভাগ রূপই আসিল ।
কনবী শাক হইয়া যায়, তাহার বিধাতার
নিকট প্রতিজ্ঞা ও গল্প কর, এবং ক্ষেত্রে
চাল করিতে গমন করে, হে শ্রীকৃষ্ণ
আমাদের প্রার্থনা প্রবণ কর ।

“বারে মহিনো রূপা মা পুরা থকা,
হেমা কনবী কোরো কণী কখার কো ;
কোই গার অনে শিখে নে সামলে
বাস বর্ণনা তেনো নষ্ট থই পার কো ।

বার মাগ রূপা খাবা পূর্ণ হইল ;
হইতে কনবী কোরার জ্বল বর্ণিত হইল ।
যে কোই গার, শিকা করে—বা গোনো তাহার
অতি শীঘ্র বর্ণা বাস ঘটয়া থাকে ।
হে শ্রীকৃষ্ণ
আমাদের প্রার্থনা প্রবণ কর ।

জোঠ মাসের প্রথম ভাগে আমের সকল
ক্রমকদিগকে লইয়া পঞ্চমী বৎসরের জ্বল
জ্বলের আলোচনা এবং বর্তমান বর্ষে কৃষি-
কার্যের কি নূতন বন্দোবস্ত হইবে তাহা ঠিক

করিবার জন্য পেটেল পল্লিগ্রামে যুক্ততলে সমবেত হয়। কৃষকগণ গত বৎসরের গ্রুপ জ্ঞাপন করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে পেটেল তাহাদিগকে—প্রকাই হাভার প্রাণ, প্রকা বাতীত রাতা কিছুই নয় ইত্যাদি নানা প্রকার মিটে কথাই কুট করিয়া গ্রামের মোড়লকে একটা পাগড়ী উপহার দিয়া সকলকে সম্মত করে। তৎপরে পুনরায় বর্তমান বর্ষের জন্য সকলে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

কেত্রে শত্রু পাকিয়া উঠিলে তালুকদার, জমিদার বা তাহাদের কর্ণচাৱী গ্রামের পেটেলকে সঙ্গে লইয়া কেত্রে গমন করেন। পেটেল কোন কেত্রে কত শত্রু জড়িয়াছে তাহা নিরূপণ করেন। তালুকদার বা জমিদারের কর্ণচাৱী শত্রুর পরিমাণ একটু বাড়িয়াই ধরেন। কৃষক তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অজ্ঞারোহ অজ্ঞার করে তাহা শুনিয়া তখন জমিদারেরের প্রাণ্য হির হয়। কৃষক শত্রু কর্তৃকের পূর্বে অজ্ঞমতি গ্রহণপূর্ব্বক জমিদারের অংশ তাহাকে প্রদান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। গুজরাতের বিভিন্ন অংশে এই বটনের অংশ বিভিন্নরূপ। সালাবারের কোন স্থলে অর্দ্ধেক কোনও স্থলে এক তৃতীয়াংশ কোনও স্থলে দুই তৃতীয়াংশ জমিদারের প্রাণ্য। খাজ প্রভৃতি যে সকল শত্রু কৃষ পুতুর প্রভৃতি স্থান হইতে জল দিকন দ্বারা জম্বাইতে হয়, সাধারণতঃ সে সকল শত্রুর এক তৃতীয়াংশ জমিদার গ্রহণ করিয়া থাকে। যব বাবলী প্রভৃতি যে সকল বৈমজিক শত্রু জল দিকনের স্ববন্দোবস্ত আছে তাহারা এক চতুর্থাংশ জমিদারের

প্রাণ্য। কোথাও কুদি উৎপন্ন প্রাণ্য অতি সামান্য মাত্র জমিদারকে প্রদান করিতে হয়। প্রতি বলদ ও কৃষিকার্য্যকর শোকপ্রতিও একটা খাজনা নির্ধারিত আছে।

গুজরাতের যে সমস্ত স্থানে জলের বন্দোবস্ত অতি সামান্য সেই সকল স্থানে চূড়াগমা রাকপুত ভূম্যধিকারীগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের ভিন্ন উপায় হির করিয়াছেন।

সদস্য জমী উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। তার পর সমস্ত উৎপন্ন শত্রু একত্র করিয়া বৎসর হয় তাহা লাভগ দ্বারা কর্তৃত জমিদার গণিতক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া প্রতি জমির উপর একটা আদায় মত হিসাব করা হয়। তৎপরে প্রতি একবার জমিতে এক মণ শত্রু বীজের জন্য বাদ দিয়া উৎপন্ন শত্রুর এক দশমাংশ কৃষকের পারিশ্রমিক দরিদ্রা বক্র; অংশ জমিদার ও কৃষকগণ সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া লয়।

পল্লির শত্রু বটনের পুণ্যখন প্রাণ্য নিয়ন্ত্রণ।

কৃষকদিগের সমুদয় শত্রু পল্লির সর্ব সাধারণের গোলাবাড়ীতে স্থগীকৃত হইত। তৎপরে নির্দিষ্ট এক দিনে জমিদার, গ্রামের মোড়ল, গ্রামের চৌকিদার, বাবদারী লোক ও বাগিয়া তাহা বিভাগ করিবার জন্য পান্সা পান্সা সহ গোলাবাড়ীতে সমবেত হইত। শত্রুর এক অষ্টচত্বারিংশ ভাগ রাজার জন্য পাকিত তাহা হইতে কিছুকমভাগ গ্রামের তহশিলদার, গ্রাম্যচিকিৎসক, রাজপুত্রের বাজেনগর, গ্রামের চৌকিদার, দেবারতন, পুর্করিয়া সংভার, ও কুতুরদিগল প্রভৃতির জন্য পাকিত।

তৎপত্র বাকি অংশে অধিনায় ও ক্রমক সমান
অংশে ভাগ করিয়া দিইত।

বর্তমান সময়ে জম্মা অজম্মা সকল বৎসরেই
ক্রমককে অধিকাংশ স্থলে শস্তের পরিবর্তে
অর্থরাজস্ব দিতে ছর বলিয়া তাহারা
প্রীড়িত বোধ করে; অনেক স্থলেই নেপা
থার এইরূপ অর্থরাজস্ব প্রদান করিতে
যাইয়া শস্ত ক্ষেতগুলি উত্তমর্ণের বহুগত
হয়।

ভূম্যধিকারী বা কৃষকবর্গের নিকট হইতে
রাজস্ব আদায় করিয়া রাজস্বতদার 'সরকারে'
জমা দেয়; কাকতই মামুনতদার মহকুমার
রাজস্ব আদায়ের কর্তারূপে নিরীচ গ্রামবাগীর
উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। মামুনতদারের
মনস্কটি—করিতে যাইয়া ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী
অনেকস্থলে নিঃস্ব হইয়া পড়ে।



সকরটি বৃনকেয়া কাপিস লইয়া যাইতেছে।

বড়োয়া রাজ্যের অন্তর্গত পল্লিগুলিতে
রমণচন্দ্রের উদার শাসননীতি অবলম্বিত
হইয়াছে। গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেওয়ানী
ও কোজদারী ক্ষমতা পল্লির নির্বাচিত
পকারিতেই চড়ে এবং গ্রামের উন্নতি

বিধানের সমস্ত ভার গ্রামবাগীদের হস্তে
ভুগ্ন করা হইয়াছে। রাজস্বকর হইতে
বাৎসরিক দাফা কিছু সাহায্য তাহা
পল্লিমিত্তির হস্তে অর্পিত হয়।

শিক্ষার উন্নতি, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির
উপায় ও বাগিচা প্রদানের সুবিধা সুযোগের
ব্যবস্থা রাজস্বকর করিয়া দেন। পরি-
হতে এক্রূপ ক্ষমতা স্তম্ভ হওয়ার দিন দিন
পল্লিগুলির শ্রীবৃদ্ধ হইতেছে।

সমস্ত বোম্বাই প্রদেশে বৎসর বৎসরই
রাজস্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ৭০ বৎসরে
রাজস্ব বাড়িয়া আর বিঘ্ন হইয়াছে। ভূমির
উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি না পাইলেও এইরূপ
করভারে প্রীড়িত ক্ষীণ ধ্বংস প্রায়
হুৎ মড়কে করাল প্রাণে নিপতিত
হইতেছে।

২৭ শালের (১৯২৭
বিক্রমাব্দ) ভীষণ দুর্ভিক্ষের
শ্রুতি শুভরাতবাগীদের অন্তঃকরণ
হইতে বুদ্ধি না যাওয়ার দেশ-
বাসী বাগিচা নীতির একটু
উপায় অবলম্বন করিয়াছে এবং
তৎফলে দেশের অবস্থার উত-
্তোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভিত হইতেছে।

সে বৎসরের দুর্ভিক্ষে ধনী
দরিদ্র সকলকেই করাল প্রাণে

নিপতিত হইতে হইয়াছিল। সহর পল্লি
সর্বত্রই ভীষণ দুর্ভিক্ষের করাল বুদ্ধি
একটিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই
—শুভরাতের বাগিচার নূতন যুগ দেখা
দিয়াছে। দেশের লোক দেশ ছাড়িয়া আফ্রিকা,
সুদান, কানাডা, ত্রাপ নিউজিল্যান্ড অর্থাৎ
হানে বাগিচা বাগবনে ছাইয়া পড়িয়াছে।

গুজরাতউৎসব কার্পাসের উপরই স্বদেশ-
রাতের ধর্মগম বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেসকল
কার্পাসের চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাউতেছে।

গুজরাতের নিম্নশ্রেণী কৰ্ত্তৃক প্রস্তুত
calico printing কাপড় সুসজ্জা স্বাস্থ্য
প্রভৃতি দ্বারা রপ্তানী হইয়া বহু লক্ষ টাকা
দেশে আগম হয়। খারেটা কাপড়, অদিক্ত
মাখন, কাঠ প্রভৃতি বহুতর ক্ষুদ্র বৃহৎ বাণিজ্য
প্রচল জগ্রে বহুতর অর্থ দেশবাসী প্রাপ্ত
হয়।

ইহারা ক্ষেত্রোৎসব কার্পাস কেবল মাত্র
বিদেশবাসীদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া অর্থ প্রাপ্ত
হয় এমন নহে,—দেশবাসীও ইহা ক্রয় করিয়া
তদ্বারা স্বয়ং ও কাপড় প্রস্তুত করিয়া বিদেশ
এবং প্রদেশ হইতে বহুতর অর্থ উপার্জন করে।

সমস্ত পশ্চিম ভারতের মধ্যে একমাত্র
গুজরাতই সর্বশেষ উন্নয়ন ও শস্যশালী
প্রদেশ; কাজেই রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের
বহু অধিবাসী বহুবার হুজুত গণীড়িত হইয়া
অশ্রুতৃপ্তি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গুজ-
রাতের চিরস্থান অধিবাসী হইয়াছে।
এইরূপে সহস্র সহস্র রাজপুত গুজরাত
পারিত, নগরে আশ্রয় লইয়াছে; কোথাও বা
বস্ত্র রাজপুত পানী গড়িয়া তুণিয়াছে।

বাণিজ্যের ঐক্যবিরুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে গুজরাতের

সহরগুলি অত্যন্ত রূপে বাড়িয়া গিয়াছে।

গুজরাতের বাণিজ্যের তরঙ্গাতিবাহিত বোঝাই
নগরী ঐরূপ। ও হ্যাঁচো ইম্রাবতী তুলা হইয়া
উঠিয়াছে। অমাব্যাদ, সুরত, তরোচ, কাচে,
খোলা, রাজকোট সমস্ত নগরীগুলিই কল-
কারখানা ও বাণিজ্য বিনোদনে ঐরূপশালী
হইয়া উঠিয়াছে। সহস্র সহস্র কৃষক বীর
পরিগ্রাহ্য পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কল-
কারখানা ও বাণিজ্য ব্যাপারে যুক্ত হইয়া
ঐক্যবিরুদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। এবং দুরাগত
আশ্রিতরা কেহ কৃষিকার্যে কেহ বাণিজ্যে
লিপ্ত হইতেছে। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত
গুজরাতবাসীদের ১ম যুগ বা প্রাচীন যুগ বলা
হইতে পারে। মুসলমান শাসন কাল ২য়
যুগ মহারাষ্ট্রবিদগের অভ্যাস ও অধিকার
এবং ইংরেজাজের আগমন গুজরাতের তৃতীয়
যুগ রূপে পরিগণিত। ইংরেজাজের শাসন
কাল হইতে ৩য় যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এই
চারি যুগের মধ্যে তৃতীয় যুগই গুজরাত-
বাসীদের চূড়ান্ত হুর্ণশা হইয়াছিল। একদিকে
অন্তঃসাম্য মুসলমানশক্তির শেষ চেষ্টা অপর
দিকে মহারাষ্ট্র নৈস্তের অভিযান,—এতদ্বয়ের
মধ্যে পড়িয়া গুজরাতবাসীদের হুর্ণশায় পরিলম্বা
ছিল না। বিগত ত্রিংশ বৎসর হইতে পুনরায়
গুজরাতের ঐক্যবিরুদ্ধি সাদিত হইতেছে।

ঐক্যবিরুদ্ধি পেন।

ওপমান ও আলি।

মহম্মদের মৃত্যুর পরে প্রায় ২৪ বৎসর
গত হইয়াছে। আবুবেকর ও ওমার মহম্মদের
হুকুমাবলী হইয়া মুসলমান শক্তি বর্ধিত

করত; একে একে পৃথিবী হইতে চলিয়া
গিয়াছেন। ওপমান এখন মদিনার পলিকা।
ওপমান মহম্মদের দামাত। আবুবেকর ও

ওমার কঠোর হতে শাসনও পরিচালনা করিয়া যুগলমান নৃতি সংঘে রাখিয়াছিলেন । কিন্তু যে দিন করুণ-রূপ ওষমান সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, সেই দিন হইতে বিলুপ্ত লায় স্বেপাত হইল । ওমার যেমন বীর ব্যবহার দ্বারা প্রজাপুত্রে বিলাসিতা-বর্জন করিতে শিক্ষা দিতেন, তেমনি সেখানেই বিলাসিতার উল্লেখ দেখিতেন সেখানেই কঠোর ভাবে তাহার দমন করিতেন । লোকজগৎ নগর অবরোধের সময় এক উল্লেখ্য ওমার তথার গমন করিয়াছিলেন । উল্লেখ্যে তাহার আসবাবের মধ্যে ছিল, কিছু ফল ও শস্য পরিপূর্ণ দুইটি থলি, চন্দ্রনির্মিত একটি জলাধার ও একখানি থালা । লোকজগৎের অধিবাসীগণ তাহার বাসের অস্ত্র-এক মনোরম প্রাসাদ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ওমার নগরের বহির্ভাগে এক তাবুর মধ্যে যুক্তকার আসীন হইয়া নাগরিকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন সুলভিত প্রাসাদে পদাংক করেন নাই ।

বীর রাজত্বকালে বিলাসিতার আনির্ভাব হইতে দেখিয়া ওষমান ক্রুর হইলেন, কিন্তু তাহা নিবারণ করিবার সাধনা তাহার ছিল না । কঠোর কার্যে তিনি নিত্যই অশ্রু ছিগেন । ওমারের স্মৃতির পূর্বেই সমস্ত আরব ও পারস্যদেশ, সিরিয়া, মিশর, ও আফ্রিকা দেশ এবং শাইকাস বীপ মদিনার খলিফার পদানত হইয়াছিল । পূর্বে হিন্দুকুশ ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত সর্বত্র যুগলমানের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইয়াছিল । এতদূর সাম্রাজ্যের বাহারা প্রতিষ্ঠিতা, দেশবিশেষ লুণ্ঠন করিয়া অপরিমিত

ধনসম্পদ দ্বারা স্বদেশে আনিয়াছে, ওমারের কঠোর শাসন অপরূপ হইবার পরেই তাহার বিলাসিতার ময় হইয়া পড়িল । ওষমান তাহার প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হইলেন না । এদিকে ওষমান আর এক ভুল করিয়া বসিলেন । তিনি উপরক্ত লোক দিগকে অগ্রাহ্য করিয়া বীর আশ্রয়-স্বজনদিগকে উচ্চ রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন । যে সমস্ত বীর যুগলমান সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারা ওষমানের অধঃহেলার ক্রুর হইলেন । আবার বিলাসিতা বৃদ্ধির সহিত দেশের দারিদ্র্যও বাড়িতে লাগিল । চতুর্দিকে অসন্তোষ ধূমিত হইয়া উঠিল । মহম্মদের স্ত্রী আবুদার নামক এক ব্যক্তি কোরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে লাগিলেন, অর্থ সমস্ত অমণের দ্বারা, স্তব্ধতা বল প্রয়োগ করিয়া ধনীগণকে তাহাদের প্রয়োজনাত্মিক অর্থ দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিতে বাধ্য করা উচিত । অস্ত্র এক প্রচারক আবিস্কৃত হইয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, মহম্মদ গম্বরই পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিয়া যুগলমানদিগের উপর যে সমস্ত দ্রবুত অত্যাচার করিতেছে তাহা দিগকে বিনাশ করিবেন । সেই শুভদিনের প্রত্যাশার যুগলমান প্রচার-রাজনিকে অবহেলা ও ত্যাগ করিতে শিখিল ।

যুগে যুগে মহম্মদ যে সমস্ত উপদেশ দান করিতেন, তাহার জীবিতাবধাতেই তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু যাবতীয় উক্তি একত্র সংকলিত হইয়া গ্রন্থাকার ধারণ করে নাই । আবুবেকর এই সমস্ত বচন একত্র করিয়া প্রচার করেন । আবুবেকের সংকলিত

কোরাণ ওপমান পুনঃসংস্কৃত করিয়া
একটি করেন। বর্তমান মুসলমানজগতে
ওপমানের এই কার্য্য তাঁহার কৌতুকপে
গয়া। কিন্তু ওমানীজন মুসলমানগণ
ওপমানের কার্য্যকে মহম্মদের বচনের উপর
হস্তক্ষেপ মনে করিয়াছিল। মহম্মদ উপাঙ্গনা
কালে যে স্থলে ছইবার ভূমিট ছইবার নিয়ম
করিয়াছিলেন, ওপমান তথার চারিবার ভূমিট
ছইবার নিয়ম প্রচলিত করেন। ইহাতেও
অনেক মুসলমান উত্তেজিত হইয়া উঠে।

অলম্বোষ ও অশান্তি পত্রিশেষে এমন
আকার বাসন করিল, যে একদিন মঙ্গলিমে
উপাঙ্গনা আরম্ভ করিবার ক্ষণ ওপমান যেমনি
দণ্ডায়মান হইরাছেন, অমনি চারিদিক ছইতে
তাঁহার উপর গোটে নিকিষ্ট হইতে লাগিল।
বাধা হইয়া থলিকাকে মঙ্গলিমে ত্যাগ করিয়া
আসিতে হইল।

ক্রমে সমগ্র মুসলমান জাতি নানা দলে
বিভক্ত হইয়া পড়িল প্রত্যেক দলেই ওপমানের
স্থলে নূতন থলিকা চাহে। অবশেষে একদিন
মিশরের একদল সৈন্য সমগ্র অবস্থার মদিনায়
উপস্থিত হইল। ওপমানের কথার সেবার
তাহারা প্রত্যাগমন করিল বটে, কিন্তু অচিরেই
পুনরায় মদিনায় প্রত্যাগত হইল।

দেদিন গুরুবার। গুরুবারে কোরাণ
আজ্ঞাপত্র পাঠ না করিয়া ওপমান জলগ্রহণ
করিতেন না। ওপমান কোরাণপাঠে
অভিনিবিষ্ট, এমন সময়ে সংবাদ আসিল,
আন্তর্জাতীগণ তাঁহাকে বধ করিবার ক্ষণ
অগ্রসর হইতেছে। বহুগণ তাহাবিষয়ের গতি-
রোধের আয়োজন করিতে উজ্জ্বল হইলেন।
কিন্তু ওপমান তাহাদিগকে নিবেদন করিয়া

বলিলেন, “মহম্মদ যুগে আমাকে দেখা দিয়া
বলিয়াছেন যে উত্তরে একত্র আসি যুগে
প্রতিষ্ঠান করিতে হইবে।” তবুও পাঁচ শত
শতাব্দীরক্ষা আক্রমণকারীগণের গতিরোধে
চেষ্টিত হইল। কিন্তু সকলেই নিহত হইল।
পলিফার পত্নী স্বামীর কৌশলকার ক্ষণ
অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তরবারির আঘাতে
তাঁহার এক হস্ত ছিন্ন হইয়া পড়িল। আলি-
পুত্রগণ ও অন্তর্জাত বহুগণ আক্রমণকারিদিগকে
নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন
না। আন্তর্জাতীগণ পলিফার কক্ষে আসিয়া
উপস্থিত হইল। তরবারীর আঘাতে রক্তাক্ত
পলিকা ভূমিশায়ী হইলেন। পলিফার কোরাণ
থলিকার রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। দামাফানের
মঙ্গলিমে আজও সেই রক্তাক্ত কোরাণ সদয়ে
রক্ষিত হইতেছে।

মহম্মদ একদিন বলিয়াছিলেন “বর্ণের
ব্যতীে আমি ওপমানের নাম লিখিও দেখিয়াছি।
আল্লাহ সিংহাসনের পশ্চাত্তানে আমি
ওপমানের নাম উৎকর্ষ দেখিয়াছি, দেবপুত্র
গ্যাব্রিয়েলের পক্ষে আমি ওপমানের নাম
চিত্রিত দেখিয়াছি।” মহম্মদের জামাতা,
মহম্মদের ভ্রাতা, মহম্মদের শ্রীর গুরু ওপমান
এইভাবে নির্দয়ভাবে মহম্মদের শিষ্যগণ কষ্টক
নিহত হইলেন। পৃষ্ঠীর ১৩৯ অব্দে এই
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, কিন্তু সমস্ত আরব-
দেশকে এই মহাপাপের প্রারম্ভিত করিতে
হইল। ওপমানের মৃত্যুর পরে পাঁচ বৎসর
যাবৎ গৃহযুদ্ধে আরব অসমর হইয়া পড়িল।

ওপমানের হত্যার পরে আলি থলিকার
পরে প্রতিষ্ঠিত হন। মহম্মদ মৃত্যুকালে
আলিকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া

যান বলিষ্ঠা প্ৰবাদ আছে । কিছু মহাশয়ের
পত্নী আবেগা আলিৰ আতিথ্যকী ছিলেন ।
মহাশয়ের ইচ্ছা গোপন রাখিয়া তিনি আলিৰ
খলিফাপনপ্ৰাপ্তিৰ আতিথ্যকতা কৰিছা
ছিলেন । আলি মহাশয়ের পিতৃবাগ্ন ।
শৈশবে তিনি পিতাৰ দেহে মহাশয়কে ঢকা
কৰিছাছিলেন, সমস্ত কোবেশ জাতিৰ
বিষয়ে হইতে তিনি মহাশয়কে ঢকা কৰিছা
ছিলেন, মহাশয়ের ধৰ্ম্মপ্ৰৱণ না কৰিছাও তিনি
কৌশলৰ শেষ দুৰ্দ্ধ প্ৰত্যাহ মহাশয়কে পুত্ৰ
নিৰ্দ্ধিষ্টে দেহ কৰিছাছিলেন, সেই আবু-
তালেব আলিৰ পিতা । মহাশয়ের প্ৰথম
পত্নী খতিজা বিবি, ও খতিজাবিবিৰ গৰ্ভজাত
মহাশয়ের কজাগণ, মহাশয়ের ক্ৰীতবাস য়েদ
এবং আলি - ইহাৱাই সৰ্বপ্ৰথমে মহাশয়কে
"আল্লাৰ ৰহুণ" বলিয়া স্বীকাৰ কৰেন ও
তাঁহাৰ শিষ্যপ্ৰৱণ কৰেন । হুই কোৱেশ-
গণ যখন মহাশয়কে হত্যা কৰিবাৰ আন্তঃপ্ৰায়ে
তাঁহাৰ পুৰাতিমুখে অগ্ৰগৰ হইতেছিল,
তখন মহাশয়ৰ পৰিতাপ পৰিচ্ছদে আত্মত
হইয়া আলিই আত্মত্যাগকে প্ৰচাৰিত
কৰতঃ মহাশয়কে পলায়নৰ সুযোগ প্ৰদান
কৰিছা আত্মত্যাগপৰে প্ৰচণ্ড বিবেচ
যাৰ্ঘ কৰিছাছিলেন । বেখানে বিপদ
শেষণানেই আলি সৰ্বমুখৰে বুক পাতিয়া
দিয়াছেন । মহাশয় আলিকে বশেট ভাগ-
বাণিতেন এবং স্বীয় কজা ফতেমা বিবিৰ
সহিত তাঁহাৰ বিবাহ দিরাছিলেন । আলিকে
অগ্ৰাৰ কৰিয়া আবেগা বিবিৰ প্ৰয়োচনাৰ
মহাশয়ৰ সঙ্গাপন যখন আবুবেকৰকে খলিফা
পদে প্ৰতিষ্ঠিত কৰেন, আলি তখন চাৰ্ঘিত
হইয়াছিলেন । কিছু বিৰোধে অবলম্বন

কৰিয়া মুদলমানৰে ৰক্তে মহাশয়ৰ পদৰেপু-
পুত আৰব দেশকে কলঙ্কিত কৰিবাৰ ইচ্ছা
একবাৰও তাঁহাৰ মনে উদ্ভিত হয় নাই ।
আবুবেকাৰেৰ পৰে ভবাৰ যখন খলিফা পদে
প্ৰতিষ্ঠিত হন, তখনও বহুগণেৰ পৰামৰ্শ
অবহেলা কৰিয়া আলি নূতন খলিফাৰ বস্ত্ৰতা
স্বীকাৰ কৰিছাছিলেন । স্বাত্ৰকগণ যখন
ঐখমানকে নিধন কৰিতে গিৰাছিল, তখন
আলিৰ পুত্ৰগণ তাহাদিগকে বাধা দিতে
গিৰা আহত হইয়াছিলেন । ঐখমানৰ
মৃত্যুৰ পৰে যখন আলিকে খলিফা নিৰ্দ্ধাৰিত
কৰা হইল—তখন নিতান্ত অনিচ্ছায় সন্মিত
তিনি উক্ত পৰ্য্যবেশে স্বীকৃত হইলেন ।

আলিৰ চৰ্ভাগ্যবশতঃ বিনা কাৰণেও
তাঁহাৰ শত্ৰুৰ অভাব ছিল না । তাঁৰ জীৱ
বিমাতা আবেগা তাঁহাৰ পৰম শত্ৰু ছিলেন ।
আলিৰ খলিফাপন প্ৰাপ্তি আবেগাৰ মনোমত
হইল না । মহাশয়ৰ প্ৰথম ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰ কাৰণে
আবু হুফিছান নামক একজন সন্ত্ৰাত মকাৰাসী
তাঁহাৰ তন্ত্ৰানক আতিথ্যকতা কৰিছা-
ছিলেন । ওহদেৰ যুদ্ধে (৬-৫ খৃঃ আবে) এই
আবু হুফিছানেই মহাশয় ও তাঁহাৰ মদিনাবাসী
বহুগণকে সম্পূৰ্ণ পৰাস্ত কৰিছাছিলেন ।
মহাশয় স্বয়ং এই যুদ্ধে শত্ৰুতৰ ভাবে আহত
হন ; তাঁৰেৰ পিতৃবা হামজা নিহত হন ।
আবু হুফিছানেৰ স্বী দিল্ল-বিবি সমস্তনিহত
শত্ৰুগণেৰ কৰ্ণদাসিকা ছেদন কৰিয়া
তাঁহাৰ মালা গাঁদিয়া পৰিধান কৰেন । এমন
কি মহাশয়ৰ পিতৃবা হামজাৰ মৃত দেহ হইতে
তাঁহাৰ ছনৰ কৰ্ভন কৰিয়া লইবাত্ৰও চোটা
কৰিছাছিলেন । হিম্মেৰ গৰ্ভে আবু হুফিছানেৰ
পুত্ৰ মোৰাখিছা জন্মপ্ৰৱণ কৰেন । আলি

যখন পলিকা পদে আরোহণ করেন করিয়া তাঁহাকে
মোহাণিয়া তখন নির্দিষ্ট স্থান পালন কর্তব্য।

আলি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই দূর্ভ
মোহাণিয়াকে পক্ষাতি করিবার আজ্ঞা প্রদান
করেন। কিন্তু মোহাণিয়া পলিকার আজ্ঞা
অবহেলা করিয়া বিদ্রোহ অবলম্বন করেন।
তিনি আলিকে ঔষধানের হত্যার সহায়তা-
কারী এবং ঔষধানের হত্যার প্রতীশোধ
লাইবার জন্ত নিজে অস্ত্র ধারণ করিয়া
ছেন বলিয়া প্রচার করেন। এতিকে
আরও অনেক গোকে ত্রাণপরাহণ আলির
নিকট প্রার্থিত পূর্ণ না পাইয়া অসন্তুষ্ট
হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে আরোহণের সহিত
মিলিত হইয়া আলির বিক্ষেপে অভিযান
করিলেন। আরোহা নিজে সেনাপতি
পদ গ্রহণ করিয়া আলির প্রতি বিধেবের
চূড়ান্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। একদিন
সন্ধ্যায় আরোহাকে বলিষ্ঠাছিলেন “আমার
এক পক্ষী কুক্ষেরে গিয়া হইয়া রোবোর গ্রামে
উপনীত হইলে কুক্ষের কর্তৃক আক্রান্ত হইবে।”
আরোহা যখন সন্ধ্যায় রোবোর গ্রামে উপস্থিত
হইলেন, তখন গ্রামের যাবতীয় কুক্ষের তাঁহাকে
ও তাঁহার লৈল্যবিগকে আক্রমণ করিল।
হামীর ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ করিয়া আরোহা
সন্ধ্যায় পলায়নোক্ততা হইলেন। কিন্তু
নান্যপ্রকার প্রতারণার সাহায্যে তাঁহার
দলহরণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। যোবাই-
বার যুদ্ধে আরোহার লৈল্য সম্পূর্ণ পরাজিত
হইল এবং আরোহা বন্দীভাবে আলির নিকট
নীত হইলেন। উদারহরণ আলি সন্ধ্যানে
সম্রাটকে অভিযান করিয়া এবং ভবিষ্যতে
রাজনৈতিক ব্যাপারে গিয়া হইতে নিষেধ

কিন্তু আরোহাকে পরাস্ত করিয়া আলি
নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। মোহাণিয়া
রক্তাক্ত গাত্ৰাবরণ সংগ্রহ করতঃ ঔষধানের
ডায়াক্সালনগরে লগ্নে গেলেন তাহা সন্দর্শন করিয়া
দায়াক্সালনগরকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।
মিশর বিদ্রোহী অমর মোহাণিয়ার সহিত যোগ-
দান করিলেন, এবং উভয়ে বহুসংখ্যক লৈল্য
সমভিযাহারে আলির বিক্ষেপে ব্যাধা করিলেন।

মিকিন প্রান্তরে উভয় লৈল্য পরস্পরের
সম্মুখীন হইল। সাহসে ও পরাক্রমে আলি
অমর ও মোহাণিয়া কাহারও অপেক্ষা ন্যূন
ছিলেন না। তিনমাস যাবত উভয় লৈল্য
যুদ্ধে লগ্নিতে লাগিল, তাহাতে মোহাণিয়ার
লৈল্যগণই ক্রমশঃ পরাজিত হইতে থাকে।
অবশেষে সন্ধ্যায় যুদ্ধ সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া
মোহাণিয়া স্বাভাবিক দূর্ভতা অবলম্বন
করিলেন।

কতিপয় লৈল্যের বর্ষায় অগ্রভাগে কয়েক-
খণ্ড কোরাণ স্থাপন করিয়া মোহাণিয়া অগ্রসর
হইতে লাগিলেন, এবং উভৈঃদিকেরে বলিতে
লাগিলেন “এই আঘাতের পবিত্র ধর্মপুস্তক
ইহাতে সুসলমানের রক্তপাত নিষিদ্ধ আছে।
এই পুস্তকের সাহায্যে আমাদের বিবাদের
মীমাংসা করা কর্তব্য।” মোহাণিয়ার উদ্বেগ
সিদ্ধ হইল। আলির লৈল্যগণ কোরাণের
উপদেশের কথা শুনিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিল।
লৈল্যবিগকে উত্তেজিত করিবার জন্ত মোহা-
ণিয়ার দূর্ভতা ও বিবাসবাচকতার উল্লেখ
করিয়া আলি বক্তৃতা করিলেন কিন্তু কোনও
ফল হইল না। লৈল্যগণ বলিয়া উঠিল

“এখনানের মত তোমাকেও আমবা হত্যা করিব।”

সালিশিবারা বিবাদ সীমাবদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্ৰদত্ত একজন সালিশি মনোনীত করিতে আশিষ্ট অধিবেশন করিল। কর্তৃত্বগত বিরোধ-শান্তিকে অসম্মত হইতে দেখিয়া আলি ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিলেন “আমার ধন্য স্বাধীনতা নাট, তখন তোমরা বাহা ইচ্ছা করিতে পার।” প্ৰদত্ত সালিশি নিযুক্ত করিল। মোহাম্মদীয় পক্ষে নিযুক্ত হইলেন—চম্ৰ অমর। অমর আবুদুলাকে বুঝাইলেন “মোহাম্মদীয় ও আলি কাদেরও রাজপদে নিৰ্ব্বাচন বিধিযুক্ত সম্পন্ন হয় নাই। সূতরাং প্রথমতঃ উভয়কেই বলিয়ার পদ হইতে অবনতি করিয়া, পুনরায় খলিফা নিৰ্ব্বাচনই সম্ভব, সে নিৰ্ব্বাচনে আলি ও মোহাম্মদীয় মধ্যে যিনি জয়লাভ করিবেন—তিনিই বৈধ খলিফা বলিয়া স্বীকৃত হইবেন।” আবুদুলা অমরকে শঠতা বুঝিতে না পারিয়া প্রত্যাহত হইলেন। সালিশীর দিন উপস্থিত হইলে, আবুদুলা দত্তারমান হইয়া খীর অঙ্গুলি হইতে এক অঙ্গুলীক উন্মোচন করিতে করিতে বলিলেন “এই অঙ্গুলী হইতে যেমন আমি এই অঙ্গুলীক খুলিয়া ফেলিতেছি—তেমনি খলিফার সিংহাসন হইতে আলি ও মোহাম্মদীয় উভয়কেই অবনতি করিলাম।” পরমুহুর্তে অমর দত্তারমান হইলেন, এবং খীর অঙ্গুলীতে এক অঙ্গুলীক পরিধান করিতে করিতে বলিলেন “যেমন আমি এই অঙ্গুলীতে এই অঙ্গুলীক অর্পণ করিতেছি, তেমনি খলিফার সূত্র সিংহাসন ও রাজত্ব আমি মোহাম্মদীয়কে

অর্পণ করিলাম। মোহাম্মদীয়কে ওয়দানের স্তায় সমস্ত উপদ্রবদিকারী বলিয়া, আমি অভিনন্দন করিতেছি।”

আলির সমস্ত আশা নির্মূল হইল। তাঁহার প্ৰদত্ত সালিশি আশাভেদে হর্ষভিত্তিক পরিণাম দেখিয়া একে একে তরে তাঁহাকে তাগে করিয়া চলিয়া গেল, এবং “বারিজিত” নামে পরিচিত হইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে আলি ও মোহাম্মদীয় উভয়েই খলিফা পদের অধুপগুণ। আলি, অমর ও মোহাম্মদীয় এই তিনজনকে সমস্ত অনর্থের মূল মনে করিয়া তাহারা তিনজনকেই বিনাশ করিবার লংকর করিল। বড়ব্রহ্মকারণ এক দিনে তিন জনকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে ত্রিশ ত্রিশ দলে সৈন্য, হামফল ও মিশরের গমন করিল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে প্রাণবের বাহিরে আগমন না করায় অমরকর প্রাণ রক্ষা হইল। মোহাম্মদীয় সাতাঙ্গরপ আহত হইয়া পরান বরা প্রাণ রক্ষা করিল। নিরতি-পীড়িত আলিই কেবল বাতকের হাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

সমগ্র মুসলমান ইতিহাসে আলির প্রাতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার জায়গামারগত, পৈতৃক সন্তান ও বিনয় মুসলমান সমাজের আদর্শ। তাঁহার বৈদ্বন্দ্ব্যেই মুসলমান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নিষ্ঠুর নির্যাতন বিধানে বাতকের হাতে তাঁহার প্রাণ বিহর্ষিত হইল; কিন্তু জয়োল্লাস পতাবিক বঙ্গের যাবত মুসলমানগণ ভক্তিব্রজাঙ্গনহকারে তাঁহার স্মৃতির পূজা করিয়া আসিতেছেন। আলি ও মোহাম্মদীয় বিবাদ হইতে সিরা-হুরি পার্শ্বকোর হুতপাত হয়। সিরাগণ আলির পূর্ববর্তী তিনজন

খলিফাকে জাহসকত খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন না। মরক্কোর পরেই তাঁহার আলিকে প্রথম খলিফা বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার আলিকে মরক্কোর সমকক্ষ বলিয়াই বিশ্বাস করেন। অনেক আবার মরক্কোর অপেক্ষাও আলিকে উচ্চমানমান করিতে চান। হুজিগণ আলির এতাদৃশ গুণ ছিল বলিয়া স্বীকার করেন না। উত্তর সন্ধানের আর একটি পার্থক্য এই যে সিংগণ মুসলমানগণের প্রাচীন পদ্ধতি বানিহা চলিতে স্বীকৃত নহেন, একমাত্র কোরাণই তাঁহাদের গ্রন্থ। হুজিগণ কোরাণের স্তায় প্রাচীন পদ্ধতির উপরও সন্ধান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তুরক, মিশর, আরব ও ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই হুজিমতাবলধী, ভারত পারস্ত ও ভারতীয় মুসলমানগণের বিরুদ্ধে দিয়া মতাবলধী।

সুফী নগরে আলি নিহত হন। তপার একপ্রকাণ্ড সম্মিগ্ন আজিপর্যন্ত তাঁহার

মুগ্ধ হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। হানতীর নাম “মোসেন আলি” (আলির সমাধিস্থান)। ইহা মুসলমানগণের তীর্থস্থান।

আলির মৃত্যুর পরে তৎপুত্র হাসান খলিফাপদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু অত্যন্ত দিন মধ্যেই তিনি মোঘাবিহার সহিত দাঙ্গ করিয়া খলিফাংশ ভাগ করেন। তৎপুত্র ওমায়েদগণের নির্দয় হস্ত তাঁহাকে ক্ষমা কবে নাই। মোঘাবিহার পুত্র ইম্বাখিদেব পরোচনার মদিনা-নগরে হাসান নিহত হন। হাসানের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে আলির দ্বিতীয় পুত্র হোসেন কারবালা ক্ষেত্রে নিহত হন। তপার কালে এক দ্ব্যুতিমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। সে স্থানটী মোসেন হোসেন (হোসেনের সমাধি) নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। আজও সিংগণ মহরমের সময় “হা হোসেন, হা হাসান” এইরূপ কণ্ঠস্বরে শ্রোতার মন বিভগিত করিয়া দেয়।

শ্রীভারতব্রহ্ম বাহ।

দৈবীখাল।

(১)

বরুণা নামে নদী; তার একদিকে সোনা-পুৰ গ্রাম, অপরদিকে ‘খিলা’ নামে অনতি উচ্চ শৈলশ্রেণী। গ্রামে অনেক বর কৈবর্ত নরঃপুত্র ও কোলাভীতির বাস। পূর্বে ছিল না, কিন্তু এখন একটি সংকীর্ণ খাল নদী হইতে পাড় ভাঙিয়া গ্রামের তিতর দিয়া একটি ঝাঁড় কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রতিবৎসর সনাতন ও ঘনমান কৈবর্তের মধ্যে

আগে বেশ মেলামেলা এবং আত্মীয়তা ছিল, কিন্তু এই অদ্ভুত খালের জগাহে তাহাদের দুই বাড়ীর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটিতে যেমনি ভাঙ্গন ঘটিতে শুরু হইল সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহাদের অন্তরেরও বিচ্ছেদ হুঁচত হইয়া সদয় তুচ্ছ বাগবাদের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ তাহাদের মনের বিবেক অগম্যব সেই খালটির মতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

সনাতনের বাড়ী হইতে ঘনরামের বাড়ী

প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে, মাঝের খালটি পনের হাতের বেশী হইবে না। খালের উপর একটি বাঁশের সাঁকে। বিধাবিস্তৃত গ্রামটিতে লোক চণ্ডালের পথ করিয়া দিরাছে। বাহিরের এট খালটি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমতল ও ঘনজালের মধ্যে অতঃপর বিচ্ছেদ বৃত্তি বাড়িয়া যাইতেছিল ততই এই বর্জনশীল সাঁকেটিঃ মত গ্রহনবৎ অগ্র দুইটি দ্বিত্বাপক দ্রব একটা অজ্ঞাত বেননাৎ প্রঃ আগছ হইয়া পড়িতেছিল। তেব চৌদ্দ বৎসরের ঢুলাই তাহার পিতা সন্যাসনের একমাত্র পুত্র, ঘন এগার বৎসরের ময়, ঘনজালের একমাত্র কস্তা; পত্রিবারের অদ্ব্যাব তাহাদের ঐকিত্ব বন্ধন যেন প্রতিদিন দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছিল।

কুত্র বরুণার কুত্র কুত্র বীতির আর অস্ত্র নাট; সকাল সাঁকে নদীতটে সমাপ্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদেরও বৃত্তি অস্ত্র নাই। প্রামলতা ও রাগিমার মোহনেই বহু অগণ্য বীতি। শিশুগুলার বিকরদীপ্ত নীল আকাশের নীচে সকাল সন্ধ্যার বর্ণের পর বর্ণ ছন্দে লেখে আর মুছে, এবং হাত বরাবরি করিয়া মুহু মুহু চকল চরণ কেলিয়া নৃত্য করিয়া বেড়ায়; স্নেহ সৌন্দর্য হাসিগানের তাহার। অক্ষয় ভাঙার। চঃশকেও তাহাদের একটুকুও গ্রাহ্য নাই, আকাশ র্মাধারে ছাইয়া আত্মক তবু বাহির হইতে চক্ষুণ লুপিতা লইয়া বায়ের দুটি বাহবেইনের মধ্যে তাহাদের হর্ষ নৃত্য ও কলধনিস তখনো বিরাঘ নাই। এতগুলার মাঝে দুইটিকে আশ্বাদের প্রয়োজন, দুইটি মাত্র বীতি, অনন্ত সংসার সাগর সীলার কুত্র দুইটি বীতিভক্ত।

“ময়, ময়, ও ময়! বাঃ আর ডাকবনা,

ডাকতে ডাকতে গলা ধরে গেল, তারণকে নিরেই ঘান। তারণ, তারণ! চমু কিল্লার নীচেব জামগাছ থেকে জাম নিরে আসি।”

তারণ ময়ঃ জাঠুতুত তাই, খালের ওপারের নদীরটে পে হুড়ি জুড়াইতে ব্যস্ত ছিল। সে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বসিয়া উঠিল “গে।” ঢুলাই নিষেধের মধ্যে খালে বাধা ছোড়ি ডিগিতে ছোড়ি বৈঠা ধরিয়া নদীতে আসিয়া পড়িল। তারণ আসিয়া উঠিলে ঢুলাই বলিল “দেখ তাইয়া আর ময়কে একটাও জাম দেব না,” তাহার কণ্ঠের রাগে কাশিয়া উঠি-তেছিল। তারণ নৌকার একধারে বসিয়া নদীর জলের উপর কুঁকিয়া মুখ দেখিতে লাগিল, আর ঢুলাই প্রত্যেক বৈঠার ঘায়ে শীতল জলের মধ্যে প্রভাতের মুহু উক স্নেহপ্ত সুর্য্যাস্তিকে লাগিত ইশাতের ছুরির মত অপূর্ণ সূর্য্য বক্ষুফানিতে জাগাইয়া দিয়া ডিকি বাহিয়া চলিল; কিন্তু কিছুতেই আর তাহার ভেমন উৎসাহ পোছ হইতেছিল না। তবে নিরাস্যাহ প্রকাশ করাটা ঢুলাইএর স্বভাব নয়, সে কণ্ঠ ছাড়িয়া গান ধরিল,—

রাস্তা পুরুষ হেসে উঠল শূনের কোণে,
নয়ন মেল নয়ন মেল ওগো মলনে।

চঠাৎ তুরি হইতে চাঁৎকার শোনা গেল “ঢুলাইয়া, ঢুলাইয়া আমাকে দেবে না?” নৌকা বৈঠাপুর অগ্রসর হয় নাই, আপন। আপনিই যেন প্রোতে ভাসিয়া গিয়া কিছু দূরে পাড়ের একটি বাড়ী অংশে লাগিয়া পড়িল; ময়, দৌড়িয়া গিয়া নৌকার উঠিল, উঠিয়াই চকল বালিকা হাত পা মাড়িয়া বিবিধ অলভনি-সহকারে লক্ষ্যবীর দিয়া যেন বলিতে আরম্ভ করিল,—“ঢুলাই, কাল রাতে যা যন্ত্র দেগেছি

সে কি আর যশ? যেন একটা মত বড় লালচোখো বাঘ স্মিয়ার পাহাড় থেকে লাফিয়ে নদী পাঁচরিয়ে আমার শিরের কাছে এসে আমাকে খানে বলে হাঁ করে রয়েছে, আমি তবে এতটুকু হয়ে গেলাম; জোরে তোমাকে ডাকলাম, কিন্তু মুখে লব্ধ হুটন না; তখন হঠাৎ জেগে দেখি ভোর হয়েছে, ঘোড় চোবানের পায়ী তোমাকে বলতে গেলাম, হুনি তখনো ঘুম থেকে ওঠনি। আচ্ছা জুনিয়া আমাকে না নিয়ে আজ—” মনু এতকণ বিবের ভাবেই এতদূর বিছাপ হিল যে গুগাইএর বিকে লক্ষ্য করিয়া বেশিবার তাহার অবলম্বন হইয়া উঠে নাই; হঠাৎ যখন সে বৃত্তি:ত পাইল গুগাই তাহার কথার কিছু মাত্র কান দিতেছে না; মনেযোগের সহিত মাথা শুঁজিয়া বৈঠা পরিকাবে প্রবৃত্ত আছে তখন বালিকার সর্গাঙ্গী উচ্চ হস্তক্ষেপে নিবেদের কাণে যেহে যেন সহসা একেবারে মগ্ন হইয়া গেল; বালিকার মুখে আর কথা সরিল না।

সকলে আসিয়া নদীর পর পারে নামিয়া পড়িল। জুগাই আঁচল ভরিয়া গাছ হইতে জাম পাড়িয়া আনিয়া, কিন্তু মনুকে একটাও দিল না। সে মনুকে ফেলিয়া এখানে, সেখানে কতকগুলি ছুটিয়া বেড়াইল। কিন্তু পরে মনুকে বেধনা দিবার নতুন উপায় চিন্তা করিতে করিতে সে কিরিয়া আসিতেছিল এমন সময় সহসা তাহার চিন্তাজোতে বাগা পড়িল; অনুর জামগাছের নিকটবর্তী নিম্নতম দিরা প্রবাহিত কণার জল হইতে উত্তীর্ণা একটা বজ্র মহিষ তাহার নিম্ন বাগাইয়া ব্রুইটা করণ চক্র বিবগযাতক বিবদৃষ্টিতে মনুকে লক্ষ্য

করিতেছিল। সর্গাঙ্গী। এ সে মনুর বিকে ছুটিয়া আসিতেছে! গুগাই বাক্য উৎকর্ষপূর্ণ মতম উচ্চ-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উত্তীর্ণ “মহু মহু সরে যা, মহিষ মহিষ!” চিন্তা-মগ্ন মনু হঠাৎ কিবিয়া চাহিয়া ভয়ে এক জড়-মড় হইয়া গেল যে এক পান্ডিতে পারিল না, গাভুতাক্তিত পত্রের মত শুণ্ড ধর পর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্তেব জড় গুগাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল,—পর মুহূর্ত্তে হাতের কাছে বাহা পাইল তাহাই চটু করিয়া জুগিয়া সজোবে মহিষের মাথা লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। তাহার মগাধ লক্ষ্য এগ প্রস্তর খণ্ডের মহিষার মহিষের একনিষ্ট প্রতিবেশ পাখিয়া গেল; মহিষের নাক দিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল, সে এক মুহূর্ত্তে কিরিয়া বহগা-মৃতকশপ করিতে করিতে পলাইয়া গেল। গুগাই দৌড়িয়া আসিয়া কল্পমান মর্দ চেতনাপূর্ণ মনুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

(২)

“মনু আর কখনও যদি কুইঐ পাজি ছোড়া-টার সঙ্গে বাবি তবে তোর হাড়গোড় ভেঙায়ে একেবারে জুড়া করে দিব।” বলিত যের যত্তার্ক বনরায় মাছ বিক্রয়ের পর বিকালে বাড়ী আসিয়া তারণের নিকট হইতে যখন সকলের ভিন্না ভ্রমণের নিবেদ বিবরণ শুনিয়া তখন তাহার আর রাগের জড় রহিল না। বনরায় সেই প্রেমীর লোক বাহাদুর অস্তরমেনে প্রচুর দাঙ্গ পমার্থ সজিত থাকে একটু সংঘর্ষ বা তত্ত্ব হাওয়ায় সম্পন্ন পাইলেই আর কথা নাট অমনি হাউ হাউ করিয়া অগিয়া উঠে।

অধিগর্ত ঘনরামের সাগের প্রথম ধাক্কা তারপরে উপর দিরাই পেলে, এবং তাই বাওরাই ত সঙ্গত; কারণ সমীচ পদার্থের মধ্যে সেখানে বিতীর কেহ ছিল না, এমন কি গরু মহিষ শিয়াল কুকুট। পর্যাপ্ত নয়,—খাকিবার মধ্যে শুধু জড় মাটি আর কঠিন পাথরের টুকরা,—(বংশলতাঙ্গীর) নিচ্ছান-বস্ত্রের সহিত অপরিচিত ঘনরামের নিকট তা'রাত আর মজ্জা জ্বরের সহিত ভাবের আধান প্রদানের যোগ্য নয়! ঘনরামের বিতীর ধাক্কা অবশ্যই মরণই প্রাপ্য; মরণের কেবল গড়গীবা ও পৃষ্ঠদেশের সহিত তাহার শিরাদ্বীত ফাটাথতের সংস্পর্শ বেশ একটু জাচও হইয়াই উঠিয়াছিল। ঘনরামের কৃতীর ধাক্কাটা যে কাহার উপর ক্রান্ত হইয়াছিল তাহা আমরা ঠিক জানি না; তবে ক্রোধমাত্মক ক্রমিক বর্ধনশীলতা এবং পশ্চাৎগতি ঘটনায় মনে হয় আরো একটা বেশী অবলম্বন পাইলে কৃতীর ধাক্কাটা একটা প্রায় কাণ্ডে পর্যাবসিত হইত,—কিন্তু বিখ-লটির একাকর্তা বিহু বোধ হয় তখন অমু-কূল ছিলেন,—তাই আর প্রায়-কাণ্ডটা তখন ঘটতে পারিল না।

ঘনরাম দ্রুত ঘন ঘন পাদক্ষেপে খালের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। খালের ওপারে নদী তটের কাছে সনাতন তাহার পুরাতন জালে গাবেব আটা লাগাইতে ব্যাপৃত ছিল। ঘনরাম একেবারে মস্তেই ছয় চড়াইয়া সনাতনের উর্দ্ধতন চৌক পৃষ্ঠ হইতে দৃশ্যহীন পর্বাঙ্গ খুব গাল পাড়িয়া লইল। হাট হইতে পঞ্চানন নমঃশূত্র বাড়ী ফিরিতেছিল, সনাতন তা'রাকে ডাকিয়া বলিল “দেখ ত

পঞ্চানন দা, ওর স্ককমটা দেখত, ওটা কি তন্ত্রলোকের মতো হলো! আমি ভেবে কি বলছি, গার পড়ে কেন অগ্গতা কর্তে আনে?”

ঘন। না তুই কি কিছু বলিস, তুই শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে লোকের সর্বনাশ কর্তে পারিস; নাজি ফ্রাণাকে চিবিয়ে খেলে তবু আমার গায়ের কাল মেটে।

সনা। ও রতন খুড়ো, রতন খুড়ো, দেখে যাও ত, কাণ্ডখানা দেখে যাও ত; এট পঞ্চানন দা লাকী—আমি তন্ত্রলোকের মত কাজ করছি, কিছু বলতে কিচ্ছু না, আমার উপর এসব কেন?

ও পাড়ার রতন, নাজির দেখ, রাননাও এবং আরো কয়েকজন আসিয়া দেখানে লাড় হইল। পঞ্চানন সকলকে বৃত্তাকারে জ্ঞানাইয়া দিল। সনাতন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল “তোমরা সকলে দেখ এতে আমার কি ঘোষ, ওর ব্যাভারটাও দেখলে, ওটা কি তন্ত্রলোকের মত ব্যাভার হলো? তোমরা সকলে আছ, মইলে ও হইত আমার খুন করে ফেলত!”

ঘনরাম একটা বংশদণ্ড লইয়া ও পার হইতে দ্রুত অগ্রসর হইতে হইতে “ফ্রাণা কেবল ‘তন্ত্রলোক তন্ত্রলোক’ করে, কি তন্ত্রলোক রে ফ্রাণা, সকলের সামনেই আজ ভোকে খুন করব, ফ্রাণা সনাতনের আমি!” বংশদণ্ড খাড়া তাবে উত্তত করিয়া পুল পার হইয়া ঘনরাম সনাতনকে মারিবার জন্ত এপারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়েকজন লোক গিয়া তা'রাকে ধরিয়া ফেলিল, রতন সনাতনের আপন লোক, সে ঘনরামকে

মারিতে উত্তর হইল, ‘অগ্রান্ত সকলেও ঘন-
রামের এই অগ্রার ব্যবহারে তাহাণ প্রতি
অত্যন্ত আগ্রহী ছিল, রতনকে কেহ বাধা
দিতে চাহিল না। তখন সনাতন গিয়া
রতনের হাত ধরিয়া ফেলিল, বলিল “মেরো
না, ভক্তলোকে কি মারামারি করে!”

ভক্তলোক-হুলত সনাতনের এই কমা-
প্রবণতার ঘনরামের কপকিৎ সমস্তা-
আশ্রয় ভাগ আবার বিতণ্ডা করিয়া উঠিল।
এবার ঘনরামের ভাগ গ্রামবাসীদের হস্ত
বন্ধন এড়াইয়া সনাতনের মাঝার বংশ-
দেওর এক আঘাতে পরিণত হইল। সে
আঘাতে দুর্বল সনাতন ভূমিলাগী হইল,
তাহার মাথা সামান্ত কাটিয়া রক্ত করিতে
লাগিল। পিতৃহত হুলাই কিছু দূরে বড়শির
ছিন্ন হাতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল;
সে অগ্রার সহ করিবার ছেলে নয়—
তথাপি ঘনরামের উপর হাত তুলিতে
তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই,—কিন্তু ঘনরাম যখন
তাহার পিতাকে আঘাত করিল তখন হুলাই
সমস্ত ভুলিয়া গেল,—বড়শির গোড়ার দিক
বাগাইয়া দৌড়িয়া গিয়া সে ঘনরামের মাঝার
সজোরে এক গা বসাইয়া দিল। সৰু ছিপের
আঘাতে ঘনরামের বিশেষ কিছু হইল না।
একজন হুলাইকে ঠেকাইয়া রাখিল, রতন
ঘনরামের হাতের পাত কাড়িয়া লইয়া তাহাকে
বুৎ করে ‘খা’ দিল। হুই একজন গ্রামবাসী
মধ্যস্থ হইয়া গোলমাল মিটাইয়া দিয়া
ঘনরামকে ধরিয়া তাহার বাড়ীর দিকে লইয়া
চলিল। সনাতন ভগনো কিছু বলিল না,
কেবল যখন রামনাথ তাহাকে ধরিয়া তুলিল
তখন তাহার বাহিরের চক্ষু দুটির অন্ধরালে

আর এক দোড়া চক্ষু যেন দুটিয়া উঠিল,
তাহাতে ঘনরামের কবিত সনাতন-হুলত নয়-
কামি-শিখার একটা কণিক গোপন দীপ্তি
অকাশ পাইয়াছিল।

যটনা স্থান হইতে কিছু দূরে আশিরা
পদানন বলিল “দেখলে ভ্রাণা ঘনরামের
কাণ্ডটা, যাটাকে বস্ত্রবর আদি দেখতে
পারি না। দেখলে সনাতন কেমন, এত
গালিগালাজে মরিগট মুখে রা’টি নেই।
ওর মত লোক হয় না।” রাম মুখি বলিল
“ঠিক! ওদিন দেখলে না বাজারে করিম
সেক তাকে কি নাতানাবুদটাই বলে!
এই ঘটনার পর করিমের বাড়ী পুড়ে যায়;
কেরামদি, আই-এদি, তারা সব বলে যে
ও সনাতনের কাজ, আমার কিন্তু তা মোটেই
নিষাধ হয় না। চরি আমার বলিল “এ
হতেই পারে না!”

(৩)

* মা-মা-মরু পিতাকে ভাগ-ও বলে ভব-ও
করে। অতিমানী অগচ বিশ্রোহ-ভাব
বিরহিতা বলিকা পিতার হাতে মায় শাইয়া
একমাত্র হুলাইয়া ভিন্ন কাহারো নিকট
সাহসনার আশা রাখিত না, অগচ পিতার
নিষেধে সে পথেও কাঁট। বাহাদের অতি-
মান মনের এবং বাহিরের ছোটখাটো
বিশ্রোহের মধ্যে আত্মসংকল্প করে তাহাদের
বাণিত ছদ্ম সেট বিশ্রোহের মধ্যেও একটা
বলিষ্ঠ আশ্রয় পাও, সেই উদ্ভাঙ্গনাই বাণিত
ছদ্মের বেদনা লাগন করে। কিন্তু প্রতিশোধ
নিশ্চেষ্ট বিশ্রোহীন সহজ সরল বরকতার ভিতর
দিয়া যে কষ্ট বহন করিতে হয় তাহা অত্যন্ত
গভীর। সঙ্গ-ব তাহাই হইয়াছিল। পিতার

নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে-চুপুটি করিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া উঠিল, সারাটা বিকাল তাহার কি ভাবে কাটিল সেই শুধু জানে। তখন গ্রামজুড় সনাতন ও ঘনরামের বগড়াই কথা প্রচার হইয়া গিয়াছে,—ময় ও তুলি দে দ্রুলাই তাহার পিতাকে মারিয়াছে। এই কথা শুনিয়া ছেঁড়া কাঁথা ও মহলা বালিসের উপর ময়র কঁচ অঙ্গবেগ গলিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল।

দ্রুলাই সেদিন সন্ধ্যাপর্যন্ত নদীর পারে অকারণে ছিণ হাতে গুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইল; যাছ ঘরবার ভেগে সেদিন তার হাওয়া পাইবারই বেশী প্রসূতি দেখা গিয়াছিল। বিকালের সেই ঘটনার অল্প পরেই তাহার গগ কিছু পড়িয়া আলিতেই তাহার ঘন কেনন একটি অহুশোচনীয় ভাব জাগিল। ছিঃ সে ঘনরামকে মারিয়া ভাল করে নাই, না জানি ময়র তাহার সবচে কি ভাবিতেছে।

এইরূপে করদিন কাটিয়া গেল। সনাতন নৌকার তিন চারিদিনের পথ দূরে সহরে গিয়া ঘনরামের বিকছে নালিশ করিল। ঘনরামও রতন এবং সনাতনের বিকছে পালাটা নালিশ করু করিল। সকল সাক্ষীই সনাতনের পক্ষে; ঘনরামের কিছু দিনের জন্ত বেশ হইয়া গেল।

সনাতন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন সকলেই বেশ শান্তিতে আছে, কোনো বগড়া কাঁটি নাই। কিছু দিন পরে একদিন হঠাৎ শোনা গেল ময়রের একটি গাই হঠাৎ মাঠ হইতে বাড়ী আসিয়া মাটিতে আছাড়িয়া পড়িয়া মরিয়া গেল। রামদীন ওবা প্রায়ের কুতে পাওয়া অনেক

মায়া ও অস্ত্রাত্ত জীব ভককে আরোগ্য করিয়াছে; সে-ও ইহার কোনো কিনারা করিতে পারিল না। অল্পদিন পরেই আর একটি গরু মারা গেল। যথা ক্রমে হরি চামার আসিয়া দুইটিরই চাবড়া লইয়া গেল। দুইঘণ্টা গাভীদের মধ্যে অবশিষ্ট তৃতীয়াটিকেও যখন গাভীদের শবনের (রাম-দীনের মতে সকল জীবেরই পৃথক পৃথক শবন আছে) হাত হইতে ফিরান গেল না তখন রামদীন ময়র জোঠাই মাকে বলিল “এ বড় শক্ত ‘বেগের’ ঘরেছে, আর দেখছ না দুইগালা গাইয়ের দিকেই নজরটা বেশী, এত সহজে ছাড়ছে না। অস্ত্রাত্ত গাইগর এবং তোমাদের পর্যন্ত এ ছেড়ে কথা কবে না। ককিরের দৃষ্টিগার তোমাকে নির্দিষ্ট দিতে হবে,—তার জন্ত সোয়া সের দুধ, সোয়া সের ঘি, সোয়া সের মাখন, সোয়া সের বোল, সোয়া সের দই আর সোয়াটা টাকা দিতে হবে।” নানা যোগে টোটকা ঔষধ প্রয়োগ, প্রায়ের ঘেরমহলে বুদ্ধি ও উপদেশ বিস্তরণ—এবং করুণ কঠোর জন্ত তারণের আ প্রায়ের মধ্যে দিখাত ব্যক্তি ছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল “বটে শক্ত বেগইত বটে, আমি এখন সব বুজুঁতে পেরেছি,—ও সব ঐ হিংগুটে ব্যাটা সনাতনের কাছ; ও হরি চামারের সঙ্গে কি পরামর্শ করুছিল করদিন হল আমি দেখেছি; নিশ্চর ঐ দুই ব্যাটা মিলে আমার গরুগুলিকে দিব খাইয়ে মেয়েছে; আজক আগে ময়র বাপ, এর সোবাটা তুলব এখন। তুমি বাও গিরি মিরিতে এর কিছু হবে না।” এখানে বলিয়া রাখা ভাল তৃতীয় গরুটি দামা

বাগরার পর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে অশ্রুণী সন্মত হইতে কোণা। হইতে হরি চানার আশিরা তাহার আশা চামড়াটি লইয়া গিয়াছিল।

(৪)

কোনো ইতিহাসে এবং কোনো কাব্যে অশ্রুণী কোনো একটি লোক তাহার পরিবারের এক ব্যক্তি নারা বাগরার পর নাকি বলিয়াছিল “একজন নারা গেল তাতেও ত হুং নাই, কিন্তু গমে যে পথ চিনিয়া ফেলিল।” আমাদের তারণের মা-ও বলিতে পারিত “গাই নারা গেল শুধু তা ত নয়—সঙ্গে সঙ্গে বিনয় যে পথ চিনিয়া ফেলিল”; কারণ কবিতার মধ্যেই একটি মাত্র বর অবশিষ্ট রাখিয়া তাহাদের বাড়ীটিও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল; তারণের মা মরু ও তারণকে লইয়া সেই ঘরে আগ্রহ লইল। খননকার সজিত সামগ্র্য অর্থ, এবং তারণের মার পরামর্শে সে যে দুই এক জারগার টাকা ধার দিয়াছিল সেই সব তদন্তকণ আশ্রণে পুড়িয়া গেল। তারণের মার নিজের সামগ্র্য অর্থ দিয়া সংসার চলিতে লাগিল। এই অবস্থার তারণের মার কর্তব্য উচ্চতর পথে উঠিয়া সমস্ত গ্রামে যে সব কথা প্রচার আরম্ভ করিয়া দিল তাহাতে গ্রামবাসীদের মনে সনাতন সঙ্কেত মানা সন্দেহ স্থিতি হওয়া স্বাভাবিক; এমন কি হুলাই পর্য্যন্ত এই সন্দেহের স্পর্শ হইতে একেবারে মুক্ত থাকিতে পারিল না। একটা আশ্রয় সত্যের আশ্রমে হুলাইএর মনে প্রথমটা অত্যন্ত আশ্রয় লাগিল। যে যোদ্ধা সত্যের

চক্ৰ অস্ত্রের বিকস্কে জীবন পণ করিয়া বহুদিন যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে সে যদি হঠাৎ জানিয়া ফেলে যে সে সত্য শুধু তিরিহীন মিথ্যার মাগ-কুহেলিকা মাত্র তখন তাহার যেমন আশ্রয় লাগে হুলাইও প্রথমটা সেইরূপ বেদনা অল্পতব করিল। কিন্তু কিছু পরেই সে গেল একটা যোগ্য ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্তি লাভের অনির্জন্য আরাম বোধ করিতে লাগিল, আর তাহার মিথ্যা যুদ্ধ করিয়া মরিতে হইবে না; যে পথ গাটি, বাহা সত্য, সাহা সন্মতের রঙে বিচিত্র, সন্তব্রতের কোমল হুলাই আজ হইতে সেই পথই অবলম্বন করিতে পারিল।

কিন্তু পাহাড়ের আড়াল দিয়া লাল হইয়া তখন হুলাই অস্ত্র বাহিতেছে; যদ্যপ স্রোতের বক্ষণের জল যেন সোনার স্বপ্ন দেখিতেছে। হুলাই কীয়ে কীয়ে সাঁকাটি পার হইয়া মরুপের বাড়ীর সামনে নদীর পারে আসিয়া বসিয়াছিল। অদূরে তারণ হুড়ি লইয়া খেলা করিতেছিল, এবং বাড়ীর একটা গোড়া ভিতের উপর মরু হুলাইয়ের বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া মৌন হইয়া বসিয়াছিল। মরু হুলাইকে দেখিয়াই মুখ ফিরাইয়া ফেলিল। তারণ হুলাইকে আসিয়া বলিল “কাকা আর মা আমাকে ও মরুকে তোমার সঙ্গে যেতে মানা করে দিবেছে, আমাদের কাছে কুঁচি আর এসোনা।” মরু গুড় বেহনায় তরু একট মৌন সঙ্কল্প দৃষ্টি তারণের দিকে নিক্ষেপ করিল, তারণ তাহার কোনো অর্থ বুঝিল না। হুলাই মনে মনে একটা নিবিড় বাগা অল্পতব করিল, এক মুহূর্তে সত্যের রঙ

তাঁহার কাছে মান হইয়া গেল। সে নিজেরও অজান্তসাবে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। তার মন, জুনি রণটি এবং সঙ্গে কথা কহিবার ক্ষমতা বাহিরের এবং মনেরও প্রতিফল ঘটনার সঙ্গে কিঞ্চপ বৃদ্ধ করিতেও, দুলাই আবার বুধে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তোমার বুকের শিরা যে বেদনায় ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে,—দুলাই তাহার কিছুই বুঝল না!

(৪)

এমনি করিয়া আরো কয়দিন কাটিল। ঘনরাম ফেল পাটিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। সে সমস্ত দেখিল। উপস্থিত প্রত্যেকের জন্ত সে সেই কৈবর্তের নিকট গিয়া তাঁহার পাওনা টাকা চাহিল; টাকা মিচাছে গিয়া সেহু সাক্ষীকাব করিয়া গেল; ভরা, মধু, রামনাথ তা'রাও খেচুণ পথটী অসুগর্য করিল। এই অগস্ত শোকেরও যে এখন এক্সপ বাবহার করিতেছে তাঁহার কারণ বুঝিতে ঘনরামের বাকী রহিল না। পদে পদে সনাতনের প্রতি তাহার ক্ষোভ ও বিবেক ঘনোজ্বল হইয়া আসিতে লাগিল। সে বহুকষ্টে কিছু টাকা ব্যয় করিয়া বাড়ীতে দুইটি ঘর বাধিল।

সেদিন সাতারাত বৃষ্টি হইয়া গিয়া সকালে উজ্জল আলোকময় আকাশ হইতে কাটিয়া পড়িয়া বিজার বৃষ্টিধৌত ভ্রামল পাখাড়ে পাখাড়ে, গাছে বনে, বহুবার আনন্দকেন্দ্রপূর্ণ চঞ্চল নীচিঙলার মাথার মাথার, করণা 'চূর্ণাধ' চূর্ণ বলবদ্যন্তলোর বুকে বুকে প্লুকে গিয়া পড়িয়াছে। সোনাপুর গ্রামটি গত হজরীর অক্ষতলের ভিতর দিয়া প্রান্তের হাঙ্গিতে

যোগ দিগাছে। সোনাপুরের কৈবর্তরা আজ মস্তার মোহনাম হাছ ধরিতে যাইবে। সোনাপুর হইতে সে জাহাঙ্গা নৌকার আর একদিনের পথ; সাতারাত তা'রা সেখানে নাছ ধরিয়া পরদিন সন্ধ্যার দিকে বাড়ী ফিরিবে। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি প্রতিপদের ক্ষণ চন্দ্রকলাকৃতি বড় বড় মেছো নৌকা তাহাদের মধ্যদেশে আসে সংলগ্ন রাখিয়া এবং দুইদিকে দুই মাথা আকাশে বহু উঁকে জুলিয়া পালে ও জালের বড় বড় বন্দনতে নভোপট চিত্রিত করিয়া দিয়া বহিয়া চলিল। পাল পাওয়াও অনেক বেলা থাকিতেই তাহার গন্তব্য স্থানে পৌছিল। এবার প্রচুর মাছের আমদানী, সকলে মহা উৎসাহে জাল ফেলে আর তুলে এবং কাড়িয়া নৌকা নোকাই করে। মাছ ধরিতে ধরিতে সনাতন ও ঘনরামের নৌকা একবার পূব কাছাকাছি হইয়া পড়িল, এমন কি সনাতনের ধাঁড়ের বা ঘনরামের ফেলা জালের সীমার মধ্যে পড়িল। ধাঁড়ের বা'রের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড কাতল মাছ ঘনরামের জাল হইতে লাফাইয়া আর পনের হাত দূরে সনাতনের জালের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িল। অমনি ঘনরাম বলিয়া উঠিল "ঐ মাছ-আমার"। সনাতন বলিয়া উঠিল "আমার জালে এসেছে এই মাছ আমার।" দেখি কথার প্রত্যেকজন ছিল না, ঘনরামের জালের কোনো ক্ষেপে আজ বেশি মাছ উঠে নাই, তা'তে এত বড় মাছটা আর কাহারো নয় কিনা সনাতনের জালে লাফাইয়া পড়িল; বিশেষতঃ ঘনরামের দৃঢ় বিশ্বাস মাছের আভাস পাইয়া ইচ্ছা করিয়াই সনাতন ধাঁড়ের আঘাত

করিয়াছে; সর্লোপনি সনাতনের প্রতি পূর্ণ হইতেই বনরামের ক্ষণে ক্রোধ এবং বিবেক প্রকীর্ণ হইয়াছিল,—মুহুর্তের মধ্যে বনরাম মাছ-কাটা দা লইয়া সনাতনের নৌকার লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে আঘাত করিল। সনাতন পূর্ণ হইতেই বনরামের লক্ষ্য হইতে একটু সরিয়া গিয়াছিল,— তাহাতে তাহার বাহুর দিকে দা'র আগাত লাগে, সেটা তত মাত্রায়ক হয় নাই, কিন্তু সনাতন পূরায় নৌকার খাওয়াল কিনারায় পড়িয়া গিয়া মাথার চরমক আঘাত পাইল এবং সংজ্ঞা হারাইয়া জলে পড়িয়া গেল। তাই একজন সাঁতার দিয়া তাহাকে নৌকায় চুলিল। নিকটবর্তী নবগ্রাম থানা হইতে সংবাদ পাঠকা পুলিশ আসিয়া সকলকে দিরা লইয়া গেল।

করদিন দুলাই রাগে হুগে গৃহ হইতে মোটেই বাহির হয় নাই। বনরামের প্রতি তাহার পূর্ণ ঘৃণা ও ক্রোধ গভীরতরূপে ফিরিয়া আসিয়াছে; এখন হইতে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া দুলাইএর জীবনের একটা বড় কাজের মধ্যে পরিণত হইল। হায়! কিন্তু তাহাতে ত তাহার পিতা আর ফিরিয়া আসিবে না। দুলাইএর দা এই কয়দিন ধরিয়া মাটিতে আছাড়িয়া পড়িয়া কিনিতেছে; তাহাদের স্তম্ভিত খাওয়া খাওয়া পর্যন্ত হইতেছে না। এই করদিনের ডঃগরুণায় ও অবিচারে দুলাইএর দেহের উজ্জলতা নান হইয়া গিয়াছে, তাহাকে বেশিলে যেন এখন সহসা চিনা যায় না।

(৬)

সেদিন সকাল হইতে অবিরাম বৃষ্টিপাতে

বেশ ভাসিয়া বাইতেছে। মূলধারায় নিরামরোণ হারি পাত, যেন হয় যেন আকাশ ভাসিয়া ভাসিয়া ধরার উপর পলিয়া পড়িতেছে; ক্ষণে ক্ষণে নিখণ্ডসার কাপাইয়া বিরা যেন যেন বহুমানি; তখনহীন মেঘে-ঢাকা নিবনের স্নান আলোর মাঝে মুহুর্ত: নিরাশিকার; দেহমনকে জমাইয়া বিরা স্তম্ভস্পর্শ হৃদিত্ত বাতাসের অবিরাম গন্ শন্ শন্! সারা সোনাপুর গ্রাম ক্রম গৃহের ভিতরে ঢেঁড়া-কাঁপা জমাইয়া উজ্জ্বল দুপ্তিতেছে; বাহিরে মাঠ খাট নদী বিল জলে ভাসিয়া উঠিয়াছে। সনাতন ও বনরামের লাড়ীর মাঝের খালটি জলে কুপিয়া উঠিয়া দুই পার স্পর্শ করিয়া পূর্ণ ও নিরন্তর হইয়া উঠিয়াছে, খালের জল এখন আর তাহাদের বাড়ী হইতে দূরে নহে; খালের সাঁকোটি তটমিকে দুই নির অংশে ভুগিয়া গিয়াছে, মধ্য ভাগগায় কতকটা স্থান শুষ্ক জলের উপরে ভাসিতেছে; পুলের মাটি ও অনেক বাঁশ জলে ভাসিয়া লইয়া গিয়াছে। দুলাই ঘরে একা বসিয়া আছে এমন সময় সহসা ময়ু আসিয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইল। তাহার কাপড় ও সর্জনসার স্তম্ভ, মাথার এলো-মেলো চুল হইতে বর বর করিয়া জল পড়িতেছিল; তাহার চক্রে একটা গভীর বিধানছায়া এবং করুণাচ্ছায়া ছুটিয়া উঠিতেছিল। সে যেন দুলাইকে কি একটা কথা বলিতে আসিয়াছে কিন্তু মূগ হুটিয়া বলিতে পারিতেছে না। দুলাইও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ময়ু ডাকিল “দুলাই!” দুলাইএর একবার উজ্জ্বল হইল আরও করিয়া ময়ুকে সেই অপেক্ষার মত তাই একটা কথা বলে,

কিছু কোনো হইতে তুংগ অভিমানে ও
ক্রোধে ভরা একটা অটল মেঘভার তাহার
নাড়ির উৎসস্থ অটকাইয়া রাখিল।
মহু, আবার ডাকিল “হুঁদা!” হুলাই
ভগ্ননো কোনো কথা কহিল না। মহু
কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ঘোঁরে
ঘোঁরে গুর হইতে বাহির হইয়া গেল।
তখন পাশের বাড়ীর মনার মা হুলাইএব
মার নিকট কি কথা বলিতেছিল; সহসা
একটা কি কথা শুনিয়া হুলাই চম্ভিতা উঠিয়া
গিয়া বিজ্ঞাণ করিল “কান্নী দিদি
কি হয়েছে?” মনার মা বলিল “জন্মদিন
ঘনরানের যে গাঁসি হবে গিয়েছে, তনুছিল না
তাৎপের মা যে কাঁদছে?” হুলাই কান
পাতিয়া তারপের মার চীৎকারধ্বনি বাতালে
ভাঙ্গিয়া আসিতেছে শুনিতে পাইল। সে
কিছুক্ষণ অন্তর হইয়া দাঁড়াইয়া উঠানে
বুটতে ভিত্তিতে গাঙ্গিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া
আসিয়াছে; দিনের মা’ একটু আলো ছিল
তা’ও অঁদোরে মিলাইয়া গিয়াছে। হুলাই
ঘোঁরে ঘোঁরে ঘোঁরে বাড়ী হইতে বাহির
হইয়া দেখিল, কোথাও কাহাকে দেখিতে
পাইল না; ঘোঁরে ঘোঁরে অঁদে নাগিল;
পুলের ভাঙ্গা অংশ উঠিতে তাহার বুক অল
পর্য্য হইল। সে খাল শাব হইয়া মনুদেহ
বাড়ীতে আসিল। এক ঘরে তারপের মা ও
তারন চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, হুলাই
সেখানে গিয়া দেখিল মহু, নাট, তাৎপের
মা তাহাকে বেশিরাও বেশিল না।
হুলাই প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক কোণটি
পর্য্যন্ত খুঁজিয়া দেখিল, কোথাও মহুকে
দেখিতে পাইল না। সে বাড়ীর বাহিরে

আসিয়া মহুকে ডাকিতে লাগিল “মহু, মহু!”
কেহ উত্তর দিল না। হুলাই পাশের কাছে
আসিয়া উঠ ঘরে চৌৎকার করিয়া
ডাকিল “মহু মহু!” কেহ কোনো সাড়া
পদ দিল না। আতঙ্কে হুলাইএম তখন কাঁপিয়া
উঠিল। বিদাহকালের মনুদেহ বেননা-কাতর
মুখপানা তাহার মনে ভাঙ্গিয়া উঠিল; হাঁহ!
তাহাতে কত তুংগ কত অশ্রু লুকাইয়া ছিল।

পরদিন প্রাতে মেঘ কাটিয়া গিয়া
অকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, পূর্ণদিকে একটু
একটু রোদের আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে;
বক্যা বাহুভাবে গান গাহিয়া চলিয়াছে।
গ্রামবাসীরা আসিয়া দেখিল সনাতন ও ঘন-
রানের বাড়ীর মধ্যে সুবিশীর্ণ খাল প্রাচীর
অলত্যা ব্যবধান রচনা করিয়া পড়িয়া আছে;
বাহিরের সংযোগকারী পুলটির কোনো চিত্র
মাত্র নাট, সঙ্গে সঙ্গে অস্তরের বেগমুহুরটিও
কখন ছিঁড়িয়া গিয়া কোন অতলে লুকাইয়া
পড়িয়াছে!

গ্রামবাসীরা প্রতিদিন স্তোরে আসিয়া
খালটি দেখে; এবং প্রতিদিন খালটি কিছু
কিছু করিয়া ছোট হইয়া তাহাদের
চোখে প্রতিভাত হইয়া উঠে দেখিয়া
নিশ্চিত হয়।

হুই একদিনের মধ্যেই একদিন গ্রামে
সংসার আসিল সনাতন ও ঘনরানের স্ত্রীরা
কথা দিগা! তিন চারি দিনের পথ সহস
হইতে কোনো সংবাদই আসিয়া সেই স্ত্রীর
পন্নোতে শষ্টক পৌছে নাই। হাঁসপাতালে
খাঙ্গিয়া সনাতন স্ত্রী দুখ হইতে বাঁচিয়া

উঠিয়াছে। ঘনহাষের মাত্র কয়েক মাসের
জন্ত বেশ হইরাছিল, সেও শীঘ্র বাড়ী
ফিরিলে।

কিছু দিন পরে বরষার উপর দিবা দুইটি
ছোট ভিন্‌ভিন্‌কা আসিয়া আসিতেছিল,
একটিতে সনাতন, অপরটিতে ঘনহাষ।
তাহারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিল;
কিন্তু কেহ কাহায়ে সঙ্গ কথ্য করিল
না। ঘনহাষ বাড়ী আসিয়াই ডাকিল
“সন্ন, সন্ন।” কেহ কোনো উত্তর করিল না,
তথু তারপরে বা কাঁদিয়া উঠিল। সনাতন
ঠিক সেই সময়েই বাড়ী আসিয়া ডাকিল
“জুলাই জুলাই!” কেহ কোনো সাড়া দিল
না, তথু জুলাইএর মা মাটিতে আছাড়িয়া
পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

ঘনহাষ সনাতন উত্তরেই খালের পারে

আসিয়া পিড়াইল। খাল তখন একেবারে
সুকাইয়া গিয়াছে, অপের কোনো চিহ্ন পর্য্যন্ত
নাই; তথু একখানি শুষ্ক সংকীর্ণ রেখা—
কোনো দিন সেখানে খাল ছিল তাহার স্মৃতি
পরিচয় দিতেছে। ঘনহাষ ও সনাতন দুই
জনই অগ্রসর হইয়া সেই রেখাটির উপর
সুখেঃখুধি হইয়া পিড়াইল, ঘনহাষের চোখে
সে বিজাতীয় স্নান নাই, সনাতনের চোখে সে
নারকীর দীপ্তি নাই।

*

*

সেই খালের চিহ্ন এখনো বিস্তারিত,
গ্রামের লোকে ইহাকে “সৈন্যখাল” বলিয়া
উল্লেখ করিয়া থাকে। নৌকাঘাটী ঘাটীরা
খালের নিকট দিরা ঘাটীবার সময় এই
করণ কাহিনী শুনে এবং সেই স্থল অত্যন্তের
জন্ত একবিন্দু অশ্রু বিদগ্ধন করিয়া যায়।

শ্রীসুপ্রভজন রায়।

পাতালভেদী রাজা ।

মুসলমান রাজবংশের শেষভাগে বর্তমান
দেশের নড়াইলের এলিচ পল্লী সিদ্ধিয়ার
অনতিদূরে এক বিখ্যাতা ছিলেন। রাজার
অপেল নাম কি ছিল—তিনি কতদিন
রাজত্ব করিয়াছিলেন—খনদৌলত, ঠেংগামত,
করতা খোয়াতা তাহার কেসন ছিল,—তাহার
রাজধানীকেই বা লোকে কি নামে অভিহিত
করিত—সতযুখী জনহৃতিও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ
নিরাকার। তবে তাহার সময়ের বহুদূরব্যাপী
এগুপ্তগক, ইতত্ততঃ বিকিষ্ট অগণিত ইষ্টক

তুপ, বৃহৎ অট্টালিকা সমুদ্রের ভিত্তিমূল ছিল,
বিপুল সন্তোষ, নৌতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত
সুপ্রভ রাজপথ প্রভৃতি দৃষ্টি করিলে তিনি
যে একজন প্রবল পরাক্রান্ত ধনধানী নরপতি
ছিলেন ইহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে
পারি।

এবার আছে—রাজা বহিরাঙ্গন হইতে
অপনার ধনদাম্পত্য ও পরিবারবর্গকে
সুবিকৃত ও নিরাপদ রাখিবার অভিপ্রায়ে
হুনিরে একটি গুপ্ত পাতালগৃহ নির্মাণ করেন;

এই ক্ষতই লোকের তাহাকে সাধারণতঃ পাভালভেন্দ্রী রাজা নামে অভিহিত করিত।

ইচ্ছাতেই হটক আব অনিচ্ছাতেই হটক রাজ্যচ্যুত করিতে হটলে রাজবাড়ি ছাড়ি বুদ্ধ অপরিস্রব। কালে এই ‘পাভালভেন্দ্রী রাজার’ও গ্রন্থবস্তুর কোন মূল্যমান নরপতির সহিত বুদ্ধ বাধিল। বুদ্ধ যাহার পূর্বে রাজা নিজের ধনদৌলত ও পরিবার-বর্গকে সেই পাভাল গৃহে নিবাসনে রাখিয়া বাইবার সময় বলিয়া গেলেন—“আমি বুদ্ধ চলিলাম। ভগবানের কৃপায় বুদ্ধে শত্রু জয় করিয়া আবার আগিয়া তোমাদিগকে লইয়া জয় লাভিত্তে আসিব অভি-বাহিত করিব। আমি কিরিয় না আশা পূর্ণ্য, তোমাদিগকে এখনেই থাকিতে হইবে।” পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইয়া রাজা বুদ্ধে চলিয়া গেলেন। কিন্তু যাহুব যা ভাবে তা হয় কই!—তা যদি হইত তবে কি ভগবতঃ একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যোদ্ধাদের কল্প কল্পে বিকৃতিবিশিষ্ট আকুলিত হইয়া উঠিত।

রাজা আশা করিয়াছিলেন তিনি বুদ্ধে শত্রু সংহার করিয়া বিদায় গৌরবে গৃহে কিরিয় আসিয়া পরিবারবর্গের সহিত জয়যাত্রা ভোগ করিবেন। রাজপরিবারও দিন গণিতে ছিলেন—রাজা বুদ্ধে বেনে আসিয়া তাহা-দিগকে পাভাল গৃহ হইতে উদ্ধার করিবেন—তাহারা যুদ্ধের আশোকে, রাজার মোহাগে আবার উৎসন্ন হইয়া উঠিবেন। কিন্তু ভগবান—কাহারও আশা পূর্ণ করিলেন না। রাজা

বুদ্ধে নিহত হইলেন। সেই পাভাল গৃহের সকল কেবলমাত্র রাজাই জানিতেন। তাহার মৃত্যুর সহিত তাহার পরিবারবর্গের আশার কোন বৃহৎই হইয়া ছিড়িয়া গেল। তাহার সেই পাভাল গৃহেই চিরসন্নি নিভ করিলেন।

বিজয়ী মূল্যমান নরপতি মৈত্রসামন্ত-লইয়া রাজার রাজধানী বিপন্ন করিয়া চলি-গেল। রাজা গেলেন—রাজার পরিবারবর্গ, ধনদৌলত, রাজ্য, রাজধানী সব গেল—রহিল কেবল জনপতি—কালে বৃদ্ধি লাভ যার!

এ সম্বন্ধেই আশাম্বর সাধারণের ধারণা, ভূগর্ভে এখনও রাজার সেই পাভালপুরী বর্তমান আছে। এই জনশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই যশোবর্মের আদিষ্ট নীলকর নিঃসার, উইলিয়াম একবার এই সমস্ত ইতিহাস বিস্তৃত ইষ্টক স্থলের একটা আশুপ খনন করিয়া জনপতির মূল রহস্যোৎখাটনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে যশোবর্মের ভাগ্য নীলকরোহ উপস্থিত হওয়ার উদ্ভোগে উইলিয়াম বিপন্ন হইয়া নিজ সকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ‘পাভালভেন্দ্রী রাজা’র মূল রহস্য ভূগর্ভের যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়া গেল।

কিন্তু কে বলিতে পারে—এই অগণিত ভূপ নিরে—এই পাভাল গৃহের গুপ্ত কক্ষে ‘পাভালভেন্দ্রী রাজা’র কোনও অজানিত পরিচয় পথে বাস্তবায়িত ইতিহাসের কোনও অজ্ঞাত পৃষ্ঠা স্ফুটাইয়া আছে কিনা!

শ্রীমধুনীকুমার সেন।

দক্ষ মৎস্য ।

আমার অবশ্যে একটা প্রধান অভিনীত
হইয়া গেছে তাহা তোমরা জাননা ।

তখন সবমায় ব্যারিটার হইয়াছি ।
এক পরসী উপার্জন নাই । মামা হাইকোর্টে
একজন বড় ব্যারিটার ;—প্রত্যহ তাঁহার
গাড়িতে কোটে যাউ, সেখানে এ এডলার,
সে এডলার করিয়া নুরিয়া ফিরিয়া নেড়টি,
গাঁটের পরসী ভাতিয়া ইংখোজ হোটেলের টিন
খাই এবং বৈকালে শ্রুত পকেটে শুক মুখে
বাড়ি ফিরিয়া আসি—তখন কাকের মধ্যে এট!

প্রথম যখন ব্যারিটার হই তখন মনে
করিয়াছিলোম, মা লক্ষীর ভাঁড়ারের চাষিতে
বুধি এখন হইতে একলা আমারই অধিকার
অধীন । কিন্তু কার্যকরের এ কী পার্থক্য !

আমার তখনকার দিনগুলার বিশদ
বর্ণনা এখানে করিব না, কারণ তাহাতে
আমারই মতো ত্রিফলুত অনেক ব্যারিটারের
হাঁড়ির খবর বাহির হইয়া পড়িবে । কি জানি,
তাহাতে তাঁহাদের মনে যদি হুঃপ ৩৩ !
পরের মনে হুঃপ দেওয়া পাপ । সে পাপে
আমি নিপ্ত হইতে চাহিনা । তবু এইটুকু
জানিয়া রাখো যে বিলাত হইতে ছুটি কোট
বুট টাই প্রভৃতি যে করেকটা পোশাক সংগ্রহ
করিয়া আনিয়াছিলোম সকল হুঃপেব উপর
সেই কটাই আমাকে বেশি করিয়া হুঃপ দিত ।
সাহস করিয়া তাহাদের ছাড়িতে পারিতাম না
কিন্তু তাহারা আমাকে নির্দয়ভাবে ত্যাগ
করিবার অন্ত—আপনা হইতেই খসিয়া
পড়িবার অন্ত বহুদিন পূর্বে হইতে আমাকে
নোটিশ দিয়া বসিয়াছিল । অন্তরের পরসার

বিলাতে পোশাক পরিয়াছিলোম, বেশে ফিরিয়া
পত্রের নিকট আবার খোলস কিনিবার
পরসী চাহিতে অত্যন্ত চক্কুলজ্ঞা হইত ।
তখন মনে হইত, বিলাত গিয়া একী অশকণ্ঠই
করিয়াছি ! এ গরম বেশে গায়ে কামিজ ও
গলার কলার কি ছাই একদিনের বেশি
পরিষ্কার রাখা যায় ! অথচ প্রত্যহ পরিষ্কার
না রাখিলে চাল বজায় থাকে না । পোশাকের
এই নীতি যে কি করিয়া চাকিতে হয়
তাহার উপায়টা বিলাতে আইন শিখাইবার
সঙ্গে সঙ্গে যদি শিখাইয়া দেয় তাহা হইলে
আমার মতো অনেক ব্যারিটারের অনেকটা
জুঁজুপনা কমিয়া যায় ।

একদিন মনে হইল, একদিনে বুধি
মা লক্ষী মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন । সেদিন
সকালে মামা পয়স দিলেন যে সন্তোষপুরের
অমোদার হেংস্রবাবুর একটা মকদ্দমা আছে,
মামা অন্ত কাজে ব্যস্ত সেইজন্য এ ‘কেস’
তিনি গ্রহণ করিতে পারিবেন না—আমাকে
তাহার ভারে করিতে হইবে । আমি সে
সংবাদ পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে
পাইলাম । আমার বিশ্বাস ছিল আমার
কৃতিত্বের অভাব নাট, কেবল তাহা
দেখাইবার সুযোগ জোটে না ।

সেদিন সোমবার । বেলা দুইটার সময়
আমার সহিত হেংস্রবাবুর দেখা করিতে
আসিবার কথা । আমি সেদিন একটু ভালো
করিয়া পোশাক করিয়া কোটে গেলোম
বাড়ি হইতে করেকখানা আইনের বই এবং

আমার করেকটা পুথানো ফাইল হইতে গোটা দুই বস্তা সংগ্রহ করিয়া উকিল পাড়ায় আমার চেম্বারের আগমারিতে ও রাত্রে সাজাইয়া রাখিলাম। পানকতক খবরের কাগর কিনিয়া টেবিলের উপর ছড়াইয়া দিলাম; ঘর ও ঘরের আলবাবপত্রগুলি ভালো করিয়া পরিষ্কার করাইয়া লইলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘবটাকে লইয়া এমনি করিয়া ওলটপালট করিয়া দিলাম বাহাতে দেখিলেই মনে হয় যেন হাইকোর্টের অধিকাংশ কাজের কেন্দ্রস্থল আমার এই ঘর! জনকতক বন্ধুকেও পেলিন বেশা ছুইটা নাগাদ অকারণ নিমন্ত্রণ করিলাম—তাঁহাদের জটিলিতে আমার ঘরের চিরয়ন নিতুৎকতা! অন্তত করেক ঘুর্ন্তের অস্ত ও ভঙ্গ করিয়া রাখা পরকায়!

ঘড়ির কাঁটা যতই ছুইটার দিকে সরিতে লাগিল আমার মনের মধ্যেও একটা উবেগ ততই বাড়িতে লাগিল। আমি করেক ঘুর্ন্তের অস্ত মন হির করিয়া—ঠিক করিয়া লইলাম মফেলের সহিত কি ভাবে কথা-বার্তা করিতে হইবে। তাহার পর এখন ছুইটা বাজিতে পাঁচ মিনিট তখন তাড়াতাড়ি একটা পুথানো নথি পাড়িয়া একখানা সুলভ্রপ কাগজ সমুখে রাখিয়া ‘নোট’ করিবার তাগ করিতে লাগিলাম;—আমার মফেল যেন দেখিয়াই বুঝিতে পারেন যে আমার কাজের অভাব নাই—কাজের মধ্যেই আমি চুপিয়া আছি।

টং টং করিয়া আমার ঘরের ঘড়িতে ছুইটা বাজিল—সিঁড়ির পথে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। আমি একান্ত মনে নথির উপর চোখ নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম—

যেন সমুদ্র দিয়া কে বায়, কে আসে আমার দেখিবার অবসর নাই।

ঘরে কেহ প্রবেশ করিল না। পদশব্দও ঘুরে মিলাইয়া গেল। আমার হঠাৎ মনে হইল যেন এমনি করিয়া আমার আলাও মস্তিষ্কার মতো মিলাইয়া বাইতেছে।

আরো আব ঘটা কাটিয়া গেল তবুও হঠাৎ বায় দেখা নাই। মনে মনে ভাবি বিরক্ত হইতেছিলাম। নথিপত্র লইয়া একজন অভিনয়ে আমার শরীর ও মন অবগর হইয়া আসিতেছিল—প্রথমটা যেমন উৎসাহের সহিত আরম্ভ করিয়াছিলাম তেমন উৎসাহটা আর বদার রাখিতে পারিতেছিলাম না। কিছু না, শৈথিল্য হইলে চলিবে না। মনকে ধমক দিয়া বলিলাম—শৈথিল্য ভাগ কর।

আর তিনটা। তখনও অধীবার বায় দেখা নাই। একে বাঙালি তার অধীবার;—আমি মনে মনে বলিলাম—কি ভুলই করিয়াছি! ছুইটার সময় বখন দেখা করিবার কথা তখন চারিটার পূর্বে নিশ্চয় শুভাগমন হইবে না—একখাটা আমার আগে বোকা উঠিত ছিল। বিলম্ব দেখিয়া মনের মধ্যে যে একটা নৈরাজ্য আসিতেছিল এই কথাটা মনে হওয়াতে তাহা দূর হইল—আবার যেন একটু বল পাইলাম।

গুট করিয়া শব্দ হয় কান ভুলিয়া গনি—থস্ করিয়া কি সরিয়া যায় আড়ালে দেখি, বাতালে যেমন দরজাটা নড়িয়া ওঠে অমনি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া নথি পড়িতে লাগিয়া যাই। এত সাবধানতা জীবনে কখনো অভ্যাস করি নাই—মনের মধ্যে এত অধীরতা আর কখনো অনুভব করি নাই!

এতক্ষণ আমার খেঁচে যেন প্রাণ আগিল,
—আনন্দে বুকটা একবার নাচিয়া উঠিল।
একটি ভ্রমলোক দীর্ঘতাবে আমার ঘরে
প্রবেশ করিয়া আমার সামনের চেয়ারে
আসিয়া বসিল। আমি নখি হঠাতে নখ
তুলিয়ায় না—কোনো সন্তোষও কবিলাম
না! হঠাৎ একবার মনে হইল কাকটা অস্তর
হইতেছে, কিন্তু পক্ষ:পই ভাবিলাম—না,
এমন না করিলে পক্ষ:পই হইবে!

দেখিলাম লোকটিও ভারি অসুস্থ। আমি
না হয় তাহার আগমন জানিতে পারিলাম না;
কিন্তু কৈ সেও তো তাহা জানাইয়া দিল না!
সে বিনা বাকা যায়ে টেবিল হইতে একখানা
বরনের কাগজ উঠাইয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ
করিল;—ব্যস্ততার কোনো চিহ্ন দেখাইল
না।

আমি চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া
উঠিলাম। পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া
একবার চকিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিলাম—
“My God! Three O'clock!”

আমাকে ধাঁড়াইতে দেখিয়া লোকটি
একটা ব্যাগ হইতে কতকগুলি কাগজ পত্র
বাহির করিতে লাগিল।

আমি অধীরভাবে বলিয়া উঠিলাম—
“Excuse me. আমি টিফিনে যাচ্ছি।”

ভ্রমলোকটি অপ্রতীতভাবে কাগজগুলি
আবার ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দিল, জড়িত
কণ্ঠে বলিল—“আজ্ঞা, আপনার টিফিন শেষ
হ'ক—আমি অপেক্ষা করছি।”

আমার জীবনের প্রথম বয়সটিকে একটু
অপ্যাখ্যাত করিবার জন্য আমি বলিয়া উঠিলাম,
—“you must be hungry—আহুন ন/

চোটেলে গাই
of course!”

ভ্রমলোকটি একটুমাত্র ইচ্ছিত করিল
না আমার কথাকে একেপায়ে দাঁড়াইয়া
উঠিল;—যাইবার জন্য প্রস্তুত। আমি
টুপি লটগা মুখে একটা ইংরেজি সুরের
শিল্প দিতে দিতে সিঁড়ি নামিতে লাগিলাম
—ভ্রমলোকটি আমার সঙ্গে সঙ্গে আগিতে
লাগিল। দরবার সামনে আগিয়াই একটা
সেকেন্ড ক্লাস গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম
—ইক দিয়া বলিলাম—“উইলসন্ চোটেলে।”

চোটেলে দুইটা টিফিনের অর্ডার দিলাম।
দেখিলাম, ভ্রমলোকটি বিনাভি দরবেগ আমার
কবিত্তে বেশ পটু! আমি বিস্মিত হইয়া
গিয়াছিলাম—পল্লীগানের লোকও ছুরি কাঁটা
ধরিতে শিখিয়াছে! আবহ কাহনা বিলাতি
ধরণের হটলেণ্ড লোকটার আচরণের পরিমণ
কিন্তু সম্পূর্ণ বদেয়া! অস্বস্তি তিন দিন
উপবাস না করিয়া থাকিলে এত আমার
কেহ করিতে পারে না!—এক একটা
ডিন্‌ দুই দিনবার করিয়া চাহিয়া লটগাও
তাহার তৃপ্তি হইতেছিল। পাড়গের
লোক কিনা—আহার বেশি চাইবারই কথা!

আহার শেষ হইলে চোটেলের বিল
“আসিয়া হাভির হইল—দশ টাকা! টাকার
সংখ্যা দেখিয়া মনটা ভাঁচ করিয়া উঠিল! কিন্তু
ভ্রমক? হুদে আসলে আমার করিয়া লইব।
সাহেবি চালে করিত পদে আমি গাড়িতে
গিয়া উঠিলাম। আপিসে পৌছিয়া একটা
চুইট ধরাইয়া আমার মক্কেলকে জিজ্ঞাসা
করিলাম—“এখন বলুন দেখি আপনার
কাজ।”

অত্রলোকটী কোনো কথা না কহিয়া ব্যাঘ্র হইতে কতকগুলি কাগজ পত্র বাহির করিয়া আমার সামনে ধরিল।

কাগজের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে মনে হইতে লাগিল—যাহা দেখিতেছি সব ভুল—মনের উত্তেজনা বোধ হয় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু শেষে যতই ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলাম ততই সত্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এ কী! এ যে লাইফ ইন্সুরেন্সের কাগজ!

আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—“এ সব কাগজ আমার দেখাছেন কেন?”

—“আজ্ঞে এই তো আমার কাজ! দেখুন, মাহুদ মাজেরই তথ্যবাহু অনিশ্চিত; সেই জন্তে প্রত্যেকের কর্তব্য তথ্যবাহুর জন্ত সংস্থান করা। তা ছাড়া আপনি বিমান, বুদ্ধিমান—একথা নিশ্চয় আপনি বোঝেন যে আপনি এখন মাহুদ হইতে জন্মেছেন তখন মাহুদ সমাজের উপর আপনার একটা কর্তব্য আছে। ভগবান না করুন, আপনি যদি অকালে মারা যান তার জন্তে তো একটা সংস্থান রাখা চাই। সে সংস্থান কত সহজে কত আরে হবার উপায় রয়েছে—একশত বিলে দশশত পাবার সম্ভাবনা। আর যদি দীর্ঘজীবী হন তাহাৎ ক্ষোভ নেই;—আপনার অর্থের লাভ থেকে কত দরিদ্র আর পাবে, কত অনাথা, বিধবা, অঙ্গগত সাহায্য লাভ করবে;—এ সমস্ত—”

—“ধামুন! ধামুন!” আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—“ধামুন!” প্রথমটা আমি এমন খতমত হইয়া গিয়াছিলাম যে

লোকটা কি করিয়া ঘাইতেছে তাহা ভালো বুঝিতে পারিতেছিলাম না—তাহাকে বাধা দিতেও পারিতেছিলাম না।

আমার বৈবাহিক বঁধ ভাঙিয়া গেল। আমি অস্বস্তি হইয়া বলিয়া উঠিলাম—“আপনি সন্তোষপুরের জমিদার নন?”

—“আজ্ঞে না! আমি ইন্সুরেন্সের দালাল!”

আমি ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম—“সে কথা আগে বলেন নি কেন?”

—“আজ্ঞে বলবার সময় দিলেন কৈ!”

তাই তো, সে কথা ঠিক। ঘোষণা আমারই হইবে। একটু লজ্জিত হইয়া বিরক্তির স্বরে বলিলাম—“ধান মহার! এখন আমার কাজ আছে।”

লোকটা আমার দিকে বলিতে ঘাইতেছিল; আমি ধমক দিয়া উঠিলাম; সে ঘরে ঘরে চলিয়া গেল।

আমার মনের মধ্যে একটা অশুশোচনা ভীতির ফলার মতো বিধিত লাগিল; কেবলই মনে হইতে লাগিল—মিছামিছি দল দলটা টাকা নষ্ট করিলাম।

মানাজ্ঞাপ প্রবোধ দিয়া চিত্রটা ব্লক করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময় মানার সহিত একজন চিঠি আনিয়া হাতে দিল। মামা লিখিয়াছেন—“কোনো বিশেষ কারণে সন্তোষপুরের জমিদার আজ কলিকাতায় আসিতে পারিলেন না।”

আমি দুঃখিতাম আমার নিভাওই শনিব দশা—নইলে বড় মতত পালায়?

ঐমলিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন।

বঙ্গমাতার আর একটা সুসন্তান জননী
অঙ্ক স্মৃত করিয়া গত ১৩ই আষাঢ় অনন্ত
শান্তিশ্রমে চলিয়া গিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথের জন্ম দশম পাব চন্দ্রানন্দ
উদারমতাবলম্বী বিচক্ষণ ব্যক্তি স্বরূপে বিবগ।
সংবাদপত্র পরিচালন করিতে চাইলে দেশ
উদারমত থাকা আবশ্যক নরেন্দ্রনাথের ভাষা
ছিল। তিনি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, কিন্তু
তাহার স্বদেশপ্রেম, তাহার জনহিত বিখ-
প্রেমকে একদিনও আঁতড়া করে নাই। তিনি
জাতিনির্বিদ্বেষে সমগ্র মানবসম্প্রদায়ের সেবার
আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এটুকুই
তাহার চরিত্রের বিশেষ মাহাত্ম্য।

নরেন্দ্রনাথ তাহার পিতার চতুর্থ পুত্র।
তাহার পিতা স্বর্গীয় হরিমোহন সেন মহাশয়
জয়পুর রাজহাট্টে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী
ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ শৈশবে বিজ্ঞা শিক্ষার অল্প
কলিকাতার হিন্দুস্কুলে প্রেরিত হন। ছাত্রা-
বৃত্তার তিনি প্রতিভার বখেটে পরিসর দিচ্ছি-
লেন কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্ব হওয়ার তাহাকে যৌবনের
আরম্ভেই বিজ্ঞান পরিচয় করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু প্রতিভা কখনও ভ্রমোন্মুদ্র হইতে
জানেন না। নরেন্দ্রনাথ স্কুল ভ্যাগ করিলেন
বটে কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার অভ্যাগ অক্ষুণ্ণই রহিল।
পুত্রের এইরূপ অদম্য জ্ঞানাহুতীলন প্ররতি
দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের পিতা এক অতিজ
ইংরাজ শিক্ষকের হস্তে তাহার শিক্ষার
সমর্পণ করিলেন। তাহারই হাতে নরেন্দ্র-
নাথের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইতে লাগিল।

বিশ্বব্ধার বয়সে নরেন্দ্রনাথ এক এটর্নি

আগসে কাল শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।
তিনিই যোগ হর বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন
এটর্নি। কিন্তু অধিক দিন তিনি এটর্নির
কর্ম্য করেন নাই। উপার্জন অভাবে
দে তাহাকে এটর্নির ব্যবসায় ছাড়িয়া সংবাদ-
পত্রের সম্পাদকরূপে জীবন অতিবাহিত
করিতে হইয়াছিল এমন নহে। আপনার
চরিত্রগুণ ব্যবসায়ের আরম্ভেই তাহার প্রতি-
পত্তি হইতে আঁতড়া হইয়াছিল, কিন্তু যে জীবন
জনসাধারণের কার্যের জন্য পূর্ণ হইতে
নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে তাহা কি জীবিকা
উপার্জনরূপ সামান্য কার্যের স্বার্থে গভীর
মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে!

ইংরাজী ১৮১১ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক ইণ্ডিয়ানমিরর সংবাদপত্র প্রথম
প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে এদেশে এক
হিন্দুপেট্রিট ব্যতীত দেশের লোকের
পরিচালিত অল্প কোন ইংরাজী সংবাদপত্র
ছিল না। ইণ্ডিয়ানমিরর প্রথমে পাশ্চিক
পত্র ছিল। ত্রিমুখ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ এবং কেশবচন্দ্র
সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই কাগজে নিয়মিত
ভাবে লিখিতেন। কিছুদিন পরে মহাত্মা
কেশবচন্দ্র তাহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ
করেন। তখন হইতেই নরেন্দ্রনাথ ইহার
সম্পাদক। এই ইণ্ডিয়ানমিরর সম্পাদনাই
তাহার প্রতিভার প্রকট পরিচয় পাওয়া যায়।

সংবাদপত্র সম্পাদন ব্যতীত তিনি দেশের
প্রায় সমস্ত কলাগুরু অহুতানে আশ্রয়ক-
ভাবে যোগদান করিতেন। বাণ্যবিবাদের
অন্ততঃ দণ্ড দর্শনে দেই প্রথা নিবারণ সংকল্পে

ভাৰতী ।

শ্রাবণ, ১৩১৮

সাহাবা ক'ৰিডেন। তাঁহার শ্রীতিপূর্ণ
অমরিক ভাব তাঁহার তেজস্বী নিষ্ঠীক চরিত্রকে
একটী শাস্ত্ররূপে মণ্ডিত করিগা য়িরাছিল।



এই কর্ণবীর ধর্মপ্রাণ চিত্তাশ্রম ব্যক্তির
অস্তিত্ব ঈশ পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না।
আমরা তাঁহার মৃত্যুতে আশ্রয়ের ল্যাই

শোকাভিতৃভ হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার
শোকলগ্ন পরিজনদিগকে সাহসনা প্রদান
করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

চরন।

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(Sylvain Levi-র কবিতা হইতে)

পৌরাণিকী কথা।

ভরত ও নাট্যশাস্ত্র।

আশ্চর্য্যবশেষ প্রতি ভারতীয় প্রতিভার
এক অধিক প্রবণতা যে তাহার কলে উত্তীর্ণ
ভারত হইতে এক প্রকার নিক্সিত হইয়াছে
বলিলেও হয়। ভারতীয় ঐতিহ্যকে যদি বিশ্বাস
করিতে হয়, নাট্যশাস্ত্র স্বর্গ হইতে পরাভূত
আনীত হইয়াছে। অর্গেই উহার জন্ম।
স্বয়ং ব্রহ্মা, স্বরূপ অস্ত্র চারি বেদের পরিমিষ্ট-
রূপে এই নূতন শাস্ত্রের সংহিতা রচনা
করেন। ভারত এই নাট্যশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া
মানবদিগের নিকট প্রেরণ করেন। পঞ্চম
বেদের উৎপত্তিগন্ধে ভারতবুনি এইরূপ
বর্ণনা করিয়াছেন :—একথা অনাথারকালে,
আশ্রয় প্রভৃতি অধিগণ নাট্যকোবিন ভারতকে
জিজ্ঞাসিলেন ;—ভগবান্, আপনি যে নাট্য-
বেদের কথা কহিয়াছিলেন, উহা কাহার জ্ঞাত
এবং কিরূপে উৎপন্ন হয়, উহার অঙ্গ কত-
প্রকার, মূলই বা কি, প্রযোগই বা কিরূপ ?
ভরত কহিলেন ;—তোমরা অবহিত হইয়া এই
ব্রহ্মনির্দিষ্ট নাট্যবেদের কথা সংক্ষেপে শ্রবণ
কর। পূর্বে যেভাবে কামক্রোধাধিকৃত
আশাধর্মে প্রবৃত্ত হইলে লোকসকল ঈর্ষা
বেদাদির বশীভূত হইয়া ব্রহ্মত্ব ভোগ করিতে-
ছিল। ঐ সময় ইন্দ্রাদি বেদগণ মঙ্গলোক-
পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন ভগবান্, বাহ্য দৃষ্ট

ও শ্রব্য এইরূপ কোন এক ক্রীড়নক আশাধর্ম
আবশ্যক। বেদচতুষ্টয় পুণ্যভিত্তিক শ্রবণযোগ্য
নহ, অতএব আপনি এই সূত্রে সাক্ষ্যবর্ণিক
পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করুন। তখন ব্রহ্মা তাঁহা-
দের অনুরোধে ভাবী লোকের সাক্ষ্য-
আদর্শক সাক্ষ্যার্থগুরু ইতিগান-মহ নাট্যশাস্ত্র
পঞ্চম বেদ প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিয়া
যোগাৎনে বেদচতুষ্টয়কে শ্রবণ করিলেন এবং
স্বয়ং হইতে নৃত্য, গায় হইতে গীত, বস্ হইতে
অস্তিনয় এবং অপরী হইতে রূপ আভরণ করিয়া
নাট্যবেদ প্রণয়ন করিলেন। তবস্তর ব্রহ্মা
বিশ্বকর্মাণকে একটি রত্নমালা নির্মাণ করিতে
দিলেন ; নাট্যমালা নির্মিত হইলে, এই
নাট্যবেদের প্রযোগভার ভারতের প্রতি অর্পিত
হইল। প্রযোগকালে শিব উপস্থিত ছিলেন।
তিনি পূর্বাংগে তত্বর দ্বারা বেদগণ একবার
নৃত্য করাইয়াছিলেন সেই প্রচণ্ড তাড়ন-
নৃত্য তাঁহার শ্রবণ হওয়ায়, তিনি উহা
ভরতকে পিতা দিলেন। আগার দেবী
পার্বতীও মদ্যে হইয়া, লাল্য নাদক কমলোদ
নৃত্য ভারতের নিকট প্রদর্শন করিলেন। ভারত
ঐ তাড়ন-নৃত্য মনোহরদিগের নিকট আনয়ন
করিলেন। স্বয়ং পার্বতী বাণ-ভূমিতা উহাকে
লাগ্য-নৃত্য পিতা দেন। উহা আবার ঐ

নৃত্য জ্ঞান নগরী স্বাধীনতার গোপীগণকে শিক্ষা দেন। তাহানিগের নিকট হইতে সুবাস্তুর সমীপগণ ঐ নৃত্য শিক্ষা করে; ক্রমে উহা সমগ্র বাঙ্গালায় ছড়ি পড়ে। এইরূপে নাট্য কলা প্রচলিত হয়। ইহাও সংগঠনে বিজ্ঞবৎ কল্পে হাত ছিল। নাট্যশাস্ত্রের বাংলা জননী-স্বরূপ, বিজ্ঞ সেই চারি প্রকার নাট্যবৃত্তির স্রষ্টা।

নাট্যশাস্ত্রে এই যে উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আত্মবিশ্বাসী তত্ত্ব হিন্দুর নিকট বর্ণেই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; কিন্তু মুসলিম বিচারক ইহাতেই সন্দেহ হইতে পারেন না। ভারতীয় গ্রন্থকর্তাদেরই সাক্ষ্য-প্রমাণে, কালমিত উপাখ্যানাদির স্থানে ইতিহাসকে স্থাপন করিয়া, নাট্যশাস্ত্রের প্রামাণিকতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইতে পারে। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে এই গ্রন্থের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজ-অন্তঃপুরের হুইজন নাট্যাচার্য্য প্রত্যেকেরই আপন আপন শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠতা লটুয়া আত্মগরিমা করিতেছিলেন, পরিশেষে তাহারা এই বিষয়ে রাজাকে মধ্যস্থ মানিলেন; রাজা পরিভ্রাজিকার উপর বিচারের ভার অর্পণ করিলেন। পরিভ্রাজিকা:—“দেবুন্ মহারাজ, নাট্যশাস্ত্র প্ররোগ-প্রধান—এ বিষয়ে বাক্য-ব্যবহারে কি কল?” Weber “নৃত্যের-কলাবিদ্যা” এইরূপ অংশট বাক্যে “নাট্য-শাস্ত্রের” অর্থব্যব করিয়াছেন; কিন্তু কালিদাস যিনি স্বকীর গ্রন্থে কলাবিদ্যার সমস্ত পারি-ভাসিক খুঁটিনাটি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিচয় দিতে যত্ন পাইয়াছেন, যিনি কলাবিদ্যার নিরমাদি নতশিরে পালন করিতেন, তিনি যে, শেষের প্রকৃত অর্থ অহুগারেই লক্ষ প্ররোগ

করিতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই জ্ঞান আমাদের বাখাখি অবিকতর যুক্তি-সম্মত বলিয়া মনে হয়। বিক্রমোর্ধ্বশী নাটকে তিনি ভরতের যে কার্য্য নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীতি হয় যে, ভরতকে তিনি নাট্য-শাস্ত্রের প্রণেতা বলিয়াই মনে করিতেন। আবার ভবভূতিও ভরতকে ভৌত্যাটিকের সূত্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

অরিন্দ একটা কথা, কালিদাসের সম-সাময়িক মাতৃগুপ্ত, ভরত প্রভৃতি গ্রন্থের একটি ভাষ্য পড়ে রচনা করেন। কিন্তু আমরা যে গ্রন্থকে এক্ষণে নাট্যশাস্ত্র বলিয়া জানিতেছি, কালিদাস ও ভবভূতি কি কিছু সেই গ্রন্থকেই ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্র বলিয়া জানিতেন? ভরত-কৃত মূলগ্রন্থের যে একটা মূলভিত্তি নাই তাহা আমরা বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা ইতিপূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। ভাষ্যকার মাঘবতট্ট এই নাট্য-শাস্ত্রের অস্বরূপ, “আদি-ভরত” নামক আর একটি নাট্য-শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের হস্তলিখিত পুঁথির তালিকার মধ্যে “আদিভারত-প্রস্তার” নামক গ্রন্থের উল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু নাম ছাড়া তৎ-সম্বন্ধে আর কোন কথা জানা যায় না। পক্ষান্তরে, মনম পতাস্বীতে লিখ্যামিন্, ভরতের লিখন-স্রোতির সহিত বহুবার অক্ষকামের জলের তুলনা করিয়াছেন। ভবভূতি-গ্রন্থক “হত্র” শব্দের সহিত এই বর্ণনার কতকটা সাদৃশ্য আছে। কেন না, হত্র অতি সংক্ষিপ্ত বাক্য—দ্রষ্টব্য ও অন্ধ-কারাঙ্কর; হত্রাং, যে ব্যক্তাবল্লগ দ্বিত্যার গ্রন্থখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার সহিত উক্ত বর্ণনার মিল হয় না।

কালসহকারে, ভরতের এই স্বপ্নগুলি, একত্র সন্নিবদ্ধ হইয়া পাণিনি উদ্ভাষিত “নটশাস্ত্র” নাম ধারণ করে। এইরূপে, আমরা গৃহীতপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আসিয়া উপনীত হই।

এই পীণকাল মধ্যে, নাট্যকলা নিশ্চয়ই পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছিল; অন্তত ঐ গ্রন্থের অতীত কালের সূত্র হইতে, ইহার সৃষ্টি আরম্ভ হয়। “নাট্যশাস্ত্র” নাটোৎপত্তির কালটাকে দূর অতীতে পিছাইয়া দেয় নাহ, কিন্তু নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করে না।

ইতিহাস।

যদি কালিদাসের পূর্ববর্তীদিগকে তারতর্ঘ্য বিবৃত হইয়া থাকে, যদি প্রাচীন নাট্যকার-দিগের অনাধিকার রচনাগুলি—কোন চিত্র না ভাষিয়া অঙ্কিত হইয়া থাকে, উৎকৃষ্ট রচনাগুলিসমেত ভারতের নাট্যসাহিত্য যদি কোন অলৌকিক ঘটনাক্রমে ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া থাকে, নাট্যকলার বৈষ উৎপত্তি নির্দেশ করিয়া এবং উহা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া যদি অসম্ভাবনাত্মক কথা গর্ভ করিয়া থাকে,—তাহা কল্প; এমনকি সন্দেহ, কল্পের ক্রমে নাটকের সৃষ্টি হইল, সেই—ক্রমোন্নতির ইতিহাস ভ্রান্তপন্থা সম্পূর্ণরূপে অপনোত করিতে সমর্থ হয় নাই। নাট্যকলার রচনার সাক্ষ্য মতাবে অজ্ঞাতীয় রচনাবলী,—সাক্ষ্যও ভাবেই হউক, বা পথোক্ত ভাবেই হউক—ভারতীয় নাট্যের ক্রমবিকাশ বিবৃত করিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যে, সাহিত্যের পুনরুৎপত্তির পূর্ববর্তী কালের

সামান্যিক দলিলপত্রের অভাব নাই। সঠিক সময় নিরূপণ করিতে না পারিলেও, বৈদিক সংহিতাগুলি যে পুণ্ডর সূত্রের বহুপূর্বের রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সংহিতার পণ্ডেই ত্র্যমূলগুলি রচিত হয়। বৃহৎ মহাকাব্যের গদ্য অনেক বিশেষ বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি উহার বৈদিক সূত্রের ঐতিহ্য, প্রথা, প্রকরণাদির বারমহিকতা রক্ষা করিয়া প্রাচীন ইতিহাসের সহিত যে একত্রে সংযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। পাণিনি ও পতঞ্জলী—এই দুই বড় বৈদ্যাকরণ, বিরূপাতি সূত্রের বহুপূর্ববর্তী।

যৌক্ত-ধর্মশাস্ত্রের অনেকগুলি ঘটনও প্রাচীন সমসাময়িক। এই সকল বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর মধ্যে,—কতকগুলি গ্রন্থে, নাট্যের অবস্থা সম্বন্ধে, রসভূমি সম্বন্ধে, অভিনয়ের রূপ সম্বন্ধে, নাট্যকলা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়; অথবা অস্তিত্ব গ্রন্থে, নাট্যকলার ধরনের কথোপকথন, নৃত্য, ভূমিকা-বিত্তান এবং অস্তিত্ব আঙ্গুলিক বিধের প্ররোচনা পৃথকভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

অতীত সম্প্রদায় ও স্বল্প-নিশ্চিত নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সকল প্রমাণ-পেথের ব্যাখ্যা যদি নিত্য প্রামাণ্যেরাণি ও দৃষ্টিসাহিত্যিক চেষ্টা বর্ণনা কাহারও মনে হয়, তাহা হইলে সঙ্কলনকারের অল্প সূত্র অবলম্বন করিয়া, পার্ববর্তী দেখাদৃষ্ট হইতে সংবাদ আহরণ করিয়া, এমন কি, আধুনিক পণ্যবৈজ্ঞানিকদিগের নিকট হইতেও প্রোত্তপন্ন লইয়া, প্রকৃত তথ্য উপনীত হওয়া যাইতে পারে। নাট্যকলার সর্বকৌশলসম্বন্ধেও সম্বোধ

এমন কতকগুলি সংখ্যা সংৰক্ষিত আছে—
যাহা হইতে আমরা নাটকের উৎপত্তি লক্ষ্যে
কতকটা জ্ঞানলাভ কৰিতে পারি। একজ
সংস্কৃত, দ্বৈতবদ্ধ, ও পরম্পরের সহিত
ঐক্য করিরা দেখিলে, এই সকল প্রমাণ-লেনা
হইতে এমন একটি ধারাবাহিক পুৰাণ
স্রবত হইতে পারে, যাহার অংশগুলি,
কালিদাস ও ভবভূতিকে, আৰ্য্যাবাসিনের
সহিত একহুই নিবদ্ধ কৰিবে।

ক—বৈদিক সাহিত্য।

যাহা ভারতীয় গ্রন্থের মধ্যে সন্মাপেক্ষা
আট্টান, যাহা বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে
সৰ্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সেই অগ্ৰবেধ কথোপকথনের
আলোপ পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিপাকিত হয় :
কখনকখন কথোপকথনের যাহা মন্ত ও
মন্তপাঠ, কখন বা সমস্ত স্থিকই বাধ্যপ্রাপ্ত
হয়। অগ্ৰবেধ সাহিত্যের ১৭টি স্থিক এইরূপ
কথোপকথনের আকারে লিখিত; ইহা
কতকগুলি মণ্ডলে বিভক্ত এবং কতকগুলি
অবিবৰ্ণের নিজস্ব বলিয়া আৰোপিত হইয়া
যাকে (I, ১৬২, ১৭০, ১৭২; III ৩৩;
IV, ১৮; VII, ৩৩; VIII, ১০০;
X ১০, ২৮, ৪১—৪৩, ৮৬, ৯৫, ১০৮)।
এই সকল মন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির; যাহারা
কথোপকথন কৰিতেছে তাহাদের সংখ্যা
আটাই তিনের অধিক নহে :—নৈমা তর্পণ
এব কৰিতেছেন, ইন্দ্র উত্তর দিতেছেন
(VIII, ১০০); যদী তাহার স্রাত্যকে
প্রেমসন্তোষে আকর্ষণ কৰিতেছেন, যদ
ধর্মের গোহাই দিয়া তাহাকে প্রাত্যখ্যান
ক'ৰিতেছেন, (X, ১০); পুরুষা চপলাচত

উপশোধকে আকর্ষণ কৰিতেছেন, এবং সেই
অপৰা অন্তর্ধান কৰিতেছে, (X, ২২);
অগস্ত্য, তাহার পত্নী গোপমুদ্রা ও তাহাদের
পুত্র—পরম্পরের সহিত মহেলিকার আকারে
বাক্যালোপ কৰিতেছেন (I, ১৭২);
ইন্দ্র, বামদেব অধিতার মধ্যেও (IV, ৮);
ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, বর্ষাকপির মধ্যেও (X, ২৮);
এইরূপ বাক্যালোপ চলিতেছে। কখন কখন,
একজনের স্থলে, দলবদ্ধ হইয়া কতিপয় লোক
প্রশ্ন কৰিতেছে :—যদা, ইন্দ্র, অগস্ত্য ও
মহৎসগ (I, ১৬৫, ১৭০) বিধামিত্র ও
ত্রিবিধেরগণ (III; ৩৩); শশিষ্ঠ ও তাহার
পুত্রগণ (VII, ৩৩); সন্ন্যাস ও পানিগণ
(X, ১০৩); আমি ও দেবগণ (X, ৪১-৪৩)।
কতকগুলি দৃষ্টান্ত এদৰ্শন কৰিলেই
এই সকল রচনার সাধারণ লক্ষণগুলি
একাংশ পাইবে।

X, ১০৮।—পানিগণকর্তৃক অগস্ত্য বর্ষহ
দেহবৃদ্ধ, পানিগণের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার
করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রেরিত দূত সন্ন্যাস সন্মগতা।

পানিগণ।—কি অভিপ্রায়ে সন্ন্যাস এখানে
আসিয়াছেন ? এই দীর্ঘপথ বহুদূর পৰ্য্যন্ত
গিয়াছে। সন্ন্যাস আমাদের নিকট চাহেন
কি ? কি লক্ষ্য এত দূর ? সন্ন্যাস তরঙ্গদ্বাভি
কিছুপে ভূমি পার হইলে ?

সন্ন্যাস।—হে পানিগণ, আমি আমাদের
নিকট হইতে মহাত্ম উদ্ধার করিবার জন্য,
ইন্দ্রকর্তৃক দূতরূপে প্রেরিত হইয়া এখানে
আসিয়াছি। এই সকল বিভীষিকা হইতে,
পতন হইতে, তিনিই আমাকে রক্ষা
করিয়াছেন, এবং এইরূপে আমি সন্ন্যাস
তরঙ্গদ্বাভি অতিক্রম করিয়াছি।

পাণিগণ;—হে সরমা, কে এই ইজ্ঞ ? অতদূর হইতে বাহার দূত হইয়া তুমি আসিয়াছ তাঁহার কিছল আকৃতি ? তিনি এখানে আছেন, তাঁহার সহিত আমরা মিত্রতা করিব। তিনি আসিরা আমাদের খেজুরগণের রক্ষক হউন।

সরমা।—আমি জানি তাঁহাকে কেহ প্রাকৃত করিতে পারে না। আমি অতদূর হইতে বাহার দূত হইয়া আসিয়াছি তিনিই অতদূর প্রাকৃত করিতে পারেন। গজীর নদী সকল তাঁহাকে প্রাকৃত করিতে পারে না। হে পাণিগণ, ইজ্ঞের দ্বারা প্রাকৃত হইয়া তোমরা ধরাশায়ী হইবে!

পাণিগণ।—হে সরমা! হে তজ্ঞে! তুমি যে খেজুরগণকে লইতে আসিয়াছ, উহা আমরা স্বর্গের শ্রেয়স্রাস্ত হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছি। বিনা তুচ্ছ কে তাহা-নিগকে ছাড়িয়া দিবে? আমাদেরও স্বতন্ত্র অস্ত্রাদি আছে।

সরমা।—হে পাণিগণ, তোমাদের কথাকলি ও অস্ত্রহীন। তোমাদের অশস্ত্র শরীর বাণের ওষবেস্ত হইলেও, এই দীর্ঘ পল অলক্ষ্যনীয় হইলেও, তথাপি বৃহস্পতির নিকটে তোমাদের নিষ্ঠুরি নাই।

পাণিগণ;—হে সরমা, এই রত্নভাণ্ডার—এই সকল খেজুর, অশ ও ধনরত্ন প্রভৃতির আভ্যন্তরে রহিয়াছে। রক্ষক পাণিগণ উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। তুমি যেখানে আসিয়াছ উহা লুণ্ঠগর্ভ; এখানে কিছুই পাইবে না।

সরমা।—ভাল! দোম পানে উত্তেজিত হইয়া, আঘাত, অস্ত্রবস নবধল এই অধিগণ

এবমি আসিবে। তোমাদের গোশালায় গাভীনিগকে তাঁহারা আপনাদের মণ্ডা ভাগাভাগি করিয়া লইবেন; তখন পাণিগণ তাহাদের দ্বারা লুণ্ঠন করিবে।

পাণিগণ।—সরমা, তুমি অনগ্র ইজ্ঞ-দেবের দ্বারা দ্বারা হইয়া এখানে আসিয়াছ। তোমাকে আমি ভগিনীরূপে গ্রহণ করি, তুমি এখানে হইতে যাইও না; হুম্মরি! এষ্ট খেজুরগণের কিরদংশ তোমাকে আমরা দান করিব।

সরমা।—আমি তাইও জানিনা, ভগিনীও জানিনা। সে জানেন ইজ্ঞ, আর সেই ভীষণ অস্ত্রবসগণ। তাঁহারা এই সকল খেজুর লইতে চাহেন, আর তাঁহাদের ইজ্ঞা আমি এইখানে আগমন করি; পাণিগণ! তোমরা এখানে হইতে দূর হ'!

এই কথা বলিবামাত্র দ্ব্যর্থার্থ গাভীগণ দ্ব্যর্থব করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল; বৃহস্পতি, দোম, প্রভুরগণ, এবং সোমোত্তেজিত অধিগণ একটা প্রাকৃত দ্বানে এই গাভীগণকে আধিকার করেন।

অন্ততঃ,—দেবতাগণ, তাঁহাদের সমকক্ষ আর এক দেবতা অস্ত্রের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। আমি তাঁহার কর্তব্য করণে বিরত হইয়াছিলাম; পরে কতকগুলি কঠিন সর্ভে বকীর কার্য্যসম্পাদনে বীকৃত হইলেন। (X, ৫১; ৫৩):—

দেবগণ।—বৃহৎ সেই আবরণ, কঠিন সেই আবরণ—যে আবরণে আবৃত হইয়া তুমি জল-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে। হে অগ্নি প্রাতবেদ! কেবল একজন দেবতা সত্য অধিগণ করিয়া, এবং অনেকবার অধিগণ করিয়া তোমার শরীরকে দেখিতে পাইয়াছে!

অগ্নি।—কে আমাকে দেখিতে পাইরাছে ?
কে সেট দেবতা যিনি আমাকে সর্বত্র অবস্থান
করিয়াছেন ? হে মিত্র বরুণ ! দেবতাদিগের
অভিমুখে অগ্নির যে শিখাগুলি উত্তীর্ণ হয়
সেট শিখাগুলি কোথায় তৎপন্ন প্রকৃত থাকে ?

দেবগণ।—হে ভাতৃগণ ! অনেক স্থানেই
তোমাকে অবস্থান করিয়াছি—জলের মধ্যে
অবস্থান করিয়াছি, ওষধি বনস্পতিদিগের
মধ্যে অবস্থান করিয়াছি। হে দীপ্তমান !
দশটি আবরণের মধ্যে হইতে যখন তুমি
অতিমাত্র দীপ্ত পাইতেছিলে, সেই গুপ্ত স্থানে
বন তোমাকে সন্নিবেশিত পাইয়াছিলেন।

অগ্নি।—হে বরুণ ! আমি বহু যজ্ঞের
অহুতান করিয়াছি, আর পারি না। তাই
আমি প্রস্থান করিয়াছি ; আর যেন দেবতারা
আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন। আমি এখন
সপ্তপ্রকারে বিভ্রম করিতেছি ; অগ্নির কাজ
আর আমার ভাল লাগে না।

দেবগণ।—আইস : ধর্মনিষ্ঠ যজ্ঞ যজ্ঞ
করিবার জন্য ইচ্ছুক হইরাছেন। তিনি
যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন, আর
তুমি অগ্নি কিনা এমন অঙ্কুরের মধ্যে
অবস্থিত করিতেছ ! যে পথ দিরা দেবতারা
গমন করেন, সে সকল পথ অগ্নি করিয়া
দেও। সপ্তপ্রকারে, যজ্ঞের বস্তু
অনিয়ন কর।

অগ্নি।—পশুসমস্তকারী লোকদিগের
জ্ঞান অগ্নির ঘোষ্ঠী আত্মগণ এই গুরুতর
আমার উপর ক্রোধ করিয়াছেন, তাই বিরক্ত
হইরা, হে বরুণ,—যেমন মর্ষিষ, ব্যাধের
রক্ষা হইতে দূরে পলায়ন করে,—সেইরূপ
আমি পলায়ন করিয়াছি।

দেবগণ।—ভাল ! তোমাকে করা
হইতে আমরা অস্বাভাবিক বিচোঁছি, তাহা
হইলে কাজ করিবার সময় তোমার কোন
কষ্ট হইবে না, এবং তাহা হইলে, হে অগ্নি !
তুমি সপ্তপ্রকারে দেবতাদিগের যজ্ঞাংশ
দেবতাদিগের নিকট বহন করিতে পারিবে।

অগ্নি।—সকল ঋতুদিগের মধ্যে প্রবাসিন্দ
ও অহুতান্দ (যজ্ঞের পূর্বে ও যজ্ঞের পরে
যে বৃত্তান্তের দেওয়া হয়) যেন একমাত্র
আমারই হয় ; এবং আমি যেন বৃত্ত ও বৃক্ষাদির
সারংশ প্রাপ্ত হই ; আর হে দেবগণ ! অগ্নির
আত্ম যেন দীর্ঘ জয়।

দেবগণ।—প্রবাসিন্দ ও অহুতান্দ
তোমারই হউক ; যজ্ঞের এই সুরম অংশ
তোমার হউক ; এই সমস্ত যজ্ঞ তোমারই
হউক ; বিচ্ছিন্নহৃদে যেন তোমাকেই পূজা
করে !

কখন কখন বহু কবি,—হয় কথোপ-
কথনের একজন বক্তা হইরা—নহ, নিজ
কবির পুরস্কার আদায় করিবার অস্ত, এক
বলে অবতরণ করেন :

অ.খন III, ৩৩।—ভরতপুত্রের পুরোহিত
বিখ্যামিত্র, যে সকল নদী সিদ্ধ অভিমুখে
প্রবাহিত হইরাছে, তাহার মধ্যে একটি নদীর
নিকট, ভরতবংশীয়দিগের কত পথ পুলিন্দ দিতে
প্রার্থনা করিতেছেন।

বিখ্যামিত্র। ভরতগামী মুক্ত হই অধিনীর
জ্ঞান, লেহনশীলা বৎস-অনন্য হই গাতীর জ্ঞান,
নিলাস ও শুভ্রদ্রী, গিরি-বল হইতে নির্গত
হইরা, ক্ষীর সহ অবাধে প্রবাহিত হইতেছে।
অবাধ-গমনেন্দ্র রূপ-যোজিত অরণ্যগুলের
জ্ঞান, ইন্দ্র কর্তৃক তাক্তিত হইরা তোমরা

সাগরাস্তিমুখে গমন করিতেছে। হে অম্বর! ভরসে নীত হইয়া অতি দ্রুতভাবে, তোমরা একজন আর একজনের দিকে গমন করিতেছ।

আমি মাতার মাতা সেই সিঙ্গুর নিকট গিয়াছিলাম; আমরা বিদ্রুত ও দৌড়াগাণাম বিপাশের নিকট গিয়াছিলাম। বৎস লেহন-কামিনী দুই গাতীর স্তায় উগায়া উগাদের সাধারণ মাতার অভিমুখে গমন করিতেছে।

নদীগণ।—তুমি বেগিতেছ, কীরের দ্বারা নীত হইয়া, দেবগণরচিত গর্ভাশার অভিমুখে আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি। আমাদের প্রচণ্ড শ্রোতকে আমরা ধারণ করিয়া তাপিতে পারিতেছি না। আমরাগিকে যিনি একজন উচ্চৈশ্বরে আহ্বান করিতেছেন, সেই পুরোহিত কি প্রার্থনা করেন?

বিখ্যামিত্র।—আমার শোম-বাক্যের বাণ তোমাগিকে খামিতে বলিতেছি; গর্শের বন্ধীকৃত হও, মণৈকের জন্ত তোমরা বহুতে ক্ষান্ত হও; আমরা প্রবল প্রার্থনা সিঙ্গুর অভিমুখে গমন করিতেছে; আমি কুশিক তোমাদের অঙ্গুগ্রহ ব্যাচুণা করিতেছি, তোমা-দিগকে অধুনা করিতেছি।

নদীগণ। বজ্রধর ইন্দ্র তিনিই আমাদের পণের আধরণ মোচন করিয়াছেন; নদীর আধরণকারী বুজকে তিনি উচ্ছেদ করিয়াছেন। স্নানব হস্তবিনীত দেব লবিতা ঔষধকে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিলেন; তাহারই কলাপে আমরা বিদ্রুত হইয়া গমন করিতে পারিতেছি।

বিখ্যামিত্র।—ইন্দ্রের বিজয়কোষ্ঠি নিচ্য-কাল পরিশোধিত হউক—তিনি অধিক বিশোধ করিয়াছেন; তিনি ঔষধ বঙ্গের

বাণা সকল প্রতিশব্দক চূর্ণ করিয়া বিরাটিলেন; তাই জলরাশি একটা পথ অবলম্বন কবিতে বাতির হয়।

নদীগণ। হে উদ্গাতা, তোমার এই কথাটি বিদ্রুত হইও না; উত্তবৎসরোরা এইকণা উচ্চকণ্ঠে পুনর্বার কীর্তন করিবে। দেব অরি! তোমার পুত্রসমূহের মধ্যে, প্রীতিগহকাণে আমাদের উল্লেখ করিও। মাহুদেব নিকট আমরাগিকে মন্তনির কবির না। অথ হউক তোমার!

বিখ্যামিত্র।—শুন ভগিনীগণ! পদব কণা কণা পাত কর; তিনি শব্দে করিয়া বহুদূর হইতে তোমাদের নিকট আনিয়াছেন; নদীগণ! তোমরা তোমাদের তরঙ্গ সমেত শব্দে অক হইতেও নিজে অননত হও।

নদীগণ।—আচ্ছা স্বর্ষি, তোমার কথাটি শুনিলাম! তুমি দূর হইতে শব্দটোষাচণে এখানে আনিয়াছ। নীতবৎ রমনীর স্তায় আমি তোমার নিকট অবনত হইব; পতির নিকট নববিবাহিতা তরুণী যেরূপ আপনাকে উদ্ঘাটিত করে আমিও সেইরূপ তোমার নিকট আপনাকে উদ্ঘাটিত করিব।

বিখ্যামিত্র।—গোমেঘাদি পত্র অবলম্বনে ঘরাবিত ও ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত ভরত-বংশীরেরা তবে নদী পার হউক। দেবগণ অপ্রতিহত প্রচণ্ড বেগে তোমরা বহিরা যাও, আমি তোমাদের অঙ্গুগ্রহপ্রার্থী। (সময়ের পাঠ; অনিয়মিত ছন্দের পদ্য)।—পত্র অবলম্বনে বহির্গত ভরতেরা নদী পার হইয়াছে। পুরোহিত নদীগণের অঙ্গুগ্রহলাভ করিয়াছে। হে উদারচেতা! তোমরা আপনাদিগকে

শ্রীত কর, আপনাদের পার্শ্বদেশ শ্রীত করিয়া
ক্ষত গমন কর ।

অগবেদ I, ১৯৫ ।—ইশ্রোব সৱ্ভব
মক্ংগণ ইশ্রোব জর যোগ্য করিতেছে ।

ইশ্রা ।—আমার সৱ্ভব ও এক নীড়ের
ভ্রাতা যে তোমরা মক্ংগণ, তোমরা কি প্রচণ্ড
বেগেই প্রণামিত হইয়াছ ? তোমাদের
অভিপ্রায় কি ?

এই নৈবেদ্যগোপন পুণ্যবেদ্য স্বকীয়
কর্তব্যে বিগ্নবিন্দিক প্রতিপন্ন করিয়া কোথা
হইতে আসিতেছে ?

মক্ংগণ ।—ইশ্রা, তুমি একাকী ছইতিতে
কোথা হইতে আসিতেছ ? বাণারটা কি ?
আমরা ইতস্তত গুরিরা বেড়াইতেছি, এই সময়ে
তুমি কিনা আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
বাক্যলাপ করিতেছ । হে পিঙ্গল অধিনিষ্ট
দেব ! বল, আমাদের নিকটে তুমি কি চাও ?

ইশ্রা ।—আমি যজ্ঞের জন্ত, মন্ত্রাদির জন্ত,
শোমের জন্ত বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি ; উহা হইতে
জগৎ উপিত হইতেছে ; আমি আপনাই
প্রত্যক্ষ সবে করিয়া আনিয়াছি । এই সূক্ত
ভলি আমাদিগের আরাধনা করিতেছে,
আমাদিগকে চাৰিতেছে । আমার ঘোটকেরা
উহাদিগের নিকট আমাদিগকে লইয়া
যাইতেছে ।

মক্ংগণ ।—ইশ্রা, যে সকল স্বাকীম পুরুষ
আমাদের খুব নিকটবর্তী, তাহাদের সাহিত
এ নই আমাদের বেগবান দেহ সংযোজিত
করিয়া দিব ; এক্সন দৃঢ়রূপে সংযোজিত
করিব, যাগান্তে তুমি স্বচ্ছন্দে আমাদিগের
নিকট উপনীত হইতে পার ।

ইশ্রা ।—সুসেব সহিত বৃদ্ধ করিবার সমর

যখন তোমরা আমাকে একাকী রাখিয়া গেলে,
তখন তোমাদের সে প্রাণ্য ইচ্ছা কোথায়
ছিল ?

মক্ংগণ ।—হে দেবপুত্র ! সহস্র জর
সাধন করিয়া তুমি আমাদেরই জন্ত অনেক
করিয়াছ । আমরাও যেন ইচ্ছামত বীৰ্য্য
সহকারে বহু বিক্রমের কার্য সাধন করিতে
পারি ।

ইশ্রা ।—হে মক্ংগণ ! কেযোগ্যর যজ্ঞের
ধারা আমি বৃহৎ বধ করিয়াছি । বিচিত্র-
কিরণদীপ্ত জলরাশিতে বহু দ্বারাতে অবাধে
উপনীত হইতে পারেন সেই নিমিত্ত আমিই
বসন্তর ইশ্রা পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি ।

মক্ংগণ ।—হে মধবন্ ! ত্রিকুবনে তোমার
অজের কিছুই নাই । তোমার সমান দেবতা
অন্ত আর কেহ নাই ; কি বর্তমান কি কৃত-
কালের কোন জীবই তোমার সমকক্ষ নহে ।
হে মহান্ ইশ্রা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক !

ইশ্রা ।—এক হইলেও, আমার শক্তি
বিগ্নহী হইবে ; বাহ্য আমি ইচ্ছা করি,
আমার সংকল্প তাহা সংশিদ্ধ করে ; কেন না
হে মক্ংগণ, আমি শক্তিমান । যে কোন
কণ্ঠেই আমি প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই আমি
বিগ্নহী হইয়া বাহির হই । মক্ংগণ ! তোমরা
আমার স্বচ্ছন্দ, আমিও তোমাদের স্বচ্ছন্দ ;
তোমরা তোমাদের স্বচ্ছন্দ ইশ্রোব, প্রতি
যে হুপ্রাণ্য সুমধুর সূক্ত প্ররোপে
করিবে, সেই সূক্তি প্রবণে আমি অনৈন্দিত
হইয়াছি ।

গাহোতা মনের বাগ্য আমার বল ও
মহিমাকে বিবৰ্দ্ধিত করিয়া আমাকে পরিতুষ্ট
কমিতে ইচ্ছা করেন, সেই গুরুপুত্র পুরুষ যে

তোমরা,—হে মরুৎগণ! তোমাদের প্রতি আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি।

কবি।—হে মরুৎগণ, কে এখানে তোমাদের চিত্তকে আশ্রয় করিয়াছে? রহস্তমর অর্ধ সফল সহস্রবোধ্যা করিবাব নিমিত্ত বন্ধুর গৃহে বন্ধুভাবে তোমরা আইল; আমার দর্শ্যভূতনের প্রতি মনোযোগী হও।

যিনি একজন সম্রাট স্বাক্ষর নিকট হইতে আনিয়াছেন, তিনি পূর্ববাবের গোয়া সম্বন্ধে নাই।

অতএব কবির দিকে তোমরা যুগ ফেরান, তোমাদের সম্মানার্থেই তিনি এই স্থিতি গান করিয়াছেন।

হে মরুৎগণ, মন নবন মার্গা নামক কবির রচিত এই গান, এই স্থিতি তোমাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইখানে আমিও তোমরা প্রতি দৃঢ় কর। আমরা তোমাদের জন্য এমন একটি নিবান নির্ধারিত করি যেখানে ক্ষত্রবী প্রচুর ধারা-বিশু বিস্তারিত আছে।

পুত্রের অস্থান পদ্ধতির মধ্যে এই কথোপকথনাদিক স্থিতির প্রয়োগ নাই। সংহিতার প্রাচীন বিভাগ অনুযায়ী ঐ সকল স্থিতি, “সম্বাদ” নামক একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উহাদের মধ্যে, কতকগুলির লক্ষণ ভেদন স্থাপ্য নী বাবায়, ঐ সম্বন্ধে ভক্তের অবসর হইয়াছে; তাই, ধাতু (X, ২৫) এই স্থিতিকে সম্বাদের মধ্যে পরিগণিত; এবং শৌনক উহাকে ইতিহাসের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। অথবা গুলভেন-বর্গ এই সকল স্থিতির প্রকৃতি নির্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। উহার বিবেচনার

ঐক্য স্থিতিগুলি মহাকাব্যগত পত্নীত্বের বিচ্ছিন্ন ভাবাবেশে মাত্র। উহাদের আখ্যানার্থে হইতে সম্বন্ধে উপস্থিতমত প্রাচীন রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ আখ্যান একটা নির্দিষ্ট আকারে পরিণত না হওয়ার বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে। কিন্তু দেবতানিগের ও কবিনিগের বাক্যগুলি, কথোপকথনকারীদিগের সাহায্যে বলতঃ, সুগম্যম্পন্নর প্রযুক্ত হইয়া অনুগ্রহভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

এই অনুমানটি বেশ নৈপুণ্যবাহক হইলেও আমরা উহাতে সন্দেহ নাই। ঐ স্থিতিগুলি এমন স্থাপ্যভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে, উহাতে কথোপকথন একদা প্রকৃতপক্ষে অনুগ্রহ হইয়াছে যে, উহার আখ্যানমূলক টীকাগুলি বাচ্যমাত্র।

এই স্থিতিগুলির অধিকাংশ পাঠ করিলে, সে সময়ে কোন একপ্রকার নাট্য বৃত্তির প্রয়োগ যে হইত তাহা কল্পনা না করিয়া থাকার নাই। ১—১৩৫ স্থিতিতে যে একটু নাটকের ধরণ আছে, তাহা মোক্ষদুলভেরও মনে হইয়াছিল। তিনি বলেন “একজন অনুমান করা হইতে পারে যে, মরুৎদিগের সম্মানার্থে যে যজ্ঞ হইত সেই যজ্ঞে এই মরুৎইজের সংবাদটি আবৃত্তি করা হইত। অথবা দুইটি “কোরোগের” (chorus) মধ্যে একটি ইজের ভূমিকা ও অপরটি মরুৎগণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিত।”

নাট্যাভিনয়ের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব কলা দেই বৈদিক যুগে এতটা উন্নতিলাভ করিয়াছিল, যে তাহার সাহায্যে ভাঁকসমকের সহিত অভিনয় ব্যাপার অনায়াসেই সম্পাদিত হইতে পারিত। যে সাধবেদে, লগ্নবেদের

স্নোকেগুলি তখন সন্মোক্তের উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে, সেই সামবেদ হইতে বুঝা যায়, কতটা পাণ্ডিত্য ও মার্জিত কঠিনসহকারে সে সময়ে ধর্মসম্বন্ধে অধ্যয়ন হইয়াছিল। নৃত্যগীত আর্ঘ্যদিগের গ্রন্থ আশ্রয় ছিল। (অথর্ববেদ V-XII, ১, ৭) “মর্ত্যলোকের মনুষ্যগণ হৃদয়ভর ব্যক্তসহকারে নৃত্যগীত করিয়া থাকে।” (অথর্ব-V, I, ২২, ৪)—আর্ঘ্যগণের যে সকল শাখা পুজার শিবির সন্নিবেশ করে, তাহাদের সহিত অগ্ন্যবনিষ্ঠগতা নর্ত্তনও ছিল, এবং সেই বৈদিক কালেও নর্ত্তন-জগৎ নট্যমোদনগোচর মধ্যমা বৃত্তিরাছিল :—(শংখ শ্রাবণ III ২, ৪৬) “বাগ্‌রা গান ও নৃত্য করে রমণীগণ তাগদিগকে ভালবাসে।”

আমরা বহুদূর জানি, অজ্ঞাত বৈদিক সংহিতার মধ্যে কথোপকথনের আকারে

কেবল একটি দৃষ্টি আছে : অথর্ববেদ-V, ১১ ; পুরোহিত অথর্বনু ধরুণের নিকট, যেতন ব্রহ্মণ একটি গাতীর দাবী করিতেছেন। বরুণ তাহা দিতে বড় রাজি নহেন, কিন্তু পুরোহিতের জ্ঞানগর্ভ বাক্যগুলি অবশেষে করী হইল; এমন কি বরুণ তাহার গতি চিরবন্ধুদের ক্ষমিকার পর্যায়ে করিলেন।

শ্রাবণ ও উপনিষদ, পুরাকালীন পণ্ডিতদিগের বাহ্যজ্ঞানগুলি আরও সম্বাদের আকারে অবতারণা করিতেন; কিন্তু একটীবার অংশ বাহ্যের সহিত নাট্য ইতিহাসের সাক্ষ্য সম্বন্ধ, তাহা রাজসন্যেী সংহিতার (XXX) প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচীন সংস্কৃত ভাষার বাহ্যের অর্থ অভিনেতা, সেই শৈল্যমা পক্ষ প্রায়কদিগের আনুষ্ঠিককালে—সর্গ প্রথমে উচ্চৈঃ পঠিত হয়। (ক্রমঃ)

ত্রিভোজিতিল্লনাথ ঠাকুর।

কাহিনী।

(যে মে নোপার্গ: রচিত Confession গল্প হইতে)

মার্গারিট আজ নৃত্যশাখা! বয়স পূর্ণ বেশী না হইলেও, জ্যাপ্পার্নে, বার্কফোর ষ্ট্রীট রোডগুলি তাহার সঙ্গীতের প্রাণুটি চইয়া উঠিয়াছিল। আনুগত্য খাম, এবং অস্বস্তি বেদনার ষ্ট্রীট মূখ্যজি, বিবৃতি—খাকিয়া খাকিয়া কাপিয়া উঠিতেছিল! যেন সে কি এক ভয়ঙ্করী ছায়া দেখিয়াছে!

শয্যাপার্শ্বে তার হাতখানি ধরিয়া হুঁপিয়া হুঁপিয়া জ্বলেন কাদিতেছিল। জ্বলেন তার জোড়া ভগিনী, মার্গারিট অপেক্ষা সে ছয় বৎসরের বড়। নিকটে একখানি

ছোট টেবিল—যখনই শাখা চাবিরে ঢাকা; তারই উপর ছী বাতি জলিতেছে।

ঘরের চারিদিকে একটা বিধাবের জ্বর কমিয়া উঠিয়াছে,—ভিত্তিবারের এক গভীর শোকের রাগিনী! ঔষধের শিশি, জ্বালেন, বরফ পলি প্রভৃতি কক্ষমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—চোরাগুলা সজ্জিত নহে—অস্বাভাব্যত্ব অধিক যেন কি এক ভয়ে অস্তিত্ব হইয়া গিয়াছে! নৃত্য—ভীষণ কঠোর যন্ত্র—যেন গৃহমধ্যে বৃত্তি বেকায় হইতেছে!

এই ছই ভগিনীর কাহিনী কি করণতঃ

মাথানো! দেশের সৌক সে কাহিনী
তালাই জানিত,—সে কাহিনী শুনিয়া
অনেকেই হুই চারি নিম্ন অক্ষত্যাগ করিত!

সুজেন একদিন এক তরুণ যুগ্ম
এক তরুণী ভাল বাসিয়াছিল—সে ভালবাসা
স্বাভাবিক নয়, উত্তরের প্রেমে উত্তরে জ্বলিত
কি অশুভ্র সুখেই বসে দেখিত!
বিবাহেরও দিন স্থির হইয়াছিল—সব ঠিক—
এমন সময় তরুণ হেনরি মৃত্যু হইল—
সুনারী সুজেনের সকল আশা, সকল সুখবরণ
ভাঙিয়া গেল।

সুজেনের শোকের সীমা ছিল না—
জীবনে সে আর বিবাহ করিবে না বলিয়া
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে প্রতিজ্ঞা শত
অহুরোধে, সহস্র অশ্রুনাভেও অটল ছিল—
বিশ্বাস আচার পালন করিয়াই জীবনের
দিনগুলো কাটাইয়া নিতেছিল!

তারপর এক প্রভাতে, তার বাবদলীয়া
ছেঁটে তিনি মার্গারিট কোলের উপর
পড়িয়া কানিতে কানিতে কহিল “দিদি,
তুমি একাই কি এ কষ্ট ভোগ করবে?
না করবে না। আমি এ শোকের ভাগ নেব,
তোমার সঙ্গ ছাড়বো না। আমিও তিরস্কারী
থাকবো। তুমি স্থির হও, তোমার ছোট বোন
মার্গারিট আজ হতে তোমার হৃদয়ের সঙ্গিনী।”
সুজেন মার্গারিটের কথা বিচলিত হইল।
তখু তার পানে চাহিয়া রহিল—সুখে একটিও
কথা ফুটিল না।

বালিকা আপন সত্য রক্ষা করিয়াছিল।
শিশুস্বভাবের শত শপথ অজ্ঞা, গোটা-
তগিনীর, সাদর অহুবেদ কান্তর দিনতি
সঙ্গে সে বিবাহ করে নাই। অশুভ্র সুখের

মার্গারিট মনজনের প্রলোভনে আপন প্রতিজ্ঞা
হুলে নাই। সে তোড়ার সঙ্গিনী হইয়াছিল।

সারাজীবন হুই তগিনী একত্রে
কাটাইয়াছে একদিনের জন্তেও পৃথক
হয় নাই। মার্গারিটের সুখে কেহ কোনদিন
হাসি দেখে নাই। সুজেনের অপেক্ষা তার
শোক যেন অধিকতর! তাগের একটি
সকল পা দুহুতা তার মুখে-চোখে নিত্য বিরাজ
করিত—তার স্পর্শেই সে অকালমৃত্যু হইয়া
পড়িয়াছিল। শিশু বয়সের সময়ই তাহার
কেশগুলো কুতুভা দেখা দিয়াছে। সে
চিরকল্পা,—যেন কোন এক দুর্ভাগ্য কন্যারোগে
জর্জরিত। আজ সে সুজেনের সম্মুখেই
মরিতে বসিয়াছে।

কাল সারা ছাত্রি দিনে সে একটিও কথা
কহে নাই—মাসে মাঝে হুই একটি কণী
আঠোমার ভিন্ন আর কিছু না। আজ প্রভাতে
অতি কৌশলে সে বলিল “আচাৰ্য্যকে শীঘ্র
জাকো—আস—” একটি অব্যক্ত বস্তুগার
সে শিহরিয়া উঠিল; ছোট ছোট ঈষৎ কাঁপিল
—সুখে একটি তরুর রেখা পড়িল!

শোকবিহ্বল সুজেন বিছানার মূখ
লজিয়া কানিতে কানিতে বলিল “মার্গারিট!
বোন!” মার্গারিট সুজেনের প্রতি কথন ভাবে
চাহিল, কি যেন বলিবে—কিন্তু কথা ফুটিল
না।

শিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শুনা গেল।
যার খুঁটিয়া ভূতা প্রবেশ করিল, সঙ্গে যেত
বস্ত্র পরিহৃত বৃদ্ধ আচার্য্য!

আচার্য্যকে দেখিবামাত্র সুখের বেন বদ
পাইল। সে উঠিয়া বলিল। অজিত স্বরে
কয়েকটা কথা বলিয়া বিছানার চাপন ধরিল।

টানাটানি করিতে লাগিল। আচাৰ্য্য সাইমন নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া শিঙচুৰন কথিয়া নম্রস্বরে কহিলেন “না ভগবান তোমার ক্ষমা করুন, তবু কি মা, মুক্তকণ্ঠে তোমার পাপ স্বীকার কর; এই ত সত্য।”

মার্গারিটের আপাবনস্তক কাঁপিয়া উঠিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে কহিল “বোন্সো নিদি এখানে বোন্সো, তুমিও পোন।” কথাটা বলিয়া মার্গারিট চণিমা পড়িল।

আচাৰ্য্য তাহাকে উঠাইয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। ছুই ভগিনীর দুই হাত ধরিয়া আচাৰ্য্য বলিতে লাগিলেন “হে লগদীশ্বর ইহাদিগকে বন দিন, ইহাদিগকে আপনায় করুণা দান করুন।”

দীৰ্ঘ-ক্লান্ত স্বরে মার্গারিট কহিল “ক্ষমা, দিদি, ক্ষমা কর আমাকে। ওঃ! তুমি যদি জানতে—জীবনে এই মুহূর্তটুকুকে আমি কি ভর করতাম!—”

স্বপ্ননের ঢকে ধরা বহিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল “কি ক্ষমা করবো বোন? আমার জন্তে তুমি কি না করেছ—স্বপ্ন ঐশ্বর্য্য যা কিছু পথই ত ত্যাগ করেছ,—দেখো তুমি, তোমার—”

মার্গারিট বাধা দিয়া কহিল “চুপ কর, দিদি, তুমি জানো না। আমাকে বন দাও, বাধা দিও না। ওঃ, জপে যাচ্ছে!—আমাকে একবারে—সবটুকু—শেষ করতে দাও। পোন,—মনে আছে—হেনরিকে—” সে আর বলিতে পারিল না। স্বপ্নন চমকিয়া ভগিনীর পানে চাহিল।

মার্গারিট আবার বলিতে লাগিল “সব ভালো করে পোন তুমি, না হলে বুঝবে না।

যখন আমার বসে বসে বহর—মনে আছে? সেই বাহো বহর বহর সেই আমি মরেছিলাম। যা মনে এসেছিল তাই করেছিলাম। কেমন করে মরেছি জান? পোন।”

“হেনরি—আহা প্রথম যেদিন সে আসে, —পারে দীর্ঘ বৃট, বোড়ার চড়া। বোড়া থেকে নেমে—তার সে বেশের জন্ত লজ্জা পেয়ে সে ক্ষমা চেয়েছিল। বাবার কাছে সে একখানা চিঠি এনেছিল। মনে পড়ে? না, চুপ করে শুনে যাও। লেদিন—যেদিন তাকে প্রথম দেখি—সে কি দিন! বতকণ সে ছিল ডুরিংকমের এক কোণে দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে আমি শুধু তাকেই দেখেছি—তার প্রত্যেক কথাটি আমার কাণে কি মিটি বাজছিল।—পুরুষ এমন হুম্বর!”

“তার পর আবার সে এসেছিল—কত-বার—চোখ ত’রে তাকে দেখতাম। তখন আমি বাণিকা হলেও আমার জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু খুব সাবধানে থাকতাম, ঘৃণাকরেও তাকে জানতে বিইনি। মনে মনে কত ভপেছি—হেনরি—হেনরি ডি সাম্পারায়! পরে শুনলাম তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে—মনে দারুণ আঘাত লাগল—সে আঘাতের বেদনার তিন রাত্রি ঘুমাইনি। প্রত্যহ সে লঙ্কার পর আপত,—আমাদের খাওয়ার দাওয়ার পর, মনে পড়ে?”

“কথা বলে না,—শোন, কেবু সে বড় ভাল বাসত। মাগন, দুধ দিয়ে, তুমি নিজের হাতে তৈয়ারী করে দিতে,—সে আমার বেশ মনে আছে; প্রেরোগন হলে আমিও তৈয়ারী করে দিতে পারতাম।

“সে এক এক গ্রাসে এক এক খানা

নিঃশেষ করে ফেলে এক গেশান জুয়া গালে
ঢেলে বলত—চমৎকার! মনে পড়ে, কেমন
ভাবে কণাটি পে বলত? হিংসার আমার
দারা বেহ জলে উঠত। দানবী আণা!

বিবাহের বিলম্ব ছিল না।—আর পনের
দিন থাকি! অসহ্য।

আমি ভাবলাম—জ্বলেন, জ্বলেনকে বিয়ে
করবে—না না! আশ্রয় বরষ হলে আমাকেই
পে বিয়ে করবে!

জীবনে কাকে এমন ভালবাসিনি, কাকেও
না, এব এতটুকুও না। কি পে গভীর
ভালবাসা!

পে এক সন্ধ্যায় সমর—বিয়ের ঠিক দশ
দিন আগে জুনি তার সঙ্গে বাড়ীর সামনে
বেড়াছিলে। চাঁদের আলোর চারিদিক ভরে
গেছিল—সেই দেবদাক গাছটার নীচে সেই
বড় গাছটার কাছে তোমাকে পে চুম্বন
করলে,—বুকের মতো মতো টেনে উঃ—
কতক্ষণ, মনে পড়েছে? বোধ হয় সেইই
প্রথম!

বাড়ী ফিবে আমার পানে চাইতে লক্ষ্য
তোমার মূণ রাত্তি হয়ে উঠল। আমার তা
বেশ মনে আছে! আমি তোমাদের দেখে-
ছিলাম। সেই কোপের অড়ালে পাড়িয়ে
আমি সব দেখেছিলাম। কি এক জালা—
আমাকে উদ্ভাব করে তুলেছিল! বোধ হয়
হাতে কিছু থাকলে দুজনকেই খুন করতাম।
পে কি ভীষণ ক্ষণ!

জ্বলেনের সঙ্গে তার বিয়ে হবে! না,
কখনো না—আর কারো সঙ্গে না,—আমি
তা লইতে পারব না! তাকে বড় হীন মনে
হল—এমন লোক পে, আমি আছি, এমন

হৃদয় প্রিদ্ধতন—কিশোরের মোহন স্পর্শে
দীপ্তোজ্জ্বল আমাকে অগ্রাহ্য করে—? না
কখনো না!

তার পর আমি কি করলাম, জানো,—
শোন ভবে। মালী কুঁহুর মাথবার গুচ্ছ
বিধ জানতো, আমি জানতাম। পাথর দিয়ে
ঘোতল গুঁড়া করে এক টুকরা মাংসর সঙ্গে
সে গুঁড়া মিশিয়ে দিত।

মার দর হতে গুণ্ধেব একটা ঘোতল
চুরি করে, তাকে হাড়ি দিয়ে ভেঙ্গে খুব
মিহি করে গুঁড়িয়ে লুকিয়ে রাখলাম। ঘোতল
চুর শুণা স্বকৃ স্বকৃ করছিল, মীরের মত ঠিকরে
পড়ছিল। তার পর দিন তুমি কেন্দ্র হৈমালী
করলে আমি ছুঁবি দিখে ঘোতলচুর তার
ভিতর পুরে দিলাম। তিন খানা কেক পে
খেরেছিল, ছখানা পুস্তকের সঙ্গে ফেলে দিয়ে
ছিলাম। তিন দিন পরে চুটো মাহীদাস মনে,
মুনে পড়ে?

“আঃ! চূপ কর—শোন আগে—

আমি শুধু মরিনি! কিন্তু তবু এ মুকুতা

হেনরি চলে গেল! মনে পড়ে?—শোন,

শুধু তাই নয়। তার পর মনে কি একটা
ভীষণ আতঙ্ক কেবলি যন্ত্রণা!—মনকে
মোকাভাম—দিদির কাছ-ছাড়া ছব না, মরবার
সময় দিদির কাছে সব কথা বলে যাব। এখন
বলা হয়েছে—আজীবন তাই এট মুকুতাই
জন্ত ভাগ্যতাম—কি করে বলব! এখন সব
কথা বলা হয়েছে তবু—!

সকালে সন্ধ্যার দিনে রায়ে কেবলি
ভাগ্যভূম একদিন না একদিন তোমাকে সব
বলব—কেবল দেখিনের প্রতীক্ষার পাকতাম।
সব বললাম তবু ত মন খালি হয় না! কেবল

কি ভয়! যা হবার তা হয়েছে—এখনো ভয়—মনে করতে ভয় হয় যদি তার সঙ্গে দেখা হয়! আজ আমি মরতে বসেছি—দিনি, তুমি আমার কথা কও,—তুমি না কথা করে তার সঙ্গে দেখা করতেও পারবে না আমি! আচাণ্য নগর দিমিকে কথা করতে বসুন, নটলে মুকুতেও আমার শান্তি নেই।” মার্গারিট দিচ্ছিল হটন। সে হাঁপাইতেছিল।

হুজেন দুটো চোখের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ভাবিতেছিল—চেনার,—ভাগ্যকে সে কত ভালবাসিত, সে আজ কতদিনের কথা সে আজ থাকিবে কি স্পষ্ট ন: দিন কাটিত! আহা!

আজ বহুদিন পরে আবার নতুন করিয়া হেনরিকে সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল—সেই এক অতীত দিনের ভাগ্য খেলার মধ্যে হেনরির স্থিতি জাগিয়া উঠিল। হায়! সে কি স্থিতি-

মণ্ডিত স্থানের অতীত অগন্তি! এম প্রিয়তম তে মুকু পথের পথিক, এম আজ হুজেনের কাছে ফিরিয়া এস! আজ হুজেনের জ্বর ভাঙিয়া যায় যে! সেই চুখন! সেই এক, সেই প্রব! তার স্থিতি হুজেনের প্রতি শিরটিকে কাঁপাইয়া জ্বলিতেছিল! তারপর আর কিছুই নাই শূন্য—সকলি—শূন্য—দাক্ষণ হাচাকার!

আচাণ্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হুজেনকে কহিলেন, “মা, দেখ, আর সুখি দেখি নাই—” হুজেন ভগিনীর পানে চাহিল। চোখের জলে দুই অশ্রু হইয়া আসিয়াছিল। ভগিনীর হৃদের উপর পড়িয়া তার অধরে চুখন করিয়া হুজেন কহিল “মার্গট! মার্গট! বোনটি আমার,—কথা, কথা—প্রাণভরে কথা করলাম তোকে!—”

ঐন্দরপ্রমোহন চৌধুরী।



সমুদ্রকূপ।

প্রাগ্য ভারতের একটি প্রসিদ্ধ ভীর্ণ স্থান। ইহার কাপুর্নিক নাম এলাহাবাদ। শুধু হিন্দু ভীর্ণ বর্গেই প্রাগ্যের প্রসিদ্ধি নহে। কি প্রাকৃতিক দৃষ্টে কি ঐতিহাসিক তথ্যে কি প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে প্রাগ্যের গৌরব সমুদ্রকূপ। সর্বপ্রকার কালের অপ্রতিদত্ত-প্রস্তাব লব্ধেও প্রাগ্যে এখনও বহু ধর্ম্মনীর বস্তু বিস্তারিত রহিয়াছে। সমুদ্রকূপ তাহাদের মধ্যে অগ্রতম। উচ্চ ত্রিবেদীসঙ্গমের পরপারে এক কূত্র শাহাডের উপর অবস্থিত।

ঐ কূপের নামকরণ স্বর্গে তিন প্রকার

মত ত্রিনিতে পাওয়া যায়।—পুত্রাতনবিদগণ বলেন যে শুভসংলগ্ন প্রবর্তক কৌপাখী-অমিগতি সমুদ্রকূপ ঐ কূপ খনন করা হইয়া ছিলেন। তাহার নাম হইতেই উহা সমুদ্রকূপ নামে বিখ্যাত। কিন্তু প্রাগ্যের পাণ্ডালা বলেন যে, সমুদ্রের সহিত ঐ কূপের যোগ থাকিতেই উহার নাম সমুদ্রকূপ হইয়াছে। আবার, জমশাদীরপের বিখ্যাত, রামচন্দ্র পিতৃপুত্র ব্রহ্মার্থে বনগমন করিলে তদীর অশ্রুজ স্তম্ভ অগ্ররূপে প্রত্যাবর্তন করাইবার মানসে যখন তাহার অঙ্গগমন করিয়াছিলেন সেই সময়ে

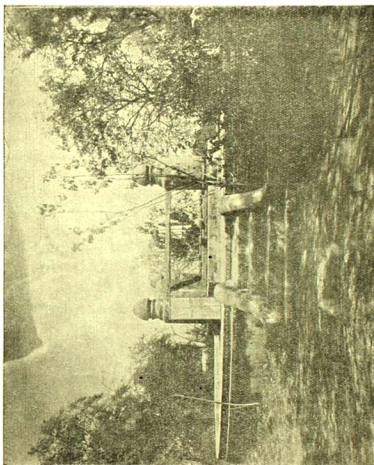
৩৪শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

চরন—সমুদ্রতৃপ।

তিনি সঙ্গে সপুত্রবারি লইয়া যান। গুহোর
সকল ছিল নদী রামচন্দ্র প্রত্যগমন করিতে
সম্মত হন তাহারইশে তাঁহার লগাটে এই কল
চাকটিকা পরাইয়া দিবেন। বিস্ত দাম্পে

প্রত্যাবর্তনে অদ্রুত হওয়ার এই জল তরত
কতাপতিত্রেয় ফলে নিক্ষেপ করেন—গেই
ফলেই উক্ত কুপের স্বষ্টি হয়।

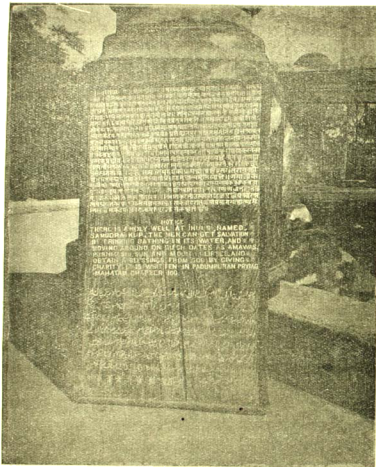
বলা বাহুল্য এইকল পিৎস কলনাকুল



কলপায়শের উর্ধ্বর মতিফলহৃত ভিন্ন
অর্থ কিছুই নহে! আমাদের দেশের অজ্ঞাত

ইতিহাস যেমন একটানা একটা ইন্ট কলনায়
অজ্ঞান থাকে ইহাও সেইরূপ।

যাহা হঠক আগে ঐ কৃষ্ণ পত্ৰ ভৰাট উহাৰ সংগ্ৰহ কৰাটতে আশ্চৰ্য্য কৰিলে স্থানীয়
হট্টাৰা দিওঁছিল। 'কছু দিন হ'ল কো-: মাথু পাণ্ডাৰণ ভাণ্ডেই ই প্ৰকাৰ জ্ঞানহেৰে



সম্ভ্ৰুতপুৰেৰ অত্যাৱহে কো-: ৩ লিপি

কাৰ্য্য কৰিতে নিষেধ কৰেন। তাৰোপৰি বলাবাহুল্য সাংস্কাৰকাৰ্য্য নিৰ্ব্বিঃস্থই
বিধাস ছিল, ঐ কৃষ্ণ পত্ৰ কৰিলে সম্ভ্ৰুতপুৰেৰ লক্ষ্য হইয়াছে এবং প্ৰাচীণেৰ কোনকণ
নিৰ্ভৰতলগালি উচ্ছ্ৰুতিত হইয়া লম্বত পৰাণ অনিষ্ট ঘটে নাই।
ভাণাইয়া দিবে।

মাতৃশয়ন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(মজলিসেবৈজের)

পরদিন মরোভার কাছে মাঝে বারান্দির এক চিঠি গিয়া উপস্থিত।—তারার বাড়ী গল্পীক মাঝেভার নিমন্ত্রণ। চিঠির ভাষায় একটা ছোট্ট ‘পুনশ্চ’কে বরি আর্জেক্টকে সঙ্গে করিয়া এইবার তত্ত্ব আবার বিশেষ করিয়া অগ্ররোধ করা চাইয়াছে।

নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া আর্জেক্ট করিল “আমি তা’বলে থাকিনা!”

মরোভা মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “যাবেনা!—কেন?”

“আমি ঐ রকম জীবনোৎসাহের সঙ্গে আনন্দ করতেই বড় একটা রাগী নই—বাড়ী গিয়ে নেমন্ত্রণ খাওয়া তো পরের কথা!”

“না, তুমিই—বলি—আমার মন প্রায়শই মতি করবে!—নেমন্ত্রণের গেতে পোষ কি? মাঝামাঝি বারান্দির তুমি যা ভেবেছ, তা নয়, আর যদিই তাই হয় তবু আমার পাতিরে তোমার যেতে হবে!—বুঝেছ তো—কাউকেস্কে না বাগাতে লাগলে কাগজ খানা আমদের মোটেই লেগবে না!”

অনেক বলাকহার পর আর্জেক্ট ঘাইতে রাগি হইল।

হারজের উপর জিম্মনের ভার দিয়া মরোভা গল্পীক ইদবে বাসার উৎক্ষেপে যাত্রা করিল। কবি আর্জেক্ট বলিল “তোমরা এখোও আমি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হব!”

মরোভা জিজ্ঞাসা করিল “যাচ্ছো ত?”

“হ্যাঁ।”

মাতৃশয়ন সময় আর্জেক্টের উপস্থিত হইবার কথা। এই আসে এই আসে করিয়া মাতৃশয়ন গেল। কিন্তু আর্জেক্ট আসিল না। ইদা অস্তির হইয়া উঠিল। সে মরোভাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—“কৈ এখনও আসেন না ত? অগ্রহ-বিরহ ক’বল না ত!—তার যে পরীবা!”

মরোভারও বিশেষ জাবনা হইয়াছিল—আর্জেক্ট না আসিলে কাগজের কথা ত তোলাই যাবে না!—আঃ আর্জেক্টটা সব মতি করবে! আর সাড়ে মাতৃশয়ন সময় আর্জেক্ট আসিয়া উপস্থিত হইল।

আর্জেক্টকে দেখিয়া ইদার প্রাণের ভিতর কি যেন একটা অপূর্ণ আনন্দ উপলব্ধি উঠিল। মরোভা বলিল “কিচে এত দেরী?”

“হঠাৎ একটা কাজে দেরী হয়ে গেল!”

ইদার বাড়ী দেখিয়া আর্জেক্ট একটু হুড় হুড় গিয়াছিল—বেশ ত কিছুটা অশান্ত পরভলি। ইদার দবেব আলোব দেখিয়া মরোভা বস অজস্র প্রশংসা না করিলেও আর্জেক্ট মনে মনে একটু লজ্জা হইয়াছিল এবং পূর্ণের মত গল্পীর ভাবে বসিলা না পারিয়া কথাবাতীও বেশ কহিতেছিল।

আর্জেক্ট কথাবাতীর যে নিত্যক অপটু তাহা নয় কিন্তু নিজের কথা ছাড়া সে আর কিছু কহিতে বড় ভাল বাগেনা। ইদার আবার স্বভাব যে কাহারও আশ্রয়কথা বড় বেশীকণ পৈর্ষ্য দিয়া শুনিতে পারে না।

শ্রোতার এই অবৈধ আর্জেন্ট আবার ভাবী চট্টগ্রাম। আর্জেন্টর কথা মাঝে ইদা অনেক বার আপনাব অজ্ঞাতে বাধা দিয়া ফেলিল। আর্জেন্ট এক প্রকার বিতর্কিত নৃষ্টিতে ইদার পানে চাহিল। ইদা সঙ্কট হইয়া গেল—ভাবিল—আর্জেন্ট কেন এমন করিয়া চাহিল? বিরক্ত হইয়াছে? ...কেন? ইদার বুকের মাঝে রক্ত উছলিত হইয়া উঠিল। আর্জেন্টর বিবক্তি ইদার পক্ষে যে সুস্থারও অধিক! ইদার ইচ্ছা হইতে লাগিল,—চাপ ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠে!

ভোজনান্তে সকলে সুসজ্জত বৈঠকখানার গিয়া বসিল। মরোভা ভাবিল কাগজের কথাটা ভুলবার এত ঠিক সময়। বসিল “বেশুণ কাউন্সেল, আপনি যে সেই একখানা কাগজ প্রকাশ করার কথা বলেছিলেন আমি সে সবকে ভেবে দেখেছিলাম...খরচটা যত পড়বে তেমনেছিলাম তত লাগবে না।—”

ইদা অপ্রমত্ত ভাবে উত্তর করিল “হ্যাঁ।”

“বেশুণ এ সবকে আপনাব সঙ্গে একটা পরামর্শ করা খুব দরকার—”

ইদার কানে এ কথা পৌঁছিল কি না সন্দেহ!—সে আর্জেন্টর কথা ভাবিতেছিল—কেন সে এমন চিন্তিতভাবে পরোচাষি করিতেছে!

ইদার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া মরোভা তাহার শত্রুর পানে চাহিয়া একটু হাসিল। তাহার অর্থ—“একবারে বিতোর!”

এদিকে ইদা ভাবিতেছিল কি করিয়া সে আর্জেন্টর মনের বেশ সরাইয়া তাহার মন পাইবে। হঠাৎ একটা মতলব তার মাথায় আসিল। ইদা আর্জেন্টকে করিল—“অনুগ্রহ

করে আপনাব দেই কবিতাটা একবার শোনাবেন—আমার বড় ভাল লাগে!”

কি জানি কেন আর্জেন্টর মনে একটু করণা হইল। বলিল, “এখন কোন কবিতাটা শুনতে ইচ্ছে?”

সেই যে কবিতাটি জিম্মানে পড়েছিলেন—প্রথম লাইনটা তাৎ—

“শেষ, বিদূষ পুত্র—কেহ নহে ছোট—।”

আর্জেন্ট তাহার এই একনিষ্ঠ ভক্তটির প্রতি প্রশ্ন না করিয়া আব লাফিতে পারিল না। বলিল “আমার কবিতার লাইন পর্যন্ত আপনি মনে রেখেছেন দেখছি—দস্তাবাদ!”

আনন্দে ইদার মুখে কণেকের ক্ষুদ্র ব্যাক-দুর্গি হইল না। মুহূর্ত পরে আত্মভাব সংবত করিয়া ইদা করিল “আমার সে কবিতাটি বড় ভাল লগেছিল—ভাল কবিতার লক্ষণই হচ্ছে মনে গেলে থাকে।”

ইদার এই অতিরিক্ত প্রশংসার আর্জেন্টর সমস্ত মুখে একটা গৌরবদীপ্ত মুটিয়া উঠিল। আর্জেন্ট একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিল, তাহার অর্থ—তবু সম্প্রদিকে তার লেখা কিম্বাইরা বের!

জিম্মানে কিছিরার পথে মরোভা আর্জেন্টকে বলিল—“বেশ যদি কামানের কাগজ একখানা বেতার তবে তোমাকে তার সম্পাদক হ'তে হবে!”

মরোভা ভাবিয়াছিল আর্জেন্টকে সম্পাদক হইবার লোভ না দেখাইলে তার ততটা ‘চাক’ হইবেনা, আর আর্জেন্ট ব্যতীত কাউন্সেলের নিকট হইতে টাকা বাহির করাও কঠোর সাধ্য নহে।

মহোত্তর কথার আর্জেন্ট কিছু কিছু উত্তর দিল না! কাগজের কথা সে একটুও ভাবেন নাই। তাহার জীবনে নিমেষের মতো যে একটা প্রকাণ্ড পরিসরনের ‘চলমানিচ্ছা’ সে তাহারই বিপর্যয় ভাবিতছিল! এ পর্যন্ত কোন নারী তাহার মনে এতটুকু মাগ পাড়িতে পারে নাই কিন্তু সহসা আজ এই নারী কি করিয়া তাহার মনের বাধন এত সহজে গুল করিয়া দিল!—

দেই দিন হইতে ইহার প্রতি বাহুতঃ কোনরূপ ভাবান্তর না দেখাইলেও আর্জেন্টর মনোরম নিভৃত পটে যে একখানি নারীমূর্তি দিন দিন ধীরে ধীরে দৃষ্টির উষ্ণিতেছিল আর্জেন্ট নিজে তাহা বেশ স্মৃতিতে পারিয়াছিল!

আর্জেন্ট জ্যাককে নানা কথার মধ্য দিয়া তাহার মনের কথা তাহার বাড়ার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিত। আর্জেন্টর আদরে জ্যাক গিয়া গিয়া তাহারের বাড়ীর ছোট খাট বস কপা সব একে একে তাহাকে বলিয়া বাইত! এক দিন জ্যাক কথার কথার বলিল “আমার বন্ধু আমার পুত্র ভালবাসেন।”

আর্জেন্ট জিজ্ঞাসা করিল “বন্ধু?—তিনি কে?”

জ্যাক তাহার আশ্চর্য্য হইয়া যেল। জিজ্ঞাসা করিল “আপনি বন্ধুকে চেনেন না? ...তা চিন্তেন কেমন করে—তিনি তো এখানে কখন আসেন নি!

“তিনি কত বড়—কি নাম?”

“কি নাম তা জানি না, আমি শু্যক বন্ধু বলে ডাকি,—চের বড়—আপনার চেরেও।”

“তোমার মা তাঁকে কি বলে ডাকেন!”

“মা?—মাও তাঁর ঠিক নাম ধরে ডাকেন না—মুলো!—মুলো! করেন।”

“তোমাকে ভাল বাসেন?”

“পুত্র ভালবাসেন!—যখন তখন আমদের দেখতে আসেন, গমন না আমের পারেন তখন কত ফলটল পাঠিয়ে দেন!—আমিও বড় ভালবাসি তাঁকে!”

“তোমার মাও তাঁকে ভালবাসেন?”

“হা—ভালবাসেন সেই কি!”

জ্যাক সহস্র ভাবেই উত্তর দিতাছিল। কিন্তু ঐ কথার আর্জেন্টর মনে কে যেন খানিকটা ভাব বিচলিয়া গিয়া। দেই দিন হইতে বন্ধুর কথা আর্জেন্টর মোটেই ভাল লাগিত না। তার বন্ধুর উপর আর্জেন্টর কেন এমন ভাব হইল জ্যাক কিছুটা উত্তেজিত পারিগেন। আর্জেন্টকে জ্যাকও ক্রমে আর দেখিতে পারিত না। ইহার উপর জ্যাকের মা আবার আর্জেন্টর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছে দেখিয়া জ্যাক অগ্নিগ্নি হইত! ক্রমে আর্জেন্ট জ্যাকের চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছিল।

ছুটির সময় জ্যাক বাড়ী আসিলে ইহা জিজ্ঞাসা করিত—“তোমার মাতার মতাই আর্জেন্ট তোকে ভালটানো বাসেন?”

জ্যাক মূগ ভাবে করিয়া বলিত—
“হাই!”

মাসে দুইটি বৃহস্পতিবার জ্যাক হাফ ছুটি পাইত। সেই দুই দিন জ্যাক মাতার কাছে থাকিত, খাওয়া দাওয়া করিত। এক বৃহস্পতি বার জ্যাক দেখিল বাইবার ঘরটি বেশ সাজান হইয়াছে—সুন্দরানীওলি কতরকমের ফুলে ভরা! ঘরে তিন জনের বাইবার আসন। জ্যাক মনঃ আত্মবিস্তার হইল—সে ভাবিয়া

ছিল তাহার বন্ধু আজ তাহাদের সঙ্গে ভোজন করিবেন।

এমন সময় মাকে দেখিয়া জ্যাক জিজ্ঞাসা করিল “মা আর একজন কার জায়গা হয়েছে?”

“বল দেখি—বদি এলুতে পার—তবে তোমার একটা খুব ভাল খেলুনা দেব—বল দেখি কে আজ আমাদের সঙ্গে খাবেন?”

জ্যাক ভাবিয়াছিল সে ঠিকই বলিতে পারিবে তাই সে ঠোট দুপানি ঈশ্বর সূণাইরা মাঝের সুখের পানে চাহিয়া বলিল “বলি?—বন্ধু আসবেন!”

জ্যাকের মা হাসিতে হাসিতে বলিল—
“হেলোনা—তোমাদের মাঠার - আর্জেন্ট!”
আর্জেন্ট!

শলকের মধ্যে জ্যাকের সুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। ইহা ভাবিল পুত্র্যার লাভে হতাশ হইয়া জ্যাকের সুখ অমন হইয়া গেল। সে জ্যাককে বুকের—মাঝে টানিয়া লইয়া বলিল—“না—না—খেলুনা পাবে!”

তিন মনে খাইতে বসিল। আজ জ্যাকের মনে এতটুকু সুখ নাই!—ইহা ও আর্জেন্ট গল্প করিতে করিতে খাটতে লাগিল। তাহাদের কোন কথা জ্যাকের কানে বাইতেছে না!—জ্যাকের আর এক দণ্ড দেখানে থাকিতে প্রস্তুত হইতেছে না! আজ—তাহার চারি দিকে বিষাদ!

আহার শেষ হইলে ইহা ও আর্জেন্ট দুই জনে বসিয়া নানা গল্প করিতে লাগিল। আর্জেন্ট তাহার অতীত জীবনের বহু সুখ-দুঃখের কাহিনী বলিয়া খাটতেছিল আর ইহা তখন হইয়া শুনিতেছিল। বেচারী জ্যাক বুঝে

এক খানা ছবির বই দেখিতে দেখিতে ঈশ্বর তত্ত্বাহার হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহা জ্যাককে কহিল—“জ্যাক, যাও—এখানে নুনিও না—কঁতাকে ডাকো!”

জ্যাক সন্ধ্যা দৃষ্টিতে নাথের সুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার ইচ্ছা আর একটু মাঝের কাছে থাকে!

ইহা কহিল, “হি যাত্র আমার, যাও তা নইলে মাঠার মশাই বসবেন!”

জ্যাক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মাঝের আঁজা শালন করিল।

ইহার সহিত আর্জেন্টের বস বসিষ্টতা গাঢ়তর হইতে লাগিল ততই জ্যাক আর্জেন্টের চক্ষুশূল হইতে লাগিল। ইহা আর্জেন্টের জন্ত আর লম্বা সময় করিতে পারে কিছ জ্যাক—তাহার আদরের জ্যাক আতা তার লাজনা তাহার বুকে শেলের মত অগাধ করে! বরং জ্যাককে সে ছাড়িয়া থাকিতে পারে কিছ জ্যাকের কষ্ট তাহার অংশ!

আর্জেন্টের বিনয়ন হইতে জ্যাককে দূরে রাখিবার ইচ্ছার ইহা একদিন স্পষ্টই আর্জেন্টকে কহিল—“চল আমরা অস্ত্র যাই—আমার নগণ কিছু আছে তা ছাড়া আমি খাটতে পারব।”

“আর্জেন্ট” লম্বা হইল না—বলিল “এত শীঘ্র! না আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর—আমার এক আত্মীয়া আছে—এই তার বাবার সময় চরে এসেছে—ঈশ্বরই কিছু শীঘ্র মারা যাবে!—বুঝেছি কি না তখন আর আমাদের বিবাহের কোন বাধা হবে না—”

এই বলিয়া আর্জেন্ট উদ্ভল ভাবভরে

চির অন্ধিতে বসিত । ইদাও মুখ হইয়া
বাইত । এইক্ষণে শীত কাটিয়া গেল ।

একদিন জ্যাক স্নানস্থলে জানালায়
পানে বসিয়া বসন্তের সুনীল আকাশ পানে
চাহিয়া আছে । সেদিন বৃহস্পতিবার । জ্যাক
আর বড় একটা স্নানের বাহির হয় না ।
বসন্তের বাতালে নীতের জড়তা কাটিয়া
গিয়াছে । মনে মনে লোক ছাত্রের বাহির
হইয়াছে । জ্যাক ভাবিতেছিল এই সময় অস্ত
কোণায় যদি যাওয়া হত !

এমন সময় হঠাৎ কে ডাকিল “জ্যাক !”
জ্যাক কিরিয়া দেখে—তাঁহার মা ! তাহাকে
সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বাইবে
বলিয়া আনিয়াছে !—

জ্যাকের আফ্লাদ দেখে কে ! সে তাড়া-
তাড়ি সব গোছগাছ করিবার জন্ত তাহার
ঘরে বাইতেছে হঠাৎ মাত্র সঙ্গে দেবা হইল ।

মাত্রকে দেখিয়া জ্যাক ইদাকে কহিল
“মা মাত্রকে আমাঘের সঙ্গে নিয়ে চলনা !”
তমা কহিল “মাত্রকে কি এরা যেতে দেবে ?”

“হ্যাঁ মা কুমি বলে যেতে দেবে !”

“জ্যাকের নিত্য ইচ্ছা দেখিয়া মাত্র
বাইবার ছুফু পাইল । জ্যাক তখন অত্যন্ত
আফ্লাদিত হইয়া উঠিল, বলিল “মাত্র মাত্র
শীগগীর সব ঠিক করে নাও ?”

মাড়ী করিয়া বাইতে বাইতে জ্যাক
জিজ্ঞাসা করিল—কেমন, মাত্র বেশ—না !”

মাত্র চারি দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল
—“বেশ !”

সমুদ্রতীরের একটা ছোট্টোলে আহাতিদি
করিয়া জ্যাকের মা বলিল “চল এখনকার
চিড়িয়াখানা দেখে আসা যাক্ !”

তুনিয়া জ্যাক ও আনন্দে লাফাইয়া
উঠিল—বাঃ—বাঃ বেশ!—মাত্র কখনও
চিড়িয়াখানা দেখে নি—তারও দেখা হবে !”

এতক্ষণ মাত্র জ্যাকের বাহিরে পড়িয়া
বলিতেছিল তার আবেদন হইতেছে । কিন্তু
চিড়িয়াখানা দেখিয়া বাস্তবিকই সে প্রীত হইল !
কত দেখের কত শত পশুপক্ষী বন্দী হইয়া
রহিয়াছে—কেন ?—তুখু মাহুঙ্গের স্নেহের
জন্ত ! চিড়িয়াখানার উচ্চ স্রোতের দেখিয়া
জিমনেশের উঁচু দেওয়ান মনে পড়িল—তার
বুট্টা কাঁপিয়া উঠিল । মাত্র তাবিল, তার
অবস্থা এই সব জন্তর অপেক্ষা কতটুকু
উঁচুতে ?—খুব কম ! সেও মাহুঙ্গের চোখে
বন্দী—এবার তাই ?—অসহ্য পশুপক্ষীর
নীরব শব্দনা মাত্র আপনার বৃকের ভিতর
অজুতব করিতে লাগিল ।

চঠাৎ মাত্র দেখিল এক প্রকাণ্ড হাতী
চড়িয়া অনেকগুলি নরনারী মাত্র দিকে
আসিতেছে ! সূর্য্যের স্পর্শত কিরণ তাহাদের
উপরে পড়িয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল ।

হাতী দেখিয়া সব্বেশের কথা মাত্র মনে
পড়িল । বসন্তের স্মৃতির সঙ্গে মাত্র অত্যন্ত
মোভাগ্যের কথা মনে আসিল । অতীতের
স্মৃতি মাত্র বর্তমান গুরুত্বের কথা যেন
জাগাইয়া দিল । মাত্র যেন কি রকম হইয়া
গেল ! জ্যাক বলিল—“মাত্র—মাত্র কি হেরচে
তোমার ?”

মাত্র কোন উত্তর দিতে পারিল না । তার
পর যখন সে তুলিল সেও ইচ্ছা করিলে হাতীর
উপর চড়িয়া চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে পারে
তখন তাহার মুখের বিবর্তন্য কাটিয়া গেল !

জ্যাক বলিল “তুমি তবে হাতী চড় আমি

মার কাছে থাকি। তাহারা মাতৃপুত্রের তই
কেনে মাহু হাতীর উপরে উঠা দেখিতে
লাগিল। মাহু কি স্বাভাবিক ক্ষিপ্ৰগতিতে
হাতীর উপর উঠিল!

হাতীর উপরে উঠিয়াই মাহুর মেঝা
ফিটিল গেল। তাহার মনে হইতে
লাগিল সে যেন আবার বদশে ফিরিয়া
গিয়াছে... তাহার নিজের ভাঙা... পলকের
মধ্যে চোখের সামনে দাহমীর ভাঙা প্রসাদ যেন
দেখিতে পাইল—রণবাত্ত যেন কাণে আসিতে
লাগিল—সে যে মরোভা! ভিমনেসেব একজন
লাঞ্ছিত ছাত্র একথা সে মনেই করিতে পারিল
না!

মাহু হাতী চড়িয়া অনেকক্ষণ বেড়াইল।

কেনে বেশ গেল—মাহুকে হাতী হইতে
নামিতে হইল!—আবার যে মাহু—সেই মাহু!—

ঘাটা ফিরিবার সময় হইল। ক্যাকের
মনের আর সে আনন্দ নাই! ইদাও বিমর্ষ
চিত্ত!—কি যেন বলিবে—বলিবে করিতেছে
কিন্তু মূণ কুটীরা বলিতে পারিতেছে না।
অনেকক্ষণ এই রকমে গেল।

অবশেষে ইদা ডাকিল—“ক্যাক!”

“ক্যাক মাকে তড়াইয়া ধরিয়া বলিল
“কি—মা?”

ইদা ক্যাকের মুখের দিকে খানিকক্ষণ
চাহিয়া রহিল। পরে বলিল “তোমার একটা
কপা... বলব... তোমার তুণ হবে... কিন্তু...”

ক্যাক শব্দবাক্তে বলিয়া উঠিল—“না মা
তবে, থাক—বেশ না!”

“না ক্যাক আমার বলতেই হবে—কিছু
দিনেব কত্রে আমার একটু দুই যেতে
হবে—”

“মা!”

“ছি—কেন না!—” আমি তোমাকে চিঠি
লিখব—আর বেশী দিনও থাকব না!—”
বলিয়া ইদা ক্যাককে সাশ্বনা দিতে লাগিল।

ক্যাক শুধু গাধাঘের মত আড়ষ্ট হইয়া
বসিয়া রহিল—চোখের—তই কোণে তই
বিশু জল! সময় বিখটা যেন এক যুদ্ধের
অস্তরঙ্গ হইয়া গিয়াছে।—চারি-ধারে বিষাদ
—বাধা—নির্মমতা!

ইদার কোলের কাছে বসিয়াও ক্যাকের
—মনে হইতে লাগিল—সে কাল—মাতৃহীন
—একা, অসহায়! (ক্লমণঃ)

বিদায়।

(টেনিসন হইতে)

শীঘ্র শীঘ্র সহে যাও মধুগা তটিনী!

সুদূর সাগরে মিলো দেয়ে;

আমি আর আসিব না, ভ্রমিব না ভীরে,

রহিব না তল পানে চেয়ে।

বহে শীঘ্র, বহে যাও চুম্ব তুণ তুমি,

নির্ভরিশী তরঙ্গিনী পরে,

যেখার চরণ নাহি পড়িবে আমার,

চিরদিন, চির দিন স্তরে।

হাসিবে তোমার জলে সহস্র তপন,

মৃত লগ্নি জোছনা ঢালিলে,

কেবল দ’বনা আমি, হেরিতে সে শোভা

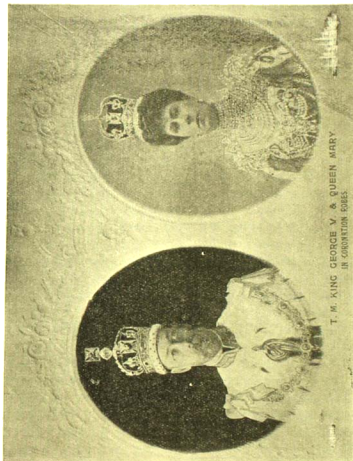
চির স্তরে বিদায় আনিবে।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী।

সম্রাট জর্জের রাজ্যাভিষেক।

বিষয় ২২ শে জুন বৃহস্পতিবার সম্রাট জর্জের
রাজ্যাভিষেক হইয়া গেল। পেরিনকার অধুতপূর্ণ
যোদ্ধা দৃষ্ট বৈদ্যগণ কণ্ঠ পুদিবীর বাবা হন হইতে

লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি লণ্ডন সহরে সমবেশ হইয়া-
ছিলেম। সংগে বংশের প্রতিম্বা ইংলেতে রাজ্যাভিষেক
ব্যাপার বিশেষ সমারোহ গয়: নাবাবির কণ্ঠাঙ্গুসারের



সম্রাজী বেলী।

সহিত লন্ডন হইয়া আসিয়াছে বিস্ত্রীকভাবে সৌন্দর্যে
সাজীয়ে পূর্ণবস্ত্রী কোন রাজ্যাভিষেক ব্যাপার
যজ্ঞমান ঘটনার সহিত তুলিত হইতে পারে না। এই

পূর্ণ উপলক্ষে লণ্ডন সহরে যে অপরিসংখ্য জনগণ
অবাহিত হইয়াছে তাহার নিদর্শন ইতিপূর্বে কোথাও
দেখা যায় নাই। এক ইংলেতের রাজকোণ হইতে,

মুদ্রিত হইয়া পড়িতেছেন, অমনি সেবিলাস
তাহাঙ্গিলকে দেখা করিবার জন্য বোড়িমা আসিতে
ছেন। ষ্টিক কুট্টার সময় ওয়েষ্টমিনিস্টার পিঙ্কাবায়
উদ্ঘাটিত হইল। কত অত্যাচার নটনার সাক্ষ্যদ্বারা সেই
সভার দ্বানে আসি কি বিভিন্ন পূণ্য মুক্তকণ্ঠে অভিনয়
হইল। অতি প্রাচুর্যে হইতে নকটমালা অনিচ্ছিত
ভাবে রূপান্তর ওয়েষ্টমিনিস্টার পিঙ্কাবায় হাঙ্গেনে
উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রত্যয়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন
ছিল কিন্তু ১ টার সময় সম্রাটকে আনন্দিত করিবার
জন্যই যেন একবার সূর্য্যবের মেঘের অবসান হইতে
চেষ্টা করিলেন। আবিষ্কার হইতে সঙ্গরণী
সূর্য্যবের উল্লেখের একটি মুক্ত কখনও স্বপ্নকালে
অসম্ভবিত হইবে নাই। যে পথ দিয়া রাজা ও রাণী
ওয়েষ্টমিনিস্টার পিঙ্কাবায় পয়ন করিয়াছিলেন তাহার উত্তর
পার্শ্ব দৃষ্টের বর্ণনা অসম্ভব। পূর্ণা, পের, পত্যাকার,
এবং বিভিন্ন চোয়নসমূহে সুসজ্জিত সমুদায় রাজপথ
ইঙ্গুপ্তার সূচনা বোধ হইতেছিল। কয়েক টা
বাগিল ভবন সমুদায় অতিশয় সজ্জিত
সুসজ্জিতভাবে অভিব্যক্তি হইতে উপস্থিত হইতে
লাগিলেন। পিঙ্কাবায় সমুদায় রাজসভার বর্ণনা
নকট সৌন্দর্য্য মনোহরতার স্তর চলিতে লাগিল। এই
অকারে বেশিতে বেশিতে সাত সময় সম্রাট উচ্চস্বর
আনন্দিত হইয়া উঠিতে ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ হই সমুদায়
সেই বিরাট অভিব্যক্তি হইতে পূর্ণ হইয়া গেল।
অভিজ্ঞাতবর্ণের বহির্গমন সভাপূর্ণের উত্তর ভাগে
সমাধীন হইলেন। তাহার পরে পরিচালক বহুসংখ্য,
কর্তৃক বিভিন্ন দীপকসমূহ, স্রোতের স্রোতে
তাহার স্রোত স্রোত হইয়া গিয়াছিল। নকট সম্রাট
রাজসভায়—তাঁহার অভিব্যক্তি বীর বীর আসনের
নিম্নে মুক্ত ভাগ করিয়াছেন। বেলার সমুদায় তাহার
বিভিন্ন বিদ্যায়—রাজসভা, রাজসভা, সূর্য্যবায়
অকৃতি অভিব্যক্তির সমুদায় উপস্থিত দেখা হইতে
বিস্তৃত। সকলে বসন্তের পদবর্ণনামূল্যের ব
ভিত্তিত আসনে উপবেশন করিলে পর সক্রিয়তা
যে চারিত্রিক সঙ্গীত হইয়া উঠিল।
সাত্রে আট ঘটিকার সময় সমুদায় পথ পরিষ্কৃত

হইয়া গেল। আর একবার নকট ও চলিত
হইল না। ১০টা বাজিতে বাজিতে সকলে অভিব্যক্তি
পূর্ণ দেখা হইতে উপবেশন করিয়া উত্তর হইয়া গেল
লন্ডনের বর্ণনায় বহিলেন।

এদিকে বাকিংহাম প্রাসাদে রাজার বিরাট পোতা-
খাচার বাহিনী সুসজ্জিত ভাবে প্রস্থান করিতে
লাগিল। প্রথমে রাজপরিবার ব্যক্তিগণ, সর্ব্ব
সুন্দর ও সজ্জিত অঙ্গুর হইলেন। তৎপরে
পাঁচবাগি সুসজ্জিত নকটে রাজকুমার রাজপুত্র-
পত্র রাজকুমার উচ্চস্বর কর্তৃক প্রেরিত। ইহার পরে
নকট মাঝে প্রেরিত ও তাহার স্ত্রী রাজকুমারী
সৌন্দর্য্য ও কনিষ্ঠ রাজপুত্র উপস্থিত হইলেন। তাহার পরে
এসময় উচ্চস্বর মুক্তি বর্ণনায় রাজের বর্ণনায় পোতাখাচার
আনন্দজনক করিয়া উঠিল। তৎপরে রাজার অঙ্গুর
সেবার স্তর, কনিষ্ঠ,—এবং রাজা ও রাণী নকটে
পূর্ণা করিয়া করিয়া কখনো পানিত হইল। কি
আনন্দ। ষ্টিক এই মুহূর্ত্তে প্রেরিত দেখালা অঙ্গুরিত
করিয়া তাহার কনিষ্ঠ স্ত্রী বহিলেন। ১০টা
স্বর্গত অঙ্গুর বর্ণনায় মুক্তা করিতে করিতে রাজা
রাণীকে বহন করিয়া চলিল। রাজসভার
পাঁচতেই প্রথমে পোতাখাচার সমুদায় রাজ সেবা—
যোদ্ধা সম্রাট হইয়া আনন্দপূর্ণে অঙ্গুর
করিল। রাজা রাণী বর্ণনায় রাজের—সর্ব্ব
আনন্দে আনন্দ হইয়া অঙ্গুরিত সমুদায় স্তর
কম্পিত করিয়া চলিল। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ
হইতে ওয়েষ্টমিনিস্টার পিঙ্কাবায় পূর্ণ আনন্দ করিল
তৎপরে পর উচ্চস্বর অভিব্যক্তি হইতে লাগিল।
সেবিতার কোটা কনিষ্ঠ অঙ্গুরিত সম্রাট সম্রাজ্ঞীর
কনিষ্ঠ স্ত্রী হইয়া বাকিংহাম প্রাসাদ হইল।

রাজসভার পরেই—সর্ব্ব স্ত্রীর বর্ণনায় মুক্তি
অঙ্গুর করিলেন। তাহার পত্যকে তাহার স্তর
কেন্দ্রীয় উচ্চস্বর ও উচ্চস্বর বর্ণনায় স্তর
বর্ণনায় বর্ণনায় আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল।—
এইভাবে সেই বিরাট পোতাখাচার বাহিনী
ওয়েষ্টমিনিস্টার পিঙ্কাবায় উপস্থিত হইল। সর্ব্ব
বিশেষ স্তর, সর্ব্ব রাজকুমার ও রাজকুমারী ১৩।

গৃহে অবশ্য কঠিন সংগোচনে সমাপ্ত সন্ধানিত হইয়া নীর নীর আদ্যে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে গাটীরবেশধারী সুবোধ হাই-লাটারের ঘেমে সজ্জিত সজ্জগণের সবিচ সভা গৃহে অবশ্য করিলেন। সমুদায় রাজপরিজন তাঁহার অঙ্গসঙ্গে করিলেন। সুবোধের এক হস্তে সুবোধের টুপী অপর হস্তে হুট্ট। অবশ্য সুবোধ নীর নিশ্চিষ্ট আদ্যে অবশ্য করিলেন। তাঁহার সমুদায় বিদ্যা সমুদায় রাজপরিজনের অঙ্গসঙ্গে হইতে লাগিলেন। সুবোধের সমুদায় একে একে সকলকেই সমুদায় করিলেন। রাজসুদারী দেবী অঙ্গল বেলে সজ্জিত হইয়া হুট্ট হস্তে অঙ্গল হইলেন, তৎপরে পুরোহিতগণ বর্শন দিলেন। একজন মানীর দণ্ড, হুট্ট অঙ্গল হস্তে করিয়া অঙ্গল হইলেন। তাঁহারে পশ্চাতে অঙ্গল হস্তে পুরোহিতগণের যথা-বর্ণিত হইয়া নীর পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন রাজার "সভাতে তাঁহার পার্শ্ববর্তী সন্মান মহিলাগণ। তৎপরে, রাজবস্ত, তরবারি, পোষাক অঙ্গল হস্ত করিয়া রাজার অঙ্গলগণ একে একে বর্শন দিলেন। এই সকল সামগ্র্য গিলের পশ্চাতে অঙ্গল হস্তে নীর পার্শ্বক্লে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাষ্ট্রকে বর্শন মাঝেই সমুদায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারে অবশ্য। পশ্চের বিকে চাহিয়া বসিলেন। রাজ-দর্শন মাঝেই সমুদায় জনিত হইয়া উঠিল এবং ভয়েভিষিটার জ্বলন্ত তাজপা লাটিনতায় অস্ত্রবস্ত পাঠ করিল। রাজপরিজনের সমুদায় যে অপূর্ণ আদ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাতে কান্ডের পশ্চ, কেনেডার বেলে, খোলাপ, খিলি। অস্ত্রিত সুবোধের সমুদায় সা কতিক চিত্র সকল বিচিত্রভাবে চিত্রিত ছিল।

রাজ্যাভিষেক সিদ্ধি ।

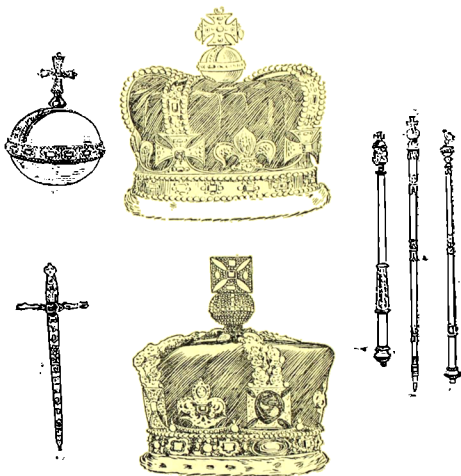
রাজা ও রাষ্ট্র দেবীর সমুদায় আশিষ্য অবশ্য সমুদায় হইয়া ইবর অঙ্গ করিলেন,—তৎপরে অভি-বেক সিদ্ধি আরম্ভ হইল। রাজা রাষ্ট্র ইবর অঙ্গ করিয়া ব ব আদ্যে উপবেশন করিলে

রাজপুত্রোচিত উচ্চকণ্ঠে অঙ্গসঙ্গে উত্তর বক্ষণ পূর্ণ পশ্চিমে বৃষ ক্রিয়াই এইকণ্ঠে অঙ্গসঙ্গে, "মাঝি এই সাম্রাজ্যের ভারসমস্ত রাজা গন্ধ অঙ্গকে আগুনানিরে নিকট উপস্থিত করিতেছি আগুনানি কি ইহাকে রাজ্যোজিত সেবাভক্তি বারা সমুদায় করিতে ইচ্ছুক আছেন।"

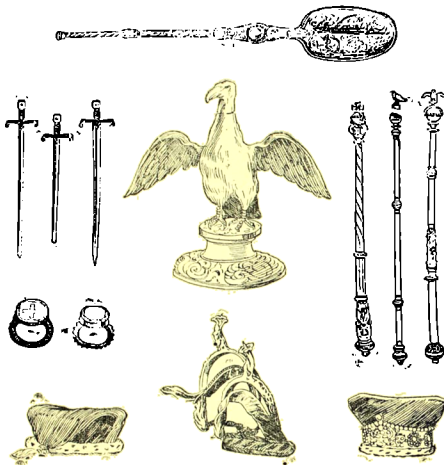
পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডায়মান রাজাও উত্তর বক্ষণ পূর্ণ পশ্চিমে করিতে লাগিলেন। সমুদায় সমুদায় রাজা গন্ধ অঙ্গ দীর্ঘকালি হউন বলিয়া অঙ্গসঙ্গে বসিয়া অস্ত্রবস্ত অঙ্গ করিলেন।

তৎপরেই অঙ্গল হস্তে বসিয়া উঠিল। অভিষেকের উপকরণ সমুদায় যথাযথানে সজ্জিত হইলে, আচাৰ্যগণ সমুদায় আর্থনা ও সমুদায় করিলেন। রাজপুত্রোচিত তৎপরে রাজার কল্যাণ আর্থনা করিয়া বাইবেল পাঠ করিলেন। রাজা রাষ্ট্র এবং অঙ্গল সকলেই বসুদায়ন থাকিয়া তাহা অবশ্য করিলেন। তৎপরেই ইবরকে বর্শাভাষ্য উপবেশ পাঠ করিলেন। উপাসনার সময় রাজার বস্তক অব্যাহত ছিল—উপবেশ অবশ্যকালে সমুদায় টুপী পরিধান করিলেন।

উপাসনান্তে রাজা রাজবর্শপালনের সমুদায় বিনিপূর্ণক আভিষা করিলেন। পাদিষ্যকেট অস্ত্রিত বিধিসমুদায়ের ভারসমস্তভাবে প্রা-বর্শ অঙ্গল হস্তে রাজা তৎপরে করিতে এবং ইংলণ্ডের অস্ত্রিত বর্শবিধি অঙ্গসঙ্গে বর্শদায়ক পালন করিতে ও তাহার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অস্ত্রিতের পর রাজা আদ্যকাল করিয়া অঙ্গল সমুদায় বক্ষণ হস্ত বাইবেলের উপর রাখিয়া সমুদায় অস্ত্রিত। পশ্চের বাক্য করতঃ "ইবর আদ্য অস্ত্রিত। পালনে সমুদায় হউন" বলিয়া বাইবেল চুবন করিলেন। তখন রাজা রাষ্ট্র উত্তরে সমুদায় হইয়া উপবেশন করিলেন ও সমুদায় স্তিত হইল। অস্ত্রিত যথাযথ অস্ত্রিতকল্পিত সমুদায় হইল। অঙ্গলভাষ্য সমুদায় উজ্জায়ন পূর্ণক পশ্চি উঠল বারা রাজার সমুদায় হস্ত ও বক্ষণ দিক করিলেন। ঐশ্বর্যভিষেকের পর রাজা তাঁহার পিতা এডওয়ার্ডের সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহাকে তৎপরে অঙ্গল



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)



କାନ୍ଥିସେବକ ଓ ମହାରାଜାଙ୍କ ନାମାଂକିତ ;

- (1) Spoon for anointing.
- (2) Swords of Justice, Mercy and Spirituality.
- (3) Golden Ampulla.
- (4) Queen's Sceptres and Ivory Rod.
- (5) King's and Queen's Rings.
- (6) King's Cap of Maintenance.
- (7) The Golden Spurs.
- (8) Queen's Cap of Estate.

রাজবণ্ডে সন্ততি বিভিন্ন রাজচিহ্ন সকল স্বয়ং সন্ধানের
 ক্ষমতা ছিল। এই অক্ষরে রাজার দক্ষিণ হস্তে
 রাজবণ্ডে বাহ্যেতে রাজকীয় খেলের পার্শ্বে তরবারি
 সন্ততি প্রোথিত হইল—এই রাজবণ্ডে পরিধান
 করিলেন। তখন অখানোচাণী মুহুর্তপ্রে রাজ-
 সন্মুখে সত্যমান হইয়া পশ্চিমে অস্ত্রোচ্চারণপূর্বক
 বীরপতীরভাবে রাজার সম্মুখে মুহুর্ত পরাইয়া
 দিলেন। রাজা মুহুর্তস্থগত হইয়াবাত্র সমবেত
 সকলি সজলনি করিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ
 সমুদায় রাজস্বত্বপূর্ণ বীর বীর সম্মুখে মুহুর্ত
 পরিধান করিলেন। যেরূপ রূপে তরবারি
 বাজিয়া উঠিল এবং লগুন টাউয়ার হইতে পতীর
 ধর্কনে কানান সানিত হইয়া গমন কর্ত্তের মুহুর্ত
 পরিধানসংবাদ সমুদায় সহজে প্রোথিত করিল।
 কানানপূর্ণি গুনিয়া সহস্রস্বর আনন্দসঙ্গীত হইতে
 লাগিল—জয়বাহা! বাজিয়া উঠিল, গোকে চুপ্তি উঠাইয়া
 নৃত্য করিতে লাগিল। জয়গানসম্বন্ধে হইলে আচাৰ্য্য
 রাজ্যেত বাইবেল উপহার দিলেন এবং আশীর্বাদ
 করিয়া হস্ত বহিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন।

বস্তুভা স্বীকার।

রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে প্রথমানোচাণী প্রথমে
 রাজার নিকট অবনতভাস্ত্র হইয়া বস্তুভা স্বীকার
 করিলেন। তৎক্ষণাৎ সমবেত সমুদায় আচাৰ্য্য
 উপাচাৰ্য্যগণ ব ব আসনে অবনতভাস্ত্র হইয়া
 বসিলেন। প্রথমানোচাণী বস্তুভা স্বীকারান্তর রাজার
 বামপাশে চুপন করিলেন।

তৎপরে বালকমুখরাজ পুণ্ডিয়া
 রাজার নিকট সতভাস্ত্র হইয়া স্বীকার

করিলেন। দুবতালের সঙ্গে সঙ্গে রাজপরিবারের
 সকলেই মুহুর্ত উত্তোচন করিয়া সতভাস্ত্র
 হইয়া পুনরাত্মের সমিত সম্মুখে বস্তুভা
 স্বীকার করিলেন। পুনরাত্ম বস্তুভাস্ত্র হইয়া রাজার
 মুহুর্ত স্পর্শ করিয়া তাঁহার বামপাশে চুপন করিয়াবাত্র
 রাজা পূজকে সম্মুখে বসে দায়ন করিয়া চুপন
 করিলেন। তৎপরে একে একে ডিউক, মার্কুইস
 ডিস্কাউট প্রভৃতি রাজবংশীয়গণ আসিয়া রাজার
 বামপাশে চুপন করিলেন। পরিচয়ে সকলে সম্মুখের
 রাজা স্বীকারি হইলেন বহিরা কলসনি করিয়া উঠিল।
 মতাকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজী বৈদ্যের আভিষেক
 হিষ্টা সম্পন্ন হইল। তাঁহার সম্মুখে মুহুর্ত
 দক্ষিণ হস্তে রাজবণ্ডে বামহস্তে সজলনিপন্নিত স্বয়ং—
 যাদী অবস্রকারে সম্মুখে হইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট
 রাজাকে অভিষেক করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট
 হইলেন। এই অক্ষরে রাজসম্মুখে সম্মুখে হইয়া
 রাজবণ্ডে হস্তে রাজা ও রাজী মনোরমভাষ্য করিলেন।
 রাজবণ্ডে মুহুর্তস্থিত রাজাচার্য্যকে সইয়া নিম্নে
 গম্বিরা রাজসম্মুখে প্রত্যাহ্বান করিল।
 রাজসম্মুখের ধর্ককণ আকাশ বিদ্যায় স্বয়ং সজলনি
 করিয়া উঠিল। পৈনিক পুরুষগণ আসনে তরবারি
 উর্ধ্বে নিষ্কেপ করিল। এইরূপে সন্ততিপূর্ণ সম্মুখের
 রাজাচার্য্যের অভিষেক হিষ্টা সম্পন্ন হইল। অসম্মুখ
 তাঁহার তরবারি প্রদর্শন প্রদূরে পাতিয়া
 সেই শুভ দিনে তাহাজের প্রাণে সহজে সন্ততি
 সন্ততিঃকরণে সেই মহোৎসবে যোগদান করিয়া
 এবং নিম্নবর্ণনায় রাজাচার্য্যের অভিষেক পূর্ণিমাযোজ
 সম্পন্ন দেখিবার আশার সমুদয় হইয়া আছিল।

কেতকী।

অর্থ। লয়ে পূজ করে উর্ধ্ব মুখে আছি এতীকায়,
 আদ্যের সার্থক কত, ভগ্নো শির যৌন বনোহর!
 কটকী কেতকী আছি, মুটেছি কাঁটার বনে হার,
 তবুও বস্তুভা হুঁমি কর ঘোরে ভীষণ দুখার।
 মুটেছি কাঁটার বনে, লগের শাশনেন করি বাল,
 অস্ত্র অস্ত্র বাক্যে যেন যেন হুঁমি হুঁমি দালিত;
 চৌদিকে খসিয়া উঠে ভূজের পরল দিখান,
 সদা সপঞ্জিত আশ, সপ্তমান, দেখে মুহুর্তিত।

জটিল সম্মুখের যেহা মুক্তিযোদ্ধা রান মনোভলে,
 ভোবারি বৈদ্যানে থাকি পশ্চিমা তরঙ্গপূর্ণ বহি;
 যেখের পশাণ বনে, বিবি ভাঙে জোনাকী সে অর্থ,
 কুঁড়িত এ আশ যেরূপ হুঁমি হুঁমি হুঁমি করি।
 সন্ততি সন্ততি কাঁটা করে সন্ততি সন্ততি,
 সন্ততি-পশাণ আশ, আশিত নহে সে তোমার,
 তবুও সার্থক করি লও ওগো লও কোনো যজ্ঞ
 কটকের হুঁমি সনে লোভের পৌর আশার।
 প্রিয়ভোজনাশ বস্তু।

মধুমক্ষিকা ও ফলোৎপত্তি।

লন্ডনের ডেনিমেল শত্রিকার প্রলেপক W. D. Inyang মহাশয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে মধুমক্ষিকার মধ্যে এক প্রকার সংক্রমক বাধির বিবরণ আলোচনা করিয়াছেন। ঐ বাধির নাম "Isle of Wight" বাধি; কারণ উহা প্রথমে ঐ দ্বীপের মধু চক্রেই আবিষ্কৃত হয়, পরে সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া অসংখ্য মধুমক্ষিকার শব্দ শ্রবণ করে। মক্ষিকার সংখ্যা দ্রুত হওয়ার পরিণামে এত দেখা গেল যে সে বৎসর তাৎক্ষণিক উজ্জানেই ফলোৎপত্তির সমুদ্র স্রোত হইয়াছে এবং ফলও নিত্য ক্রমে অধিক হইতে ও নীরস হইয়াছে। প্রথমে ইন্ডাউ সাহেব স্পষ্ট বুঝাইয়াছেন যে উৎকৃষ্ট ফল পাঠিতে হইলে মধুমক্ষিকার সাহায্য ছিন্ন উপাচার্য নাই। এমন কি তাঁহার গবেষণার পর একটা প্রণয় চলিয়া আসিতেছে "No bees no fruit" "মৌমাছি না থাকিলে ফল হয় না"। বর্তমান প্রবন্ধ উক্ত লেখক মহাশয়ের ভাব মাত্র লইয়া লিখিত হইল।

প্রথমতঃ মধুমক্ষিকার বিধি কিছু স্থল জ্ঞাতব্য আছে। মধুমক্ষিকা পতঙ্গজাতীয় প্রাণী এবং সকল পতঙ্গের জায় উহারই তিন প্রকার। (১) পুংমক্ষিকা বা পুরুষ মাছি (Drone); (২) স্ত্রীমক্ষিকা বা রানী মাছি (Queen Bee) এবং (৩) নপুংসক (Worker Bee)। পুংমক্ষিকার দেহ বৃহৎ, মস্তক বৃহৎ ও গোলাকার, এবং পক্ষ দুইটিও সমধিক বৃহৎ। উহাদের "হল" (sting) থাকে না, এবং উড়িবার সময় ডানার শব্দ হয় না। উহাদের জীবনের

একমাত্র উদ্দেশ্য রানীমাছিকে ভিষণী করা। হৃদয় আকর্ষণে উড়িবার কালে ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং অনতিবিলম্বে পুংমক্ষিকা মরিয়া যায়। সমগ্র মৌচাকের বসন্তালি মাছি থাকে তাহার প্রায় এক চতুর্থাংশ পুরুষ এবং মাত্র একটি রানী। রানীমাছির দেহপ্রত্যয় লক্ষ্যপেক্ষ বৃহৎ, পক্ষ ও লম্বা, মস্তক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। উহাদের হল থাকে। সকল মক্ষিকাই রানীকে অত্যন্ত ঘেহ ও সমধিক মস্তক করে। বিপদে আপদে রানীর চতুঃপার্শ্বে বহুলাংশক নপুংসক মক্ষিকা সর্বদা রক্ষক স্বরূপ থাকে এবং তাহার সেবা করে। নপুংসক মক্ষিকা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি, কিন্তু অপর দুই জাতীয় মক্ষিকা অপেক্ষা সমধিক বলিষ্ঠ ও কণ্ঠী। উহাদের একটা লম্বা শুঁড় (proboscis) থাকে। উহাদের হলও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মধুমক্ষিকার হল এক বিচিত্র গঠনে নিৰ্ম্মিত। উহা একটি পক্ষস্থল নালিকার জায় ও ক্ষুদ্র এবং সর্বোচ্চে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লম্ব থাকে। ঐ লম্ব একদল ভাবে অগ্নিহিত যে যদি কোনও স্থানে হল বিচ্ছিন্ন হয়, প্রবেশ সম্ভব উহা কোন বাধা পায় না, কিন্তু বাহির করিবার সময় লম্বগুলি এমন আটকাইয়া যায় যে মাছির নিঃসৃত উত্তরের কিংবদন্তি ছিঁড়িয়া হল শুষ্ক পিচ্ছ দ্বানে সংলগ্ন থাকিয়া যায়; মক্ষিকাও তৎক্ষণাতঃ পক্ষপ্ত প্রাপ্ত হয়। অল্পদীর্ঘকাল দেখা যায় যে হলের বহিরাগত স্বীয় পক্ষপ্ত। একটি ক্ষুদ্র বিষভাণ্ড হইতে ঐ হলের মধ্যস্থ লম্ব দ্বারা বিষ বেগে ক্ষতস্থানে সিক্ত হয়, আততায়ী মাছির প্রাণনাশ ঘটে। প্রকৃতির নিয়মই এমনি আদৃত। নপুংসক মক্ষিকা

মধুচক্রের সমস্ত কার্য করে রাণী ও পুংমক্ষিকাগুলি কেবল বসিয়া বসিয়া থাকে। রাণী ডিম্ববতী হইলে নপুংসকেতা পুরুষ মাছিনের মারিগা ফেলে, অনর্থক মধু অশয়্য করে না। রাণী মাছি প্রত্যহ ২০০০ হইতে ৪০০০ পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। জনাবঃ প্রভুই সমগ্র প্রত্যহ এইরূপ ডিম্ব প্রসব করিয়া কিছুকাল নিশ্চেষ্ট থাকে। তাৎ নবম্বর রাণীব ডিম্ব হয় পরে বৃদ্ধা হইলে নপুংসকেতা তাহার অত্যন্ত যত্ন ও সেবা করে। ইত্যবসরে অপর একটি রাণীর অভ্যাসের চর, এবং এইরূপে নবম্বর হইতে থাকে। নপুংসক মক্ষিকার কর্মদক্ষতা ও সহিষ্ণুতা দেখিলে অশঙ্ক হইতে হয়। মধুচক্র প্রস্তুত করণ, মধু ও পরাগ সংগ্রহ করা, মোম প্রস্তুত করা, রাণীমাছির সেবা ও মধুচক্রের রক্ষণাবেক্ষণ, শিশুপালন, পক্ষর সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত গুরুতর কার্য এই ক্ষুদ্র নপুংসক মক্ষিকার উপর হস্ত। উহারা বাস্তবিক নপুংসক নহে। পরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া ত্রীতিমত অস্থানীকণ বস্তুর সাহায্যে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উহারা অণুট (বা কুণুট) শ্রীমক্ষিকা। উহাদের গর্ভকোষ এবং উৎপাদিকা শক্তির সম্যক আভিযুক্তি হয় নাই এবং অম্লানদের অভাবে অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে। কবাবৎ দেখা যায় যে একটা নপুংসক (?) অকর্মণ্য “গাওয়া” ডিম্ব প্রসব করিয়াছে। কিছু সাধারণতঃ উহার নপুংসক ধর্মী; উহারাই মধুচক্রের শিরা এবং কর্মকর।

মধুমক্ষিকার প্রধান কার্য পূর্ণ হইতে মধু এবং পরাগ আহরণ করা। মধু আহরণ কর্ত্তী মক্ষিকাদের একটি লম্বা শুঁড় থাকে

তাহা পূর্ণে লিখিত হইয়াছে; ঐ শুঁড় দ্বারা মধু শোষিত হয় এবং সুপের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া উৎসের দ্বারা। মধুমক্ষিকাদের দুইটি উদরগজর থাকে। প্রথম গজরটি একটি স্বচ্ছাবরণ পলিচার দ্বারা, ফলস্ব মধু সঞ্চয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। উহাতে পাত্ত পবি-পাক হয় না। প্রত্যেক কৃণ হইতে অশ্লুত হইয়া মধু ঐ পলিচারে জমিতে থাকে, এবং যখন উহা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন মক্ষিকা গুচ ফিঁদগা আদিয়া মধুচক্রের প্রত্যেকটি উদ্বীর্ণ করিয়া রাখে। ঐ মধু পরে পাত্ত রূপে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন নিম্ন উদরে গিয়া পরিপাক হয়। পরাগ মক্ষিকালিঙ্গর দ্বারা। পূর্ণে লোকের বিশ্বাস ছিল যে পরাগ হইতে মোম প্রস্তুত হয়। কিছু বাস্তবিক তাহা নহে। পরাগ কেবল সত্ত উদ্ভূত মক্ষিকাপ্রাবকদের একমাত্র খাদ্য। নপুংসক মাছিনের নিঃস্রব হইতে এক প্রকার ন্যাসিত তরল চট্টেট লম্বা নির্গত হইয়া আদিয়া মোম হয়। আহ্বের পর মক্ষিকা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করে হস্তপর কিছুই নাড়ে না; সেই সময় উহাদের গাত্র হইতে মোম নির্গত হয়। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ঐ দেহদ্রব অনতিক্রিয় রস মক্ষিকাগণ সমুখের পথঘরের দ্বারা ক্ষুদ্র পিণ্ডাকারে অর্ধিত করিয়া বাসগৃহের ভিত্তির প্রান্ত ব্যবহার করে। মক্ষিকা মিষ্টরস যত বেশি খাইতে পারে, মোমও তত বেশি উদ্ভূত হয়। এই জন্যই বৃষ্টি মৌসমে “মধুখ” বলে। ক্ষুদ্র পরাগ খাইয়া মাছিন মোম হয় না; আগার একটিও জুলে বসিতে না দিয়া যদি শর্করা বা শুষ্ক খাওয়ান যায় তাহা হইলে প্রচুর মোম হয়। অতঃপর পরাগ মোমের উপাদান নহে

হারা স্পষ্টই দৃশ্য যায়। মধু আহরণ কালে মক্ষিকা যে একটি মহৎ উপকার সাধিত করে, এ প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য।

মধুমক্ষিকার উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে এ স্থলে পুষ্প ও পুষ্পের বিশিষ্ট অঙ্গবোতের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। সচচাচব পুষ্পের চারিটি অঙ্গবোত থাকে। একটি পুষ্পের চতুর্দিকে বর্ধলাভিত ফলকাক্ষে সংযুক্ত রইয়া একের উপর অন্যটি ঘুরে ঘুরে নিজস্ব থাকিতে দেখা যায়। ১ম ডিম্ব ও দ্বিতীয় ডিম্বের অন্তর্গত পুষ্প ও তাহার গভাঙ্কানি বিচ্ছিন্ন করিয়া চিত্রিত হইল। সঙ্গনিয় বা সংযুক্ত স্তবকে প্রায় হরিৎ বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রের দ্বারা বেটন পর (১, ১) (calyx and sepals)। তাহার পর বিভিন্ন উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট কোমল পুষ্পবল বা পাপড়ি (২, ২) (corolla and stamens) পুষ্পবলের অভ্যন্তরে প্রায় বর্ণচীন কোমল

স্বপ্নবৃত্তের দ্বারা পরাগকেশর (৩, ৩)। প্রত্যেক পরাগকেশরের দুইটি বিশিষ্ট অংশ থাকে। প্রথম কেশরদণ্ড, (filament) এবং দ্বিতীয় পরাগকেশর (anther)। ইহার পরবর্তী ফলে পুষ্পের স্ত্রী প্রদন (pistil) (৪)। এই স্ত্রী-প্রদনের তিনটি অংশ থাকে; সর্ষ নিম্নস্থ গর্ভকোষ (ovary) তাহার গর্ভনদ্র বা কর্ণিকা (Style) এবং সর্ষোপরি কিক্ষাজ (stigma)।

চক্রণ চিত্র দেখ।

পরাগকোষের মধ্যে পরাগ জন্মে।
প্রাথমিক: পরাগ অতি ক্ষুদ্র বর্ধলাকার বা



(প্রদন চিত্র)



(দ্বিতীয় চিত্র)

ডিবাঙ্কতি একটি বেগু, ঈষৎ পীতাক্ত স্বেতবর্ণ।
যখন পরাগ স্পর্শক হয়, তখন পরাগকোষ
একটি মণারেরা ধরিয়া বিপত্ত ও উন্মুক্ত
হয় এবং পরাগ ব্যতিরিক্ত হইয়া পড়ে। সেই
পরাগ প্রা-স্তবকের উপবিভাগে কিঙ্কড়াগ্রে
পতিত হইলে উহার গায়ে সংলগ্ন হইয়া যায়;
ইহার কারণ ঐ Stigma-র গায়ে এক স্রাব্য
চুটুটে তরল পদার্থ নিঃসৃত হইতে থাকে,
তাহাতেই পরাগ সঞ্চিত হয় ও ক্রমে দ্রবীভূত
হওয়া উঠে। পরে প্রত্যেক পরাগবেগু
ইহাতে একটি স্থায়ী নালিকা উন্মুক্ত হয় ও
গর্ভাশয়ের ভিতর দিয়া ক্রমাগত বর্ধিত হইতে
থাকে। চতুঃপার্শ্বই কোমল পদার্থে ঐ
নালিকা পরিপূর্ণ হয় এবং পরিপেবে গর্ভকোষ
ভেদ করিয়া বাহ্যের মধ্যে প্রাবিষ্ট হয়। নালি-
কার অগ্রভাগস্থিত স্তম্ভকোষ, বীজত (ovule)
ঐকল স্তম্ভকোষের সাহিত মিলিত হইয়া একটি
নূতন কোষ সৃজন করে; উহাই প্রকৃত বীজ।
গর্ভ-ভেদে প্রা-স্তবক ও পরাগসম্বন্ধ চিত্রিত
হইল।

সুতরাং বীজ অথবা ফলের উৎপত্তির
অন্ত কিঙ্কড়াগ্রে পরাগপাত অসম্ভব। যদি
অন্যথায় কিঙ্কড়াগ্রে অথবা পরাগাধার ছিন্ন
করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে অচিরে
ফলের সকল অংশই শুকাইয়া যায় ফল হয়
না। সচরাচর একই পুষ্প মধ্যে পরাগ-
কেন্দ্র ও প্রা-স্তবক উভয় বস্তুই থাকে। ব-
পরাগ লইয়া ঐ সকল পুষ্প ফলান হয়
সন্দেহ নাই কিন্তু ফল ও বীজের উৎকর্ষ
সাধন করিতে হইলে এক পুষ্পের পরাগ
অন্য পুষ্পের কিঙ্কড়ে লাগান আবশ্যক।
অনেক বৃক্ষে পুষ্প বিকশিত হইবার পর

যেখা যায় যে কোন কোন পুষ্পের পরাগ
কোষ স্পর্শক হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার
কিঙ্কড় তখনও পরাগগ্রহণক্ষম হয় নাই।
কিঙ্কড়াগ্রে তরল পদার্থের উদয় হইলেই
ঐ ভাগ সমধিক পূর্ণ হয় এবং তখনই পরাগ-
গ্রহণক্ষম হয়। আবার কোনও পুষ্প এমনও
যেখা যায় যে উহার প্রা-স্তবক পরিপক
হইয়াছে বটে কিন্তু পরাগকোষ তখনও পাকে
নাই, বা তাহার বহু পূর্বে কাটিয়া পরাগ-
বিহীন হইয়া গিয়াছে। এই সব পুষ্পও
ফলবান হয় এবং তাহাদেরই ফল সমধিক
উৎকর্ষ লাভ করে। ইহার কারণ অপর
পুষ্প হইতে পরাগ আনিয়া উহাতে পতিত
হয়। এইরূপ পরাগসম্বন্ধকে Cross fer-
tilisation বলে। এক পুষ্প হইতে পরাগ
নামা উপায়ে অন্য পুষ্পে নীত হইতে পারে।

আর যেখা যায় যে একটী ফুলে অধিক
বা ততোধিক পরাগকেন্দ্র থাকে। কোন
কোন ফুলে অসংখ্য পরাগ কেন্দ্র যেখা
যায়। প্রত্যেক কেন্দ্রের উপর এক একটী
পরাগকোষ থাকে এবং তাহাতে প্রচুর
পরিমাণে পরাগ ভরে। অর্থাৎ একটি গর্ভ-
কোষের পক্ষে একটি পরাগকণাই যথেষ্ট।
এত অধিক পরাগ আনিবার উদ্দেশ্য কি?
ঝাউ, দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষের পুষ্পে
এত পরাগ উৎসর্গ হয় যে সমস্ত সময় উহার
বায়ু চাপিত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত নীত হয়
এবং বহুদূরের পুষ্পে লাগিয়া উঠাকে ফল-
বান করে। তাল, বঙ্গু, হুপারি প্রভৃতি
বৃক্ষের পক্ষেও ঐরূপ দেখা যায়। ইটালি
প্রদেশের উত্তরাংশে একটি তাল বৃক্ষ ছিল
উহার প্রচুর পুষ্প হইত কিন্তু তাহাতে প্রা-স্তবক

ময়ি ছিল, পরাগ অভাবে উহা ফলশালী হইত না। এইকালে প্রায় ২০ শতাব্দী পর্য্যন্ত ফল হইতে ফল দূরিতে দেখা যায় নাই। ইহাৎ এক বৎসর দেখা গেল যে উহাতে এক পাহ ফল ধরিত। সকলে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল, এবং ইহার কারণ অন্বেষণে উদ্ভিদবিজ্ঞান্য নতু ব্যতিক্রম এবং উৎকৃষ্টত ইহা উঠিলেন। স্বভাবের বিচারে এই কার্য তাহাই আশ্চর্য্য: দৃষ্ট হইল পরে বহু অন্বেষণে জানা গেল যে প্রায় ৪০ শত কোশ দূরে ইটালির দক্ষিণে ঐক্লপ একটা ভালগাছ আছে। তাহাতে কেবল পরাগ-কেশর ছিল কিন্তু স্ত্রী-স্তবক ছিল না। যে বৎসর সেই বৃক্ষ পুষ্পশালী হইল সেই বৎসর সেই সময়েই উত্তরের স্ত্রী-পুষ্প ফল ধরিল। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে বায়ু সহযোগে দক্ষিণের পুং বৃক্ষের পরাগ আসিয়া উত্তরের স্ত্রী পুষ্পে পড়িয়াছে, তাই সেই স্ত্রী-পুষ্পে ফল ধরিত। এ বিষয়ে পরীক্ষাও করা হইল। পর বৎসর ঐ পুংপুষ্পগুলিকে দুই হইবার পূর্বেই বিনষ্ট করা হইল। সে বৎসর উত্তরের সেই স্ত্রী-বৃক্ষে একটিও ফল হয় নাই। পর বৎসরে আবার ফল হইল। সুতরাং পরাগ বায়ুগলিত ইহা বহু প্রামাণ্য, নদা, পূর্কত উন্নয়নপূর্কক পাঁচ ছয় শত কোশ দূরেও নীত হইতে পারে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

যদি, ক্ষেত্র ছোট ছোট বৃক্ষও এতরূপ বায়ু চালিত পরাগে ফলবান হয়। জলীর বৃক্ষের পুষ্প জলপ্রোতে ভাসমান পরাগ তেণ্ডু বাহা ফলবান হয়। কতক বা বায়ু চালিত হইয়াও হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে

পতকের দ্বারা বিশেষতঃ মধুমক্ষিকা ও প্রজাপতির সাহায্যে এত পরপরাগসক (cross fertilisation) ঘটে। মধুমক্ষিকা এতরূপ প্রত্যেক ফলোদ্ভানের একটি অপরিহার্য্য সামগ্রী। অতি দুগন্ধ মালী অপেক্ষাও মধুমক্ষিকার কাণ্য বেশী মুগ্ধবান। ইহাট্ট একটু ভাল করিয়া দেখা যাউক।

কোন কোন পুষ্পের গঠন এরূপ যে পরপরাগসক খট্টেই পারে না। পরাগ-কেশর ও কিল্লদাত্র এরূপ ভাবে অবস্থিত যে বায়ুরিস্রোলে বা পুষ্পবৃন্তের সোলনে যথাস্থানে পরাগপাত হট্টেই পারে না। আবার কোন কোন পুষ্প কেবল পরাগ-কেশর মাত্র থাকে, কিল্লদাত্র নাই; কোন কোন পুষ্প কেবল স্ত্রী-স্রাট্টীয়। পরাগকেশর তাহাদের নাই, কেবল স্ত্রী-স্তবক মাত্র আছে। এই সকল পুষ্পের বৃক্ষে পতক ভিন্ন পরাগ সঙ্গম হট্টা অসম্ভব। প্রকৃতিহুক্ষত্রী এই সকল পুষ্প বিবিধ উচ্ছদ বর্ণে চিহ্নিত করিয়াছেন, উহাতে মনোমোহকর স্রগন্ধ নান করিয়াছেন এবং উহাদের বল প্রাপ্তে (ভিত-বের দিকে, প্রায় বৃক্ষ গানে) অতি সুমিষ্ট পতকখাত মধু স্রব করিয়া রাখিয়াছেন। উচ্ছদ চিহ্নিত বর্ণে, অগন্ধে এবং মধুৎ জত্র মক্ষিকাদি ঐ পুষ্পে আকৃষ্ট হয়। পুষ্পদণ্ডে নিম্নপ্রাপ্তে ভিতবের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলিগাও প্রায় কোদ থাকে, তাহাতে উপযুক্ত গমরে মধু জম্মার। মধুমক্ষিকা, ঐ মধু আহরণ জত্র পুষ্পে উপবিষ্ট হইলে, পরাগ-কেশর এরূপ ভাবে গতিৎ যে ঠিক সেই সময় মক্ষিকার গাত্রে পরাগবর্ণেণ লাগিয়া যায়। মধুমক্ষিকা পরাগও সংগ্রহ করিয়া

বেড়ার; সেই পরাগ উহাদের সমুদয়ের পদ
যের সংগৃহীত থাকে। তৃতীয় চিত্র দেখিলে
ইহা স্পষ্ট বোধ হইবে। 'ক' চিত্রিত চিত্রে
পরাগকোষ অগুরু হইয়াছে, কিলকায়
তখনও পুটে হয় নাই। 'খ' চিত্রিত চিত্রে
অপর একটি পুষ্প দ্বারা কিলকায় পুটে
চটয়াছে, মক্ষিকা পুষ্পে প্রবেশ করিলেই
পৃষ্ঠস্থিত পরাগ ঐ কিলকায় লাগিয়া যায়।

এইরূপ পরাগপ্রাপ্তকালের ফলে পুষ্প
হইতে ফল উৎপন্ন হয় তাহা সমধিক পরি-
পুষ্ট, লম্বা ও প্রচুর বীজশালী হইয়া থাকে।
উদ্ভানে সেইরূপ ৫০টি মধুচ্চক অতি দ্রুত
পালিত হয়। উহাদের মধ্যে দ্বারাতে কোন
ব্যাধি না হয় সে বিবর উদ্ভানদ্বারা খুব
সতর্ক থাকেন এবং পুষ্পোন্মাদ সময়ে অত্যন্ত
হইলে শর্করা, শুভ্র ইত্যাদি নানাক্রম খাদ্য
যোগাইয়া মক্ষিকার আত্মপালনে যত্নবান
হয়েন।



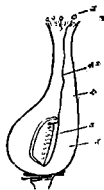
(ক) তৃতীয় চিত্র)

(ক) মধুমক্ষিকার পুষ্পে প্রবেশ কালে পুটে
পর্যাপ্ত হইয়াছে। কিলকায় অগুরু।

(খ) ঐ পুষ্পের পর্জন্য (ন) বন্ধিত হইয়া
বাকিয়াছে এবং মক্ষিকার পৃষ্ঠে মধু পর্জন্যের আশ্রয়ে
লাগিয়াছে। পরাগপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরাগপ্রাপ্তের তথ্যইহা হইবে।

(প)

কতকগুলি পুষ্প আছে (যথা অর্কমূল
ইত্যাদি) দ্বারা দ্বারা পুষ্পবল লবানলের দ্বারা
এবং পরাগকোষ ও ক্রী-স্তবক ঐ নলের
অন্তস্তরে অতি নিয়মে থাকে (see Aris-
tolochia &c)। উহাদের পরাগ স্তঃ
পুষ্পের বাহিরে আশ্রিত পায়ে না এবং
উহাদেরও পুষ্প দুই জাতীয়। কোন পুষ্পে
শুভ্র পরাগকোষ থাকে, তাহার পুরু
পুষ্প; এবং কোন পুষ্পে শুভ্র ক্রী-স্তবক
থাকে; তাহার ক্রী-পুষ্প এবং তাহারাই
ফলবান হয়। ইহাদেরও পরাগপ্রাপ্ত না
হইলে ফল ও গীত হয় না এবং প্রচুর মধু
থাকার উদ্ভাদের মধুমক্ষিকার দ্বারাট পরাগ-
প্রাপ্ত হয়।



(চতুর্থ চিত্র)

ক্রী-স্তবক ও পরাগ প্রাপ্ত

প-পর্জন্যকোষ (ovary)

ক-পর্জন্য বা কর্ণিকা (style)

ক-কিলকায় (stigma)

ন-পর্যাপ্ত

প, ন-পর্যাপ্তমক্ষিকা

ব-বীজ

আমার টেবিলের উপর আলো এক ভোড়া রজনীগন্ধা ও সেই জাতীয় নানারূপ 'লিলি', রাখিয়া দেয়। উহাদের বৃক্ষ প্রায় শিকড় ও গোড় হইতে হয়। বীজ পুতিয়া বৃক্ষ হইয়াছে দেখা যায় না। কতকগুলি প্রোথাপতি আশিয়া ঐ ফুলের মধু লইতে লাগিল এবং দুই তিন দিন পরে দেখিলাম উহাদের পুষ্পের নিম্নে ফল ধরিয়াছে। অনেকগুলি ফল বয়স্কক পালন করিতেছি নীল ও পুষ্ট হইতেছে। উহা হইতে বৃক্ষ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আম লিচু, শিমারা, কমলাপেয় প্রভৃতি ফলের অল্প পরপরাগলক্ষ্য নিভান্ত আবৃত্তক— বিশেষতঃ লেবু। উহাদের অনেক ফল পুকা বাড়ী এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আ-ত্মক পুষ্ট হয়। কমলামধু এই সব ফুল হইতে আচ্ছিত হয়। মক্ষিকার দ্বারা বাগানে বাহ্যতে দুই চারিটি মধুচক্র বরাবর থাকে সে বিষয় আমাদের দেশের আলদের অথবা

উজানবাসীদের মধ্যে লক্ষ্য নাই। আম বাগান বা অন্ত্রান্ত ফলের বাগানে কৃত্রিম উপায়ে মধুমক্ষিকা পালনের উপায় উদ্ভাবন করা নিত্য আবৃত্তক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে আমাদের দেশের ফল যে ক্রমশঃ নিষ্ফল হইতেছে তাহা শ্রবণই নিবারণিত হইবে। ইউরোপে যার কাল প্রত্যেক ফলোদ্যানে মধুমক্ষিকা প্রতিপালিত হয় সেইজন্য তাহাদের দেশে যে ফল হয় তাহারও সমাধিক প্রবন্ধ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে মক্ষিকা আশনি আশিয়া কুটে তাই যাহা কিছু ফল পাই। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে মাছি ও মোচাক বসা-টলে বাগানের ফল যে উৎকৃষ্ট হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। বন থাকিতে আমাদের দেশে এই পাকাত্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণা হুঁহুর প্রবর্তন করা বাস্তবানের কাজ। উদ্যানবাসীগণ এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

শ্রীযতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সমালোচনা।

মেঘনাদবধ কাব্য।—বাইকেল মধুবন সম্বন্ধে বিবর্তিত। শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাবান দাস কর্তৃক সম্পাদিত। এলাহাবাদ ইতিহাস বেল হইতে অকাশিত। কলিকাতা ইতিহাস পাবলিশিং হাউস। দুলা তিন টাকা মাত্র। মেঘনাদবধ এই নটক সম্বন্ধেখানি পাঠ করিয়া আমরা যেনে ত্রুটি লক্ষ্য করি। প্রথমে ভূমিকার বাইকেলের রচনার বিশেষতঃ মেঘনাদবধ কাব্যের কবির মৌলিকতা বেশ সঙ্গতভাবে সংক্ষেপে নিবৃত্ত হইয়াছে। প্রতি সর্গের মূখ্যতঃ সর্গোক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলাপ, কাব্যোপেক্ষের সাধন ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ সঙ্গতিও

সরিষাই হইয়াছে। ইতিমধ্যে কাব্যটির গতিত ভুলনার মেঘনাদবধের নিকট মৌলিকতার পার্থক্য প্রদর্শনের দৃষ্টান্তের অসংখ্য উদাহরণ দৃষ্ট্যতঃ একত্র করিয়াছে। মেঘনাদবধ, ব্যাখ্যার শেষে তাহা—সেই কাব্যের চমকিত সংক্ষেপ একত্র করিয়া সম্পাদক ও প্রকাশকর বঙ্গবাসীসমাজেরই স্বত্বাবত্বভাজন হইয়াছেন। প্রথমে মূখ্যতঃ কবির বাইকেলের চিত্র ও প্রবন্ধের বিষয়সম্পর্কিত বহুখানি ত্রুটিন চিত্র অদৃষ্ট হইয়াছে। সকল চিত্রের পারিকল্পনার কিত্তি সূচ্যাত্তি করিতে পারিলাম না। গল্পের জ্ঞাপা বিবাহী কামেয় সঙ্গীত মূল্য হইয়াছে।

কলিকাতা, ২- কর্তব্যালিঙ্গ প্রিট কাব্রিক সোসে, ইংলিওর দ্বারা দ্বারা মূল্য ১ টা ম, ওড় পাবনপ্রঃভ্যত হইতে

ঐদীপলো মূখ্যোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত।



সেপ সাদা শিরাজী
প্রাচীন চিত্র হটতে

ভারতী

৩৫শ বর্ষ]

ভাদ্র, ১৩১৮

[৫ম সংখ্যা ।

নব ভারতে নব সামাজিকতা ।

প্রতীচা জগতের গভাতার সচিত সংশ্লেষে আসিয়া আমাদের মনে অনেক নূতন প্রশ্নের উদয় হইতেছে; তন্মধ্যে একটা প্রধান প্রশ্ন-এই, নব ভারতের সামাজিক জীবন কোন ভিত্তির উপর দাঁড়াইবে? ইহা আমরা সকলে অস্বস্তি করিতেছি যে প্রাচীন হিন্দুসমাজের সামাজিক জীবন আবহমানকাল যে ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান ছিল, সেখানে আর তাহাকে দণ্ডায়মান রাখিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু কোন্ নূতন ভিত্তির উপরে তাহা দাঁড়াইবে?

কালের গতিতে কতকগুলি ভাব ও কতক গুলি দোষ গুণ সকল সমাজেই দ্রুতিগা থাকে। নানা প্রকার কাৰণের সমাবেশে এই কল দ্রুট হয়। নানা প্রকার শক্তি নানা দিক দিয়া জাতীয় চরিত্রের উপরে কার্য্য করে। এমন কি দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাও অনেক সময় জাতীয় চরিত্রের উপরে কার্য্য করিয়া থাকে। কোন কোনও চিত্তশীল লেখক বলিয়াছেন যে কুল শূদ্র হিমালয় ও বিপুল অগার নদী সকলের মধ্যে বর্ধিত হওয়াতে প্রকৃতির জীবন বৃদ্ধি দেখিয়া দেখিয়া ভারতীয় হিন্দুগণ উদ্ভবময়ী হইয়া বর্ধিত হইয়াছে; এবং প্রকৃতির উর্ধ্বরতা ও জলগাম্ভীর্য্য সামান্যতঃ থাকতে জীবনধারণের প্রথাগণের অল্পতা হইয়া তাহারা

ক্রিয়াবিমূর্ণ ও দ্যান-পরায়ণ হইয়াছে; অপর-দিকে ইউরোপীয় জাতিসকলকে কহুর্কর জুঁম ও শ্রুতাতপের ব্যবহার মধ্যে বাস করিতে হইয়াছে বলিয়া প্রকৃতির সহিত দুরন্ত সংগ্রাম করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে; সুতরাং তাহাদের দেহমনের শক্তির বিকাশ এবং উদ্ভব ও স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তির আবির্ভাব হইয়াছে! গ্রীক ও ইটালীয়গণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বর্ধিত হইয়াছে বলিয়া অমোদ-পরায়ণ ও সৌন্দর্য্যসজ্জ হইয়াছে, এইজন্য অপরায়ণ বেশেও জাতীয় চরিত্রের বিকাশের মধ্যে প্রাকৃতিক কারণ সকল দ্রুট হয়। একবার মধ্যে যে বৃদ্ধি নাই তাহা বলা যায় না।

তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংশ্লেষে আসিয়া জাতি সকলের মনে নব নব ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। বর্তমান ইংলণ্ডকে আমরা বাহ্যে দেখিতেছি তাহার মধ্যে শিল্প, কণ্ট, নন্দান, জাক্‌সন্, ডেন, ফর্দাস প্রভৃতি কত জাতি আসিয়া মিশিত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডগণ সকলের বোমডগন পাইয়াছে। এমন কি আমাদের স্থিতিশীল ও উন্নতি-বিমূর্ণ বেশেও শক, কাট, হুন, মঙ্গোলিয়ান ও ত্রাবিড় প্রভৃতি কত জাতি মিশিয়াছে। পশ্চতত্ত্ববিদগণ ও নবতত্ত্ববিদগণ

এ বিষয়ে যে সকল নূতন কথা দিন দিন আবিষ্কার করিতেছেন তাহা শুনিয়াই আমরা অথাক্ হইয়া গাইতেছি । এই সকল বিভিন্ন জাতির সংস্রব যে জাতীয় জীবনের মূলে অদৃষ্টকণে কার্য্য করিয়াছে তাহাতে কি সন্দেহ আছে ? আমরা বর্তমান হিন্দু চরিত্রে যে দোষ গুণ দেখিতেছি, তাহার মূলে কত জাতির সম্মিলন রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে ।

জাতীয় জীবন ও জাতীয় সামাজিকতার মূলে এই সকল কারণ যে বিভিন্নমান আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সকল স্রীতি নীতি ও সংস্কার কুটিয়া উঠিয়াছে, এবং বংশ পদম্পর্ষাক্রমে মানবীয় চিত্তকে শাপন করিয়াছে, সে সকলও যে জাতীয় চরিত্র গঠনে প্রধান কারণ-রূপ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র ।

দৃষ্টান্তরূপ প্রাচীন ভারতের সামাজিক জীবনের বিষয়ে আলোচনা করা বাড়িক । সচরাচর লোকে ভারতীয় হিন্দুগণের সামাজিক জীবনকে বিতর্কিত ও উন্নতি-বিমুখ বলিয়া থাকে । এই বিতর্কিততা ও উন্নতি-বিমুখতার কারণ কি ? চিন্তা করিলেই দেখা গাইবে যে, প্রাচীন ভারতের সামাজিক জীবনের ভিত্তিমূলে প্রধানতঃ তিনটী বিষয় ছিল । প্রথম পারত্রিকতা ও অদৃষ্টবাদ দ্বিতীয় শাপনশক্তি বা বাধাতা, তৃতীয় জাতিভেদ ও বৈষম্য ।

প্রথমে লওয়া গাউক পারত্রিকতা । নিষ্ঠাবান প্রাচীন হিন্দু মাত্রেই সংস্কার এই যে ঐহিক জীবন ও ঐহিক জীবনের সম্বন্ধ সকলই মায়ার পেলামাত্র ; এই সংসার কান্দার রূপ এবং অপূনরাবৃত্তি অর্থাৎ এখানে আর

না আসার নামই মুক্তি । এ জীবনে বাস কেবল কর্ম্মকল ভোগের স্থান মাত্র, এবং এ জীবনের সমুদ্রতান কেবল কর্ম্মকল ভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় মাত্র । এই পারত্রিকতা বা অদৃষ্টবাদ ভারতীয় ধর্ম্মের অস্থি মস্তুর মধ্যে প্রতিটি বলিলে অত্যাঁকি হয় না । এই ভাব ও এই বিশ্বাস এ দেশের মানুষের হাড় হাড়ের বসিয়াছে । এখানকার কবি ও সাধকগণের চিত্তে শব্দই এই ভাব দৃষ্টিগোচর । সাধক-প্রবণ রামপ্রসাদ গাইয়াছেন :—

“তারা, কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেহাদে সংসার গাধনে থাকি বল ।”

কলিকাতার রাজপথের পার্শ্বে একজন বেহারাদেশী হুচি বসিয়া কাজ করিতেছে, তাহার একজন বন্ধু আসিয়া নিকটে ঝাঁড়াইয়া কোনও এক তৃতীয়া ব্যক্তির সংসারিক হৃৎকের কথা বলিতেছে । হুচি পাঠকান্তে হুৎ প্রতিটি করিতে করিতে বলিতেছে “আরে তাই ! রামজী যো লিখলবাড়ি পোত হৈবে করে”—অর্থাৎ বিধাতা বা লিখেছেন তাঁত হবেই ।

এই অদৃষ্টবাদ এদেশের মানবের মনে বহুদূর থাকিতে একদিকে অসুস্থ সহিষ্ণুতা ও অনাসক্তি উৎপন্ন করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । দৃষ্টান্তরূপ মনে কর, একজন পুরুষ এক স্ত্রী সম্বন্ধে আর একটা পত্নী ঘরে আনিয়া ; প্রথম পত্নী চক্ষের জলে ভাসিয়া বলিল—“এ হতভাগীর কপালে সন্তান ছিল, তা না হলে কি এমন হয় ।”—পাড়ার মেয়েরা বলিল—“তা ঠৈ কি কপালে সন্তান ছিল, তাইত সন্তান এল ।”—তারপর প্রথম স্ত্রী মূখ বুজিয়া এক কোণে গেল, অবাধে হুঃপ সহিতে লাগিল । পুত্রশোকে জননী কাতরা, জন্ম

বিখ্যাত আসিল, তাঁর কপালে ছিল ছেলেটা পলাবে, তখন তিনি জ্বর বাধিলেন ও ধৈর্য ধরিলেন। এইরূপে অদৃষ্টবান গুঃশশোক বহুদিনে সামর্থ্য দিরাচ্ছে; এবং মাহুবকে আসক্তির উপরে তুলিরাচ্ছে; কিন্তু অপর দিকে এদেশের মাহুবের মনে নৈরাশ্র উৎপন্ন করিয়া উদ্ভন-শীলতা, স্বাধীন-প্রবৃত্তি প্রকৃতি নষ্ট করিরাচ্ছে এবং সামাজিক গুঃশরুগতি ও চরিত্রের প্রতি উদাসীনবৃত্তি জন্মাইরাচ্ছে। এদেশের মাহুব গুণ গুণ দরিদ্রা যেরূপ সামাজিক বাধা সহিয়া আসিরাচ্ছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

এ জীবন ও জনসমাজ মানবের কর্তৃকল ভোগের স্থানমাত্র এবং পারত্রিক সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনাসক্ত চিত্তে এখানে বাস করাই বুদ্ধিমানের কাণ্ড, প্রজালাপারণের মনে এই সত্যের প্রবল থাকিতে এদেশের মাহুব সামাজিক জীবনের প্রতি তত মনোযোগ করে নাই। অবশ্র সামাজিক জীবনকেও ধর্মের অঙ্গগত রাধিবার জন্ত প্রচুর উপদেশ আছে। বলিতে কি সমুদ্র রামায়ণ গ্রন্থখানি মাহুবের সামাজিক জীবনকে অশৃংখল ও অস্বনিমিত্ত করিবার উপদেশ মাত্র। রামের পিতৃভক্তি, লক্ষণের জ্যাক্রোশ্রম, সীতার পাতিভ্রতা, হনুমতের প্রত্ন-ভক্তি, যে বিষয়েই চিত্রা করা যাক্না কেন, সকল উপদেশেরই লক্ষ্য মানবের সামাজিক জীবনকে উন্নত ও পবিত্র করা। এতব্যক্তিত্ব দৃতি ও পুরাণে সামাজিক জীবনে ধর্ম লাগনের অসংখ্য উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ সকল উপদেশের মূখ্য উদ্দেশ্র এই যে মানবকে ব্যক্তিগত ভাবে উন্নত ও পবিত্র

করিয়া পারত্রিক সম্পত্তির উপগুরু করা, এবং কর্তৃকল ভোগ হইতে নিরুক্তি দেওয়া।

এই ত গেল কৌলিক ও লৌকিক ধর্মের উপদেশ। জ্ঞানপথানলব্ধগণ এই ব্যক্তিগত সাধনকে আরও অধিক মাত্রাতে দৃঢ়াইরা-ছেন। সমাজ ও সামাজিক জীবন যে মাহুর খেলা এ উপদেশ তাহারা আরও দৃঢ়তার সহিত দিরাছেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বসিরাছেন—

কাতব কাত্য কণ্ডে পূবঃ

সংসারোদয়মতীষ বিতিঃ।

অর্থাৎ তোমার আবার স্ত্রী কে, তোমার আবার পূব কে, এ সংসারটা এক বিচিত্র খেলা, তা বৃত্তিগে না।

ধর্মের এই পারত্রিকতা ও অদৃষ্টবান এদেশের জনগণের চিত্তে সন্নিবিষ্ট থাকিতে একদিকে ঐহিকগিকে ব্যক্তিগতভাবে অনাসক্ত ও ঐহিক অশ্ববিস্রুত করিয়া ধর্মের সাধনে মনকে নিযুক্ত রাধিরাচ্ছে বটে, কিন্তু অপরদিকে সামাজিক উন্নতি ও সামাজিক কল্যাণের বিষয়ে নিরাশ্র ও উদাসীন করিরাচ্ছে। বর্তমান সময়ে আশ্রা দিন দিন অধুডয করিতেছি, এ জগতে মাহুব কেবল আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলে না। ব্যক্তিগতভাবে যেমন নিজ নিজ উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, তেমনি সম্বলিতভাবে সমগ্র সমাজের উন্নতির জন্ত অনেক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। মনে কর তুমি একজন জ্ঞানাহুবাণী মাহুব, তুমি রাধি বিন পাঠে রত আছ, তুমি নানা ভাষাতে অভিজ্ঞ, দার্শনিকদিগের দর্শনভয, বৈজ্ঞানিকদিগের নবনব আবিষ্কার সবলি তোমার বিচিত্র, ইহা তোমার নিজের

পক্ষে অতীব সুস্থির অবস্থা তাহাতে লক্ষ্য হ
নাই। এই পথ যে অশরেরও অবলম্বনীয়,
তাহাও নিঃশেষ; কিন্তু সমগ্রভাবে জন-
সমাজের উন্নতিসাধন কথ্যে হইলে, এবং এই
জ্ঞানসূত্রী কর্মসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিতে
হইলে, অশরের সহিত মিশিত হইয়া সামাজিক
ভাবে নানা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।
মনে কর তোমরা দশ জনে মিলিয়া
একটি সাধারণ পাঠাগার ও পুস্তকালয়
স্থাপন করিলে, সর্বসাধারণের লব্ধ তার
ব্যয় উৎকৃষ্ট করিলে, সেখানে জানী পুরুষ-
দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বসাধারণের লব্ধ
তাহাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিতে প্রস্তুত
করিলে, তাহার ফল এই হইল যে, যে
জ্ঞানালোক তোমার ব্যক্তিগত অন্তরে আবদ্ধ
ছিল, তাহা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল;
যে জ্ঞান-সূত্রী তোমার চিত্তে অগ্নির স্তায়
জ্বলিতেছিল তাহা সাংসারিক তাপশক্তির
স্তায় হৃদয় নত নত চিত্তকে উত্তপ্ত করিয়া
তুলিল।

অন্তএব বর্তমান সময়ে বানবৈর মনে
এই একটা ভাব গড়াইতেছে যে, ব্যক্তিগত
জীবনের উন্নতির লব্ধ যেমন ব্যক্তিগত উপায়
অবলম্বন আবশ্যক, তেমনই সামাজিক জীবনের
উন্নতির লব্ধ সামাজিক উপায়ও অবলম্বনীয়;
কিন্তু আমাদের প্রাচীন শিক্ষা এই সামাজিক
চেষ্টার অঙ্গকূল নহে; তাহাতে ব্যক্তিগত
সাধনকে ফুটাইয়াছে, অনাসক্তি ও বৈরাগ্যকে
উৎপন্ন করিয়াছে, পারত্রিক কল্যাণের
সহিত তুলনার ঐহিক স্বার্থকে তুচ্ছ করি-
য়াছে, ভোগ অপেক্ষা ভোগকে প্রিয় জ্ঞান
করিয়াছে; কিন্তু মানবের সামাজিক জীবন

ও সামাজিক উন্নতির প্রতি অন্ধ থাকিয়াছে
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইজন্যই এদেশের
সমাজ গতিশীল না হইয়া স্থিতিশীল হইয়া
রহিয়াছে। সামাজিক উত্তম ও চেষ্টার
অভাবে জ্ঞান ও ধর্মভাবে কতিপয় সাধকের
মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে; এবং সাধারণ জন-
মতলী অজ্ঞতার মধ্যে বাস করিতেছে।
যেটা গারমখানা সেটার উন্নতিতে আবার
কাহার মন থাকে! যার হাত পা কঠিন
মুখলে বঁধা, মুখ বুজিয়া সঙ্ক কংই যার
একমাত্র পথ, সে আবার কোন্ সামাজিক
উন্নতির প্রয়াস পাইবে! এরূপ প্রাণিপুঞ্জের
সমাজ স্থিতিশীল হওয়া অনিবার্য।

ধর্মের পারত্রিকতার পরে উল্লেখযোগ্য
বিষয় শাসন-শক্তি ও বাধ্যতা অর্থাৎ একদিকে
শাসন শক্তি অপরদিকে বাধ্যতা। আমাদের
ধর্মের প্রাচীনেরা স্পষ্ট বুঝিয়া গুহাচ্ছিলেন
যে, মানবসমাজকে রাখিতে হইলে ইহার
অস্বীকৃত ব্যক্তিদিগকে চিত্রা ও কাঞ্চীর বিষয়ে
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে চলিবে না। যেমন
গৃহ পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক শিশু যদি স্বীয়
স্বীয় অঙ্গপ্রায় মত চলে; এবং স্বীয় স্বীয়
প্রবৃত্তির অনুসারে কার্য করে, তাহা হইলে
গৃহে শৃঙ্খলা ও স্থিরত্ব থাকে না; এই কারণে
যেমন শিশুদিগকে পিতামাতার আজ্ঞাবীন
রাগিতে হয়, তেমনই জনসমাজেও মাহুষের
কর্তৃত্বের একটা সীমা নির্দেশ করিতে হয়।
এইজন্যই তাহার আদেশ করিয়াছিলেন
যে, গৃহ-পরিবারকে পিতার অধীন, নারীকে
পুরুষের অধীন, প্রজাসাধারণকে গুরু
সুরোহিতের অধীন, রাজাকে রাজার অধীন
রাখিতেই হইবে। এই শাসন-শক্তি ও বাধ্যতা

আমাদের হিন্দু সমাজের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের মধ্যে একাগ্রভূতপরিবারপ্রথা প্রচলিত থাকতে এই শাসন-শক্তি ও বাধ্যতা নবীনকে অনেক ফলে প্রাচীনের শক্তির অধীন রাখিতেছে, এবং অনিবার্যরূপে সামাজিক উন্নতির গতিকে মন্দীভূত করিতেছে; ইহা সকলেই অস্বীকার করিতে পারিবেন। সামাজিক শাসন সর্বাঙ্গই আছে, কিন্তু পাস্চাত্য জাতিসকলের মধ্যে এক একটা দম্পতির এক একটা সংসার এই প্রথা প্রচলিত থাকতে, তাহারা অনেক পরিমাণে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতে পার; ওই জনে এক মত হইলেই অনেক সময়ে আপনাদের অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে দেশের স্বাধীনতা সন্তব নহে। আমাদের দেশে মানুষের মনে কোনও নূতন জীব আসিলেই সে দেখিতে পাই যে, সে অপর দলজনের সঙ্গে দৃঢ়স্থির বন্ধ আছে; পিতা মাতার আজ্ঞাধীন আছে; স্ত্রীপুত্র ব্যক্তিগতভাবে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সহজ নহে। যদিও বা সে সাহস করিয়া অগ্রসর হয়, তাহা হইলে জন্মজন্মের অবাধ্যতা অপরাধে অপরাধী হইয়া তাহাকে সমাজের নিন্দা, কুৎসা ও অবজ্ঞা ভোগ করিতে হয়। ইহার অনিবার্য্য ফল এই হয় যে, অধিকাংশ লোকই নূতন আলোককে আকৃষ্ট করিয়া প্রাচীনের বশবর্তী হইয়া চলে। এক্ষণ সমাজের পক্ষে স্থিতিশীল ও উন্নতি বিমূখ হওয়া অবশ্যস্বাভাবিক। কেবল তাহা নহে; এই যে ব্যক্তিগত শক্তির উপরে সামাজিক শক্তির অতিরিক্ত আত্মার প্রভাব,

ইহার মধ্যে যে জাতি পঙ্কিত হয়, তাহা-
যের জাতীয় চরিত্র হইতে উদাস, ক্ষুণ্ণ,
অবলম্বন, নবম্পৃষ্ঠা, নবাকাক্স। সমুদয় অগ্র-
হীত হইয়া যায়, এবং ক্রমে তাহারা গভর্ণিকা
প্রবাহবৎ গতানুগতিকের অঙ্গসরণ করিতে
পারে।

এইত গেল শাসন-শক্তি ও বাধ্যতার
উপরে সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকিবার
ফল। তৎপরে জাতিভেদ ও সামাজিক
বৈষম্যের ফলও উদয়রূপ। এদেশে জাতি-
ভেদ প্রথা কিরূপে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ক্রম নির্দেশ
করা দুঃসাধ্য। তবে অবাগাদিগের মধ্যে
আগাদিগের অধিকার ও ক্ষেত্রবিজিতের
সম্বন্ধ হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে;
ইহা সন্দেহ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক
এ প্রথা যে অতি প্রাচীন তাহা নিরালিঙ্গ-
বেদ মন্ত্র হইতেই জানা যায়। বেদের পুণ্য
স্থানে আছে—

ব্রাহ্মণোহত সুখমাসীৎ বাহু রাজতঃ কৃতঃ,

উত্র যদস্য তৎবেদ্যঃ পত্ন্যাং পুত্র অধারতঃ।

ইহার অর্থ—পুরুষের সুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুসদ
হইতে ক্ষত্রিয়, উক্খর হইতে বৈশ্য, এবং
পদবর হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে।

জাতিভেদ না রাখিয়া যে সমাজের স্থিতি
রক্ষা পাইতে পারে তাহা এসেবার লোকের
ধারণাতেই আসে নাই; এবং বর্ণ-গত
অপেক্ষা অধিক সম্বন্ধ বিধব এদেশের পক্ষে
আর কিছুই নাই। স্বীকার করিতেছেন;—

অবর্ণাভিত্যাবৎ কক্ষ প্রহ্মাশি কুলত্রিভঃ।

শ্রীশু দ্রোণ বাক্যে তাহাতে বর্ণভেদঃঃ

অজ্ঞান কক্ষকে বলিতেছেন :—“হে কক্ষ
অখণ্ড যখন অবলম্বন তখন কুলদ্রীমগের চরিত্র
এই হয় ; জ্ঞানোক এই চরিত্র হইলে বর্ণসঙ্কর
উৎপন্ন হয় ; বর্ণসঙ্কর কুলয় ব্যক্তিবিশেষের
কুলয় ব্যক্তিবিশেষের নরকের কারণ হয় ; যে
কুলে বর্ণসঙ্কর হয় তাহার পিতৃপণ পুত্র-
পিত্তোদক হইয়া পতিত হন ; কুলয় ব্যক্তি-
বিশেষ বর্ণসঙ্কর-কারণ দোষে জাতিধর্ম ও
কুলধর্ম সকল উৎসন্ন হয় ; হে জনানন্দ যে
মহাধর্মের কুলধর্ম উৎসন্ন হয়, তাহারে নিশ্চিত
নরকে বাস হয়। এই কথা শুনিয়া
আমিতেছি।”

গীতাচার্য বর্ণসঙ্করকে বৈষ্ণব ভয়ের চক্রে
দেখিরাছেন, সেই ভয় অপেক্ষে প্রজালাবা-
রণের মনে চির দিন কার্য্য করিতেছে।
এই জাতিভেদ প্রচার উপরেই হিন্দু সমাজ
দণ্ডায়মান। কিন্তু এই জাতিভেদ প্রথা
হইতে অনিবার্যরূপে দুইটি ফল ফলিয়াছে।
প্রথমতঃ—জাতিভেদের কঠিন নিষেধ সকল
আচার ব্যবহারগত পার্থক্য উৎপন্ন করিয়া
সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়, উন্নয়ন সম্প্রদায়,
এইরূপে কানীর কোটার মত বিভিন্ন জাতির
সৃষ্টি করিয়াছে। এক এক মুষ্টি মানুষ গইয়া
এক একটা দল বা জাতি হইয়াছে। তাহাদের
আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ভারতীয়
হিন্দুসমাজ এইরূপে খণ্ড বিখণ্ড হওয়াতে

কোনও প্রকার সামাজিক উন্নতির লক্ষ্য
সকলকে একত্র করা চরিত্র ব্যাপার হইয়া
ধাড়াইয়াছে। এখন দেখিতে পাউতেছি,
সকল শ্রেণীর মানুষের মনে উন্নতি-সুখ
জাগিয়াছে বটে, কিন্তু এই জাতিগত পার্থক্য
বুড়াইয়া সকলে এক ভাবে কার্য্য করিবার
প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে না। সেই উন্নতি সুখের
ফল এই দেখা যাউতেছে যে, কায়স্থ-মতা,
স্বর্ণ-বর্ণিক সমিতি, বৈষ্ণব-মতা, বৈষ্ণবসমিতি
প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া, পুরাতন সম্প্রদায়গত
পার্থক্য সকলকে দুর্বীকৃত করিবার চেষ্টা
চলিয়াছে ; এবং জাতীয় উন্নতিকে খণ্ড খণ্ড
করিয়া লওয়া হইতেছে। অতঃপর সমুদয়
বিভাগের লোক সামাজিক ভাবে মিলিত
হইয়া সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করা, এখনও
কঠিন রহিয়াছে। বিতীর্ণতঃ—এই জাতিভেদ
প্রচার আর এক ফল এই ধাড়াইয়াছে যে,
জাতিগত মানুষকে অতিরিক্ত মাত্রায় জাতীয়
শাসনের অধীন করিয়া প্রত্যেকের পক্ষে
স্থানীয় ভাবে অগ্রসর হওয়া কঠিন করিয়াছে।
মানুষ যে কোনও নবভাব গ্রাপ্ত হইয়া
ভদ্রপূর্ণায়ে কার্য্য করবে তাহার ঘো নাট,
জাতিনাশের ভয়েই অস্থির। বংশপরম্পরা
ক্রমে এই ভয়ের মধ্যে বাস করিয়া করিয়া এ
দেশের মানুষ জাতিবন্ধন ও স্বাণবন্দন-বন্ধন
হইয়া গিয়াছে। কাজেই সমাজ বিত্তিনীল ও
উন্নতি-বিশুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের সমাজ প্রাচীন ভিত্তির উপরে
প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক প্রকার চলিতেছিল,
ইতিমধ্যে প্রভাচ্য লগত হইতে আর এক
শক্তি আদিয়া দেখা দিয়াছে, এবং সামাজিক
জীবনকে অধিকার করিতে চাহিতেছে।

এ শক্তির প্রকৃতি ও লক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ।
প্রাচীন শক্তির লক্ষণ বলিয়াছি (১)
পারত্রিকতা ও অদৃষ্টবাদ, (২) শাসন-শক্তি ও
বাদান্ত, (৩) জাতিভেদ ও বৈষম্য ; এ শক্তির
লক্ষণ, (১) ঐহিকতা, (২) স্বাধীনতা-
প্রকৃতি, (৩) সাম্য, একেবারে বিপরীত ।

ঐহিকতার অর্থ এই—আমাদের পার-
ত্রিকতাতে বলে, ঐহিক জগৎকে মোহ বলিয়া
জান, পারত্রিক সন্দর্ভকেই লক্ষ্য হলে রূপ,
কিন্তু প্রতীচা ভগন্ত হইতে যে ভাব
আগিতেছে তাহাতে বলিতেছে, মানবের
ঐহিক উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি,—পারত্রিক
সন্দর্ভের অন্তর্গত ঐহিক জগৎকে তুচ্ছ করা
নির্বোধের কাজ, এ জগতের জ্বলমলন্ত যত
পার ভোগ কর । বলিতে কি পান্ডিত্য জগতে
মাহুদের ভোগতৃষ্ণা যেন অতৃপ্ত ও অতৃপ্তীর
মনে হয় । আমাদের শাস্ত্রকারেরা যে
বলিয়াছেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুখ্যোৎপাদনামাশ্রিতঃ ।

হবিষ্য স্ফুৰ্য্যন্তে বৈ কুরং যোতিষর্ঘ্যতে ॥

অর্থাৎ কামা বস্তু পাইয়া কামনার ভগনই
নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহতির স্ত্রায়
তদ্বারা কামনাকে আরও গর্জিত করে।—
প্রতীচা ভাজো যেন তাহাই দেখিতেছি,
ভোগের অন্ত নাই, কামনাও অন্ত নাই ।

মানবের বুদ্ধিতে যত দূর আসে, মানবের
অর্থনামার্থে যত দূর জ্ঞান, ভোগের নানা
পথ আবিষ্কৃত হইতেছে, অগত আকাঙ্ক্ষা ও
প্রাণের অন্ত নাই । বলিতে কি সে দেশের
লোকের ঐহিক জ্বরের প্রতি এত দৃষ্টি যে,
জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিক্রমে তাহারা ঐহিক
জ্বরের দ্বারা বিচার করিয়া থাকে । কোনও

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত কোনও নূতনতত্ত্বের
আবিষ্কার করিবারে, তখনই সর্বপ্রথমে
যেন তাহাদের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়,
এতদ্বারা কোনও ঐহিক জ্বল বা হবিষ্য বৃদ্ধি
হইবে কি না । যদি জানিতে পারে তদ্বারা
কোনও ঐহিক জ্বরের বৃদ্ধির আশা নাই,
তখন তাহারা সেই মহাত্ম্যের প্রতি উদ্যমীন
হইয়া তাহাকে কতিপয় জ্ঞানীর আলোচনার
অন্ত রাখিয়া দেয় । এতদ্বারা তাহাদের নিকট
একজন প্রধান বিজ্ঞানবিৎ কখনও তাহার
আবিষ্কৃত তত্ত্বসকল মানবের ঐহিক জ্বল
সমৃদ্ধির দ্বারা অনেক পরিমাণে বাড়াইয়াছে ।
অধিক কি যেন যেন হয়, দীক্ষার দৃষ্টান্ত ও
উপদেশ এই ঐহিক জ্বল-লালসাকে সম্পূর্ণ
সামান্যইতে পরিভোক্তে না ।

কিন্তু এই ঐহিকতার আর একটা দিক
আছে যাহা সামাজিক উন্নতির সহায়
হইতেছে । গড়ের উপর তাহাদের মনোম
ভাব এই, যাহা হইবার এই ভগতেই চইতে
হইবে, যাহা করিবার এই ভগতেই করিতে
হইবে । মাহুদের উন্নতি সংগ্রামক্ষেত্র,
বিশেষতঃ মানবের সামাজিক উন্নতি সংগ্রাম-
ক্ষেত্র ; একা একা সংগ্রাম করিয়া না পার,
দলবলে মিলিয়া সংগ্রাম কর ; দল জনের
উন্নতি হইলে প্রত্যেকের উন্নতি অবশ্যজ্ঞানী ।
এই সংগ্রাম জ্বরের প্রবল প্রাকারে, সে দেশের
মাহুদের অতুত সামাজিক সমস্যার শক্তি দৃষ্ট
হইতেছে । দৃষ্টান্ত বস্তু মনে কর, তাহারা
বোধ যে কলকারখানার মালিকদিগের
হস্ত হইতে দরিদ্র শ্রমজীবীদিগকে বাচান
চাই অমনি চরিত্র হাকার পক্ষপাত দ্বারা লোক
এক ছোট হইয়া এক দূর দূরিল, এক

সংগ্রামে ভূবিলা! এইরূপে তাহাদের অদ্বুত স্বাধীনতা-প্রসূতির সহিত অদ্বুত একতা-প্রসূতির সমাবেশ দেখা যাইতেছে। ঐহিক অশ্বকে ক্রম ও হেতু ভাবিলে তাহারা এইরূপ করিতে পারিত না। এই ঐহিকতার ভাব ভ্রমের থাকাতেনই দেশকল দেশের হাঙ্গার হাঙ্গার নবনারী মানব-সমাজের চঃপস্থিতি দূর করিবার জন্য সেই মন সমর্পণ করিয়াছেন। তাহারা গুণীয়া হ্রাসকরণ, বিপর্যয় নিপত্ত্যাপ, অনিশ্চিতকে নিশ্চয়, বোগীনের স্তম্ভন প্রভৃতি কার্যোনিমুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। কেবল মাত্র ব্যক্তিগত সাধনে দ্বয় থাকাকালি স্বার্থপরতা জ্ঞান করিয়া সে পণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ তাহাদের মনে নাই। বাস্তবকে অপন্যাস উন্নতি আশা করিয়া লইতে চাইবে ভ্রমের এই সত্যই বহুশূল থাকাতেন উত্তম, সাধন, স্বাবলম্বন প্রভৃতি মানব চরিত্রে কুটিয়া পুরুষকারের সৃষ্টি করিতেছে; এবং সেটুকু পুরুষকার সমর্থ সাধারণ উন্নতির সহায় হইতেছে।

তৎসংগে নব্যগত শক্তির আর একটী লক্ষণ স্বাতন্ত্র্য-প্রসূতি। প্রতীচ্য জগতে এই স্বাতন্ত্র্য-প্রসূতি বিন বিন এক বাড়িতেছে যে, চিত্তাঙ্গল মানবহিতৈষী ব্যক্তিগণ দেখিয়া ভয় পাইতেছেন; এবং অনেকে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-প্রসূতির অতিরিক্ত বিকাশের প্রতি-বিধানস্বরূপ socialism বা সামাজিক সান্যবাদ প্রচার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই স্বাতন্ত্র্য-প্রসূতির বিকাশের অনেকগুলি কারণ বর্ণিত আছে। প্রথমতঃ—পূর্বমান সভ্যতার অলম্বন বড় বড় সহরের সৃষ্টি হইয়া, হাঙ্গার হাঙ্গার নরনারী তার মধ্যে বাস

করিতেছে। বড় বড় সহরের কেবা কার পথ পথ, কেবা কাহাকে দেখে! স্ততঃ তাহারা দেখানে যথেষ্টরূপে বাস করিতে পাইতেছে, অগত্যাতে যথেষ্টরূপে চলিতে পারিতেছে। গ্রামে ও জনপথে যে সামাজিক শাসনের মধ্যে মানুষকে বাস করিতে হয়, তাহারা তাহার বাহিরে থাকিতেছে, স্ততঃ যথেষ্ট চারিত্র্য তাহাদের প্রকৃতিতে বর্জিত হইতেছে। বিতীর্ণতঃ,—বহুশূল্যক পুরুষ ও রমণী দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকতে সামাজিক বন্ধন ও শাসনের মধ্যে প্রসিষ্ট হইতেছে না, স্ততঃ স্বীয় প্রসূতি ও ইচ্ছার অনুসারে চলিবার সুযোগ পাইতেছে; তদ্ব্যতঃ তাহাদের স্বাধীনতা-প্রসূতি বর্জিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ সংবাদপত্র সকল বহুশূল প্রচার হইয়া প্রতিদিন দেশবিদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামবার্তা সকলের গোচর করিতেছে, তাহাতেও লোকের স্বাতন্ত্র্য-প্রসূতিক অদ্বুতরূপে বর্জিত করিতেছে।

এই স্বাতন্ত্র্য-প্রসূতির বিকাশের ফলস্বরূপ ধনী দরিদ্রে, রাসা প্রজাতে বিবাদ বাড়িয়া যািতেছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অসমাজবিগণ আর অবজ্ঞার তলে থাকিতে চাহিতেছে না, তাহারা ইতিমধ্যে প্যারিসেট মহাসভাতে চর্চনা জনের অধিক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অজ্ঞাত দেশের নীন দরিদ্র অসমাজবিগণের অভ্যুত্থান দৃষ্ট হইতেছে।

কিন্তু ইহাও বোধ হয় স্বীকার্য যে এই স্বাতন্ত্র্য-প্রসূতি অসংযত হওয়াতে অনেক দেশে বৈধাচারকে প্রসন্ন দিতেছে এবং বাস্তবকে

ধর্মভাববিহীন করিয়া ভোগলালসাতে মগ্ন করিতেছে।

স্বাভাব্য-প্রকৃতির পণেই মান্য। সাম্যকে স্বাভাব্য-প্রকৃতির অঙ্গীভূত বলিলেও হয়। স্বাভাব্য-প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া সে বেপের মাহুদ আর চিহ্নগত সামাজিক বৈষম্যসকল সম্বন্ধ করিতে পারিতেছে না। সে সকল বেপে আনন্দের বেপের জার জাতিভেদ নাট, কিন্তু লেখানেনও ধনী দরিদ্রের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য বিস্তারান। কিন্তু সে দিবসে এক মহা বিপদার এই ঘটতেছে যে, শিল্প বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধনাগনের নানা দ্বার উন্মুক্ত হওয়াতে আর যে দরিদ্র কাল সে ধনী হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং আর যে অবজার তলে বাস করিতেছে কাল সে সম্বন্ধের পাত্র হইয়া পড়াইতেছে। সুতরাং সাম্যের ভাব দিন দিন বর্জিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সকল শ্রেণীর মধ্যেই জ্ঞান বিজ্ঞান হইয়া, সকল শ্রেণীতেই জ্ঞানী ভণী মাহুদ-সকল দেখা দিতেছে। ইহাও সাম্যভাবের তুচ্ছির অপর কারণ।

এখন আমাদের পক্ষে এই মহাপ্রশ্ন আসিয়াছে, কোন্ পণ আমাদের অবলম্বনীয়? আমরা কি প্রাচীন ভিত্তির উপরে পড়াইয়া, পারত্রিকতা, অদৃষ্টবাদ, শাসনশক্তি ও গাথতা, জাতিভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখিব, না ঐহিকতা, স্বাভাব্য-প্রকৃতি ও সাম্যের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া প্রভীচা সম্বন্ধেতে চাপিয়া দি।

এ প্রশ্নের উত্তর এই, নব ভারতে নব সামাজিকতার প্ররোজন অর্থাৎ যে সামাজিকভাবে প্রাচীণ প্রভীচাকে মিলিত করিলে, যাতে ঐহিকতার সহিত পারমার্থিকতাকে,

স্বাধীনতার সহিত সংযুক্তকৈ, সাম্যের সহিত একতাকে ব্যক্তিগত সাধনের সহিত সামাজিকতাকে সন্নিবিষ্ট করিলে, সেই সামাজিকতার প্ররোজন। নব ভারতে নর নারী সমানভাবে শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিলে, অথচ বৈরাগ্যের নিমগ্ন হইবে না; পদদলিত জাতি সকল উন্নিত হইবে, অথচ সামাজিক বিশ্বাসনা ঘটবে না; মানব ব্যক্তিগতভাবে আত্মোন্নতি সাধন করিলে অথচ সামাজিক উন্নতির অত্র সম্মিলিত হইবে।

ইহা কি সম্ভব? নিম্নের সম্ভব। সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রকৃত ভিত্তিধর্ম যদি ভারতের সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে এই অপূর্ণ সম্মিলন সম্ভব বোধ হয়। ভারতের সামাজিক জীবনের বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলেই অসুচব করা যায় যে, ধর্ম-ভিত্তি চিরদিন এদেশের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ভিত্তিতে রহিয়াছে। মাহুদ বিষয়ের মধ্যে থাকিলে অথচ বিষয়ে আসক্ত হইবে না, ইহা ধর্মভাব ভিন্ন আর কোন সাধিত হইতে পারে? সাতোনেহা পারত্রিকতাকে প্রবল করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, যে ঐহিক যাহা দেখিতেছে, তাহা অনিত্য, অস্থায়ী ও কারাগার বিশেষ, মনকে ইহার বাহিরে ও ইহার উপরে রাখ, পারত্রিক কল্যাণ কিলে হয় সেই চিন্তা করা। সেই ধর্মভাব এদেশের মাহুদের চিত্তের অবিম্ভাজ্যেতে প্রবর্ত হইয়া-ছিল, এবং অনাগতিক ও বৈরাগ্যের অদ্বুত দৃষ্টান্ত সকল উৎপন্ন করিয়াছিল। এখন প্রশ্ন এই নবসামাজিকতার সম্বন্ধেলে অনাগতিক ভাবকে কিরূপে রক্ষা করা যায়? যদি তাহা করিতে না পারে, মাহুদ বিষয়-

শক্তিতে নিমগ্ন হইবে ;
বিবিধ পাশে লিপ্ত হইবে ।

নব সামাজিক জীবনের মূলে আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, মানুষকে নব তত্ত্বদর্শনে দীক্ষিত করা । নব তত্ত্বদর্শন শব্দ এতদ্ব্যক্ত বাহ্যের কর্তৃত্ব, যে আমাদের দেশে একপ্রকার পুৰাতন তত্ত্বদর্শন আছে, বাহ্য ভাবুকতার নামান্তর মাত্র, এবং যাচা মানবের পাশ্চাত্যতিকে সম্পূর্ণরূপে শাসনাধীন রাপিতে পারে নাই । নবতত্ত্বদর্শন তাহাকেই বলিতেছি বাহ্য সেই সৃষ্টিকর্ত্তা পরম পুরুষে শ্রীতিস্থাপন করাইয়া মানব-প্রকৃতিকে অধ্যাত্মযোগে তাঁহার সহিত যুক্ত করে । অধ্যাত্মযোগের অর্থ তাঁহার স্বরূপে মানবাত্মার বিপর । মোটাবুটি বলিতে গেলে, তাঁর বস্তুর তিন লক্ষণ আছে,— জ্ঞান, শ্রীতি ও পবিত্রতা বা ধর্মভাব । তিনি মানবাত্মাকে এই তিন বস্তু দিয়া আপনীর সহিত যুক্ত রাপিয়াছেন । চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে মানুষ এই তিন স্বরূপে জগতের নিকে সীমাবদ্ধ থাকিবার তাঁহার নিকে অসীম রহিয়াছে । আমাদের জ্ঞান যখন প্রসারিত হয়, তখন তার একটা সীমা দেখা আসে বটে, কিন্তু কে বলিতে পারে যে সে সীমা চরম সীমা ? মানবাত্মা তাহা স্বীকার করে না । মানুষ জানে সীমাবদ্ধ কিন্তু তাহার জ্ঞানাকাক্সা ও জ্ঞানের গতি অসীম । তবেই আমরা অনন্তের নিকে উপস্থিত বলিয়াছি । যে পরিমাণে আমরা জ্ঞান, প্রেম, স্বপ্নভাব, ও ধর্মবুদ্ধির অনন্তোপ্ত প্রসারকে প্রাপ্ত হই, সেই পরিমাণে আমরা সেই পরমপুরুষের সহিত অধ্যাত্মযোগ নিবদ্ধ

করিতে সমর্থ হই । উপনিষদ এই অধ্যাত্মযোগ স্থাপনের বিষয়ে বার বার উপদেশ দিয়াছেন । এই অধ্যাত্মযোগ প্রকৃত তত্ত্বদর্শনেই স্থাপিত হইতে পারে ।

সেই পরমপুরুষে বিভক্ত ও ঐকান্তিক শ্রীতি স্থাপন করিয়া মানুষ এই অধ্যাত্মযোগে যখন আরোহণ করে, তখন তাহার চিত্ত বিষম মধো থাকিবার এবং যেরূপ অসীম চাইয়া যায় ; মন সেই মহা দত্তার ও মহাপ্রভেদে নিমগ্ন হইয়া সূর্য প্রেমকে অতিক্রম করে সূর্য্যতঃ অনাগতি যতাই আসে তাহা মানুষের পাশ্চাত্যতিকে দমন করে ; এবং বাহ্য অসৎ তাহাকে বর্জন ও বাহ্য সৎ তাহাকে গ্রহণ করে ।

এই ঐশ্বর-শ্রীতিভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা হইলে সে জীবনকে সুস্থ, সুখী, ও উন্নত করে, তখন মানুষ অহুভব করিতে থাকে মানব-দেবাই ঐশ্বরের সেবা, সূর্য্যতঃ তখন জনসমাজের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য আপনীর বেহ মন নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় । অতএব ইহাতে ঐশ্বিকতা ও আধ্যাত্মিকতা মিলিত হয় ।

কেবল তাহা নহে নব তত্ত্বদর্শনে স্বাধীনতা ও সাধুচরিত্র-উত্তরকে মিলিত করিবে । অধ্যাত্মযোগের বিষয়ে বাহ্যতা চিন্তা করিয়াছেন, তাহার সফলেই জানেন যে তাহার প্রকৃতিই স্বাধীনতা । মন্ত যেমন জগে বিহার করে, পক্ষী যেমন আকাশে বিহার করে, তখন তেমনি আমরা যখন পরমাত্মাতে বিহার করে তাহার নাম অধ্যাত্মযোগ । যেখানে শ্রীতি সেইখানেই স্বাধীনতা, সেইখানেই আত্মার স্বাভাবিক প্রকৃতির পূর্ণ চরিতার্থতা । অথচ এই তত্ত্বের সহিত

সামুদ্রিক জড়িত ; কারণ প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা
সে পার, অপরে আধ্যাত্মিকতা দেখিবার চক্ষু
সে পার ।' যে জন প্রকৃত ভক্তিতে উন্নত,
তাহা বিনয় সঙ্গীত মত । সুতরাং নব ভক্ত-
পন্থের উন্মেষণ মধ্যে বাহ্যিক-প্রসুত্তিরূপিত
উজ্জ্বলতার ভর নাই ।

ভারতে নব সামাজিকতার আবির্ভাব
অনিবার্য বোধ হইতেছে । কি প্রকারে তাহাকে
নব আধ্যাত্মিকতার দ্বারা অলুপ্তানিত করা যায়
ইহাই এখন আমাদের পক্ষে সঙ্গীতপন্থা কঠিন
প্রশ্ন ।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী ।

বাগানবাড়ীর কথা ।

নিম্নক বাগানবাড়ীর উপর দিয়া নিম্নাচর
পানী বিকট-স্বরে চীৎকার করিয়া গেল,
তাহার দে চীৎকার শ্রুতগৃহে প্রতিধ্বনিত
হইয়া উঠিল ।

নিম্নক বৃক্ষ এবং তরুণমণ্ডি দে চীৎকার শব্দে
শিররিগা উঠিল । চাপা গাছ অল্প বৃক্ষগুলিকে
সম্বোধন করিয়া বলিল, “তাই এর মানে
তোমরা বলতে পার কি ? কেন প্রত্যহ
এমনি সময়ে একটা পানী স্রুৎ তালগাছের
মাথা থেকে বাগান বাড়ীটার ঠিক উপর দিবে
ঐ ঈর্ষণাল দাছটা পর্য্যাপ্ত এমনি চীৎকার
ক’রে যায় ?”

গোলাপ গাছ মাথা নাড়িয়া বলিল “আর
কেনই বা প্রত্যহ সম্বোধন মনে হয় কে
যেন মাধবী গাছের আশে পাশে আমাদের
ঘিরে ঘিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে !”

কেহই উত্তর দিতে পারিল না, সকলেই
বলিল, “হ্যাঁ তাই আমরা গত্যহই ইহা দেখি
বটে, কিন্তু জানিনা ইহার ভিত্তি কি গুঢ়
রহস্য আছে ।”

দহকায়ের বক্ষ লয় সুপ্রোপিণ্ড মাধবী-
লতা তখন কেমন-কণ্ঠে বলিল, “জানি
জানি সে কথা !”

যত তরুণতা আশ্রয় হইয়া বলিল, কুম্বি
জান ? কি জান মাধবী ?

মাধবীলতা বাতাসের সহিত একটুখানি
হুনিয়া বিহর হইয়া কহিল সে কথা তোমরাও
জানুতে যদি একটু লক্ষ্য করে দেখতে । যে
ঘটনার কথা আমি বলব সেটা যখন ঘরেছিল
তখন আমার ঐ যে প্রথাবাটা ঘরের ভিতর
চুকোছে সেটা নিত্যক শিত ছিল । ঘরের
ঐ জানালার পাশেই তার তরুণ শিরটি গিয়ে
পৌছিল, প্রত্যাহার ঈর্ষণ-বাতাসের সঙ্গে
সে হেলে ছুদে নাচত, এবং কখনও বিহরতাবে,
কখনও একটী তড়িত-নিখার মত চকল হ’য়ে
সে ঐ ঘরের ভিতরকার মাথুঘরে, তাণের
প্রাত্যহিক আচরণ-ব্যবহার নিগোষণ করত ।
সে ঘটনার কথা বলছি, সেটা সেই প্রত্যক
ক’রেছিল ।

নিম্নক বৃক্ষ-রাজি সেই অদ্ভুত কাহিনীর
প্রতীক্ষা শুরু হইয়া গেল ।

মাধবীলতা ক’হল “এহা! রামলোচনের
সমর এই বাগানবাড়ীতে প্রত্যহ যে কাত
হইত তা তোমরা জান । এতো তখন স্রুতী
বেশিগেই তাহাকে রাক্ষাস লজ সংগ্রহ করিয়া
আনা হইত ! তাহার যখন প্রথম প্রথম আগিত

তখন মনে হইত তার ইহাং কিছুতেই বক্তৃতা স্বীকার করিবে না, বরং কিছুতেই নশিদান দিবে না। কিন্তু মাহুদের মধ্যে নাকি বর্ষ অশেষ উঁচু ঐশ্বর্য ব'লে একটা জিনিষ আছে। সেট ঐশ্বর্যের নিকট অবশেষে তার পরাক্রান্ত হ'ত। ঐ যে বাগানবাড়ীর সামনে অতভেদী শুল্ল গৃহ-টাকে ঘিরে সন্ধ্যাকালের লাতাস হা হা ক'রে উঠতে থাকে, ও কার বাড়ী জানে? এমনি একজন লক্ষ্মী যে প্রথম দিন আশ্চর্য্য করিতে গিয়েছিল, কিন্তু আমি জানি তার পর এক মাসের মধ্যেই তার বিহার-গৃহ ঐ বাড়ীর ভিত্তি আশ্রয় হ'য়েছিল।

এমনি করে কত দিনকার কত আশ্চর্য্য ঘটনাই এখানে সংঘটিত হ'য়েছিল। কত অনাগর অন্ন, কত আশ্রয়হীন দীর্ঘ-রাস, কত অভিসম্পাত যে এই গৃহের তরে তরে পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে, তার ইরস্তা নেই। আরও এক একদিন মনে হয় যেন কার কল্প কল্পনে সমস্ত ঘরটা পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠিল, যেন কার আগলগ চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে, যেন কোন নিঃসহা তার শেষ সামর্থ্যটুকু বিরে আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রে, ব্যগ্র হ'য়ে জানালার মধ্য দিবে দেখে—অন্ধকার! সে দিন যে অত্যাচারটা নিদারুণ সত্য ছিল—তার মিথ্যা অভিনয় মাত্র।

অনেক দিন এমনি ক'রে গেল, যার নুতন আসত তারা হুই একদিন কল্লিকটি ক'রে বস মানত। তার পর যখন আরও পুরাতন হট্টা বাইত তখন আমাদের গা থেকে যেমন শুকনো পাতা করে পড়ে

তেমনি তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত। এই দেখে দেখে আমার মাহুদের উপর এমন যুগা হ'য়েছিল! ক্লম যখন আমাদের গা থেকে করে পড়ে তখন আমরা তাদের জন্ত কত গুণ করি কত শীঘ্রনিশ্বাস ফেলি, কিন্তু মাহুগুলো আমাদের চেহেও নীচ! যাদের উপর আশ্রিত মনে হয় জীবনে কখনও ভাবলে না, একদিন হঠাৎ তাদের ঘরের আশ্রয়নার মত বাইরে ফেলে দেয় তার জন্ত চোখে এককিল্প অশ্রু আসে না।

একদিন একটু নুতনও দেখলাম। হেম-স্তের ফুরাণা কেটে গিয়ে বস্ত্রের লক্ষ্মী-স্ত্রী তখন দরতলকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল; আমাদের বোলের দিড় গড়ে দিখিদিখি পরি-পূর্ণ হ'য়ে যেত। আমার সমস্ত দেহ অকারণ সন্ধ্যা হুলে তরে উঠত, এবং একখানি সন্ধ্যা বস্ত্র ছবির মত পুশ্চনী কামিনী শোভার দৌলগে ঝলমল করত। এমনি বস্ত্রের এক দিড় লক্ষ্মী ভোগ্যমালোচিত সন্ধ্যাকালে এই বাগানবাড়ীতে একজন এল, যার রূপের কাছে বস্ত্রের অতুল লক্ষ্যও রান হ'য়ে গিয়েছিল, পুর্নিবার চাদের শোভা যার কাছে নিস্ত্রত বোধ হ'ত। তার রূপেরই মত দিড় তার নাম ছিল —মালতী।

প্রভাতের শুভ্র শিশির-কণার মত মালতী তেমনি স্বচ্ছ তেমনি সরল ছিল। কোথায় কোন গুপ্ত পাতার আড়ালে দেহতার আশ্র-র্য্যের মত সে একদিন পবিত্র প্রভাতে জন্ম নিয়েছিল, হঠাৎ যখন তার চোপ খুলল, তখন সে এই বাগানবাড়ীর কদম্বা অভিনয় দেখে শিহরিয়া উঠেছিল।

আমি ঠিক বৃদ্ধের পারতান সে ক্ষুধের একটা বিথম আঘাত পেয়েছিল। সে ভাবত, এই পৃথিবী! প্রভাতের মিষ্ট সুন্দর বাতাসের মাগধানে যখন শিশুর ঘুম ভাঙ্গে, তখন সে উঠে, নিদ্রে, চারিদিকে ক্রান্তির অপূর্ণ দৌলভ্য দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যায়, ভাবে কি সুন্দর পৃথিবী! মালতীর সে দিন ঘুর ভাবল সে দিন সে চেয়ে দেখলে বাগানবাড়ীর রুদ্ধ প্রাচীরের মধ্যে স্থগিত বিলাসিতা তার অশেষ কদম্বাতা নিয়ে তারই পানে নোমুণ হস্ত-দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

মালতী রাজা রামলোচন আর তার পারিবার্যগণের স্বর্গীয় অভিজ্ঞতাকে একেবারে ওলটু-পালটু ক'রে দিয়েছিল। অচেনা বিনয় ভয়প্রদর্শন তাহাকে বহিষ্কৃত করিতে পারে নাই, অবশেষে যখন অর্পণমগ্নাধিক্য পূর্ণ হইল তার কাছে পরাজিত হ'য়ে গেল, তখন রামলোচন বিথম প্রমাদ গলিলেন।

সমস্ত দিন ধ'রে মালতীকে দেখে আমার কৃষ্টি হ'ত না, মনে হ'ত এতদিন পরে একটা মাহুকের দেখা পেরেছি, যার কাছে দণ্ডই একমাত্র, আত্ম-মর্ধ্যাদার গৌরব থাকে ভাবের ক'রে তুলেছিল। মালতীকে দেখে ভক্তিতে আমার ডালগুলো নত হ'য়ে পড়ত, সে যখন আমার কাছে এই জাননিার পালে দাঁড়িয়ে অপুর আকাশের পানে তাকিয়ে থাকত, আর ধীরে ধীরে তার চোখ অঙ্গসিক্ত হ'য়ে উঠত, তখন হৃৎকোষ অছিলার আমার ডাল নেড়ে তার মাপায় ফুলগুলো নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে কৃতার্থ হ'তাম।

সন্ধ্যাকালে রামলোচন ধীরে ধীরে প্রবেশ

করিয়া বলিল “আজ ভাদ্রের আনির্নি।” মালতী কোন উত্তর করিল না।

একবার ঢোক দিলিয়া রামলোচন করিল “আজ তোমাকে চাই-ই।” মালতী এবার উত্তর দিল “সামারের সবই সম্ভব হ'তে পারে।” কিন্তু অপর্যেয় দ্বারা তুমি আমাকে কিছুতেই পাবে না।

“মালতি, কিন্তু তোমাকে আমি পতাই ভালবাসি, তোমাকে কেমন ক'রে পেতে পারি, সে উপায় ব'লে দাও।”

মালতী তার উজ্জল হঠাৎ চক্ রামলোচনের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল “আমি কিন্তু তোমাকে চাই না। তুমি আমাকে ভালবাস এ কথা আমি বিশ্বাস করি না — ভালবাসা এত কদম্বা এত নীচ নয়।”

“তোমার সঙ্গে আমি নীচের মত ব্যবহার ক'রেছি, স্বীকার করি; কিন্তু আমি তত নীচ নই, আমি সংশোধন ক'তে চাই, কেমন ক'রে সংশোধন করি, কেমন ক'রে দেখাই যে রামলোচনেরও সমস্ত জ্বর-বৃত্ত নিঃশেষে তকিরে যায় নি।”

মালতী গুঢ় অবচণিত স্বরে বলিল “তবে আমাকে বিবাহ করো। অপর্যেয় দ্বারা তুমি আমাকে কিছুতেই পাবে না, দণ্ডবত ব'দি আমাকে পত্বী ব'লে গ্রহণ করো তা হ'লে তুমি আমাকে পেতে পারো, অস্তথা নয়।”

* * *

তারপর একদিন ঢাক ঢোল সামান্যই সে বাগানবাড়ীতে বেধে উঠল, পুরোহিত এলো, মন্ত্রপড়া হ'ল, রামলোচনের সঙ্গে মালতীর বিবাহ হ'য়ে গেল। এ একটা মত মানবের ব্যাপার, কিন্তু কেন জানি না নিকষ কাণো

যেথের মত একটা গভীর অমঙ্গলের ছায়া
যেন তাকে মলিন করি দিবেছিল। আমা-
দের ক্ষুদ্র সাধা, ক্ষুদ্র কামনা, কিন্তু সেটুকু
সম্পূর্ণ ভাবের তত-আকাঙ্ক্ষার নিরোপিত
ক'রোইলাম।

তারপরে ঠিক দুদিন খেল। রামলোচন
ক্রোধে মালতীর কাছে আসে, তাদের হৃৎ
হৃৎয়ের কত কথা হ'ত। মালতী আকাঙ্ক্ষার
পানে চোখে থাকত। তার চোখে ক্রমশঃ
এক আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠতে লাগল।
হেম মালতীকে নবীন করে, তরুণ করে।
রামলোচনের বিলাস-ক্রীড়া জীবনের মধ্যে
একটা তরুণতা যেমন খীয়ে খীয়ে জেগে
উঠতে লাগল, তেমনি মালতীর বুকে চোখে
একটা নূতন আশ্রিত একটা নূতন তৃপ্তিরভাব
স্পষ্ট বোকা যেতে লাগল।

গ্রেম জিনিষটা মালতীর কাছে যেমন
নূতন, কদম্ব বিলাসিতার মধ্যে নিমজ্জিত
রামলোচনের কাছেও তেমনি নূতন বোধ
হ'য়েছিল।

আমরা তাদের জীবনের এই নূতন
মেখে ভাবতাম—আহা তরুণান এদের চির
দিন এমনি থাকুন।

* * *

বসন্তের মে একটা তারি হুন্সর দিন।
খামখা আমাদের দেহ ফুলে ফুলে ত'রে
উঠল। সাতাসের মধ্যে এমনি একটা মাদ-
কতা এলো যে লোকগুলো যেন মাতঙ্গ হ'য়ে
উঠলো! তাদের হৃদয় থেকে এক সুহৃৎ
যেন চিরজীবনের সব তার নেবে গিয়ে হালকা
হ'য়ে গেল। দিকে দিকে সেদিন কি
আনন্দের লাড়া পড়ে গেল।

কিন্তু এমন দিনে রামলোচন একটা
মস্ত ভুল করেছিলো। সে দিন বোধ হয়
সে স্মৃতিহীন ছিল না, তাই জেতে সে সুহৃৎ
পারেনি সে কি ক'রছিল। সন্ধ্যার সময়
সে আবার আগেকার মত দলবল নিয়ে
সাগানদাড়িতে এগে উপস্থিত।

মালতী তখন কিরোজা রকের পাটি
খানি পবে বসন্তের পোতাঘরী দেবতার মত
কাব প্রতীকার ছিল। তার চূর্ণকুল কণা-
লের উপর এলে পড়েছিল। ঠোঁটের উপর
রক্তিন নেশার মত একটা ঢাকলা। চোখে
একটা আবেশ-ভাব জেগে উঠেছিল।

এমন সময় রামলোচন ও তার সঙ্গীরা
এসে ডাকিল “মালতি।”

সুহৃৎ মালতী উঠিয়া পি.ডাইল, রাম-
লোচনের দিকে কিরোজা বলিল “একি!”

একজন সঙ্গী বলিয়া উঠিল “এমন হুন্সর
দিনটা—”

মালতী ফুৎফুৎ রামলোচনকে বলিল
“আমি তোমার ধর্ম পত্নী, তুমি কোন সাহসে
আমার নিকট তোমার সঙ্গীদের নিয়ে এলেছ।”

তখন তাহার সঙ্গীগণ উচ্ছ্বাস করিয়া
উঠিয়া পরস্পরের দিকে চাহিল, তাহার পর
তাহার মধ্যে একজন বলিল, “মিথ্যা মালতী।
সে বিবাহ মিথ্যা। সে ময় মিথ্যা, সে
পুঁজিহিত মিথ্যা, তোমাকে পাবার জে
রামলোচনের সে এক চাকুরী মায়—বিবাহের
মিথ্যা অস্তিত্ব।”

বসন্তের পরসুহৃৎের মত একটা গভীর
নিমজ্জতা সুহৃৎে আসিয়া পড়িল। সঙ্গীগণ
সহসা ক্ষুব্ধ হইয়া গেল, এবং রামলোচন
পাপের মত চাহিয়াছিল।

সহসা রামলোচন উদ্ভবের মত চৌক্যের
করিয়া উঠিল, “নরাধম, শিশাচ, পাবক, দূর
হ’, দূরহ’, এই মুহূর্তে দূর হবে যা !”

সঙ্গিগণ চলিয়া গেল। কষ্টে দেবতার
সম্মুখে গিড়ার-প্রার্থী মাধব যেমনভাবে
দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনই রামলোচন মালতীর
সম্মুখে শুষ্ক নির্জীক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।
হার তাহার এক মুহূর্তের দুর্জয়তা !

মালতী অনেকক্ষণ শুষ্ক পাকিয়া বলিল
“বা! জননাম তা সত্য ? মিথ্যা বণোনা।”

রামলোচন করিল, “সত্য, আমাদের
বংশের নিয়ম -”

মালতী দৃঢ় ভাবে বলিল “তোমাদের
বংশের নিয়ম আমি জানতে চাইনে।
যা’ শুনেছি তাই যথেষ্ট। তুমি আজ
হ’তে আমার কেউ নও—আমার সম্মুখ
থেকে চলে যাও। এই আমার শেষ বেগা—
তোমার এই প্রত্যারণার বল যেন জগবান
তোমাকে দেন—এই আমার শেষ প্রার্থনা।”
বলিয়া ছুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

বাহিরে রামলোচন প্রার্থনা করিতে
লাগিল “মালতি, আর একটিবার দেখা করো
যাও。” সে দিন দেখাযা মালতী বস
অপেক্ষাও কঠোর !

গভীর রাত্রি - মালতী ঘরে ঘরে এই
জানালার পাশে আনিয়া দাঁড়াইল। তার
চোখে একি জ্বালা, মুখের একি ভাব !
মাথার চুল তার কপাল বোধ হইল,
তাহার বেহের বশন স্তম্ভ হ’য়ে গিয়েছিল।
কিছু সে দিকে তার লক্ষ্য ছিল না।

সে আকাশের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ কি
ভাবিতে লাগিলো, তারপর তার চোখ বলে
ত’রে উঠিল। তারপর এই জানালার
উপর রাত বিহরে তাতে আপনার মুখ রক্ষা
ক’রলে,—ক’রে কতক্ষণ হ’বে কীদলে !

সে কি ভাবছিল, সে কেন কীদছিল,
কে জানে ! থাকে সে সত্য ব’লে নিশাচ ক’রে
পরম অগ্রহ করে জড়িয়ে ধ’রেছিল, আজ
লক্ষ্যের হঠাৎ বশন ভাব মিথ্যা প্রেত মূর্তি
ধাঁধ কঁড়াল নিয়ে তার সম্মুখে এগে উপস্থিত
হ’লো, তখনকার গভীর নিরাশা, লাহিত
প্রত্যাহত ধর্মের বেদনা, কি অস্ত আর কিছু,
কে জানে ! এগুটি মাত্র তেলো আশ্রয় ক’রে
সে মহানমুখে হেসেছিল, বশন দিন দিন সে
সেই তেলোকে তার একমাত্র আশ্রয় একমাত্র
রক্ষা মনে ক’রে ভবিষ্যতের দিকে আশা-পূর্ণ
দৃষ্টিতে চাইতে আরম্ভ ক’রেছিল, ঠিক সেই
সময় কোথা হ’তে একটা স্বপ্ন এসে তাকে
হুনিরে দিয়ে গেল ! আজ রাত্রে এই শুষ্ক
উজ্জল সমুদ্রের ব্যঙ্গগানে তার শেষ আশ্রয়-
টুকুকে নিশর্জন দিয়ে, সে কি ভাবছিল সেই
জানে।

অনেকক্ষণ পরে সে এগান থেকে সরে
গিয়ে আপনার ব্যস্ত খুললে। রামলোচনের
দান সমস্ত বিলাস সামগ্রী দুয়ে কেলে দিতে
একটাছোটো কোটা বার করলে ! সেটা বিহের
কোটা, তার অস্ত্রমতন আশ্রয়। তার কাছে
তখন আর সব-মিথ্যা, কেবল সেই ছোট
কোটাটি একমাত্র পরম সত্য ছিল।

একবার ফেলে দেওয়া রামলোচনের সেই
দানজলির দিকে তাকিয়ে, সজ্জিত সেই
ঘরের চারিপাশ দেখে তার বুকের ভিতর

থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠল। এসবই তার, কিন্তু তার, সে আর কাগো নয়।

ভগ্নের মাঝে অস্ত্রম হুৎ দেওয়ার আগে পৃথিবীটা চোখের সামনে যেমন-খায়া বোধ্য হয় তারও তেমনই বোধ চ'ছিল। এই সব সামগ্রী, এই সব নিশানিধি, সব মিথ্যা, একটা ক্ষুদ্র বৃদ্ধের মত মুছে যাবে, দিনশেষে আগের মত নিঃশেষে 'নবে যাসে !' মরণ—সমুদ্রের তীরে পাড়িয়ে চৌকনটা একবার আগাগোড়া ডেবে যেবে, অল্প হুৎ আশা প্রেম এবং অবশেষে গভীর প্রতারণার কথা মনে ক'রে তার বুকের মধ্যে কি হ'ছিল কে জানে ! কয়েক মুহূর্ত পরে ফলে ফলে ভরা, শোভা-লক্ষ্য-ঐশ্বর্য-মানন্দে পূর্ণ এই পৃথিবী আর তার কেউ নয়, প্রথম বৌবনের অগ্নী-লৌম্বাভয়া তার অনিন্দিত এই বেহ-খানি উপকূলে যেবে, তাকে কোন্‌ বেলে কোন্‌ মহাপথে যাত্রা করতে হবে কে জানে !

কিন্তু সে অজ্ঞাত, সে অনির্দিষ্ট মহাব্যাজা, পৃথিবীর এই পঞ্চিল, কদম্বা, কলুণ্ডার মণেকা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

প্রায়শ্চয়ের অস্ত্রম হুৎনের মত পরম—আগ্রহ ভরে বিষপাত্র নিঃশেষ করিয়া মালতী দীয়ে দীয়ে শয়ন করিল।

সেই সময় এক নিশাচর পানী আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত তার কণক ক্রমশে বিনোদ্য ক'রে গেলো, এবং তার পর দিন থেকে প্রত্যহ সে তার অস্ত্র নিত্যক রাত্রে ঠিক এমনি সময়ে কৈবে ভেটে ! তারপর থেকে প্রতিরোজে জামাঝ মনে হয়, মালতী আমারি পাশে এই জামাঝার পাড়িয়ে আকাশের পানে চেরে আছে, তার চোখ জাগাময়, হুল কষ্ট, মুখ বিবর্ণ, বসন স্রস্ত, আর মাঝে মাঝে যেন তার সমস্ত বক্ষ-পঙ্কজ ভেদ ক'রে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গেলিছে, পৃথিবীর সমস্ত মরীমতা সমস্ত তরুণতাকে মলিন ক'রে দিচ্ছে !

আমার দেহ থেকে যেমন সব-মাত্রা ছুটে আরম্ভ-করা মাধবীর কৃষ্টি অকস্মাৎ একদিন অসময়ে থ'ড়ে পড়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর গা থেকে সে রাত্রে সহসা, এই পরম স্তম্ভর মালতী কৃষ্টি কোন্‌ অঙ্ককারে ক'রে গেল কে জানে। ঐগিরীজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ ।

বঙ্গের কাননে তপ মধুর 'কাচেনী'
ভ্রামল পাবে, কণি, অগ্নান স্নান,
'বঙ্গনা' ফিরিছে গাহি নৌগিমা তিতর
তোমার কীড়ির 'কথা' অগম প্রাবিনী,
নির্মল মিতর কুলে মানসগাঢ়ি
'কণিকা' তোমার করে হ'ল দিনকর,—
বর্ষার সরস পথা মেঘের অধর
'কণিকে' আঁকিলে তুমি স্বর্ণ-সৌধবিনী।

তুমি দেখাওচ, কবি, কুহক বজারে
'মানসী'র অস্তিত্বে কি প্রেম আবেগ,
তোমার 'গোনার তরী' উদ্ভাস জোয়ারে
'চিহ্না' তটে সহিতেছে বিচিত্র উৎসেগ,
নহে ইহা গম্ভীরত্ব,—দীপ্ত প্রত্যাকর ;
এ 'নৈবেদ্যে' করি পূজা হইলে অমর।

ঐতীবেশ্বর সুখোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ ।

ভাবতর্পণের পুথ্যরত্ন আলোচনা করিবার সময় এক্ষণ অনেক জটিল ভাবে উপনীত হইতে হয় যে সময়ে তাহার মীমাংসা হওয়া নিতান্ত চরম; অস্তরঃ বিবেচি চিত্তা ও সময় সাপেক্ষ এবং বহু কষ্টসাধ্য । অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে এক নামের বহু ব্যক্তি ইতিমধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন—দৌকিক কিম্বদন্তী গাহাধের একই ব্যক্তি কিয় করিয়াছে অথচ গাহাধের আনির্ভাবতাগ, জীবনের ঘটনাবলী গাহাধের স্বকৃত কার্য্য, —এ কার্য্য গ্রন্থরূপট হোক বা কোন লেখকর দ্বারা অমূল্য রূপই হোক—সম্পূর্ণ নিষ্কৃত । অনেক ঘটনা একপ লোকের সহিত একপভাবে জড়িত যে ততঃ ঘটনার সহিত সেক্ষণ লোকের কোনও সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনা নাই । অনেক ঐতিহাসিক সত্য ঐ ভাষার অস্তিত্ব সত্যের সহিত একপভাবে সম্মিলিত যে আপাততঃ দৃষ্টিতে উভয়বিধ সত্যই এককালের ঘটনা বলিয়া বোধ হয় কিন্তু উভয়ই এক সত্য ঘটনা বলিয়া নির্দেশ করা যাউতে পারে না । অনেক সত্য ঐতিহাসিক বলিয়া শুধু অবস্থানকালে হইতে চলিয়া আসিতেছে এক্ষণ নহে, এমন কি অনেক ঐতিহাসিক বিদ্যোৎপাদ ও উচ্চ সামান্যিক ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ; অথচ মূল্য-সম্বন্ধ করিয়া নিরপেক্ষ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে উচ্চ বিধম ভ্রম । ভারতের প্রত্ন-তথ্যবিদ ও ঐতিহাসিকেরা পদে পদে এক্ষণ রহত দেখিতে পাইবেন । নিম্নে কতকগুলি এক্ষণ রহতের উল্লেখ করা গেল । যদি

কোনো পাঠক প্রবন্ধ লিপিত রহতের লক্ষণ সমাধান বা ইহার কোনো রহতোল্লাসিত করিতে পারেন বা কাহারও অমূল্যকিংশা সমুত্তি ইহাতে আগ্রহ হয় তাহা হইলে প্রবন্ধ লেখক সফলস্বপ্ন জ্ঞান করিবেন ।

১ম । ভাবতর্পণকালে কালিদাস নামে কয়জন লোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন ? যে অগণিত্যত মহাকবিব নাম অস্তিত্বান লক্ষ্যগ, মেঘদূত, ক্ষুদ্রাঙ্গদ, বঙ্গ-প্রত্নিত মহাকাব্য নাটকের সহিত জড়িত গাহাধের আনির্ভাবের স্বার্থ সময় কি ? পুণ্যবান বিলাস, ক্রতবোধ, মানসোদ্যম ও অস্তিত্বান লক্ষ্যগাধির রচিত্য কি এক ও অস্তিত্ব ? প্রাণ ও প্রতীচ্য প্রত্নতথ্য-বিদ্যোৎপাদ অনেক গবেষণা করিয়াছেন কিন্তু এ লক্ষ্যে সত্য যে অধিকতর অগ্রগত হইয়াছে এক্ষণ ত বোধ হয় না । ভাটধারী ভাটধারক রমেশচন্দ্র রামদাস প্রমুখ প্রাচ্য পণ্ডিতগণ এবং যোক্ষমূল্য মণির উল্লিখিত 'নিবন্ধশাব্দী' ব্রজার প্রমুখ প্রতীচ্য মনীষিবর্গ যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহারফলে কালিদাস পাঁচ পত বৎসর (খ্রীষ্টীয় ১ম হইতে ৫ম পতাব্দী) ইত্যন্ততঃ করিতেছেন ! এক জ্ঞান বা বিশ পট্টন বৎসর এদিক ওদিক নহে একেবারে পাঁচ পাঁচ পত বৎসর ! পণ্ডিত 'শাব্দীলেশ' অস্তিত্ব সিদ্ধান্তের বিকল্প কোনো কথা বলিতে বাওয়াই দুইটা,—কিছু ইহাভোজ প্রবন্ধকারের মত সিদ্ধান্ত বলিয়াই অনেকটা বোধ হয় না কি ? ভোজ প্রবন্ধকার স্বীকৃত প্রবন্ধভুক্তি ও কালিদাসকে সমসাময়িক ও এক মূল্যবান সত্য উচ্ছদ করিতেছেন বলিয়া

বর্ণনা করিয়াছেন। এই পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে যেচারা কালিদাসকে নাত্যানাবুৎ হইতে হইরাছে। কালিদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে যে সনু প্রমাণ একাবৎকাল তুমিরা আসিতেছি তদ্ব্যতীত চূড়ান্ত প্রমাণ আর কোনও কিছু আছে কিনা। এক্ষতত্ববিদগণকে সে বিষয়ে মতামত দিতে সাধুনয় অক্লান্ত্য করি।

২২। সেন বংশের নরপতি রাজা লক্ষণ সেনের প্রধান ধর্মাদিকার ও প্রাগজ্ঞ পণ্ডিত হলায়ুধ তাঁহার 'ব্রাহ্মণ-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ রচনার বলিয়াছেন (১) যে তাঁহার পিতার নাম বনজর। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে লক্ষণসেনের পিতা বাল্লভসেনের তিনি ধর্মাদিকার ও বিখ্যাত ভোক্তাভির্জন ছিলেন। (২) আমরা (১৮৯৫, জুলাই) "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকার "Halayudha, His life and times" গ্রন্থে হলায়ুধের আবির্ভাবকাল নিরূপণ করিতে গিয়া দেখাইরাছি যে এই ধনজরের আবির্ভাবকাল একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অর্থাৎ ১০৪১ খ্রীঃ হওয়া সম্ভবপর। এদিকে আবার ধর্মিকাপর নামা ধনজর মূল ভোক্তাভির্জনের সভাসদ ছিলেন। তিনি "দণ্ড-রূপ নিবন্ধের" রচয়িতা। এই 'দণ্ডরূপ নিবন্ধে' ও "দণ্ডবর্তি কঠোত্তর" গ্রন্থে রাজশেখরের শৌক দণ্ড উদ্ধৃত হইরাছে। পণ্ডিতবৈর মতে রাজশেখর দণ্ড শতাব্দীর পূর্বের লোক। ইত্যাদি নানা কারণে পণ্ডিতদের কোল্লঙ্ক

ধনজরের আবির্ভাবকাল ১০৪১ খ্রি করিয়াছেন। এই যে সময়গত ও নামগত ত্রুটি ইহা ব্যতীত তাঁহাদের নাক্ষত্রগত কোনো ত্রুটি স্থাপিত হইতে পারে কি না?

৩২। হলায়ুধের পিতামহ (পণ্ডিতামহ?) মহেশ্বর ১০২১ খ্রীঃ আবির্ভূত হন। হলায়ুধ তাঁহার কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অজ্ঞাত গ্রন্থ হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রসঙ্গে দেখাইরাছি যে হলায়ুধের পিতামহের এই সময়ে আবির্ভাব হওয়াই সম্ভবপর। এই নামের আরও দুই জন লোক আছে। একজন 'বিশ্বপ্রকাশ' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধানের ও 'সাহস্রক চরিত' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি স্বচিত্রিত 'বিশ্ব-প্রকাশের' 'মিশ্রটর' প্রাচ্যে আপনাকে গাধি পরেশ্বর সাচসাহ্যের রাজদৈব ও ক্রীতকরের বংশধর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধ্যাপক উইলসন্ ইহার আবির্ভাব কাল ১১১১ খ্রীঃ করিয়াছেন। সুতরাং এক সময়ে আবির্ভূত হইলেও ইহাদের মধ্যে কোন গোপযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। একজন ব্রাহ্মণ ও আর একজন বৈষ্ণবংশজুত। ইহা ছাড়া আর একজন মহেশ্বর আছেন। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহাকে ভট্টনারায়ণ হইতে অদ্বৈতন দশম ও (সুতরাং) হলায়ুধের পূর্বপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (২) "ভারতী" পত্রিকার কোনো পাঠক

(১) মূল ভেদন 'ধর্মাদিকার ধনজরঃ সম্বন্ধি জ্যোতিষঃ' এই কথা লিখা আছে। হলায়ুধ বর্ণন আর বহুদেই রাজামাতা হন তখন তাঁহার পিতা যে বাল্লভের ধর্মাদিকার ছিলেন এ অল্পমান করা যোয হই অসম্ভব নহে।

(২) সম্বন্ধ-নির্ভর, ১৯০৬-০৭ পৃঃ। বিদ্যানিধি দ্বারাণ হুলা পকাননের গোষ্ঠী কথার "ভট্টের অদ্বৈতন দশম মহেশ্বর" এ পক্ষি হইতে এ কথা সংগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে ৬৪ পুরুষ ধরিলে সময়ের পার্থক্য পড়ে না। এ কথা সম্বন্ধের সাক্ষ্যের উক্ত সংক্ষেপ প্রমাণ করিয়াছি।

অগ্রহণ করিয়া বলিয়া দিবেম কি যে ঢোকা-
মুণ্ডের উক্ত পুষ্কপুষ্ক ও বিভ্রানিবিমহানদের
উল্লিখিত মহেশ্বরের ঐক্য আছে কি না ?
আমরা কয়েক বৎসর হইল 'মাহিতা-পত্র'
'ভট্টনারায়ণের বাংলাবানী' শীর্ষক প্রবন্ধে
অজ্ঞাত প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই দুই
ব্যক্তির ঐক্য সংস্থাপন করিতে প্রয়াস
পাইয়াছিলাম কিন্তু উভয়ের আবির্ভাব
কাল সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক
সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে পারি নাই
বলিয়া আমাদের দারিদ্র্য। বিভ্রানিবিমহানদের
এ সভা স্থাপনের জন্ত প্রমাণ প্রয়োগও
আমাদের সন্তোষজনক পোষ হয় নাই।
এখানে জিজ্ঞাস্য এই আমাদের অদত্ত বা
বিভ্রানিবিমহানদের। প্রদর্শিত প্রমাণ
প্রয়োগের অপেক্ষা কি অদিকতর সন্তোষকর
প্রমাণ পাওয়া যায় না ?

ওঁহ। বিভিন্ন দেশে বৎসর গণনার
বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত দেখা যায়।
একটি বৎসর গণনার প্রান্তের ইতিহাস
বিভিন্ন ও কোতুহলোদ্দীপক। সচরাচর
দেখা যায় যে কোন লোকোত্তর চরিত্রের
মহাপুরুষের আবির্ভাব বা তিরোভাব ঘটিয়া
বা কোন জগজ্জীৱী মহাবীর সম্রাটের বা
কোনো গুণগ্রাহী নৃপতির আবির্ভাবকাল
হইতে এক্ষণ বৎসর গণনার প্রথা প্রচলিত
হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় শতাব্দী বা মহামুখের
হিজরী এইরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব
তিরোভাব বা তাঁহার জীবনের কোনো প্রধান
ঘটনা (যেমন মহামুখের মদিনার পলায়ন)
অবলম্বন করিয়া এই দুই বর্ষ গণনা প্রচলিত
হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা তাঁহাদের

মুখপ্রসূতিক ধর্ম্মগীর্জাতার তিরোধান অবলম্বন
করিয়া বর্ষ গণনা করে। বিক্রমসম্বৎ,
শালিবাহনের সাল, চৈতন্যসম্বৎ, ত্রাশ্বিনসম্বৎ,
লক্ষ্মণসম্বৎ, পূর্নোক্ত দ্বিতীয় সত্যের দৃষ্টান্ত।
এমন কি আজ কাল পরমহংস রামকৃষ্ণের
তিরোভাব অবলম্বন করিয়া বর্ষ গণনা ব্যবহার
ভক্তদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। অবশ্য
জাতিবৈচিত্র্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই
বর্ষ গণনার ইতিহাস একটু পরিবর্তিত
আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের
অপরিণত মন প্রাকৃতিক কোন বিপ্লব বা
জর্নিপাক—যেমন মহামারী, জলপ্রাধন, দাক্ষণ
হর্ডল, প্রবল বজ্রাঘাত প্রভৃতি—অবলম্বন
করিয়া বর্ষ গণনা করে। একটু ভাবিয়া
দেখিলেই শংকার ভারতমাজুয়ানে মানবের
মনের পরিণতি ও গঠনবৈচিত্র্য ভাবিয়া
দেখিলেই বিস্মিত হইতে হয়। যে বাংলা
হটক আমাদের দেশে যে সমস্ত বর্ষ গণনা
প্রণালী প্রচলিত আছে তাহার প্রধানগুলি
এই :—শক, সম্বৎ, সন, বিজয়ী, বঙ্গাব্দ, ফসলী,
মহী, ত্রিপুরাব্দ ও বালিমাষ। ইহার অনেক-
গুলি পত্রিকার শিরোনামে অনুল্লভ করে
দেখিতে পাই কিন্তু তদধিক ইতিহাস জানি-
বার কোতুহল আমাদের মনে জাগ্রত হয়
না এটা আমাদের লক্ষ্যপ্রকৃতি জাতির স্বভাব-
সম্পত্তিই বটে। ইহার মধ্যে এক একটা বর্ষ
গণনা প্রণালী ইতিহাস আলোচনা করিয়া
এক একটা বস্তুর প্রবন্ধ রচনা করা যাইতে
পারে। শ্রেয়শক্তি ও সমুদ্রের আমাদের
একান্ত অভাব। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবরে
যতটুকু আলোচনা করা সম্ভব তাহাই করা
যাইতেছে। পূর্নোক্ত বিভিন্ন সালগুলির সংক্ষিপ্ত

আলোচনা পরে করিতেছি। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল বিহার প্রদেশে অবস্থানকাশীনা বাকিপুর সহরের 'খজা-বিলাস' প্রেসের অধিকারী, হিন্দী ভাষার উন্নতিকল্পে একাধি উৎসাহী নিজের উদ্যুক্ত রামদীন সিংহ মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত এক সাধুর নিকট প্রাপ্ত একটা ডাকের কথা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। উহাই প্রথমে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে অনেকগুলি সত্যের নাম ছিল। উক্ত সূক্ষ্মবর বর্ধমান আবক্তের লেখককে ঐ স্লোক কয়টি অবলম্বন করিয়া একটা প্রবন্ধ রচনা করিতে অনুরোধ করেন লেখকও সেই কার্য্য করিতে প্রীতিকৃত হন। কিন্তু নানা কারণে এ কয় বৎসর সে প্রতিজ্ঞা পালনে আমরা অসমর্থ ছিলাম। ইতিমধ্যে যদি তিনি কোনো পত্রিকার দ্বারা বা পণ্ডিতবর ঐশ্বর্য্যদাস প্রমুখ তাঁহার অত্র কোনো সহৃদয়ের দ্বারা এ বিষয়ে আলোচনা করাইয়া থাকেন বলিতে পারি না। কিন্তু বিষয়টি এমন গুরুতর ও কৌতূহলজনক যে একবার আলোচিত হইলেও তাহার পুনঃ-ক্রমেণ এখানে পাঠকবর্গের অস্বীকৃত্যকর হইবে না বিবেচনার দো কয়টি স্লোক এখানে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"সবং কই এক ভাটিকে জানো।

ডাক করে সব সুনো দেয়ানো ॥

কলি কোলম কলি চুরি সিং।

দৌকিক-বিক্রম লছিমন সিং ॥

বুড় নির্জাণ মৌর্য্যলক ভাই।

চালুক বিক্রম গুপ্তগণাটী ॥

গাজে হর্ষ নিবারহু জানত।

পরং জিহ্বত লছিমন মানত ॥

উক্ত ডাকের কথা মতে কয়টি বর্ষের আমরা উল্লেখ পাইতেছি।

যথা :—(১) কলিগবৎ (২) কোলম (কোলম ?) (৩) কলিচুরি সগৎ (৭) (৪) দৌকিক সগৎ (শালিবারনের সন) (৫) বিক্রম সগৎ (শকাব্দ) (৬) বুড় নির্জাণ সগৎ (৭) লক্ষ্মণ দেন সগৎ (লং সৎ) (৮) মৌর্য্যলক (৯) চালুক্য সগৎ (১০) বিক্রম সগৎ (১১) গুপ্ত সগৎ ('২) গাজ (গজাব্দ) নূপতিদিগের সগৎ ?)।

এই কয় সত্যের মধ্যে অনেকগুলির সত্যে সন্দেহ থাকিয়া যায়। চালুক্য, গুপ্ত, মৌর্য্যলক যেন একরকম বোকা গেল, কারণ তত্ত্বদামীর প্রথম পরাক্রান্ত রাজকংশ ভারতের দৌকাগ্যেয় বিনে ভারতভিহাণ উচ্ছল করিয়াছিলেন। গাজসগৎ ইহা উড়িষ্যার ইতিহাস গ্রন্থে গজাব্দীর কেশরী-রাজগণের প্রতিষ্ঠিত সগৎ অনুমান করা নিতান্ত অযৌক্তিক বোধ হইবে না। তবে ঐ ডাকের শেষ ছত্রের পূর্কি ছত্র—'গাজে হর্ষ নিবারহু জানত' এই ছত্রের অর্থ অত্যন্ত অস্পষ্ট। পরবর্তী ছত্রের সহিত মিলাইয়া অর্থ করিতে গেলে এই রকম অর্থ হয় যে "গাজ সগৎ 'হর্ষনিবার' দেশের শোকেদের মধ্যে জানিত অর্থাৎ প্রচলিত।" যদি এ ব্যাখ্যা সমীচীন হয়,—তবে 'হর্ষনিবার' দেশ কোথা ও কাহাকে বলে? 'পরং জিহ্বত লছিমন মানত' অর্থাৎ জিহ্বত অকলে নূপতি লক্ষ্মণসিং (লক্ষ্মণ সগৎ তাত্র শাশনাদির গ্রন্থে 'লং সৎ')—সকলে মানিয়া চলে। এ ছত্রের স্পষ্ট অর্থগ্রহ হয়। 'কলি' সগৎ যেন কলিযুগের আদিত্য হইতে ধরা

গেল। কিছু কোনম্, কলিচুরি ও শৌকিক
স্বত্ব কি ?

আমাদের পল্লিকার প্রথম পৃষ্ঠার শোভিত
আমাদের পূর্বোন্নিখিত বঙ্গদেশই বা কি ?
কোন নরপতি বা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা
সংঘটন হইতে এ বর্ষ গণনা প্রবর্তিত হইয়াছে ?
অগচ সন, বঙ্গাব্দ ও ফসলী তিনটি বর্ষগণনার
অতীতাব্দ এক (১৩১৮)। 'সবি' গণনা
কোন ঘটনা অবলম্বনে গণনা করা হয় ?
'ত্রিপুরার' কি ত্রিপুরা দেশের রাজগণের
আদিপুরুষ কর্তৃক বংশপ্রতিষ্ঠা দ্বিবিয়া
গণনা করা হয় ? তাই যদি হয় তবে
ত্রিপুরার কোন বংশ ? এ বর্ষ গণনা ত্রিপুরার
চলিত কি না ? 'দালিমাব্দ' বা কি ? ঐতি-
হাসিক রহস্যের এ সব অন্ধতম গুহার
আলোকপাত কে করিবে ?

হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে 'হরিত' এই শব্দ
অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া
যায়। ইহার আভিধানিক অর্থ পলাপন
অর্থাৎ পীত মিশ্রিত সন্মিশ্রণ। (হরিত্রাভঃ
পলাশে হরিতো হরিত ইত্যমরঃ)। আবার
'হরিত' দিক্ শব্দের একটা পর্য্যায়মাত্র
('বিশুদ্ধ ককূভঃ কাটা আশান্ত হবিত্তত ভাঃ')
'দিক্' কিনা এই অনন্ত সৌম্যপুত্র আকাশের
মহুয়া নির্দিষ্ট কোণ-বিশেষ। আকাশের ত'
কোনো প্রাকৃতিক অংশ নাই অনন্তের অগার
সীমা না কোণ-কি ? মহুয়া কেনল বিভাগ
ও সীমা নিকারণের স্তম্ভ অস্তিত্ত ভাষার
প্রচলিত কথার মত এই 'দিক্' শব্দেরও
বাবহার করে। 'হৃদ্য' পর্য্যায়ের হৃদ্যের

বহু নামের মধ্যে দুইটা নাম এখানে
আমাদের প্রধানতঃ আলোচ্য। সে দুইটা
নাম 'সম্ভাব্য' ও 'হরিত' (পুংসং বিবসৎ
সম্ভাব্যো হরিতব্যোক্ত্যমরঃ)। হৃদ্যের এই
দুইটা নামের অর্থ এতদ্বন্দ্ব 'হরিত' অর্থাৎ
'হরিত্রাভ সন্মিশ্রণ অথ বাহার', 'সাতটা অথ
বাহার', 'দিক্ অথ বাহার'—হৃদ্যের এই তিন
অর্থই সমর্থক। অধ্যাপক মোক্ষমূলর 'হরিত'
শব্দের আরও একটা অর্থ করেন 'কিরণ'।
'হরিত' শব্দ 'হ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন কিছু
ভিনি এ শব্দকে 'হু' ধাতু দ্বারা নিপাতনে
সিদ্ধ করিয়াছেন। এ ধাতু নিষ্পন্ন কিরণার্থক
একটা শব্দ 'হুপি'—কার্য সাহিত্যে এ শব্দের
প্রয়োগ অতিবিশদ। ('কিরণোক্ত মনুসাত-
গভজিহ্বাণয়কঃ')। আচার্য্য 'হরিত' শব্দকে
গ্রীকদের সমিভূতবেদের ভববাহী 'Charites'
শব্দের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। হৃদ্য পূর্ক
দিক হইতে পশ্চিমে ভ্রমণ করেন, দিকই
তাহার অর্থ অর্থাৎ বাহন। তাহার কিরণ
পিতাত হরিত,—কিরণই তাহার অর্থ—এ শব্দ
বিশেষণই তাহাতে প্রয়োগ করা যাউতে
পারে। এদিকই হরিত হিন্দু ও গ্রীকপুরাণে
হৃদ্যবেদের হরিত্রণ সম্ভাব্য বাহনরূপে চিত্রিত
হয়। ইহার 'সম্ভাব্য' নামটা আরও বিশদ-
কর। কারণ, 'সম্ভাব্য' = 'সম্ভ অথ বাহার'
বা, (মোক্ষমূলরের 'হরিত' শব্দের 'কিরণ'
অর্থ গ্রহণ করিলে) = সম্ভ কিরণ বাহার, হৃদ্যের
সম্ভ কিরণ কি ? এ প্রশ্নে সহজেই আর্ঘ্যের
Spectrum শব্দকে জ্ঞানের কল্পনা করা কি
একবারে অযৌক্তিক ? (৩)

(৩) গত বৎসরের 'অবাসী' পত্রিকার বর্তমান পেনপেনের 'একটা সম্ভ' শব্দের উত্তরে অধ্যাপক বেদেপ
চন্দ্র দ্বারা বঙ্গদেশের সম্ভাব্যের সম্ভাব্য বাহা নির্দিষ্টাছিলেন তাহা আমাদের সম্ভাব্যজনক বোধ হয় নাই।
পীতার দ্বন্দ্ববাহ পুত্রকে ঐচ্ছিক হৌবেপ্রবাহ দত্ত বঙ্গদেশের আবার সম্ভই সম্ভাব্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাবান্তরিত জাতির পূর্ক ইতিহাস স্বচ্ছর থাকে । সম্ভাব্য কথা উঠিতে—যেহ, গ্রাম, চীন প্রভৃতি মহা পরাক্রান্ত জাতিদের সহিত এককালে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কেবল পণ্যপ্রবাহের আদানপ্রদানে নহে— তাবেরও আদানপ্রদান হইতাহিল তাহার কথা সহজে উঠে । অনেকটো জানেন যে কোণ্টিয়ের সিদ্ধান্তভাগের এক ভাগের নাম ‘রোমক সিদ্ধান্ত’ । এ অংশের এণেতার নাম সবনচাণ । গ্রীক ও হিন্দুধর্মন প্রণালী এ দুটো চিন্তাশিল্পতার ও মনস্কপাতিতার সহিত আলোচনা করিলে উভয়ের মধ্যে তাবের ও দুইটো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলাক্ষিত হয় । চাক্ষক ধর্মদের সহিত এলিকউরধানদের

Epicureans) দাইনিকবের (Cynic) সহিত যোগী ও কাগলিকবের মূলগত ধর্ম-মতের ঐক্য নাই কি ? টোইকদের (Stoics) উল্লেখ্য যে ক্রমে ক্যান্ট ও হেলেনিয়ান, দের (Hegellians) চিন্তা প্রণালীতে উন্নীত হইয়া বোদা লাভের প্রধান প্রতিপাত অনুভবের ওইরতবাদে এককালে উপনীত হইবে না । এ কথা সাহস করিয়া কে বলিতে পারে ? গ্রীক ও হিন্দুধর্মন পুরাণেতিহাস ও মহাকাণ্ডেও অন্তত সাম্য । সে সঙ্কে প্রবন্ধান্তর ও সমগ্রান্তর বিবৃতিভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা হহিল । আপাততঃ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বক্তকালি শব্দের উল্লেখ করিয়া নিরন্ত হইব । সে লক্ষগুলি ‘নিক’ ‘দীনার’ ‘চেল’ ‘চীনাধর’ প্রভৃতি । নিক তদানীন্তন প্রচলিত সূবর্ণ মুদ্রার পরিমাণ । ১০৮ সূবর্ণে বা ২ কার্ষাপণে এক ‘নিক’ বা ‘দীনার’ । এই দীনার লক্ষ গ্রীক মুদ্রাদীনার (Dinar) শব্দের রূপান্তর ।

এই নিক শব্দের প্রারোগ্য মঙ্গলসময় হইতে চলিয়া আসিতেছে । অমরসিংহ নিক, সূবর্ণ, কার্ষাপণ, পল, দীনার এই সকলের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া দিরাছেন । এক সময়ে উভয় দেশের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটরাছিল ইহা হইতে সচেতন অনুমিত হইতে পারে ।

গ্রীক ও রোম দেশের দ্বায় কৃণ্যক্ষণ না হউক চীন দেশের সহিতও যে পণ্যের ও তাবের আদান প্রদান হইত,—বৌদ্ধ সাংতিতা প্রচুর পরিমাণে ও তরুতপারবর্তী পূরণাদিতেও তাহার বহু প্রমাণ আছে । রামায়ণে স্ত্রীও পান নির্দেশ করিয়া বানরদের ঘরন বিভিন্ন বিশেষণ পাঠাইতেছেন তাহাতে উক্তর বেশে পার্শ্বতাভাতি বর্ণনা করিয়াছেন । তাহাবের বর্ণনাপাঠে তিকতীয় ও চীনদেশীয় লোকদের কথা মনে পড়ে । কালিহাপ্রাণে ইহাদের ভাবরতর বর্ণনা আছে । সংস্কৃত সাংতিতা চীনাভক্ত, চীনাধর ইত্যাদি শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে । কালিদাস চীনাধরের উল্লেখ করিয়াছেন—

‘চীনাভক্তমিষাকতো গতিবাতঃ দীৰমানভ’ ।

এরূপ শব্দের অন্তরও বহুল প্রয়োগ আছে । কালিদাসকে যদি অমৃতঃ ক্রীটির লক্ষ্য মতাকীর লোক স্থির করা যায় তাহা হইলেও তাহার পূর্ক হইতেও যে চীন দেশের সহিত বাণিজ্যের চলাচল হইত এ অনুমান আদৌ অমূলক বোধ হয় না ! বিক্রমাদিত্যের জগদ্বিখ্যাত রাক্ষসতার অন্ততম সভাপদ অধর সিংহের অভিধানে চীনাধরের কোনো উল্লেখ নাই ।

বহুরূপ কথা বলিতে আর এক কথা মনে পড়িল । বঙ্গীয় ‘চেলী’ শব্দ কি দেশজ না

কোন সংযুক্ত লক্ষণ? 'চেল' লক্ষ বঙ্গের পর্বাধারে পাওয়া যায়, ঢেলী লক্ষ ঢেল লক্ষের জৌলিজে নিম্নের একপল যমি কল্লনা কল্লনা যার তবে ইটা বহুমায়েতই আমায়ের বুঝাও,—বেশমী বস্ত্র একপল বুঝাও না। অথচ গঠলিত 'ঢেলী' লক্ষ 'কোম বসন' এ অর্থ কোথা চইতে আসিল তাবিবার বিষয় বটে।

৬ষ্ঠ। প্রবন্ধের কলেবর সঙ্কীর্ণ চইতে চলিল; উপসংহারে একটীমাত্র বিষয় ঐতিহাসিক ভ্রমের উল্লেখ করিলাম এ অক্ষিক্ষেত্র প্রবন্ধ শেষ করিল। সে ভ্রম সপ্তদশ অধারোহী বৈজ্ঞ লইয়া বসতিয়ার গিলিকি কর্তৃক বঙ্গবিজয়। বহুদিন এ ভ্রম লইয়া কোনো আলোচনা হয় নাই। মনে চইয়াছিল এই নির্জলা নির্জ্ঞা মিথ্যা বাহ্য ঐতিহাসিক সত্তোর আকারে প্রণে করিবার স্পষ্টতা রাখে তাহা বিশ্বস্তির গর্ভে বিনীত হইয়া গিয়াছে। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে সম্ভ্রান্তি একজন কষতালানী বঙ্গের চিত্রকর লক্ষ্যলেনের পলায়ন নাম দিয়া একটি চিত্র আঁকিয়া আবার এট মিথ্যা কাচিনীকে লোক লক্ষ্যে নুতন আকারে প্রচার করিয়াছেন। ব'হুসচজ্ঞ বঙ্গবর্ধনে তাঁহার বিভিন্ন কষতালানী লেখনী এই অগত্যের দিক্‌তে চালনা করিয়া বিবিধ প্রবল যুক্তিগত ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা উক্ত ভ্রমকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছেন। সেই হ্রুৎকিপূর্ণ প্রতিবাদ প্রবন্ধ 'ঐতিহাসিক ভ্রম' প্রকাশের পর আবার কেহ এ নির্জ্ঞা কথা উপাশন করিতে সাহস করিবেন তাহা মনে করি নাই। কিন্তু আমাদের বঙ্গী চিত্রকরের চিত্রের বিষয় নির্দোষ বিষয়কর! তিনি অগ্বেতে,

অজ্ঞান বদনে এই নির্জ্ঞা মিথ্যাকে এই জাতীয় কলঙ্কে চিত্রের আকার দিয়া স্থাপিত দিতে প্ররানো। অথবা আবার দেবিদাহিলাম ইন্দুক অবনীপ্রনাগ ঠাকুরের মত কুশলী শিল্পীও এই চিত্রের বিষয়নির্দোষ সমর্থন করিতে তাঁহার কষতালানী লেখনী প্রয়োগ করিয়া ছিলেন। টাহার অগ্বেক। আক্ষেপের বিষয় আর কি চইতে পারে? অথবা তাঁহার মত চিত্রকলাকুশল নহি। কোনটা চিত্র-বিব্রার বিষয়, কোনটা নয়, এ লব তাঁহার সহিত বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। তবে এটা মোটামুটি বলা যায় যে জাতীয় কলঙ্কট দ্বারা ভিত্তি,—অসত্যেই দ্বাধার প্রতিষ্ঠা—সেই বিষয় লইয়া কোনো চিত্র-বঙ্গের নিভের কল্লনাফোলাপ বা কলাকুশলতা দেবাইবার প্রমাণ অর্থাৎ প্রাচীনতায় বসিত বিবেচনা হয় না। কোনো ভ্রম করিয়াই একপল কার্যকে সমর্থন করিবার না। কথেক লিঙ্গর পূর্বে এই 'ভারতী' পত্রিকার "ভারত-বর্ষের ইতিহাসের উপকরণ" প্রবন্ধে মিনহাজ-উদ্দৌনের এ মিথ্যা রটনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তাঁহার তৎকাল 'নাসিরি' গ্রন্থ—যাহা হইতে এ নির্জ্ঞা অগত্যের প্রথম উদ্ভব হইয়াছে ও ইশরাউ প্রমুখ ঐ শ্রেণীর ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ দ্বারা নিজে জাতীয় অধা মতিমা প্রচার ও প্রুবিধা পাইলেই এলেক্সিওরের কলঙ্ক বটনার দিক্‌তে, দ্বাধারের লেখনীভণে দিয়ার একটী মরাশনাচ ও ওয়াবেণ্ডু ফেল্ডিংস এটী মরাশনার দেবতা—ছত্রপতি শিবাজী একটা কলটবস্ত্র আর রটোড একজন তাত্তী মরাশপুত্র—তাঁহার এ বিষয় ভ্রম, এ ক্ষুদ্র নির্জ্ঞা মিথ্যাকে অজ্ঞানবদনে

গলাধঃকরণ করিয়া গিয়াছেন! একথাও বিবেচনা করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই যে সত্যশিখ মিন্‌চাক্ বস্তুত্বাবেষ এ বক বিজ্ঞের কাহিনী কোথা হইতে পাইলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা এ ঘটনার কিছুই জানিলেন না—জানিলেন কে? না, বঙ্গবিজয়ের অপর: পক্ষাপৎ বঙ্গের পরে আগত বিদেশী, সত্যশিখ মিন্‌চাক্,—‘‘তিনি জেলে বাসা ও তুলে বাগ্‌চীরে মুখে এই ‘জননব’ (!) জানিয়া নাকি নিষেধ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! কোকুকের বিবর এই যে স্নাত্তপ্রাণ প্রভৃতি মনোবিবর্ণ অসামি যুক্তি সহকায়ে দেখাইয়াছেন (৪) যে বস্তুত্বাবেষের সমা বাঙ্গালার সিংহাসনে লক্ষণ দেন থাকিতেই পাবেন না, তাঁহার পৌর লাক্ষণের তখন বঙ্গের সিংহাসনে আরও ছিলেন! অপর, ‘‘লক্ষণ দেনের পলায়ন কলক’’ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার চিররচনা হইয়া গেল! সন্ধিচক্রেও পুত পদাঙ্কগ্রহণ করিয়া এ অক্ষম লেখককর্জুক ও বস্তুত্বাবেষের সপ্তদশ অধ্যোহী লইয়া বঙ্গবিবরণে পিতামহীর উপকথা খণ্ডিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষর কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও এসবক্কে তাঁর লেখনী চালনা করিয়া, ইতিহাসের লক্ষ্য রক্ষা করিয়াছেন। সে সব যুক্তি (বিসৃষ্টভাবে) পুনরবতারণা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে নিস্তারান।

কোকুসলী পাঠক সে সব গ্রন্থ অগ্রহ করিয়া অগ্রহণ করিবেন। এখানে এইবার বক্তব্য যে বঙ্গের সাময়িক ইতিহাসে এ ঘটনার কোনো উল্লেখ নাই—যখন বেরিতে পাই যে পান্টে, যিপুয়া, চাঙ্কড়, জরতী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বাঙ্গালাব সম্রাজ্ঞ স্বাধীন রাজ্য তখন প্রবল প্রভাবে বর্তমান, তখন কি আমাদের মিন্‌চাক্ ও তাঁহার পদ-দেহনকারীদের সহিত সম্বন্ধের চীৎকার করিতে হইবে যে সপ্তদশ শতাব্দীতেই বঙ্গবিবরণ করিয়াছিল? (বঙ্গের বহু সৈন্ত বস্তুত্বাবেষের সঙ্গে লইয়া আনিয়াছিলেন একথা স্বয়ং মিন্‌চাক্‌ই বলিয়াছেন।) বলিতে হইবে কি যে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের অধিকার করাই বঙ্গবিবরণ? এবং সঙ্গে সঙ্গেই অমনি একটা কাল্পনিক ঘটনা—অন্ততঃ যে ঘটনা তর্কের বিবর ও সন্দেহবল, সেই অনিশ্চিত জাতীয় অবস্থাননাশ্রয়ক ঘটনাকে কল্পনার মনোহর আবরণ দিয়া তাহাকে নূতন ভাবে, নূতন আকারে লৌক সমক্ষে প্রকাশের চেষ্টা প্রবাসিনীর বঙ্গিয়া খাড়া করিতে হইবে? অনেকস্থলে ইরাব প্রতিপাদ হইলেও তদন্তে কেবল নীরব উপহাস ও অসঙ্গ প্রদর্শন করিতে হইবে! সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ও সত্যস্বপ্ননা করিতে হইলে বঙ্গবস্তু প্রমাণ প্রয়োগ প্রয়োজন।

ঐশ্বরীবেশ্বর গোপালী ।

(৪) তাঁহার ‘‘Indo-Aryans’’ গ্রন্থে
মাকড় উৎসৃষ্ট অবস্থা দেখুন।

রাজা।

১

মন্ত্রী রাজাকে বলিল—“মহারাজ
একটা আঁত পাগল!”—

রাজা কি যেন ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন,
“এঁ! তাই নাকি?”

মন্ত্রী কহিল “নইলে টাকার আশার
পথের ধারে বসে ভগবানকে ডাকে!—
টাকা কি মহারাজ পথের ধূলা দে উড়ে গিয়ে
হাতে পড়বে?”

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে, কি বলে?”
“সে যা বলে মহারাজ, শুনে হাসি পায়।”
রাজা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন
“কি রকম?”

“সে বলে আগুনের ডাকলে ভগবান
নিজে এসে তাকে টাকা দিবে যাবেন!”

রাজার মূণ ঈষৎ গভীর হইল, তিনি
জিজ্ঞাসা করিলেন “মন্ত্রী খবর নাও লোকটা
শঠ কি না!”

মন্ত্রী কহিল “না মহারাজ, লোকটা শঠ
নহ—তবে লোকটার মাথা খারাপ!”

রাজার মুখ প্রবল হইয়া উঠিল—বলিলেন
“শঠ নয়?—তা হলে লোকটার কি গভীর
আত্মা—ভগবানের উপর!”

মন্ত্রী বলিল “মহারাজ, বলেছি তঁ লোকটার
মাথা খারাপ!”

“তা হাই হ’ক—আমি একবার তাকে
দেখব!”

“তাহ’লে কাল যোগা করে দেওয়া হ’ক
—মহারাজ চণ্ডীপাগলকে দেখতে যাবেন!”

“না কিছু দরকার নেই!—আমি আর
তুমি ধান—আর কেহ নহ।”

২

চণ্ডীপাগলকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন
“তুমি চোখে বুঝে লব সময় বলে থাক কেন?”

পাগল মুদিত চক্ষুতেই জিজ্ঞাসা করিল
“তুমি কে?”

“আমি কে জেনে কি হবে?”

“না, আমি সকলকে আমার কথা বলি।”

রাজা মন্ত্রীর পানে চাহিয়া মুহূর্ত্ত তামিরা
পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কি রকম
লোককে তোমার কথা বল?”

“যে আমার শ্রাণ বুঝে তাকেই বলি!”

“কি রকম লোকে তোমার শ্রাণ বুঝে
মনে কর?”

“যার শ্রাণ আছে সেই পথের শ্রাণ
বুঝে!”

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল,
কু’র নেই?”

পাগল মাথা নাড়িয়া বলিল, “উঁহ,
শ্রাণ কি সকলের আছে তাই,—পাণের
যাকার বড় আক্রা—বড় আক্রা!”

রাজা মন্ত্রীকে ইরিতে নিরস্ত হইতে
বলিয়া পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি রকম
মাহুষের শ্রাণ আছে মনে কর চিন্তি?”

পাগল পূর্ণের মত মুদিত নেত্র কহিল
“এই তোমার কথাবার্তার মনে হুচে যেন
তোমার একটু শ্রাণ আছে!”

“তবে বল—তোমার কি কামনা?”

“তার আগে আমার কথার উত্তর দাও—
“তুমি কে?”

“কেন তুমিত এই বলে গার শ্রাণ আছে
তাকেই তুমি তোমার শ্রাণের কথা বলবে!”

“তবু পরিচরটা বলতে ক্ষতি কি ?”

তখন রাজাব ইচ্ছিতে মন্ত্রী পাগলের নিকট
রাজার পরিচর দিল !

তিনিই পাগল আপদমস্তক শিহরিয়া
উঠিয়া বলিল “রাজা ?—রাজার আমার প্রাণ
বৃক্ষের ?—না আমি কিছুই বলবনা !”

রাজা তরলকণ্ঠে বলিলেন—“পাগল, রাজা
হলেই কি তার জন্ম জিনিসটি নষ্ট হবে না ?”

পাগল রাজার পানে নির্মিত নয়নে
চাটিয়া বলিল, “তুমি রাজা—মতি ?”

“আমি এই দেশবাসীর পেশক !”

“হাঃ !—তোমার কথাগুলি বড় মিটি !—
রাজার এমন ভাবে কথা বলতে জানে !—
আজ্ঞা তোমার আমার কামনা বল !”

“কি—বল !”

“পূর্ববর্ত্তে যাকে আমি সব চেয়ে
প্রাণহীন পাবাণ নবন করি—আমি তাই
হতে চাই !”

“কি—সে ?”

“রাজা !—সেই

ডাকি !”

“এ অপরাধ সাধ, কেন ?—বিশেষতঃ
তোমার ?”

“একবার জানতে বড় সাধ সিংহাসনে
বসলে মানুষ আর মানুষ থাকেনা কেন ?”

“চিৎ, কে বলে তুমি পাগল ?”

“পাগল নই ?—এতদিন ধরে শুনে
আমি, আমি পাগল, আর আর তুমি বলছ
আমি পাগল নই ?—পাগল না হলে রাজা
হবার অস্ত্রে কেউ চোখ বুজে দেশে দেশে
পথে পথে বিশ বছর কাটিয়ে দেয় মহারাজ !”

“হাঃ !—বিশ বছর !”

“হ্যাঁ মহারাজ—”

“আর কতদিন এমন ভাবে কাটাবে ?”

“যতদিন না আমার বাহা তিনি পূর্ণ
করেন !”

“তোমার বাহা পূর্ণ হবে তুমি হির
জাম —”

“মহারাজ আমিও আসি সিংহাসনে
গিনি, তবে তাঁর উপর এ অধিবাগ
আগবে কোথা থেকে ?”

মন্ত্রীর আর দৈবা রহিল না,—বলিল,
“পাগল, মহারাজের সঙ্গে এমন অসদম কবে
কথা কর ?”

রাজা মন্ত্রীর পানে চাটিয়া বলিলেন,
“চতী ঠিকই বলেছে ! আমারই মন্ত্রীর
হয়েছে !—যে পরল বিশ্বাসে আঘাত করে
সে মহারাজ অধম !—তারপর পাগলের নিকে
কিরিয়া কটিলেন—“চতী কাল থেকে তুমিই
এদেশের রাজা !—চল মন্ত্রী—অভিষেকের
আয়োজন করবে !”

“মহারাজ !”

“চল কর মন্ত্রী—আমার আদেশ !”

পাগলের মূণ এক স্বর্গীয় শ্রীতে উদ্ভল
হইয়া উঠিল ।

৩

চতী বলিল “মহারাজ আমার রাজ্যলাভ
হয়েছে আমি সুখ !”

রাজা অশ্রুপূর্ণ হইয়া বলিলেন “কৈ
এখনও তো অভিষেক পর্য্যন্ত হয় নাই !”

“হয়েছে বৈকি ! যখন আপনি
ভগবানের নামের গোমর রক্ষার জন্য একটা
পথের পাগলকে আপনার সিংহাসনে বসাতে
চেষ্টা করেন তখনই আমার অভিষেক ও

ওনে বর্ষ, পক্ষম সংখ্যা ।

রাজ্যলাভ চেষ্টাছে !—রাজতন্ত্রে বসে লক্ষ্যেরই
জন্মর যে পাখির হয়ে যায় না এবং ভগবানের
নামের মহাশক্তি প্রকাশ করবার লোক আত্মা যে
পৃথিবীতে পাওয়া যায় এত মহাজ্ঞানই আমার
রাজ্যলাভের অন্তিক—আমি চন্দ্রম্ ।”

রাজা কাতরভাবে বলিলেন “যাবে ?—
কিন্তু বলে যাক তুমি—কে ?”

দেখিতে দেখিতে পাগলের চারিদিকের
একটা জ্যোতির্ষের আভা মণ্ডলাকারে ছুটিয়া
উঠিল, এমন সময় অদৃশ্য প্রভাতের নহবৎ
বাঁজিয়া উঠিল ! বসন্তক রাজা দেখিলেন
তিনি আপনার লগ্ন্যায় শারিত ।

রাজার লোক চারিদিকে সন্ধান করিল
কিন্তু পাগলের কোন সাক্ষ্য মিলিল না ।
ইহাতে রাজবাটীর সকলেই প্রসন্ন হইল—
কেবল রাজা বিনয় !

যশী করিল “মহাশয়, বগেছিলাম—
ওটা একটা ঘোর পাগল ! কি মেহাল হতেই
সবের পড়েছে—আবার হরত একদিন এসে
উপস্থিত হবে !”

রাজা একটা নিশ্বাস কেনিয়া বলিলেন
“না যশী, আর তাঁর বেথা পাবনা !”

ঔপাচুল্য খোদ ।

সিন্ধু ।

অনন্ত বিশাল বপু করিয়া বিস্তার
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে
ভৈরব নিনাদ রঙ্গে
আত্মানিহি বিশ্বজনে জগনি চক্ষ্যাব ।
উদ্বল আরবে মাতি
গর্জিতেছে দিবারাতি
সর্বসংহারক মূর্তি সত্তত তোমার,
ভীষনাগে রক্ত হবে
ডাকিয়া করিছে মবে
মুক্তি পথে ঘাইবার এই “সর্বঘোর !”
নাহি রাক্ষি নাহি রেশ
নাহি দগা ঘেব লেশ
কৃষ্ণবর্ণ ভগবত অধোর স্তম্ভ,
তব নীল কলেবর
ক্রোধে সদা জ্বল জ্বল
‘অগ্ন্য’ ঝালুকা গাহে বোহিছে প্রলয়,
সংস্র নাগিনী ঘেন
উগাদিয়া খেত কেন

তীর ভূনে আছাড়িয়া পড়িছে সরোপে,
প্রকাত করিতে প্রাণ
জগত ছুড়িয়া প্রাণ
ভুলিতেছে বাহুকীর গরল নিশালে ।
মণিরা তোমার বারি
সর্গস্ব লয়েছে কাঁচি
দেবগণ, সেই ক্ষোভে প্রতিহিংসার—
তোমার কৌশলে আজি,
কৌশল রতন রাজি
নাহি, লক্ষী তিরোধান ছাড়ি রতাকর,
স্বধাভাত গেছে লয়ে
হলাহল ঢালি দিয়ে
দ্রবজ জন্মর মারো অশান্ত করিয়া,
মাতৃহারা হয়ে তাই
মুহুর্তের শান্তি নাও
অগবন্ধ পদাশ্রয় গিরেছে তুলিয়া ।

ঔপ্রসন্নময়ী দেবী ।

আমাদের বিলীয়মান ও উদীয়মান যুগ ।

আমাদের বর্তমান যুগেই হটক কিংবা অতীত যুগেই হটক পারিবারিক জীবনের শিক্ষা দান কখনই প্রচলিত নাই। শিক্ষা পদ্ধতির আলোচনা করিতে গিয়া স্পেন্সার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “জীবিকা অর্জনের জন্য লোকের কি বৃহৎ আয়োজন-ই না করিয়া থাকে; কিন্তু সন্তান সন্ততির শিক্ষার জন্য সেদিকে উদ্ভব ও চেষ্টা প্রয়োজনীয় বলিয়া কেহ মনে করেন না। ছেলেরা সাধারণতঃ ভ্রমলোকের উপদেশে শিক্ষা আরম্ভ করিতে বহু বয়সর যাপন করিয়া থাকে, এবং সেবেরা সামাজিকতা দক্ষতার জন্য গেটুফু শিক্ষার দরকার পেটুফু অধিগত করিবার জন্য তাহাদের জীবনের পূর্বাঙ্ক দ্রোণ করে, কিন্তু উত্তরপক্ষের কোন পক্ষই—জীবনের সর্বাঙ্গপক্ষা-উন্নতির বিষয় যে—পরিবার গঠন সে সম্বন্ধে, এক ঘণ্টার মধ্যে কোন শিক্ষা গ্রাপ্ত হয় না।”

ইহা হইতে আমরা সুস্পষ্ট-ই দেখিতে পাইতেছি যে পারিবারিক কর্তব্যপালনের প্রকৃষ্টতা সভ্যতম সনাতনেও আজও পর্য্যন্ত উদ্ভিত মত বীকৃত হয় নাই। ভারতে উর্নাবৎল সভ্যতায় তাহার সমস্ত প্রকা, ভক্তি ও জ্ঞান, জ্যোতি ও পুজনীয়গণের প্রতি একগুণভাবে নিঃশেষিত করিয়া দিয়া ছিল, যে মেহতাজন ব্যক্তিরা সেই আশ্রিত্যের ফলে সূত্রমাত্র লাভ করিয়াছিল। যথাপি শাস্ত্রকারণ্য কবে শাস্ত্র রচনার সময় এ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়া গিয়াছিল, দুঃখবশতঃ সে বর-তরঙ্গ তখন তাহার কানে

পহুঁতে ছিল না, সুতরাং—পিতামাতার সন্তান সম্বন্ধে, জ্যোতিঃ কনিষ্ঠ সম্বন্ধে, স্বামীর স্ত্রীর সম্বন্ধে অশেষ কর্তব্য পালিকলেও সে কর্তব্যপালনের কোনো একটা বিশেষ দারিষ্য ছিল না।

স্বশ্রু ও বধু ।—অবস্ত, ইহা হইতে আমরা এমন কিছু প্রতিপন্ন করিতেছি না যে লোকলে জননীগণ সন্তানকে দেখে করিতেন না, কিন্তু ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে জননীর স্বাভাবিক যে পুত্রস্নেহ, পুত্রবধুগণ তাহার উপর কিছুমাত্র দাবী করিতে পারিত না। সেফালে পুণ্যালিঙ্গু পিতামাতা অষ্টমবর্ষীয়া কন্তাকে বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিতেন, কিন্তু মাতৃহৃৎ-হৃৎ সেই স্নেহমাত্রী বালিকা পতিগৃহে আসিয়া তাহার দুল্লিত পিতৃমাতৃ-দয় ও সহোদর সহোদরার অপূর্ণ আত্মিক পরিপূরক কোনো পদার্থই পাইত না। সেই অগহীর শৈশব পতিগৃহের উপেক্ষা ও অনানবের ভিত্তর কিরূপভাবে তাহার দিন কাটিত সেই সর্লজ তাহার বিধাতা পুত্র-ই জানিতেন, পরে যখন সে বয়স্ক হইয়া লংগারে প্রবেশ করিত তখন স্বশ্রু মাতা তাহাকে আপনায় পরম বাৎসল্যের পাকী বিবেচনা না করিয়া বরং প্রতিদ্বন্দ্বীর মত দেখিতে আরম্ভ করিতেন। তাহার মনে করিতেন যে ছেলের সঙ্গে এযাবৎকাল তাহারের দে খনিষ্ঠ যোগ ছিল, বধু আসিয়া তাহার খানিকটা বিচ্ছিন্ন করিয়া নিতেছে, এবং তাহারের দিক হইতে সেহের পাতা উঠিয়া গিয়া বধুর দিকে নামিতেছে, সুতরাং আপনায়

ভাগে কম পড়িবার ভয়ে তাঁহার সপত্র হইয়া দেই গোপ্য অংশটুকুকে রক্ষা করিবার জন্য দুইতে আতঙ্ক করিয়া দিতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এইরূপ বিপরীত গতি অবলম্বন না করিয়া তাঁহার দ্বি আশনার জীবনের বিবেকে ফিরিয়া চাহিতেন তাহা হইলেই তাহার সম্ভোগ-জনক উত্তর লাভ করিয়া এ মিথ্যা ক্রোড বিদূরিত করিতে পারিতেন। অবশ্য তাহাতে খানিকটা ঔষধ অবলম্বন করিতে হইত।

স্বার্থবর্জনে সামাজিক স্থিতি।—পৃথিবীতে সত্য সমগ্র মাঝে-ই আপনায় সঙ্গে পরের বিনিময়ের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের এই যে প্রবণ বক্তিশালী স্বভাব “আর্য”—যাহাকে প্রতিনিয়তই সে খণ্ডন করিতে চাহিতেছে, কিন্তু যাহার কবল হইতে আপনাকে সে কিছুতেই মুক্ত করিতে পারিতেছে না, তাহার সঙ্গে সে এই একটি পন্থায় সন্ধি স্থাপন করিয়াছে। তাহার যাহা কিছু নিজের, তাহা সে বিলাইয়া দেয়, যাহার উপর তাহার কিছু মাত্র অধিকার নাই, তাহা লইয়াই সে চিরদিনের বরকলা পাতে। পিতামাতাকে তাই নিজের ঘরে পরকে দিয়া পরের মেয়ে নিজের করিয়া লইতে হয়, বৃক্ক পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে আপন করিতে হয়, পত্নীকে নিজের বস্ত্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া স্বামীর স্বার্থ গ্রহণ করিতে হয়—এবং জননীকেও তাই পুত্রের উপর হইতে খানিকটা স্বত্ব উঠাইয়া লইয়া “পরের মেয়েকে” একটু ভাষণা ছাড়িয়া দিতে হয়; আমাদের এই সামাজিক বিধিগুলির মধ্যে স্বার্থ বর্জনের

এই যে প্রস্তুত উদারপন্থা—আপনার স্বার্থপরতা যাহা তাহার মিলিত হইতে না পারিয়াছেন, কিম্বা তাহাকে লম্বন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা বিধাতার এ লক্ষ্যনিম্ন লগতে পরম দারিদ্র্যই ভোগ করিয়াছেন এবং আপনাতঃ চারিদিকে চরম অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন! তবানীতনকালে বহু উপর বংশ-গণের যে অমাত্রদিক অত্যাচারের কথা শোনা যায়, তাহার মধ্যে এই একটি হেতুকেই আমরা নির্ণয় করিতে পারি। এখন চাকর চাকরাণীকেও কেহ স্বল্প আহার জগবা কর দিতে পারেন না এবং শ্রম-লক্ষ্যেও যথেষ্টাচার করিতে পারেন না, কিন্তু তখন কতালমা বদুকে ক্রীত দাসী অশেষাও অপিকতর খোচনীয় অবস্থায় রাখিতে আর কেহ স্কৃতি হইতেন না। তাহাও আহার স্বত্ব, পরিবেশ কটে লক্ষ্যাবরণক্ষম, গৃহকাৰ্য্যে হাজারো সে নিপুণ হোক, শ্রমে সে হাজারো অলসবক্ষ্যতা হোক, পরিজনদের সেবার সে হাজারো অকৃশীলা হোক,—তবু তাহার ক্রটিও অত্র নাই, দোষের সীমা নাই, আচরণের অশোভনত্বের শেদ নাই, তাহার বংশক্রমের অহুপগৃহ বহু কঠোর কার্য্যের ডারে তাহার কোমল পানিতল বেক্সপ নিশেধিত হইয়া যায়িত, তাহার কোমলতার বালিকাছবর তদপেক্ষা বহু কঠোরতর আঘাত ও লংঘনপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইত। হায় অত্যাগিনী বকবদ! গৃহের নিভৃৎ প্রান্তে, বেহবজ্জিত কোমলতা-পুঞ্জ সহানুভূতির সে গরলদ্রব্য জীবন তাহা-দের—যেখানে তাহাদের জুখ জুখ বলিয়া কথিত নয়, ক্লেশ, ক্লেশ পলিয়া স্বীকৃত নয়, কঠোরতা কঠোরতা বলিয়া উক্ত নয়, যেখানে

তাহাদের মুখে ভাষা নাই, চক্রে ঘূট্টি নাই, ভদ্রেরে স্তম্ভস্ত্রিও উদ্ভাণ নাই—সনার সংস্কারক হোন্, বেশনারক হোন্, পরমজারক হোন্—সেখানে কবে কাহার দৃষ্টি পড়িত হইয়াছে! ছেলেবেলায় তুমিরাহিলামে চতুর্দশ বর্ষীয়া বয়সে রতনে সমান্ত্র একটু ফ্রট হইয়াছিল বলিয়া মাতৃসমা শ্রদ্ধাবতী তারার সর্জক প্রচ্ছন্নিত কাঁঠবধায়া পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। উপবিত্ত বর্তমান যুগেও এখন সেদিন বেখিলায় বিস্ময়ের কক্ষরাজা বসু শিশ্রাম স্মরণ উপভোগ করার অপরাধে শ্রদ্ধাবতী তাহার নিশ্চিত অবস্থার বুঝে চোখে লজ্জাবীটা মাখাইয়া দিলেন। এইরূপ নির্ঘাতন বেখিলে তুলিলে কি ক্ষত্রিগণের পূর্জাচারিত সন্ত-প্রবৃত্তা কত্রাবধ প্রথাই বাক্যের বলিয়া মনে হয় না!

কিন্তু সাহস করিয়া আর আমরা বলিতে পারি আমাদের বিংশ শতাব্দীর ভারত হইতে একজন দৃষ্ট ক্রমশঃ পুণ্ড্র হইয়া গাইতেছে, আমাদের বিনোদমান যুগের অস্ত্র গমনেই সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর নিহৃত অস্ত্রঃপুরুষণ ও রক্তনশাণ হইতে বাণিকাব্যুর উত্তম নিধান ও অলঙ্কার বিদ্যারগ্রহণ করিতে আবস্ত করিয়াছে।

আমাদের উদীয়মান যুগ আমাদের শূত্র প্রায় ভাঙারে ঐটুকু নবনকর করিয়াছে, এখন আমাদের বিনোদমানযুগের সঙ্গে যে সব রক্তরাজ আমাদের জীর্ণবাবের সংস্কারহীন বৃহৎ ছিত্রের ভিতর দিয়া বাহিরে খালিত হইয়া পড়িতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা থাক।

অভ্যাসের বল ও ইচ্ছাশক্তি। পশ্চিমের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে যদিও তাৎক্ষণিক অনেক মহাব্য জব্য বিনষ্ট হইয়াছে তজ্জাচ

সত্যের অমুরোধে একথা স্বীকার্য্য যে পশ্চিমের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রচণ্ড অস্তিত্বাভে নিশ্চিত ভারতবর্ষ অকস্মাৎ তাহার নিজস্ব পিত ককে জাগিয়া উঠিয়া বলিয়াছে। নিজস্ব জড়িমার অবশ্য হইয়া গে যে শূত্র কক্ষতলে পুলিসবার শরন করিয়াছিল তাহার প্রতি চাহিয়া আজ তাহার কপোলে লক্ষ্যের রক্ষিয়া দক্ষারিত হইতেছে! তারার অত্যন্ত বিবাদের চির আচরিত কর্ত্তের অভ্যাস যে তাহাকে গাড়ীর ঢাকার মত আপনায় নিহিষ্ট ঘূর্ণন পথের উপর দিয়া টানিয়া লইতেছিল তাহা দেখিয়া আর সে আপনায় সমস্ত শক্তিকে সচেতন করিয়া ধাঁকাইয়াছে! শূত্র মহিমার মুহূর্ত্তে আপনায় দিয়া সে আর আজ আপনাকে জগতের কাছে মহিমাবিত বলিয়া বিবেচিত করিতে চাহে না, সে বাহ্য কিছু পাইতে চায় তাহা আপনায় বোধশক্তির ভিতরে, চেতনার ভিতরে, কর্ত্তের ভিতরে পাইতে চায়, তাহার ভিতরে যে মহান্ সল্লখ প্রকৃতি লুপ্ত আছে, তাহাকেই সে আজ জাগাইয়া তুলিতে চায়।

গৃহকর্ম্ম—প্রাচীনা ও নবীনা।
দেকালে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিনীর বলিয়া বিবেচিত হইত এবং এখনও প্রাচীনগণের নিকট অপরিচ্ছন্নতা বিনয়ের নামান্তর। কিন্তু আমাদের শিক্তা নবীনা ভগিনীগণ গৃহকাব্যে প্রাচীনগণ অপেক্ষা পরিচ্ছন্নতার পরিচয় প্রদান করা সবেও নৈপুণ্যে তাহাদের সহযোগিতা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

দেশের মহাপুরুষেরা কর্ম্মযোগের সহায় মাইমা কীর্ত্তন সবেও কর্ম্মবিমুখতার স্রোত কিছুতেই কিরিতেছে না, বিলাসের চকল বায়ুবেগে তাহা

ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া বহিঃস্বপ্ন ছাড়িয়া পুরাতনের দিকেও অগ্রসর হইতেছে । প্রথমকথা তাই এখন স্মৃতিস্রাব হইয়া উঠিয়াছে, কষ্টসাধ্য কার্য্যে কেহ ব্যস্তকেন্দ্র করিতে চায় না, পল্লী-ঐতিহ্য—নানাবিধ গাছগাছড়া লতা পাতি ইত্যাদি এখন অনাদৃত হইয়া নিসৃত্তর অতলতলে নিমজ্জিত হইতেছে, এবং সহজ অস্বস্তি—আমাদের পিতামহীগণ বাহা অকুলি হেলেন বিদূষিত করিয়াছেন, তাহা দরিদ্র গৃহস্থের রুগ্নের শোষণ করিয়া চিকিৎসকের ধনভাতার পূর্ণ করিতেছে । একালে মেয়েরা অসম্ভব মাত্রার বিলাসিতার দিকে মূর্ছিত হইতেছে, এইজন্য একটা অধিবাসনের মধ্যে বানিকটা সত্য ও নিহিত আছে । কিম্ব, একদিন সাহারা নির্জীক পটভূতায় মন্থনের অমরা অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল, তাহাদের পক্ষে এইটুকু সংশয় কঠোরতা কি এতট অসম্ভব ! আমাদের নবীনা ভগিনীগণ এই কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন ।

বঙ্কর প্রকাশ্য কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত লেন মহাশয় অলঙ্কারশিলা ভাষ্যায় সম্বাদনীর কথা প্রায় ভাষার প্রত্যেক গ্রন্থেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এমন কি উৎসাহ কবিতায় স্থানী পতিকে সেই ভাষণ ভবিষ্যতের বিভীষিকা দেখাইতেও ক্ষমতা হইল নাট । বিগত যুগেরই হোক কিম্বা বর্তমান যুগেরই হোক, এ সম্বন্ধে নিজের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় কিছু বলিতে সাহস করিলাম না । এইটুকুমাত্র বলিতে পারি বাহারা চুঃখ-ভাপ-ফ্রিষ্ট পুণিবীতে রোগে শাস্তি, চুঃখে দগ্ধ, শোকে সাদনা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন তাহারা—অর্থচিন্তাগ্রস্ত ভগবান

মর্ত্ত স্বামীকে সেবা ও সহায়ত্বের পরিবর্তে আপনাদের বিলাস আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্ত ত্যাগনা করেন, একথা যদি সত্য হয় তবে আমাদের কলত্র রাখবার ঠাই নাই ।

পল্লীশিল্প ও পল্লী-চিত্রকলা ।
সেকালে মেয়েদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই চিত্রকলা ছিলেন । ব্রত উপলক্ষ্যে, পূজা উপলক্ষ্যে, বিবাহ উপলক্ষ্যে তাহাদের যেরূপ পরিচয় পাওয়া গাইত, তাহা অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইত । আমাদের সেই যুব যাকিনীর শোভন পল্লীশিল্প ও পল্লী-চিত্রকলা—যখন ও দরিদ্রের বাসাতে সমান আদ্যকার ছিল—কেন্দ্র অপরোধে যে তাহা বর্ধিত হইল তাহা বোঝা যায় বটে ।

প্রাচ্য স্বাস্থ্যতত্ত্ব ।
বিগত শতাব্দীর সহিত বর্তমান প্রাচ্য ভারত তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যশ্রীও হারাইয়াছে । পশ্চিমের উদাহরণ দিয়া এবং দেশগত জল-বায়ু বিভেদেব পার্থক্য বিস্তৃত হইয়া বাতাস-কণ্ডের প্রচাৰ অনাবৃত্তক বোধে বিসর্জন দিয়াছে এবং ধর্ম্মচরিত্র উপলক্ষ্য করিয়া প্রাচ্য শাস্ত্রকারগণ স্বাধীনোচিত যে নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে জলাধার দিয়া আপনাদের অটুট স্বাস্থ্যতত্ত্বকে বিনষ্ট করিতেছে । প্রতীয়া বৈজ্ঞানিকগণ অসীম গবেষণা ও অধ্যয়নের ফলে যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব আজ আবিষ্কার করিতেছেন, তাহা পেরি হুবার কালে সহজ জ্ঞানের মধ্যেই ছিল । আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে যত্নসহ শরীরের যে অজ্ঞেয় সম্পর্ক আছে এবং গ্রহ যৈশেষের অবস্থান ভেদে আবহাওয়া যৈশেষের পার্থক্য এবং উপবাসাদি দ্বারা যে তাহা প্রভব করা যায়, তাহা সহকাল হইল তাহারা লোক সমাজে

প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ-
পূৰ্ণ ভারত এই নিরমণের প্রতি প্রজা-
সম্পন্ন ছিল বলিয়াই অকৃত্রিম স্বাধীনতা ও দীর্ঘ
পরমায়ুলাভ করিয়াছিল। বাহ্যিকতার ক্ষত
সে বেঙ্গল কঠোরচরণ করিত, বৈশাখ হুজুমার
বর্তমান ভারত আজ তাহা স্বীকার করিতে
সম্মত বিমুখ। অগতঃ প্রভাটা বিজ্ঞানবিদগণ
আজ সমুদ্রের তাহার কাণের কাছে গলিতেছে
শুভবাস মল্লয়া শরীরে যোগ-বীজগণের মঙ্গল
সাধনের প্রধান উপায়! রোগ ভোগ অপেক্ষা
রোগ সমন করার কষ্ট তাহার কাছে আজ
কঠোর হইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমান ভারত।—মত। বটে
আমাদের পিতামহগণ চরিত্র-নীতির উপর
প্রজ্ঞাপান ছিলেন না, কিন্তু ততাত ইহা
স্বীকার্য যে সাধারণ ধর্মবুদ্ধি তাহাদের প্রশংসা-
নীর ছিল। পাঠা, পুস্তক, পরস্পরকথা
এক রকম ছিলই না, আমাদের উদ্যোগমান
ভারত এই বিবিধ পাণে বিসদ অভিভূত হইয়া
পড়িতেছে। তবে একথা অসঙ্গত স্বীকার্য
যে তখনকার সময়ে লোকের জীবনযাত্রা
নির্ভর একজন চক্কর ছিল না, নতুং হুপ্রচুর
যেদিনের অভাবক্লেশ-বর্জিত সম্মানগণ
লক্ষ্যবাসী সন্তোষের সন্তোষে তৃপ্ত হইয়া জীবন
গাপন করিয়াছে। ভাণ্ডের পত্রোৎপাদিকা
শক্তি বহুই কমিয়া বাইতেছে, পণ্যব্রহ্ম
তাই প্রচুর চাইতেছে। উদ্যোগের
অন্ত কিন্তু ইহা লোক আপনাতঃ সচেতন
জাতির মুখের গ্রাম কাড়িয়া লইতেও
আজ কুঠিঠনয়! তাই স্বল্পে তুটী ভাব আর
এখন নাট, রত্ন লভের অত্যাশ্রয় আকাঙ্ক্ষা
লোকের ধর্মবুদ্ধিকে শোচনীয়রূপে ধর্ম

করিয়া ফেলিয়াছে, বাহা আপাতমুখ ও
আতঃকলমারক, তাহারই প্রকৃত সকলে উন্মত্ত
হইয়া উঠিয়াছে। বাহাদের দৃষ্টি একদিন
দূর অগতির তিমিরাত্মক ঘনিকা ভেদ করিয়া
কুণ্ঠনিক স্বর্ণলোক প্রভৃতি ব্রহ্মণ করিয়াছে,
তাঁহারা আজ আপনাতঃ স্বার্থকামনার
বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে সম্মত অক্ষম হইয়া
পড়িয়াছেন! আমাদের পিতামহগণ মান-
নীর ও পুণ্ডরীকগণের প্রতি বেঙ্গল সম্মান
প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পরিমাণে বহু ও
অপমান যদি তাঁহারা তাঁহাদের সম্মানগণের
সমক্ষে প্রদর্শন করিতেন তাহা হইলে হয়ত
একজন ঘটত না। পতিগৃহে সংসারত্যাগ
নাথার লইয়া তাঁহারা সংসারের লক্ষ্য ব্যাপা-
রই স্থানিগণ ভাবে চালাইয়াছেন, কেবল এ
সমক্ষে দৃষ্টপাত করেন নাই। আমাদের
মহাদে বিদ্যাক্ষণ সফল বিধানের সুব্যবস্থা
করিয়া কেবল ছলিয়া গিয়াছিলেন যে
“নারীর স্বার্থ পুত্রবধের নিমিত্ত স্বার্থ। যদি
তাঁহারা উন্নতির পথে উত্থান করে তবে
পরম্পরের হাত ধরিয়াই করিবে, যদি
অধঃপতনের পথে নামে তবে তাঁহাদের
সম্মিলিত বাহই তাঁহাদের একজন টানিয়া
নামাইবে, উত্তমতার হোক আর ক্ষুদ্রতার হোক,
তাঁহারা এক সঙ্গে তথায় পৌছিয়া। নারী
যদি স্বর্গীয়চিত্ত ক্ষুদ্রপ্রকৃতি ও দুর্দশাগ্রস্ত
হয় তবে তাঁহার গর্ভজাত পুরুষ কি করিয়া
উন্নতির আশা করিবে?” এখনও যদি আমা-
দের মনীষী জননীগণ এবং তাঁহাদের ভাগ্য-
বিদ্যাক্ষণ একথা নিশ্চয় হইয়া চলেন এবং
শিশুদের চরিত্র-শিক্ষার প্রতি পূর্ববৎ
ঐক্যসীমিত অঙ্গলবন করেন, তবে ভবিষ্যৎ-ভারত

বিগত কালের সুপ্রভুত্বের পুনরাবান-
করিবে সন্দেহ নাই। শুধু তাহাই নয়,
বর্তমান ভারত তাহার এই দুর্লভ দর্শনবিধা
লইয়া যদি একবার বিশেষ খোঁজ চেষ্টা
পড়ে তবে সে আর পুনরাবান করিতে
পারিবে না। যে বৃত্ত শক্তিতে সে একবার
বৃহত্তম পাণ্ডেও লগন করিয়া উঠিয়া ঝড়াই-
তে, সে শক্তি তাহার এখন নাই, এখন
যদি সে গোপ্পনেও পতিত হয়, তবে তাহাও
তাহার পক্ষে লগন অসাধ্য হইবে।

**উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ প্রতি-
ক্রিয়া।**—আমাদের উদীয়মান যুগের বহু-
গণ এখন স্বতন্ত্রভাবে আসিয়া পূর্বের দ্বার নম্রতা
ও বংশভীতা প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে না,
প্রাচীনগণের মূখে একদম অভিযোগ অত্যধিক
মাত্রার পোনা দাঁটাইতেছে। অতীত যদি কেহ
একদম উচ্ছ্বস ও দুর্নীতির পরিচয় প্রদান করে
তবে তাহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই।
কিছু বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা
যাইবে যে বিগত যুগে বহুগণ যাহা সঙ্কর-
হাছে, প্রাকৃতিক নিয়ম বেশে বর্তমান যুগে
তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। যদি
কোনো বংশের লজ্জা অপর্যাপ্ত হয়, পর বংশের
লজ্জা ভাঙার না, এবং যে বংশের কুটী আদৌ
হয় না তাহার পর বংশের জলজীবন উপস্থিত
হয়। যে বংশের বাহ্যিক আভিযাত্র ঘটে পর
বংশের তাহার স্বল্পতাবিধান করিয়া প্রকৃতি
তাহার সামঞ্জস্য দান করিয়া থাকেন।
আমাদের জীবন আমাদের প্রকৃতি জননী
সঙ্গে সঘন-শুভ নহে, একই শক্তি যে একই
প্রাণীতে জড়লগ্নে ও মনোজগতে কাজ
করিতেছে তাহা সর্ববাদী দ্বন্দ্ব সত্য।

পূর্ববর্তী যুগের নিম্নোদয় কনিষ্ঠেরও বেধ-
ভাজন ব্যক্তিরেব এ যুগে অনুপ্রাণন ঘটাইতে,
বহুখা পারিবারিক মর্যাদার ভিত্তর তাহাদের বিধি
নির্দিষ্ট স্থান দাবী করিতেছে, পুত্র পরিচরনের
শাশন উপেক্ষা করিয়া আপনায় পথ নির্ণয়
করিয়া লইতেছে, চাকর চাকরানী এবং
সনাতনের নিয়ন্ত্রণ—এ বাৎকাল বাহ্যিক জড়
পদার্থপং উচ্চতর সমাজ সমূহের বেগজাচার
অমান বহনে সহিত আগিতেছিল, তাহারা
তাহাদের মাথায় উপর পুত্রোক্ত অনুশাসনের
স্বপ্ন বিদার্য করিয়া সদর্পে জগতের অপরায়ণ
জাতির সহিত সম্মিলিত হইতে বাহিরে
আসিয়া ঝড়াইয়াছে। কলহাশ আঘেওগিরির
আকস্মিক বিদারণের মত সমগ্র মানব আত্ম
কম্পিত করিয়া তাহাদের সেই দীর্ঘকাল
শক্তি অস্ত্র ও অত্যাচারের ফল উত্তপ্ত লক্ষা
প্রবাহের মত উৎকর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, আর
আর তাহাকে অবহেলা করিবার ঘো নাট,
জাহার যুগের উপর দারুণ করিয়া দিবার
পথ নাই, আর সমগ্র বন্দনময় জাল-
পৃথক প্রবিন পড়িয়া গিয়াছে “লামাল!
লামাল!” আর সকলে শক্তি নৈজে নিরম
ভঙ্গকারীর প্রতি রোষোকাণ্ড করিয়া তাকাই-
তেছে, কিছু হার! এ যে আঘাতের প্রতিঘাত
—এ যে বিধাতার বিধি—ইহাকে নিরোধ
করিবে কে? শালনে বতই বেটন করা যাক্
দুর্লভেবে যে বণ আছে, এবং আপনাকে
বতই বড় মনে করা যাক্ উপরে যে
ভগবান আছেন, আমাদের শক্তিধরমত
সমান-বিধাতৃগণ যতদিন এ কথা না স্বীকার
করিয়া লইবেন ততদিন ইহার প্রতিগারে
পথ নাই—এ কথা যেমন সত্য, অপর পক্ষে

এ কথাও ভেদনি সত্য যে, যে কাৰণেই হোক, নিম্নম যে লজ্জন করবে, বিশ্ব জগতের বিধান অল্পপাণ্ডে নিম্নমতকের যে ফল—তাঁহা হইতেও তাহাদের অব্যাহতি নাই। অহমিকার ফল হইয়া কিবা আত্মস্থচেষ্টায় অঙ্ক হইয়া বর্তমান ভারত যদি সগৰ্ব্ব পনক্বেপে কল্যাণকে লজ্জন করিয়া চলে, তবে তাহার অন্তঃকামেনব নবীন প্রভাত অটরে অন্ধকাৰাঙ্কর হইয়া যাইবে এবং বিংশ শতাব্দীর অবসানে নব শতাব্দীর উদা তাহাকে “যে তিনিরে সে তিমিরেই” মধ্য দেশেরা বিশ্ব-লুপ্তে নতমুখী হইয়া দাড়াইবে !

মানুষের শক্তির নির্দিষ্ট মাত্রা।—
মানুষ শক্তির একটা বিশেষ মাত্রা নাই। জগদ্রহণ করিয়াছে দেবা বাহ। তাহার হাঙের সেই মূল ধনটুকু হইতে যদি কোনো দিক দিয়া সে একটু বেশী খরচ করিয়া ফেলে, তবে অল্প দিকে পরের বেলায় তাহার অভাব পড়া হইল। বিস্তার যে স্বেচ্ছা লাভ করে, সাংসারিকতার সে তত্ত্ব প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না, সাংসারিকতার যে প্রতি মাত্রার নিপুণ, মানুষের অল্প সব বাহ্যিক গুণাবলিতে সে বঞ্চিত। সাংসারিকতার যে অল্পলবণ, দেহ তাহার অগভীর, দেহ বাহ্যিক অত্যন্ত সাংসারিকতা তাহার প্রশংসনীয় নহে। মনোবৃত্তির মধ্যে একটা দিক অতি পুষ্ট হইয়া উঠিলে সেই আত্মবৃত্তির অল্পপাণ্ডে অপর দিকে সর্জন্যতা বটিয়া থাকে। সুতরাং মানুষের সমস্ত স্বেচ্ছাবলীর সামঞ্জস্য ব্যাধি অল্পপাণ্ডের সাধনা করিতে প্রাচীন ভারতবর্ষ

উপদেশ বিধাছিল। কোনো মনোবৃত্তিকেই বাহ্য দিগা নয়, কোনোটির অপব্যাপ্ত বৃত্তিতেও নয়, প্রত্যেক মনোবৃত্তিতে গুণকে অল্পলবণের দ্বারা পরম পরিণতির ভিতরে লইয়া যাওয়াই ধর্মের শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া পন্থীকৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ এই সামঞ্জস্য সাধনায় পণ হইতে খলিত চটকা একেবারে আত্মপন্থা বহন অল্পটিকে অভাবগ্রস্ত করিয়া ফুলিল, তখনই তাহার বিশ্ব-বাসিত স্বর্ণমুগের যৌগেবৃত্তাসিত দিগা অবগান হইল !

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের গন্তব্য পথ।—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অমেরুখার এই মহান সামঞ্জস্য সাধনার জর বক্রমাবৃত্তির শাক জন্ত শব্দেব গভীর মানে ভারতের গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও তন্ত্রাত্মক প্রাচীন ভারত যথ্য জড়িত চক্ষে কিম্বাইতেছিল। নগরোপকণ্ঠে ধ্বনিত তুর্ধ্যধ্বনির মত কেহ সে স্বর শুনিতে পাইল কেহ পাইল না ! আর পুরাতন ও নূতনের সমস্ত ধ্বংসংঘাত লাভ ও ক্ষতি বিনাশ ও সৃষ্টির দিকে চাহিয়া বর্তমান ভারত কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিহ্বল চক্ষে চারিদিকে চাহিতেছে কিন্তু যে পর্যন্ত সে এই অনাবৃত্তক আত্মপন্থা ও স্বতাবৈবিক্ত স্বরতা এই দুইকে একান্তভাবে পরিচাণ করিয়া, যাহাকে দেখানে রাখা কর্তব্য এবং যাহাকে বর্জন্য দেওয়া কর্তব্য তাহাকে দেখানে রাখিবার ও সেটুকু দিবার ক্ষমতা লাভ না করিতেছে ততদিন পর্যন্ত তাহার হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে জ্বলমনিবার্য !

শ্রী. বামোদিনী বোদগারী ।

ভিতর গড় ।

ভারত বকে যে কত অসংখ্য ক্ষুদ্র ও
বৃহৎ পুরাতন কীর্ষির ভগ্নাবশেষ বিস্তারিত
রহিয়াছে তাহার ইহুতা নাই । সমগ্র ভারত-
বর্ষে বোধ হয় একরূপ স্থান অতি অল্পই আছে
যহার কোন না কোন প্রকাণ্ড ইতিহাস
সম্পর্কিত প্রাচীন কীর্ষি দৃষ্টি গোচর না হয় ।
উত্তর বকে যেন আবার এইরূপ কীর্ষির
কিঞ্চিং সংখ্যাধিক দৃষ্ট হইয়া পাকে । দিনাজ-
পুর প্রভৃতি স্থানে এইরূপ বহু প্রাচীন কীর্ষির
ভগ্নাবশেষ দীর্ঘিকাভূগণ্যপুষ্কাদি সমাকীর্ণ
হইয়া অত্র পর্য্যন্ত তাহাদের অস্তিত্ব অক্ষুর
রাখিয়াছে । কাণের ক্ষয়কারী তাড়নার
তাহারা অক্ষয় হইয়াছে ; আর কত
কাল এই তাড়না সহ করিয়া তাহাদের
অস্তিত্ব টুকু রক্ষা করিতে পারিবে কে
জানে ?

এই ভগ্নাবশেষগুলির অধিকাংশই
ঐতিহাসিক তথ্য অতীতের বনাকুকায়ে
আচ্ছন্ন । কোন্ অতীতের কোন্ কুত নুহুর্ন্তে
কোন্ মহাপুরুষের ভ্রম গ্রহণ করিয়া এই সব
মহান কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহার কোন
লিখিত বিবরণ আমাদের হস্তে আদিয়া
পৌছে নাই ; কিন্তু সেই সকল অজ্ঞাতনামা
মহাপুরুষ যে অতি ভীমকর্ষা ছিলেন ও
অসংখ্য ইতিহাস বিখ্যাত মহাপুরুষদের সম-
সাময়িক ছিলেন তাহা তাহাদের অতীত কীর্ষি
সকলের ধ্বংসাবশেষ অতি ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট
রূপে বলিয়া দিতেছে । অথি আমরা এইরূপ
একটি পুরাতন নষ্ট গৌরবের বিবরণ প্রকাশ
করিতেছি, তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে

পারিবেন যে ইরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্পন্ন
করিতে কত শ্রম, কত সময় ও কত অর্থ
ব্যয় হইয়াছে ।

জলপাইগুড়ী জেলার বোরা ও মরাসী-
কাটা নামে দুইটি পরগণা আছে । এই
দুইটি পরগণারই দ্রুতকালে লইয়া ভিতর গড় ।
সম্প্রতি আমরা উহা যে অবস্থায় দেখিতেছি ও
যে স্থানে উহার পরিখা ও মৃত প্রাচীর বর্তমান
রহিয়াছে সে স্থান জলপাইগুড়ী নগর হইতে
আট মণ মাইল দূরে অবস্থিত । তালুমা নারী
ক্ষুদ্র গিরি-সরিং আর এই মৃতিকা-প্রাচীরের
পূর্বদিকে প্রায় তিন চার মাইল দূরে প্রবাহিত
হইতেছে ; কিন্তু চাঁটার সাহেব এই ক্ষুদ্র
নদীটিকে দুর্গ-মধ্য-প্রবাহিত বলিয়া উল্লেখ
করিয়াছেন । বর্তমানে তালুমা নদীর
প্রবাহিত, তথাপি দুর্গের কোন চিহ্ন লক্ষিত
হয় না । চাঁটার মহোদয় এই দুর্গ প্রায়
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দর্শন করেন ; তাহার
বর্ণনামতে যদি এই নদীটিকে দুর্গ-মধ্য-
প্রবাহিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে
এই দুর্গটিকে প্রায় বারো মাইল দীর্ঘ ও আট
মণ মাইল প্রস্থ বলিতে হয় । পরন্তু, এই
হিসাব ছাড়িয়া দিয়াও, আমরা বর্তমানে
যাহা চান্দ্র দেখিতে পাউতেছি, তাহাতেও
এই দুর্গ দৈর্ঘ্যে সাত মাইল ও প্রস্থে প্রায়
পাঁচ মাইল হইবে ; অথবা, অত্র প্রকাণ্ড
বলিতে গেলে, এত বড় মহান সমগ্র ভারত-
বর্ষে বর্তমানে দুই একটির অধিক নাই ।
চাঁটার সাহেব ইহাকে মহানগরী (city)
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু আমরা

ইহাকে গড় অথবা গুণ বলিতেছি; কারণ পরে নশাইবে।

দুর্গটি একটি সমকোণ বিশিষ্ট সরল ত্রৈভুজ ক্ষেত্র, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে প্রায় সাত ও পাঁচ মাইল। অধুনা যেমন দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে এই দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে, প্রথমে প্রায় বিশ ফুট প্রশস্ত একটি পরিখা পাব হইতে হয়। তাহার প্রায় পঞ্চাশ ফুট পবে প্রবেশোক্তটির জায় আর একটি, ও তদুপর অণেকাক্ষত ঘন সরিষি ও অন্ন পরিসর আরও তিনটি পরিখা বিস্তারিত। এই পাঁচটি পরিখা পার হইয়া অন্ন কিছু দূর গমন করিলে আর একটি পরিখা, ইহার প্রায় পঞ্চাশ ফুটের ন্যূন নহে। পুনোক্ত পরিখা সমুদ্রের গভীরতা এখন বিশেষ কিছুই নাই। তাঁর প্রবেশ, লতা, গুহা, তৃণ ও অজ্ঞাত নাতি বৃহৎ স্থানীয় বৃক্ষ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া একটি অরণ্যের আকার ধারণ করিয়াছে। এই পরিখাময় চূড়াংশে পরই এক বৃহৎ সুসজ্জিত দুর্গটিকে দেখেন করিব রহিয়াছে। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বোধ হয় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর দক্ষিণে সতদূর দৃষ্টি করা যায় তত দূরই সুবৃহৎ অঙ্গগণের জায় সরণ তাৎপে লব্ধমান এই বিশাল প্রাচীর-দেহ দৃষ্ট হইয়া পাকে।

এই প্রাচীরের পরই লম্বাদিকে এক মাইল ও চওড়া দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দ্বািত ক্ষেত্র পার হইলে অধুমান বিশ ফুট প্রশস্ত আর একটি পরিখা। ইহারও গভীরতা প্রকৃতি পুনোক্ত জলির দ্বারা ও ইহার পর ইষ্টক প্রাচীর। এই প্রাচীর সকল এখনে প্রাচীরের দ্বারা

ইষ্টক মিশ্রিত লোহিত স্তূপে পরিণত হইয়াছে। প্রামবাগিগণ আপনাদের ও গবাদির গভীরতার স্থবিধা জন্ত স্থানে স্থানে কাটিয়া পথ করিয়া লইয়াছে; তদ্ব্যতীত সমস্ত অংশ অবিকারিত ও প্রায় সমোচ্চ রহিয়াছে। তদুপর লম্বা ও চওড়া দিকে যথাক্রমে আট শত ও চার শত ফুট দ্বািতের পার হইলে এক তড়াগোপন বৃহৎ দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকার একটু বিশেষ বিবরণ আবশ্যক; কেন না তাহা হইলে, কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ অজ্ঞাতনামা পুরুষের দ্বারা এই সুবৃহৎ জলাশয় এইরূপ স্থাপিত দুর্গের মধ্যস্থলে খনিত হইয়াছিল তাহা সুবিধা পাঠকগণ চিন্তা করিবার স্থিতি পাইবেন।

দীর্ঘিকাটিকে স্থানীয় লোকে “মহারাণা দাঁবি” বলিয়া পাকে। উহা উত্তর দক্ষিণে ১৭৭৫ ফুট ও পূর্ব পশ্চিমে ১০০০ ফুট। হাট্টার মহোদয় ইহার পরিমাণ উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব পশ্চিমে যথাক্রমে ৮০০ শত ও ৭০০ শত গজ বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে, আমরা কিংবা বাহা মাপিয়া দেখিয়াছি। ইহার পাহাড়ের উচ্চতা কোন স্থানে ত্রিশ ফুট অধিক কোন স্থানে বা পঞ্চাশ ফুট, এবং পাগবনের প্রশস্ততা কোন স্থানেই এক শত ঘন ফুটের ন্যূন নহে। শীর্ষ প্রবেশের প্রশস্ততাও প্রায় সর্বত্রই পঁচিশ ফুট। যতঃ এই প্রাকৃতিক তাঁর পাহাড়বৎ প্রতীয়মান হয় ও উহার চূড়া প্রবেশে আরোহণ করিতে পর্বত প্রবেশের জায় স্ফুট বোধ হইয়া থাকে। ভীতিত এই প্রকৃত স্তম্ভিকাটানি দৃষ্টে বিশাল দীর্ঘিকাটির গভীরতার বিষয়ও কিঞ্চিৎ অল্প-ধাণন করা যাইতে পারে।

এই জলাশয়ের মোট ঘনটি অবতরণিকা

অথবা ষাট আছে। পূর্বা ও পশ্চিমদ্বারে তিনটি তিনটি করিয়া ছয়টি এবং উত্তর ও দক্ষিণদ্বারে দুইটি দুইটি করিয়া চারটি। পূর্বা-দ্বারের তিনটি ষাট বাটীত অস্ত্রাস্ত্র সাতটি ষাটই ইষ্টক নির্মিত ছিল। হাট্টার সারের পূর্বাধিকের ষাটগুলিকেও ইষ্টক নির্মিত বলিয়া উল্লেখ করাযাচ্ছেন, কিন্তু এখন

ইষ্টকাদির বিশেষ চিহ্ন কিছু দেখা যায় না। ষাটগুলি সেরোবরের বিশালতারই অনুরূপ; বিশেষতঃ পার্শ্বের অবতরণিকা সমুহের অঙ্গলোচ্চর অথচ অত্যধ আশের গঠন প্রাণালী দেখিয়া একপ মনে হত যে উহার ছাদ বিশিষ্ট গুহের স্থায় ছিল; হঠাৎ কত স্মরণীয় সমাগমে ঐ গুহ সকল আণোড়িত হইয়া



মহল গড়ের তথ্যবিশেষের একাংশ।

উঠিত, হঠাৎ কত অধিক কঠোঁ-জাঙ্ঘিত হোত্র গানে তাহার পবিত্র শাস্ত্র গম্ভীর ভাবে ধারণ করিত।

পূর্বা ও পশ্চিমদিকে ৫০০ পত ফুট ১০০ পত ফুট ও ১০০০ পত ফুট এবং উত্তর দক্ষিণ দিকে ৩৫০ ফুট ও ৬৫০ ফুটের উপর এক একটি করিয়া ষাট গম্বিবিষ্ট। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বের পশ্চিম দিকের ষাটের উপর একটি অস্থল ফুট পরিধি বিশিষ্ট বটবৃক্ষ।

বৃক্ষটির চতুর্দিক ইষ্টক দ্বারা বেঁধা ছিল, এখন বীধুনি ভ দ্বারা গিয়াছে ও ইষ্টকরাশি চতুর্দিকে বিকলিত রহিয়াছে। এ স্থানে এখনও বাকীষ্ট স্থান ও দেগা হইয়া থাকে।

দীর্ঘিকাটি সর্পভোভাবে আবর্তনশীল। কোন প্রকার জগত বৃক্ষ ইচ্চাতে আরও পর্যন্ত ভদ্রিতে পাতে মাই। জল অতি পরিষ্কার। একপ পরিষ্কার জল অস্ত্র কদাচিত্ত দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সুবিশাল

বারিষক্ গণন পবনামোঁলিত হইয়া নীচ-
বিক্ষোভিত হইতে থাকে, তখন সেই গাড়ী-
থোর নিকট ছদর হস্তঃই নত হইয়া পড়ে ও
মন অতীতের কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে
অজ্ঞাতের চিত্তায় নিবিষ্ট হইয়া যায়।
বিশেষতঃ সন্ধ্যার গাঢ়-অঁড়ার লে দৃশ্য যে
একবার দেখিয়াছে সে আর কখনই ভুলিতে
পারিবে না। বারি হানির ঐক্লপ অনাবিলতায়
গ্রামবাসীগণ দেবত্বের আরোপ করিয়া থাকে ;
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তলপ্রদেশ বাসুকামর
হওতাতেই অলপ পরিষ্কার রহিয়াছে এবং
ইহাতে কোন রূপ তলর নৃক্ষ বা আবর্জনাও
কল্পিতে পারে না। ইহার আর একটি
বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ,
কোন প্রকার মন্ততর অস্তিত্বের পরিচয়
পাওয়া যায় না। যে কোন জলাশয়ে এমন কি
ক্ষুদ্র ডোবাতে পর্য্যন্ত অস্ততঃ অতি ক্ষুদ্র
শুভ্র মন্ততর বিচরণ করিতে দেখা যায় ;
কিন্তু এই শুভ্র জলাশয়ে, আমরা বিশেষ
রূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কোন বৃহৎ
মন্ততর কথা দূরে পাত্ৰক, অতি ক্ষুদ্র কোন
একটি মন্ততর দেখিতে পাই নাই। ইহার
কারণ কি ? এ বিষয়টি কি দৃষ্টি আকর্ষণ
করিবার উপযুক্ত নহে ? গ্রামবাসীগণ
দীর্ঘকালিকৈ অতি পবিত্র মনে করে এবং
সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইহাতে
তাঁহারা কদাচ মল মুত্র ত্যাগ করে না
কিন্তু কোন প্রকারে ইহার অধমাননা করে
না। আমাদের সঙ্গেই হাজার মাস্তেতরা
জলে 'এ'টোপাত' কেলিতে উত্তত হওঁয়া,
সেই স্থলে উপস্থিত করেজন গ্রামবাসী
তাঁহাদিগকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করিয়া-

ছিল। শুনা গিয়াছে তাঁহারা এ জলে
নামিরা মুখ পর্য্যন্ত দোত করে না ; তাঁহাদের
বিধাণ তাহাতে নীড়া হয়।

দীর্ঘকাল স্নান হানীর লোকের এইরূপ
সম্মানের ভাব কোথা হইতে আসিল ?
আমরা ইহার উত্তরে বলিতে চাই যে দূর্গ-
বাগিনের পানীর জলের অতাব মোচনার্থ
ইহা পানিত হইয়াছিল এবং দূর্গ অপরোধ কালে
উত্তম পানীর জলের অভাব না হয় এতদন্ত
জন সাধারণ ইহার কোন প্রকার আবিদতা
সম্পাদনে বিহত থাকিত। কাল সংকারে
এই ভাব, ভয় সংযুক্ত ভক্তিতে পরিণত
হইয়াছে। যেহেতু পূনাতোয়া জাগিরদারী
অপের মঙ্গল গিয়ারিনী বঁগরা সরল দৃষ্ট
হিন্দু-ভদ্রেরে মুক্তিসারিনী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত
রহিয়াছেন—ইহাও তেমনি জীবনরূপ মঙ্গল
রাশি বিতরণ করিয়া দূর্গবাসিনের কৃতজ্ঞ
ভদ্রের সরল মধুর অঁড়া ভক্তিটুকু আকর্ষণ
করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ঐশ্বর্য্যকালে জল বধন অত্যন্ত কমিয়া
যায়, সেই সময় দীর্ঘকাল মধ্যস্থলে মন্দিরের
চূড়ার দ্বার একটি কক্ষবর্ণ পদার্থ জলের
উপর প্রায় আধ হাত কি এক হাত উঁচু
ভাসিয়া উঠে। হানীর লোকে বলে, জল
মধ্যে এক মন্দির আছে, তাহারই চূড়া দেখা
যায়। পূর্জকালে অনেক দীর্ঘকাল অথবা
সত্তরাত্তরের মধ্যস্থলে দেব মন্দির কিংবা
বিশালভবন নির্মিত হইত। সেইরূপ একটি
মন্দির অথবা ভবন হইত এখানেও ছিল,
ভূমিকম্প অথবা অন্ত কোন নৈসর্গিক কারণে
নিমজ্জিত হওয়া অসম্ভব নহে। আমরা এই
চূড়াকার স্রাবটি দেখিতে পাই নাই ; কারণ

আমরা কাস্টিক মানে ঐ স্থানে গিয়াছিলাম ; তবে আমাদের অস্ত্রান্ত বহুগণ, গাছাও অগ্নি সময়ে তপার গিয়াছিলেন, তাহারা বলেন যে উহা একটি কাঠ বাতীত আর কিছুই নহে।

দীর্ঘিকার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত আর একটি স্থান। তাম্রের লোকে ইতাকে “মহলগড়” বলিয়া থাকে। এটি স্থানটি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ২৪০০ ফুট ও পূর্বে পশ্চিমে প্রায় ১০০০ ফুট হইবে। ইহারই মধ্যস্থলে আবার দুই দিকে পরিখা বেষ্টিত আর একটি স্থান। পরিখার উপরেই ইটের কাজ; বোধ হয় প্রাচীর ছিল, অথবা পরিখার উপরেই অট্টালিকা উত্তোলিত হইয়াছিল। তার পর একটি চূণ-স্মৃতি-ইট-মিশ্রিত অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান, সম্ভবতঃ এইস্থলে দ্বার কড়াই আশা হইয়াছে। এই স্থানে যে নিম্নেই একটি ইষ্টক গৃহ ছিল তাহা আশি ও স্পষ্ট-ই বুঝা যায়। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে আর বোধ হয় তাহা বৃদ্ধিতে পারা যাইবে না। আমাদের বোধ হয় চাষের দ্বারা এক্সপ বহু চিহ্ন লোপ পাইয়াছে। এই স্থানের পশ্চিম পার্শ্বে এক ইষ্টক তুল। কিন্তু এক স্থানে রোমারের এক অংশ এখনও অস্তর রহিয়াছে। গণেন এমনই শক্ত যে আমরা টানাটানি করিয়া তার একটুকুও ভাঙিতে পারি নাই। এই রোমার এবং তুল অতি দীর্ঘ শালাজাদিত। ইহার পশ্চিম উত্তর কোণে আর একটি তুল ও ঐক্সপ চূণজাদিত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট। উত্তর দিকে আর একটি তুল; এটি পরিষ্কার। এটি কোন মঠাকৃতি ইষ্টক গৃহ ছিল

তাহা সহজেই অস্বাভাবিক। ইহার উত্তর দিকে পূর্বে পশ্চিমে ৭৭৫ একটি ছোট পুষ্করী। কোন মূল্যমানের খোদিত কিংবা ইহার উত্তর ও পশ্চিম দিকে দীর্ঘ-চূণ-সমাধিকর্ণ দুইটি উচ্চ স্থান। মহলগড়ের ভিতরে এমন চারিটা লগ দেখা যায়। পশ্চ-তপার অনেকগুলি ইষ্টকময়। পশ্চ চারিটি পূর্বে হইতেই ছিল কি পরবর্তীকালে করা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা এখন অতি কঠিন। পুষ্করিকের প্রাচীর কাটাও যে স্থানে পশ্চ হইয়াছে সে স্থানে যেন একটি ধামের গাণনি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতেই যেন হয় এই স্থানে, অথবা কয়েকটি পথেই, খিলানবার ছিল। পূর্বে বারের অনতিদূরেই একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাশ্রয়ন পুষ্করীও রহিয়াছে; ইহার নাম “কুল পুষ্করী।” চারি পার্শ্বে চারিটি ঘাট, সমস্ত বৎসর জল থাকে, শুকায় না; পুষ্করীটি সমস্তক্ষেপ। পুষ্করে ঘাইতে হইত বলিয়া এখনকার তোরণের একটু বিশেষত্ব থাকে। অসম্ভব নয়। ইহার দক্ষিণ দিকে প্রায় ১০০ লত বিধা তুলি ব্যাপিরা এক আশ্রয় কানন।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকগুলি প্রায় তর। উহার মধ্যে যেগুলি অস্তর রহিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় ইট দুই প্রকারের। এক প্রকার, নয় ইঞ্চি দীর্ঘ, আট ইঞ্চি প্রস্থ, দেড় ইঞ্চি পুরু ও অস্ত্র প্রকার নয় ইঞ্চি দীর্ঘ, সাড়ে চার ইঞ্চি প্রস্থ ও দেড় ইঞ্চি পুরু।

ভিতর গড়ের দুই একটি বৈশিষ্ট্যের কথা না বলিলে এ স্থানের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিরা যাইবে। দীর্ঘিকার দক্ষিণ দিকে

এক স্থানে শুধু এক লক্ষ্যবর্তী বন । এক স্থানে এত বহুলাংক লক্ষ্যবর্তী আমরা অব কুত্রাপি দর্শন করি নাই । কে যেন কয়েক বিঘা ভূমি ব্যাপিত্য এই লতার চাব করিয়াছে । আরও অশ্লিষ্টের বিষয় এই যে এই স্থান বাতীত গড়ের অস্তর কোথাও আমরা অব একটিও লক্ষ্যবর্তী দেখিতে পাই নাই । অব এগুটি বৈশিষ্ট্য, এই গড়ের লেমন গ্ৰাস (Lemon Grass) । জলপটী-জড়ীর ঐ প্রদেশে ঐ তৃণ অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই গড়ে যত এত আর কোথাও দেখা যায় না । যে স্থানে কোন ভয় তৃণ বা উচ্চ ভূমি, সেই স্থানেই এই তৃণশাকার্য ও স্থানে স্থানে তাহার এমন সতেজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে ব্যাঘ্রারি অস্বাস্ত স্থাপন হোয়া দূরের কথা, অস্তিকার হস্তী পর্যন্ত তাহাতে লুকাইয়া থাকিতে পারে । আর সর্কোপরি অশ্লিষ্টের বিষয় এই যে সমগ্র ভূগর্ভে দুই স্থান বাতীত অট্টালিকা প্রভৃতির বিশেষ কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না । এক্ষণ হঠাৎ কারণ কি ? হাটোব মাঝেবের স্থার ইহাকে মহানগরী বলিতে হইলে, ইহার অভ্যন্তরে বহু অট্টালিকা, বহু দেবালয়, বহু আগণ, বহু বিপণি প্রভৃতি বিস্তারিত ছিল এক্ষণ কল্যাণ করিতে হয় ; এবং তাহা হইলে ঐ সমস্তের চিহ্ন পর্যন্তই বা দেখিতে পাওতেছি না কেন ? আমাদের বোধ হয় কোন রাজা—খুব সম্ভব তিনি

ভগবতবংশীক, — কামরূপ হইতে আসিয়াছিলেন ; লক্ষ্য কর্তৃক বিভাজিত হইয়া এই স্থানে এক অশ্লিষ্ট ভূগর্ভ নির্মাণে প্রচলন পাইয়া ছিলেন, তাহারই পরিচয় ও প্রচীর লক্ষ্য মায় নির্মিত হইয়াছিল ।

মহাগড় নাম হইতে বুঝা যায়, ঐ স্থানে রাজ্যস্থাপন ছিল । কিন্তু ভয় চিহ্ন যাহা দিহায়াছে—ভদ্রুটে ইহাকে রাজ্যস্থাপন হোয়া দূরের কথা, রাজ্যের কোন একটি পদস্থ কর্মচারীরও ভবনের স্থার পোদবহ না ; বরং এটি বেগালর ছিল এক্ষণ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে । হাটোর মহোদয়ও এটিকে বেবালয় বলিয়াই অগ্রহণ করেন । কিন্তু তিনি যেখানে রাজবাড়ীর নির্দেশ করেন, দুঃখের বিষয়, যেখানে আমরা কোনই চিহ্ন দেখিতে পাই নাই । মোটের উপর, এই স্থানটির ঐতিহাসিক রহস্য এখনও ভেদ হয় নাই । লাহিরা পরিবেশের উত্তরবঙ্গ শাখা-সমিতি আত্মকাল এই প্রদেশের অনেক স্থানের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, এই গড়টির স্রুতিও তাহারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য ।

ভিত্তরগড় এই নাম কোথা হইতে আসিল ? ভিত্তরগড় বলিলেই যেন আবার একটি বাহির গড়ও ছিল, এক্ষণ প্রত্যাশা মনে পড়েই উদিত হইয়া থাকে । বাহ্যভয়ে ইহার ইতিহাস লব্ধে কিংবা বলিবার ইচ্ছা রহিল ।

প্রিয়োগে



শিবপূজা
আটোম চেন চইচ

প্রতিমা ।

মেয়েটি ছিল অসুস্থ রূপশ্রী । তাহার অঙ্গে ছিল সুপের লাবণ্য, তাহার প্রতিভা ছিল বসন্তের তাওয়া ।

বেশের লোক তাহাকে দেখিয়া পাগল হইয়া গেল । সকলে যথোপাযুক্ত ভাবে, গানে তাহারই প্রশংসা করে । কেহ বা তাহাকে বলিতে দেখে কেহ বা তাহার নাম শ্রুতি পাইত না ।

স্বামী বলিলেন—“উহাকে না পাইলে আশা রাখা কিসের ?” রাজপুত্র কহিল—“উহাকে না পাইলে আমার জীবন বৃথা !” দেবালয়ের পুণ্যস্থিত কছিল—“যেহে তো মানবী নয়, ওতো পাপভরী দেবী । উহাকে বেদান্ত মন্দিরে আনিয়া রাখিব ।”

সকলে চকু হস্তবর্ণ করিয়া কহিল—“না, সে হইবে না । তাহা হইলে মন্দির ভাঙিয়া ফেলিব ।”

মেয়েটি মানালায় কাছে বসিয়া ভাবে—আমার মধ্যে কী আছে ! কেন লোকে এমন করিয়া পাগল হয় !

সে তো কিছুই বুঝিতে পারিল না । যতই না বুঝিল ততই তাহার আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল । সে মনে মনে বলিতে লাগিল, আমারে সকলে সেমন করিয়া দেখিতেছে আমারকে কে আমার কাছে ভেমন করিয়া দেখাইতে পারে !

সে সকলকে জিজ্ঞাসা করিল—“তোমরা কী দেখিতেছ ! কী চাও !”

তাহারা উদ্বিগ্ন, কালো কবিতা কিছুই বলিতে পারে না । কেহ বলিল—“তোমাকেই চাই !”

মেয়েটি আবার বসিয়া ভাবিতে লাগিল, আমারে কেন চায় ? আমি তো মনজনের মধ্যেই একজন—আমাকে লইয়া কী হইবে ?

অনেক ভাবিল, কিন্তু কিছুই সে বুঝিতে পারিল না । সপ্তাহে বৈবাহিক বাহুল্য হইল চকু আকর্ষণে দিকে তুলিয়া সে কাটাকে জিজ্ঞাসা করিল—“আমি কি শুধু একটা বস্ত্রের কোটা ! আমার মধ্যে কী আছে তাহার কোনো দৃশ্য জানি না ?”

আকাশ হইতে একটি ব্যক্তি আসিল—যে তোমাকে চায় না, যে তোমার কাছে হইতে দূরে আছে, সেই দেখাইয়া দিতে পারিবে, তুমি কী ।

কে আছে ভেদন যে তাহাকে চায় না ! সে লোককে সে খুঁজিতে লাগিল । সকলকে জিজ্ঞাসা করিল—“আমাকে চায় না এমন লোক এ দেশে কে আছে ?”

শুনিলে পাইল, ভেদন একজন লোক তাহার ঘরের পাশেই আছে । পাথর কাটিয়া সে মূর্তি গড়ে, কেহ তাহার সে মূর্তির কোনো পদমণ্ডল হয় না । কতবার দিনের পর বিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটে, সব হইতে সে বারিষ হয় না । যখন লোকে মনে করে হু হু তো বা সে বহিরাছে তখন দেখা যায় ঘরের বাহিরে সে ভোগা মনে বসিয়া আছে !

একদিন সকাল বেলায় সেট শিল্পীর দ্বারে আঘাত পড়িল । সে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, প্রভাতের আলোতে শূন্যবীথ সেট কামনার ঘন তাহার দ্বারে দাঁড়াইয়া । শিল্পী একটু হাসিল ।

যেহেটি মাথা নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—
—“সবাই আমাকে চায়, তুমি আমাকে
চাওনা কেন ?”

সে বলিল—“সবাই বাহা চায় সে আমি
পাটখাতি, তাই তোমাকে আমার আর দরকার
নাট।”

যেহেটি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,
—“তুমি আমাকে পাইয়াছ ? তবে একবার
দেখাও কী পাটিলে।”

শিল্পী তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।
ঘরটি অন্ধকার। মাঝখানে একখানি আলম
পাতা। এতাতের প্রথম আলোকের রেখাটি
আলিয়া পড়িল ও কচোর উপরে ? আলমের
সম্মুখে ঘেদীর উপরে ও কে দাঁড়াইয়া ? সমস্ত
বিশ্বের বিস্ময় নিবিড় হইয়া একখানি খেত
পাথরে মুক্তি ধরিয়াছে ও কে !

শিল্পী করিল—“নেপের লোকে বাতাকে
চায়, অথচ জানে না কাহাকে চায় সে ঐ।”

যেহেটি করিল—“ঐ কি আমি ?”

শিল্পী করিল—“হাঁ, ঐ তুমি।”

যেহেটি করিল—“ও যে অমরী !”

শিল্পী করিল—“হাঁ ও অমরী ওই তুমি।”

যেহেটি হাত মোড় করিয়া মাথা মাটিতে
ঠেকাইয়া সেই মুহূর্ত্তকে শ্রবণ করিল। উঠিয়া
দাঁড়াইয়া শিল্পীর দিকে গুট হাত বাড়াইয়া
দিয়া করিল—“তুমি আমাকে দেখাইয়া দিলে,
তুমিই আমাকে লও।”

শিল্পী করিল—“না, আমি সাহস করি
না।”

যেহেটি করিল—“কেন ?”

শিল্পী করিল—“কোন দিন ঐ অমরীর
সঙ্গে তুমি আমার ভেদ ঘটাইয়া দিলে, তখন
তথু তোমাকে লইয়া কী করিব।”

রাজা তখন পণে চাহাকার করিয়া
কিয়তেছিলেন।

কত্কাটি কুটার ছাড়িয়া বখন বাহিরের
আলোতে আলিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার গুই
চক্ষু—সব দৃষ্টি অন্ধবিন্দু।

ঐশ্বর্য্যবান পদোপাখ্যায় ।

চিরমৌন ।

হে বসন্ত বায়ু

তোমার আছে অনেক স্তর
অনেক কণা ছোটে,
সখা তোমার সাড়া পেয়ে
অনেক গনিই ছোটে,

বসন্তে বনের মাঝে সন্ধ্যা বাও,
নীরব আশ্রয় সাংকে, উদ্যোগ গাও,
বিশ্ব ভরা আগের আশা, অকালেতে শোক
বর্ষ কাব্যে কত ছন্দে নিষ্ঠা নব মোক ।

আমি শুধু পড়ে আছি ধরতীর মত ;
বহু দূরে চাপা আছে ছঃখ তাপ বত ;
অকুরিয়া ওঠে তৃণ ককে নব আশা,
পুষ্প মাঝে কেঁপে যায় মোর ভালবাসা !

সখা হবে মোর বনে সাড়া দিবে যাও,
কুহুমের গন্ধ লুটে ছুটিয়া পলাও ;
কুহুরিয়া উঠে পিক নির্ঝরিত গায়
আমি শুধু শুক থাকি ধরতীর প্রায় ।
ঐশ্বর্য্যবান সেবী ।

মাগরা উপরীপে হিন্দুভাষা ও সাহিত্য ।

অবুঝ দশাভেদের দক্ষিণভাগে যে একান্ত ভূ-খণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাই মাগরা উপরীপ বলাযা আশ্রিত । ইহা ভাষ্যতর্ক হইতে কতিপয় সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত । এই দূরবর্তী স্থানও পূর্বাঞ্চলে হিন্দুমাধ্যম্য প্রকাশ করিত । হিন্দুগণের পুরাতন দেবভাষা মাধুর্য্যো পরিপূর্ণ । উক্ত দেবভাষার ক্ষমতা কেবল যে আনাম, নেপাল, তুটান ও কাম্বীর প্রকৃতি পার্শ্বতানীমাত্র প্রদেয়নমুখে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহা নহে চীন, তিব্বত, বর্মা ও মালয়ভূমিতেও তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে ।

মাগরাভাষার সখকে একদাহিতো অনেক কথ্য বলাযাছেন কিন্তু এ প্রদত্ত কেহই উল্লেখ করেন নাই । বানিজ্যনি লইয়া হিন্দু-ভাষার সহিত এই ভাষার বহুকাল হইতে সখক প্রচলিত ছিল । সেইহেতু মাগরাভাষার প্রধান সম্পদ ভাষা ও সাহিত্যও উক্ত ভাষার মধ্যে নষ্টে নষ্টে ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে । উইলিয়াম মার্সডেন সাহেব বলেন—

“আমি মাগরা ভাষার জ্ঞানলাভ করিয়া ভারতীয় দেবভাষার সঙ্গে তাহা ‘মিলাইয়া দেখিয়াছি । মাগরাবাসীগণ সংস্কৃত ভাষার নিকট বহুগুণে দক্ষ । আমি আরও জানিয়া সন্দেহ হইয়াছি যে এই ভাষা মুসলমানধর্ম প্রবণ করিবার বহু শত বৎসর পূর্ব হইতে তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন হইয়াছিল ।”

আজকাল বহু আরবী কথা উক্ত ভাষার

প্রবেশলাভ করিয়াছে । তদ্ব্যতীত বহু কথা কোবাণ হইতে গৃহীত । কিন্তু সে সকল কণোশকপনে আবদ্ধ হইয়া না । কারণ আরবী কথার উচ্চারণ সহজ নহে । মার্সডেন সাহেব বলেন, আরবী ভাষায় সরলভাবে মনের ভাব প্রকাশক কথা নাই । সুতরাং উক্ত উপরীপে উহা'র প্রচলন এক প্রকার নাই বলিলেই হয় । কথাবার্তা প্রকৃতিতে তথাকার লোকের অপর ভাষার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করে । হিন্দুভাষার মনের ভাব স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হয় বলিয়া উহা সভ্যসামাজ্যের উপযোগী । মাগরাবাসীগণ সংস্কৃত ভাষা হইতে বহু কথা গ্রহণ করিয়াছে । সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইহাদের কিশোর সখ্য তাহার একটি তালিকা যথাসময়ে প্রদান করিলেই পাঠকগণ উভয়ের পার্থক্য জ্ঞানস্বক্য করিতে সমর্থ হইবেন । এই সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষা কেবল মাগরা উপরীপেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে । ইহার নিকটবর্তী জম্মু, কিলগাইন, মোলাকা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জও আশালব্ধবসিত । সকলেই উক্ত ভাষা বুঝিতে ও কহিতে পারে । ইহাকেই ইংরাজীতে ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা’ (Lingua franca) কহে । যেমন আমাদের দেশে বিন্দী লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা । দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যবর্তী মাডাগাস্কার ও পূর্ব্বদীপে অর্থাৎ জাতিমাত্রের উন্নত ভিত্তি পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত উক্ত ভাষা পরিবাস্ত । ইহাতেই বুঝিতে হইবে আমাদের হিন্দুভাষার ভাষা ও সাহিত্যের কিশোর অপ্রতিহত প্রভাব । ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই । যদিও অপ্রতিহত ভাষারও বহু শব্দ ঘীরে ঘীরে

উহার মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে তথাপি ইহার গোড়া পত্তন সংকুত নইয়াই—কারণ মালম্ভা অভিধানে সংকুত শব্দই অধিক ।

মালম্ভার সন্নিকটবর্তী ধোপপুঞ্জ এবং প্রবেশসমূহ অসভ্যভাষার নিবাসভূমি । তাহাদের আভিধানো হইয়া মালম্ভাংশ সে সভ্যশ্রেণীর অতর্কিত হইয়াছে তাহার অধীন কারণ তাহার হিন্দুভাষা ও সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া । একথা বহু ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন । হিন্দুগণের এইপ্রকার সুদূর দেশে আগমন প্রবণে কাহারও বিম্বের কারণ নাই । হিন্দুভাষা বহুকাল হইতে পূর্বা ও পশ্চিম মহাদেশে গমনাগমন করিতেন । তাহারাই উত্তরোপে ইতালী প্রভৃতি দেশেও আফ্রিকার মিশর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিতেন । তদে মালম্ভাবাসীগণের সঙ্গে হিন্দুগণের ক্রমিকারে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া ছিল তাহদের নিরাকরণ গ্রন্থাধ্য । আনুয়া ইহার তিনটি কারণ নির্দেশ করিতে পারি । (১) হিন্দুগণের বাণিজ্যার্থে বিস্তারিত গমন, (২) দেশবিজয়াদি এবং (৩) ধর্ম প্রচার । যে কোন একাধেই হটক হিন্দুভাষা এই উপবীণে আগমন করিয়া তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । তদ্বশের ভাষা ও সাহিত্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ভারতবর্ষের সঙ্গে অরব, সিঙ্গাপুর ও মালাক্কা প্রভৃতি স্থানের বীতিমত বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রচলন ছিল । সর্বাশ্রমে যখন পোর্চুগীজেরা এই সকল বীণে বাণিজ্য করিতে আইলে তখন তাহারাই বহুসংখ্যক হিন্দু বাণিজ্য-পোত ঐ সকল বীণের উপকূলে বর্জন

করিয়াছিল । পোর্চুগীজেরা এই বিষয়ে তাহাদের পুত্রকে সর্বশেষ লিপিবদ্ধ করিয়াছে । তাহার আভাও বলিয়াছে ঐ সকল জাহাজ 'করমতল' উপকূলে হইতে আগমন করিয়া মালাক্কা প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিত । এই প্রকারে বহু শতাব্দীকাল হইতে মালম্ভা ও তৎসন্নিকটবর্তী ধোপসমূহের অধিবাসীগণ হিন্দুভাষার নিকট হইতে ভাষা ও সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছিল । ইহারাই ত্রৈলোক্য ও তামিল ভাষার নিকট হইতে কোনপ্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই । তবে ইহারাই উত্তর ভারত-বাসীর নিকট হইতে বহুবিধ শিক্ষা করিয়াছে । ইহা হইল বহু বংশের কথা । তৎপরেই আরবী ভাষার কিঞ্চিৎ প্রচলন দৃষ্ট হয়,— আরবীর সকল কথা নহে কেবল কতিপয় বিশেষ্য ও প্রধান ক্রিয়াপদগুলি । শুভম্ভাটীগণের নিকট হইতেই ইহার সর্বাশ্রম সংকুত ভাষা শিক্ষা করিয়া গয় । আনুয়া মালম্ভা-অভিধান হইতে কতিপয় শব্দ উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু ভাষার সহিত তুলনা করিয়া দেখাইব ।

মালম্ভা	সংকুত হইতে বাসনা
সূক	সুখ
হক চেখা	থকচেই
হক	হঃখ
বারি	ভাগী
বলে	বাল
বাগ	ভাষা
বিহাং	বিহার
বিঃ	বীতি, বীজ
বুদি	বুদ্ধি
মোং	মোত
জাপা	জাপ
পুজী	(মাল) পুজী

রথ	রথ
পূর্ণিমা	পূর্ণিমা
চরিত্র	বিচার

যে সকল মালায়াবাসী আরবী বা অপর কোন ভাষা গ্রহণ করে নাই তাহারা হিন্দু-বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে তাহাদের বর্ণমোজনা করিয়া লইয়াছে,—এখনও ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ।

মালায়া উপদ্বীপে এক প্রকার বর্ণমালা প্রচলিত আছে তাহাকে “রেজাং বর্ণমালা” (Rejang alphabet) কহে । তাহার দুই চারিটি নমুনা দিতেছি ।

রেজাং		সংস্কৃত
(Ki)	ক	ক
(Gi)	গ	গ
(Nga)	ঙ	ঙ
(Ta)	ত	ত
(Da)	দ	দ
(Na)	ন	ন
(Pa)	প	প
(Ba)	ব	ব
(Ma)	ম	ম
(Cha)	চ	চ
(Ja)	জ	জ
(Nia)	য	য । এড়তি ।

সংস্কৃত বর্ণমালায় প্রতি বর্ণে পাঁচটি বর্ণ । কিন্তু রেজাং বর্ণমালায় তিনটি ছায়া এক একটি বর্ণ শেষ করা হইয়াছে । রেজাং বর্ণমালায় ক বর্ণের কার্য ক, গ ও ঙ ছায়াই সম্পন্ন হয় কিন্তু বর্ণমালায় উচ্চারণ উভয়েরই এক । মালায়া অভিধান ৩৫তে পুণ্যে যে কতিপয় শব্দের তালিকা প্রদান করিয়াছি তাহাতে শব্দের কিংকিৎ উচ্চারণ প্রত্যেক লক্ষিত হয় তটে

কিন্তু তাহারা সাধুতের সঙ্গে আরই এক । কেবল মালায়াবাসীগণ অল্পস্বাভাব ও বিমর্শের লোপ করিয়া লইয়াছে মাত্র । সেদিক দৃষ্টেও হিন্দুপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় । তদ্ব্যতিরিক্ত বর্ণমালায়ও বহুবিধরূপ ঐ মা দৃষ্ট হয় ।

আর একটি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে হিন্দুপ্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয় । মালায়াবাসীগণ কোন গল্প লিখিতে বাইরা রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনায় বিষয়গুলির সঙ্গে তুলনা করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায় । এমন কি একখানি হস্ত লিখিত পুঁথিতে হিন্দু-গণের সাহিত্য ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রতি পক্ষে উল্লেখ দৃষ্ট হয় । লিখিত ভাষায় লিখিত তাহাদের একটি গল্প হইতে কিংকিৎ উদ্ধৃত করিয়া এই বাক্যটির সার্থকতা প্রদান করিব ।

“টারলাপু ব্যাএক সেগালা জগাঙ্গিয়া মহাইন্দ সেগাটি পাতুলিয়া ।” অর্থাৎ তাহাদের ‘জগ’ যেন ‘পকপাতবের’ ছাত্র অতুলনীর । এই স্থলে ‘পকপাতব’ মহাভারত হইতে গ্রহণ না করিলে তাহারা এই কথাটি পৃথিবীর অপর কোন স্থলে প্রাপ্ত হইতে পারে না । অপর স্থলে আছে—“লাকুনীরা মেং-গামক ঈতু সেগাটি পাতু জীয়া তৎকাল ঈয়া মেং-গামক ডেডালায় রাংং কুক ।”

অর্থাৎ পকপাতব যে প্রকারে বৃদ্ধ করিতে করিতে কুকটৈশ্ব মহো প্রাপ্তি হইতেন তাহারাও তদ্রূপ বৃদ্ধ করিতে করিতে পকটৈশ্ব মহো প্রাপ্তি হইয়াছিল । এক্ষণে পাঠকগণ বুঝিয়া লউন ইহা কোন দেশের কথা ।

মালায়াবাসীগণ রামায়ণের কথা গল্পাকারে বর্ণনা করিয়াছে । মালায়ায় রামকৃষ্ণায়ণ

এক সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের দ্বার কণ্ঠদৈত্বে লটকা
 রাক্ষসগণের সঙ্গে মহাবীর যমভাতীত যুদ্ধ
 করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন ।
 শ্রীরামচন্দ্র মহাবীর হস্তমাক্ষিক বে প্রকারে
 সীতা অধোবর্ণাথে লক্ষ্মীপুরে প্রেরণ করিয়া-
 ছিলেন মহাবীর ওছল করিতে ক্রটি করেন
 নাই । মালতা প্রস্থানিতে বিকৃতবেদ, মহাবেদ
 পঙ্কজ, মাণ্ডুয়ত সরোবর । এই জলাশয়ে
 মৌলগা জন্মে) সিংহ-মস্ত্রি (ভগবতীর
 অলৌকিক পতিশালী সিংহ) গজতীর
 উল্লেখ আছে । কোন বুলে মহাবীর কর্ণের
 উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । পুরাকালে যে
 তথ্য হিন্দু আশাঙ্ক বর্তমান ছিল এট সন্দেহ

ভারতীয় প্রকৃতি প্রমাণ । হিন্দুগণ বাণিজ্যের জন্য
 ভারত সমুদ্রের উপকূলস্থ দ্বীপ সমুদ্রেও গমন
 করিত। বহু প্রাচীন কাল হইতে লবঙ্গ,
 এলাইচ, তৈজসী জাতিফল, দাক্ষিণিণ্য, তেজপত্র
 প্রভৃতি বহু প্রকার দ্রব্য আনয়ন করিতেন ।
 বর্তমান সময়েও জাতি, বর্ণিত, মেলিবিদ
 প্রভৃতি দ্বীপেও এক প্রকার ব্রাহ্মণের বাস
 দৃষ্ট হয় । ইহাও বাণিজ্য বাণিজ্যে
 সংঘটিত হইয়াছে দৃষ্টান্তে দৃষ্টব্য । পুরাকালে
 হিন্দুগণের সমুদ্র যাত্রা নিষেধ ছিল না এট
 প্রমাণ বাণিজ্য হইতে আমরা তাহারও
 একটা প্রমাণ পাঠতেছি ।

শ্রীগণপতি রায়

প্রারম্ভ ও শরৎ ।

নির্দোষিত বস্ত্রকুণ্ড, তাপ দগ্ধ কার
 তরি উঠে বিটপীর আয়ল শোভায়,
 আধিক্য গিরিবালা বজ্র তম্র শেখ
 মাণিক্যে,—খার খুঁজি সাগর উদ্দেশ !
 গাঙ্গ হ'ল পঞ্চতপ, নিগূত গো, উমা ! —
 মুক মুক মেঘলাহ আতপ-অরুণা !
 সিদ্ধ না সাধনা,—চাঁদ গগনের পানে,
 শোন' কার বরবাহা নার্তা পলে কানে ।
 গাঙ্গ ওই গুরুগুরু ডমরুর ধ্বনি
 লীলায়িত সিতিকর্মে মুহু দীপ্ত কণি !
 ছাঁদ যোবন লটকা স্নিগ্ধ পিঙ্গল,
 অরে স্বর অর প্রেম সন্ধ্যাকিনী জগ !
 যত কৃত বসে নাচে হাসে খল খল,
 কৃত সঙ্গে কৃতপতি আনন্দে-বিহ্বল !

শিব হুপ্রসন্ন মেঘ,—রক্ত কুণ্ডল
 গুহ্র বরকাজি হেরি মুগ্ধ চরাচর ।
 তালে শিতপত্রী, তটে সোম্য শাশ্বতাস !
 মধুর মঙ্গল জপে দিক্ হুপ্রকাশ ।
 আবার কাকন-কাজি হরিদ অকলে
 বসুণ্ণে মননেন্দ্রা, কোকনব বলে
 রাধি-রক্ত পা-পুথানি, শিশিরাস্রু ছুটি
 শেফালিকাসহ অরে লাজমানে ছুটি !
 শুদ্ধকাল,—ছত্রসম ধরি লীলাধর,
 নারিকেল শিখি নাড়ি ঢুলাই চামর
 নখ-বায়ু-কল্প রঙ্গে ছলাইছে কানে
 শিতসম, হেরি নৌন মৃতমন্ড হাসে
 বধুর অবরে কুটে ভূতল্যক দল !
 গাঙ্গে বিব শিব-শিবা মিলন মঙ্গল !

শ্রীনিরুপমা দেবী ।

চন্দন ।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি ।

এইপ্রকারে পূর্ণোক্তরূপে তিনি এতাহ স্বৰ্ণ
নির্ধৃত মূর্তি ধরন করিতেন । অবশেষে শেখ বিবলে
অকস্মাৎ চৈতঃ ও সজ্ঞানান্বেষণ উপলব্ধিত হইল
আগ্নি বোলা দিল । তৎক্ষণে রাজা বলিলেন “আমি
আমার সমস্ত অর্থদান করিয়াছি এবং পূর্ণোক্ত রক্ত-
পণের পূহাও অবলম্বন করিয়া এই সজ্ঞানান্বেষণ
করিয়াছি এবং উৎকৃষ্ট কার্য্য দ্বারা নিম্নোক্ত অসংখ্য
করিবার প্রয়াস করিয়াছি কিন্তু আমার সমস্তই বুঝা
হইল । এখন এই সকল বিপন্ন ঘটনোত্তে, জন্ম
আমার যৌন হারবে অথবা ক’কি ?”

পরে তিনি পঞ্চদশ অক্ষপত করিয়া আর্থনা
করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন
“আমার পূর্ণোক্তাধিকৃত পুণ্যবলে আমি ভায়-
বদানপিত্ত হইয়াছি ; আমার পুণ্যবলে এই অগ্নি
নির্ধারিত হইক ; যদি আমি নির্ধারিত না হয়,
তাহা হইলে আমার বৈদ্য বৃত্তা হইক ।” পরে তিনি
হুঃসংসারের সহিত অঙ্কলিত দ্বারাতিমূলে অঙ্গদর হইয়া-
মাত্র, অকস্মাৎ ঐ অগ্নি নির্ধারিত হইল এবং ধূমধানি
অশ্রুত হইল ।

উপস্থিত রাজস্বৰ্ণ এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া
রাজার প্রতি আরও চিন্তাভাবন হইলেন কিন্তু রাজা
রাজস্বৰ্ণকে বলিলেন “এই অগ্নি আমার স্বর্গলীলার
এবং কীর্তী বিনষ্ট করিয়াছে । আপনাদি এ সম্বন্ধে
কি বিবেচনা করেন ?”

রাজস্বৰ্ণ তাহার পদতলে নত হইয়া ক্রন্দন
করিতে করিতে বলিলেন “আমরা আপা করিয়া-
ছিলো যে আপনাদি এই অশ্রুতকীর্তী রিহদ্বারী হইবে
কিন্তু একমুহূর্ত্তে ইহা ভয়ে পরিণত হইয়াছে । আমরা
এ দুঃখ লক্ষ করিতে পারিতেছি না । কিন্তু অবি-
দ্বানীপণের যে ইহাতে আশ্রয় হইয়াছে ও তাহার
যে ইহাতে আশ্রয়প্রাপ্ত করিতেছে তাহাতে আমাদের
আরও কষ্ট হইতেছে ।”

রাজা উত্তর করিলেন “অশ্রুতঃ ইহাতে আমরা
বুদ্ধদেবের কথা যে অশ্রুত ইহা দেখিতেছি । অবি-
দ্বানী এবং অশ্রুত ঘটনাবলীপূর্ণ সকল জনাই
দ্বিষ্টা বলিয়া মনে করে কিন্তু আমাদের বুদ্ধদেব
সকলই অমিতা বলিয়া এতদ করিয়াছেন । আমরা
কার্য্য আমি শেখ করিয়াছি এবং তৎকালতের শিকাই
যে সত্য এই বিপন্ন হইতে ইহাই আরও বিশেষ ভাবে
সুপ্তিতে পারিতেছি । ইহা আমাদের আজ্ঞাবাহক
বিশেষ,—হুয়েনসাং ।”

তৎপরে তিনি অশ্রুত রাজস্বৰ্ণের সহিত পূর্ণ-
দিকে অঙ্গদর হইয়া বৃহৎ তৃণোপরি আরোহণ
করিলেন । উচ্চারণে পৌছিয়া তিনি চতুর্দিকে
অবলোকন করিয়া অবলোকন করিয়াবাস,
অকস্মাৎ এক অবিদ্বানী মূর্ত্তিকা হস্তে রাজাকে
আশ্রয় করিল । রাজা এই আশ্রয়িত আশ্রয়ে
ভীত হইয়া পশ্চাদ্গমন হইয়া তাহাকে ধৃত করিলেন ।
“রাজস্বৰ্ণচরিত্রণ তরে এতদূর বিজ্ঞান হইয়া গড়িয়া-
ছিল যে রাজাকে কি একারে সাহায্য করিবে তাহা
দিক করিয়া উদিত পারিতেছিল না ।

উপস্থিত রাজস্বৰ্ণ তৎকাল অপরাক্রমে পদন
সবদে সোহগের আর্থনা করিলেন কিন্তু শিলাবিভা-
রাম অপরাক্রমে সাহায্যে হস্তা না করা হয়
বীচাবে তাহার অবশেষ দ্বিষ্টা নিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন “আমি তোমার কি করিয়াছি, যে তুমি আমাকে
হস্তা করিতে উদিত হইয়াছিলে ?” অপরাক্রমী উত্তর
করিল “সহায়তা । আপনাদি বর্ণোপরি বিবল ;
সর্বস্বই ইহা স্বপ্ন আনয়ন করে । আমি নির্ধোণ ও
হস্তবুদ্ধি ; অবিদ্বানীপণের একটা কথার বিপদগ্রামী
হইয়া এবং তাহাদের অনুগোষে পর্য্যবিত্ত হইয়া আমি
রাজার প্রতি বিক্রোভজন করিয়াছি ।”

রাজা তখন বিজ্ঞান করিলেন “অবিদ্বানীপণ কি
অশ্রুত এই অশ্রুত কার্য্যে ভীত হইয়াছে ?” অপরাক্রমী

উত্তর করিল “বহাওয়! আশাশুভ্র ভিত্তি ভেগের
অধিবাসীগণকে একত্রিত করিবারে এবং অধবসগণকে
উপহার ও বোদ্ধাভাবের সূত্রি নিম্নাংগে রাখাণে পুঙ্খ
করিয়াছেন কিন্তু বেশ দেখাছার হইতে যে সকল
অধিবাসী আশিত্যে তাহারে সন্নিহিত বাত্যালাপও
করেন নাই। এইরূপ তাহারে অস্ত্রকরণে তেঁাহের
উদ্দেশ্য চইতাকে এবং আমের ভার হস্তভাগকে এই
হুগাংগে প্রস্তুত করিষাকে।”

রাজা তৎক্ষণাৎ পাঠশত প্রতিকাশানী রক্ষণকে
রাজার নিমিত্ত উপস্থিত হইতে আবেগ করিলেন।
রাজা অধবসগণকে সম্মান প্রদর্শন করিয়ারিলেন
সেই যেহু অধবসগণের প্রতি সর্বাংগে চইয়া তাহার
একত্রিত কীর্তনযোগে সুল্লাসান আশাধে অগ্নি
সংযোগ করিয়ারিল এবং আশা করিয়ারিল
যে অগ্নি হইতে রক্ষা পাইবার ক্ষমতা যখন নিশ্চয়
উপস্থিত হইবে তখন তাহার রাজ্যকে হুগা করিবে।
ঐ কারণে বিপদ সংকট হইয়াছে, তাহার এই
বাক্যকে উৎকোচ গ্রহণে বশীভূত করিবার প্রয়াস
পাইয়াছিল।

এই সংবাদে বহুসংখ্য ও উপস্থিত রাজস্বর্গ
অধিবাসীগণকে নির্ভুল করিবার প্রার্থনা করিলেন।
রাজা উহাদের নায়কবর্গকে শান্তি বিয়া অগ্নি
সম্বন্ধে কথা করিলেন। ঐ ৫০০ শত ব্রাহ্মণকে
তিনি সীমান্ত অংশে নির্ধারিত করিয়া রাজধানীতে
প্রত্যাপন করিলেন।

রাজধানীর উত্তর পশ্চিমে রাজ্য অংশে নির্ধিত
একটা স্থল আছে। এই স্থানে তদাপত্ত পৃথিবীতে
অধবাসকালীন সাত দিবস পরিমাণ বর্ষণাত্মক উত্তম
উত্তম লগা প্রায় করিয়ারিলেন। স্থলের পরিচটেই
চোঁকি জল বৃদ্ধ উপবেশন ও বাতাসের ক্ষমতা পবনরূপ
করিয়ারিলেন। এতদ্ব্যতীত একটা ক্ষুদ্র স্থলে বৃদ্ধদের
চুল এবং বস আছে এবং সে স্থানে বৃদ্ধদের প্রচুর
করিয়াছিলেন, দেখানেন একটা স্থল আছে।

পক্ষাতীয়ে বর্ষণ বিকে তিনটা সন্ধ্যায় আছে;
ইহাদের বিস্তৃত ভিত্তি বার ব্যক্তিগত একই প্রাচীর
ইহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। এইখানে প্রত্যেক কাল

কাণ্ডা শোভিত বৃদ্ধদের কর্তব্যকী সূত্রি আছে।
পুর্নোদিতগণ তৎ ও ময়। কয়েক লক্ষ উপাসক
এই স্থানে পুর্নোদিতগণের অধীনে বাস করেন। এই
বিহারে সুল্লাসান আশাধে বেকুটিকি যোগ বৃদ্ধদের
একটা উচ্চল বস আছে; এতৎ ও ভিত্তিতে ইহার
ভিত্তি ভিত্তি বস বস। বেশ বেশান্তর হইতে অসম্ভাব
এই স্থানে সমবেত হই; অধবাস আশাধে ব্যক্তিগত
ব্যক্তিগত সন্নিহিত একত্রিত হইয়া পুজা করেন।
প্রত্যাহ শত লক্ষ ব্যক্তি সমবেত হইয়া থাকেন।
এইরূপ অনুষ্ঠান লক্ষ ও বেকুটিকি বিহাররক্ষকগণ এক
একটা স্থবর্ণ মূর্তি বসন্তপন্থী নির্দেশ করিয়ারেন।
তদাশি বহুসংখ্য ব্যক্তি এই স্থানে উপস্থিত হই
এবং এক এক স্থবর্ণ মূর্তি আশাধে সন্নিহিত ব্য
করে। তৎপরে বিন দক্ষাকর্তৃগণ ইহা বর্ধির্ধে
আনয়ন করিয়া উক্ত সিংহাসনযোগি স্থাপন
করেন; তখন রক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সমবেত একত্রিত
ও পুলা বিকীর করেন এবং বসিত প্রচুর পরিমাণে
পুলা পুলাগার করিয়া চালা ইহা তদাশি এ আশাধ
আগুত হইয়া।

সন্ধ্যায়ের পশ্চিমে বর্ষণে ও বাবে দুইটা বিহার
আছে; প্রত্যেকটার ভিত্তি প্রচুর নির্ধিত, প্রাচীর
ইহাদের এবং প্রায় এক এক শত ফুট উচ্চ। বসন্ত
বসন্তপন্থীশোভিত বৃদ্ধদের সূত্রি—একটা স্থবর্ণ
মৌলানির্ধিত এবং অস্ত্রী তৎপরে তদাশি
প্রত্যেক বিহারে পশ্চিমে এক একটা সন্ধ্যায়
আছে।

সন্ধ্যায়ের পশ্চিমপূর্বে বিকে অনুভবুই
একটা স্থবর্ণ বিহার আছে; ইহার ভিত্তি প্রচুর;
সন্ধ্যায়ের ২০০ ফুট উচ্চ এবং ইহা নির্ধিত।
তদাশি প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ বসন্তপন্থী বৃদ্ধমূর্তি আছে।
ইহা তৎপন্থী তদাশি নির্ধিত এবং বস সুল্লাস
বসন্তপন্থী বসন্তপন্থী। বিহারের চোঁকি প্রাচীর
বোঝিত ভিত্তি বসন্তপন্থী। তদাপত্ত যখন
বোঝিসম্বন্ধে বসন্তপন্থী শিক্ষা করিয়ারিলেন, তখনকাল
সকল ঘটনা এই সকল প্রাচীরে বোঝিত রহিয়াছে।

প্রচুর বিহারের পশ্চিমে অনুভবুই বসন্তপন্থী

মন্দির এবং ইহার অনতিদূরে মধেবরের মন্দির। উক্ত মন্দিরই উল্লেখ্য মৌল প্রস্তর নির্মিত এবং মাল্য একবার প্রথম কলিকাতা পৌরিক। বৈষ্ণবগ্ৰন্থে ভারতীয় বুদ্ধদেবের বিহারের লবণুলা। প্রত্যেক মন্দির পরিচাল্য করিয়াও মন্ত্র লেখ্য তৃত্য আছে; দিয়ারাত্রি মন্দির সবচেই বাত ও গীতল্যনি হইয়া থাকে।

দ্বাবৎ লবণের মন্দির পূর্ণিমে, এবং পলা হইতে ৬৭ মি মন্দিরে রাজ্য অণোক নির্মিত ২০০ ফুট উচ্চ একটা ত্পু আছে। পুদিবীতে অম্বান কালীন, তথাপত দ্রাং, অনিতা এই লবণে লব বাস প্রচার করিয়াছিলেন।

উগ্রাই এক পার্শ্বে পূর্ণিচন চার জন বুদ্ধ উপবেশন এবং বাগানের মন্ত পাবচারণ করিয়াছিলেন। অধিকতর, একটা বৃত্ত ত্পু তথাপতের চুল ও লব আছে। যদি কোন রোগী প্রকৃত ভক্তিদান হইয়া এই মন্দির প্রদক্ষিণ করেন, তবে বৎকল্য ত্রিনি রোগমুক্ত হন এবং পুণ্যার্জন করেন।

রাজধানীর মন্দির পূর্ণিমে ১০০ মি বাইরা আনয়্য লবণেবুল লবণে উপস্থিত হই। ইহা পলায় পূর্ণিচীরে অবস্থিত এবং ইহার পরিধি প্রায় ২০ মি। এখানে পুশ্চক এবং লক্ষ্মণলিল লব আছে; এই লকল লবণে বুদ্ধের দ্বারা প্রতিকলিত হয়।

লবণের উত্তর পশ্চিম কোণে লবণ পূর্ণিচীরে বৈষ্ণবদিগের একটা মন্দির আছে। এই মন্দিরের চূড়ান্তি কালকারণের মন্ত লক্ষ্মণ। লবণের ৭৫ মি পূর্বে ৩৫৫ লক্ষ্মণায় আছে ইহারের ত্রিভ ত্রিভ বার কিত একই প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রায় ৫০০ লবণ ত্রিভ বাস করেন; ইহার লক্ষ্মণীবানী লীন-বান লভ্যলম্বী।

লক্ষ্মণায়ের লক্ষ্মণে ২০০ লবণ পূর্বে রাজ্য অণোক নির্মিত ত্পু। যদিও এই লক্ষ্মণায়ের ত্রিভি পুদিবী পর্বে, তথাপি ইহা বর্জ্যল্যনেও ১০০ ফুট উচ্চ। এই স্থানেই তথাপত লাক্ত বিলব লক্ষ্মণা বর্জ্যল্যনে করিয়াছিলেন। এই স্থানে একটা মূর্তি আছে—উগ্র হইতে লকল লবণেই আকৃতি নির্মিত

হয়। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে পূর্ণিচন চার জন বুদ্ধ উপবেশন ও বাগানের মন্ত পাবচারণা করিতেন।

লক্ষ্মণায়ের ৪০ মি উচ্চের এবং লক্ষ্মণায়ের রাজ্য অণোক নির্মিত ২০০ ফুট উচ্চ একটা ত্পু আছে। এই স্থানে বুদ্ধদেব লাক্ত বিলব লক্ষ্মণা প্রচার করিয়া-ছিলেন। এই লবণ ৫০০ লবণ বৈষ্ণা বুদ্ধদেবের মিকট উপস্থিত হইয়া উগ্রায় বর্জ্যল্যনা ত্রিভি। বৈষ্ণায়ের পরিচাল্য করিয়া বর্ণে লক্ষ্মণায় করেন। ত্পুপের নিম্নে পূর্ণিচনী বুদ্ধদেবের লবণ ও উপবেশনের ত্রিভ পাওয়া যায়। মিকটেই একটা ত্পু বুদ্ধদেবের চুল ও লবণ লকিত আছে।

এই স্থান হইতে মন্দির পূর্ণিমে ৬০০ মি বাইরা এবং পলা ইজার ইহার আনয়্য লবণেবা পৌরিক।

অযোধ্যা।

এই রাজ্যের ৫০০০ মি বিস্তৃতি; রাজধানী প্রায় ১০ মি। এখানে বর্ণে পাশ্চল্যন, ও প্রচার পরিচাল্য লবণ ও পুশ্চ পাওয়া যায়। লক্ষ্মণায় মাক্তিচীতোক এবং লবণায়; অযোধ্যায় লক্ষ্মণ ও মাক্তি। তালার বর্জ্যল্যল্যনে লবণ এবং বিজ্যায় লবণ। প্রায় প্রকৃত লক্ষ্মণায় ত্রিভ লবণ বক্তি বাস করেন। ইহার লীন ও লবণ উগ্রয় বানলুত পুশ্চক লি পাঠ করেন। লক্ষ্মণা বৈষ্ণবদিগ আছে, ত্রিভ ত্রিভ লক্ষ্মণায় লক্ষ্মণায় উপস্থিত বাস করে; কিত উগ্রায় লক্ষ্মণায় লবণ।

রাজধানীতে একটা পুরাতন লক্ষ্মণায় আছে; এই স্থানে বর্ণলক্ষ্মণা বৈষ্ণব, কয়েক লক্ষ্মণা বর্ণিচা লীন ও লবণ উগ্রয় বানলুত পুশ্চক লবণ করিয়া-ছিলেন। মিকটে লক্ষ্মণায় প্রাচীরে লক্ষ্মণায়ের লবণ পাওয়া; এই স্থানলুত পূর্বে লক্ষ্মণা বৈষ্ণবদিগ বিভিন্ন বৈষ্ণা রাজলক্ষ্মণা, লবণ ও লক্ষ্মণায়ের লবণ লবণের বাগা ও প্রচার করিয়াছিলেন।

লবণের ৫০ মি উগ্রয় লক্ষ্মণায়ের লবণ লক্ষ্মণায়ের রাজ্য অণোক নির্মিত প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ ত্পু আছে। তথাপত এই স্থানে ত্রিভ বাস লবণ বৈষ্ণবদিগের মিকট বর্ণ প্রচার করিয়াছিলেন। পূর্ণিচনী

চাষি জন মুন্ডের উপবেশন ও অশ্বের চিহ্ন চিহ্নস্বামী করিবার অত্র নিকটেই একটী কৃৎশ নির্মিত হইয়াছে।

সম্ভার্যারের ঠান লি পন্ডিতের একটী কৃৎশে তপাৎতের মূল ও মণ্ডিত রক্ষিত হইয়াছে। এই কৃৎশের উত্তরে একটী সম্ভার্যারের তপাৎশেব দেখা যায়, এই স্থানেই নৌজাতিক সম্ভার্যারের তপাৎতের ঋগ্বেদে বিভাগ পাঠ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মুন্ডেরের ঠান লি পন্ডিতের পুত্র আমল্যাকান্তের নবোদ্যোগ সম্ভার্যার; এই স্থানে অঙ্গর বোধিসত্ত্ব গায়ত্রীভাসে করিয়া অঙ্গকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অঙ্গর বোধিসত্ত্ব রাত্রিতে ঐশ্বর্যের বোধিসত্ত্বের মাল্য-প্রদানে প্রথম করিয়াছিলেন এবং তৎপরে বোধিসত্ত্বের পাত্র, বহাধান সুর্যলক্ষ্মীতী, মধ্যম বিভাজনায় একত্রিত গ্রহণ করিয়া লবণাধারের নিকট ইহা রাখিয়া করিয়াছিলেন।

আমল্যাকান্তের উত্তর পন্ডিতবদিকে একপত্র পত্র দূরে একটী কৃৎশ তপাৎতের মূল ও মণ্ডিত রক্ষিত আছে। নিকটে কতকগুলি ঋগ্বেদের ত্রিবিধে পত্রিতা যায়। এই স্থানে বহুশব্দ বোধিসত্ত্ব ত্রিবিধে বর্ণিত হইতে অবতরণ করিয়া অঙ্গর বোধিসত্ত্বকে স্বপ্নিত করিয়াছিলেন। অঙ্গর বোধিসত্ত্ব পাণ্ডারবাসী ছিলেন। মুন্ডেরেরের আশ্রমের সহস্র বৎসরের মধ্যে তিনি অঙ্গগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐবসিক মুন্ড-বর্ণনপত্রিতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি পাণ্ডাই মুন্ডের বর্ণ অবগত হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতভাবে শিবায় গ্রহণ করেন এবং মহিমাগত সপ্তদশের বোধিসত্ত্ব করেন কিন্তু পরে নিম্নস্ত পত্রবর্তন করিয়া বহাধান সম্ভার্যার তুল্য রণ। ঠানার মাত্রা বহুশব্দ বোধিসত্ত্ব সর্গভিষ্যাসিন্ধু সম্ভার্যারতুল্য ছিলেন। যেসবিসে ঠানার খ্যাতি ব্যাপ্ত ছিল; তিনি মুন্ডবান, ধীপতি সম্পন্ন এবং বিশেষ ভীষণ ছিলেন। অঙ্গের মুন্ড-নিম্নে নামে খ্যাত স্ত্রীতপালা এক শিখা ছিলেন।

এই স্থানেই তিনজন খ্যাতনামা খ্যাত অঙ্গের সহস্র এইরূপ বাক্যপ্রাপ্ত করিতে "ঠানার" ব্যাঘাতে মুন্ডার পর ঐশ্বর্যের সমুদায় হইতে পারি তপ্তর চেষ্টা

করিতেছি। আশ্রমের মধ্যে গিনি গ্রন্থ দেখতাপ করিয়া উপলোক অবস্থাপ্রাপ্ত হইবেন, তিনি যেন ঠানার আশ্রমবাসী। আশ্রমের পুণ্ড্রই নিবেদন করেন।

এত্রণ কথোপকল্পের পরে, মুন্ডনিম্ন গ্রন্থের দেখতাপ করিলেন। তিনি বহুশব্দে দেখা ঠানার কোন সংবাদ পাওয়া পের না; তৎপরে বহুশব্দ-বোধিসত্ত্ব প্রাপ্ত্যাপ্ত করিলেন। তৎপরে অস্তিত্ববিহিত হইল, তৎপরে ঠানার নিকট হইতে কোনই সংবাদ পৌঁছিয়া না এবং সেই রূপ সতল অবিস্মরণীয় বিভাগ ত উপলব্ধ করিয়া ছিলেন তৎপরে ঠানার হীন মন্ত্র জ্ঞান করিয়াছেন এবং সেই রূপ কোনরূপ ঐশ্বর্য চিহ্ন দেখা যায়নি।

ঐশ্বর্য পরে, একদিন অঙ্গর বোধিসত্ত্ব পঞ্চম ত্রিবিধ গ্রন্থের ভাষে কি একবারে দেখা দান করা যায়নি পাবে, ঠানার শিব্যকে এই সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেছিলেন, তৎপরে মুন্ডবাস্য প্রবাসের আলো দিয়াত হইয়া গেল এবং মুন্ডে উজ্জল আলো দৃষ্ট হইল। সেই সময় এক কথি-সেব আশ্রমবাসী গ্রন্থ করিতে করিতে তৎপরে অবতারণ হইলেন এবং পুণ্ড্রের সোণামালী আশ্রমের করিয়া অঙ্গকে অভিযান করিলেন। অঙ্গর ঠানাকে সংবাদ করিয়া বলিলেন "আশ্রমের আশ্রমে এক বিলম্ব হইল কেন? আপনি বর্তমানে কি নাম ধারণ করিয়াছেন?" উত্তরে ঐ কথি-সেব বলিলেন "আশ্রমের মুন্ডাকালে আমি ত্রিবিধ বর্ণে বাইয়া ঐশ্বর্যের নিকটস্থ পত্রপুত্র দেখা লক্ষগ্রহণ করি। পুণ্ড্র এক্ষুণ্ণ হইলে, ঐশ্বর্যের গ্রন্থপ্রাপ্তক বাক্যে বলিলেন" বাগত: যে স্থপতিত, আশ্রমের আশ্রিতে আশ্রম হইল। আমি এতকিন করিয়া ঠানাকে প্রণাম করিয়া বহাধান এইস্থানে চলিয়া আসিয়াছি।" অঙ্গর জিজ্ঞাসা করিলেন "মুন্ডনিম্ন কোথায়?" তিনি উত্তর করিলেন "বহন আমি ঐশ্বর্যকে প্রদর্শন করিতেছিলাম তৎপরে ঠানাকে বহির্দেশে লবণার মধ্যে স্থাপন ও মাল্যপ্রদান দিয়া দেখিলাম। তিনি আমায় এত দৃষ্টিপাত করিলেন না। মুন্ডার এবং অবস্থার কেনন করিয়া, তিনি যে ঠানার বর্তমান অবস্থার কথা আপনায় নিকট বিদ্রুত

করিয়েন, আপনি একগু আপা করিতেছিলেন ?
অনর বলিলেন :— “এইকণ বৈয়ের বেগিতে ক্রিগ
এবং তিনি ক্রিগে বর্ণিতগার করেন ? তিনি উত্তর
করিলেন “ভাষার বৈয়েরের পত্নীএর সৌন্দর্য
বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার বর্ণ সবচে এই
বলা যাউতে পারে যে পৃথিবীতে অটলিত বর্ণের
সচিত উহার কোন বিকিত্রতা নাই। তাঁহার স্মরণ
সর বসু, পণ্ডিত এবং বিদ্বৎ। যাহারা ইহা শ্রবণ
করেন, তাঁহারা ভয়নত ক্রান্ত হন না; যাহারা ইহা
শ্রবণ করেন, তাঁহাদের পরিভুক্তিত শীমা নাই।”

অসমের বর্ণিতগার গৃহ হইতে ৪০ লি উত্তর-
পশ্চিমে আমরা পরাতীতবর্তী একটা পুরাতন মন্দিরগমে
উপস্থিত হই। ইহাতে একমত দুট উচ্চ টীকের
তৃণ আছে; বসুবসু এই স্থানে প্রথম মহাবান পুত্রক
অধারনে ত্রুটি হন। উত্তর ভাগত হইতে তিনি এই
স্থানে সমাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে, অসম
বোমিদয় তাঁহার বিদ্যাপণকে বসুবসুকে সাধারণভাষার
লগ্ত প্রেরা করেন। বসুবসু এই স্থানে পৌঁছিলে
উত্তরের সাক্ষাৎ হয়। অসমের শিবা বসুবসুয় গৃহের
বহির্ভাগে বিজ্ঞান করিতেছিলেন; পেরায়ে তিনি
সমস্তই স্থান আকৃতি করিতে থাকেন। বসুবসু ইহা
শ্রবণ করিয়া ইহার অর্থ বোধগম্য করেন এবং ইতি
পূর্বে ইহা তাঁহার কণিগার হয় নাই, সেই সন্ত
আক্ষেপ করিতে থাকেন এবং জিলাবারা তিনি
মহাবানকে নিদা করিয়াছেন, এই মনে করিয়া জিলা-
হেবনে উগাত হন। একবাণি দুহিতা লইয়া তিনি
একগু কার্যোধ্যাত হইবা মাত অনরকে তাঁহার
সম্মুখে বসারমান দেখিতে পান। অসম তাঁহাকে
বলিলেন— “বস্তুতই মহাবান বসুপূর্ণ হ্রস্ব, সফল,
বুদ্ধবান ইহা প্রমাণা করেন এবং সকল কদিনই
ইহার স্ততিবাদ করেন। আমি আপনাকে ইহা শিখা
বিতায় কিন্তু এইকণ আপনি নিজেই ইহা শিখা
করিয়াছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে শিখা করিয়াছেন
সেই মুহূর্তেই আপনি আত্মহত্যা করিতে উগাত
হইয়াছেন। ইহা করিবেন না; বরক অসুতাপ করন
এবং পুত্রাকালে আপনি যে জিলাবারা মহাবানকে

শিখা করিয়াছিলেন, ততগ এইকণ যি জিলাবারাই
তাঁহার প্রমাণা করুন। আপনি মৃতন জীবন আরম্ভ
করুন; ইহাই স্মরণ উপার। মৃগশক করিয়া এবং
জিলা কর্তন করিয়া কোন লাভই নাই। এই কথা
বলিয়া তিনি অস্তবান করিলেন।

বসুবসু এই আদেশ মাত করিয়া জিলাকর্তনে
বিরত হইলেন। পর দিবস প্রাতেকালে তিনি
অসমের নিচট মন্দির করিলেন এবং মহাবান সত্যবান-
বান করিলেন। ইহাতে তিনি যি দিবসে চিহ্না কর্তে
আপিলেন এবং মহাবানের সতিত একমত হইয়া
সত্যবিক শাস্ত্র প্রবরণ করিলেন; এই সকল পদে
বসুই প্যাতিলাত করিয়াছে।

এই স্থানে হইতে দক্ষিণ উত্তরে প্রায় ৩০০ লি দাইয়া
অমরা হরগুণ বোনে পৌঁছি।

হুয়ুপু

এই রাজ্য প্রায় ২৪০০ কি ২৬০০ লি বিস্তৃত।
পরাতীতবর্তী রাজবানীর পরিচি ২০ লি। একপের
জলবাধু ও উৎসার ত্রাধা খোখোয়া প্রায়। সতিবানীরা
সমস্ত সন্তবিত। ইহারা শিখার্কনে তহ ও ধার্মিক।
এটা মন্দিরগমে সন্তপ্রাধিক গতি বাস করেন। ইহারা
হীনবান সত্যবানী। দেবতাপিগের বসুই দেববলিগের
মান্যপূজার তুল্য ব্যক্তি বাস করে।

নগরের দক্ষিণ পূর্বদিকে পরাতীতগে রাজা আনোক
মির্জিত ১০০ পত দুট উচ্চ একটা তৃণ আছে। এট
এই স্থানে বুদ্ধবোম পুত্রাকালে তিনবান প্রেরা করিয়া
ছিলেন। দিকটে পূর্ববর্তী তামি মন বুদ্ধের শ্রবণ ও
উপবেশনের চিত্র আছে। দিকটে সন্ত তৃণে বুদ্ধবোমের
চুল ত বন বসিত আছে।

পুণের দিকটহ মন্দিরগমে ২০০ শিখা বাস করেন।
এইস্থানে বসলিত বুদ্ধবোমের একটা স্ততি আছে;
ইহা দেখিতে স্মরণ—আধিত স্ততি বসিয়া বোম হয়।
প্রাধান ও ব্যাভাতালি কাক্তকর্ণাপোস্তিত। পুত্র-
কালে বুদ্ধবান এইস্থানে প্রবতিবানগের সন্ত
মহাবিভাপ শাস্ত্র প্রবরণ করিয়াছিলেন। এইস্থান
হইতে দক্ষিণ পূর্বে ১০০ লি দাইয়া আমরা আচাপ
পৌছি। (অন্যঃ)

মিলন ।

সোফিয়া মনে মনে জ্যাককেই ভালবাসিত, কিন্তু তবুও পিতৃবোৰ অহুৰোধে ঘতুল ধনেৰে অধিপতি ডাক্তাৰ ডনবাৰেৰ পত্নীৰে বহু হেঁচা আপত্তি কৰিলে না, তাহাৰ কাৰণ জৈবযামোহ ।

ডাক্তাৰ ডনবাৰ গোকটা কিছু নিৰ্জনতা-প্ৰিয়। বড় বড় ভোজ, নৃত্যগীত—এ সব তাঁহাৰ হেমন ভাল লাগিত না। তাই বিবাহৰ পৰাই স্ত্ৰীকে লইয়া তিনি সমুদ্ৰকূলে একটা নিৰ্জন পৰীভবনে বাস কৰিতেছিলেন। চাৰিদিনে গাছপালা ও নানা বৰ্ণেৰ ফলফুল শোভিত স্থানটি হাবিৰ মত দেখাইত।

এ বিবাহে পতিপত্নীৰ মধ্যে প্ৰথম প্ৰণয়েৰ তেমন উদ্ভাস উজ্জ্বল দেখা গাইত না; তথাপি তাহাৰ কেহ অংশীও ছিলেন না। শাস্ত্ৰপ্ৰিয় পত্নীৰ প্ৰকৃতি ডাক্তাৰ, পত্নীকে হাবী কৰিবাৰ জন্ত, বসনভূষণে অৰ্ঘ্যবাহ কৰিতে বা অতুল্যে দেহযন্ত্ৰেৰ কোন ক্ৰটি কৰিতেন না। পত্নীও আপনাৰ ইচ্ছানুযায়ী চলিতে পাইয়া সঘট পাৰিতেন। ভালবাসেৰ ক্ৰটি লইয়া কেনে লক্ষ হইতেই কেনে অভিযোগ ছিল না। ডাক্তাৰ অধিকাংশ সময়ই তাহাৰ লাইব্ৰেৰী ঘৰে পুথক পানিৰ যথো বেটিত থাকিতেন। সোফিয়া নিজেৰ ইচ্ছানুযায়ী কৰিয়া এখানে দেখানে বেড়াইয়া বেড়াইত। পত্নীৰ কোনো কাৰ্য্যে ডাক্তাৰ ডনবাৰেৰ বাৰণ ছিল না, শুধু একটা বিষয়ে তিনি পত্নীৰ উপৰ আপনাৰ আত্ম বজাৰ রাখিতে চাহিতেন। তিনি জ্যাকৰ সহিত সোফিয়াৰ লেখাপাৰাত্মক সম্পূৰ্ণ বিহোৰী

ছিলেন তিনি বাল্যতেন, জ্যাকৰ সহিত যখন সোফিয়াৰ এক সময় ভালবাসা ছিল—এমন কি বিবাহেৰ কথাবাৰ্তা পৰ্য্যন্ত চলিয়াছিল তখন তাহাৰ সহিত অধিক বেলামেশায় লোকে নিন্দা কৰিতে পারে। স্বামীৰ একপাৰ সোফিয়া যুখে কিছু বলিত না, কিন্তু অন্তরে বিরক্ত হইত। সে মনে মনে বলিত—‘স্বামীৰ মনে এ কি সন্দেহতা! লোকনিন্দাৰ কথা একটা ছল মাত। তাহাৰ নিজের মনের সন্দেহতা তিনি নোক-নিন্দাৰ নামে গোপন কৰিতে চাহেন—এ কি আমি বুজি না!’

সমুদ্ৰটোকতে অপব্যৱহাৰেৰ প্ৰিয় বায়ু লেগন কৰিতে কাৰ্য্যে সোফিয়া এতিদিন জ্যাকৰ কথাই ভাবিত। জ্যাক এখনও তাহাকে মনে রাখিরাছে কি? নিশ্চয়ই রাখিরাছে নহিলে সে আজিও অবিবাহিত কেন? সে না কি বলিরাছে এ জীবনে সে বিবাহ কৰিবে না। হায়! তাহাৰই জন্ত কি। তাহাৰ কেবলই মনে হইত তাহাৰ সন্নিবিষ্ট স্বামী যদি বাধা না দিত তাহা হইলে সে একদিন জ্যাককে নিমন্ত্ৰণ কৰিয়া আনাইয়া বাহাতে সে বিবাহ কৰে তাহাৰ জন্ত অহুৰোধ কৰিত; বলিত—তাহাৰেৰ বে ভালবাসা তাহা চিৰদিনই আটুট থাকিবে, বিবাহ না কৰিলে কি ভালবাসা থাকে না? কেন, যেন যেমন তাইকে ভালবাসে সে তেমন কৰিয়া জ্যাককে ভালবাসিবে! কেন সে তবে মিছামিছি নিজের জীবন নষ্ট কৰিতেছে! তাহাৰ জন্ত সে কেন কাঁদিয়া বেড়াইতেছে? সে এখন অপৰেৰ

বিবাহিত পত্নী তাঁহাকে তো পাঠবার আর কোনো সম্ভাবনা নাই। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইত এমনি পুণ্য সন্ধ্যায় এমনি নির্জন বেলাভূমে সে কতদিন জ্যাকের সহিত একত্র ভ্রমণ করিয়াছে। জ্যাকের স্বর কি মিষ্ট; কথ্য কহিবার ভঙ্গী কি সুন্দর! তাহার চাপি কি মধুর! ভাবিতে ভাবিতে হাজি হইয়া যায়। জলে নবজের ছায়া ছায়কথকের মত জলিতে থাকে। শীতল-শীতল বায়ু তাহার ললাটে শীতলতা আনয়ন করে। সে ঘরের দ্বারে গুহ করিয়া আসে। সেখানেও সে পাশি পায় না। একটা অপ্রশোচনা কেবলই তাহার হৃদয়ে বিধিতে থাকে। জ্যাককে সে প্রভাষিত করিয়াছে! অর্থের জন্ত, লজ্জার জন্ত সে তাহার স্বামী ভালাপালা পদদলিত করিয়াছে। সে অপরাধিনী। একবার সে জ্যাকের নিকট ক্ষমা চাহিয়া সমস্ত অপ্রশোচনা দূর করিয়া গইবে—কিন্তু স্বামী যে তাহাতে বাধা দেন। সে প্রেমিকার মত তাহার সঁহিত আশ্রয় করিতে চাহে না; সে ভগিনীর ঘেহে জ্যাকের হৃদয়ের সমস্ত মানি দূর করিয়া দিতে চাহে। কিন্তু স্বামী যে তাহা বুঝেন না। তবে সে কি করিবে?

একটা বিশেষ প্রয়োজনে ডাক্তারকে এক সপ্তাহের জন্ত সহরে খাটতে হইল। দাসদাসীদের বিশেষ সাপথানে থাকিতে বলিয়া পত্নীর নিকট ছাড়িতভাবে বিদায় লইয়া ডাক্তার সহরে চলিয়া গেলেন। গোন্ধি

বিবাহের পর এই প্রথম দেখিল যে সে স্বামীকে বড়টা ছীন মনে করে তাহা নহে! বিবাহের সময় তাহার নয়ন হইতে লতাই একটা বেদনার সজলতা উৎখলিয়া উঠিতেছে—গোন্ধের কাঁচরত্ন সর্বাঙ্গ হইতে প্রেমের একটা আভা সূঁটয়া উঠিতেছে। স্বামী চলিয়া গেলে গোন্ধিরাও একটু চকল হইয়া উঠিল। সে বাহাকে চিরদিন অবহেলা করিয়া আসিয়াছে তাহারই সাহিত একটা বন্ধন সমস্ত অবহেলার মধ্য হইতে কেমন করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়কে যুক্ত করিয়াছে সে তাহা বুঝিতে পারিল না! কিন্তু কেমন একটা অস্পষ্ট বেদনা তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া চকল করিতে লাগিল।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা সমুদ্র উপকূলে আনমনে বেড়াইতে বেড়াইতে যখন জ্যাকের কথা মনে পড়িল তখন গোন্ধিরা ভালাপালায় অশ্রুপাতিত হইয়া যোগে জ্যাককে ডাকিয়া পাঠাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে হয় না? ঘোষ কি? সেই দিনই গোন্ধিরা জ্যাককে নিমন্ত্রণ করিয়া একখান চিঠি পাঠাইল। সেবে একবার মাত্র জ্যাকের দর্শন প্রাপ্তিই দেখা জানা হইল, এবং ডাক্তারের গৃহে অশ্রুপাতিত কথাত লিখিতে জুলিল না। সে লিখিয়া দিল গৃহকর্তা কাণ্ডাক্তের সহরে গিয়াছেন সে জন্ত তাহার আদর বহুর যে জুটি হইবে তাহা মাফনা করিতে হইবে। স্বামীর অশ্রুপাতিত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে দেখিয়া পাছে জ্যাক কিছু মনে করে, তাই সে লিখিয়াছিল নিত্য একা থাকার দিন কাটান ভার; তাই সে তাহার ভ্রাতৃপদ মেহাংশদ জ্যাককে নিমন্ত্রণ করিতে সাধল করিতেছে।

৩

দূর বাগানে জ্যোৎস্নালোকে স্বর্ণব
বৌদের উপর বসিয়া অনেক দিনের পর
আজ আবার জ্যাক ও সোফিয়া গল্প করিতে
ছিল। সন্ধ্যার শীতল বায়ু সোফিয়ার জুকিত
বর্ণোচ্ছল কেশবাণি লইয়া খেলা করিতেছিল,
তাহার গোলাপী পরিচ্ছদের আঁর ভাগ লটকা
নাড়িতেছিল। অনেক দিনের পর জ্যাকের
সহিত দেখা হইয়ায় আনন্দে সোফিয়ার হৃদয়
সুখ অদিকতর হৃদয় দেখাইতেছিল। এট
ছন্দাসে তাহার কণ্ঠ পরিবর্তন হইয়াছে।
জ্যাক অনিমেঘনরূপে মুগ্ধনেত্রে সোফিয়ার উন্নত
হৃদয় দেখে, সুগোপন ব্যক্তিত্ব চাহিয়া চাহিয়া
দেখিতেছিল। সোফিয়া বন্ধু ভাবে জ্যাককে
নিবাহ করিতে বলিতেছিল, পৃথক মাথার কাজ-
কর্ম না করিলে শরীর মন দুইই নষ্ট হইয়া
যায়। জ্যাকের উচিত আপনার উত্তরির চেষ্টা
করা, জ্যাক যদি কিছু না মনে করে তাহা হইলে
সে তাহাকে ব্যস্ত করিবার জন্য হাল্কা
কয়েক টাকা বামের নিকট হইতে চাহিয়া দিতে
পারে। ছোট বোনের নিকট সাহায্য লইতে
দেখ কি? জ্যাক সোফিয়ার এই অবাচিত
কল্পগ্রহে তাহাকে ধন্যবাদ দিল, কিন্তু সেই
সঙ্গে জানাইল যে বিবাহ সে এমীবনে করিবে
না, পৃথক মন পাষণ্ডের মতই কঠিন তাহা
ভাড়িলে আর কোড়া লাগে না, দাগ পড়িলে
সে দাগ আর তোলা যায় না। জীবন তাহার
ভাব মাত্র, অস্বচ্ছতা মহাপাপ, নচেৎ সে
এতদিন সংসারের নিকট বিবাহ লইয়া সমাধির
শীতলশয্যা আর আপনার তপ্তদেহ জুড়াইতে
পারিত। হায় তাহাদের অতীত জীবন।
বাণ্যকাল সে কি হৃদয়ের দিনই গিয়াছে।

সেই সকাল হইতে লক্ষ্য পর্যন্ত দুইটীতে
একরে খেলা খেলা অপরূপ হাসিকান্না
মান অভিমান। হারপব ঘোবনের আবেগে
সে যখন প্রথম জানিল সোফিয়া তাহারই
তখন মগ্ন কি হৃদয় কি ইচ্ছাগুলি লটকা
তাহার চোখের সামনে দাঁড়াইয়াছিল। সেট
ইচ্ছাগুলির মধ্যে সেই প্রথম ঘোবনের আশার
আলোকে সে কি হৃদয় মগ্ন দেখিয়াছিল।
সে কি তখন জানিত ভালবাসার নৈরাশ্র
আছে, নারী হৃদয়ে প্রেমের প্রোভাতন
বিয়াক করে। সে কি জানিত দরিদ্রের ভাল-
বাসিবার অধিকার নাই। তাহা জানিলে,
কে জানে সে কি করিত? কিন্তু এখন?
সংসারে তাহার কেহই নাই, কিছুই নাই।
সে হতভাগা! নিতান্ত হতভাগা! এমন
করুণ কণ্ঠে এমন কাতরতার সহিত সে এই
সব কথা বলিতেছিল, সে অজান্তসারে
সোফিয়ার দুই চক্ষু বরিয়া অগভীর পড়িতে
লাগিল। সত্যই কি জ্যাক তাহাকে এমনি ভাল
বাসে? কই এতটুক সে জানিত না।
জানিলে সে কখনই ভাতারের পাত্রে আবদ্ধ
হইত না। হায়! কি বলিয়া সে এখন তাহাকে
সামান্য দিবে।

সোফিয়া মুগ্ধিত ছিল এসব আলোচনা
করা উচিত নয়—জ্যাককে এ সকল কথা
হইতে নিবৃত্ত করা, তাহাকে বাধ্য দেওয়াই
তাহার কর্তব্য, তাহার এখন বলা
উচিত—জ্যাক অতীত ভুলিবা যাও, আমি
বিবাহিতা পত্নী। এসব কথা আবার শুনিতে
নাই। এস মাথার পবিত্র বস্তুতাবে পরস্পরকে
ভালবাসিতে আরম্ভ কর। কিন্তু তাহার বন্ধ
কণ্ঠ হইতে বর বাহির হইল না।

কথা বলিতে বলিতে জ্যাক সোফিয়ার একখানি হাত অপনোদন হস্তের মধ্যে তুলিয়া লইল। সোফিয়ার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া একটা বিস্ত্রোহভাব তড়িতের মতো বহিয়া গেল। তাহার বাহা দিতে চেষ্টা চাইল কিন্তু পারিল না। তখন তাহার মনে হইল হার ! কেন সে জ্যাককে নিয়ন্ত্রণ করিয়া ছিল। তাৎকালিক অধিকন্তর অস্থির করা ভিন্ন ত আর কিছুই হইল না। সে যে তাহার প্রেমের বহিঃকটকন সংযোগ করিয়া দিল। সে ত এতটা আনিত না। সে আনিত জ্যাক তাহাকে ভাবনাতে বেটে কিন্তু তাহারই জন্ত সে জ্যাকের জীবন চিতদিনের মত খরচা চেষ্টা গেছে তাহাত সে আনিত না। নিজের প্রতি একটা স্থগার ও অসু-শোচনার সোফিয়ার জ্বরহটা আকুল হইয়া উঠিল। জ্যাক তাহার সে বিচলিতা বেশি কক্ষণ কঠোর বর আরো উচ্চ চড়াইয়া নিজের হৃৎকের কাহিনী বলিতে লাগিল।

এই সময় পরিচারিকা আসিয়া আহ্বানের স্বর দিল। সোফিয়ার চমক ভাঙ্গিল। তাই ত গম্ব কঠিতে কঠিতে সময় বৃষ্টিতে পারে নাই। সরেহে জ্যাকের কর মর্দন করিয়া সে আহ্বানের জন্ত তাহাকে অস্বরোধ জানাইয়া অব্যবস্থিতা চাইল। পরিচারিকা প্রদর্শিত গলে জ্যাক পরিচ্ছন্ন পরিবর্তনে। জন্ত গৃহস্থের প্রবেশ করিল। সোফিয়া বেনাপালের বারদেপে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুভ জ্যাকের লোকে মুক্তার গৃহমধ্যে কার্পেটের উপর গম্বানা গম্ব পড়িয়াছিল। অসাবধানে জ্যাকের গম্বট হইতে পড়িয়া থাকিবে—

হয়ত কোন দরকারী কাগজ—এই ভাবিয়া সোফিয়া চিঠিখানা উঠাইয়া লইয়া জ্যাকের লোকে মান পড়িবার চেষ্টা করিল। চিঠিখানা রমণীর হাতের লেখা। কৌতুহলের সচিত সোফিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে দেখা ছিল—

প্রিয়তম জ্যাক ! তোমার নীতাব্যাস্য্য শুনিয়া সুখী হইলাম। প্রাণনা করি তুমি ভর্য হও। তুমি গণিয়ার হাবী আপন আপন পড়িতে চাহিতেছে। সে গণিয়ারে তাহার বামী অসুপরিভ তাই তোমার দেখিতে চায়। হয় ত তুমি কুল বৃষ্টিভাট, তা জ্যাক সাক্ষাতে সে সব কথাই আলোচনা হইবে। এখন অস্বরোধ নুতন পাঠের পুস্তকের কথা তুলিও না, তাহার পেয়াল হই দিনেই হুয়াইবে। তোমার চিতদিনের

একাত্ত অসুপরিভ মোম
গমে একটা প্রসিদ্ধ নাট্যালাসার সিকানা ছিল। গম্ব পড়িয়া সোফিয়ার কর্ণমূল হইতে লগাট পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। ছিঃ ছিঃ কি স্থগা ! কাহাকে সে আদব করিয়া আলনার ঘরে ডাকিয়া লইয়া আসিয়াছে ? এই জ্যাক ! ইহারই হস্তে হস্ত রাখিয়া সে এই সাক্ষ তাহার নিকট ভালবাসার উপভাগ শুনিতে ছিল। অসুপরিভ প্রথম স্পর্শে যেমন সমস্ত দেহ স্থগার সসুচিত হইয়া উঠে জ্যাকের কর স্পর্শে তাহার নৈকেকে তেমন অসুচিত বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। চিঠিখানা স্থগার সহিত ফেলিয়া দিয়া পদদলিত করিয়া দূর পদক্ষেপে সে ভোকন গৃহে ফিরিয়া আসিল।

জ্যাক বসন ভোজনগারে ফিরা আসিল তখন সোফিয়া টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া নত

শিবে একখানা টাইমটেবল দেখিতেছিল। পর শব্দ শুনিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—তার পর ঘরের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া দৃঢ় অপ্রজ্ঞাভক্ত হইবে বলিল “মহাশয় গাড়ী ছাড়িবার আর বেশী সময় নাই অতঃপর বিদায়! সবার জিহবার এই শেষ গাড়ী আর এক মিনিটও আপনাতঃ অপেক্ষা করিবার সময় নাই।” কাকের বিশ্বাসের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত না হইতেই মোফিরা দৃঢ় পদক্ষেপে পদাঠেলিয়া অপর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বাহির হইতে কাকের সহস্র অস্থির শব্দ আর মোচনও সে দ্বার মুক্ত হইল না। পবিত্রকর আশিরা জানাইল গাড়ী প্রস্তুত তাঁহাব টেনে সাইবার সময় হইয়াছে। অগত্যা মনের কোভ মনে

রাখিয়া ডাক্তার সেই রাত্রেই অনাধারে গুপ্তে ক্রিষ্টে হইল। তাহারই সামান্য অসাবধানতাব ফলেই যে এটা ঘটিল ইহা বলন সে সুবিধ তখন আর হুগে রাখিবার তাহার স্থানে রহিল না। সেই একখানি চিঠি! নচেৎ সে ত ভীত হইতাই ছিল।

এবার সহর হইতে কিরিয়া ডাক্তার দেখিলেন এই করদিনের অদর্শনে তাঁহার জগদ্বীনা পত্নীর আশ্রয় পরিবর্তন ঘটয়াছে। মোফিরা গোপে আত্মবিক্রমের একটা উদ্দেশ্যে উদ্ভিষ্টা। তাঁহার চিরদিনের উৎপেক্ষিত স্বামীকে সে আশ্রয়দায়কতার সহিত নিবিড় বাহুবন্ধনে বেঁধে রাখিল।

শ্রীমুকুণ্ড দেবী।

সারনাথ ।

সারনাথের আত্মবিক্রম অপবা নিকটবর্তী কোন স্থানই সারনাথের ত্যার কোমলজনক নচে। অল্পদিন হইল যে পল্লী ও অল্পসংখ্যক কার্গি আবদ্ধ হইয়াছে তাহা দ্বারা এই বৌদ্ধ-ধর্মের কেন্দ্রস্থানের অতীত যুগের বহুতর তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে, এইরূপ অনেকই আশা করিতেছেন।

সারনাথ নামটী সম্ভবতঃ সারস্বত (অর্থাৎ সুগাধিপতি) নামের অপভ্রংশ। একটি প্রাচীন প্রবাদ হইতে জানিও পাওয়া যায় যে এখানেই এককালে সুগাধিপতি ছিল।

বৌদ্ধযুগের পূর্ণোৎসাহ সারনাথ পবিত্র

স্থানরূপে বিদ্যমান ছিল। তখন ইহার নাম ছিল ঈশিপত্তন (ঈশ=ঈশ্বর, সখ্যকীয়; পত্তন=নগর) ও কুশিপত্তন। অস্থান তথ্য, পূর্ণ নামটির সহিত মহাশিবের নামের কিতং সখ্যক আছে; কারণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাগবদীতে মহাশিবের পূজা হইয়া আসিতেছে।

“প্রাচীন”গুলির (বুদ্ধের জন্মস্থান সখ্যকীয় উপাখ্যান) মধ্যে একটির সহিত সারনাথ নামের উৎপত্তির বিশেষ সখ্যক দেখা যায় এবং এতদ্বারা যে এককালে সুগাধিপতি ছিল ইহাতে তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া

হাইতেছে। আখ্যানটি অতিশয় তথ্যপূর্ণ বলিয়া
 নিশ্চিত করিতে পারা হইল। কথিত আছে
 যে, বুদ্ধের দৌত্যকল্পে আবিস্কৃত হইবার
 পূর্বের বহুবার পুণিদেতে অবতীর্ণ করেন।
 তাঁহার এইরূপ একটি আশির্ভাবকালে তিনি
 সারনাথকল্পে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং
 বর্তমান সারনাথের নিকটবর্তী স্থানসমূহে
 মুগমুগ লইয়া ভ্রমণ করিতেন। বারাণসীর
 মুগমুগীয়া রাজা যথো যথো মুগমুগীকে
 নির্দয়ভাবে বধ করিয়া ফেলিতেন। এইরূপ
 আশীর্ভাব্য অতিশয় বর্ণিত হইয়া
 সারনাথ রাজার নিকট আবেদন করিলেন।
 রাজা বলিলেন আচ্ছা তিনি আর মুগ বধ করি-
 বেন না কিন্তু রাজার আহারের জন্ত তাঁহাকে
 আত্মা একটি করিয়া মুগ গ্রহণ করিতে হইবে।
 লঙ্ঘি-পত্র মত মুগগুলি সারনাথের নিকটই
 রহিল। একদিন একটি গর্ভগাত্রী হঠাৎকৈ
 পাঠাইবার পালা আসিল। হঠাৎকৈ তাহার
 জঠরস্থ শিশুটির প্রাণ ঠাটাইবার জন্ত অত্যন্ত
 কাতরভাবে নিজের প্রাণতিকা চাহিল।
 বুদ্ধের বহাদরিতে হঠাৎকৈ পরিবর্তে আত্ম-
 লম্পণ করিতে রাজার নিকট গমন করিলেন।
 রাজা বুদ্ধরূপী মুগের অনিচ্ছাকল্পে মুগ
 হইয়া তাহাকে বিজ্ঞাপ্য করিলেন যে কি জন্ত
 সে নিজেকে লম্পণ করিতে আসিয়াছে।
 বুদ্ধের তখন তাঁহাকে ঘটনাটি
 বুঝাইয়া দিলেন। রাজা বুদ্ধের এই মহৎ
 বশনে অতিশয় নিশ্চিত হইয়া বলিলেন,
 “আমি মনুষ্যদেহে মুগ আর তুমি মুগদেহে
 মনুষ্য।” তৎপর তিনি বুদ্ধকে জীবনদান
 করিলেন এবং তাঁহার মুগমুগীকে বুদ্ধ করিয়া
 নির্ভয়ে বিচরণ করিবার আশীর্বাদ দিলেন।

সারনাথ লব্ধে ভাষণ শতাব্দী পূর্বের
 জাতব্য বিবরণ চীনদেশীয় হুইলন-
 পরিব্রাজকের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে অবগত
 হওয়া যায়। তাঁহার বারাণসী ও সারনাথ
 ভ্রমণ করিয়া সে লব্ধে কিছু কিছু
 নিশ্চিত করিয়া গিয়াছেন। প্রথম ভ্রমণ-
 কারী ফাহিয়ান খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর
 প্রথমভাগে আগমন করেন। অপর হুয়েন-
 সাঙ ঈশাখ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরে
 আসিয়াছিলেন।

ফাহিয়ানের লিখিত বিবরণ অতি অসম্পূর্ণ,
 তাহাতে তাঁহার পরিদর্শনের বৃত্তান্ত অশেষ
 প্রাণের কবাই অধিক আলোচিত হইয়াছে।
 তিনি এখানটী মুগের আবাসস্থান ছিল বলিয়া
 উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা জ্ঞানেনের
 পুত্র বুদ্ধদেবের কঠোর তপস্কার গৌরবকীর্তনও
 করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণে পাঠ্যী ধর্মনিষ্ঠ
 ব্যক্তির বিষয় বিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহারই মধ্যে
 একজন বুদ্ধদেবের শিষ্য। ফাহিয়ান
 দুইটি প্রকাণ্ড একত্র বিহারেরও উল্লেখ
 করিয়াছেন।

হুয়েনসাঙের বিবরণ ইহা অপেক্ষা অনেক
 বিস্তৃত। তিনি বারাণসীর একটি সাধারণ
 বিহার দিয়া সারনাথ লব্ধে তদপেক্ষা
 বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার
 মতে বারাণসীর পরিধি তখন ৬৬৭ মাইল
 ছিল। এ আকার সম্ভবতঃ বারাণসীরাজ্যের
 হইবে। তিনি যে ৩০০টি বৌদ্ধবিহার ও
 ৩০০০ তিন সহস্র ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির উল্লেখ
 করিয়াছেন তাহা বারাণসী লব্ধেই প্রমাণ;
 কারণ অত্রস্থানে, সারনাথে ১৫০০ জন ধর্মাস্থা
 ছিলেন বলিয়া নিশ্চিত। তাঁহার বিবরণের

কোন অংশেই বৃক্ষবিষয়ক গ্রন্থাদ দেখিতে পাওয়া যায় না ।

অধুনা আবিষ্কৃত ধর্মসাবিশেষের সহিত চীনদেশের ভ্রমণকাহীর বিবরণের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করা অতি কঠিন ব্যাপার। তবে ভ্রমণকার্য্য আতও অগ্রসর হইলে তথ্যবাহিত হইত অনেক বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িত। একটি বিষয় অবধানযোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অট্টালিকার পর পর স্থাপত্যলি দেতপ ক্রমশঃ বাড়ির হইয়া পড়িতেছে তাহাতে কোন্‌টির কথা যে হঠেহুলাং বর্ণিতাছেন তাহা নির্ণয় করা বড়ই সমস্যার বিষয়। সমগ্র ধর্মসাবিশেষ তলি লগুনপ শতাব্দীর অট্টালিকার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। বুদ্ধদেব সম্ভবতঃ তাহার প্রচারণার্থঃ পূর্বে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অবস্থ করেন। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে এখানেটি ধারণ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধর্মসম্প্রাপ্ত হয়। এই অনুমানটি সত্য বর্ণিতা বোধ হয় না। কারণ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে তাহার পরবর্তী সময়ে বহু অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল। তবে তাহাবিশেষ সহিত মৌল্যধর্মের কোন সংঘর্ষ নাই। পৃষ্ঠান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে "চৌপতি" নামক উচ্চ মৃত্তিকাত্তরের উপর যে কুয় ইটক নির্মিত গুহাটি আছে, তাহা ভনায়নের তথ্যর আগমনের স্বত্তি প্রকাশ নিমিত্ত আকবর কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

বিগত একশত বৎসর হইতে সারনাথের স্থান নিরুপণ উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে বন্যযোগ্য অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অল্প কয়েক বৎসর মাত্র হইল ইহার উল্লেখ-

যোগ্য আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে। মিটার এক্স. ও. ওয়েটেল ১৯০৪ সালে ইহার খুঁটনা করিয়াছিলেন। এই স্থানের প্রথম ভ্রমণকার্য্য প্রকৃত-তথ্য-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানরূপে অস্বীকৃত হয় নাই।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে কানৌর মহারাজাও দেওয়ান বাবু জগৎসিং নগরের কোন একটা মন্দির নিজের অট্টালিকা নির্মাণ করাইতে ছিলেন। (পরে তাঁহারই নামে এই মন্দির নাম জগৎ গাঞ হইয়াছে) এই কার্য্যে সারনাথকে প্রকৃতপক্ষনিষ্ঠপে ব্যবহার করা হইয়াছিল। জগৎ সিং সারনাথের চতুর্দিকে বিকল্প ভ্রমণ-শেষ হইতে তাহার মালমগলা সঙ্গোহ করিয়া লইয়াছিলেন। মিঃ শেরিং (Shering) বলেন যে, জগৎসিং সারনাথ হইতে একটি সম্পূর্ণ জুপাই তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহারই ভিত্তি ভূমি পরে "জগৎ সিং জুপ" রূপে অভিহিত হয়। দেয়র ক্টিটে. (Nitoc) ও মিঃ টোমাস এই জুপ আবিষ্কার করেন। ইহার অন্তর্ভাগে একটা প্রস্তরের শিল্পক পাওয়া যায়। সেই শিল্পকের মধ্যে মুলাবান-সম্বন্ধিত একটা মন্দির প্রস্তরের আকার ছিল। সে আকারের বিষয় এখন কিছুই জানিবার উপায় নাই। প্রস্তরের শিল্পকটি পবে তথী হইতে কলিকাতার নীত হইয়া মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে। তাহা এখনও তথ্যর দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল পরে বুদ্ধমূর্তির কিয়দংশও জগৎগঞ্জে পাওয়া গিয়াছে। তাহার আবিষ্কারও সম্ভবতঃ একই স্থান হইতেই হইয়াছিল।

এই জুপের বিশেষ বিশদণ সেরূপ উল্লেখ যোগ্য নহে। ইহার সম্ভাভাগে যদি কিছু

ছিল এমন হত তাহা বহুদিন হইল অগম্য হইয়াছে। এক্ষণে ইষ্টকের বেইনীর উপর কতকগুলি বেইনী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সংগেই বুঝা যায় যে, একই স্থানে ক্রমাগত কতকগুলি কুপ নির্মিত হইয়াছিল। একটিকে অপরটির অন্তর্গত করিবার জন্য একটিকেই পূর্ণটি অলংকা বৃহত্তর করিতে হইয়াছিল।

সারনাথের কুপগুলিকে দেখিবার যোগ্য হয় যে এগুলি স্থিতি স্তম্ভ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সম্ভবতঃ বৃহত্তর জীবনের ঘটনাবলির সহিত জড়িত স্থানসমূহে মাংসাদি প্রদান উদ্দেশ্যেই ইহাদের নির্মাণ। অধিকাংশগুলি বৃহত্তর প্রতি ভক্তি প্রদশনার্থ তদীয় ভক্তগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। হর্ষহর্ষমাং গিনিয়াছেন, “তিনিউ উল্লেখযোগ্য কুপ নির্মিত হইয়াছে; একটি যে স্থানে বৃহৎ ধর্মক্ষেত্র গৃহীত হইলেন, আর একটি যে স্থানে বৃহত্তর প্রথম শিখোরা তাঁহার নিকট ধর্মপ্রদান করিয়াছিলেন, আর একটি বৃহৎ যেখানে পূর্জ্ঞগণে হস্তীক্ষেপে তাঁহার দত্ত একটা ব্যাঘকে দিয়াছিলেন।” হর্ষহর্ষমাং উপসংহারে গিনিয়াছেন যে “তথায় নত নত গিহার ও কুপ রহিয়াছে কিন্তু আমরা কেবল দুই তিনটিকে লক্ষ্য করিয়াছি; কারণ সকলগুলির বিবৃতিভাবে বর্ণনা করা অতি দ্রুত কার্য।”

১৮১৫ খৃঃ অব্দে কর্ণেল ম্যাকালি সর্ক প্রথম ধ্বংসাবশেষ স্থানের কিছু দূর গমন করাইয়াছিলেন। ১৮৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কোটা-রেল কানিংহাম অতি উৎসাহের সহিত এই কার্যে আগ্রহ করিয়া কতকগুলি প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কার করেন। সেগুলি এক্ষণে

কলিকাতার মিউজিয়ামে রক্ষিত। প্রাপ্ত বস্তুগুলির মধ্যে যেগুলির বিষয়ে তুল্যাক্ষপ বহু লওয়া হয় নাই, সেগুলি তথায় পতিত ছিল। কানিংহাম গিনিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বে প্রায় ৪০টা মূর্তি তথা হইতে নীত হইয়া বহুলা শেতুর খিলানের তলদেশে রক্ষা নিমিত্ত নদীতে নিক্ষেপ হইয়াছে।

দক্ষিণে অপর শেতুটী হইবার সম্ভবত সারনাথের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্তবশনি (quarry) রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। শেতুর ভিত্তি নির্মাণের অন্ত সারনাথ হইতে বহুল পরিমাণে প্রস্তরাদি আনীত হইয়াছিল।

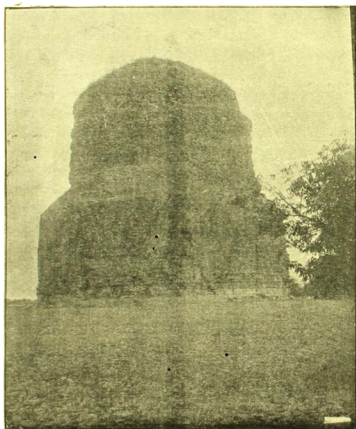
কানিংহামের পরবর্তী অধ্যয়নকারী মেজর ক্রিটো। তিনি সারনাথের গমন কার্য পুনরাব আশ্রয় করাইয়াছিলেন। মেজর ক্রিটো কেবলমাত্র প্রস্তরবর্ণিত ছিলেন না,—তিনি একজন বিখ্যাত শিল্পী ও স্থপতি ছিলেন। সেই সময়ে তিনি কুইল কলেজ নির্মাণ করাইতেছিলেন। তিনি নাকি সারনাথ হইতে আনীত অনেক প্রস্তর এই কার্যে ব্যবহার করেন সেই সমস্ত সমস্ত ব্যবহৃত হইবার পূর্বে নিশ্চয়ই একবার করিয়া পরীক্ষিত হইয়াছিল, কারণ অঙ্গমান আমরা করিতে পারি। কুইল কলেজের চতুর্দিকের ভূমিতে যে সকল খোদিত প্রস্তর পরিভ্রম্য অবস্থায় পড়িয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লতোর মিউজিয়ামে আর কতকগুলি পুনরায় সারনাথে নীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপতঃ ক্রিটো লাহেব তাঁহার অধ্যয়ন কার্যের বিবরণ প্রকাশ করিবার পুঙ্খই মুহূর্ত্তে পতিত হইয়াছেন।

ইহার পর টোমাস লাহেব ও হল লাহেব

অল্পকাল কার্যে অগ্রগত হইতে প্রয়াস
পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার উল্লেখ গোণা
কিছুই করতে পারেন নাই ।

১২০৫ সালে মিটার এক ও ওরটেল
(O. Oertel) এই আবিষ্কার ব্যাপারে

একটি সুখাবতার আনিচেন করিয়াছেন । ইহার
পর হইতে গবর্ণমেন্টের প্রত্যক্ষ বিভাগের
ডিরেক্টর মার্শাল সাহেব (Mr. J. H.
Mashell) বিশেষদৃষ্টির সহিত পুনন কার্য
পরিচালিত করিতেছেন এবং ডাক্তার



টেনকেমাত ও মিটার ডব্লিউ, এইচ, নিকোলস
এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন ।

নিম্নে সারনাথের বিশেষ প্রইয়া যন্ত্রগুলির
সংক্ষিপ্তবিসরণ প্রদত্ত হইল—

(১) 'থামেক তুপ' (Thamek Tower) — ইহাকে আবিষ্কার করিতে হয় নাট। এই উচ্চ তুপটি চিরদিনই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে! ইহার চতুর্দিকস্থ বানগমুহুর অশ্রুসঞ্চার বিষয়ে ইহার স্থিতিসংঘেত দৃষ্টান্ত কখনোই ছাড়াছিল।

জেনারেল কানিংহাম সাহেব এটি তুপ-টির পর্যবেক্ষণের জন্য বহু সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহার রিপোর্টের লক্ষ্যলক্ষ্য জ্ঞাপনা বিষয়ভাগ যি: সেরিক্তত কানিংহাম বিষয়ক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই তুপের মধ্যভাগে ইহার একটা তত্ত্বদত্ত ভূবিদ্যা গিয়াছে। ইহার মধ্যভাগের কঠিন প্রণালী অবগত হইবার জন্য কতকগুলি গমনাগমনের পর প্রাপ্ত করা হইয়াছিল।

তুপটী উচ্চতায় ১১০ ফুট। তলদেশ ইটকনির্মিত এবং ২৮ ফুট গভীর। ইহার একটি প্রদূর ভিত্তি আছে। বর্তমান তুপটী পূর্বে একটা তুপের ভগ্নাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার বাস নিম্নদেশে ২৩ ফুট এবং ক্রমশঃ উচ্চদেশে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িয়াছে। জু'ম হইতে ৪৩ ফুট পর্যন্ত নিরেট প্রস্তর নিমিত্ত। এই প্রস্তর খণ্ডগুলি লম্বায় পোহের দ্বারা বাতাবদ্ধ। এই স্থান হইতে ফুট উর্দ্ধদেশ পর্যন্ত বহির্ভাগে প্রস্তর এবং অন্তর্ভাগে ইটক দ্বারা গঠিত। উপরিবৃত্ত অংশগুলি সম্পূর্ণরূপে গিমেস্ট করা ইটকে প্রস্তুত হইয়াছে।

তুপের মধ্যভাগে দুই ফুট দীর্ঘ ও এক ফুট প্রস্থের উৎকীর্ণ লিপিস্থ এক

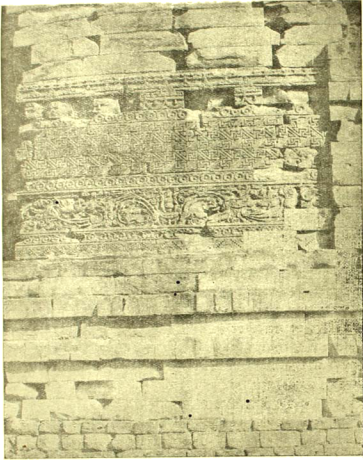
খানি প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত কথা গুলি লিপিত আছে।

"যে সমস্ত কাণ্ড, কাণ্ড হইতে উৎপন্ন, তাহাদের কারণ তৎপাত্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সেও যত্নসহকারে সেরিক্তত (কৌশল) নিকট কাণ্ড ও যুক্তি দিয়াছেন।

তুপের প্রস্তরনির্মিত অংশ অতি প্রাচীর কাণ্ডকাণ্ড দেখা যায়। কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন, ইহার নিম্নদেশে আটটি বহির্ভিত্ত অংশ আছে। ইহার প্রতিটি ১০ ফুট করিয়া প্রাপ্ত। এই প্রতিটি অংশে এক প্রস্তরভিত্তি ও ফুট উর্দ্ধে কুলকী আছে। ইহার প্রতিটি কুলকী একটা করিয়া তত্ত্বদত্ত ভিত্তি। কুলকীগুলি উচ্চতায় এক ফুট করিয়া এবং তাহাতে মূর্তির নিম্ন ভাগ বসান কাণ্ডকাণ্ড কতকগুলি ছিদ্র করা হইয়াছে। মূর্তিগুলি অনেকদিন হইল অক্ষত হইয়াছে। কিন্তু নিম্নদেশে একপ অক্ষত করা যায় যে প্রতিটি কুলকীতে একটা করিয়া বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কুলকীর আকার দেখিয়া মনে হয়, মূর্তিগুলি মনুষ্যমূর্তির প্রায় উচ্চ ছিল। এই কুলকী-গুলির ঠিক নিম্নভাগে ২ ফুট প্রাপ্ত অতি দৃঢ় কাণ্ডকাণ্ডের প্রস্তর প্রদর্শিত করিয়া এক একটি প্রস্তর আছে। প্রতিটি প্রস্তর ইহার ক্ষুদ্রাকারের ৩ ফুট প্রায় বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৃহত্তমটির কাণ্ডকাণ্ড কানিংহাম সাহেবের প্রায়; সর্ব নিম্নেবীর কাণ্ডকাণ্ড পুন্ডলতার আকৃতিবিশিষ্ট। কেবল একটি স্থানের কুলকীর সীমার ভৌগোল্যের আকৃতি

* এই থামেক নগর উৎপত্তি লইয়া অনেক দ্বন্দ্বভেদ আছে। ইহালা এনারাটিক সোদাইস্টের অর্থে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। লেখক।

কষ্টি, আর কতকগুলি স্থাপত্যিক মন্থনের
কাষ । মন্দির-মূর্তিগুলি পগের উপর উপবিষ্ট



এবং প্রত্যেকের হস্তে একটি করিয়া পদ্ম কারুকার্যগুলি ভারতীয় শিল্পবিজ্ঞানের
রহিয়াছে । সুস্বের এই কারুকার্যে উন্নত অবস্থা জ্ঞাপন করে । নক্সাটি অতি
বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় । উচ্চ ধরনের ; খোদাই কার্যগুলি অত্যন্তকষ্টে ।

আধুনিক সময়ের শিল্পের সহিত ইহার বিশেষ
সাদৃশ্য দেখা যায়।

(২)। প্রধান মঠ বা সত্যসাহা—

এই মঠটির সংসারণের ধামেক তুল্যের
পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ধামেকস্থান ১৮ ফুট
উচ্চ এবং ৯৯ × ৯৯ ফুট বিস্তৃত। ইহার
প্রাচীরের ঘনত্ব দেখা যায় অস্বাভাবিক হইয়া
একটি বিরাট উচ্চ গৃহকে রক্ষা করিবার
উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। গৃহটির কতক
আংশ ইষ্টকে আর কতক প্রস্তরে নির্মিত।
প্রস্তরগুলি পোথের অল্প কোন একটি
প্রাচীনতর মন্দির হইতে গৃহীত হইয়াছে।
অস্বাভাবিক হইয়া, এই গৃহটি খ্রীষ্ট ১১শ শতাব্দীতে
নির্মিত; কিন্তু একখানি উৎকর্ণ লিপি
হইতে অবগত হওয়া যাউতেছে যে ইহার
স্থাপন খৃঃ পূর্ব ২য় শতাব্দী। এই নির্মাণ-
লব্ধ বোধের অল্প একটি প্রাচীনতর মন্দিরের
হইবে। সেই মন্দির হইতেই, সম্ভবতঃ, ইহার
নাম মসলা গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই গৃহের মধ্যভাগে একটি প্রকোষ্ঠ
আছে; তাহার পূর্ণদ্বার উন্মুক্ত। ইহার
চারিদিকে আর তিনটি প্রকোষ্ঠ আছে।
ইহারই দক্ষিণপার্শ্বে একটি প্রকোষ্ঠে একটি
সমতলকোণ প্রস্তরবেষ্টনী একটি তুল্যের
নিষ্কলম্ব খোঁজা রাখা আছে। তাহার প্রত্যেক
দ্বার ৮ই ফুট দীর্ঘ এবং ৪ই ফুট উচ্চ।
এই বেষ্টনী সম্বন্ধে সন্দেহের কোন
করিবার বিষয় এই যে ইহা একটি অল্প
নিম্নে পাথর হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।
ইহার গঠন বসন্ত অতি সামান্য ধরণের,
তথাপি ইহার নির্মাণকৌশল অস্বাভাবিক হইয়া

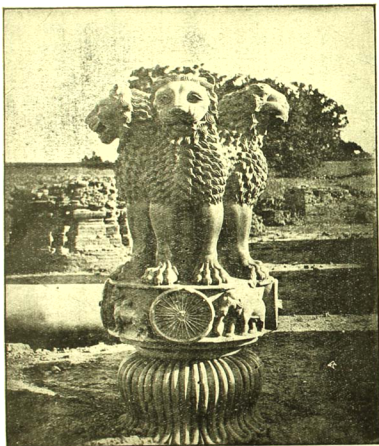
বলিয়া বোধ হয়। খোঁজা কাঁচা সম্পূর্ণ-
রূপে অস্বাভাবিক, পালিশও অতি উৎকৃষ্ট।
এই অলোকের সম্বন্ধে বলিয়া নির্ধারিত
হইয়াছে। এই প্রকোষ্ঠে একটি বসন্তাধার
বুদ্ধমূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

(৩)। অলোকস্তম্ভ—এই গৃহের নিকটেই
একটি ভগ্নস্তম্ভ অবিস্কৃত হইয়াছে। তথ্য-
শেষের মধ্যে এইটি সন্দেহের কোন
ইহার উপরিস্থিত একখানি লিপি হইতে
বিবর্তিত হইয়াছে যে, এটি একটি অলোক-
স্তম্ভ। এই লিপিরূপে একটি সত্যতা। ইহাতে
প্রমাণগতকৈ অসম্ভবপূর্ণ করিতে ও কল
হইতে সামান্য হইতে অল্প দেখা হইয়াছে।

চীনদেশের পরিভ্রমক চন্দ্রের মতে যে
স্তম্ভের কথা লিপিবদ্ধ, এটি সেই স্তম্ভ
কিন্তু এ সমস্ত বিষয় অবশ্যই হইয়া নহে।
তিনি বলেন, “একটি ৭০ ফুট উচ্চের
প্রস্তর-স্তম্ভ আছে। ইহার প্রস্তর পাগু
নামক (১) স্তম্ভের পাথরের তায় মস্তক এবং
দর্পণের দ্বারা উদ্ভূত। ইহার প্রস্তরভিত্তিতে
অবস্থান করেন, তাহার ইহাতে নানাবিধ
প্রতিমূর্তি খোঁজা পান। এই স্তম্ভ
প্রতিমূর্তি প্রস্তরের পাথরগুলোর উত্তর
বলিয়া বোধ হয়। এই স্থানেই তথ্যগত পূর্ণজ্ঞান
লাভ করিয়া ধর্মগুরু গুণাইয়াছিলেন।”
একটি সে স্তম্ভ এবং এ স্তম্ভের এক-নির্মাণ-
বিষয়ে একটি অস্বাভাবিক হইয়া উপস্থিত
হইতেছে। এ বিবর্তের শেষ মীমাংসা এ পর্যন্ত
সম্ভব হইয়া নাই। কারণ, অধুনঃ অবধি
স্তম্ভটির পূর্ণ উচ্চতা কতকটা অস্বাভাবিক।
তাহা ৪০ ফুট বলিয়াই অনুমান হইয়া

থাকে। চৈতনিক জয়গতাবী অস্ত্র হস্তাধারিত
সহিত ইহার স্থান নিখেল যেভাবে করিয়াছেন
একশ্রে ফেল্প বহাগ অতি কঠিন কার্য।

এই সকল হস্তাধারিত ক্রমিক পদে বেহু
যেহুপ বিপুলতা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে
এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এককপ অসম্ভব।



তবে হঠাৎ সঙ্কীর্ণতার বিবরণে এই অতি
শোভামণ্ডিত তত্ত্ব চূড়ার উল্লেখ যে করেন নাই

বা এবিষয়টি তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল
এরূপ মনে করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

স্বস্তেব যে অংশটি দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে, তাহার উচ্চতা ১৬ হইতে ১৭ ফুট। ইহার উপরে অংশটি ভগ্ন। তাহারি কতক অংশ ঘলিব ও অপর অংশের মধ্যে পতিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

(৪)। স্তম্ভ-চূড়ার এক একদিকে দুই করিয়া চারিটি সিংহের মস্তক রহিয়াছে। ইহার ঠিক নিম্নে একটি বেড়; তাহারে চারিটি ঢোল, চারিটি কুস্তকাব রত্ন, একটি সিংহ, একটি হস্তী, একটা ঘণ্টা, এবং একটি অশ্বশি অঙ্কিত আছে। এই চূড়াটি পরিণত ভাবগোচর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কাঙ্ক্ষার্থে ইহার লোকণ্য অতুলনীয়। ইহার নির্মাণ কোণল বেশিরা হির করা যায় যে, ইহার ভিত্তর যে সুগেব বা বেশের হটক না কেন, তাহাকে বিশেষরূপে সাধুবাদ না করিয়া উপায় নাই। স্তম্ভ ও চূড়ার যে পাশিগটি (৫) ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এত স্থলব যে গ্র্যানাইটের সহিত তাহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। স্তম্ভ ও চূড়ার মাজ হইতে প্রাচীন সংরক্ষণ প্রণালীরও প্রমাণ পাওয়া গাইতেছে। স্তম্ভটি যদিও ভগ্ন তথাপি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। সিংহের মস্তকগুলি ও স্তম্ভটি দেখিলে মনে হয়, যেন এইমাত্র শিল্পীর হস্ত হইতে আনীত হইয়াছে।

(৪)। গগনসিংহ স্তম্ভ—ইহার বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

(৫)। বিহার—ইহা

ভগ্ন

অট্টালিকা। ইহার কতক অংশ খনন করিয়া খসির করা হইয়াছে। খননকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। আকৃতি দেখিয়া অনুমান হয়, এখানে একটি বিস্তৃত অট্টালিকা বর্তমান ছিল। ইহার নিম্নতল ও উচ্চতল ইটক এবং প্রস্তর স্থাপত্যের একএকটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

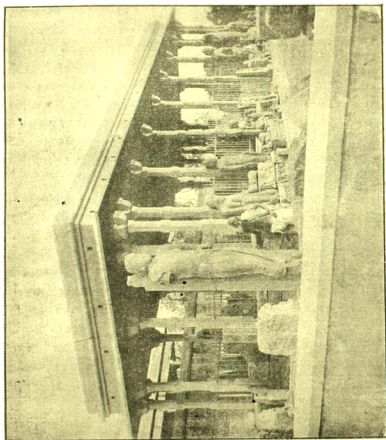
(৬)। চৌখতী—এটি দামেক-কূপ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম অনেকটা দূরে অবস্থিত। পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, ইহা আকস্মিক ভূকম্পে নির্মিত তাহার পিঠার অংশমন্দির। ইহার নিম্ন অংশ দেখিয়া মনে হয় যে এটি একটি স্থাপত্যই স্থান ছিল। যদিও অস্ত্রাঙ্গ গৃহগুলি হইতে ইহা কিঞ্চিদূরে অবস্থিত তথাপি যে এটি অস্ত্রাঙ্গগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন নহে সম্ভবত ইহার খননকার্য্য তাহাই প্রকাশ করিবে।

(৭)। মিউজিয়ম—এদ স্কেল প্রায় সংগৃহীত হইয়া এখানে রক্ষিত হইয়াছে তাহাও বৈ সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির করিবার চেষ্টা প্রণীত আরম্ভ হয় নাই। অশা করা যায়, যখন মিউজিয়মটি সম্পূর্ণ হইবে তখন কোন বিশেষজ্ঞের দ্বারা বস্তুগুলি যথাবৎভাবে সজ্জিত হইবে এবং তাহাদের বিবরণীসহ তালিকাও প্রস্তুত হইবে। ইহা তখন নূতন করিয়া ইতিহাসগঠনে সহায়তা করিবে সম্ভব নাই।

এখানকার একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি ও একটি বিরাট চিত্র বিভিন্ন ছবি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উত্তরটীর উৎকর্ণ-শিল্পি হইতে

* দুর্ভাগ্যবশত অকস্মাতঃ মৈত্রেয় মহাপণ্ডিতের মৃত্যু ঘটিয়াছে যে, পাশিগটি একটি ক্রিয় অবস্থায় আছে। ইহার ভগ্নত প্রণালী পূর্বে অঙ্গিত ছিল। অস্ত্রাঙ্গাঙ্গও তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।—লেখক।

জানি দায় যে, এ দুইটা কনিষ্কের সময়ে একখানি প্রস্তরের আটটি ফলকে অঙ্কিত
অর্থঃ ৩: ১৫ লক্ষাধীঃ নির্দিষ্ট হয় । বুদ্ধদেবের নানা লীলা অতীব চিত্তাকর্ষক ।



মহাশয়ের মূর্তিগণ ।

মহাশয়ের একটি প্রকাণ্ড মূর্তিও বর্শনের ইহাতে অঙ্কিত মূর্তিগুলি শিল্পের উন্নত অবস্থার
যোগ্য । আর একখানি দীর্ঘ প্রস্তর (পস্তরতঃ) সাক্ষাৎ প্রদান করিতেছে ।
স্বারসে (ছিল) বিশেষভাবে প্রতীক্য ।

ঐত্বদ্ব্যবসায় তত্ত্বাচার্য্য ।

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি ।

(পূর্বাঙ্গসূচি)

খ ।—মহাকাব্য

ঐক্য কোন্ সময়ে মহাকাব্যত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বদিও বলা যায় না, তবে ইহা নিশ্চিত যে উহা পুৰাণকালেব রচনা। যুগ যুগদগুণ কর্তৃক রাজাদের নিকট যাহা গীত হইত, অথবা ভাটগণ কর্তৃক বাহা নগরে নগরে কীৰ্ত্তিত হইত, ইতিহাস নামক সেই সকল প্রাচীনকাহিনী—এই প্রকাণ্ড ঐক্যগিক বিখ্যাতদের সংকলনকর্তারা, পাণ্ডবদিগের ইতিহাসের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

জনসাধারণের নিকট ভাবপ্রদায়ককারে কাব্যসাধার আনুভূতি ও ব্যাখ্যা করা ভারতে পূৰ্ণাঙ্গপন চলিয়া আসিতেছে। সমস্ত পণ্ডাগীতে বাণ ভাঁহার প্রসিদ্ধ একটি আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন, মহাকাব্যতপাঠে শুনিবার মত রাষ্ট্র বিলাসনী আগ্রহাবিতা হইয়া মহাভারতের মন্দিরে ভ্রমণবে চলিয়াছেন। (১) কেম্ব্রিজ (২) ভাঁহার সমসাময়িক লোকদিগের উল্লেখ করিয়া এইরূপ দোষ দিয়াছেন, ভাটরা অরাদিত হইয়া উপবেশ শুনিতে যাহ, কিন্তু সেই সকল উপবেশ কাৰে পরিণত করিতে বিলম্ব কবে। “ভট্টদিগের শিকার মত এখনও মন্দিরে রামায়ণ মহাভারত পঠিত হইয়া থাকে। পরোজ্ঞায়ে লোকেরা কথকঠাকুরকে যিহিয়া বনে, এবং যখন মহাকাব্যের নাটকেরা বনবাসে

গমন করে, তখন শ্রোতৃপূর্ণের ক্রন্দন ও হাঙ্গামার আরট পাঠের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু যখন তাহারা প্রাতঃগমন করিয়া আবার দিঃসন্মানে অধিষ্ঠিত হয়, তখন প্রামের গৃহগুলি দীপমালায় ও পুষ্পমালায় বিভূষিত হয়।” (৩) যাহারা রামায়ণ মহাভারতের ব্যাখ্যা করে তাহারা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত;—“পাঠক” ও “মারক”। পাঠক, মূলতঃ লোকগুলি আনুভূতি করে; পবে মারক অল্পশিক্ষিত ইতঃ-সাধারণের বোধনোকর্ষার্থে সেই সকল লোক লোকভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। পাঠক ও মারক উভয়ই প্রামাণ্য। যে গৃহস্থ এইরূপ কথকতায় হুলে লোক নিবহণ কবে, বৃত্তদিন না কথকতা সমাপ্ত হয় ততদিন সে কথকদিগকে নিযুক্ত রাবিয়া তাহাদের সমস্ত ব্যবচাব বহন করে। সমস্ত মহাভারতের কথা শেষ হইতে তিন মাস—কখন-কখন ছয় মাস লাগে। কথকতা শেষ হইলে কথকেরা পারম্পরিককরণ প্রভূত অর্থ লাভ করে।

বিমিশ্র শ্রোতৃদগণের সমুখে কথকেরা মহাকাব্যের গানে কবে। উচারা হুল্ললিত অরভাগীসকলে পাঠ আরম্ভ করে। পাঠের মধ্যে মধ্যে নৃত্য ও বাজ হইয়া থাকে।

(১) কাম্বয়ী।

(২) চারভাষাশতক—আবার বৃহৎ কথামন্তরীর আলোচনার উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৩) Max Muller ; India, what can it teach us. (P. ৪১.)

পুঁইপুলাখে বিরচিত সাক্ষির একটি উৎকীর্ণ-
চিত্রে কথকতা-বৈশিষ্ট্যের একটি চিত্র আছে।
কথকেরা কতকগুলি বাস্তবের ছাড়া কল্পিত,
বিবিধ কল্পিতকথার পা ফেলিয়া নৃত্য
করিতেছে। এইরূপ মহাকাব্যগঠি কতকটা
নাট্যাভিনয়ের কাঙ্ক্ষাকাঙ্ক্ষি বার। প্রবেশপ্রবেশ
বার দিগা কবিতা প্রোতার কল্পনাকে
উত্তেজিত করে এবং নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গী
দর্শনশ্রদ্ধকে পরিতৃপ্ত করে। সমস্ত মিলিয়া
দর্শকের মনে কাব্যের দ্বিধাটি দৃঢ়রূপে
মুদ্রিত করিয়া দেয়। দর্শকের আবেগ
উজ্জ্বলই তাহার সাক্ষী। তাহার মনে হয়
যেন কাব্যোক্ত নারকদিগকে সে প্রত্যক্ষ
দর্শন করিতেছে, তাহাদের কথা স্বকর্ণে
শ্রবণ করিতেছে। ভারতীয় মহাকাব্যের
বর্ণনা-পদ্ধতিও কতকটা এই বিব্রম উৎপাদনে
সহায়তা করে। হেম্বর ও তাহার অঙ্কুরা-
গণ যেকুল ভ্রমোবল্লভ মোকের দ্বারা পাত্তদিয়ে
কথাবার্তা প্রবর্তিত করেন, মহাভারতের
পদ্ধতি সেজন্য নহে। কথাবার্তা প্রবর্তিত
করিবার সময় মহাভারতে কবিতার
ছন্দ পরিত্যক্ত হয়। যথা, “মুখিগির
বলিলেন.....”, “বরষা হইল বলিলেন.....”
এইরূপ ছন্দান্তর করিয়া, কবিতার বর্ণনা
হইতে পৃথক রাখিয়া, পাত্তগণের প্রবেশের
প্রতি লোকের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ
করা হয়।

এই কথোপকথনের পাঠ্যরূপকে অতি
সহজেই নাট্যকারে পরিণত করা যাইতে
পারে। বেশি কিছু করিতে হয় না,—দুইজন
কথক একত্র হইয়া দুইটি ভূমিকা আপনাদের

মধ্যে বিভাগ করিয়া লইলেই নাট্য হইয়া
গাড়ায়। রামায়ণের আদিকণ্ঠে ও উত্তরা-
কণ্ঠে ত্রিক এইরূপ প্রকারের একটা পরিচয়
ঘটিরাছে দেখিতে পাওয়া যায়। নারদের
উপদেশ অনুসারে বাক্যিক একটি কাব্য রচনা
করিলেন—যাহার নামক রাম। তিনি
তাঁহার দুই শিষ্য কুল ও লবকে ইহার আনুষ্ঠি
করিতে দেখাইলেন; কুল ও লব এই অভিনয়
কাব্য মধ্যে নগরে গান করিয়া বেড়াইতে
লাগিল। রাম যখন অরণ্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিতেছিলেন, সেই সময়ে লব কুল অযোধ্যায়
প্রবেশ করিল। তাহাদের গানে জনতা
আকৃষ্ট হইল। রাজা উহা শুনিবার জন্য
ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার সমক্ষে সমস্ত
রামায়ণের আনুষ্ঠি হইল। আনুষ্ঠি শেষ
হইলে পর, তখন রাম জানিতে পারিলেন,
নির্জামিতা সীতার গর্ভগ্রহৃত তাঁহার পুত্রস্বপ্ন
এইরূপ সূত্রমাধ্যমে যেন উপস্থিত হইয়াছে।

নাট্যস্থিতির পক্ষে মহাকাব্যের কি অপূর্ণ
প্রভাব তাহা কবি ভবভূতি তাঁহার “উত্তর-
চরিত্রে” দেখাইয়াছেন। জনক বাক্যিক
আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাঁহার পৌত্র
বালক লবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।
তিনি তাহার লক্ষ্যবস্তুর কিছুই জানিতেন না।
তিনি একপ্রকার অনিচ্ছানীয়ে সহ্যহৃত্যুত্ব
ঐ বালকের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি
রামের ইতিহাস সব্বন্ধে তাহাকে শ্রবণ
করিলেন।

জনক।—“আজ্ঞা জিজ্ঞাসা করি বল
নেমি, সেই মরণের পুরগণের মধ্যে কার
কি সন্তান হইবে? তাদের নামই বা
কি,—আমি কোন্‌ স্ত্রীর কোন্‌ সন্তান?

লব।—কৈ, এ কথা ত আমরা শুনিমি,
কিংবা অস্ত্র কেহই ত পোনে মি ।

অনক।—তবি মে কথা কি লেখেন মি ?

লব।। লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রকাশ
করেন নি । তারই একটি স্থান তিনি নাট-
কাকারে রচনা করেছেন । আর সেটি পুণ
মধুর হয়েছে বলে, অতিনয় করবার মত সেই
বক্তৃতিপাখানি ভৌবীজ্যব-সুজকর ভরত-
মুনির হাতে দিয়েছেন !

অনক।। তাঁকে দিয়েছেন কি আত-
প্রাণে ?

লব।। তিনি সেই খানি অপ্সরাদেবীর দ্বারা
অতিনয় বরাবনে বলেন* । (৩)

নাট্যের উৎপত্তির সহিত মহাকাব্যের যে
সম্বন্ধ তাহার সম্পর্ক নিম্নরূপ নাট্যকলার দশ-
কোণে সংরক্ষিত হইয়াছে । নটের যে দুই
নাম্যত্র "ভারত" ও "কুশীলপ", তাহা রাম ও
পাণ্ডবদ্বিগের কীর্তিকলাপের সাধক স্তম্ভমাগধ-
দিগের সাফল্য উত্তরাধিকারসূত্রে চলিয়া
আসিয়াছে ।

যে ভারত নাম নটের প্রতি প্রযুক্ত হয়,
তাহা নাট্যকলার কল্পিত সুরকার ভরত
হইতে উৎপন্ন, সাধারণতঃ এইরূপ বাখ্যা
করা হইয়া থাকে । এইরূপ ব্যুৎপত্তি অশ্রুত
ব্যাকরণ-নিয়মের অস্বত্বাধী ; কিন্তু অস্ত্রান্ত
সম্প্রদায় ব্যাপ্যার মধ্যে এই ব্যাখ্যাটিই কেন
গৃহীত হইল তাহার বৈধতা দেখাইতে হইলে,
ঐতিহাসিক পারম্পর্যের সহিত এই ব্যাখ্যাটির
সামঞ্জস্য আছে কি না তাহা দেখাইতে

পারিলে ভাল হয় । ব্যাক্ত ভরতমুনি কি
ভারতমণ্ডলীর অগ্রদূত ?

এই নামটি বৈদিক কালের কৃত্যটিকা-
তিমিরে আবৃত ; সিদ্ধির শাখা-মদীসমূহের
তটভূমে যে সময়ে বিচলী আর্গাগণ শিবির
স্থাপন করে, তখনই আর্গাগণের এক শাখা
ভারতনামক বোদ্ধাভি প্রভুত গৌরব অর্জন
করিয়াছিল । ভরত-অর্থাৎ নামে তাহাদের
নিজস্ব অর্থ ছিল । অমৃতভোগভিতির মধ্যে,
বিশেষরূপে এই অগ্নির অস্ত্র হওয়াও প্রাপ্য
ছিল । প্রাচীন বীর-যুগের একজন রাজা,
পুরুকলা ও দুয়ন্তের পুত্র,—ঔহারও নাম
ভরত । আরও অনেক রাজা পৌরাণিক
উপাখ্যানে এই নামে পরিচিত । ভরত মুনি
অত প্রাচীনকালের দাবী করিতে পারেন না ।
সংস্কৃতমূলক পুনরুৎপাদনের পূর্ববর্তী দার্হিত্যে
ঔহার উল্লেখ দেখা যায় না । এই পুনরু-
ৎপাদনের সময় হইতেই তিনি দার্হিত্যের
পূর্ব, তৎকাল আলঙ্কারিকদিগের আশ্রয় অধি-
নেতা । কিন্তু ঔহার এই ব্যাক্তিগত-
পঞ্জি সবেও তিনি ধরাবর অস্পষ্ট অনিচ্ছাই
আকারেই অবস্থিত করিতেছেন । যে ভারত
পৌরাণিক আখ্যানে রচনার মুক্তহস্ত সেই
ভারত ইহার কোন ইতিহাস দেন না ।
একটি মাত্র বচনে তিনি কন্দর্পের দ্বোষ্টপুত্র
বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । (৪) স্বর্গীয় নাট্যা-
ভিনয়ের পরিচালনাই ঔহার একমাত্র
কার্য । অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ ঔহার শিষ্য ।
নাট্যাভিনয়ের ব্যাখ্যাত্তরায় ঔহারই অঃ

(৩) উত্তরচরিত, চতুর্থ অধ্যায় ।

(৪) বালমায়্য, তৃতীয় অধ্যায় ।

শাশে উজ্জ্বল স্বর্ণ হইতে বিদূরিত হয় । (৬) তিনি উদার নিষ্কিন্ত কাব্যের আসন্ন কালে, কোন আশ্রয় তখনকার নিম্ন প্রাচীর ও নিম্নমণ্ডলকে শিখা দেন । (৭)

এইরূপ ব্যক্তিই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।
যাকার করা অসম্ভব । Lassen (লাসেন) এই নামের উপর একটি ক্লপক-অর্থ আরোপ করিয়াছেন । তিনি বলেন, “স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে লসেনের ঐক্য অর্থ, কেননা স্বতঃস্ফূর্ত হইতে এই সকল ক্রিয়া স্ফূর্তিতে “ভরণ” করিয়া অর্থ্যৎ ধারণ করিয়া নগরে নগরে গাহিয়া বেড়ায় ।” (৮) লাসেনের এই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হইতে পারে না ; যাকার এইরূপ লক্ষণের প্রতিকূল । তা ছাড়া, “ভরণকর্তা” এই শব্দটির অর্থ যেকোন অংশে, তাহাতে ঐ অর্থে আরও অনেক ব্যাখ্যার বুঝাইতে পারে । সাধারণ নট অর্থে ভরণ শব্দের ব্যাখ্যা না করিয়া উহা মুনি-বিশেষের নাম এইরূপ মনে করাই আমার পোষ হয় সঙ্গত ।

ভারতের প্রকৃত অর্থ—ভরত-প্রসূত কোন এক শাখাকান্ডসম্বন্ধীয়,—ভরতগণসম্বন্ধীয় । বিশেষণ-গণটি ক্রাবলিঙ্গে বিশেষ্যস্বপ্নে পরিণত হইয়া, ভরতগণের ইতিবাচক মহাভারত,—এইরূপ অর্থ দাঁড়াইয়াছে । এখন কি, বর্তমান কালেও প্রধান প্রণয় এক দল মগব (চলিত ভাষার ভাট) এই ভারত-নামে পরিচিত । ভারতেরা মহাভারত, রামায়ণ এবং অস্ত্রাঙ্গ মহাকাব্য আত্মিক করিয়া থাকে । উৎসবে ও বজাদির অঙ্গ-

ঠানকালে উদগার পূর্ণমুখ্যবিগের কীর্তি ঘোষণা করে । উদগার অনেকের বংশাবলী জানে, এবং বড়-বরের উদগার ক্রমবর্ধমান রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া থাকে । উদগারের অসীম প্রতিপত্তি । বক্তৃতা-লোকেরাও উদগারের গারে হাত উঠাইতে সাহস করে না । সার্থ বাহিগের মতো যদি একজন ভাট থাকে, তাহা হইলে উদগারের আর দ্বন্দ্বের ভয় থাকে না, উদগার আপনাদিগকে অরক্ষিত বলিয়া বিবেচনা করে । যে সকল ভারত, কালিদাসের বহুপুর্বে চন্দ্রবংশের বংশোদ্ভূত, বর্তমান ভাটেরা সেই পুরাতন ভারতদিগেরই উত্তরাধিকারী । মহাকাব্যের আত্মিক যখন ক্রমে নাট্যে পরিণত হইল, তখন এই ভারত নামেরও অর্থান্তর উপস্থিত হইল । যখন মহাকাব্য হইতে নিঃসৃত হইয়া নাট্যকলা পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল, তখন ভারত নাম ভাটকে ভাগ করিয়া নটকে আশ্রয় করিল । মহাভারতের আত্মিককারী ভারত নামক এই লক্ষণালী ব্যবসায়ীমণ্ডলী আপনাদের একজন করিত আদিক্রম স্বষ্টি করিয়া, ভারতদিগের পিতৃপুরুষ ভারত এই অর্থে তাঁহাকে ভারত নামে অভিহিত করিল । এইরূপ ভ্রান্ত্যেবোও ভারতী শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতে গিয়া প্রাণের স্মৃতিবশত ভারত নামক দেবতার স্বষ্টি করিয়াছেন । ভারতদিগের ব্যাধি ভারতী এই সাধাদিগা আকরিক অর্থটি এখন আর উদগার গ্রহণ করেন না । (৯)

(৬) বিজয়োপনিষদের অর্থের লক্ষণ ও তৃতীয়াঙ্কের অবস্থানে ।

(৭) গালব, পেমব । বিজয়োপনিষদ—তৃতীয় অধ্যায় ।

(৮) ভগবদ্গীতা Schlegel Lassen সম্পাদিত—দ্বিতীয়—ভারত ।

(৯) ঐতরীয় ব্রাহ্মণ ২, ২, ৬, ৬ ।

কুনৌলব এই লম্বটি মহাকাব্যের আর এক মুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই বুথানন্দ কুনৌলব, রামায়ণের অনেক স্থলেই রাম ও সীতার বদন পুত্রবধ কুন ও লবকে নির্দেশ করিয়াছে। এই বুথানন্দের গঠনে, কুন-লবের অন্ত্য-অ-এ পরিবর্তিত হওয়া অশুভ প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধ। কিন্তু তখন এই ব্যাকরণগত ব্যতিক্রমে নামটির পরম্পরাগত ব্যাপার অস্বীকার্য হইতে পারে না। পেন্টি-শিটার্গার্নের অস্তিত্বের ধারণা মত অনুসৃত হইয়াছে সেই ওয়েবার সাহেবও এই লম্বটিকে দুই উপাদানে বিভক্ত করিয়াছেন :—প্রথম “কু”; দ্বিতীয়, নীল; উহা হইতে নীলম এই বিশেষণ পদটি উৎপন্ন। নীলের অর্থ, রোক্তনীতি। এই অর্থে মটদিগকে কুনৌলব বলিলে, নটেবা নিশ্চয়ই এত নামে

প্রাচ্য বোধ করিবেন না। ওয়েবার সাহেব “নৈলুবা” ও “নৈলানিন্দ” এই দুই পর্যায় লব্ধের সহিত প্রাপ্ত লব্ধের নৈকট্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বুথানন্দ “কুনৌলবো” এই গঠনটি অপেক্ষা “নীলবের” গঠনপদ্ধতি আরও অপূর্ণ। নীল-লব্ধে যে ব-প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে, এই প্রত্যয়ের প্রবেশও ত আশ্চর্য্যকোণে ঘটিয়াছে না; এবং নৈলানিন্দেরও উহার উল্লেখ করেন নাই। ওয়েবার সাহেব তাঁহার প্রাপ্ত নিকটের অনুরূপে যে দুইটি পর্যায়লব্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা উ-টা তাঁহার প্রতিপাদিত নিকটের প্রতিফলিত হইয়াছে; “নৈলন” এই লব্ধের লব্ধি মূল-রূপ “নীল” (রোক্তনীতি) কখনই নহে, পরন্তু উহার মূল-রূপ—“নিগ” (প্রেরণ)।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রাচ্য।

ঠগী-কাহিনীর একটি চিত্র।

পুত্র ঠগের কপাই আমরা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু মেয়ে ঠগের কথা আর শুনি নাই, তবে একটি ঘটনার কথা শুনিয়াছি, আজ এই প্রবন্ধে সেই ঘটনাটাই বিবৃত করিব।

আনিগড়ে ধনশ্রীলাল নামে একজন ধনবান হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অধিকাংশ পুত্র উন্নত, তিন মহল বাড়ি, লোকজন কর্মচারী দাদ-দাদী বিস্তার; মান-লব্ধ ও ঘন-প্রসূরও অসংখ্য। এই অতুল ঐশ্বর্য্য, এই প্রশস্ত আশা, ইহার ভাবী উত্তরাধিকারী ধনশ্রীর একমাত্র কজা।

ধনশ্রীর আর কোনো সন্তান হয় নাই। তাঁহার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় বিবাহ করেন, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে একমাত্র কজা লক্ষ্মীবাই এম জন্ম। লক্ষ্মীবাই ধনশ্রীর অশ্রুত যত্ন, তৃষ্ণার তল; পরিণয়-পাশের একমাত্র হৃদয় ফল, মরুভূমি মধ্যে সুবাসিত হৃদয়ল বারিপূর্ণ সর্বোত্তম সর্বদাই শোভমান। তাহার আকর্ষণীয়ত বিকশিত নলিনী-দলের স্তায় কল্যাণতাবা-বিশিষ্ট উজ্জল চন্দ্র, পরন্তু শোভাময় পূর্ণচন্দ্রের মতো কমনীয় সুখ, আশু-লবিত কেন্দ্রপাশ, চন্দ্রক-বিনিমিত বর্ণ,—আর

কেজিল-নিম্নমিত্ত স্বঃ। লক্ষীবাঈ অত্যন্ত
দয়াবতী। দৰিৱেৰ মলিনৰূপ—শীড়িতৰ
কাতৰুৱনি তাৰোৰ নিকট অসহ, কাৰণে
আনিত অত্যন্ত পূৰণ কৰা তাৰাৰ জীবনেৰ
এই ছিল।

ধনশ্ৰী মহাপদাৰোহেৰ লক্ষীৰ বিবাহ
দিলেন। সকলে বলিতে লাগিল, আলিগড়ে
এই ঐক্যমতৰ বিবাহ কেত কৰনো দেখে
নাই। পায়টিও পাত্ৰীৰ অতুলন—অপে শুনে
এবং শ্ৰীৰূপা দৰ নিকট লহান। ধনশ্ৰী
উৎসুক পাতে কস্তাখান কৰিয়া নিশ্চিত ও
আনন্দিত হইলেন। পাত্ৰেৰ বাড়ি মপুৰাৰ।
কোনো একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা
বিবাহেৰ পৰা প্ৰেৰাজা ধনশ্ৰী কস্তাকে
মন্তব্যগতি পাঠাইতে পাতেন নাই। বিবাহেৰ
দুইমাহ পৰে কস্তা পাঠানো হইল।

একমাত্ৰ কস্তাকে প্ৰথম মন্তব্যপৰে
পাঠাইতে হইলে, স্ততৰা ধনশ্ৰী তত্ত্বমুখ
কস্তাৰোৰ কিছুমাত্ৰ বাৰ্তা মাখিলেন না।
একখানি খুৰ তাণো 'বৰেল গাড়ি', তাৰাৰ
মধ্যে স্তম্ভৰ চকোমণ থকা। গাড়িৰ মোক
ড্ৰট প্ৰকাণ্ডৰ ও সমধিক বসি। সঙ্গে
দলজন বৰকম্বাৰ ও চাৰিজন মেহেৰা (দাসী)
চলিল। এবাৰ আৰ ৮ জন স্ততপুট বেহাৰা
কিংবাণেৰ বস্ত্ৰাচ্ছাদিত একখানি পানী লটকা
উপস্থিত হইল। লক্ষীবাঈ পানীতেই বাইবেন,
তবে বাইতে বাইতে ক্ৰান্তি বা বিৰাজি বোধ
হইলে তখন 'বৰেল' গাড়িতে চড়িবেন।
কাৰণ পথ অতি দীৰ্ঘ, আলিগড় হইতে
মপুৰাৰ ষাটটিয়া বাইতে দুই দিন লাগে।

ধনশ্ৰী বহুদূৰা তত্ত্বালকাৰে কস্তাকে
সাক্ষাতি দিলেন। আৰ একখানি পৃথক

গাড়িতে তিনিব-পত্ৰ বোকাই কৰা হইল।
প্ৰেৰণিত আশিৰা শুভলয় বিৱ কৰিয়া দিলে
সকলে বাত্ৰা কৰিল। ধনশ্ৰী ও তাঁৰাৰ
বাড়িৰ সকলোই কীৰ্তিতে লাগিলেন।

দিনেৰ আগে নিবিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাৰ
তাৰনী-কাৰা অৱে অৱে সমস্ত প্ৰান্তিকে
চাকিয়া কেলিগাছে। এখন সময়ে গাড়ি
আগিয়া এক নিৰ্জন বনেৰ ধাৰে থামিল।
সেই ৰাত্ৰাৰ দুই বিকেই গহন বন, তবে
সঙ্গে অনেক মোকৰন ও অস্ত্ৰপত্ৰ থাকি
কেহ ভীত হইল না। তথাৰ কিংকণ
বিভাৰ কৰিয়াৰ পৰ সকলে আবাৰ অগ্ৰসৰ
হইল। এখন সেই বন অতিক্ৰম কৰিয়া
গাড়ি সৰৰ বাত্ৰাৰ আশিৰা পড়িগাছে।
তাৰ দুই বিকে দুইএকখানি পানীয়াৰ।
আমতলি ছোট ছোট স্তম্ভৰ পাৰাচৰ
শিৰোদেশে অবস্থিত। তগাকৰ জীলোকেরা
আগে দেখিয়া নামিয়া আগিল এবং গাড়িৰ
পৰ্দা তুলিয়া দৰ-বদৰ মুখ দেখিল। জীলোকে
জীলোকেৰ মুখ দেখিতেছে, ইহাতে কেহ
আশঙ্কি কৰিল না। এই ঘটনাৰ পৰ গাড়ি
প্ৰাৰ এক মাইল পথ অতিক্ৰম কৰিয়াছে,
হঠাৎ এক অক্ষুট ক্ৰন্দন-ধ্বনি সেই বৈল
নিৰ্ভকতা তৰ কৰিয়া সকলেৰ প্ৰতিগোচৰ
হইল। সকলে অত্যন্ত ভৌতুহগাক্ত হইয়া
দেখিল যে, এক বৃদ্ধা ৰাত্ৰাৰ পাশে বসিয়া
কীৰ্তিতেছে।

বাহকগণেৰ কঠিন জয়ৰ সেই বৃদ্ধাৰ
ক্ৰন্দনে কিছুমাত্ৰ ভয়ীত হইল না। তাহাৰা
কিছু জিজ্ঞাসা না কৰিয়াই চলি গেল।
লক্ষী তখন 'গাড়ি'ৰ মধ্যেই ছিলেন।
সাক্ষাতি চলিগাছে—'বৰেল' গাড়িৰ সকলেৰ

শিখেন। লক্ষ্যের কর্ণে সেই বৃদ্ধার বেগন-ধ্বনি প্রবেশ করিল—স্বাধীনতার স্বাধীন স্বপ্নের সংকেতই গািল, তখনই গাড়ি থামাইতে হুকুম দিলেন। গাড়ি থামিলে লক্ষ্যগণ মনে করিল যে, গাড়ির ‘ড্রাম’ ছিঁড়িয়াছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে না থামিয়া চলিতেই লাগিল। লক্ষ্য সেই বৃদ্ধকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৃদ্ধি কীভাবে কেন ?” বৃদ্ধি ক্রমশঃ প্রবৃত্তি আরো চড়াইল—স্বাধীনতার ‘স্পর্শ’ তাহার শোক বেন সংস্পর্শে লাড়িয়া উঠিল ! সে বলিল,—“না, তুমি রাজ্যশীল হও, রাজার মা হও, আমি মতি হুঃখিনী, আমার আব কেউ নেই গো—কেবল একমাত্র মেয়ে—” এই পর্যন্ত বলিয়াই সে উঠেঃঃ করে কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধির চেহারায় অত্যন্ত খারাপ, শরীর ক্লম অসুস্থতার। কিন্তু নমনে কুটিল কটাক—মুখে বেন একটু কি-বেন কেনন ভাব ! হাতে একখানি লাঠি ও কাছে একটি পুঁটু। লক্ষ্য বলিলেন,—“বৃদ্ধি, কীদিন কেন ? বলনা কি হয়েছে, তার মেয়ের কি কিছু অসুস্থ হ’য়েছে ?”

বৃদ্ধি বলিতে লাগিল,—“না, আমার ঐ একটিমাত্র মেয়ে, তার উপর পিতামাতার লক্ষ্য পড়েছে। মাগো, আমার কি হলে গো ?” বৃদ্ধি আবার কাঁদিতে লাগিল।

লক্ষ্য বৃদ্ধার জননের প্রবেশ লাগল কথা কিছুই বুঝতে না পারিয়া নিজ পাশ্চাত্য হইতে কতকগুলি মিষ্টান্ন উঠাইয়া বৃদ্ধিকে খাইতে দিলেন। বৃদ্ধি তখন কান্না ভুলিয়া ভোজনেন মনোনিবেশ করিল, আহাঃহাঃ আবার তাহার সেই কাহিনী আরম্ভ করিল।

লক্ষ্য সেই স্বাধীন কাহিনীর মধ্য হইতে এই স্থিতিগত যে, বৃদ্ধার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হইয়াছিল, কিন্তু এখন একটি মেয়ে ভিন্ন আর কিছুই নাই। সে জাতিতে আহির, তাহার জামাতার আশা ভাগো নহে। কতটি সংগ্রহিত কঠিন পীড়ার আক্রান্ত, তার স্বভাব-বাহু মনুষ্য হইতে চারি ফোপ দক্ষিণে। এই কাহিনীর পর বৃদ্ধি নিমন্ত হইল।

রজনীর অন্ধকার সমস্ত প্রকৃতিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, মাঠের মতো নিবিড় অন্ধকার। বৃক্ষাংগে, নদীর জলে, কঙ্করময় ভূমিপথে, চতুর্দিকেই বেন গাড় মণ্ডি গুলি হইয়াছে ! গগন মণ্ডলে কতকগুলি নক্ষত্র মিটমিট করিয়া আলিতেছে, প্রকৃতি নিভর, শিথিলতার নিভর ! কেবল ‘বহেলগাড়ি’ ঢাকার শব্দ, গোরগুলির উপর চালকের নানাবিধ সম্পর্ক-বন্ধন সজ্জাবল এবং দুই একটি এম্বা কুস্তরের চাঁৎকার ভিন্ন আর কিছুই প্রতিগোচর হইতেছিল না।

বৃদ্ধি একটু থামিয়া আবার আপন মনেই বকিয়া বাইতেছে, লক্ষ্য মাঝে মাঝে ‘হু’ দিতেছেন, আবার কখনো বা সে দিকে কর্ণপাতও না করিয়া পিতামাতার কথা ভাবিয়া অবসর হইতেছেন। বৃদ্ধির গম্ব কিছু এক টানা স্রোতের মতো চলিতেছে।

লক্ষ্যের বড় পিণামা পাইল। সমস্ত দিন রোজের গরুর তেল মিষ্টাছে, ‘গাড়ির’ চতুর্দিক পদ্দা দিয়া খেয়া—বায়ু সঞ্চালনের কিছুমাত্র উপায় নাই ; বাক্য উত্তাপ ! লক্ষ্য সেই বৃদ্ধকে বলিলেন, “বৃদ্ধি মা, একটু লগ দিতে পারিবা ?” বৃদ্ধি “বলি বেন,

ভেট্টা পেয়েছে বল খাবে তা বিচ্ছিন্ন। 'গাড়ি' খামাতে বল কোথায় কুয়া আছে নেবে দেখি। রসি ও লোটা সঙ্গে আছে তো?" লক্ষী বলিলেন, "না না, না-বুতে হবে না, এখানে মোটে কলসীতে জল আছে, তাই যে।" তখন বুড়ী কলসী হইতে জল ঢালিল এবং একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া বস্ত্র-প্রান্ত হইতে একটি ছোট কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া কি একটা জুঁড়া পেই জলে মিশাইল।

লক্ষী একনিশায়ে সব জমটুকু খাইয়া ফেলিলেন এবং প্রায় পাঁচ মিনিট পরে বলিলেন,—“বুড়ী, আমার গা কেমন করচে তুই ঘরোয়ানকে ডাক্।” এই বলিয়াই তিনি বুড়ীর কোলের উপর ঢলিয়া পড়িলেন। বুড়ী মনের সহিত তীরে বিদ্য মিশাইয়া বিগাহিল।

বুড়ীর কোলে লক্ষী অলাড় হইয়া পড়িয়া আছেন। বুড়ী তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করিতে লাগিল, এবং উপযুক্ত সমস্ত স্থিতি ব্রহ্মণ্য হইতে একখানি রেশমি কমল বাহির করিয়া বালিকার গলার ফাঁদি লাগাইয়া তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিল।

তখন বুড়ীর অধরে কৃতকার্যতার মৃদু হাসির বেগা বেগা দিল। সে সেই মৃদুভেজ অঙ্গুষ্ঠের হাতড়াইয়া লক্ষীর গহনার বাস্কাট লইল এবং বালিকার মুখের কাছে ধুৎ লইয়া ফিণ্ ফিণ্ করিয়া কি মন্ত পড়িল, তৎপরে আন্তে আন্তে গাড়ি হইতে নানিধা প্রস্থান করিল। গাড়ির মধ্যে রহিল—লক্ষীর প্রাণপুষ্ট, স্পন্দনপুষ্ট নব-কিশলয়-বল তুল্য দেহ!

হাজি মন্ত থাকিতে 'বয়েল' গাড়ি লক্ষীর শস্ত্র-বাড়ির সমস্ত ঘরজার পামিল। এই প্রথম বার বণু ঘব করিতে আসিতেছেন, একটা আনন্দের উৎকর্ষার সমস্ত রাত বাড়ির কেহই ঘুমায় নাই। বাড়ির দরজার আলপনা, নিকটস্থ পথে পঞ্চবর্ণের জুঁড়া ও চতুর্দিকে নানাধিগ পুষ্প ছড়ানো। ঘরের লক্ষী ঘরে আসিতেছেন, তাঁহাকে সঞ্চর্মনায় গৃহই এই সব আয়োজন!

লক্ষীর শস্ত্রাঙ্কুরাণী মঙ্গল-ক্রন্দন হুহু লইয়া পুরমহলাগণ সমভিযাহারে ঘিরে ঘিরে গিয়া গাড়ির দ্বার উন্মোচন করিলেন; দেখিলেন বণু শুইয়া রহিয়াছেন, ডাকিলেন, “মা, মা, ওঠ মা, ঘরের লক্ষী ঘরে এসেছে ওঠ মা!” কিন্তু হায়! মা কি আর আছেন!

গৃহিণী বধূর মুখেত কাছে আসে ঘরিলেন কী ভয়ানক। কী লোমহর্ষণ! কী শোচনীয়! সেই উষা-মিশ্রী তুলা অনতি-বিকণিত মৌনধোঁ কে যেন কালিদা ঢালিয়া বিগাহে! সোনার অঙ্গ হিম হইয়া গিয়াছে! সেই বজ্রনবৎ ঢেল চকু হ্রি ও নিম্বক! সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ স্তম্ভর তারকা উড়ে উঠিয়াছে! গৃহিণী দেখিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন—তাঁহার সংজ্ঞা-লোপ হইল। তখন বাড়িতে একটা কীষণ হাহাকার উঠিল। আনন্দ উজ্জ্বল এই রোগনের ধ্বনিতে জুঁবিধা গেল। পথের মূল পথেই পড়িয়া রহিল! লম্বলে সেই সৃজিতা গৃহিণী ও লক্ষীর শব্দবহ বাড়ির ভিতর লইয়া গেল।

হায়! কী দুর্ভেদ! দুহুর্ভেদ বিবাহ বাসর

চরন—স্বাগীত ।

শোকবিভীষিকার এই দুৰ্ঘটনার নারিকার সেই রাক্ষসী ঠগী
পরে গুত হইয়া পুলিশের নিকট সব কথা
খুলিচা বলিয়াছিল ।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী ।

চীন-কুম্ভ ।

(কবি লি পো—অষ্টম শতাব্দী)

ভো!—ইয়ে তটে

(১)

গুটিনীর গৌতমুখে তারা
করিতেছে সুপাল চরন ;
শৈবাল করিছে নতশিরে
ভরী হ'তে ভরীরে গোপন !
প্রাণের নিভৃত দেশ হ'তে
লাগুয়ুহ স্থখ আলাপন,
নদীর সে কলহাসি মনে
বহিরা আনিছে সমীপন !

(২)

নিবিড় সবুজ কুম্ভমাঝে
সুবর্ণের দীপ্ত জ্যোতির্বেশা,
তালের বদন পরে আসি
রচিয়াছে চাকু চিত্রলেখা !
রেণুকের বাহুআগ্ররপ,—
সুসজ্জিত সমীর খেলে তার ;
ঘীরে ঘীরে চুপে চুপে তারে
স্বীকৃত করে যত প্রাণ তার ।

কিছু হেথা কা'রা আসে ওট,
অথারোহী সৈনিকের দল ?—
যৌরবেশ নদীর কিনারে
রবিকরে করে স্নানমল ।
মণে মিলে চলে সারি সারি,
তিন জন পাঁচ জন করি,
শৈবাল বনের পরশারে,
বিজড়িত প্রোতরোপা'পরি !

(৩)

অথ এক করে হ্রেণা রণ ;
সৈনিক যুবক একজন
অথগুরে মণি ফুলনলে
করে বৃষ্টি যাত্রা আরোহিন ।
বৃথা চাহে জীতা ওই বালা,
ঝোড়িবারে ধবর কম্পন,
নরনের গোপন কথার
চাহে দিতে বৃথা আশ্রয়ন !
শ্রীবেবেজনাথ মহা ।

স্বায়ীত্ব ।

(সেখ সাদীর পারসী হইতে)

দাতার হৃদয় নহে রক্তের বাস,
প্রেমিকের চিত্ত নহে শৈশবের আবাস,

শত ছিঁড়ে পায়ে অল রহে কতকণ,
কেবল পতনে তার লাগে বতকণ !
শ্রীবেবেজনাথ মহা ।

মাতৃঋণ ।

ଗର୍ଭେ ଅବିରଟନ୍ତେନ ।

काव्यभूषण ।

১৯৪৫ কিছুকাল পরে অর্জেন্টাইন নিকট
হটকো গ্রামেই মরোভারি নামে এক পত্র
আদিল।

মরোভা'কে 'বন্ধু' সংবাদন করিয়া কবি
 নিশিগাহে,—অতঃপাং এক আশ্বাসের সূত্র
 হওয়ায় তাহার অস্বাভ্যাস পরিবর্তন ঘটয়াছে,
 কাজেই সূলে অধ্যাপকের কার্য করা তাহার
 পক্ষে সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় নিত্য
 দুঃখের সহিত এ পবিত্র ব্রত পালন করিতে সে
 সক্ষম হইতেছে না ঐত্যাাদি। পত্রের পান্থদেশে
 কয়েক ছন্দে লেখা ছিল, মানাম বার্মাদিও
 মহাশয় পারিতে চলিয়া আদিগাহেন, পুত্র
 লোককে পিতার মত স্নেহপরায়ণ অধ্যাক্ষ
 মরোভা'র তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত।
 মরোভা' লোককে পিতার মত স্নেহ করিলে,
 মানাম এ আশা রাখেন। লোকের অগ্রণ
 বিশ্বাস হইলে সে সংবাদ কার্যেভ'কে দিলেই
 চলিবে, 'আজেক্ষ' মানাম বার্মাদিকে তখনই
 সে সংবাদ প্রেরণ করিতে একটুক্ষণ বিলম্ব
 করবে না।

পাতার মত দেহধারণ ! কি অসহ্য এ
বিলম্ব ! আর্জেন্ট কি মরোভাকে জানেন না ?
জ্যাকের মা এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া
গিয়াছে,—জ্যাকের তরফ হইতে একটি কপদিক
পাইবারও যখন সম্ভাবনা ছুরাইয়াছে, তখন
মরোভার নিকট জ্যাক কেমন ব্যবহার
পাইবে, তাহা আর্জেন্ট বেশ বুকে। তবু এ
কথা গিথিয়াছে। চমৎকার।

এই কব ছাত্র পাঠ করিয়া যোগে, মোতে
মরোত্তর অপরমতক অগিয়া উঠিল। সে
অনলেগ তাপ জ্বনেনেবাসী সকলেই অস্বাধিক
অমুভব করিল।

চলিত গিরাছে !

মেট ভিখারী কন্যা লোকটার সহিত
চলিয়া গিয়াছে। লোকটার না আছে বৃত্তি,
না আছে এতটুকু সামর্থ্য! নিত্যভূই দ্বিত্তিক,
বৃথ, অপরার্থ। আর দেখে নাই! সে এত
টুকু বিধা করিল না। স্বল্পেই এমন পুস্ত্রের
মাত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! কি হৃদয়
হীন,—কি পাশানী সে!

আজ্ঞেই পঠন। ডাক করিয়া
পকেটে রাখিতে রাখিতে মনোহা। এখটা
ক্রম যুগ বাঁস হাঙ্গল, ডাবিল; বাপের মত
যত্ন করব আমি, বটে। বাপের মত যত্ন,
একেবারে হুজু!”

দস্তাবেজ বাসিকপত্রের সমস্ত আণা লুপ্ত
হইল বলিয়া যে মরোভাঁর এত আক্ষেপ
হইয়াছিল, তাহা নহে। এ আক্ষেপের প্রধান
কারণ ছিল, জেৰা। এই দুইটি আণা প্রথম
সাপ্তাহ অবধি আপনাবিগকে যেমন
একত্ব বোধিত করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনই
উভয়ের চতুর্দিকে তাহার। এমন একটি হৃদে
আচীর গঠন করিয়া রাখিয়াছিল যাহার মধ্য
বিরা তিতরকার এতটুকু গোপন রহিত
মরোভাঁর সম্বন্ধ ও সন্তর্ক পৃথিতে ধরা পড়ে
নাই। এমন করিয়া চতুর মরোভাঁর চক্রে উভয়ে
দুই নিক্ষেপ করিবে এবং এত নীচ—তাঁহা
মরোভাঁ কখন কখনও করিতে পারে নাই।

জ্যাক ! জিমেনেসেই পে থাকিবে ! কিন্তু অর্থ কোথায়ইবে কে ? মরোভা' নিশ্চিত থাকিতে পারিল না । সংবাদ লইতে গিয়া কীর্তীর মুখে তুলিল মানান পাহা'দি এখানকার বাস উঠাইবারই এককণ সঙ্কল্প করিয়াছেন, ফিরিবার সম্ভাবনা তাঁহার বড় একটা নাই !

জিমেনেসে ফিরিয়া মরোভা' স্থির করিল, আর একটা মান শুধু জ্যাক এখানে স্থান পাইবে ! তার পর উদার আকাশের তলে সে আপনার আশ্রয় খুঁজিয়া লউক !

সে দিন জ্যাক আহারের সময় মরোভা'র পার্শ্বে স্থান পাইল না । আহা'র্য্যও বাহা মিলিল, তাহা নিতান্ত নিকটে । জীবনে জ্যাক এমন আহা'র্য্য মুখে ভুলে নাই ! বোঁর উপর মরোভা'র দৃষ্টি কি ক্রুর, কি ভীষণ !

মাত্র কাছে আসিয়া জ্যাক ডাকিল, "মাত্ৰ !"

মাত্ৰ তখন আপনার মনে কি বকিতেছিল ।

জ্যাক কহিল, "ভূমি কি গান গাচ্ছ, মাত্ৰ ?"

মাত্ৰ কহিল, "না—একটা কথা জ্ঞান-হিলাম !"

জ্যাক মাত্ৰকে আপনার কাহিনী বলিল, তাহার ম',—ভগতে যে মা ছাড়া আর কাহারেক সে জানে না,—সেই মা তাহাকে এখানে কেলিয়া কোথায় গিয়াছেন, আর ফিরিবেন কি না, কে জানে !

মাত্র বদ্ধব নিকট আপনার মতগত খুলিয়া বলিল ।

মাত্র জিমেনেসে পরিভ্রমণ করিবে । নিশ্চয় ! অনেক দিন হইতেই কবাটা সে ভাবিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কখনও একটা সুদৃশ্যর হইতে পারে নাই । অন্ধকার জীবনে এখন

স্বর্ণোদয় হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে ! আর লক্ষ্য হইল না ! সেদিন চিড়িয়াখানার গিঘা সে মুক্তি'র স্বপ্ন পাইয়াছে ! বাহিরের মট বায়ু সহ্য সে ভোগ করিতেছিল, পিঙ্গবানড জাগী'তলা তাহা হইতে বঞ্চিত ছিল ! পরিমিত আহার, নিঃশ্রমিত সমস্ত, সে কি দাক্ষণ কষ্টকর ! সে সাহ'মতে কারিকার কাছে ফিরিয়া যাউ ! জ্যাক যদি সমস্ত হইত তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাউতে মাত্র অস্বস্ত আছে ! তবে কোন তর মাট, 'খি-জি'র ভগ্নে সকল বিন্দু কাটিয়া যাইবে ।

জ্যাক সমস্ত হইল না ! প্রথম সূর্য্যকিরণে তত্ত্ব মাত্র সে অনেক গৃহ অপেক্ষা জুগুপসাবিজ্ঞা ঘেঁষা জিমেনেসের এ বায়ু-আলোকহীন কক্ষ অনেক ভাল ।

মাত্র কহিল, "বেশ, ভূমি তবে এখানে থাক, আমি একলাই যাব ।"

জ্যাক কহিল, "কখন যাবে, ভূমি ?"

মাত্র কহিল, "কাল ভোরে ।"

পরদিন বেলা হইলে জিমেনেসে একটা কোপাষণ উঠিল । ভোরে মাত্র বাজারে গিয়াছে, বেলা এগারটা বাজে, এখনও তাহার দেখা নাই ; কেহ এখনও খাইতে পার নাই ! মাধান মরোভা' কহিল, "নিশ্চয়, গণ্ডে তার কোন বিপদ হয়েছে ।" মরোভা' কিছু বলিল না । দীর্ঘ ঘণ্টা হুতে অধীর আগ্রহে মনো মনো জিমেনেসের ঘাণে আসিয়া মরোভা' দেখিতেছিল, কখন সে কাফ্রীটা ফিরে ।

কিন্তু কাফ্রী ফিরিল না । মাধান মরোভা' অবশেষে নিকটস্থ দোকান হইতে আহা'র্য্য আনিয়া ক্ষুধাত্তর জিমেনেসকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে পরিজ্ঞান করিল । আহা'র্য্যটির

পর মরোভাঁ কহিল, “ভার কাছ টাকাকড়ি কত ছিল?”

“পনেরো ফাঙ্ক!”

“পনেরো ফাঙ্ক!”

পালিয়েছে।”

ডাক্তার হাব্বজ কহিল, “পনেরো ফাঙ্ক ত আর দাচমি বাওরা যায় না!”

মরোভাঁ মাথার টুপি উঠাইয়া পানির চলিল!

বেশন করিয়া হউক এট মাত্রকে ডিটাইরা আনিতে হইবে। মার্শেল অবধি যেন সে না যায়! বনফিলদের কাণে যেন এখানকার কথা না উঠে! পৃথিবীতে চক্কু-কঁকে কেবলই ঈর্ষ্য। রাজপুত্র জিমেনেসের নিশা করিলে নিকশা সংবাদপত্র-সম্পাদকের দল এখনই ফুকরের মত চীৎকার করিয়া উঠিবে। জিমেনেসের প্রতিপত্তি, তাহা হইলে, নিমেষে টুটিয়া যাইবে! কাজেই সকলের মুখে চাপা দিতে হইবে!

পুলিশের নিকট মরোভাঁ যে বিবরণ লিখাইল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম,—মাত্র অনেক টাকাকড়ি লইয়া পলাইয়াছে, কিন্তু সেজন্য মরোভাঁ কাতর নহে। হতভাগা, নিক্রাসিত, বিদেশী রাজপুত্র,—আমি সে বালক যাত্র,—পথে কত বিষয়ে পড়িতে পারে!

কথাটা বলিয়া ব্যায় চক্কু বৃছিল। ইমপেক্টর আখাল দিল, “তাবনা কি, সুন্দো, নিন্দর তাকে পূঁজে বার করব!”

মরোভাঁ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইমপেক্টরের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, “তাকে পূঁজে দাও, বোচাগা রাজপুত্র দে,—আমি চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

চাঞ্চায়ে সন্ধান চলিতে লাগিল। পারি মহরের সমুদয় কটকে প্রহরীর দল সতর্ক রহিল। কষ্টমেঘ কপুচাঠীর নিকট কাফ্রী বালকের আকৃতির পুখারুপুখা বিবরণ পাঠান হইল। জিমেনেসের বালকের দণ্ডে লইয়া মরোভাঁ হারজ সকালে-সন্ধ্যায় নানাপ্রণে গুরিগা বেড়াইতে লাগিল! কিন্তু বিশেষ ফল হইল না।

যত্নে কিরিগা জ্যাক ভানিত, মাহ্‌ এতদিনে কতদূর গিয়াছে। তাহার মাথার উপরও যে আকাশ, মাত্র মাথার উপরও সে একই আকাশ! আকাশ তাহাদিগের চাইজনকেই দেখিতেছে, কিন্তু তাহারা পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছে না। হারে মাহ্র শূণ্য বিছানা দেখিয়া জ্যাক ভানিত, মাহ্‌ পলাইতেছে! পলাও, পলাও মাহ্—শ্রাণপণে পলাও!

সে রাত্রি বিছানার উপর বসিয়া জ্যাক আপনার অবস্থার কথা ভাবিতেছিল! মা—কোবাচ, মা? আর কি কখনও সে মার দেখা পাইবে না? বুকটা দারুণ দঃণে ভরিয়া উঠিল। জ্যাকের চক্কু চুইটি জলে ভরিয়া আসিল!

বারিহে যেথ ডাকিয়া উঠিল। ভাবন শব্দে ভুটি নামিল! জ্যাক ভাবিল, ‘আহা, এটী জলে পথে মাহ্রর কত কষ্ট হইতেছে! শিলা ও বন ভূবারপাত আরম্ভ হইল! মাহ্রর কথা ভাবিতে ভাবিতে জ্যাক ঘুমাইয়া পড়িল। সে ঘরে দেখিল, কি সতর্ক সতর্পিত গতিতে মাহ্‌ পলাইতেছে—ঐ যে, মাহ্‌, ঐ যায়। একটা বিকট উল্লাস-চীৎকারে চমকিয়া জ্যাক জাগিয়া উঠিল! জাগিয়া

ভুলিল, বাহিরে একটা রুব উঠিয়াছে—জ্যাক
বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একজন
কহিল, “মাহুকে পাওয়া গেছে।” জ্যাকের
বুকটা পলক করিয়া উঠিল। ধরা পড়িয়াছে।
বেচারি মাহু! নিত্যন্ত অচাগা!

জিমেনেলের জ্যাকের দল সারি দিয়া
দাঁড়াইয়াছিল—অধ্যাপকের দল বসিয়া—
অব্যাহার সম্মুখে বিচারপীর মত দাঁড়াইয়া,
মাহু! তাহার চোপদুইটা কোটরে দুকিরা
গিয়াছে, মুখ শুক, পোশাক কাদানাপা, হানে
হানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে—এই মাহু,—করমিনে
তাচার এক পরিশ্রম হইয়াছে।

মাহু জ্যাকের পানে চাহিল। উভয়ের
চোখে নৌরবে কি বেগনার ভাবা ছুটিয়া
উঠিল—ভায়া তাহারাই মুঞ্চিল। সে ভায়া
মুন্সিয়ার লোক জিমেনেলে ছিল না।

মুন্সিয়ার লোক চলিয়া গেলে মাহুয়
শান্তি আশ্রয় হইল। ভীত ভিন্নতারের সহিত
পৃষ্ঠের উপর মরোভাঁর কপার ভীতের আশ্রয়
পড়িল,—এক, দুই, তিন, চার—। মাহু
মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। জ্যাক
কাপিতে কঁপিতে দেয়ালে ভর দিয়া কোনবতে
আপনাকে সামলাইয়া গেল।

সারাদিনের মধ্যে জ্যাক মাহুকে আর
দেখিতে পাইল না। রাত্রে তাহারই পার্শ্বের
বিছানায় মাহু শুইয়াছিল—নিকটে মরোভাঁ,
মাদাম মরোভাঁ ও ডাক্তার হারজ্ দাঁড়াইয়া
ছিল।

মরোভাঁ কহিল, “অল্পখটা কি বেশী,
ডাক্তার হারজ্?”

মাদাম কহিল, “ওর মাছে, কিছু?”

হারজ্ কহিল, “ওর আশ্রয়, কি?”

এ কাকীতলোর গ্রাম
শক্ত।”

তাহারা চলিয়া গেলে, জ্যাক আদিয়া
মাহুর পার্শ্ব বসিল, ডাকিল, “মাহু!”

“কে, জ্যাক?”

জ্যাক কহিল, “তোমার গা যে পড়ে
যাছে, মাহু! অস্থপ করো, কি?”

“মাহু আর পড়বে না, জ্যাক—তার
‘ত্রি-ত্রি’ কোণার হারিয়ে গেছে।” জ্যাক
হির হইয়া বসিয়া রহিল।

মাহু ডাকিল, “জ্যাক!”

“কেন, মাহু?”

“দাহ্মিতে আর পাওয়া হইল না!”

এক খোঁটা গরম জল মাহুর কপালের
উপর পড়িল।

মাহু কহিল, “এল পড়ল, কোথা থেকে?
তুমি কোথাক, জ্যাক?”

“না,—তুমি বুঝো, মাহু, আমি তোমার
দ্বিধার হাত বুঝিয়ে দি।”

“না, না,—তুমি যাও! মরোভাঁ

দেখে ত, তোমার আশ্রয় থাকবে না।”

সকালে মাহুর অবস্থা খারাপ হইল।

ডাক্তার হারজ্ আপনার মৌলিকতা জাহির
করিবার জন্য মাহুকে চিকিৎসার নতুন ব্যবস্থা
করিল। লগানের মধ্যে গাছের তলায়

• মাহুর বিছানা পড়িল। হারজ্‌য়ের নানাবিধ
উদ্ভট ঔষধ-প্রক্রিয়াতেও কোন ফল দেখা গেল
না। শেষকালে মাহুর সকল রূপের অবলান হইল।

মরোভাঁ আবেশ দিল, খটা করিয়া কণবের
ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এমন খটা দরিদ্র স্রোতে কেহ কখনও
চক্ষে দেখে নাই।

নিষ্কাশে উপনীত হইলে, এই অস্বাভাবিক বাপারে অনুপক্ষে পৃথিবীর বয়সকেটি বৎসরের অধোভাগ হইয়াছিল।

আন্তর্গেহের বিষয় এই যে অধ্যাপক জোলি (Professor Joly) যন্ত্ররূপ পত্রীকায় ঠিক এই একই নিষ্কাশে উপনীত হইয়াছেন; এবং এইজন্য তিনি Royal Society নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সভা হইতে সম্মতি-একটা অর্থ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধ্যাপক জোলি অনুমান করেন যে সমস্ত এককাল পৃথিবী অস্তিত্ব জার বিস্তৃত বলে পূর্ণ ছিল। ইহার লক্ষ্য লক্ষ্যের তাপ সমস্তই নবী-অবশেষে হ্রাস হইতে আসিয়াছে। এই অনুমান করিয়া তিনি সমস্তের মানা অপেক্ষে অলঙ্কারের বিশেষণ করেন; এবং বৎসর বৎসর নবী ব্যতিরিক্ত হইয়া কত পরিমাণ লবণ সমুদ্রে আনিয়া পড়ে, তাহারও একটা পড়পরিমাণ হ্রাস করেন। একইরূপ তুলনায় তিনি দেখেন যে, সমস্ত-বলে এখন যে পরিমাণ লবণ আছে, তাহা লক্ষিতে বয়সকেটি বৎসর অতিব্যতিরিক্ত হইয়াছিল।

কিন্তু সমস্তি বিবিধ অস্তিত্বিকরণ তত্ত্বের আবিষ্কারের ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে আধাব্যে এই ভূমণ্ডল সূত্ববিশেষের অনুমান অপেক্ষা বহু কোটি বৎসরের প্রাচীন; মানুষকে পৃথিবীর বয়স ১০ কোটি বৎসর। এই নিষ্কাশের সহিত অনুমান করবার কোনও সংশয় নাই; প্রকৃতঃ ইহা বৈজ্ঞানিক পত্রীকায় প্রমাণবান সাহায্যে বিবীকৃত হইয়াছে। ইউরেনিয়াম (Uranium) বায়ুর রূপান্তরকার এই তত্ত্বনিষ্ঠপণে সর্বিষেব সাহায্য করিয়াছে।

ইউরেনিয়াম এক আন্তর্গেহ পদার্থ। ইহা রেডিয়াম বায়ু অপেক্ষাও প্রাচীন। ইহার অণু সমুদ্রে যে কি প্রচণ্ড শক্তি বহু রহিয়াছে, তাহা আনন্দা বায়ুও কঠিনে পারি না। সাতো সাতাল মণ ইউরেনিয়াম লভ্যের ভার একটা প্রকাণ্ড বহুত্বকে এক বৎসর অণোজিত করিয়া রাখিতে পারে। ইহার চালক শক্তি এইরূপ যে, এক পেয়ালার পরিমিত ইউরেনিয়াম প্রকাণ্ড 'ডেডনট' বহু ভারাক্রমকে পূর্ণরূপে সমস্ত পৃথিবীটা

অবশিষ্ট করাইয়া রাখিতে পারে। কিন্তু ইহার শক্তি-সত্তা সমস্তে বৈজ্ঞানিকবিশেষ কোন লক্ষণে না থাকিলেও তাঁহারা এই শক্তিকে আন্তর্গেহীয় কনিষ্ঠা কার্যে প্রয়োগ করিতে এখনও সক্ষম হই নাই। ইউরেনিয়াম নিষ্কাশেই যথেষ্টে সম্ভবতা পদার্থে চূর্ণ করিয়া তাহার লব্ধ অণুগুলিকে চৌম্বিক কড়াইয়া দেখিতেছে। এই চূর্ণিত অণুগুলির বেগ প্রতি সেকণ্ডে সমস্ত সমস্ত হাইল। বহু ভারাক্রমের একটা খোলা ২২ সেকণ্ডে এক হাইল দূর পথন করে। কিন্তু ইউরেনিয়ামের একটী অণু এই সমস্ত সমস্ত পৃথিবীটা অবশিষ্ট করিয়া রাখিতে পারে। ইউরেনিয়ামের অণুগুলি নিষ্কাশেই রেডিয়ামে পরিবর্তিত হইতেছে; এবং এই পরিবর্তন প্রাপ্য অবলম্বন করিয়াই আমরা চৌম্বকনিষ্কাশের অস্তিত্বকাল অনুমান করিতে পারি।

অন্তর্গেহিকরণ তত্ত্বের ইহা একটা বৈজ্ঞানিক নিয়ম যে, ছাঁটী অণুজৈবিকক্রিয়া (radioactive) পদার্থ যদি বিচ্ছিন্নপাতিতে পদার্থান্তরে পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে কোন পদার্থ পদার্থে তাহাৎ পরিমাণসূত্রে দেখিয়া তাহারে অস্তিত্বকালের পরিমাণ অবশ্যই বোঝা যায়। ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম উভয়েই অণুজৈবিকক্রিয়াকারী পদার্থ; উভয়েই নিষ্কাশ পদার্থান্তরে পরিবর্তিত হইতেছে; এবং উভয়-কেই সর্বত্র ও একত্র ও একই অণুপাতে দেখিতে পাই। এক প্রে রেডিয়াম পদার্থান্তরে পরিবর্তিত হইতে ২০০ বৎসর প্রায়কৃত হয়। এবং সর্বত্রই ইউরেনিয়াম রেডিয়াম অপেক্ষা ১০ লক্ষ গুণ অধিক বেগে যায়। অতএব অণুজৈবিকরণ তত্ত্বের মূল সূত্রানুসারে ইউরেনিয়ামের বয়সকাল রেডিয়াম অপেক্ষা ১০ লক্ষ গুণ অধিক অর্থাৎ ইউরেনিয়ামের অস্তিত্বকাল ১০ কোটি বৎসর। হুতরঃ আধাব্যে এই পৃথিবীত মানুষকে সাত শত পঞ্চাশ কোটি বৎসরের প্রাচীন।

এই অণুজৈবিকক্রিয়াকারী পদার্থসমূহের তত্ত্ব-বিচারে একটি তীক্ষ্ণদৃষ্টি দৃষ্টব্য নিরাকৃত হইয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানি পণ্ডিতগণ যোগ্য করিয়াছিলেন যে পৃথিবী ব্রহ্মণ্ডই নীচলতর হইতেছে এবং এই নীচল-

তার সহিত মানবজাতির জীবন প্রবীণের তৈলন্ত
জুড়াইয়া আসিতেছে ; তবে এখন একমিহ্ন আসিবে
যখন পৃথিবীর সমুদ্র উত্তাপের বিশাল হইয়া, পৃথিবী
আধুনিক চক্রে বশা প্রাপ্ত হইবে । সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক
ট্রাট্‌ (Professor Strutt), আমদিগকে অতঃ বিদ্যা
বলিতেছেন যে, পৃথিবী শীতলতর হইয়া মানবজাতির

অযোগ্য হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ
নাই । কারণ পৃথিবীর পৃষ্ঠতল সমুদ্রে এখনও এক
হেডিয়াস পরিমাণে যে উত্তাপ পৃথিবীর তাপমিত্রিয়-
জনিত ক্রি়া অসাধ্যসে পূরণ করিতে সক্ষম । সুতরাং
এই কোটী কোটি বৎসরের অচীর্ণ পৃথিবীর জীবন্ত
হইবার আশঙ্কা নিতান্তই অল্পলক্ষ ।

ঐদীনবন্ধু সেন বি. এ ।

ব্যবহার ক্ষেত্র ।

ব্যবহার মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম । ব্যবহার
ব্যতীত কোন মনুষ্য থাকিতেই পারে না ।
ব্যবহারেই মনুষ্যের মানা স্তম ও শক্তির
বিকাশ ঘটে, স্নাতক-ব্যবহার ক্ষেত্র যে
মনুষ্যের একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র তাহাতে
আর সন্দেহ নাই । ব্যবহার যদি সত্য
হয় তবে ইহা হইতেই মনুষ্য ভগবানের দর্শন
বা সৃষ্টির পথ আনন্দ লাভে সমর্থ হয় ।

মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের ব্যবহার-কি
প্রকারে সাধিত হয় ? সন্দেহের স্থান । সন্দেহ
বোধই মনুষ্যের ব্যবহারকে নিরাসিত করে ।
মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের গভীরতম যোগ বা
নিবিড় সন্দেহ অসুস্তবই মনুষ্য জীবনের সর্ব-
শ্রেষ্ঠ আনন্দ ; ইহাতেই ভগবান মনুষ্যের মধ্যে
প্রত্যক্ষ হন । এই যোগ বা সন্দেহ প্রাধান্যতঃ
তাই প্রকারে অসুস্তব হইয়া থাকে, এক
প্রয়োজনীয় মধ্য দিয়া আর এক বিস্তৃত
প্রীতি বা আনন্দের মধ্য দিয়া । সৃষ্টি ব্যতীত
আনন্দ নাই, বাহার অস্তঃকরণ সৃষ্টির আনন্দে
উদ্ভাসিত, তিনি মনুষ্যের সঙ্গে আনন্দের সন্দেহ
স্থাপন করিতে অর্থাৎ বিস্তৃত প্রীতি দান ও
গ্রহণ করিতে সক্ষম, আর যিনি সৃষ্টি লাভের

অন্ত একান্ত ভাবে ব্যাকুল তিনিও এই প্রীতি
—আদান প্রদান করিতে না পারিলেও—
অসুস্তব করিতে সমর্থ ।

যে সকল মনুষ্যের মধ্যে সৃষ্টির সন্দেহ
কোনো বোধ উদয় হয় নাই তাহাদের পক্ষে
প্রয়োজনের সন্দেহই একমাত্র সন্দেহ এবং
তাহাই তাহাদের মধ্যে বাস্তবিক, তাহাকে
অভিজন করিয়া যে সন্দেহ করিয়া করা হয়
তাহা মায়া বা মিথ্যা এবং তাহার ফল
অসমঙ্গল ও দুঃখ । অতএব এরূপ সন্দেহ করিয়া
মনুষ্যের পক্ষে সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য ।

প্রয়োজন ও আনন্দ এই দুই অবস্থাকে
অবলম্বন করিয়াই কেবল যথার্থ পক্ষে ব্যবহার
চলিতে পারে । ইহার মধ্যে প্রয়োজনের
সন্দেহ বাস্তব শক্তির চর্চ্চা ও প্রীতির সন্দেহ
বারা আনন্দের উৎসাহন হয় । আমাদের
মধ্যে যিনি কেবল মাত্র প্রয়োজনের ব্যবহারে
আবদ্ধ না থাকিয়া সৃষ্টির আনন্দ লাভে ইচ্ছুক
হইবেন তাহাকে এই উত্তম ব্যবহারের সাধনা-
তেই প্রবৃত্ত হইতে হইবে ।

ব্যবহার বাহা প্রয়োজন, অসুস্তব মাঝেই
যথাসম্ভব তাহা সম্পন্ন করিতে অগ্রহ

প্রকৃত খাঁকা, নৃত্যিকামী ব্যক্তিঃ প্রতি প্রতি
কলা ও তাহার সাহায্যার্থে লক্ষ্যভ্রমকরণে
নিবৃত্ত হওয়া এবং যিনি নৃত্যি লাভ করিয়া
ছেন একান্ত প্রজ্ঞাতন্ত্রির সহিত তাহার
আগশের সম্মুখে নতমস্তক হওয়াই এই

উত্তর ব্যবহারের সাধনা। ব্যবহার কেবল
এইরূপ সাধনাই প্রকৃত মহত্বের সাধনা।
এবং ইহার ফলেই মহত্ব সেই পরম পুরুষের
দর্শন লাভে সমর্থ হয়—যিনি সমানুভূত ও পূর্ণ
অনিন্দ।

ঐহেমলতা দেবী।

দূরে।

দৃষ্টি হ'তে ভাল অদর্শন,
করনার তুলিকার আঁকা,
অনিন্দা কি স্থখলা দোরভে—
অরুণ মাধুরী থাকে মাগা।
স্বস্তির দাক্ষণ-দীর্ঘশ্বাসে—
অভাগের দৃঢ় আকর্ষণে,

স্রোতির করুণ ছবি হার!
চির বাধা পড়ে জানমনে।
তাঁই ভগ্নে দেবতা গুপ্ত
তাঁগ করে নূর্ন পিপাসা,
মৌন থাকে অঁকিতে তোমাতে—
দূরে—দূরে, এত দূরে আসা।

ত্রিগুণং গগন রায়।

আলোর পথ।

স্বপ্নর আশার কে আজি লইল
আলোকের রথে তুলি,
পথের দুপারে ছড়িয়ে চলিল
আলোকের রেখাগুলি।
লতার শাটার ঢাক স্থখমার
পড়িল কিরণ তার,
তরিল রক্ত পত্র শুক
বকে যা ছিল বার।
বস বার বথ উজলিয়া পথ
আলোক পড়ে সে ক্রি,

এই পথ দিয়া কে বাহ লইয়া
কাহার স্বপ্নর চরি—
চাহি বেথে লোক, এ কার আলোক
অরিছে বরষী গাহ,
বরষীম ধূলি এ যে পথ তুলি
আলোকে দিলিতে বাহ!
স্বপ্নর আশার হরে বাবে মৌন
আলোক লখায় মাথে,
পথের চিত্র পড়িয়া রহিব
যে লম্ব তুলিয়া মাথে।

ঐহেমলতা দেবী।

ৰাজকন্যা ।

অষ্টম দৃশ্য ।

নন্দিও আশুপ । ৰাজকন্যা মৃগচক্ৰে আশীনা,
মদুৰে ভূমিতলে বোণটি পড়িবা ।

ৰাজ । এৰ চোৱে মৰ কটাই দ্বন্দ্ব ;
কি কৰে এ অত্যাচাৰ নিবারণ কৰব ?
পিতাকে সাবধান কৰব ? কে আমাৰ
সহায় হ'বে ! কে আমাকে পথ দেখাবে !
—হঠি, দগদগ কোথায় তুমি ?

(পুৰাসক্তায় হস্তে সৰীয়াগেৰে অবেশ)

হাসি । আমাৰা এসেছি ৰাজকন্তে,
এদক্ষিণ শেষ কৰে—আত্মন এবাৰ পূজা আৱশ্য
কাৰ ।

ৰাজ । (উত্তিয়া দাঁড়াইয়া) ওঃ আজ
সৰস্বতী পূজা কৰে গিৰেছিন্দুম হাসি । হ, হ !
আজ তাঁৰ পূজাৰ দিনেও কেন পূণ্যমিলন
সঙ্গীতে জগৎ সুধাসিক্ত দেখতে পাৰ্ছিনে !
(মন্থিত এদক্ষিণ কৰিতে কৰিতে সকলোৰ গান)

মঙ্গল পক্ষৰী আজি ভাৱতী

গাও পূণ্য স্তুমিলন গান ;

হুতাব সঙ্গীত বজা সঁৱতে,

গুচাও, গুচাও এ ভাৱতে,

যেৰ বিবেচ হীন স্বাৰ্থ অভিমান ।

অৰ্দ্ধ শোণিত পাতে, নীপ কবোটি ভাতে,

যেৰ গো ভাৱত,—

একি তোমাৰ অৰ্জনা আৱত,

পুণ্য পূজা অপমান !

দীন অভাজনে, কল্পণা বিতৰণে,

মেহ চেতনা,—

নিবাৰ পাপ, কৰ জখা বৰ দান !

এগাদ উৰণিত, নোৱৰ নিনাদিত,

বোণা তানে—

দেবি, ত্ৰীভি পুৱিত কৰ পুণীবিমান ।

বাঁকো কণ্ঠে তানে ধন্থে যন্তে বাণে

আপে আপে গো—

বহাও মিলন ৰাগ উদাৰ জ্ঞান ।

ৰাজ । (এদক্ষিণাত্বে) স্বতি স্বতি,

দেবি এসৰ হও ।

সকলে । পদাননকুম্ভাৰ ও ৰাজকন্তাৰ

মঙ্গল হোক— ।

হাসি । (স্বগত) চাহ ! মনে হ'ল্লে যেন
দেবীৰ নয়ন অঙ্গ সিদ্ধ হ'বে উঠলো !

ৰাজ । মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক,
লক্ষ্মীভূক্তেৰ মঙ্গল হোক, অভাগা অসহায়
দুঃখীজনৈৰ চক্ৰে দূৰ হোক— ।

(বেলঘো ভীষণ নাগাড়া শব্দ । সকলে
চমকি উঠিল, হস্তেৰ অবাধি ঝলিত হইয়া
পড়িল ।)

ৰাজ । (মোৎকৰ্ঠে) একি ! আজি অসময়ে
এই ভীষণ নাগাড়া কেন ধ্বনিত হ'ল্লে ।

সখিগণ । তাইত আজি সৰস্বতী পূজাৰ
দিনে চান্দুভাসিন্ধৱেৰ নাগাড়া কেন বেলে
উঠলো ! -

ৰাজ । হা হা হা ! হঠত কোন অভাগাৰ
বলিদানই বা হ'ল্লে ! হঠত কোন নিৰপরাধী
পুলমকেই বা উঠেছে ! যাও সখিগণ তোমরা
বাও সংবাৰ আন । এই উৎকৰ্ঠা নিজে
কি কৰে দেবীপূজা কৰব ! আমি দেখি
কোন ৰকমে মহাৰাজেৰ যদি একবাৰ দেখা
পাই ।

(সকলের প্রস্থান, ও কিছুপরে রাজকন্তার একাকী পুনঃপ্রবেশ)

রাজা । দেখা পেলেম না, কিছুতেই দেখা পেলেম না! হার! আমার অপরায় নিরপরাধ আশ্রিতদের আমি কিছুতেই রক্ষা করতে পারব না! ওঃ পারিনি,—আর পারিনি! শুনেছি রাজপুত্র পঞ্চদশ আমার চতুঃপাশী—তিনিই তবে আজ্ঞা; আমাকে বিবাহ করে নিয়ে যান,—এই অত্যাচার নিষ্ঠুরতা আমি আর চোখে দেখতে পারিনি,—রাজা বধন রাজধর্ম ভুলেছেন তখন হুজ আমায় আর কি সাধা! এস রাজপুত্র এস—আমাকে নিয়ে যাও, আর পারিনি,—আমি পারিনি—!

(হুজ্বামেরে কণকাল নিতুজ্ঞতা বারণ করিয়া পুনরায়)

কি ভরানক! কাদের ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছি? এই আমার অনাথ সন্তানদের,—অত্যাচারিত ভাইভগিনীদের হৃৎসমুদ্রে কেল রেখে আমি স্থখী হতে চলে যাব? হার! কি করে মুহূর্তের অন্তর আমার এ ভাব মনে এস? তারা যদি অস্তির আগা সহ করে তবে আমি কি তা পারব না! স্থখের চেয়ে সে অভয়ও যে আমার উপভোগ্য? না—চলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব,—অসম্ভব! আমি শুধু বদ্ধ চাই, সহকারী চাই, সহায় চাই। এস পঞ্চদশ এস,—তুনিই তুমি করুণ লবণ ত্রাণবান, তুমি এসে এই অত্যাচার নিবারণে আমার সহায় হও, এস বদ্ধ এস—!

(ঐশ্বর্যমায়ের আগমন—ও বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া রাজকন্তাকে নিরীক্ষণ)

ঐ । কি পূণ্যসহিমায়ী স্ত্রী? দেখলে

ছব্ব আনন্দে আর্দ্র হয়ে উঠে। বর্গের শিশুর ধারার মত পবিত্র সেই আনন্দবারি টেলে চরণ দৌত করতে টুচ্চা হয়।

(নিকটে আসিয়া)

দেবি মন্ডর!

রাজা । (অগত) কে এ সোমামুর্দী, পুণ্যরূপ সুবাসুন্দর? বিধাতা কি আমার প্রার্থনার প্রদর হয়ে একেই আমার সহায় বরূপ পাঠালেন? (একান্তে) কে তুমি তত্র?

ঐ । দেবি, পুণ্যবতি, আমি রামকৈশিক, অপমানার দাস, কোন বিশেষ কার্যোপলক্ষে চরণ দর্শনে এসেছি।

রাজা । বল তত্র কি কাজ?

ঐ । রাজার বিবর্তে অবল নড়ম্বর চণেছে—আমি গোপনে জানতে পেরেছি। প্রজাদের উত্তেজিত করে বিস্ত্রোহিতার উত্তোষ হচ্ছে—অতি সখ্য কাণ্ড আরম্ভ হবে।

(নেপথ্যে নাগাড়ার শব্দ)

ঐ তখন নাগাড়ার শব্দ,—চীৎকারউল্লাস!

রাজা । এ তবে বিস্ত্রোহী প্রজাদের বোষণা—?

ঐ । কিন্তু মহাশয় এ বোষণায় বহির, তিনি ভাবছেন চাহুতাবেদীর মন্দিরে তাঁর আবেশে অপরাধীর বসিধান হচ্ছে। তিনি শত্রুকে মিত্র ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে আমোদ প্রমোদ করছেন। দেবি তাঁকে সাবধান করুন এই মুহূর্তে সাবধান করুন। এই কথা বলতেই আমি এগেছি।

রাজা । ব্রাতঃ, এ-কি বলছ তুমি?—আমিও যে তাঁর নিকট অবস্থানী—এইমাত্র তাঁর দ্বার হতে ডাক্তিত হয়ে আসছি।

ক। কি উপায় তবে? না সাবধান করতে পারলে—হঠাত আজ রাতেই তিনি বন্দী হতে পারেন।

রাজ। জাহাঃ বাও, তুমি বাও, যে উপায়ে পার—তাকে রক্ষা কর।

ক। দেবি, আপনি আমাকে জাতি বলে সম্বোধন করেছেন—আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি। আমার প্রাণে অলীম উদ্ভম, বেহে অমিত বল সঞ্চার হচ্ছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার স্বস্তি সেনা নিয়েও নিশ্চকই এ বিস্তোভ দমন করতে পারব।

রাজ। বাও জাহাঃ বাও, জগদান তোমার সহায় হউন, এ গৃহ অস্ত্রাঘের বিরুদ্ধে স্ত্রীর প্রেরণা,—এ ভয়ে কেবল রাজস্বকা নয় রাজা-রক্ষা, ধর্মরক্ষা। জগদান তোমার সহায় হোন।

ক। চলেন। সন্তানত ব্রুদ করতেই হবে না, তাদের অস্তিত্ব প্রকাশ হয়েচে—এ কথা রাষ্ট্রে হলে আপনা হতেই বিস্তোভ দমন হয়ে যাবে। তা যদি না হয়—শেষ পর্যন্ত আমি সেনাপতিকে বার্ষ্য করতে চেষ্টা করব,—অকৃতকার্য হয়ে যেন না কিরি এই আশীর্বাদ করুন।

(অবনত জাহাঃ হইয়া নমস্কার। দেবীর পূজার মূল নতুকে দিয়া রাজস্বকার তাহাকে আশীর্বাদ।)

রাজ। বাও জাহাঃ, বাও জগদান, কর্তব্য পালন কর—বাও পুণ্যবান,—ধর্ম বৃদ্ধে আত্মোৎসর্গ কর।

ক। (উঠিয়া) আপনার আশীর্বাদে ধর্মের বল—আমি স্বপ্নের প্রতি অশ্রুতে পরমাগুতে অহুতব করছি—।

জগ মহারাজার জয়,—জয় রাজস্বকার জয়
—জয় সন্তোর জয়—জয় জয় ধর্মের জয়!

(প্রতিবাক্যের সহিত স্ত্রীর উত্তোলন এবং শেষে উত্তোলিত স্ত্রীর মস্তকে স্পর্শ করত নমস্কার পূর্ণক প্রস্থান)।

রাজ। হায়! স্ত্রীর তবু আশ্রয় হচ্ছে না,—হঠাত এই বড়বয়ে মিত্রজনই শেষে নিষ্পেষিত হবে!—হয় হোক—তাইতেই বা হঃখ কি! এ মুহূর্তে জীবনের চেয়েও প্রাণীক, স্বপ্নের চেয়েও বরণীক!

(নন্দীর মধ্যে প্রবেশ!)

নবম দৃশ্য।

রাজাঃ পুর। রাজাও মহিষী উপবিষ্ট।

রাজা। মহিষি, আশ্চর্য ব্যাপার! কথা উঠেছে তোমার শিশাহৌদৈল্য দাসদাসী প্রজা-পীড়ন করে,—তোমার জাতি সেনাপতি অবি-চায়ে প্রজাগণকে শাস্তিবান করেন—তোমারি আজার প্রজাদের ঘরে আশ্রয় লাগান হয়েছিল,—এই সব।

রা। মহারাজ! তাই কি তুমি বিশ্বাস করেছ?

ম। আমি বিশ্বাস করব! কিন্তু তোমার তত্ত্ব নামে এই বুধা অপবাদও আমার পক্ষে অসম্ভব কষ্টকর।

রা। আমরা দুর্ভাগ্য! আমি প্রজাদের সন্তান জুল্য ভালবাসি—তবু তারা আমার নামে অপবাদ ঘটায়!

ম। কিন্তু এর ত প্রতিকার করা চাই!

রা। প্রতিকার! কি বল মহারাজ! এর প্রতিকার কি করে হবে, আমার মুহূর্তে ভিন্ন এর প্রতিকার আর কিছুই নেই।

মহা। মহিষি, তুমি কি ভুলে যাও, ও রকম কথাই প্রতিশোধের পূর্য্য আরো জলন্ত হয়ে ওঠে ? যারা একরূপ মিথ্যা রটনার সাহস করে—তাদের শাস্তিবিধানই এর প্রতিকার ।

রা। নিরাহ নির্দোষ সব প্রজা—তাদের শাস্তি দেবার কথা মনেও এমন না মহারাজ ! তাদের কি দোষ ? গৃহ বিচ্ছেদই এর মূল । যে কথা বলতে আমার একেবারেই ইচ্ছা করে না এমনি অশুভ যে বাধা হয়ে দেই কখনো আমারকে বলতে হয় । নির্দোষ প্রজাদের উপর তুমি রাগ করবে তাও ত আমি সহিতে পারি না ।

ম। বল তবে তুমি কি জান মহিষি !—

রা। বলতে যে মুখ বন্ধ হয়ে আসে—

ম। তবু বল, আমার অসুখোদ বল !

রা। তবে বলি—রাজকত্তার শঙ্কতাই এ কথাই কারণ ।

ম। (হৃগত) তা ত আমি বেশ বুঝতে পারছি ।

রা। যদি বলেন তখন সব কথাই পূলে বলা ভাল । শুনাছি—রাজকত্তাই প্রজাগণকে আমার বিকক্ষে উত্তেজিত করছেন । তুমি ত রাজকাণ্ড নিয়েই ব্যস্ত—কিছু ত খবর রাখ না—রাজকত্তাই এ রাজ্যের রাজা—তার মহল হচ্ছে—একটি দরবারস্থান । যত প্রজাদের আদরঅবাধার বিচার পরামর্শ সব সেখানে চলে ।

ম। আর বলোনা—খার । নিয়ে যাও মহারাজি, বিয়েটা বিধে যাও, এ রাজ্য থেকে ছুঁর হয়ে যাক্ ।

রাণী। বিয়ে করলে ত ? তবে আরও

একটু পূলে বলতে হয়—কিন্তু মুখ যে ফোটে না ।

ম। না বল মহারাজি আমার জানা আবশ্যক ।

রাণী। সে পক্ষনদকে কিছুতেই বিবাহ করবে না। ঋষভুমার বলে কে একজন সৈনিক আছে, শুনাছ—তারই প্রতি সে অহুভাগিণী, তাকে রাজ্যে বদানই তার উদ্দেশ্য—!

রা। বিবাহ হচ্ছে না,—বিবাহ হচ্ছে না—আর যতই দোষ থাক, আমার কত্তা সে কখনো হস্তরিজা হতে পারে না ।—

রা। আর্থনা করি মহারাজ, এ কথা মিথ্যাই হোক । কিন্তু সকলেই ঋষভুমারকে তার কাছে সন্নিধা দেখতে পায়—।

ম। যদি সত্য হয়—তাহলে চামুড়ার নিকট বলিবারেই তার আশঙ্কিত,—এই আমাদের বাপের নিম্নম । কিন্তু প্রমাণ চাই,—প্রমাণ চাই ।

(নেপথ্যে—চীৎকারকোলাহল ও নাগাড়ের শব্দ ।)

প্রতিহারিণীর প্রবেশ ।

প্র। মহারাজ—সেনাপতি দ্বারে দণ্ডায়মান ; প্রজাগণ বিদ্রোহী,—

ম। এ আমার কি ব্যাপার !

(ভয়ে উত্তীর্ণ দ্বারবেশে আগমন ।)

সেনা। (অস্ত্রহীন হাতে) মহারাজ—বাক্য বড়বড়,—রাত্রিকালেই—রাজবাটী আক্রমণ করার উদ্ভোগ হ'চ্ছিল ; পৌতোগা জমে আমি পৌতা বাপ করতে পেরেছি ।

ম। সত্য ! কি ভয়ানক ! কে নেতা ?

সেনা। ঋষভুমার । তার দল ছিন্ন হয়ে গেছে—কিন্তু তাকে ধরতে পারিনি,—পে

ভারতী ।

পলায়ন করেছে। তুমি রাজকন্যা তাকে
আশ্রয় দিবে কেন— ।

মা। উঃ আমি যে পাগল হবে যাব! যাও
সেনাপতি—তুমি বিজোহীনের বন্দী কর—
আমি এখন রাজকন্যার কাছে যাচ্ছি।

দ্রুতগদে প্রস্থান।

চাণ্ডী। উঃ বড় ভয়ে ভয়ে ছিলাম,—
কিছু দেখে চাবুতা উদ্ধার কবেছেন—চাণ্ডী-
দিকের নেব কেমন আন্তে আন্তে কেটে গিয়ে
আমার সৌভাগ্য। হৃদাকে প্রকাশ করে
চুকেছে।

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ—)

মা। আর কোক মহারাণীর!

না। বল পবন কি?

মা। পবন কত পলক? এক মুখে
বলা যায় না। একদিক থেকে ফাঁপি, লুল,
কামানফল, খোপাফল।

মা। বল বল ভাল করে বল,—প্রাণটা
প্রফুল্ল হয়ে উঠুক—তুল দেখান হৃদা কিরণে
একটু একটু করে খোলে যেমন করে ছব-
দল বিকশিত হতে থাকুক।

মা। বাবা বলেছিল—মহারাজার চক্ষু

আগুন লেগেছে—তাদের ফাঁদি, যারা
মাহারাজের আবেদনে এসেছিল তারা উত্তেজক
নলে নিক্ষেপিত;—যারা চুপে চুপে আলোচনা
করেছিল তারা বৈজ্ঞানিক। যারা দাঁড়িয়ে
দেখেছিল—তারা বন্দী—

রা। তার পর? এ বিজোহী আবার
কি ব্যাপার বল দেখি!

মা। সেটা এখনো ঠিক বুঝতে পারিনি,
তবে মনে হচ্ছে রাজকন্যাকে ও ফক্সমারকে
জব্দ করার জন্যই সেনাপতির এ আশ্রয় একটা
ফন্দী।

রা। বেশ হয়েছে! ঠিকই হয়েছে।
মহারাজ রাজকন্যার পুরে গেলেন, এখন
তাকে লেখানে দেখতে পেলে চমক!—চাবুতে
দলিত রক্তে তোমার চরণ দোত করব যেন
মহারাজ লেখানে ফক্সমারকে দেখতে পান।
তা নইলে—আমার সমস্ত আবেদন সমস্ত
উদ্বেগ—স্বাধা হবে।

মা। অভিনয়ের সব ঠিক, চলুন—দর্শন
করতে— ।

রা। চল চল আজ আমার জন্মের দিন
বর্ষের দিন! প্রস্থান।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

ছাইজন মহারাজ।

ঐচ্ছিক আইন কমিটির সাধারণ ভাষার আণ্ডা এবং
অভীচা নির্ধক সংকে ভারতবর্ষীয় ছাইজন মহারাজার
বর্ণনা করিয়েছেন, একজন সর্গজন দ্বিত বরদার
মহারাজা ঐল ঐচ্ছিক মহাবিদ্যাও পাইকাওয়াড়,
অন্যটি অধ্যাপকগোবর উদয়পুর মহারাজাবিদ্যাজ
জার কতে পি।

গাইকাওয়াড় লবকে আইন খলন "বরদার
মহারাজা মাট লহন পাটলত বর্ণবাইল ভূমির অধীশ্বর।
ভাষার এলাখাখো বিখ্যাত লক এবং ভাষার
বাংলায়িক আর একত্যাউ মাট লক। ভাষার বিখ্যাত
আলাখা এবং লাকতের দিন সেবিলাখ ভিনি লক
গুজ গাউলগাউলিত বধ্যাকৃতি সবলকারপুতল,
ভাষার চলাকেরা উদাখা আতি লবলজিত।

ইরাকী এবং কাদামী উত্তর ভারতেই অবলীলাভে
জলদগ্ধে তিনি যাকালান করিতে পারেন। দুইবার
আমেরিকা এবং ইউরোপ গণ্ডিট করিয়া আনিয়াছেন।
পুত্রদ্বিগের মধ্যে একজনকে ইংলেতে অত্যন্তকোমার্ডি
বিখ্যাতভায়ে আমেরিকাতে শিক্ষা দিত্তেছেন। তিনি
আমেরিকার রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপাতী।—তাহার বিখ্যাত
ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর যদি কোন দিন পরিবর্তন
হইত তবে তাহা যুক্তকালের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ
হইবে। সকল শিক্ষিত ভারতবর্ষীরেই তার তাহারও
বিখ্যাত ব্রিটন শাসনকর্তাদ্বিগের পক্ষিত সহানুভূতি-
হীন ভ্রূষ ব্যবহারই বর্তমান অসন্তোষের কারণ,—
অবিধাই অবিধানের জন্মদাতা। তিনি জানে
যে সকল সংস্কার করিয়াছেন এবং নিরন্তর করিতেছেন
তাঁহাতে এখনও অবিধানের প্রভাবই অদৃষ্ট হই
কারণ তাহারা অল, কিন্তু যখন তাহারা সংস্কারের
উপকারিতা উপলব্ধি করে তখন অসন্তোষের কোমাই
করিত থাকে না, বরং তখন তাহারা আনন্দিত হিত
কৃতজ্ঞতা প্রাপন করে। তিনি বলেন লতবিন রাজা
এবার কোন লক্ষ্যই নাই, উভয়েই আপন মত শু
ইচ্ছাপ্রণয়ে চল, রাজা এখানে দিকট হইতে রাজত্ব
প্রাপ্ত করিয়াই সন্তুষ্ট ভক্তবিন - রাজকাণ্ডে এমার
অভিযন্তের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না কিন্তু
যখনই রাজা নৃতন আইন করেন, সম্রাট অস্তগত এবং
বর্ধগত বক্তাসভের বিজ্ঞেয় লোকের প্রচার করেন, বাহা
রক্ষা, বিবাহকাল, শিক্ষাসম্পত্তি নৃতন নিয়ম বিধিবদ্ধ
করিতে থাকেন তখনই রাজ্যকে কেবলমাত্র আপন
মত এবং ইচ্ছাপ্রণয়ে চলিলে হয় না, তখন তাহার পদে
পদে প্রজাবিগের ইচ্ছা, মত এবং শাসনপ্রণয় করিয়া
চলা কর্তব্য। প্রাজসেনারীবিগের বর্ধবিধান, জাতি-
ভেদ, শ্রমবিধা, পুষ্কার্ভা অত্যন্ত চিরায়ত এবং
বিশেষনীবিগের সহিত বসিষ্ঠভাবে খেলাধোয়ার বিশেষ
অভ্যাস তাহা তিনি নিম্নলিখিত নীকার করিলেন।
যায়ত শাসনের দিন এখনও বহুদূরে তবে শাসনকর্তা-
দিগের ব্যবহার যদি অধিকতর শব্দ এবং বিধানপূর্ণ
হইত, তাহা হইতে রাজ্যসম্রাট সন্তুষ্ট বসিষ্ঠত এবং
ক্রীতিপ্রদ হইবে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহহইতে নাই।

মুক্তাভিগ।। বিহার রাজধানী উদয়পুর, এই
রাজ্য ১২ সহস্র বর্গ মাইল বিস্তৃত, ইহার অধিবাসী
৪৭ লক্ষের কিছু অধিক, বাৎসরিক রাজস্ব ১২,০০০০
উপরিংক লক্ষ শকাব্দ সহস্র। ভারতবর্ষের হিন্দু রাজত্ব-
বর্ষের মধ্যে উদয়পুরের মহারাণার পদ সর্বোচ্চ এবং
শ্রেষ্ঠ, দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইল তাহারের
রাজবংশ চলিয়া আসিতেছে, এই পুত্রা রাজস্বলয়ের
আদিপুরুষ হুগুণ্ডশাহতলে অধিবাসের অধতার
স্বাধীনতায়। ভারতবর্ষের হিন্দুসম্রাজ্যে তাহার পদ-
খোরবের তুলনা হয় না, তিনি একাধারে রাজা,
শ্রেষ্ঠ পুরোহিত এবং বর্ধসেনতা।

এ রাজ্যে আনুগতিক কিছুই নাই যায়তশাসন
ও শাসনবিগের অধিকার, বিজ্ঞাতের বল কারাবান,
আচারকার অধিনব বিধবানীন রাজনৈতিক
উন্নতি, শিক্ষাবিগের এ সকল সম্পূর্ণ অধাধিত।
সংবাদপত্র নাই, সংবাদ নাই, বাহা আছে তাহা
যায়তগুণবৎ। এখানেকার হালকাগানের বহুদ
শাসনতন্ত্রবিগণিত বহুদর। কোন ব্রহ্ম নাই,
কোন রাজত্ব নাই, এখানে আসিলে জুলিয়া
যাইতে বহু লভ্যতা কত দূর অস্তগর হইয়াছে।
যে দিন পাহাড় হইতে পিকারী কক্ষ্যাত্তের
আগমন সংবাদ লইয়া চুটিয়া আসে সেদিন পুত্র
দুর্ভবান, আড়বহ, আরোহণ, উত্তরণ এবং উৎ-
সার আদিরা উঠে। কাপানের কুণিকল, পুত্র-
পালের রাজ্যবিগণ, ইংলেতের সম্রাটবহ, দিউইজের
নৃতন বিভাগিকা, পায়সা রাজধানীতে প্রজাবিগের
দোহায়া, যাবিন রাজনৈতিক শেতার অগ্রিমাত্রী
ব্যক্তিগার লংবাহ কেহই রাখে না। পরমাত্রা
বিশেষ, পরমাত্রাশাসনপুত্র এবং পরমাত্রাশাসনর
কোন লক্ষ্যই এখানে নাই। কেনই বা থাকিবে,
মহারাজা তাহার অগণ্য আদ্যবস্ত্রীয় একান্ত পুত্র
সেবতা। তিনি বাধ্য করেন, তাহার রাজ্যে বাহা বর্তমান
তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই; পাকিতে পারে
না, প্রজাবগের ইচ্ছাই দৃঢ় বিধান। মহারাণা
লক্ষ্যে কোন রূপ লম্বাশোচনা তাহারের কলনার
অভ্যতা।

ভারতবর্ষীয়ের শীলতা ।

ডেলি কনিফার নামক সংবাদ পত্রে চাণক্যভূত ত্রিংশতি সাতের নিখিলাভেদে "আদি ভারতবর্ষের নামাঙ্কনে বহুকালে ধর্মিণী পঞ্চাশন করিগাতি, এই তমীর্ষ জনকালে ভারতবাসীদিগের আচার, ব্যবহার, বেশ, বাস, জীবনযাপন প্রথা পুণ্যপুণ্যতপে বেশিবার অনেক সুযোগ ঘটিয়াছিল। ঐক্যনৈতিক, ঐক্যনৈতিক, আকৃতিক এবং বর্ষ লক্ষ্যের আলোচনার অবসরে তাহাদের পরিচ্ছন্ন এবং শীলতা পঞ্চাশোচনা করিবার জুড় সুবিধা পাইয়াছিল। বাস্তবানে কিম্বা গোপানে জনকালে জনতাগুরু টোপন জলিলে, জনতা পরিপূর্ণ রামশেখ কত না কত ভাবে ভারতবাসীদিগকে বেশিবারে দিত উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, কত অবসর হইতে বিবাহ, কিম্বা যোবাই হইতে সন্তান পঞ্চাশ সেন মনও কিম্বা কোনও গ্রামে কোথাও কখনও একবারে ভারতবর্ষ শীলতাগুরু কত ব্যবহারের, শুকতিপূর্ণ পোষন পরিচ্ছন্নের লেখ বাত বাতিস্তব বেশি নাই। যে প্রকারে পাই-পড়া অঙ্গ ব্যবহার ইংরেজের সর্বত্র পঞ্চাশের পুষ্টি ও মনের শীলতার কতবার কোন পরিচ্ছন্ন ভারতবর্ষ বেশি নাই। পঞ্চাশলক্ষ হুটন বিনে জনতার মধ্যে ইংলেতে শ্রী পুণ্যের যে অঙ্গ ব্যবহার, যথাবিত্তদিগের যে হঠাৎ নগরি চালের বিনে ঐক্যজনক, বিখ্যাতগণের ভাষ্কর্যের যে পোষারের যত সুশীল আমের আমের, যে ঐক্যের লক্ষ রশ্মি, বেশ বিভ্রমে যে ততি বিচারের সাক্ষ্যে, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে নিত্য অমানিত; একত্র বিশেষী। ভারতবর্ষে বর্ণের অভাব নাই, এমনকালী এখনও অনেক ভেজিণ কোমী দেখতাব। পক্ষে বাধা হুটন করে, অনেকই চুচ বিদ্যাপ পৃথিবী সম্বল, বিদ্যাতর এবং বিশেষবাসীর হস্তাঙ্গ অঙ্কেই আপনাকে কল্পিত জানে প্রান্তিতের আয়োজন করিতে উঠি করে না, তরুত সময়ে কিম্বা বিজনে, রাজবাসী কিম্বা মিথি জনপ্রান্তে জনবিল গ্রামাশ্রমে, কিম্বা জনতাগুরু টোপনগে সর্বত্রই তাহা, পোষন পরিচ্ছন্ন, সন্ত, শুভ, শ্রীল ব্যবহার

দর্শকে বিবৃদ্ধ করে। যে বিবৃদ্ধ প্রাণে, যুগের মেঘতার পথে তক্তিরে অর্থা বিশেষ করে তাহাও বেশ বিভ্রমে বক্তের পুণ্যবাসীর ভার বলাবুদ্ধির, তাহার ব্যবহার আর্থিক সম্বন্ধে সন্ত লক্ষ্যে হুটন ব্যবহার মাধুর্য়মিত। এই জনকালে বেশি বাসীদিগের সহিত এই জাত বিশেষবাসীদিগের ব্যবহার টোপনা করিবার কতবার হস্ত হুট এবং বিনে হুটতে বেশি রক্তালয়ে এবং জননাগে পরিচ্ছন্ন কি বর্ষের ততিবিচার, পাণ্ডালার কিম্বা টোপনে কি অঙ্গ নৈতিক ব্যবহার, দেখানে অনেক নিউটনের পাতিতোর অধিকারী হুটতে আচার ব্যবহারে বর্ষাবাস, একমাত্র সত্যবক্তন টোপন তক্তিপালিনী হুটিকা, সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন তক্তিতে, নিউটন রক্তালয়ের মত অঙ্গনাক্ত হীন। বেশি আচার ব্যবহার তক্তিতে, বর্ষবাস যেন অঙ্গনাক্ত সত্যতার বল, কোনও বেশিবাতি ইংলেজের নির্জনতম হুট পঞ্চাশে বেশিবাতিয়ে যে হুটতি এবং শীলতা স্তম্ভিতের হুট, বিশেষাঙ্গী সত্যালয়ে রাজবাসী জন মনরে অভিজাতবর্ষের আবাদল অঙ্গলোড় জাতি তাহা একত্র নিয়ল।

মৃত্যুর সহিত সম্পৃক্ত ।

কখন করিবার হুট মেঘবর্ষের অধিবাসীপ সম্বন্ধে বর্ষে আচার কিম্বা তক্তিতে, এ এক বিশেষ সম্বন্ধ। কিন্তু একটু ভাবিয়া বেশি বেশি পাই, যে গুণ থাকিলে, যাহু সন্ত হুট, বীর হুট তাহা ইংলেজ চরিত্রে প্রকৃত পরিমাণে বর্ষমান। আদর্শের অঙ্গ সর্বত্র জাপ ও কর্ণবোর অঙ্গ কখন মন পণ ক্রিয়ে ইংলেজ বিবৃদ্ধ হুট না। যে বেশি যে কোন কর্ণব ইংলেজ করিবার তাহা বেশিই মৌল তাহার সাধনে সম্বন্ধ, হুট, প্রস, যার, এমন কি জীবন পঞ্চাশ বিশেষ করিতে হুটিত করে। মৃত্যুবক্তন ইংলেজের উত্তর দক্ষিণ বেশি আদর্শের চরিত্র, সম্বন্ধ অঙ্গলোড়ের পঞ্চাশ, ত্তি ত্তি বেশি উপনিবেশ স্থাপন বাসিন্দা বিচার ইত্যাদি কত কথা বলা যাইতে পারে। এক একটু উৎসাহে তাহা কত কইই না বীকার করিবার কত জীবনই না বিশেষ

বিভাগে; তাহারা যন্ত্রচূর্ণ, কৃষারশ্রাবণ, বিপ্রেবন্ধ, এবং বিপ্রেস্তর মানবের সহিত যুদ্ধ করিতে পরানুগ হইয়া নাই। ইহাভেদে আর এক আশংকিত বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা—বিশেষতঃ যেখানে যক্ষাতি বিপন্ন লোকেরা নীলতম আশা হইতে মহামতি রাজসভার পূর্ণাঙ্গ সাহায্য করিতে যিবা যোগ করেন না।

সম্প্রতি হোয়াইট হেভেন নামক (white haven) করলার বসিতে বিপন্ন উচ্চতর ভেঁয়াজ তাহারা দেশীয় বীরসমকাল করিয়াছে তাহা অজিতর বিষয়েনক। একদিন রাত্রি কাল করিতে করিতে কয়েক জন বন্দকামী মুক্তি পাইল কোথা হইতে যেন দুখ নির্গত হইতেছে। বসিতে আস্তন লাগিবার স্তর বিপন্ন আর নাই, আস্তন লাগিলে উচ্চতর অঙ্গর, দাঁড়াইয়া পুড়িয়া যাইতে হয়। যে করলার পুন মেরিতে পাইয়াছিল, তাহারা ব্যাপার কি জানিবার মন্ত পনিয় বহাওরী স্থল পদে আশিয়া, যে উচ্চতর যন্ত্র দেখিল তাহা বর্ণনা করিত। জনসংবাদক লগ করিয়া বন্দকামীপদ এমিক ভদিক হুটাহুট করিতেছে, কেহ বা দুখে বন্ধ নিখাল হইয়া অজান হইয়াছে কেহ বা প্রাণাণ করিয়াছে। তখন আর রাত্রি দিসহর, তাহারা বাহিরে পনির উপরে ছিল নানাঙ্গণ লগ শুনিয়া বিপন্নের আশঙ্কা করিয়া উৎকণ্ঠা বন্দকামী-বিপন্নের সহিত কথা করিয়া লংঘ্য জানিবার মন্ত উৎকণ্ঠা হইল। বনির দুখ হইতে বারবার প্রশ্ন করিয়াও যখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না তখন তাহারা বনির বাহা অবতরণ করিল। দেখানে কাল চলিতে ছিল সে স্থান বনির দুখ হইতে কেহ কোন দীর্ঘ, অবতরণপ্রস্তা বরা বন্দ লোকেরা পৌছিল তখন দেখিল দুখে চারিদিক আচ্ছন্ন এবং তাপ এত অধিক যে দাঁড়ান অসম্ভব। তবুও তাহারা নিশ্চিন্ত যত্ন জানিয়াও বিহু না হইয়া অঙ্গর হইতে লাগিল, দু একজন অজান হইয়া গেল। বলের বেতা বন্দ দেখিলেন আশ্চর্যে প্রবেশোপযোগী পরিচ্ছন্ন ও অগ্নি নির্মাণের মন্ত বলের স্থলীয় পাইল লগে নাই, তখন আর অঙ্গর হওয়া অসম্ভব

বিবেচনার আবার উপরে ফিরিয়া আসিলেন। বাহিরে বারোটা ছিল তাহারা যখন শুনিল বসিতে আস্তন লাগিয়াছে এবং তখনও ১০ জন বন্দকামী দেখাযেই পড়িয়া আছে বহু পুড়িয়া মরিভেয়ে কিবা মরিয়া পিয়াছে তখন যে আশঙ্কিত উঠিল তাহা কলনা করা যায় কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। তাহাদের অগ্নি সমাধি হইতেছিল বাহিরে তাহাদের আশ্রয়স্থল নাহা, তপিনী, ছবিয়া, পত্নী বারবার ব্যাকুলতার সহরে বলিতে লাগিল, আশ্বাসের দাঁতে দাঁত, আশ্বাস তাহাদের রক্ষা করিবা জানি, পনি তাহারা মরিয়া পিয়া থাকে তবে আশ্বাসের সহরই প্রের। আশ্বাস কয়েকজন অবতরণ লগে আরোহণ করিয়া বনির মধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু তাহাদের অধিক দূর নাগিতে হইল না, অর্ধ কোণে থাকিতে না নাগিতেই আর লকলেই অজান হইয়া পড়িলেন, তখন তাপ এত অধিক যে অগ্নিপ্রাণত শৌর আশ্বাস উঠিল হইয়া বাহার চুল লগ পুড়িয়া বাইতে লাগিল, উপরে উঠিয়া আশ্বাসবাহ বন্দকামীদের কয়জন রক্ষা পাওয়াছে মনে করিয়া লকলে আশ্বাসলাগি করিয়া উঠিল কিন্তু অধিকবে আশ্বাসবিপন্নের প্রম আশ্বাসে পারিয়া তখন করিতে লাগিল। উচ্চতর স্তর যে করলার নাগিয়াছিল তাহাদের আর লকলেই অজান এবং দু একজন যন্ত্র অবতরণ করিয়া আসিল। তবুও নিরস্ত না হইয়া বন্দ লগ লগ বনির স্তিতর নাগিবার চেষ্টা করিলেন। যখন প্রত্যেক বারই তাহারা বর্ণ-মনোরম, অজান ও যন্ত্র অবতরণ করিয়া আসিলেন তখন যোকা গেল আর কোন আশা নাই।

আশ্বাসের শিশুপুরুষলগে স্ত্রীলোকেরা আসিলেন। কর্তব্যের মন্ত, বর্ধে মন্ত, এগ বান করাই কীরনের দার্কতা তাহারা তাহারা দেখাইয়া পিয়াছেন, তাহাদেরই দীক্ষা, যত্নের লগন কিবা পত্নী পতন, আশ্বাস যে মন্ত স্ত্রীলোকি তাই এই অধোপতি। হাং আর ভাঙতি ও গুস্ত হওয়াতেই আশ্বাসের বীরত্ব। এই স্ত্রীলোক বন্দা সস্ত্রীলোকের মধ্যে বর্ধের আদর্শ ক্রিয়ণ কীর হইয়া পড়িয়াছে দেখিলে জনর বস্তাই দেখনাপূর্ণ হইয়া উঠে।

মোহনবাগান ফুটবল-দল ।

আমাদের বাড়লামেপে ইংরেজদিগের ক্রীড়া মনো-
ভাল মনোর ফুটবল ক্রীড়া থাকিলেও এ পর্যন্ত কোন
মনোর ক্রীড়া 'চ্যালেঞ্জম্যাচ', নামক শ্রেষ্ঠ লড়াই
লাভে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু আমদের বিদ্যমান এমন
বাড়ালী ফুটবল দলের খোঁজ মোহনবাগান ফুটবল
ক্রীড়া তিনটি বিভাগে ইংরেজ ফুটবল স্ট্রীকে ফিচার
পরাক্রম করিয়া সেই ইংলিশ 'চ্যালেঞ্জম্যাচ' আদিকার
করিয়াছে।

এই প্রতিযোগী ফিচার বেশিবার মাত্র স্থলভূম
হইতেও লোক আগিয়াছিলেন। এবং সেগে লোকের
দিশ ময়দানে বেগম বিপুল জনতা হইয়াছিল তাহা
অস্বপ্ন বলিলেও সত্যিকার হয় না।

মোহনবাগানের এই ময়দানে এ দেশবাসীর
অনেকেই আসিলে আগ্রহের হইয়া পড়িয়াছেন।
অন্য একজন ভাবার্থিগণা স্বাভাবিক বটে। কিন্তু
আমাদের এই গ্রন্থ সাংখ্যে একজন আমদানি-দল
অপেক্ষা ভাষের সম্বন্ধেই বাড়িল। সময়েই পক্ষিসকল,
উচ্ছ্বাসে অগতঃই আগ্রহ। এ বিষয়ে ভাষান
আমাদের লক্ষ্যের যোগ্য। ফুটবল ফিচার কথা
হুত থাক তাহার বড় বড় মূল্য করিতেও জগৎ
উল্লাসআবেশে বেগম করতাবে সংগত করিয়াছিল
তাহাতেই তাহার যৌবন আদিকর পক্ষি-
হইয়াছিল।

ঊপ

ইংলণ্ডে ভোটপ্রার্থী মহিলাদিগের
শোভাযাত্রা । (নিলাত পত্র)

১১ই জুন পনিবার ইংলণ্ডে উক্ত মহিলাদের
শোভাযাত্রা বাহির হইয়া 'ডব্লিউমিউনিট' হইতে
'মালবাট হলে' যাত্রা করিল। সে কি অস্বস্তপূর্ণ
সমারোহ! সাত মাইলব্যাপী মোদেগণ।

এই শোভাযাত্রা উপলক্ষে এত জনতা হইয়াছিল
যে ভাষার মধ্যে একবার অধিক করিলে বিক্ষুব্ধ
হওয়া হইয়াছে। পাড়ী খোড়া অপরূপ চলিতেছে,—
বোটায়ের ক সংখ্যাই হয় না। কিন্তু এজন্য বিপুল

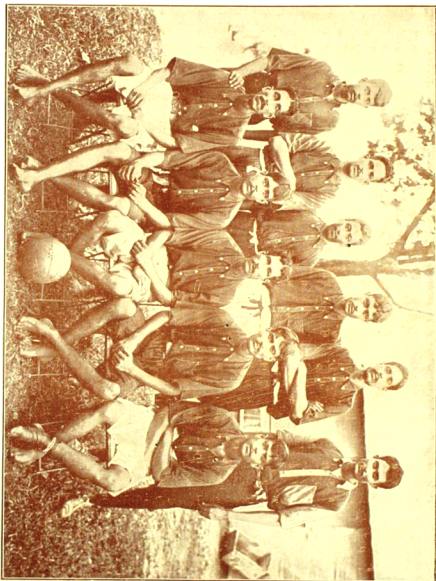
জনতারও পলিদের অসংখ্যে পাড়ী খোড়া।
যাত্রায়ের কোনই অসুবিধা হয় নাই। পাড়ীকে
সীলোকে সংখ্যাই অধিক—কাহারো বন্ধে সফরেমিউ-
নিটের বিশেষ চিহ্ন (খাত) খোড়া শাইতেছে কেহ না
নিয়ম রাখ করিয়া আরোহ আবার কাহারও হাতে
'Votes for women' ক্রীড়া বিস্তারের ব্যাপ।

মোদেগণের এতোক লাইনে পাঁচজন করিয়া
সীলোক নিশানবস্ত্রে চলিতেছিল। সে এক
অভিনব দৃশ্য। বেশিলে জ্বর উৎসাহে করিয়া উঠে।
এবং এ দেশের মেয়েদের কঠোর সাধনা ও সৃষ্টিভা
বেশিয়া বিশিষ্ট হইতে হয়। সমাজিকদের এই
অভিচলিত সাধনা কল্পে ভবিষ্যতে যে সিদ্ধিলাভ
করিবেই তাহারে সন্দেহ নাই। অনেকের
মনে হইতে পারে ভোট দেওয়াটা এমন কি অস্বস্ত
পদার্থ যে তাহার মাত্র এক হাকাম। কিন্তু বারী
কাজির জব্বের ভাব আমদের হইতে বিস্তার।
তাংরা লক্ষ্য-বস্ত্র বস্ত্রী উচ্ছ্বাস উত্তম না কেন একবার
দশি তাহা আদর করিতে ইচ্ছা করে, তাহার মাত্র
তাংরা সব করিতে পারে। এই যে একমিষ্ট অস্ব-
বসায় এইটুকুই আমদের শিকার।

বিলিতে আর আর চলিণ বন্দর ধরিত্রী সীলোক-
দের এই অস্বস্তপূর্ণ চলিণা আসিতেছে। রাজনীতি
ক্ষেত্রে সীলোকদের অধিকার লাভের মাত্র ১৮৬৬
বর্ষে সর্গশ্রম জনহুঁতাটবিল রক্ষণের আদিত
এক আবেদনপত্র পাঠাইতে পারিল করেন। সেই
অস্বি এই অস্বস্তপূর্ণ চলিণা আসিতেছে।

সমাজিকদিগের একটা বিশেষ আগ্রহের বিষয় এই
যে, তাংরা-সকলেই একটা না একটা কাজে লিপ্ত
আছে—বিন' পরিচালনে কাহারও সময় অতিবাহিত
হয় না।

এই অস্বস্তপূর্ণের বার্ষিক এখানে উদ্যোগী
তথ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য (Mrs. Pankhurst) ও
মিসেস ড্রেসপার্ট (Mrs. Drespard) নাম বিশেষ
ভাষে উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগকে এই অস্বস্তপূর্ণের
আগন্তুক বলিলেও অস্বস্তিক হয় না। মিসেস
প্যাংকহার্ট' ক্রীড়া পক্ষিত হয়। সে সময় কল্যাণী



স্ট্যাণ্ড সাইকেন কোং

আমাদের নিকট সকল রকম উৎকৃষ্ট সাইকেল এবং সাইকেলের
সরঞ্জামাদি সুলভে পাটবেন।



বিশেষ ব্যক্তিত্ব।

সবচেয়ে যথেষ্ট উপায় মত পোষণ করিতেল। তাহার পর ১৯০১ সালে ইহার সুবর্তী কন্যা ক্রিষ্টাবেল (Christabel) লন্ডনস্থিত বিশেষ লসপুষ্টিরূপে উন্নত-প্রায় হইয়া উঠিলেন।

ক্রিষ্টাবেল আইন শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার একান্ত ভালবাসা ছিল Lincoln's Inn এ প্রবেশ করেন। ব্যাবিটোরি পদ্ধতির অনুসন্ধান পাইলে তিনি যে একজন অতি বিচক্ষণ ব্যাবিটোর হইতে পারিচেন সে সবকিছু কেবল সম্ভব ছিল না।

আল লন্ডনেরইন্ডিয়ান কলেজ এক লক্ষ পাউণ্ড অর্থ লক্ষিত হইয়াছে কিন্তু ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে বেদিকা Annie

Kenney মিলের কাম্য ভাণ্ড করিয়া লন্ডনের নারী সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়া লক্ষ প্রদান করেন তখন তাঁহার হাতে দুই পাউণ্ড মাত্র ছিল। এই আশি কেরি ও বিশেষ প্যান্ডার্ট এবং তাঁহার কন্যা কন্যার কার্যে লক্ষ হইয়াছিলেন।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক বাবিনতার নীতিমতে ইংলণ্ডেও নারীশ্রমের বাবিনতামতেও মাত্র চোর-তরুর শ্রম কার্যে লক্ষ হইতে হইয়াছিল। বর্ষে আশাত পড়িলে সুখিণীর সমস্ত পুত্র্য লাভই লবান মূর্তি বাবন করেন। তখন তাবতখন ও ইংলণ্ডে প্রত্যেক লক্ষ লক্ষ থাকে।

রাজকুমার এডওয়ার্ডের যৌবরাজ্যে অভিষেক।

জ্যেষ্ঠ নার্সিংকনভালী পূর্বে ইংল্যান্ডীয় ক্রীড়া এডওয়ার্ড বীর মেজাজে আগুন পুত্রস্বপ্ন এবং দুইবর্ষব্যবসায়ী রাজত্বব্যবসার মধ্যে স্রেষ্ঠ সামরিক পুঙ্গবদ্বিপকে লটরা একটা বীর সন্তানস্বরূপ গড়িত করিয়াছিলেন।—এই সন্তানস্বরের নাম Knights of the blue Garter—নীল আশ্রয়কর্তার বীর পুত্র। উইন্ডসর জ্যালেমে দেউ জর্জের (St. George) উৎসব দিনে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়।

১০৪৪ খ্রিস্টাব্দে ১-ই জুন উক্ত উৎসব বিষয়ে বীরেশ্বরী ক্রীড়া ওডওয়ার্ড এবং তাঁহার পোতনা রাজ্ঞী বংশধার বীণেশ্বর এবং তিন পত্ন স্রষ্টা অতিথ্যঃস্বয়মীশ্বর পবিত্র হইয়া নব প্রতিষ্ঠিত দেউ ভক্ত ভক্তমাগে উপস্থিত থাকিয়া এই সন্তানস্বরের এবং স্বামীর করেন। সেইদিন তৎপক্ষের তেজোবীজ রায়পুর ওডওয়ার্ড এখন তলেস প্রবেশের দৌরগাজো অধিনিক্ত হন। এই বীরসন্তানস্বরূপ প্রতিষ্ঠার পর যত পত্নী পত্ন হইতাকে ততুৎ সে উৎসবের উপস্থানিতু হোম আভিভ অসমাপ্তিত হয় নাই, পর ১-ই জুন তারিখে ভারতলভ্যের এবং পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক উৎসব। উক্ত পুরাতন অনুষ্ঠান অনুসারে নয়া সমাগোয়ে সমাধা হইয়াছে।

উইন্ডসর জ্যালেমের অব্যাহিত দেউ সিংহবার নিরা বহনগোত্র বৈরগোত্র বনন বসিগোত্রবৈরগোত্র করিয়া তাহারের বীর কাকনগর অসজ্ঞ এবং পিয়ারের গবহাশোলিত গুহ পক্ষগোত্র বর্ষালোকে অবিকল্প উজ্জল সনোহন গোত্রা বারন করিয়াছিল। সিংহবার অতিশ্রম করিয়া সপুত্রের প্রাথম পাদপদভিত্ত আক্রমণ তাহার কিল্লকন বিশ্রাম করিল। তখন তাহারের বৃদ্ধি সন্দেহ উদ্ভূত অসিক্রমক পুথ্যালোক বিভ্রান্ত হইয়া সম্রাটের আগমন পদ বেন বীরকফালার সন্মিলন করিয়া তুলিল, রাজকীয় ভৌতবাদকরণ বর্ষ পরিক্রমে সম্মিত হইয়া

কিরদুই অবস্থিত ছিল, আর একবল স্রোতবদ্ধ গোত্র পুত্রব বার পত্নী সনক মজিরের পত্নিন বার সপুত্রীন শোণান স্রোতের উত্তর পার্শ্ব বহিকার করিয়া দত্তারমান ছিল। ইহা তিন বক্তব্যের পরিচিত একবল সৈন্যক বহিরকরণ স্রোতবদ্ধ তাহে বসস্থিত ছিল, তাহে পঃপলের উপর এই বক্ত পরিক্রমের গোত্রা বিভাগ বর্ধিত হইয়াছিল।

তখন সুকিরে বহু বটা একত্রে বাসিয়েছিল, তাহারের স্রোতায় পত্নীর লম্বায় বিনোদে গারিবিক পরিপূর্ণিত করিয়া কখনে বহু পুরাতন স্রিহ স্রুতি জাপকক করিয়েছিল। বহু হইতেছিল আবার স্রুতি কবিরে স্রোতায় এবং উপস্থানকার ওলটটার স্রুতি বর্ধিত বিনতিলি করিয়া আনিয়াছে। ইংলণ্ডের স্রোতবহন স্রোতবহন উইন্ডসর রাজমালাবের অভ্যন্তরে বেনিন যে বোহন স্রোতের স্রোতবহন হইতেছিল তাহা বর্ধনা করিতে স্রোতবহন উৎসাহী হইতেন সনোহ নাট, সে স্রোত বক্ত তাঁহারি স্বাধোহ বিখ্যাতুল্য স্রোত উৎসাহকরণ প্রতিষ্ঠিত হইত। রাজকীয় পরিক্রমে সম্মিত সম্রাট সম্রাটী বার্য স্রোত সহকারে সিংহালন গুহে আগমন করিয়া রাজমালা উপবেশন করিলেন এবং ঐতিহাসিক আর্থাররাজবর্ধিত গোত্র টেবিলের গারিবিক নির্মিতা তাঁহারি বীর অনুভবগর্ভ 'ল্যানসিনগট' প্রভৃতির ভার সেনের রাজা ম্যাক্সুয়েল, ম্যাক্সুয়ার আর্থার, ম্যাক্সুয়েল ডিকন জন কনট এবং রাজস্রোত বৃদ্ধিমান দত্তারমান হইলেন। তৎপরে এই পত্নীর সন্তানস্বরের যিনি অসমী প্রাণ আলভেস্তে বট তিন একে একে অস্বোবিনতি জন বীরকে ম্যাক্সুয়েল অস্রম করিলেন। ইহারো পক্ষ আগুন আগুন নির্দিষ্ট স্থান প্রদান করিলে পর, ত্রয় ভগলাদ, লসন এবং ম্যাক্সুয়ার আর্থার স্রোতবহন এডওয়ার্ডকে সিংহালন গুহে লইয়া আনিলেন। তত্ক্ষণ স্রোতবহন বহন পত্নীর স্রোত বীর পক্ষকরণ গুহের বহু অস্রম হইয়া সম্রাটকে অভিযানবহনকরণ করিলেন তখন সম্রাট সম্রাটী

এবং উপস্থিত সকলেই দণ্ডোচ্চান হইয়া তাঁহাকে
 আগন্ত সন্মান্য জ্ঞাপন করিলেন এবং সম্রাট পঞ্চম
 জর্জ বাহু সন্মান্য করিয়া পুত্রকে টানিয়া লইলেন,
 এবং আগমার দক্ষিণ পার্শ্বের আসনে উপবেশন
 করাইলেন । হুজুরিয়ার পরিচিত ক্রম আলসেস
 তখন কোন যুগ্মে প্রথিত একটি জাপ্রবন্ধ (Garter)
 সম্রাটের হস্তে আনিয়া দিলেন । কোন যুগ্মের এই
 জাপ্রবন্ধ বাহু পুত্রের সোঁত বীর সম্রাটের বিশেষ চিহ্ন
 বস্ত্রণ ; পঞ্চম জর্জ বহু আনন্দিত করিয়া পুত্রের যাব
 জাপ্রবন্ধ যখন তাহা পানিরা দিলেন তখন রাজ পুরোহিত
 বলিলেন—“ঈশ্বরী শক্তি আবার পরবেতেরে মরিয়া
 এবং বর্ধবীর দেউ জর্জের স্মৃতিসম্মান প্রকার
 জ্ঞত, এবং তোমার বন্যকাম্যদার এই হুজুরিয়ার
 সোমার বাহু জাপ্রবন্ধ বস্ত্রণ করা হইল । পবিত্র
 এবং সোঁত বর্ধীর বীর সম্রাটের চিহ্নবস্ত্রণ ইহা
 তুমি সজ্ঞত বারণ করিবে—কখনো বিস্ত
 হইবে না, কিংবা ইহাকে বহু বিস্তৃত করিবে না—
 ইহার পূর্ণাঙ্গ সোমার জ্ঞতের সাধন এবং শরীরের
 বন লভ্যর করিবে এবং যে মহাজীবন সংগ্রামে
 তোমাকে সজ্ঞত দিলুত থাকিতে হইবে তাহাতে
 রক্ষাকবচ বস্ত্রণ এই বস্ত্রণ তোমাকে নিয়ত বিস্ত
 রহিত এবং জ্ঞতরূপ করিবে ।” রাজপুরোহিতের
 আশীর্বাদ উচ্চারণের অব্যবহিত পরেই সম্রাট পঞ্চম
 জর্জ তাঁহা পক্ষে বর্ধবীর সর্জের স্মৃতি সম্বন্ধিত
 মনি আশিকা বস্ত্রণ পদক, যৎক হীক্ষ তারকা এবং
 কণ্ঠে হুজুরিয়ার পোলাগ পুন্সের মানিকা পরাইয়া
 দিলেন—সর্বপক্ষে সুবর্ণাঙ্ক শিতার সমুদ্রে নতজাপ্র
 হইলে তিনি ভরবারিয়ার বাহু পুত্রের বস্ত্র পূর্ণ করিয়া
 বলিলেন—“বর্ধীর সোঁত বীরসম্রাটরূপে তত্তন
 যাব উপাস্য কর ।” এইরূপে প্রাচীন বহুবিধ অনুষ্ঠানে
 উপসারে রাজপুত্রের দৌলতগোষ্ঠী অতিথিও সম্পন্ন
 হইয়া গেল । এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পর
 তাঁহারা সকলে রান্স আশায়েত বাহিরে আগমন
 করিলেন এবং সোঁতরূপ হইয়া বীর ভাবে ভজনালয়
 অতিথুগে যাত্রা করিলেন । দেহরক্ষকদিগের উদ্ভে
 উত্তোলিত অব্যবহিত অসিন্দকে স্থানালোক বিজ্ঞপিত

হইয়া সমুদ্রের পথ সমুদ্রল এবং মহতাল পরে
 বীরসম্রাটরূপে অতিথাতদিগের স্থান পরিজ্ঞান
 সর্বকবিগের বস্ত্রন মূর্ত করিল । সর্পি এখানে উইট-
 সয়ের চতুর্ভুজ দ্বা হুজুরিয়ারবাহী খোচ্ পুত্র উচ্চল
 প্রবর্তনীত সম্রাট পোঁত হইয়া তৎপক্ষে ইরক,
 উইটসার, রিভন এবং সর্বপক্ষেতার চারি জন
 রাজপুত্র ইংলণ্ডের বট পুরাতন পত্র সমুদ্র বহন
 করিয়া এবং সর্বপক্ষে লন্ডন সিটিগে বেষ্ট্রাং
 দুই দুই জন করিয়া এই সম্রাটের হুজুরিয়ার
 জন বীর জ্ঞতরূপ হইলেন । ইহাদের মস্তকে
 উত্তমকীর গুণ পঞ্চপোঁতিত কৃত্যবর্ণ সম্বন্ধের
 টুপি, যৎক বীরবর্গের অতিমানের বট বীর জ্ঞতরূপ
 তাহার উপরে বোঁত অব্যবহিত বর্গের অব্যবহিত উচ্চল
 কোট—কণ্ঠে প্রবর্তনীত,—সর্বপক্ষে হুজুরিয়ার
 চিহ্নিত এক এক মানি জ্ঞতরূপ বট বেষ্ট্রাইতে-
 ছিল । ইহাদের পশ্চাতে রাজকীয় বাটপদ আশিত
 ছিলেন । উইটসার রাজসাম্রাজ্যের সাতারন, দৌলতাল,
 পঞ্চাঙ্গলো পণ্ডিতসম্রাট বর্ধকমতলীর স্মৃতি সর্পি সম্রাট
 হুজুরিয়ার জ্ঞত বীরসম্রাট, পাওম্ব পোঁতের
 হুজুরিয়ার রান্স প্রাচীনলোকের মিকে মাত্ত হইয়াছিল ;
 তৎপক্ষে তাহা বাইটপক্ষে সজ্ঞত সম্রাট ইংলণ্ডের
 আশা এবং তাহার খোঁতর তৎপক্ষে সম্রাটের
 স্মৃতি সর্পি হইল । এই পরিজ্ঞানে তাহাকে বটুই
 জ্ঞতরূপ বেষ্ট্রাইতেছিল—তাঁহার বিপ্লব সাতকুল বর্ধন
 জ্ঞতরূপের আশা এবং পোঁতবর্ধীত মূখ সেমি
 বেষ্ট্রাইতে যে সে বটু । সুবর্ণাঙ্কের পশ্চাতে
 বাইট সম্রাটের সম্রাট বীরপদ তৎপক্ষে সম্রাট
 বর্ধিত । তৎপক্ষে উপস্থিত হইয়া সাতকুলদিগের
 স্মৃতি সর্পি সাতকুল এক মিকে, সুবর্ণাঙ্ক অপরদিকে
 বসিলেন । তাঁহাদের চারিবিধে বিভিন্ন বর্গের
 বিবিধ পতাকা আশাশিত হইতেছিল, সাতারনের
 বিভিন্নবর্ণ কানের স্যা পিরা স্থানালোক আশিয়া
 স্মৃতি স্মৃতিগে যেন অগোষ্ঠা সাতকুল পূর্ণ দল জ্ঞতাইয়া
 দিয়ারিল ।

তখন হুজুরিয়ার বন্যায় সজ্ঞতের স্মৃতিসম্রাট পরিপূর্ণ
 হইল । সম্রাট সম্রাটী সুবর্ণাঙ্ক এবং অতিথাতবর্গের

অধ্যয়ন পূর্ণ করিয়া বহু গুরোবিত্তের সহযেত্ব কণ্ঠে
আর্থনা পানিত হইল। "হে বিশ্বদ্রষ্টা স্বামীমণ্ডিত-
শালী কেশবদেব বর্ষণ কর তোমার অশ্রু করুণা,
রক্ষা কর আমাদিগের শাসনকর্তা আমাদেব বহু
পুরাতন রামকণ্ঠিস্তব বাক্য পঞ্চকক মাজো-
দরক; নিরবিত্ত হইক তাঁহার চিত্রা এবং তাঁহার
কন্যতা, তোমার অনন্ত বহিমা অচায়ে। তোমার
পতি তাঁহার বাহকে বলশালী তাঁহার চিত্তকে
অবিততেষ্য এদান করুক; তাঁহার প্রাণের শাসন

যেহ অক্ষর যাকে; হৃদয়, শীতিল, অদ্বার এবং
স্বর্গে যেন তাহলে আলোকে নির্ভর হয়। এই ধর্ম
বীর সন্তানগণে বাঁহাও তাঁহার সত্য এবং সহায়
তোমার অশ্রু দরহে তাঁহারের সকলের এবং
অতোকের বর্ষ বহন যেন দূর হয়, বৈধে, মন্থে,
এবং নৃত্যের তাঁহার যেন এই বিশাল মাজো-
দর এবং ব্রহ্মান রক্ষা করিয়া কালে কালে
একশালিত করেন।

উদীয়মান কবি ।

শ্রীমতোজ্ঞানাথ দত্ত ।

বঙ্গসাহিত্যের শৈশবসময়ে যোগকল
মনসী তাঁহারের 'মনীষা' সকারিত করিয়া
বঙ্গভাষার অমূল্যগণ কার্যে জীবন উৎসর্গ
করিয়াছিলেন বঙ্গীর অক্ষরকুমার দত্ত মহাপর
তাঁহারের অশ্রুতম। তাঁহারই পৌত্র
সত্যোজ্ঞানাথ দত্তদেবের সাহিত্যক্ষেত্রে অতীর্ণ
হইয়াছেন—কিন্তু ভিন্ন ভাবে। অক্ষরকুমার
বীরাবাস্ত গদ্য রচনা, নূতন শব্দ সঙ্কলনে,
এবং বিদেশী জ্ঞানপ্রভাব সংগ্রহ প্রদানে
বঙ্গবাসীকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন,
আর সত্যোজ্ঞানাথ মধুরমলিত গদ্য রচনা,
মথ্যলোপ্য শব্দচরনে, এবং বিদেশী ভাবপ্রভাব
বিচিত্র সংগ্রহে বঙ্গবাসীকে চমৎকৃত করিয়া
তুলিয়াছেন। সত্যোজ্ঞানাথ বঙ্গের নবীন,
তিনি সবে পাঁচ বৎসর বয়সে সাহিত্যক্ষেত্রে
যেথা দিয়াছেন; কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার
কবিত্বশক্তি বঙ্গবঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া
পড়িয়াছে। ইহারও মূলে তাঁহার পৈত্রিক
উত্তরাধিকার। একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধনা,
পাঠ্যাহার, আত্মশক্তিতে অবিচলিত নির্ভর,

স্বাধীন ও চিত্রাশ্রুত মতপোষণ ও প্রচার
প্রকৃতি যোগকল গুণ অক্ষরকুমারকে
তদানিন্তন কালের বহু সাহিত্যলেনকের উঁকে
তুলিয়াছিল, সেইসময় গুণ সত্যোজ্ঞানাথ
বর্তমান থাকিতে তিনি এত অল্পসময়ে মধ্যে
এত প্রতীক্কাপিত করিয়াছেন। কবিত্বের
প্রগোড়ন মাদিকপত্রের চেউয়ের সাধার
লগ্নুহু ফেনের মত অকালে তাঁহাকে
নাচাইয়া লইয়া ফিরে নাট; তিনি গোপন
সংগত সাধনাও ফল যেদিন 'বেগু ও নীপা'র
মধুর স্বভাবে ঘোষণা করিলেন সেদিন
পাঠকমহোদেই কোমলপ্রভ প্রভাপতিয় মত
এই নবীন কবির চিত্তশোভণের বিচিত্র
পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া
থিয়াছিল। বিশেষকৈ নূতন চোখে দেখিবার
বল, মিষ্ট শব্দের মোহনচরিত পটুতা,
স্বাধীন ও স্তম্ভিত মতপ্রচারের সাহস
তরুণ কবির কিশোর কাব্যখানির পক্ষে পক্ষে
হয়ে ছয়ে। তারপর 'বোধনিধি'র পূর্ণ
ভেদবী আলোকে কল্পনা ও উচ্চচিত্ত

বিচিত্র সমাবেশ, উদ্বোধন, নির্ভীক স্বাধীনতা বঙ্গবাসীর পূণ্যভিক্ষাক্ষেত্র জন্ত বৈদ্য নানী
উজ্জ্বল হৃৎকান দেখা দিগাহে। ভাবপব কবি তাঁরই জলে তাঁরই পোনার কলস ভরিয়া-



বৈদ্যোক্তমাল দপ

হিসেন, বৈদ্য সেই 'ভীর্থ-সংলগ্ন' বঙ্গবাসীর ভাবের ব্যাখ্যাবী বিতরি 'ভীর্থবৈদ্য'।
চরণাশ্রিত হৃৎকান কবিকে অমর করিগাহে। বঙ্গবাসীকে নিজের ভীর্থবাত্ম্য পূণ্যকলসটি
অর্থনয় কবির বিরক্তি নাই; "ভাব-নগরীর করিগাহেন। এমন হৃৎকান মনোজ সংগ্রহ

পুথক ইংরাজির মত সম্পূর্ণ সাহিত্যেও নাই, ইহাটো আমাদের ও কবির অধিকতর গৌরবের কারণ; বাহা ব্যতিক্রমে ছড়াইবাছিল ভাষারই সমষ্টি করিয়া কবি বিশ্বমানেবের, সভা অসভা সকল জাতির চিন্তা ও ভাবের লব্ধি আমাদের লিঙ্গের সম্মান করিয়া দিয়াছেন। এখানেও কবি যে কাব্যচতুষ্টয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান দুখানি মৌলিক এবং বেশ দুখানি অমূল্য। কিন্তু ইহা অমূল্য হইলেও কবির নিজস্বীকৃত। এইকণ অমূল্য যেন—

"The poetic transfusion of poetic spirit from one language to another, and the re-representation of the ideas and images of the original a form not altogether diverse from their own...It is the work of poet inspired by the work of a poet; not a copy, but a reproduction; not a translation, but the re-delivery of a poetic inspiration."

কবিসম্মতি প্রকৃত স্বাধীনতা ঠাকুর

মহাপ্রভু ইহার অমূল্য লব্ধি এই কথাই যেন—

"কবিতাগুলি এমন সহজ ও সরস হইয়াছে যে ইহার অধিকাংশকেই অমূল্য বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং রস কোনো মতেই অমূল্যকে দ্বিক মত লক্ষ্য করা যায় না—কিন্তু ভোমার লেখকগুলি মূল্যে ব্রতব্রত প্রদান করিয়া স্বকীয় রসমৌল্যের ছুটিয়া উঠিয়াছে—আমার বিশ্বাস কাব্যমূল্যের বিশেষ গৌরবই তাই—তাঁহা একই কালে অমূল্য এবং নূতন কাব্য।"

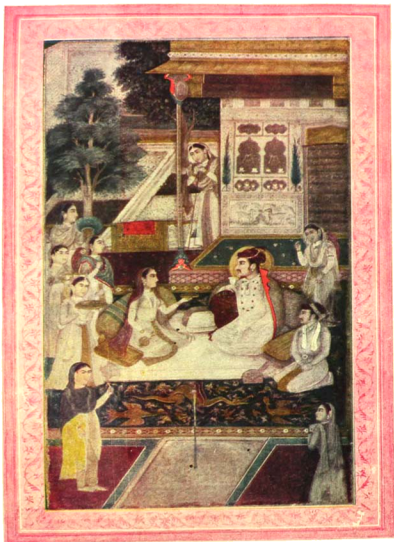
কবির অমূল্য ও মৌলিক কবিতা রচনার বিধান নাই। আগামী পুস্তক পুস্তকেই ভাষার মৌলিক কবিতার পুথক 'হুলের মঙ্গল' প্রকাশিত হইবে। এবং আগামী বহুদিনের সময় আর একখানি মৌলিক কবিতার পুথক 'কুহ ও কেকা' প্রকাশিত হইবে এজন্য সম্ভাবনাও আছে।

আমাদের 'ঐতিহাসিক ও ভাষিক', কবি নব নব রসে বর্জিত পাঠকের তৃপ্তিসাধন করিয়া দীর্ঘ জীবন ও স্বাধীনতা লাভ করুন।

সমালোচনা ।

ভাগ্যচক্র ।—(উপভাস) প্রকৃত বর্ণনাগত পদ্যোপাখ্যান। কাহিনী যেন সুসজ্জিত। ইতিবাচক পরিণতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এনিম্ন ডক্টর উপভাসকর লুই কুপারস প্রণীত Noodler প্রণেয় ইংরেজী অবলম্বনে 'ভাগ্যচক্র' রচিত হইয়াছে। মানবজাতির বিভিন্ন ভাবের লব্ধি পরিচয়

দেখাইতে লক্ষ্যী, ডক্টর, ওপার প্রভৃতি এনিম্ন উপভাস-কাহিনীর কৃতিত্ব অবলম্বন। "ভাগ্যচক্র" উপভাসে, উপভাসকর লুই, আত্মনির্ভরতাধীন বহু ব্যক্তি, সমস্ত ইচ্ছা, কল্পাবলম্বন ইত্যাদি পিতা—এই কল্পিত মাত্র চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। এই কল্পিত চরিত্রের মূল চরিত্রের আশা-নিরাশার কথা পাঠ করিয়া



অন্তঃপুরে সাজাহান
প্রাচীন চিত্র হইতে

ভাবনাতী

৩৫শ বর্ষ]

আশ্বিন, ১৩১৮

[৬ষ্ঠ সংখ্যা]

দুই দিক ।

Artকে লইয়া idealist এবং realist এই দুই পক্ষের তুলন লড়াই চলিয়াছে, সীতাকে পাইতে যেন রামস্বাভবের লক্ষ ।

রাবণটা হচ্ছে যোক্তর realist. বিলাস, ধনমগ্ন, সোনার প্রাচীর এবং সম্পূর্ণ গায়ের ঝোর—এককথার বিশটা চোখ ও হুড়িখানা হাতে বাহা দেখা যায় ও ঘরা যায় তাহাই তাহার কাছে অস্তি বাকি সমস্তটাই নাস্তি। দেবক ও সত্যীত দুইটারই ideal সে অব্যাকার করিত সুতরাং দেবতাকে সে ষোড়ার ঘেহুড়ে ও সীতাকে সে বিলাসের পেনেনা করিয়া লইতে ব্যস্ত ছিল ।

লক্ষণের দ্বারা রামটি হচ্ছেন প্রকৃত idealist. পিতৃপত্য পালনের একটা ideal ধরিয়া ইনি অযোধ্যার সুখাশন ছাড়িয়া বনে বাহির হইলেন । বনে আসিয়া ইনি যুগের একটা ideal—সোনার যুগের সত্য ছুটিয়া সীতাকে হারাইলেন এবং শিগা জলে ভাসাইয়া সাগর-বন্দন, বানর সৈন্তের দ্বারা কৃত্ত কর্ণ বধ ইত্যাদি realist রাবণের যুগ্মেণও অগোচর কতকগুলি কার্য করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়া লইলেন ।

মহাবি বাস্তবিক সত্যকাত্ত লেখালেখির পর রামস্বাভব দিয়া realist ও idealist এর বিলাসের

সীমাংসা করিলেন । এখন idealism ও realism এই দুটো পক্ষকে যেতাপুণের প্রাচীন মতামতের সঙ্গে আধুনিক মতগুলির সামঞ্জস্য আছে কিনা দেখিবার পূর্বে গৃহকেন্দ্র হইতে দূরে আসিয়া লড়াইটা ঘটায় ক্ষত তামা কি বস্ত্র বেগা বাড়িক । *

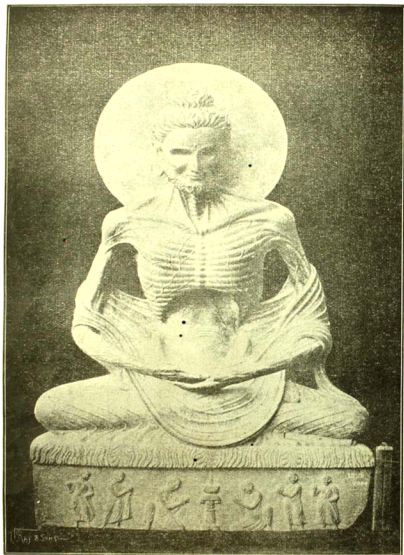
Realist নিজেদের বলিতেছেন artist আর তিনি idealist তিনিও নিজেদের বলিতেছেন artist.

• তইমনেই নিজের নিজের অবিকারিত্ব প্রমাণে অগ্রসর ।

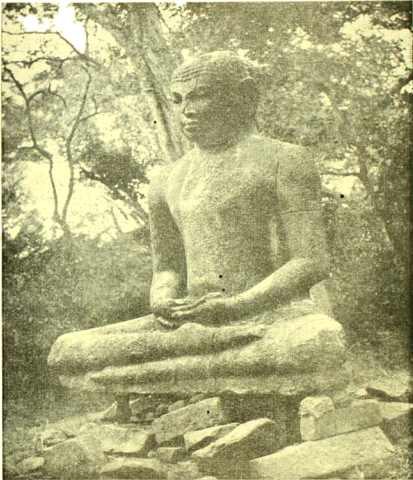
অভিপানে art পক্ষের এক অর্থ কোণল, নিপুণতা ; সুতরাং artist হইলেন কোণলী বা নিপুণতাসম্পন্ন ব্যক্তি ।

এখন এই কোণল বা art এবং কোণলী বা artist এই দুয়ের idealটাই বা কি ও এ দুয়ের realityটাই বা কিরূপ দেখা বাড়িক । সৃষ্টিকর্তার মত কোণলী কেহ নাই এবং সৃষ্টিকোণলের মত কোণলই বা কোণার পাই ।

অতএব ideal artist হইলেন যেমন সৃষ্টিকর্তা, ideal art হইল তেমনি সৃষ্ট কোণল ; অতএব artist যাহেবই উচিত হই সৃষ্টিশক্তি বা creative power লাভ করা



Realityর নিকটে সৃষ্টবস্তুতা যুগোৱে
দেওনাৰ নিৰ্মাণকৌশলটোও অগম্য



কিছু সৃষ্টিকৰ্তা। এবং সৃষ্টনকি এ দুইই কিছু। সৃষ্টিকৰ্তা এবং সৃষ্টনকিৰ অস্তিত্ব
তাঁহাৰ কাছো অগোচৰ অনিৰ্দিষ্ট একটো। realist য়ে স্বীকাৰ না কৰেন এমন নয়

কিছু সৃষ্টিশক্তি লাভ করা এবং তাহার ফলে
অষ্টার সারিধা পাওয়াটাকে তিনি কবের মধ্যে
কাব না বলিয়া নিম্নের হাতের এবং চোখের
সাহায্যে বসটা সম্ভব সৃষ্টবস্তুর এক
একটা প্রতিরূপ খাড়া কহাচ্ছেই বলেন art
এবং ঐরূপ কবচাশালী ব্যক্তিকেই তিনি
বলেন artist. মজ্জবের পক্ষে সৃষ্টিশক্তি
পাওয়া realist-এর কাছে অসম্ভব; আর ঠিক
ঐটাই idealist-এর নিকট সম্ভবপর এবং
সেটাকে পাওয়াই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

Realist-এর বুদ্ধি হইতেছে—‘বুদ্ধিঃ
তন্নিখিতঃ’। Idealist বলিতেছেন ভগো
তা মম—‘বদ্বন্দ্যত্বভূতঃ তন্নিখিতঃ’; মন বিরা
দেব দৃষ্টবস্তুর অন্তরে তাহার বরণ বা
তেজ সুকাইয়া আছে। চর্য সৃষ্টির আগে
গ্রহণ করিয়া জ্যোৎস্নার রূপাঙ্কিত করিয়া
পৃথিবীতে প্রেরণ করিতেছে—বস্তুর পর
তেজ তেমনি তোমার মনোদর্পণে গ্রহণ
করিয়া সেটাকে সম্পূর্ণ একটা নূতন ও নূতন
করিয়া প্রেরণ কর, তবেই বলিব তুমি artist
এবং তবেই জানিলাম তুমি নবগুণে মণ্ডিত
একটা নূতন সাবিত্রী সৃষ্টি করিলে।

তবেই গাড়াইতেছে—realismটা যেন
কাচখণ্ডে কোটো তুলিয়া লওয়া আর
idealism যেন মণিদর্পণে বস করিয়া গ্রহণ
করিয়া অমৃত উৎপাদন করা।

এইবার একবার ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের
মতামত গ্রহণ করা যাক।

Ruskin লিখ ও শিল্পকে দুই শ্রেণীতে
ভাগ করিয়াছেন—Higher এবং Lower.
তিনি বলিলেন—

“The lower merely copies what

is set before it, whether in portrait
landscape or still life.”

“The higher either entirely
imagines its subject or arranges
materials presented to it so as
to manifest the imaginative
power.....”

মনে কর স্তম্ভর পাঠশালাে দুই শ্রেণীর
ছাত্র লিখিতে আদিরাছে। প্রফেসরের
মত উচ্চ শ্রেণীর এবং প্রফেসরের মত
নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র। প্রফেসরের দল ‘ক’র
আঁকড়ি ‘ক’ কেবলি কপি করিয়া চলিয়াছে
আর প্রফেসরের মত ছেলেগুলির ‘ক’ দেখিয়া
কৃষ্ণ মনে পড়িয়াছে এবং হরেকৃষ্ণ বলিয়া
সংকীর্তন জড়িয়া দিয়াছে।

অনেকের কাছে Ruskin এখন সাংঘাতিক
বলিয়া তত আদর না পাইতে পারেন সুতরাং
অত্যন্ত আধুনিক Theodorechild সাহেবের
মতটা তুলিয়া দিতেছি। ইনি বলেন—

“Nature (দৃষ্ট জগৎ) is only a
dictionary. Idealists seek in their
dictionary those elements which
are in harmony with their concep-
tion and by arranging them with
a certain art they give them an
entirely new physiognomy.” আর
“Realists copy the dictionary.”

Dictionary বুঝ করা খুব একটা শক্ত
কাজ কিছু সেটা যে Dictionaryটার সং-
বান্ধার তাহা কেমন করিয়া বলি।

মাঠের মাঝে একটা শাল গাছ তাঁর
পাতা আর সবুজই বলিয়া গিয়াছে একটা

৩৪শ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা।

দুই বিক।

শোক বাহার কল্পনাও নাই এবং অলঙ্কার
শাস্ত্রটাও মুখস্থ নাই সে বলিল—

ভক্ত কণ্ঠা পত্রত্যাগে—একটা শুকুনো
গাছ দেখি যে?

আর একটি শোক বার একটু পাণ্ডিত্য
জন্মিয়াছে সে ত্রী কথাটাই একটু শুধাইয়া
বলিল—

নীচল তরুণর পুংতো ভাঙি

উত্তরেরই কাছে গাছটা গাছ মাত্র;
Realism-এর গণি কেহই পার হইল না।

তৃতীর ব্যক্তিটি তারুক অর্থাৎ Idealist.
সে বলিয়া উঠিল—

বৃক্ষের স্তম্ভে দিবি তিষ্টন্তেক:

বৃক্ষের স্তম্ভে একটা মহাপুরুষ
আকাশে বসমান রহিয়াছেন।

কেমন একটা অপরূপ মহিমাময় ছবি সে
আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিয়া চলিয়া
গেল এবং সেই সঙ্গে সে নিম্নেরও একটা
মানসিক শক্তির পরিচয় আমাদের দান
করিল।

এই যে মানসিক শক্তিরূপে একটা গাছকে
নুতন ভাব ও মহিমার মণ্ডিত করিয়া তোলা
ইহারই ইংরাজিটা হচ্ছে Idealism.

আর এই যে বাক্যভ্রমী ধার্মা অথবা
দিগা কথার গাছটাকে গাছ মাত্র দেখাইয়া
যে ওয়া ইংরাজিতে ইহাকেই বলে Realism.

Theodore সাহেবের মতে Realist
বলিতেছে—

“I wish to represent thing as
they are, or else as they would
be, supposing that I do not exist.”

আর Idealist বলিতেছে—

“I wish to illuminate things
with my mind and project the
reflection thereof upon other
minds.”

Realist আকৃতিমূলক আর Idealismটা
হচ্ছে প্রকৃতিমূলক।

যদি realist এবং idealist দুই শিল্পীকে
একখানে ছবি আঁকিবার জন্য ডাকা হইল
এবং প্রঙ্গ দেখা হইল—‘কাক’। ক। এবং ক
এই অক্ষর দুইটা চোখে পড়িলাম। দুইজনের
মনে কি যে আঁকিতে হইবে তারার একটা
ধারণা হইল; কেননা পূর্বে হইতেই প্রত্যেকেরই
মনে কাকের এক একটা ফোটো তোলা ছিল
এবং দুইজনেরই সেই ফোটোটা কানে পাটাইতে
চাহিল। এখন realist করিল কি? সে
সেই ফোটোখানির একটি নিখুঁত drawing
কাগজে তুলিয়া দিয়া হাত শুটাইয়া বলিল।
কিন্তু Idealist সেসম্পত্তা করিয়া উঠিতে
পারিল না। কাকের আকৃতি অপেক্ষা
তাহার প্রকৃতি অর্থাৎ কাকের চরিত্রতা নষ্টাদি
তাহার বসিবার চলিবার উড়িবার খেলিবার
নানা ভঙ্গি—একটা স্তম্ভিমান কোণ ও
চাতুর্য্য তাহার মনে উদয় হইল।
সুতরাং সে কাকের আকৃতির যে যে ধূল
এই চরিত্র ও কোণী স্তম্ভটিকে ফুটাইয়া
তোলে তাহাই সমস্ত ফুটাইয়া বাকি সমস্তটা
মোটামুটি রকমে সারিয়া দিল, ইহাতে
হইল কি? Realist-এর কাকের মত সেটার
নিখুঁত anatomyটা পাওয়া গেল না কিন্তু
তাবৎ কাকের অন্তরের একটা চিত্রণ কালো
ছাপু পাওয়া গেল।

Idealism-এ এই অন্তরের ছাপটা দিবার

ঠেলা এবং realismএ ঐ বাস্তবের আকারটা ধরিয়া ফলি চিরদিন চলিতেছে। এমন Ideal ও Real এই দুই মূর্তিকে কেমস করিয়া চিনিয়া লইলে চলিতেছে।

ছোট্টা বুদ্ধমূর্তি ভারতবর্ষের ছোট্টা নিজস্ব অংশ হইতে আনিয়া পাশাপাশি রাখিলাম। ছোট্টাতেই বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ অবস্থায় আছেন ; কিন্তু ছোট্টা মূর্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন মহাবলম্বী ছোট্টা শিল্পী গঠন করিয়াছে ! ওই যে অস্বপ্নতর-সার নাশুর্ভি ওই হচ্ছে গাফার বেশ ছোট্টে আনীত শ্রেণী রোমান realistic শিল্পের নিদর্শন, (১ম চিত্র) আর অস্ত্রটি হচ্ছে সিংহল দেশ হইতে প্রাপ্ত ভারতশিল্পের একটি সুন্দর Idealistic মূর্তি (২য় চিত্র)। অবশ্য এই শিল্পীদের মধ্যে ছোট্টানেই কেহ কোনদিন বুদ্ধ-দেবকে দেখেন নাই, বুদ্ধদেবের লব্ধকে প্রতীকিত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়াই ছোট্টানকে মূর্তি গঠন করিতে হইয়াছে। Realistic সে শ্রেণী, রোমান বা গাফারশিল্পী সে দেখিল ছয় বৎসরের কঠোর উপবাস এবং তপস্যার পরে বোধিতকৃত্তনে বুদ্ধদেব ধ্যানে বসিয়াছেন এবং সে তরুণমুক একটি জর্জন শূণ্য মডেল চোখের

বা মনের সম্মুখে রাখিয়া বুদ্ধমূর্তি গঠন করিয়া ছাড়িয়া দিল। আর Idealistic শ্রাণী-শিল্পী যখন ঐ বুদ্ধমূর্তি গঠন করিতে বসিল তখন ছয় বৎসরের উপবাসে বুদ্ধের আকৃতি'। কিন্তু ছোট্টে পারে সেটা সে বিচার করিল না বুদ্ধকে সে সুগঠিত প্রবৃত্তি দ্বারা গঠিত একটি জিতোজ্জ্বল সোণী মূর্তিতে একটি নিতম্প দীপনিখার জায় গড়িয়া তুলিল। ফলে Realistic শিল্পী হাতে বুদ্ধদেবের শীর্ণাটাই, অন্ধিতে অন্ধিতে নিখার নিখার প্রকাশ পাঠিতে থাকিল আর Idealistic শিল্পী হাতে ঐ মূর্তিই বুদ্ধদেব অক্ষর কবচে মণ্ডিত হইয়া অস্ত্রান্ত শরীর এবং অটল ধ্যান লইয়া বঙ্গদেশে বিবাজিত হইল।

Realism দিল সস্ত্রবণর একটি আকৃতির প্রতিষ্ঠিত আর Idealism দিল সস্ত্রবণর প্রকৃতির একটা স্পষ্ট আকৃতি।

Realism বুদ্ধের ধীন অংগটাকেই সার বর্ণিত গ্রহণ করিল। আর Idealism বুদ্ধের সমাক প্রবৃত্তি হইবার সত্ত্বের উপাদান-স্বপ্নটাকেই ব্যক্তিগত লইয়া দস্ত হইল।

ঐ অমলোজনাথ ঠাকুর।

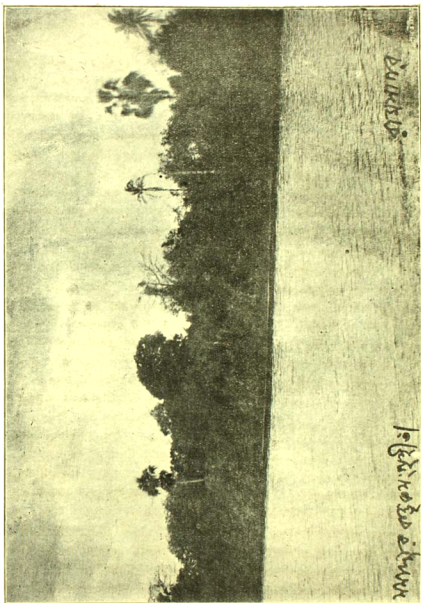
সীতারাম ।

কবেক মাল পুণে আমি দক্ষিণ গবর্ণমেণ্টের নিকট সীতারামের কীর্তি রক্ষার জন্য আবেদন করি। সীতারামের অমর কীর্তি রক্ষার জন্য, শুদ্ধ আনন্দেব নহে, অনেক উৎসাহেরও যথেষ্ট আশ্রয় দেখা যায়। গবর্ণমেণ্ট ঐ আবেদন প্রত্যক্ষ বিচারের অধ্যক্ষ ডাক্তার স্পনার মহাশয়ের নিকট

পেঁপণ করেন। স্পনার সাহেব এই প্রস্তাবে মহাপ্রসূতি প্রকাশ করিয়া দেখেন—

“ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্তির সংখ্যা অসংখ্য ; কিন্তু এই সকল রক্ষা করিতে যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক তাহা না থাকায় গবর্ণমেণ্টের এই কার্যে হতক্ষেণের সম্ভাবনা কম। বিশেষতঃ সীতারামের কীর্তি

১৪৭ বর্ষ, বহু সংখ্যা।



রক্ষণের উপযোগী কি না এ বিষয়েও সন্দেহ আছে ।”

এই পত্র পাঠিয়া আমি তাঁহাকে মহৎশ্রমপূর্ণ ঘাটতে অহুত্যাগ করি। কিন্তু তখন অল্প কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে যথাসময়ে ঘাটতে হইল। এই কারণে তিনি আমাকে মহৎশ্রমপূর্ণ গিয়া এক্ষণে কীর্ত্তিভূমি কি ভাবে আছে এবং উত্তমের বক্ষা সম্বন্ধে কি না, তাহাও প্রত্যক্ষ পৰিচয় প্রদত্তির ভার গ্রহণ করিতে বলেন।

তদনুসারে গত গ্রীষ্মকালে কতিপয় বন্ধুর সচিব মাত্ৰতা হইতে সীমার গোণে মহৎশ্রমপূর্ণ গাত্রা করি। বিনোদপুরে সীমার ভাঙিয়া আমরা পৌরে দীয়ে মহৎশ্রমপূর্ণ পৌত্তিরা প্রথমেই সীতারামের একটা প্রধান কীর্ত্তিবস্ত্র রামনাগর নামক প্রকাত দীর্ঘিকা তীয়ে উপস্থিত হইলাম। এই সুদূরত্বে জলাগর ১৮৪৫ হাত দীর্ঘ ও ৬২৫ হাত প্রস্থ। এক্ষণ দীর্ঘিকা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

এই দীর্ঘিকা খনন সম্বন্ধে অনেকগুলি কিংবদন্তী আছে। প্রাচীন ‘লঘুভারত’ প্রায়ে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়।

“একদা স চ কৃপালো নিম্বাধি কৃত কৃষিণ ।
পথটন্ বিবিধরান সুপ তথো একাপুরে ।
যতাব বিগরীত কান ভাচানানুলগ্নতঃ ।
ক্লম পাক্রাণবৎ পত্রাঃ লুই ভূব সুঃপোশি ।
দৃষ্টাত্ততঃ বৃকঃ খননাঃ বনি পুকে ।
ম্লাম বদ্যে তিহং ততপানতবৎসলঃ ”

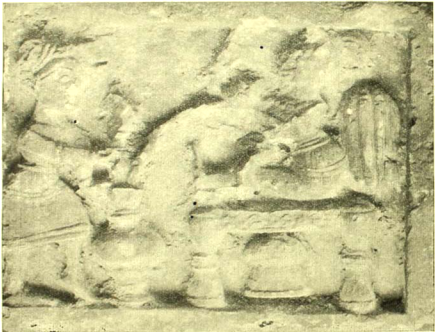
এই অলানু তলার সীতারাম যে খন প্রাপ্ত হন, তাহা বারাই এই সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করিয়া লোকের জলকটে নিবারণ করেন। বহুশ্রমপূর্ণ ও নিকটবর্তী স্থান

সমূহে প্রচলিত প্রবাদ এই যে সীতারাম বেনাহাতীকে এক তীর নিক্ষেপ করিতে বলেন। এই তীর যতদূরে বাইরা পড়ে, ততদূর পর্য্যন্ত দীর্ঘিকা খনন করিলে ত্রাণার্থে সম্পত্তি নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় অগ্নেকান্ত কৃষ্ণাকারে ইহা খনন করা হয়। পূর্বে রামনাগরের চতুঃপাশে ঘাট বাগান ছিল। এক্ষণে কেবল মাত্র এক পাৰ্শ্বে তাহার সামান্য চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। বহুতঃ রামনাগরের বর্তমান রূপস্থা দেখিলে চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারা যায় না। যে রামনাগর এক কালে লক্ষ লক্ষ লোকের পানীয় জল সরবরাহ করিত, সীতারামের সাধের সেই সাগরে এক্ষণে মৎস্তজীবনগণ মৎস্ত পরিহার অল্প বাধ ও তৎপক্ষে অজ্ঞাত আবর্জনা দি নিক্ষেপ করিয়া উহার জল দূষিত করিয়া দিতেছে। বোধ হয় এক্ষণে তাহা বৎসর থাকিলে উহার জল অসাবধান্য হইয়া যাইবে। এতদিন না হইবার কারণবস্ত্র অধিবাসীগণ বলেন যে, সীতারাম বৃহৎ তালবৃক্ষ পার্শ্ব পরিপূর্ণ করিয়া উহার তলদেশে রাখিয়া বিধা ছিলেন।

কিছুক্ষণ “দেই হিরেল বোলায়িত নদী-প্রতিম বাপীডটে” নগ্নাধমান হইয়া তাহার “মাক্ত তিরোল” লেখন করিতে করিতে যেন হইতে লাগিল, পবিত্র কনকল তীর্থে যান করিয়া জিয়ারি বাস করিতে পারিলে যদি সকল পাপমুক্ত হইয়া অধর্মোৎসর্গে কলমাত করিয়া পরলোকে অকল্প স্বর্গে বাস করা সম্ভব হয়, তবে হিন্দু মূলমতান বৃষ্টেন লৈন প্রকৃতি সকল বঙ্গবাসীর এই রামনাগর মহাতীর্থে প্রান এবং জিয়ারি মহৎশ্রমপূর্ণে বাস করিলে কেনই বা মহাপুণ্য লাভ না

ভাষ্যের কঠিন শ্রুতি বাহা নীল জনবাসি
আহত কবিত্তেছে। দীর্ঘকাল একশ্রেণে আব
“মিত্র গভীর নির্দেশ নাট, এমন দে গাভনায়
অক্লিষ্ট হটরা চৌক্যকট করিত্তেছে। কালেব
কি কুটিল গতি।

হামলাগর পরিভাগে করিয়া আমবা মহা
দলানের মধ্য দিয়া, সেই হুমগান অতীত
গে'বন কাঁহনো দ্রবণ করিতে করিতে মহাম্ব-
পুবেল মদো লদণ কবিত্তে লাগিলাম।
দেগিলাম, নগর কমনুজ ; দেবমন্দিরে প্রতিমা



নট। দেগিলাম মহাপুংসে অপূর্ণ কঠি
কাঁহিনীৰ শ্রঃসাবেশেণ মাত্ৰ অবশিষ্ট রহিতগড়ে,
কিন্তু সেই শ্রঃসাবেশেই তাঁহার অপূর্ণ কর্তৃগা-
জান, তাঁহার বীর্য, মহত্ব, ধর্মগাণতাবে
ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতেছে। এককট নিবাংগের
জন্ত শুনিতে পাই তাঁহার সঙ্গে বাসিল
হাজার বেশদার বৈজ্ঞ পাকিত। প্রত্যহ

নূতন পূর্ণবর্ণিতে ধান তাঁহার ব্রত ছিল।
এ ব্রত নিলাপিতাবে ভজ্য নটে, এ ব্রত প্রজা-
বৃন্দের জলকটে নিবারণের জন্ত। এ ব্রত
পূণ্য সফরের জন্ত। দেবমন্দিরেগুলি দেখিতে
লাগিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতে লাগিল,
চাহ, এককালে এই সকল মন্দির ধারে কত
অত সফল নর নারী ভক্তি গদগদচিত্তে, এক

অপূর্ণ পুলক সমাবেশে, -এই সকল মন্দির
 দেবতাদিগের চরণে প্রণত হইও! দেখিলাম,
 অনেকগুলিতে সেই সকল দেবমূর্তি আছে,
 কিন্তু আর রাজপথ জনমুক্ত ও তজ্ঞাকর্ণ,

প্রাসাদাবলী হস্তশ্রী, বাণী ও ডাঙাদি আর
 বিহীন, তদ্ব্যপেক্ষে ক'হি কোনটি ঘন-পঙ্কিল
 অসপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।
 প্রত্যাপদন কালে আমরা গুরুর কানাই



দ্বিতীয় ইট—দীপারামের পিণ্ড

নগরের হরিকৃষ্ণের মন্দির দেখিয়া আসিলাম।
 সে দিন কি সুযোগ! সুদলপারে তুষ্টি
 সেই লগ্নে বড়। সেই বড় তুষ্টিতে কাটা
 রাজার কয়েক মাইল দূরিতা পথপ্রভে চলা যে
 কল্পন কষ্টকর তাহা এ অবস্থায় দিনি না

পড়িয়াছেন তাঁহার পক্ষে বুঝা হু:সাধ্য।
 বহুকষ্টে মন্দির স্থানে পৌছিয়া দেখিলাম
 অস্ত্রাঙ্গ মন্দিরগুলির ভায়ে ইহার দশাও
 শোচনীয়। মন্দিরমধ্যস্থ দেবতাকে নাটোরের
 মহারাজা বারাহ্ম স্থানান্তরে লইয়া যাওয়াতে

এ পথে আর জনমানব দৃষ্ট হয় না। মন্দির পরিভ্রমণে কালে প্রাচীরপার্শ্ব চিত্রাবলীর প্রতি আশ্রয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম এক স্থানে দুইটি ইষ্টক এক সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। একখানি ইষ্টকের উপরিভাগে খোদিত মূর্তি দেখিয়া আমরা বিম্বিত হইলাম। বহু দিন পূর্বে ঐমূর্তি যখনো ভাঙাচাড়া মৎস্যের প্রসিদ্ধ সীতারামে পড়িয়াছিল। “দশভুজার মন্দিরে এক প্রাচীরে শিবিকাধ মধ্যে সীতারামের একটা মূর্তি অঙ্কিত আছে। ফোটোগ্রাফার অভাবে সে মূর্তি এবার উঠাইতে পারিলাম না। সেই মূর্তি ও নিম্নাংশ ঠাকুরের ধ্যানে জানিয়াছি যে সীতারাম অশ্বিনবর্ষ, বৃহৎ মতক, বৃহৎ চন্দ্র, মধ্যম আকারে খণ্ডিতমূর্তি ছিলেন।”

আবহমান কাল হইতে প্রচলিত প্রবাদও এই যে, দশভুজ মন্দিরের ঐ মূর্তি সীতারামেরই। আমরাও দেখিলাম সিংহানন্দোপরি বৃহৎ মন্তকবিশিষ্ট, মধ্যমাকার, খণ্ডিতবেহ এক পুণ্ড্রমূর্তি,—হাতিয়ারধারী দৈত্যগণ তাঁহাকে জ্বলিত করিতেছে। দেখিয়াই মূর্তিতে পারিলাম যে এমূর্তি সেই মহা-পুণ্ড্রবেহই। তখন জ্বর আনন্দে পতিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সকল কষ্ট, সকল পরিশ্রম, সকলব্যয় সার্থক জ্ঞান করিলাম।

পাঠক উক্ত দুই খানি ইষ্টকের চিত্রই তারতীতে সংনিবেদিত দেখিতেছেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ লমদাশ, বি, এ,
হাকারিবাগ।

জাপানের ধর্ম।

ধর্ম জাতীয় জীবনের ভিত্তি। জাপানীরা ঐক্যবিশ্বাসের আরাধনার আনন্দজনক নন। প্রাণ চালিয়া দিলেও উহাদের জাতীয় শক্তির মূলে ধর্ম। উহাদের ধর্মমত প্রাচীনকাল হইতেই পূর্ণপুরুষদের আত্মা, প্রকৃতিদেবী এবং স্বদেশের পূজা করিতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। শিষ্যোদ্যম বলে পূর্ণপুরুষদের আত্মা জাপানের পবিত্রক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া উহাদের সত্যানুভূতির ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। উহারা দেখিতেছেন, উহাদের সত্যানুগণ পবিত্র জাপানভূমি নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হইতেছে কি না। এই ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়তাই জাপানীরা বাহ্যে

তাঁহাদের দাসভূমি পরপদন্যস্ত না হইয়া নির্মল নিষ্কলঙ্ক রহিয়া যায় তৎপ্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া থাকে। এই ধর্মবিশ্বাসেই উহাদের স্বদেশপ্রেম অচল অটল রহিয়াছে। এবং এই বিশ্বাসের দৃঢ়তাই উহারা যে কোন দুর্ভেদে স্বদেশের লক্ষ্য আন্দোলন করিতে প্রস্তুত। শিষ্যোদ্যমের পর কনফিউশিয়াসের ধর্ম উহাদের ভিতর নৈতিকবল আনয়ন করে। ইহা চীনের বিখ্যাত দার্শনিক কনফিউশিয়াস (৫৫১—৪৭১ খৃঃ পূঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম। ক্রমে চীনদেশীর প্রচলিত ধর্ম কর্তৃক উহা জাপানে প্রচলিত হয়। ইহার পর তাহাদের যৌদ্ধধর্মই জাপানে সত্যতায়

বৌদ্ধ বশন করে। ক্রমশঃ সেই সভ্যতা পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান যুগে জাপানকে এক প্রথমশ্রেণীর সুসভ্য দেশে পরিণত করিয়াছে। আজও পণ্ডিত জাপানের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে বৌদ্ধার বিরুদ্ধে তর্কিত্বাচ্ছিন্ন যোগ্যতায় উদ্বিগ্ন মূলে বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতার বিস্তার, ইউরোপ বিধা আমেরিকার সভ্যতা নহে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সমাজ প্রণয়নের নিমিত্ত অনেকটাই হস্ত মনে করিতে পারেন যে অধিকাংশ জাপানীই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। কিন্তু সেটি ভুল। আজও পণ্ডিত জাপানে হাজার করা পাঁচ জন লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে নাই। ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় শিন্তোধর্মই জাপানের আদি ধর্ম এবং শিন্তোধর্মই টেটু-রিলিজন্ (রানধর্ম) রূপে গৃহীত। ভারতে প্রত্যাভর্তন করিলে অনেকে আমাদের এই অজ্ঞাতধর্ম লব্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বাৎসরিক কোথাও দুইবার হইতে, এ, এল, এল, এল, শিথিল বিবরণ হইতে সংক্ষেপে প্রধান প্রধান মূলত্বের ক্রিষ্ণ উল্লেখ করিলাম। “শিন্তোধর্ম জাপানের ধর্ম, ইহা অপর কোন দেশ হইতে আনীত হয় নাই। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, অস্ত্র ধর্মের ভাষে ইহার কোন অবশ্যক বা অবতার নাই এবং অস্ত্র ধর্মের ভাষে ইহাতে কোন বাধাবিধি কড়া নিয়ম নাই। সামাজিক রীতি, নীতি, লক্ষ্য এবং নৈতিক স্বভাব চরিত্র হইতে এ ধর্মের উৎপত্তি, শিন্তোধর্ম অবিনশ্বর স্বীকার করে, ঐশ্বরিক লক্ষ্যকে বিশ্বাস করে এবং পূর্ণপুরুষের আত্মাকে পূজা করে। নৈতিক বিষয়ে চীনের কন-

ফিউশিয়াজ ধর্মের তুল্যভাবে প্রদর্শিত না হইলেও এ বিষয়ে শিন্তোধর্ম বৌদ্ধধর্মকে অতিক্রম করে। এ ধর্ম জাপানীদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে যেহেতু ইহার সহজ সুখে সকলেই লব্ধ।

“শিন্তোধর্ম পরিবারশালক, সমাজপতি এবং দেশস্বাক্ষরিতকরণে সম্মান করিয়া চলিতে উপদেশ দেয়। শিন্তোধর্মের নৈতিকত্বের বহু এবং অনেক পরিবার শান্তিতে আবেশ করে এবং পুষ্টি মনকে কালো অধরা পক্ষি এবং নির্দোষ মনকে লাল অধরা পরিবার বসিয়া নির্দেশ করে; সাহস, লবলতা এবং সংকল্প সম্পাদনে বলবতী স্মৃতি প্রভৃতি এ ধর্মের লক্ষণ। রাজা বা শাসনকর্তাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করা শিন্তোধর্মের অপর ত্ব।

কাগজ কলমে শিন্তোধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নিত্য কম হইলেও প্রত্যেক জাপানীর ক্ষিত্র শিন্তোধর্মের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে। চীনের কনফিউসিয়াস ধর্ম কতক বিষয়ের ক্ষত্র জাপানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। উহার কতকগুলি মূল্যবান ত্ব জাপানে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ ধর্মের নীতিত ব্যক্তি জাপানে আত্ম কাল নাই বলিলেও অস্বাভাবিক হয় না। ক্রিষ্টিয়ানিটি এবং বর্মোদা যৌগের মাধ্যমানে কোন এক ক্ষুদ্র যৌগ নাকি কতকগুলি কনফিউসিয়াস ধর্মাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

জাপানের অধিকাংশ লোকই আজ কাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এখন জাপানে কর্মযুগ। উহার সময় কালকর্ম,

স্বভাবচরিত্রে ক্ষতান্তের ধর্মতাব এবং
ধর্মের প্রতিক্রিয়া প্রকটিত হইলেও বর্তমানে
কেবলমাত্র কোন এক কাগোচ্ছাদের ভক্ত
বহুটুকু আত্মকৃত তত্ত্বকে মাত্র ধর্মের সংলগ্ন
ভাষ্যেরূপে গ্রহণ করে। পূর্বোক্তরূপ ধর্ম—
কোন একটি ছেলের ইচ্ছা যে সে কোন
খ্রীষ্টান পাবরীষ স্কুলে পড়িগা উংরাজী
ভাষাটা বেশ ভালরূপে শিখা করে। পাবরী
জানাইলেন যে উহার স্কুলে খ্রীষ্টান ভিন্ন
অল্প কাকাকোও লওয়া হয় না, অগত্যা
বালক খ্রীষ্টান গণ্য করিয়াই আপনাকে ভক্তি
করিতে অনুরোধ করিল। এতদ্বিধ খ্রীষ্টান
বালক ভ্রাতাবন্ধিতে স্কুলের নিম্নমাত্রাচারী
প্রার্থনায় করিতে লাগিল। তিন বৎসরে স্কুলের
অধ্যাপন শেষ হইল; বাতির হইয়া বালক
পূর্বের স্থার বোঝাই রহিল। কার্যোচ্ছাদের
ভক্ত কিছুদিনের ভক্ত বাহিক ভাবে ধর্মাত্মক
গ্রহণে উহারে আপত্তি নাই। ধর্ম আধ্যাত্মিক
এবং মহামূল্য পদার্থ। অন্তরের শুচি,
পবিত্রতা, সাধুতা, সরলতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি
ধর্মের প্রধান অঙ্গ।

চীনদেশীয় পরিভ্রাজক আদ্যত্বি হিন্দু-
স্থান হইতে বৌদ্ধধর্মের বীজ লইয়া গিয়া
তাত্‌কালিক হুনভা চীনদেশে বপন
করিতে থাকেন। তথায় বৌদ্ধধর্ম অতি
অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত করে।
ক্রমে কোরিয়ার রাজকগণ উহাতে দীক্ষিত
হইয়া আপানে প্রচার আরম্ভ করেন।
পুঁইর ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আপানে
বৌদ্ধধর্ম কিকিং প্রবেশাধিকার লাভ
করিলেও সপ্তম শতাব্দীতে উহা বহুদূর হয়।
এই শতাব্দীতে সাত জন সম্রাট এবং পাঁচ

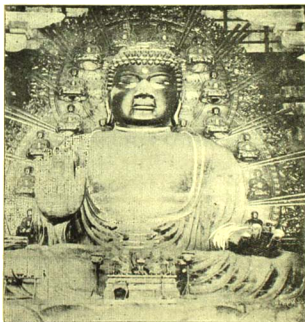
জন সম্রাজ্ঞী রাজত্ব করেন। সর্বত্রই
পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের ভিতর ধর্মতাব
এবল দেখিতে পাওয়া যায়। তাই এই
সময় সম্রাজ্ঞীদের প্রথমে অতি সহজেই
আপানের শিক্ষিত সমাজের ভিতর বৌদ্ধ-
ধর্ম প্রচারিত হইতে পাকে এবং রাজ্যের
স্থানে স্থানে মন্দিরে মন্দিরে বৌদ্ধমূর্তি
লংঘাপিত হয়। আমাদেবের দেশে বৌদ্ধ-
ধর্মের ইতিহাসে ভাষা অশোক বেদন
বিখ্যাত, আপানের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে
কোমিও 'এবং কোকেনো নামক সম্রাজ্ঞীর
তৈমনি বিখ্যাত। রাজ্ঞী কোমিও রাজ্যের
স্থানে স্থানে ১৬ মূর্তি এবং নারো নামক
স্থানে ৪৩ মূর্তি উচ্চ বুদ্ধদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা
করেন। মন্দিরস্থাপন, মূর্তিপ্রতিষ্ঠা এবং নানা
উপায়ে ধর্মপ্রচারের ভক্ত সম্রাজ্ঞী কোমিও
এবং কোকেনো হিন্দুধর্ম প্রাণাধিত্যের ভাব
অনেকবার রাজকোষ নিঃশেষিত করেন।
উঁচাদের পর আর দেড় শত বৎসর কাল
ধর্মত্যাগ পামিগা যায়। কুজিওগারার
সময় পুনরায় অপর কতিপয় সম্রাট ও
সম্রাজ্ঞীর যত্নে বৌদ্ধধর্ম আগিয়া উঠে।
৯ম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত
আপানে কুজিওগারার নামের প্রতিপত্তি
বিশেষ বাড়িয়া উঠে বলিয়া ঐ সময় আপানে
কুজিওগারার নামে খরিদ।

বঙ্গদেশীয় শিল্পে ধর্মের মূল মন্ত্র।
আপানীদের ভিতর মৌল্য বঙ্গদেশস্থাপ
দেখিতে পাওয়া যায় পুণ্ডিত্যে অল্প কোন
জাতির ভিতর তেমন দেখিতে পাওয়া
যায় না। যত্বে পর পুরুষদের আস্থা
'পুনরায়' আপানে আসিয়া উহারে সন্তান-

গণ জাপান স্বর্ণকে মিলনকর স্থাপিতে পারিতেছে কিনা তাহাটী পরীক্ষণ করিতেছে ; কি বিদ্যায় । ইহাটী উহাদের আত্মীয় জীবনের ভিত্তি । ধাতুক ও আত্মাত্মিক পরিচ্ছন্নতার দিকে জাতৃত্বিক মৌলধর্মের প্রতি বিশেষ অগ্রগতি উহাও উহাদের ধর্মের এক প্রধান অঙ্গ । তাহাও বৌদ্ধধর্মের ধর্মের উচ্চতা ব্যাধি, জ্ঞান, সূত্রা জ্ঞাতিতে নির্ভিকার । গত বুদ্ধের কত পরিচিত ব্যক্তিকে পিতা, পতি, পুত্র, ভাতা জ্ঞাতিকে হারাউয়াও অমানসদনে অস্ত্রোৎসর্গে যোগদান করিতে দেখিয়াছি । তেলগরে টেননে রমণীগণ পতিপুত্রকে সমর-ক্ষেত্রে পাঠাইতেছেন দেখিয়াছি । আর কত

ব্যক্তির একমাত্র আত্মীয় উপস্থিত পুত্র কিবা স্বামীকে ব্যাধির করণকবলে নিপতিত হইতেও দেখিয়াছি । কিন্তু একদিনের জন্তও জাপানে কাহাকেও শোকার্ত হইয়া কাঁদিতে দেখি নাই ।

শিভোমন্দির (shrine) কোন দেব-দেবীর মূর্তি নাই । পূর্জদিনে কিবা বিশেষ কোন অঙ্গুষ্ঠান উপলক্ষে পুস্তঘরে পূজা এবং নানা উপচারে ভোগের বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে । আর বৌদ্ধমন্দির (temple) অনেক স্থলেই মানে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্তি স্থাপিত আছে । পূজা আর এক তাৎপ্রেই হয় । তাহাও সহস্রের বিবরণীতে দেখিয়াছি



সময় পতাকীতে স্থাপিত বুদ্ধদেবের মূর্তি ।

যে একমাত্র তেওঁকিও সহস্রেই কোট বড় তিন লাখ বৌদ্ধমন্দির আছে । আনন্দের দেশের জার পুরোহিত কিবা ধর্ম-ব্যক্তির পূজা হইলেই পুরোহিত কিবা ধর্মব্যক্তক হইতে পারে না । ধর্ম-শিক্ষার জন্ত অনেক বিভাগের আছে ; ঐ সকল বিভাগের জ্ঞান লাভ করিলেই ধর্মব্যক্তক হইতে পারেন ।

কোন কোন পূর্জদিনে ধর্মমন্দিরের গিলা দেখি য়াছি ব্যক্তগণ দে ভাবায় অয়োজ্যায়ণ করিয়া থাকেন উহা সাধারণ জাপানীদের যোগদান

নহে। উহাতে নাকি অনেক পাণিনক
কিকিং রূপান্তরিত হইয়া মিশ্রিত হইয়াছে।
দেবমন্দিরে ছোট ছোট কঠিনলব্ধে কিংবা
বস্ত্রপণ্ডে লিখিত অনেক মূল্যবান উপদেশ
দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে হুই একটি
অক্ষর আমরা বুঝিতে পারিতাম। উহা
অনেকটা সংস্কৃতের জায়। আপানের কোন
কোন মন্দিরে এবং এক জায়গায় শাক্যমুনির
মুষ্টি উপরে “ও” লিখিত দেখিয়াছি। দেব-
মন্দিরে ঘোষের বাতি এবং মূল্যবান দেওয়া
হয়। পদ্ম ফুল এবং নব পল্লবের (আমের
নক, পাইন বৃক্ষের) ব্যবহারও দেখিয়াছি।
অনেকের বাড়ীতে কোন এক প্রকারে
অথবা ঘরের বাহির উঠানে এক একটি ক্ষুদ্র
মন্দির স্থাপিত আছে। প্রতিদিন তপা
ভাতের ভোগ দেওয়া হয় এবং সম্ভাব্য বুদ্ধাগণ
ঘোষের বাতি আগাটীয়া থাকেন। এক
মন্দিরের সম্মুখে এক বুদ্ধকে অনেক দিন
পাতি আগাটীয়া মন্দিরের চতুর্দিকে করেকবার
গুরুতে এবং হাতে তালি দিতেও দেখিয়াছি।
ধর্মমন্দির অতিক্রম করিয়া চলিয়া বাটবার সময়
অনেককে ঘোড় হস্তে নমস্কার করিতে
দেখিয়াছি। বৃন্দকথা ধর্মপন্থকে অনেক চলিত
নিয়মের সহিত আমাদের দেশের নিয়মের
অনেকটা মিলিত দেখিতে পাওয়া যায়। আত্ম-
কাল সর্জনপাঠশালা মাছুমাংস পাইলেও
ধর্মবান্ধবগণ মাছুমাংস স্পর্শ করেন না, এমন
কি কঁচ হুই একজন সাধু পুণ্ডরকে দেয়া
যায় দীর্ঘাঙ্গ ছড়ও পান করেন না।

মূল্যবান এক হইলেও আপানে ক্রমে
ক্রমে তির তির মতাবলম্বী প্রচারকের
আধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচারকের

মতবোধে ক্রমে ১২টি শাখা এবং ৪২টি শাখা
হইয়াছে। তদ্বারা নিম্নলিখিত করেকটি
বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :—

(১) চোঙ্কো—৮৩ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে
এই ধর্ম প্রবর্তিত হয়। নারা সহরের কোঙ্কুজি
মন্দির এ সম্প্রদায়ের প্রধান মন্দির। বিখ্যাত
জিজ্ঞাসার বংশের সচলে এই মন্দিরই
অর্চনা করিয়া থাকেন।

(২) তেলাই—৮০৪ খৃষ্টাব্দে ছাইটো
কর্তৃক চীন হইতে প্রবর্তিত হয়।
বাবতীয় গণের পরিচালনা দ্বারা সংপথে
জীবনভিত্তিক করাই মুক্তির প্রধান উপায়;
ইহাই এ সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র। হিউয়ে
পার্কচাপরি এন্ট্রিয়ার মন্দিরই ইহাদের
প্রধান মন্দির।

(৩) নিক—৮০৬ খৃষ্টাব্দে জুকাই
নামক চীনক প্রচারক কর্তৃক চীন হইতে
আনীত। এ সম্প্রদায়ের আর্থনা বিশেষ
বিখ্যাত। কিঙতো সহরের গোঙ্কোজি
(অর্থ নাম চোজি) মন্দির ইহাদের প্রধান
তীর্থস্থান। ইহাদের প্রাচীন এক প্রাণের
প্রধান মন্দির কইয়া পার্কচাপ কোমোজি।

(৪) মোমো—৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হোনেন
কর্তৃক প্রবর্তিত এবং ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে গেঙ্কু কর্তৃক
প্রবর্তিত হয়। এই সম্প্রদায়ের হুই মত।

(৫) এক মতে ব্যক্তিমতেরই বা ব চোটার
বুদ্ধদেবের স্তায় পবিত্র পথ অনুসন্ধান করিয়া
সংপথে চলিয়া মুক্তি লাভ করিতে হইবে।

(৬) অন্য মতে বুদ্ধদেবের প্রতি অচলা ভক্তি
রাখিয়া জীবন কাটাইলেই মুক্তি। কিঙতো
সহরস্থিত চিওনটুই মন্দিরই এ ধর্মের প্রধান
মন্দির।

(৪) জেন—লোপেন ১২২৭ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে জেন মত লইয়া যান। ইহাতে আত্মা, ধর্ম এবং নবজন্মের মূল অঙ্গপঙ্কতি করতঃ চিন্তা ও গবেষণাবাহী প্রকৃত জ্ঞানদার্গে উপনীত হইতে হয়। যেটুকি অঙ্গের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রিপূচ্ছট, ছোপো এবং ওগাজু নামক তিনটি প্রাণ বাহির হইলেও মূলে উভার

একই। যেটুকিইহা এবং ছোপো জি উভাদের প্রাণই মন্দির।

(৫) শিন—লোপোর প্রবর্তক হোমেনের শিখ শিনতান খোমিন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায় ত্রিপিটকের সূত্রাভ্যাসী পরিশীলিত হয়। এ মতে এক যাত্রা অমিত্যক বুদ্ধ অচলা ভক্তিতেই মুক্তি। এ সম্প্রদায়ের



কোফুজি মন্দির।

মধ্যে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া এবং শরীররক্ষার নিমিত্ত মাংস ভোজন করা ধর্মগ্রন্থে নিষিদ্ধ। প্রবর্তক ১২২৪ খৃষ্টাব্দে ইনাদা নামক স্থানে ইহাদের প্রথম ধর্মমন্দির স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কিওচো লুওর উইং তদ্ব্যবস্থার উপর বর্তমান প্রসিদ্ধ শিনি (পশ্চিম) হোঙ্গানজি মন্দির নির্মিত হয়। ইহার প্রধান শিখা নিখুঁত খোমিন,

লিমোজা নামক স্থানে ছেনপুজি নামক মন্দির স্থাপন করেন। কালে ইহা ইছে নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। তৎপর ১৬০২ খৃষ্টাব্দে প্রবল পরাক্রান্ত ইয়েইয়াজু আমাদের লাট কর্তৃক নববিচ্ছেদের ঠায় এই পরাক্রান্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রনৈতিক মতগণে প্রসিদ্ধ হিগাঁপি (পূর্ব) হোঙ্গান

জি মন্দির স্থাপন করেন। বর্তমান কালে এই মন্দির (পশ্চিম) এবং হিগোলি (পূর্ব) হোমেনজি মন্দিরবৎ আশ্রমে সর্গশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যাশ্রিত হয় না। এই মন্দিরবৎসেব দুই ধর্মধাককই (লর্ড ষ্টাভট) দ্বারা কাউন্ট উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। বর্তমান পশ্চিম হোমেনজির ষ্টাভট কাউন্ট ওস্তানি ইউরোপে অনেক বন্দর বিভাজন করেন। পিতার মৃত্যুতে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া মন্দিরের ভার গ্রহণ করেন। ইনি গ্রিন্স্ কুলোর বিচারক কচ্চা অর্থাৎ বর্তমান ক্রাউন গ্রিন্সপত্রীর ভোষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করেন।

(৭) নিচিরেন্ অথবা চোকে সম্প্রদায় ১২২২ খ্রীস্টাব্দে নিচিরেন্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্প্রদায়ের লোক “মিওহেরেনেকো” এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি উচ্চরবে সাহিত্যে গাহিতে নির্বাপ লাভের কামনা করেন। মিনোব্ পর্জন্তের উপর ইহাদেব প্রধান মন্দির।

(৮) জি সম্প্রদায় ইগেন শোনিন্ কর্তৃক ১২৭৪ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কুজিছাওগা নামক স্থানে ইহাদের প্রধান মন্দির ছেইজেকো অবস্থিত।

বৌদ্ধধর্মের ভার শিক্তোধর্মের অনেক-জলি সম্প্রদায় আছে। জাপানের ত্রিভিন্ন ধর্ম, ত্রিভিন্ন ত্রিভিন্ন সম্প্রদায় বলিলে পাঠকগণ আমাদের হিন্দুধর্মের হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান, পার্শী প্রভৃতির ভার দলাদলি, ঠেলাঠেলি, এবং তেদাতেদার সম্প্রদায় মনে করিবেন না। ধর্ম আধ্যাত্মিক বিষয়। একজনের শরীরের ছাত্রা লাগিলেই ধর্ম নষ্ট হওয়া কিংবা অপবিত্র হওয়া একমাত্র

ভারতেই সম্ভবপর। বহু বহু বহুকে যতটা স্থগা হিন্দুধর্মে করিয়া থাকে ত্রিভিন্ন ভার কোন দেশে তেমন নাই।

আমরা কুহুর বিভাগকে কোড়ে বলাইয়া চুপন করিতে পারি আর আপন ধর্মতাইকে নীচেরাতির স্থগিত ভাবেই চোরের স্থগিত বলিয়া মনে করি। প্রাচীনকালে প্রাতঃ-স্বর্গার আর্থা মুনিবিশিষ্ট কি ভাবে ধর্মের প্রবর্তন, প্রসারণ এবং সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন আর আমাদের ভার বোর পার্থক্য সংস্কারকের দোষে আজ কাল ধর্মের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়াইয়াছে! আজ পবিত্রতা বরণতলে গিয়াছে; ‘স্বর্গপরত’, কুটিলতা, হিংসা, ঘেদ, চৌর্য প্রভৃতি ধর্মের পবিত্র গিংশাপন মঞ্চল করিয়া বসিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—আমাদের ধর্ম এখন ছুতিমার্গে।

জাপানীরা কখনোতেও এসকল ধর্মব্যা করিতে পারে না। ধর্ম পবিত্র জিনিষ; ধর্মের যেমন ইচ্ছা তিনি তেমন তাহেই ভগবানকে ধ্যান করিতে পারেন। জাপানীদের এক বাড়ীতে এক পরিবারের ভিতরেই কতিপয় ধর্মের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ‘সামোয়ী’ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী দেখিয়াছি। আমাদের জাপানীভাবের শিকক খুদান ছিলেন এবং তাহার স্ত্রী বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু জাপানে বহু ধর্ম হইলেও দেশের কায়ে, দেশের কায়ে সমগ্র জাপানের পণে পাঁচ কোটি লোক এক। জাতীয় কার্যে সমবারশক্তিপ্রয়োগে তাহার ধর্মগীতলে অবিত্যর। গ্রন্থের বিষয় শৃংখল কুহুরের ভিতর যে সহায়কুতি এবং সমবেদন। আছে

আমাদের ভিতর সে টুকুড় নাই। একটি আগামী বারে জাপানের নব্য ঐতিহ্য
 শৃংগের জন্মের দশট শৃংগল কাঁদিয়া উঠে সম্বন্ধে লিখিবার ইচ্ছা হইল।
 আমরা একজনের পতন দেখিলে দুই
 পাঁড়াইয়া হাসি।

ঐদৃশ্যের সরকার

সরোজ-বাসিনী।

(কোন এক লক্ষ্মীপ্রতিমা বালিকার প্রতি)

১

এসেছি কস্তারূপে, আর যা ইন্দিরা,
 আর মা, আনন্দ-নির্ঝরিণী !
 চৌদিক ভাঙিয়া উঠে, পুণ্ডক অধোতা,
 হলে পত্র, গলে কমলিনী !

আর চির গোঁঘমালী, আর চির হাসি হাসি,
 আপনি মা জুমা সরোজিনী,
 তবুও লীলার জলে সরোজ-বাসিনী !

৩

একি রূপ ! চির পটে ছবি যেন আঁকা !
 বিব শোভা, লাবণ্যের রাশি !
 দুটি জুয়েল শোভা পার, শাণা দুটি মাথা ;
 আলতার রাতা পা হুথানি।

অলকে অলকে রবে রাতা ঢেলি নাচে অঙ্গে ;

আর আর মধুর মধুরা !
 রিদিকি, রিগিকি, রিনি, পিজিত নুপুরা !

৩

মধুর পুচ্ছের একি টাটম চিহ্নর !
 ঘোলাপুচ্ছের একি রূপ !
 উষাতে লক্ষ্যেতে একি মিলন মধুর !
 অতুলন, একি অপকল্প !

হুন্দেল-ধবলা অরি ! কমলা আনন্দময়ি !

দিলি হাত তারে তারে তারে ;
 বাঁজিছে ধনয়-বীণা ললিত ঝঙ্কারে।

জলধি মধুন কালে অতল হইতে

• তুই যবে উঠিনি হুন্দরি !
 অনন্ত নীলাবু রাশি বাঁধিয়া চকিতে,
 দিক্ চক্ৰ রূপে আলো করি,
 কোরুকে আনন্দে প্রভ, হুন্দার নন্দ্যাত,
 রূপে রান ভাবে, তারানাথ,
 “এ কোন্ রজনী-শেবে অপূর্ণ প্রভাত !”

কোন্ নব নন্দনের মূল পারিজাত ?

কোন্ চক্ৰ চন্দনের স্থল ?

কোন্ পুণাকল, কোন্ অমৃত প্রপাত ?

হুন্দার ভাবিয়া আকুল !

বিবসেই হুন্দুনি হইল রে আল্লাদিনি !

অকস্মাৎ, আরাধনা বিনা,

অজ্ঞানি উঠিল হর্ষে নারদের বীণা !

৬

অশোক চইল বাঁটা চুবিয়া চরণ,
চুবি মুখ সূঁচিল বহুল !
এ কোন্ মধুব বসন্ত ? মুখ জাগরণ ?
স্বপ্নময় ভাবিয়া আকুল !
চাহি তোম মুখ পানে তাতিল দৈত্যেরো প্রাণে
একি, সত্য ! — তুলি আশ্রয়ত,
দেখে করে আলিঙ্গন, ভাবিয়া সোদর !

৭

হে বরাদি ! ছিলি তুই গভীর অতলে,
কোটি কোহিহুর বধা জলে ;
বধা কোটি পদব্যাগ লোহিতে উজ্জলে,
মুখ হানে অপূর্ণ খবলে ;
এখনো বুঝি মা তট, শ্রীজন্মে দেখিতে পাই,
চক্রবাক মুকুতা ও মাণি ।
আপনি লো চন্দ্রাননি মণি-পিরোমণি ।

৮

এলেছিস কল্কান্দনে ? আর তবে আর,
সজ্জানের হৃদয়-মন্দিরে !
মনের কালিমা-রাশি রূপের প্রকাশ
যৌত হোক্ হে দেবি অচিরে ।
জন্ম-সত্তোজ-মাকে, সত্তোজ-বাসিনী-পাশে,
নিত্য রূপে দে মা ধারণ !
যুলে বাক্ যুচে বাক্ বাসনা-বন্ধন !

৯

যুচে বাক্ বাসনার বিশদ বিপাক ;
অকিকনে কন কপাদান ;
এক হয়ে বাক্ মাগো, এক হয়ে বাক্
ধোর বস্তু ধ্যানী আর ধ্যান !
যেমতি নির্বাত হলে কল্মসহীন দীপ জলে,
বাক্ তুই হে তিমির হরা,
বাক্ তুই স্রুতা পাত্র ! চির-স্রুতা-ভরা !

১০

তোম চন্দ্রমুখ হেরি স্রুতা-সুতকপিনী
হুইক এ কবি কুমুদিনী !
না জানি আসিবে কবে বিশ্ব আল্লাদিনী
সে শারদী সজ্জা বাসিনী ।
তোম শ্রীচরণে মুটে আনন্দে উঠিবে মুটে
এ চন্দ্র হস্ত কমলিনী ।
কোথা মা, কোথা মা, তুই সত্তোজ-বাসিনী ॥

১১

চিরদিন চিরদিন আমি লক্ষ্মী-ছাঁড়া ;
জন্মাকের একি, অলক্ষণ !
চিনিনি পরমমণি হয়ে জ্ঞান হারা ;
রক্ত ভাবি কাঁতেতে বতন ।
এবে মাগো বুঝিছাছি, তেঁকে মাগো শিখিছাছি
তুলনার তুল্য ব্রহ্মপদ,—
কল্পিত মাগো তোর পদ কোকনব ।

১২

সেই কল্প-ভঙ্গ-শাখে — বরদা, শুভদা,
ফলে রাঙা চতুর্ভুজ ফল,
তবু সে মাকাল বল ; তাই গো জ্ঞানদা,
বুঝিছাছি তাহাও গবল ।
ধনৈবর্থা, ঋদ্ধি, সিদ্ধি, সে শুধু দুঃখের বৃদ্ধি,
মাগাধিনি ! আর কুলাঘো না ;—
তোমায়ে তোমারি ভরে করি মা কামনা ।

১৩

আশ্রয়প্রদা, আশ্রয়দান, আর আশ্রয়দয়,
এই তিনে সব আসি মোটে ।
আছে বার এই তিন, সে জন অন্তর ;
বিশ তার পদতলে লোটে ।
বার এই তিন নাই, সব তার তরু ছাই ;
রাজা নয়, সেজন ভিখারী ।
তরু মাথি ব্যাণা ভাবে "বাঘি ত্রিপুরারি" ।

হুইক হরনীপড়া, হাংক সেফালি,
কোটী তারা জলুক্ আকালে,
তবু সেই মিনীপিনী তরাল, করালী ;
পূর্ণচন্দ্র যদি নাহি' হালে ।
ডাই মাগো তোরে চাই, তুই বিনা গতি নাই ;
নারী বধা হয় না মধুর,
বিনা সেই স্নলক্ষণ তালের নিম্বর ।

চক্রে, চক্রে, বট্ চক্রে সূতাও চক্‌শী,
আনন্দে অকুটো কমল ;
জাপক্ না সুমুদার হুগু কুতলিনী,
ল্পর্শে তোর হরলে চকল ।
সেই লহরীর জলে, সেই স্নল শতদলে,
সদা হোস্ সয়েলবাসিনী,
হির সৌর্যমিনী সম সবা হুহাশিনী ।
ঐবেবেশ্রনাথ সেন ।

বঙ্কিম-যুগের কথা ।

(১)

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকাব্যের
আলোনে, বহুদিবস পরলোকগত । কিন্তু
অজ্ঞাপি তাঁহার কোন জীবনচরিত প্রকাশিত
হইল না । ইহা বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালী
সাহিত্যের কলঙ্ক । তনিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র
স্বয়ং “আত্মচরিত” রচনা করিয়া গিয়াছেন ।
তাহা ছই ভাগে বিভক্ত । প্রথমভাগে তাঁহার
মূণ-সম্পর্কীয় কর্ম-জীবনের কথা লিপিবদ্ধ
আছে । তাঁহার মৃত্যুর চতুর্দশ বৎসর পরে
তৎপাকবিত্ত “আত্মচরিত” সাধারণ্যে প্রচারিত
হইবে, এইরূপ আশে ছিল । ১৮২৪ খৃঃ অব্দে
তাঁহার মৃত্যু হয় । তাঁহার পর বোড়ল,
বৎসর অতীত হইয়াছে,—কিন্তু অজ্ঞাপি তাহা
অপ্রকাশিত । ইহার কারণ কি ? একটাই
কি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন “আত্মচরিত” আছে ?
অথবা, তাহা নষ্ট হইয়াছে কিংবা ইহা
অমূলক জননব ? আমরা ইহার সমস্তর
পাইলে সমস্ত হইব ।

উপস্থিত প্রবন্ধে, আমরা তাঁহার জীবনী

না জীবনচরিত রচনা প্রস্তুত ছই নাই ।
আমরা বঙ্কিম-যুগের কথা আলোচনা করিব ।
অতীতের গল্প, লুপ্তময়ী ‘যুতির নিকর’,
সুতরাং বড় মধুর । আমরা ক্রমে ক্রমে
তাঁহাই বলিব ।

এ’যুগের প্রথমেই, আমরা গুপ্ত-কবি
ঈশ্বরচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করি । সকলেই
জানেন, বঙ্কিম, দীনবন্ধু ও রঙ্গলাল ঐক্যের
‘হাতে পড়ি’ ঈশ্বরচন্দ্রই নিকটে । এখানে,
সে বিষয়ের সবিস্তার পরিচয় দিয়া লাভ নাই ।
ঈশ্বরচন্দ্রের আনন্দবাহিনী রসিকতা, আজ
সাহিত্য-সমাজে অমরত্ব লাভ করিয়াছে ।
হরত’ বহুহলে তাহা সীলতা-বর্জিত—কিন্তু
সর্ব্বহলে নয় । সে রসিকতা, অনেক সময়ে
প্রজ্ঞার বাগে দাপিত হইয়া অধঃপতিত
সমাজের দুর্নীতি-রূপে প্রচণ্ড প্রকাশ্যভাৱে
মত গিয়া বাজিত । তাহার একাধিক প্রমাণ,
সেকালের “সংবাদ প্রভাকর” প্রকৃতিতে
লিপিবদ্ধ আছে । গুপ্তকবির এই প্রেমীর
রস রচনা, তৎকালিক সমাজ, কিন্তু তাহে

এধন করিত, আজ তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এ'বিশেষে, আমি একটা ঘটনা জানি—তাহাই বলিতেছি।

গুপ্তকবির আদিবাস কীচড়াপাড়ার। বকের অধিকাংশ পন্নোগ্রামের মত আজ ত্রিতা মালেশ্বরীর আক্রমণে বিগত-শ্রী। কীচড়াপাড়া, বহু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব জন্মস্থান। বক্রিমচন্দ্রের প্রাথমিক, বাল্যলীলাতির মধ্যে প্রথম ডিঃ পুনিম হুপারিষ্টেণ্ডেণ্ট হুপণ্ডিত ৮ জনকীশনাথ দাস মহাপরও এই কীচড়াপাড়ার বৈষ্ণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুপ্তকবি, আপনাতঃ "প্রভাকর" পত্রে, কীচড়াপাড়াবাসী ব্রাহ্মণজাতির সম্বন্ধে কতগুলি অশ্লিষ মন্তব্যের অবতারণা করিয়াছিলেন। ফলে, অনেক হকীমা বংশধরের দ্বিতীয় বিপুল প্রবল হইয়া উঠিল। কলির ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে গিয়াছে বা বাইতে বলিয়াছে, আছে হুগু এই কোণ !

হুগু বেল, গুপ্তকবি বিশ্রাম করিতে-ছিলেন—হঠাৎ ঠাকুরেরা দল বাহিয়া আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরের চোখে জোখারি, ঘুমে পইতা ছিঁড়িবার কথা! একালে, এ'সকল তর্ক-গর্জন, অনেকেই আমলে আনেন না—কিন্তু সেকালে ঠিক ইহার উল্টা ঘিল—ব্রাহ্মণের জোখারি একবার যদি অগিয়া উঠিত,—তাহা হইলে কি উপায়ে তাহা দিতিয়া গাইবে, সন্মলে তাহা ভাবিয়া অস্থির হইত। কালেই, গুপ্তকবি একই অস্ত্র হইয়া উঠিলেন এবং বাণাশ্রমটা বড় নিরাপদ ভাবিতেও পারিলেন না।

শান্ত হইবার নাম নাই,—ঠাকুরদের কোণ জমেই বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া

গুপ্তকবি তাড়াডাকি হাতখোড় করিয়া বলিলেন, "ভিতরে আসিয়া বহন,—একই তাবাকু আচ্ছা করিয়া দাপকে বহু করন,—যেদে কতকল আর বাহিরে গাড়াইয়া থাকিবেন?"

কথটা, ঠাকুরদের কাছে নেহাৎ মঙ্গল লাগিল না। ঠাকুরা ঘরের ভিতরে বাইলেন এবং কবির নিজেই তাবাকু লাগিতে বসিয়া গেলেন।

এখন - ঘরের একটা জানালা খোলা ছিল,—ভিতর হইতে বাহিরের একটা কলাগাছ দেখা বাইতেছিল। ঠাকুরদের একজনের মাথার হঠাৎ গুটবুদ্ধি গজাইয়া উঠিল। গুপ্তকবিকে অপদহু করিবার জন্য তিনি বলিলেন,—ওঃ! কবি ত' ভারি! আচ্ছা বাপু, তোমার কবিরের একটা প্রমাণ দাও দেখি!"

কবির বলিলেন "আচ্ছা করন।"

ঠাকুর বলিলেন "কদলীর উপরে একটা কবিতা এখন রচনা কর দেখি! জুদি কত বড় কবি নুহি!"

গুপ্তকবি বলিলেন, "ঠাকুর, কবিতা শুনিয়া বেশীরকম চট্টয়া উঠিবেন না ত?" স্বীকার করেন ত' বলি!"

ঠাকুর স্বীকার করিলেন। গুপ্তকবি, তখনই বলিলেন :-

খোলক গিহাও হরি ভূগুণদ বকে ধরি
তোদের মান বাড়িয়েছে,
শোনের শোন লেড়ে লেড়ে গলাধ দড়ি তেড়েতেড়ে
তাইতে তোদের প্রণাম করি।
(বুড়াকুঠ দেখাইয়া) নৈলে কলা কেঁবেছে!"

গাছের কলার পরিবর্তে, হাতের কলার আখার পাইয়া ঠাকুরদেব পেট ভরিয়াছিল কি না,—ইতিহাসে তাহা লেখে না।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রধানতঃ রসরাজস্বপ্নে পরিচিত থাকিলেও, গল্পকবিকর্তৃক বঙ্গ-সাহিত্যের বহু বিভাগ, প্রচুর উন্নতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যে মহাভাগের প্রাপ্যতা পরিভ্রমের ফলে, বঙ্গ সাহিত্যে আজ পুষ্প-পল্লবে শোভমান এবং জ্ঞানে বিভ্রান্তে মহিমাময় ঐশ্বর্যচক্রে ও তাঁহাদিগের মধ্যে অন্ততম। তাঁহার প্রত্যেকের প্রত্যয় বঙ্গ সাহিত্যের একদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সাহায্যে বহু নবীন লেখক সাধারণ্যে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়,—ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ প্রভৃতি বঙ্গের গৌরব-কীৰ্ত্তি-বরুণ প্রাচীন কবিগণের জীবন-সংস্কার কথা অনেকই জানিতেন না বা অল্পই জানিতেন। ঐশ্বর্যচন্দ্রই সর্বপ্রথমে, বহু পরিভ্রম এবং অল্পসঙ্কীর্ণতা বলে তাঁহাদিগকে জনসাধারণের সম্মুখে আনয়ন করেন। এ সকল লোক অপরিশোধ্য। ফলতঃ,—সকল দিকে না হোক—অনেক দিকে ঐশ্বর্যচন্দ্র, আদর্শ সাহিত্যিক ছিলেন। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট,—যে ঐশ্বর্যচন্দ্রের বর্ণ আমরা গ্রহণ করিয়াছি—কিন্তু সে বর্ণ পরিপোষের উপায় আমরা কিছুই করি নাট,—ঐশ্বর্যচন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবন বাঙ্গালী জানে না।

ইতিপূর্বে জগদীশনাথের নাম উল্লেখ করিয়াছি, অতঃপর, তাঁহার সম্বন্ধে দু একটা কথা বলিব।

জগদীশনাথের জীবনীকথাও সাধারণ

প্রকাশিত হয় নাট। কিন্তু বঙ্গের উচিত। বিভাগের তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন; প্রতিযোগিতায়, কেহ কখনও তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাট। তিনিরাছি, বিভাগের নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া বৎসরান্তে তিনি উর্দ্ধ শ্রেণীর পরীক্ষা 'ত' দিতেনই,—তাঁহার উপরে আবার নিম্ন শ্রেণীর পরীক্ষাও প্রদান করিতেন। এবং উত্তর শ্রেণীর পরীক্ষাতেই, তৎকর্তৃক প্রথম স্থান অধিকৃত হইত। বারংবার এইরূপ হওয়াতে, বিভাগের বর্ত্তমানগণ, অবশেষে বাধ্য হইয়া নিয়ম করিলেন, জগদীশনাথ পরীক্ষা দিন,—ক্ষতি নাট,—কিন্তু পরীক্ষার প্রথম হইলেও,—তিনি অ্যুর পুণ্ডার পাইবেন না—যে ব্যক্তি দ্বিতীয় হইবে,—সেই পুণ্ডার পাইবে। অরুণ, এ নিয়ম নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষাতে,—নিজের শ্রেণীতে জগদীশনাথ পরীক্ষাও দিতেন এবং বলা বাহুল্য পুণ্ডার জাহেও বঞ্চিত হইতেন না।

কিন্তু জগদীশনাথের কৃত্তি কেবল বিভাগের নয়, কার্যক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য প্রতিভার যে সকল নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন,—তাহা এই অম স্থানে বলাকালে বলিবার নয়। পুলিশবিভাগে তিনি যে দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—বাঙ্গালীর নগ্ন অদৃষ্টে সচরাচর তাহা ঘটে না। কিন্তু এই কার্য তৎকর্তৃক যেরূপ নিপুণতাপ সহ সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের গর্স প্রকাশ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তাঁহার চক্ষুতে এমন একটা তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ ছিল, যে সেই প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে অনেককেই সঙ্কুচিত হইতে হইত। তিনিরাছি,

একবার একজন চন্দ্র ও উগ্রত অন্নদারী পুরুষ,—ভাঁহার সুখের একটি কথাই আর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমবা বারাহেরে ভাঁহার কার্যক্ষমতার পরিচয়-মুচক কথেকণী কোটুৎলাজিনী কাহিনী বলিয়া।

জগদীশনাথের পাণ্ডিত্যও অসাধারণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বকোষ উৎসর্গ-পত্রের ভাঁহার পাণ্ডিত্যের উল্লেখ আছে। জগদীশনাথের পুস্তকাগারে নানাবিশয়ক বহু সস্তম জ্ঞান-পত্র পুস্তক একাধারে সংগৃহীত ছিল,—অসংখ্যকালে সেই সকল পুস্তকই ভাঁহার অধ্যয়ন লিপ্সা চরিতার্থ করিত। তিনি প্রকৃত সাহিত্যরসিক ছিলেন। বঙ্গভাষায় ভাঁহার অধিকারও অল্প ছিল না। “বঙ্গবর্ধন” যখন প্রথম প্রকাশিত হয়,—তখন তাহাতে যে নিরনিত লেখকগণের নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছিল তাহার ভিতরে ভাঁহাকেও দেখিতে পাই। অধিকন্তু তথাকথিত পত্রে ভাঁহার সঙ্গীত-বিষয়ক রচনাও বাহির হইয়াছিল। সঙ্গীতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

তিনি গান ধরিলে,—আর কাহারও উঠিবার ক্ষমতা থাকিত না,—ভাঁহার কর্তৃত্বের এমনই মধুর ছিল। পরন্তু, এই যে সঙ্গীতভিজ্ঞতা,—ইহা ভাঁহার অনিচ্ছিত গুণই নহ,—সাধনা দ্বারা, বিখ্যাত গুণই নহ,—সাধনা দ্বারা, বিখ্যাত সঙ্গীতচাঞ্চল্যের নিকটে শিক্ষাগাত করিয়া তিনি ইহাতে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। এবিধের একটি গল্প বলিতেছি।

কোথায়,—তাহা জানি না,—মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত ভাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কথা-প্রসঙ্গে, মাইকেল গুণ-প্রকাশ করিয়া

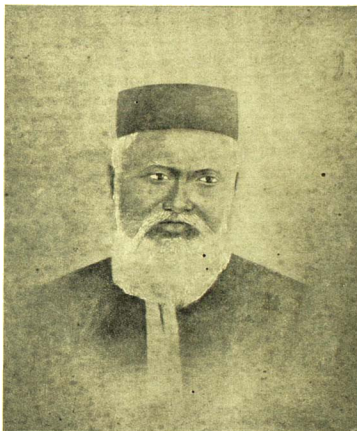
কহিলেন, “অনেক কবিতাই শ্রবণযোগ্যে গীত হয়,—কিন্তু লোকে বলে, আমায় “মেঘনার বধ” বড় কর্কশ,—তাহাতে গান হয় না। আপনামত কি?”

জগদীশনাথ বলিলেন, “গানে গাওয়া যায় না,—এমন বিষয় নাই। শ্রুত পাকিলে “মেঘনার বধের” প্রোক অনায়াসে গাহিতে পারা যায়।” মাইকেল সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু জগদীশনাথ, তখনই মেঘনার বধ হইতে প্রমোদিত উক্তি লটকা শ্রব তাহে গান দিলেন,—আর সে গানে সকলেই মুগ্ধ হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের “বিশ্বকোষ” লবণেই পাঠ করিয়াছেন এবং তাহার ভিতরে বঙ্কিমের নিজের জীবনের ছায়া আছে, একথা এখন অনেকেরই নিকটে পরিচিত। কিন্তু অনেকই যোধ হয় জানেন না, যে কেবল বঙ্কিম-চন্দ্র নন—বিশ্বকোষের মধ্যে, এক প্রান্তে জগদীশনাথও বিরাজ করিতেছেন! পরন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কেবল জগদীশনাথের চিত্রাঙ্কণের চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—ভাঁহার একখানি ইংরাজী পত্রের সম্পূর্ণ অমুবাদও বিশ্বকোষের মধ্যে বিস্তারিত। বিশ্বকোষের রচনা-কার্য সমাপ্ত হইলে পর, বঙ্কিমচন্দ্র, একখানি পত্রে জগদীশনাথকে লিখিয়াছিলেন, আমি তোমাকে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি,—কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আমি তোমাকে আঁকিতে পারিলাম না।

জগদীশনাথ, যখন কলিকাতার আশি-তেন,—তখন ভাঁহার প্রাদোদ্যম অট্টালিকা, নেকালের সাহিত্যিকগণের জটলা হইত। রবিবার পড়িলে, ভাঁহার তখন

সম্বোধনের আর সীমা থাকিত না। প্রসীদ হইতেন এবং সেই আশোচন্য প্রবণ করিলে, ও নবীন সাহিত্যকগণ, সেখানে একত্র বহুসংখ্যক পুস্তক পাঠের তুলা কর হইত।
হইয়া,—নানাবিধ লইয়া তর্কালোচনার প্রবৃত্তি ভগবীশনাথের পুত্র শ্রীমুক্ত বগেন্দ্রনাথ দ্বারা



মহাপদ, একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন “তখনকার কথা কখনও স্মরণনা,—আর সে সকল কথা বলিলেও,

সেই বর্ণনাভীত বাণীর বুঝাইতে পারিব না। এক একদিনের “টেবল টক্” ভনিতার আর মনে হইত, আজ কত নতন জ্ঞান, নূতন শিক্ষা

পাইলাম !” এখানে ইহাও বলিয়া রাখি,—যে বঙ্কিমচন্দ্র, কোম নৃতন পুস্তকের রচনা কালে জগদীশনাথের নিকট হইতে অনেক সাহায্য লাভ করিতেন। বঙ্কিমের বহু শিক্ষাপূর্ণ পুস্তকের উপকরণ জগদীশ কর্তৃক প্রদত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশনাথ অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট হইলেও, তাঁহারা উভয়ে অতিরিক্ত বয়স ছিলেন। জগদীশের আলোকে, বঙ্কিমচন্দ্র কতদিন ত্রিবিদ্যাপন করিয়াছেন,—একদিকে দানাহার করিয়াছেন। ত্রিবিদ্য, জগদীশনাথের বাড়ীতে গিয়া বঙ্কিম প্রায়ই পূর্ণমান করিতেন না। জলের উপরে মাথাটি দিয়া,—ঘটী হইতে জল ঢালিয়া বান সমাপ্ত করিতেন।

যাত্রিক, সে বঙ্কিম সকলেরই স্মৃহীনী। আর, বঙ্কিমের বঙ্কিম-জীবন সাহিত্যক্ষেত্রে আজ বিখ্যাত। এত গোলাগুলি এমন হরি-হর ভাব, বিজ্ঞান গুণের বিবেশ কলুষিত সাহিত্যক্ষেত্রে বড় একটা বেলা যায় না। একদিনের কথা বলি। বঙ্কিম, তখন কাঁথিতে। সেই প্রাচীন কাঁপি,—বেখানে কপালজুতলাই স্মৃতি। এ দিকে, জগদীশের নিকটে হঠাৎ একদিন নাটককার নীনবন্ধু আসিয়া উপস্থিত। একথা সে কথার পর,

জগদীশ বলিলেন, “চল, কাঁথিতে যাই,—বঙ্কিমকে একবার দেখে আসি।” নীনবন্ধু লম্বত হইলেন। উত্তরে, লখাসময়ে কাঁথিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া জগদীশ বলিলেন, “দেখ, বঙ্কিম এখন জ্ঞানেনা। যে আমরা তার কাছে যাঁতেছি, তখন একটু মজা করা থাক। বেদি, বঙ্কিম চিন্তিতে পারে কি না।”

বঙ্কিমচন্দ্রের বাগার নিকটে উপস্থিত হইয়া, জগদীশ তিথারীর সুরে, তিথারীর গান ধরিলেন। বঙ্কিম, সত্যই জ্ঞানিতেন না, যে জগদীশ তাঁহার কাছে যাঁতেন। তিনি ঘরের ভিতরে ছিলেন। এমন সময়ে গান শুনিতে পাইলেন। এবং তখনই ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, “বাম তিথারী থাম ! তোমার চিনিরাছি—এ গান কি ভুলিবার !” তখন তারি একটা হাসি পড়িয়া গেল।

এবার আমবা এইখানেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম,—যাত্রারবে বঙ্কিমের জীবন লম্বাছে আরও অনেক গল্প বলিব। পরিশেষে বঙ্কিম ভবিষ্যতে যদি কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চরিত রচনা করেন,—যেন জগদীশকে ভুলিয়া না যান ! কাংক্ষণ, তাঁহাকে নির্দোষিত করিবা, বঙ্কিমের জীবনচরিত রচিত হইতে পারে না।

ব্রাহ্মী কালবিভাগ ও কলিযুগের আরম্ভ ।

বিক্রমপুরাণের তৃতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক পাই :—

সমস্তপুণ্যধ্বংসঃ কলো নিঃশেষ উচ্যতে ।

তাবৎসমাপ্য চ বিপা ততো ভগতি সত্তমঃ ।

সমস্তপুণ্যধ্বংসঃ কলো নিঃশেষ উচ্যতে ।

তাবৎসমাপ্য চ বিপা ততো ভগতি সত্তমঃ ।

সমস্তপুণ্যধ্বংসঃ কলো নিঃশেষ উচ্যতে ।

তাবৎসমাপ্য চ বিপা ততো ভগতি সত্তমঃ ।

১৩: কলোভাগ্যভাগ্য কলো কলো কলোভাগ্য: ৪ ৮—৪১

৩৪শ বর্ষ, বর্ষ সংখ্যা।

ব্রাহ্মী কাণবিশাগ।

“এক বর্ষ নিঃশেষিত হইতে এক সহস্র যুগ (সময়) কথিত আছে। তাহার পর সেই পরিমিত (কাল) নিশা হয়। ক্রমান্বয়ে অধুনাঃ (জগৎপ্রবন) হইলে ব্রহ্মরূপের ভগবান্ আনিকর্তা বিহু আশিল ঐশ্বর্য্যাক্রমে গ্রাস করিয়া সর্ব্বময় (নাশরূপ) অনাধীনরূপে নিজমাতার সংস্থিত হইয়া শেবাছি (অনন্ত নাগ) বধ্যায় শয়ন করেন। তাহার পর নিশাতে প্রবুদ্ধ হইয়া সেই অব্যাহত ভগবান্ ব্রহ্মোক্তে বধ্যাপূর্ণ পুনরায় সৃষ্টি করেন; এইরূপ কয়ে কয়ে ঘটয়া থাকে।”

এই পুণ্যোক্ত বাক্যে যে কালবাক্য “কল্প” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে উহা কি এবং উহার পরিমাণ কত? এই প্রশ্ন বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ “যুগ” কথাকে বলে বুঝিতে হইবে, কারণ এক সহস্র যুগ পরিমিত কালকে এক কল্প বলে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এক কল্পের শেষে মহাপ্রলয়ে চরিতর বিশ্ব পরোধি ল্পে নিমগ্ন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম নারোহণ রূপে শেবাছিব্যায় নিমিত্ত থাকেন। তখন নিশা—সেই ব্রহ্ম নিশাও এক সহস্র যুগব্যাপী। তাহার পর নূতন কল্পারম্ভ ও নূতন সৃষ্টি।

ভাগবত প্রভৃতি পুণ্য গ্রন্থে আমরা “যুগ” শব্দের অর্থ পাই। মানবের এক বৎসর দেবতার এক অহোরাত্র; স্তরিত্ব অনুসারে

৩৬০ বৎসরে, ঐদগ ৩৬০ অহোরাত্র বা এক “দৈব বর্ষ” হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ লইয়া এক “দৈব যুগ”। এই চতুর্যুগের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে নিম্নে দেওয়া হইল।

সত্য যুগে এই চারি যুগের পরিমাণ মানব বৎসর স্পষ্ট দেওয়া আছে। “অতএব দৈবযুগে মোট দ্বাদশ সহস্র বৎসর অর্থাৎ “বিশ শংস্রাধিক ত্রিচত্বাশিঞ্চ লক্ষ” (৪৩ লক্ষ ২০ হাজার) মানব বৎসর। আনন্দের মনে প্রচলিত পঞ্জিকাতে ও এই সংখ্যা আছে।

নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে বুঝা যায় যে কলির বর্ষসংখ্যা সমস্ত দৈবযুগের এক দশমাংশ ভাগ মাত্র। তাহার বিত্তন দ্বাপর, তিনতম ত্রেতা, ও চতুর্থ সত্য। দৈবযুগের বর্ষ সংখ্যা ৪৩২০০০ আর্ধ্য্যভিহ্ন মতে “যুগ” এই স্ত্রে প্রতিলপ হয় তাহা পরবর্তী প্রবন্ধে বলিব। প্রাচীন কোমান জ্যোতিষবিদেরা ঐ পরিমিত কালকে সৃষ্টি বিবর্তন কাল (Annus mundanus) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মহাসংহিতায় আছে।

এতদ্ব্যবলম্বিতং দেবানাং যুগভূতং ।
দৈবিকান্যে যুগানাত্ সন্যস্ত পরিগণ্যতঃ ।
ব্রাহ্মণৈকমহাক্ষয়ে তাবতীং রাজিবৈবচঃ ।
তদৈব যুগসংস্রাজ্যং ব্রাহ্মঃ পুণ্যমহর্ষিঃ ।

সত্য —৩৮০০
ত্রেতা —১৬০০
দ্বাপর —২৪০০
কলি —১২০০

৪৩২০ × ৩৬০ = ১৫৭৫২০০ বৎসর ।
৩৬০০ × ৩৬০ = ১২৯৬০০০ “ ” ।
২৪০০ × ৩৬০ = ৮৬৪০০০ “ ” ।
১২০০ × ৩৬০ = ৪৩২০০০ “ ” ।

বৎসর

রাত্রিক তাৎক্ষণিক ভেদ যোজ্যত্বমিত্যে কথ্যঃ ।
তত্র সোহা বর্ণিত্যে প্রকৃতঃ প্রতিবৃদ্ধ্যতে ।
প্রতিবৃদ্ধত্বং দৃষ্টমিতি মতঃ পদসংলগ্নকঃ ॥

প্রথম অধ্যায় ১১—১০ শ্লোক ।

এক সহস্র দৈবযুগে, অর্থাৎ চারি শত
বক্রিণ কোটি মানব বৎসরে ত্রৈলোক্যে এক দিন
বা নৌকিক এক কল্প হয়। সৃষ্টির আদি
হইতে ৪৩২,০০০,০০০ বৎসর পরে মহাপ্রলয়
হইয়া ত্রৈলোক্যে আরম্ভ হয়; তাহার পর
আরও ৪৩২ কোটি বৎসর পরে নিশাবলান
হয় এবং সৃষ্টির পুনর্গঠন হয়। এইরূপ
আবর্তিত হইতেছে। প্রত্যক্ষভাবে লিপিত
আছে যে ত্রিংশ কল্পে ত্রৈলোক্য হয়। কারণ
এক কল্প এক দিগ্ন হইলে ত্রিংশ কল্পে ত্রৈলোক্য
এক মাস হইয়াই গড়ত। তাহার প্রথম
১৪ কল্প শুক্ল এবং শেষ ১৬টি কৃষ্ণ।
এই ত্রিংশটি কল্পের নামও পাওয়া যায়।

মহাভারতে আছে যে এইরূপ ত্রিংশ কল্পে
একমাস হইলে, এইরূপ ষাটশ মাসে অর্থাৎ
৩৬০ কল্পে ত্রৈলোক্য এক বৎসর হয়। “এবং
বর্ষশতং ত্রৈলোক্যং আত্মঃ তত্র পঞ্চাশৎ
ব্যাকীৰ্ত্তাঃ একপঞ্চাশৎসং অধুনা যেত
বরাহঃ কল্পঃ”। “ত্রৈলোক্য পরমায়ু এক শত
বর্ষ” অর্থাৎ ৩৬০০ কল্প। অকৌরব্য ধরিত্রী

মানবেন ৩১১০৪০০০০০০০, একত্রিংশ হাজার
একশত চারি অর্জন বৎসর হইলে ত্রৈলোক্য
এক বৎসর হয়। এইরূপ এক শত বৎসর
ত্রৈলোক্য, তদুপরে ৪০ বৎসর শেষ হইয়াছে
—একটি বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, ২৫৫ মাস
তাহার প্রথম কল্প (বারাহঃ) চলিতেছে।
সুতরাং ত্রৈলোক্য বরাহকল্পে ত্রিংশ কল্প
গিরাছে।

এক বর্ষ চতুর্দশ (১৪) মন্বন্তরে বিভক্ত
সুতরাং এক মন্বন্তরে ১০০০ + ১৪ = আরো
৭১৪ টি দৈবযুগ। ভাগবতে আছে
“বারাহকঃ চপবতো বহুং স্ত্রীকৃত্ত্বর্চনং ।
যং যং কালং যদুত্থুং তে সাধিকং যেক
সত্রতিঃ ৪৩১২২৪ ৪

অপিচ মন্বন্তরসংহিতায়

মৎস্যাক্ ষাটশ সাহস্রং উদ্ভিতং দৈবিকং যুগং
তদেকসমত্রিভুগং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥

প্রথম অধ্যায়—১০ শ্লোক ॥

অমরকোষে দেখি “মন্বন্তরং কু দিব্যানাং
যুগানাং একসমুত্তিঃ”। কালবর্গ ২২ ॥

বিস্মৃ পুরাণে চতুর্দশ মন্বন্তরের নাম আছে
এবং অধুনা কোন মন্বন্তর তাহারও নির্দেশ
আছে; যথা—

মহুঃ বারহুভো মাস মনুঃ ষায়াতিবত্বাঃ ।

ঔত্তমিযানসিষ্টবঃ বৈবতশ্চাক্ষুবত্বাঃ ॥

১ শ্রুতবারাহঃ	৮ কন্দর্পঃ	১৩ নারসিংহ	২০ মন্বন্তরী
২ শীলগোহিতঃ	৯ সভ্যঃ	১৪ মদাবিঃ	২১ বৈবৃষ্ঠঃ
৩ বাবসেবঃ	১০ ঈশানঃ	১৫ আর্যঃ	২২ অর্জুনঃ
৪ গাণ্ডারঃ	১১ দ্বানঃ	১৬ বিষ্ণুঃ	২৩ বশীকল্পঃ
৫ দৌবঃ	১২ সারথ্যঃ	১৭ পৌরঃ	২৪ বৈরাগঃ
৬ জাপঃ	১৩ ঈশানঃ	১৮ দেবদায়ঃ	২৫ পৌরীকল্পঃ
৭ বৃহৎকল্পঃ	১৪ গজতঃ	১৯ তাবনাঃ	২৬ সাংখ্যঃ

১৭ কৌর্ধঃ (জয় পূর্ণিমা)

৩০ গজবলঃ (জয় অব্যবস্থা)

এতেই মনবোহীতা: লগ্নমত মন: ৫০।

বৈবশতোহবা যশ্যত্ব নত্বো বর্ত্তিত যুগঃ।

যাচক্ষুঃ, যাতোভিঃ, ঔরমি, তামসি, বৈবশত
ও চাক্ষুশ এই চরুটি মনু অতীত হইয়াছেন;
অধুনা লগ্নম মনু বৈবশত (২৪৫ পূত্র) মনুর
কাল, এবং তাহার লগ্নম যুগ বর্ত্তমান।

অতএব আমরা অধুনা ত্রৈলোক্য (৩১)
একপঞ্চাশতম বর্ষের প্রথম কল্প যেতবারাধ
কল্পের লগ্নম মনুরের লগ্নম যুগে আছি।
একপে এই যুগের বিভাগ দেখা যাউক।
এখানে যুগ অর্থে দৈবযুগ সভ্যযুগাদি চতুর্যুগ।

লগ্নম মনুরের ছয় যুগ অতীত হইয়াছে।
লগ্নম যুগের ও সভ্য জৈতা ও যাপয় সম্পূর্ণ
হইয়াছে, এবং কলিরও কয়েক বৎসর অতীত
হইয়াছে। একপে আমাদের দেখিতে হইবে
কলির কত বৎসর গিয়াছে। তাহা হইলে
ত্রৈলোক্য বরপ এবং আমাদের স্মৃতির ইতি কাল
বুঝা যাইবে।

কলির আরম্ভ কখন হইয়াছে তাহা
লইরা মতভেদ আছে। প্রথম মতে ধর্মপুত্র
যুধিষ্ঠির যখন হস্তিনার একজ্যেষ্ঠ সিংহাসনে
অধিষ্ঠিত হন, সেই দিন যুধোদ্যের হইতে কলির
আরম্ভ হয়। কলিতে ছয় জন নরপতি
শককর্ত্তা বলিরা বর্ণিত আছেন তন্মধ্যে প্রথম
যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠিরের নাম প্রথম থাকার এবং
ছয়টি শকের মোট বৎসর কলির মান,
৪৩২০০০ বৎসর ষড়যুগ আমরা নিশ্চয় বলিত
পারি যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যান্তিমেষ্ট হইতে
কলির আরম্ভ।

দাক্ষিণাত্যে ও মহারাষ্ট্রে পঞ্জিকার উক্ত্যনাক
এবং তাহার নিম্নমত ব্যাখ্যা দেখা যায়।*

অতরাং কলির শক বিভাগ এইরূপ :

যুধিষ্ঠির শক	১০৪৪ বৎসর।
বিক্রমাব্দিতা	১০৪ "
শালিবাহন "	"
বিক্রমাব্দিসংখ্যন "	"
শালিবাহন	"
কর্ত্তী	৮২১ "

মোট ৪৩২০০০ বৎসর।

গোষ্ঠালিরের অবস্থান কালে (: ১০১)
জীঠাধে) একখানি "লগ্নম শকক" নামক
ঐ দেশের পঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম।
তাছাড়া উক্ত শকটি নাই বটে, কিন্তু
প্রথমদেশেই এই বিবৃতি আছে। "অশ্বিন
কলৌ ষট্ শককর্ত্তাঃ সূপাঃ। তৎপ্রজ্ঞে
যুধিষ্ঠির শকঃ ১০৪৪। ততঃউজ্জয়িন্যায় বিক্রম
শকঃ ১০৪। ততঃ প্রতিষ্ঠানে শালিবাহনশকঃ
১৮০০০ তন্মধ্যে গতাব্দাঃ ১৮২১ শেষশকঃ
১৮১৭৭। ততো গোতমীশালগরনন্দেনে বিক্রম
শিন্দনশকঃ ১০০০০। ততো ধার্মাতীর্থে
শালিবাহনশকঃ ৪০০০০০। ততঃ সমুদ্র
গ্রামে বহৌ ভবিষ্য তদ্ব্যকঃ ৮২১। ততঃ
কৃতযুগশ্রুতিবিত্তো।"

* প্রথম ইঙ্গরেজ যুধিষ্ঠিরের শকঃ ১০৪৪। দ্বিতীয় উজ্জয়িন্যায় বিক্রমশাল শকঃ ১০৪। তৃতীয় প্রতিষ্ঠানে
শালিবাহনশাল শকঃ ১৮০০০। চতুর্থো বৈবশিয়ায় শিন্দনশালে বিক্রমশিন্দনশাল শকঃ ১০০০০। শকযো
গৌড়দেশে ধার্মাতীর্থে শালিবাহনশাল শকঃ ৪০০০০০। ষষ্ঠঃ করবীষশালে কর্ণাটকে কদ্যবতারঃ তত শকঃ
৮২১। এবং ষট্ (৬) শককর্ত্তাঃ।"

উক্ত দুইটি পত্রিকার লিখন দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে যুগ্মিতির রাজ্য আরম্ভ হইতেই কলিবে আরম্ভ। লতর পত্রিকার কবীর শক ৮০১ বঙ্গাব্দ শেষ হইলে কলিবে শেষ, কারণ তাহার পর আবার সত্যায়ণ প্রবর্তিত হইবে।

একশে বিচার্য্য এই যে, অধুনা প্রচলিত শকগুলির হিসাবে কলিবে আরম্ভ হবে ৭ এ বিসম্বে 'আদি' একটি মাত্র বিখ্যাতগোষ্ঠা প্রমাণ পাটমাছি। রাজপুতানার অন্তর্গত জয়সমিবে চতুর্মানের একটি মন্দির আছে। তাহার গায়ে একশত শিগার শোভিত নিম্নলিখিত লিপি আছে।

"শ্রীযুগ্মিতির সা জ্ঞাতপত্রোঃ সিংহাননা-
পাদিনাং বর্ষবৃন্দ ৪৮২৮ গতে বিক্রমার্কে
রাজ্যায় সম্বৎ ১৮০৪ শালিবাহন শকাব্দশকে
১১১২ উত্তরায়ণ গতে।" খ্রীষ্টীয় ৭৮ অব্দে
শালিবাহন শক আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে
আমাদের বিনয়পত্রিকা ও লতর পত্রিকা ও
প্রমাণ। খ্রীষ্টাব্দ ১২০১ সালে লতর পত্রিকার
মতে শকাব্দা (গত শকাঃ) ১৮২০, সূর্য্যায়
শকাব্দা (১২০১—১৮২০) ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ
হয়। এ বঙ্গাব্দ (১২১১ খ্রীঃ) শকাব্দা ২৮৫০
সূর্য্যায় মন্দিরস্থ লিপির মতে ১৭১২ শকাব্দার
খ্রীষ্টীয় ১৭২৮ অব্দ পাওয়া যায়। সূর্য্যায়
যুগ্মিতির বর্ষবৃন্দ ৪৮২৮ গত হইলে, যুগ্মিতির
শকাব্দ (অর্থাৎ রাজ্যায়ম্ভ এবং কলিবে ও
আরম্ভ) ৪৮২৮—১৬২৮=৩১০২ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব
(B. C.) অব্দে হইয়াছিল। অতএব এই
মতে আমরা পাই যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩১০২ অব্দে
কলি আরম্ভ হয় (B. C. 3102)।

অপর একটি প্রমাণ আছে! যুগ্মিতির

শক ৩০৪৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ছিল, তাহার পর
বিক্রম শক ১৩২ বঙ্গাব্দ ছিল এবং এ পর্য্যন্ত
শালিবাহনের ১৮০৩ অব্দীত হইয়াছে। সূর্য্যায়
যুগ্মিতির রাজ্যায়ম্ভ হইতে আরম্ভ পর্য্যন্ত

যুগ্মিতির— ৩০৪৪ বঙ্গাব্দ
বিক্রমের— ১৩।

(১১১১) শকাব্দা— ১৮০৩

যেটি ৪০১২ বঙ্গাব্দ গত হইয়াছে।
অতএব কলিবে আরম্ভ হইতে ৪০১২ বঙ্গাব্দ
অতীত হইয়াছে। ইহা আমাদের সন্মত
প্রকৃতি পত্রিকাতেও পাওয়া যায়।
এ বঙ্গাব্দের শুভপ্রশ্নের ঐশ্বর্য্য পুঁঠায় আছে
"কলিগতাব্দাঃ ৪০১২ কলিঃ বিত্তাব্দাঃ
৪২৬২৮"। অতএব আমরা কলিবে ৪০১১
বঙ্গাব্দ পূর্ণ করিয়া ৪০১২ বঙ্গাব্দে পর্য্যাপন
করিয়াছি। এখনও কলিবে (৪০২০০—
৪০১২=৪২৬২৮ বঙ্গাব্দ বাকি রহিয়াছে।
বকীর ও অত্র পত্রিকার মারী পূর্ণিমা
শুক্রবারে কলিবে আরম্ভ। ইংরাজী মতে
হিমাংস করিলে ঐ দিন ১৮ই ফেব্রুয়ারী
ছিল।

কলিবে ৮২১ বঙ্গাব্দ থাকিতে কবীর
রাজ্যায়ম্ভ হইবে। তাহা হইলে এখন হইতে
৪২৬১৬৭ বঙ্গাব্দ পরে অর্থাৎ ৪২৮০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে
কবীর অবতার হইবে। এবং ৮২১ বঙ্গাব্দ
পর্য্যন্ত থাকিবার সুগাথর আনয়ন করিবে।
সে পর্য্যন্ত খ্রীষ্টাব্দ অব্দ থাকিতে পারে, কারণ
কবীর "স্নেহনিবহনিনধনে" শুঁহার প্রবর্তিত
শক বাদিত করিবেন। কিন্তু তত দিন
(শালিবাহন শক) শকাব্দা প্রচলিত থাকিবে
না। এই শকের পরমাত্ম ১৮০০ বঙ্গাব্দ, তাহার
মধ্যে ১৮০০ বঙ্গাব্দ অতীত হইয়াছে, বাকি

৩৬৭ বর্ষ, ৪ষ্ঠ সংখ্যা।

ॐ नमो कलविभक्त ।

১৯১৬ বঙ্গের আছে; তাহার পর বিজয়ভি-
নন্দন, নাগার্জুন ও কথীর শব্দ যথাক্রমে
প্রসঙ্গিত হইবে। তিনটি শব্দকারক যুগ্মটির
বিক্রমার্ক, ও শ্লিষবাহন হইয়াছেন। শেষটি
চলিতেছে। অবশিষ্ট তিনটি এখনও ভবিষ্যৎ-
গর্ভে। অগত আমরা তাহাদের নাম, ধর্ম ও
পরিচয় সুস্বত জানি! ত্রিগুণবর্নী আর্ঘ্য
ঐবগুণ অমল্য কালের আদি অগ্নি বোঝে হই
নবমর্পণে দেখিতে পাইতেন। নচেৎ ভবিষ্যৎ
কালের নাম এবং ব্রহ্মবেদেরও পরিচয় বিক.প
স্থিরীকৃত হইল।

কলির আরম্ভ লটহা। আরও দুইটি মত আছে। যে মহটি আমরা উপরে ব্যাখ্যা করিলাম তাইই বহুসময় এৰা প্রথম। দ্বিতীয় মতে ত্রিকোণের অন্তর্ধান হইতে কলির আরম্ভ দূর হইয়া যায়। বায়ু পূরণে আছে

ସମ୍ବନ୍ଧ କୁଳୋଦ୍ଧାର: ଧାର୍ଯ୍ୟତାପ୍ରସାର ଓ ସାମାଜିକ
ଅନ୍ତର୍ଗତ: କଳାସୂକ୍ଷ୍ମତା ଓ ସାମାଜିକତା

৯১ অধ্যায় ৪২৮ প্রাক।

অলিচ বিজ্ঞাপনের চতুর্থ অংশের
চতুর্ভাষী অধ্যায়ে কলিবার্ণ প্রসঙ্গে লিপিত
আছে

—“টাইবର ডগবডি” (Dugout Dog)।

বঙ্গদেবকুলোচ্চৈশ্বর্যকলিহাপ্ত: । ৩৭ ৬

ସାବର ମୁ ମାମମସା(ଅ)ଃ ମମ୍ମା(ର୍)ଭାଃ ସହଜାଃ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७७ ॥

যশস্বিন্ কুকে। নিবং যাঃ শুশ্রিণেব অকাংনি ।

ଅତିମହାଃ କଳିଯୁଗଃ ଶୁକ୍ଳା ସଂଖ୍ୟାଃ ବିଶୋଧ ସେ ୫ ୩୦ ।

গমনই বহুবেশকুলোদ্ভূত জগদানন্দের
অশেষ স্বর্ণের গদন করিলেন তখনই কলি
আনিল। ৩৪। বৃত্তফল তিনি (বৃত্তফল)
পানপত্র দ্বারা বহুভাষ্যে স্পর্শ করিয়াছিলেন
তত্ত্বফল কলি পুণিমা অধিকার (পুণিমা)

আলিঙ্গন) করিতে সন্মত হয় নাই। তাহা
শেষের প্রেক্ষাপট পূর্ণোক্ত বাহুপ্ৰণয়ের
প্রাক্কর সন্ধি অক্ষরে অক্ষরে ঘিলে।

অধিক প্রমাণ প্রবেশ বাহ্যিক। এই
বিভিন্ন মতে কলির আয়তন, প্রথম মত হইতে
প্রায় ২০,২১ বৎসর পরে—প্রায় ৩০৮১
অঙ্গে। তাহা যথা সময়ে দেখান যাইতেছে।

[illegible][illegible]

মুসলমান মহাপ্রাণনাশ গভী তিতি প্রাণিকিঃ ৪” ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে বিবস মুষ্টিবের রাজ্যান্তিমের শেষ দিন, সেই মুষ্টিবেরই “ভারত গুরুদিন” এবং সেই দিনটোই যাপনেরও শেষ দিন। তাহার পর দিন, ক্রমবধে, মুষ্টিবদি পক্ষান্তা হইয়াও ও পার্শ্বের একত্র মহাপ্রাণনার পক্ষে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন—সেই ক্রমবধে কলির প্রথম দিন।

উপরি উক্ত তিনটি বিভিন্ন বস্তু যে এক সময়ে কলির আকর্ষণ নির্দেশ করে না, তাহা বেশ বুঝা যায়। মুষ্টিবের চক্রানায় রাজ্যান্তিমের (প্রথম), ক্রমবধে চক্রোদয় (দ্বিতীয়) এবং পাণ্ডবের মহাপ্রাণনাশ (তৃতীয়) এই তিনটি ঘটনার মধ্যে কিছু কিছু কাল ব্যতীত ছিল।

প্রথমে পাণ্ডবপক্ষ লাভ ও উল্লস (আধুনিক দিল্লি) নির্মাণ ও তদাধি মুষ্টিবের প্রথম রাজ্যান্তিমের। তাহার পর, মুসলমান প্রত্নত এবং মুসলমানের ১২-বৎসর গন্ত হইলে যখন মুসলমান অধীনত দেশে গেল যে পাণ্ডব পক্ষে মুষ্টিবদি পক্ষান্তা লাভকি ও ক্রম ও এবং ক্রমপক্ষে প্রত্নত, অধিপতি, ক্রম, ক্রমবধী এবং পরশমাপাশী মুসলমান উল্লসের এই ক্রমবধে যাত্রা দেখা জীবিত আছেন। তখন উল্লস পক্ষে পক্ষান্তিম হইল এবং মুষ্টিব হইল ও উল্লস উল্লসের একত্র রাজ্য অন্তিম হইলেন। ইহা মুষ্টিবের দ্বিতীয় রাজ্যান্তিমের। প্রথম মতে এই দিন হইতে কলির আকর্ষণ।

তাহার পর ৪৮ রাজি পরশমাপাশী পাকিস্তান ভাষ্য স্বর্গারোহণ করেন। পরে অভিন্নমু-

খর পক্ষান্তিমের প্রথম হয়। তাহার পর এক বৎসর বাণী অধিপতিবধ; এইভাবে মুষ্টিবের দ্বিতীয় রাজ্যান্তিমের ১৫ বৎসর পরে মুসলমানের বানপ্রস্থ অধিপতি করেন। এক বৎসর পরে পাণ্ডবেরা তাহার পক্ষান্তিমের বান। তিন বৎসর অধিপতির পর মাগধের মুসলমানের মুসলমানের (মহাপ্রাণনাশ-প্রথমঃ ৩২)। দ্বিতীয় পক্ষে লিখিত আছে যে উল্লসের মুষ্টিবের প্রথম রাজ্যান্তিমের পর ৩৮ বৎসর গন্ত হইলে মুষ্টিব চক্রান্তিমের পক্ষে লিখিত লাগিলেন। সেই সময়েই ক্রমবধে নানক বাণের বাণে নিহত হন। কিছুপূর্ণাণ্ড ও আমরা দেখি যে ক্রমবধে দেহান্তিমের পরেই মুষ্টিবের রাজ্যান্তিম করিয়া মহাপ্রাণনাশ করিলেন।

কিছু আবার দেখা হয় ক্রমবধে মুসলমান চক্রান্তিমের পক্ষে হইল তিন বৎসর লাগিয়া ছিল। কারণ সেই সংবাদবাহক অধীন প্রথমে বাণের গিয়া ক্রমবধে অস্ত্রান্তিমের গিয়া ও ক্রমবধে অধিপতি করিয়া, পক্ষে বাণ-বধের সহিত দেখা করিয়া তবে হইলার গমন করেন। যখন মুষ্টিব অন্তিমের যে তাহার সপা ক্রমবধে আর নাই, তখনই রাজ্যান্তিমের পূর্ণক মহাপ্রাণনাশ করিলেন।

মুষ্টিবের প্রথম রাজ্যান্তিমের হইতে ৩৮ বৎসর পরে ক্রমবধে মুসলমান হইলে, এবং প্রথম রাজ্যান্তিমের হইতে ১৫ বৎসর পরে দ্বিতীয় রাজ্যান্তিমের হইলে, ক্রমবধে মুসলমান মুষ্টিবের দ্বিতীয় রাজ্যান্তিমের ২১ বৎসর পরে হইয়াছিল ইহাই সাব্যস্ত হয়। অতঃপর দ্বিতীয় মতে কলির আকর্ষণ ৩১০২—২১১—৩১১ খ্রী পূর্ণ অধিপতি (H. C.)। তৃতীয় ও

দ্বিতীয় সন্তে মাত্র ২.৩ বৎসরের ব্যবধান থাকিতে পারে ।

উপলব্ধ্যে ইয়া প্পষ্ট বুঝা যায় যে আমাদেবের সৃষ্টির কাল নির্ণয় এইরূপ হইবে । প্রকৃতি-দেবের ৫১ বৎসরের প্রথম কালের ৭ম মনুষ্যের ৭ম বৃণের সত্য যেটা ও বাণের সম্পূর্ণ এবং কলির ৫০১২ বৎসর গুণ হইয়াছে । প্রকৃতির বয়স $৫০ \times ৩৩০ = ১৬৬০০$ কয়, ও মনুষ্যের জন্মবয়স এবং ৩৬০০১২ বৎসর (শেন সংখ্যা সত্য যেটা ও বাণের সম্পূর্ণ এবং কলির ৫০১২ বৎসর) ।

উক্ত গণনা আবাদের জ্যোতিষ ও গণিতে কাল নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক । কোন ধর্ম বা সাম্প্রদায়িক প্রচার আত্মকুলো না ধরিণেও প্রাচীন গণিত ও জ্যোতিষ বৃত্তিতে হইলে এইরূপ কাল বিভাগ অপরিহার্য । এইরূপ বিরাট প্রণা কোন দেশে কোন শাস্ত্রে কমিত হয় নাই । উহা ভারতবর্ষের প্রথম মন্ত্রকের পরিচায়ক ।

শ্রীপরাক্রম উট্টাচাণী ।

সৌভাগ্য ।

যেদিন কবিতা দেবী কৃপাপরমেশ-
পরাণে দিকিরা যেন তাঁর সুধারস
অকস্মাৎ লক্ষ্মী পুত্র আসে যেন দুটে
একসাথে বরণের সব সুল সূটে !
চাঁতক ময়ূর শিক ফলহংস গায়
উত্তর দক্ষিণ পূর্ণ বায়ু বহে বায়,
বর্ণপঙ্ক স্নিতছলে আকুল পরাণ
কি মাঝিবে কিনা ছেড়ে করিবে প্রাণ

পায়েনা বৃত্তিতে, যদি এতটুকু পায়
পিছনে অনেক তবু পড়ে থাকে হায় !
কুহু এই সীমা বন্ধ মাহুসের মন
সে কেমনে অসীমতা করিবে ধারণ ?
অনন্ত আকাশ আর বিশাল ধরা
অতুলি একে একে দেখা বিধে বার ।

শ্রীমতী শ্রীধরনা দেবী ।

সতীর প্রতি ।

পুষ্টি ভোবার শিখ-মধুর দুকথারি সব,
পরাণ ভোবার হরি-চন্দন, উল্লী প্রসস্তম ।
আমর ভোবার সুলভরা মাঝি পোতারি স্নেহ হয়ে,
ফানসদয়লী ফাডাল করিয়া কে যেন এনেছে তরে ।
তব নিয়াম-সম্মুখনে অগুরু পঙ্ক সার,
চাঁবের বস্ত তল চিত্রণ তার চিত্রিয়েণ তার ।
অল ভোবার যেমতুবার পরায় বারিতরা
অতুলি তব চন্দ্রক স্নেহ অতুলি পুটে বরা ।
যতন ভোবার, পুহার যত্নে তরীর স্নেহনা,
কঠোর হার সৃষ্টিত বৃক-মদল আলিগনা ।

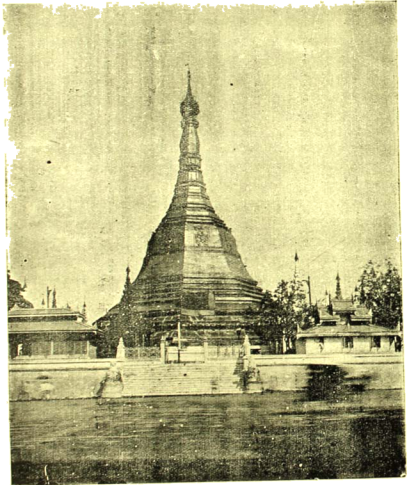
যতন তব গণের ডালা সম্মার সম্মুখনি,
কঙ্কন কন-বহারে উঠে পথবটাননি ।
হাত ভোবার নবনী-স্নেহ, বৈবরণের পাণ,
যত্নের পাতি ইলুকারি স্নেহস্নেহ মালা
শোভে সৌভাগ্যে সিংহাবিলু উদ্ভব হোবাংল,
সম্মান তির আরাতি আলোক আঁখি দুটা অল অল ।
নব বো ভোবা, তুমি যে অর্থা—সর্বদা নিবেদন,
যেবতার পার নিত্য পুনাচ, মানের আয়োজন ।

শ্রীকালিদাস দাস ।

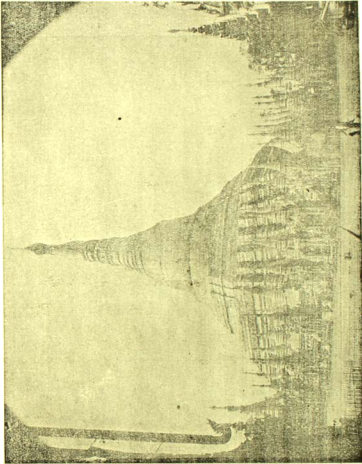
ভাষ্যসী।

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ-মন্দির।

দেশের বর্তমান রাজধানী হেন্সুন ও অদর্শন বৌদ্ধমন্দির আশাশুকের মন্দির দুই
পার্শ্ব করিলে গঙ্গাযাত্রী দুইটি স্থাপত্য করে। ইহাদের একটির নাম হেন্সু মন্দির,



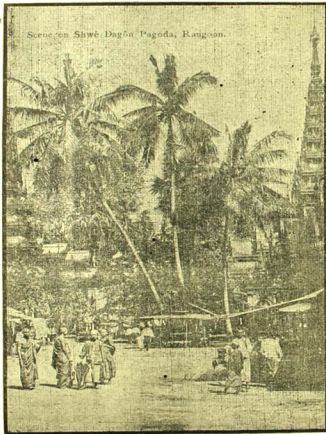
নিকট এবং সোমোডেঙন মন্দির নগরের
প্রান্তস্থিত ক্যান্টনমেন্টের নিকট অবস্থিত।



সোমোডেঙন মন্দির।

ব্রহ্মদেশীয় ভাবায় সোমোডেঙন মন্দির অর্থ স্বর্ণ-উন্নাদের স্থিতি স্বকর্ণে সোমোডেঙন মন্দিরের
চূড়। তখন যোগ, রাজা সিন-গিউ-ইন মণিপুর চূড়। স্বর্ণ-মণ্ডিত করাইয়া দিয়াছিলেন।
৬ কাছারের চূড় জরলাত করিয়া সেই সোমোডেঙন মন্দিরের গগনভেনী অক্লান্ত

অসংখ্য-মণ্ডিত চূড়া সহস্র চক্রে মণকদ্বিগেব এই স্বৰ্ণ-চূড়া প্রধান মন্দিরটির চারিদিকে
অবস্থান করিতেছে। প্রতিদিন বহুসংখ্যক আরও বহু স্তম্ভসহ মন্দির আছে। এই
বিভিন্ন মন্দিরগুলির লোক এই মন্দির দর্শনে সমুদ্র মন্দিরটিকে একটি বিশিষ্ট স্থানের মধ্যে
গমন করিয়া থাকেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশের ক্ষণ



— ৪৫ —
সোয়েডেডন মন্দিরের পরিদৃশ্য ।

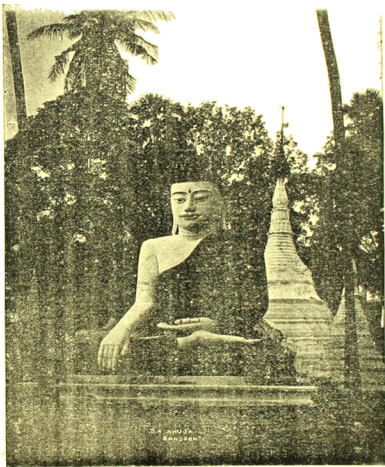
একটি বিরাট তোরণ আছে। এই তোরণ হইতে হয়। সোপানপ্রণীত হইয়াই স্থানীয়
স্বাক্ষর হইতে অনেক উচ্চ। অনেকগুলি রমণীগণ পুণ্য উপকরণ ফুল ফল বাতি ও
সোপান উত্তীর্ণ হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত পাখা প্রভৃতি লইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।

৩৬শ বর্ষ, বহু সংখ্যা ।

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ-মন্দির ।

৬৩৬

এইরূপ জনপ্রতি আছে যে, বুদ্ধদেবের মতকের এই ধারণার বশবর্তী হইয়া দেশ দেশান্তর হইতে কেণ্ডল্লুছ এই মন্দিরের মতো বসিত । বহু সংখ্যক বৌদ্ধ শাস্ত্রী হেহুনের গোহেডেঙ্গল



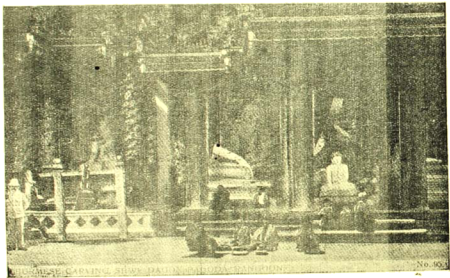
হেহুনেছ বুদ্ধমূর্তি ।

মন্দির বর্ণন করিতে আসিয়া থাকেন । তীর্থ-এখানেও দেখা যায়, কাণ্ডের পাড়ায়ের ভাগ, ক্ষেত্রে বর্ষ লইয়া ব্যবসার অনেক হুশেই আছে । বহু বংশি বৌদ্ধ-পুত্রোচিত বাতীদিগের

মিকট চইতে অন্ন আদায় করিবার জন্য নানাকল বাণ্টাত্তরী প্রযোগে করিয়া থাকেন।

এই গ্রন্থের মন্দিরটির চারিদিকে যে সকল ছোটবড় মন্দির রহিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই বৌদ্ধমতের নিশ্চিত বুদ্ধমূর্তি আছে। সকল মূর্তিগুলি একতাবের নয়, কোনটি শায়িত কোনটি বা দত্ত'হবান; কিন্তু অধিকাংশ মূর্তিই মুদ্রিতশোচন—খ্যা-নিরত-ভাবে উপবিষ্ট।

বৌদ্ধধর্মিগণ ঐকান্তিক ভক্তিভরে এই সকল মূর্তির পূজা ও ধ্যান করিয়া থাকেন এবং নানাবিধ উপকরণ সাহায্যী তৎপর্যবে উপহার দিয়া থাকেন। এই মন্দির দর্শন করিলে বিশুদ্ধ বৃত্তিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণসৌবা বুদ্ধদেবকে কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বুদ্ধের নামে, বুদ্ধের উদ্দেশে, বুদ্ধের পূজায়, বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় ইহারা অকাতরে কত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাহুত্রে অর্থব্যয় করিতে



গেডেগন মন্দিরের কাঁকাস্তা।

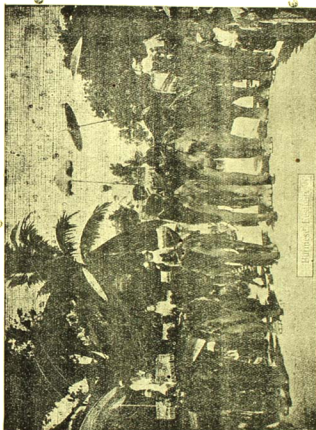
ব্রাহ্মণদের বৌদ্ধগণ একবারে মুক্তহস্ত বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। ইহারা কলাকার জন্ত চিন্তা না করিয়া, পূজা-পার্বণে যথাসর্ব্ব্ব ব্যয় করিতে সূচিত মনেন।

দৈনিক আহারব্যবহারেই একদেবের

বৌদ্ধগণ অবহার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া আমোদআজ্ঞা করিয়া থাকেন। ইহাও উপর বহি পূজা-পার্বণের দিন উপস্থিত হয় তবে কি আর ঐহাদের আমোদের সীমা থাকে? মূল্যবান বসনবস্ত্র লজ্জিত হইয়া এবং

বহুবিধ আহার্যাদি সবে লইয়া পূর্ণোপলক্ষে
ইহাঙ্গা সপরিবারে “কথা” দর্শনে গমন করেন।
যে সকল মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে
তাহাকে অন্ধবাসীরা ‘কথা’ বলেন; ‘কথা’ বলিতে

যেন পীঠস্থান বুঝায়। প্রত্যেক পীঠস্থানেই
বহু বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। এই সকল
মন্দির ও মূর্তি গুরুত্ব ব্যক্তির। নিজস্বাধে
কিংবা সাধারণের শ্রমত্ব অর্পে নির্মাণ করা হইয়া



প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। মন্দির ও মূর্তি
সমিষ্টা করিলে যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় হয়,
অন্ধবাসীসকল একত্রে বিশ্বাস আছে।

একত অন্ধবেশের পথে যাঁতে হাটে মাঠে
অন্যথা ‘কথা’ প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

শ্রীকাল্যাণদাস দাশগুপ্ত :

স্বরলিপি ।

দ্বিতীয় সঙ্গীত—রূপকূড়া

উত্তম দামোদর বাবল করে

বেলা যে গার একা করে ।

গরল ছাওয়া বহে যেগে,

পাগল নদী উঠে জেগে,

আকাশ ঘেবে কাজল মেঘে

ওহাৎ বনে আঁধার করে ।

ওগো বঁধু দিনের বেগে

এলে তুমি কেমর বেলা ।

আঁচল দিয়ে শুকাব লল

মুছাব পা আঁচল কেনে ।

নিবিড় হলে তিমির রাত,

জ্বলে দেধা প্রেমের বাতি

পরান খানি দিব পাতি,

চমক বেগে তাহার পরে ।

শ্রীবীজনাথ ঠাকুর ।

২ মা -। ৩ মা -। -গা। ১ রা রা -পা। ২ পাঃ মাঃ পা -। -রা।
 ধা রা • র্ পা ধ ল্ থ রে • •

৩ দ্বা -। -ধা। ১ পদা পা -ধ পা। ২ মা -গা। ৩ রা -। গদা।
 দা • র্ এ বা ব বে • • •

II ১ না না -। ২ না -। ৩ না -। -পা। ১ পা না -। ২ সা -না। ৩ র্মা -। পা।
 দ ত ল্ হা ওয়া • ব হে বে • থে • •

I ১ ধা ধা ২ গা -ধা। ৩ নদা -। -। ১ ধা ধগা-র্মা। ২ গা -ধা। ৩ পা -। -।
 পা গ ল্ ন দী • • উঠে • • জে • গে • •

I ১ মাসা-গা। ২ গা -। ৩ ধা -। -। ১ ধা ধগা-র্মা। ৩ গা -। -।
 আকাশ্ বে • রে • • কাঁজ • ল্ যে • •

I ১ র্মা র্মা -। ২ গা -ধা। ৩ পা -। -রা। ১ সা রা -। ২ রা -। ৩ রা -। গদা।
 ত মা ল্ ব নে • আ ধা ল্ ক • রে • • •

II ১ সা রা -। ২ রা -। ৩ রা -। -গা। ১ রা রা -পা। ২ মা -গা। ৩ রা -। -সা।
 ওগো • বঁ ধু দিনে ল্ লে • যে • •

১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I সা রা -মা। পা -ধা। গা -না I পদা পা -ধপা। মা -গা। রা -না I
 এ লে . কু বি . . কে স্ব . ন্ বে শে . .
 ১' ২ ৩ ১' ২ ৩ ১'
 I মানা -পা। পা -না। পা -না I গা পা -না। না -না। সা -না I সর্সা -না।
 জাঁচ ল্ দি . দে জ্ঞা . ব . জ . ল্ সু জ্ঞা .
 ২ ৩ ১' ২ ৩ ১'
 I সর্গাঃ -ধঃ। পদপা -না I পদা পা -না। মা -গা। রা -না I I না না -না।
 ব . গা জ্ঞা ল্ কে . পে নি বি জ্
 ২ ৩ ১' ২ ৩ ১' ২
 I না -না। না -না I পা না -না। সর্সা -না। সর্সা -না I ধা ধা -গা। গা -না।
 হ বে তি নি হ্ রা তি মেলে বে . .
 ৩ ১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I পদা -না I ধা পদা -সর্সা। গা -ধা। পা -না I I মা মা -গা। গা -না। ধা -না I
 যো গে দে বা তি পরা ল্ নি
 ১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I ধা ধা -সর্সা। সর্গাঃ -ধঃ। পা -না I পদা সর্সা -না। গা -ধা। পা -না I
 দি ব পা তি চ র ল্ বে
 ১' ২ ৩
 I সা রা -না। রা -না। রা -না I গা I I I I
 তা হা হ্ প রে

শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসুঃপাণ্ডাঃ।

রাজকন্যা

দশম দৃষ্ট।

(বেপথো বুদ্ধ কোলাহল,—নাগাড়) শব্দ, অশ্রুধারি, চীৎকার আকাশন ইত্যাদি।
 স্থান—পদসন্নিহিত উত্তান-কুনি। উৎকণ্ঠিত ভাবে রাজকন্যার প্রবেশ।)

রাজ। (আকাশের দিকে চাহিয়া) ত কোলাহলের নিবৃত্তি নাই—ক্রোধঃই যেন
 উঃ আকাশ কি মেঘাচ্ছন্ন! বিগ্রহেরে লক্ষ্য বাড়েছে! কোন্ পক্ষের অগ্নি হোল কিছুই ত
 জ্বলছে। রাত পেকে যুদ্ধ চলছে এখনো নৃকণ্ঠে পারহিনে। থাকেই সংবাদ আনতে

পাঠাচ্ছি সেই অনুষ্ঠ হতে পড়ছে !
(করঘোড়ে) হরি, বিপদের কাড়ারি, দয়াময়
রক্ষা কর প্রভু !

(হাসির উচ্চ্বাসে প্রবেশ ।)

রাজ । বল বল কি সংবাদ হাসি !
হাসি । রাজকণ্ঠে, উঃ কি দৃষ্ট দেখি
দৃষ্ট !

রাজ । মহামতি অক্ষত ত ?

হাসি । কি বলব রাজকণ্ঠে কিছুই
জানি নে। শুধু কানে বাজছে দেই গগনভেদী
চীৎকারহুকার, আর চোখের উপর নৃত্য
করছে দেই সহস্র হুণ্ডের অসির ফলক,
তক্তের ফলক, কাটাছুগ আর কাটা বেহ !

রাজ । (বগত) বল দাও প্রভু, বল
দাও ।

হাসি । কি ভয়ঙ্কর দৃষ্ট রাজকণ্ঠে—!
তবু দূর থেকে দেখেছি ; তোমাকে যে একা
ফেলে গেছি—নইলে—

রাজ । কুবজুয়ার—হাসি ?

হাসি । জানি নে রাজকণ্ঠে, কি কহে
জানব কে কুবজুয়ার ?

রাজ । (বগত) ছবর যে অবলম্বন হয়ে
আগছে ।

হাসি । সন্মুখের ডেউয়েড মত দেই চলন্ত
মাহুঘের দল, মাগছে কাটেছে চীৎকার
করছে—আর—

রাজ । (বগত) একি আশঙ্কা—এ যে
স্তার মঙ্গল শক্তির প্রতি অবিশ্বাস !

হাসি ।—আর আহত হতে মাটিতে
পড়ছে । তার মধ্যে কে শত্রু কে মিত্র, কে
আত্মীয় কে পর কি করে জানব—কি ক’রে
চিনব রাজকণ্ঠে !

রাজ । (বগত) তবু তকি অটল রাখ
দেব ;—বিশ্বাস অবিচলিত হোক ।

হাসি । হার হার ! তত আত্মীয় স্বজনকে
না জানি হারালেম— !

রাজ । তাই হয় হোক, অন্ধকার
প্রত্যাহার আগমনই ঘোষণা করে,—যটিকা
শান্তিরই পূর্ণ হুচনা, সেই শোণিত পাত্তেই—
যদি তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য সন্নিহিত হয় তাই
হোক ! বল দাও প্রভু বল দাও ।

(নেপথ্যে বিজয়গায় কোলাহলহুকার,
মার মার কাট কাট শব্দ, উভয়ের ব্যাকুল
ভাবে পথের দিকে নিরীক্ষণ)

হাসি । (ভীত চকিতভাবে) রাজকণ্ঠে
বিস্তোভের এই বিকেই আগছে, কি জানি
তাদের মনে কি আছে, মন্দিরে চলুন, মন্দিরে
চলুন—

(মন্দিরান্তিমুখে লইয়া যাইবার ইচ্ছায়
রাজকণ্ঠায় হস্ত ধারণ)

রাজ । শান্ত হও হাসি, নির্ভয়ে থাক ।
আমাদের প্রতি এরা কখনই কোন অত্যাচার
করবে না—একি—একি—

হাসি । (রাজকণ্ঠায় হস্ত ত্যাগ করিয়া
অশূলি নির্দেশে) দেখুন দেখুন—সত্যই তারা
এই বিকেই আগছে—এইখানেই—

রাজ । এ যে কুবজুয়ার ! অভিমুখায়
মত চারদিক থেকে তাকে লক্ষণে আক্রমণ
করছে । কান্ত হও দৈয়গণ—ধার বাধ—

(নেপথ্যে)

এ যে আমাদের রাজকণ্ঠা,—তিনি কি
আদেশ করছেন শোন—

রাজ । তোমরা আমার তাই, আমার

মস্তান—অসহায় অহতননকে আঘাত করে
না তোমরা।

(নেপথ্যে ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে)

ছেড়ে যাও তবে ছেড়ে যাও -,

যাঃ তবে। বড় ভাগ্যের লোক বেটার,
বৈঠে গেল!

বেশ বাগিয়ে জালে কেনা গিয়েছিল বস্ত্র
মাছটা কড়ে গেলেরে—!

রাজ। ইনি আমাদের শত্রু নয়, মিত্র
সহায় বন্ধু—

(নেপথ্যে বহু কণ্ঠে)—এ বেটারা কে শত্রু
কে মিত্র তাতে গোকার খো নেই—সবাইকেই
এক কোণে নিকাশ করতে পারলেই মঙ্গল!

কিছু রাজকন্তা আবেশ করেছেন তার
উপর ত কথা নেই। যাঃ বেটা যা তোম
অনেক পরমায়ু—!

মকলে। প্রণাম হই রাজকন্তে, অথ
আমাদের রাজকন্তার অথ অথ—অথ।

(অস্বপ্ননি করিতে করিতে নেপথ্যে হইতে
মকলের প্রস্থান—সকালকালে ঐ প্রস্থানের
প্রবেশ)

ঐ। দেবি, ভগিনি, কার্যসিদ্ধি হয়েছে,
মহারাজ অকৃত, বিজ্ঞোহ নিয়ান্ত হয়েছে।

(বলিতে বলিতে পরশলে ভূমিতে পতন)

রা। অল হাসি অল—ঐশ্বর্য ঐ পুঙ্খ
বেকে অল আন! (পার্শ্বে উপবেশন করিয়া)
হায়! কিছু ভূমি যে অতবিকৃত হয়ে
এলেছ ভ্রাতঃ!

(হাসির প্রস্থান। রাজকন্তা প্রবন্ধুদের
অঙ্গবস্ত্র উন্মোচনে নিষত)

রা। (বস্ত্রাক্ত অঙ্গরক্ষা খুলিতে
খুলিতে) ভ্রাতঃ ভূমিই খত! তোমার জীবন

যুগ্ম সবই খত! সত্যের জন্ত, ধর্মের জন্ত এ
জীবন তুমি ত্যাগ করেছ! হায়! তবু কেন
চোপের অল মনেছে না! উঃ একখানা
ভাঙ্গা বর্ষাকলক এখনো বুকে বিধে রয়েছে
—যত্নে যে স্থান ভেঙ্গে গেল!

(বলাফলক তুলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ ও
অকল গুলে বক্ত মাধ্বিন)

(প্রবন্ধুদের মুদ্রিত নেয়ে হস্ত আত্মগন
করিয়া) হুর্ভুত—কৃত্রিম!

রা। শান্ত হও, শান্ত হও বৎস,—তুমি
জড়ী হয়ে এলেছ।

ঐ। (চক্ষু খুলিয়া) ভগিনি, দেবি, এ
ভূমি! কি শান্তি। কি আনন্দ! মহারাজ
অকৃত—সেনাপতি বার্ষ—আঃ—

(পুনরায় মুদ্রিতভাবে অবস্থান।
উজ্জান ভূমিতে পতিত একটা জীর্ণ স্মারিতে
করিয়া গামির অল লইয়া আগমন।)

৩। রাজ। (প্রবন্ধুদের বক্তব্যে অল
দিতে নিতে) যাও হাসি ভূমি আগার যাও,
ছুটে প্রলেপাদি নিয়ে এস—আঃ পলে থাকে
পাও শিবিকা আনতে বলো।

হা। আরে ভূমি একলা—

রা। যাও হাসি বেশি করো না। আমি
একলাই সেবা করছি যাও—

(হাসির প্রস্থান)

(রাজকন্তা প্রবন্ধুদের ক্ষতস্থান ধৌত
করিতে করিতে)—চাহ! এ শোণিতে কি
মহারাজের অঙ্গবস্ত্র হবে না—হবে না!
ধর্মের অগোকে সত্যের অগোকে তাঁর অঙ্গ
নয়ন গুলে যাবে না!—অগত্যে অথ—অস্বপ্ননি
সত্যের অথ চিরস্তন—

এ। (মুগ্ধিত নেত্রে) কোথায় গেল কোথায় গেল, তাকে যে দরতে পাচ্ছি—

রা। শাস্ত হও জ্ঞাতঃ! হায়! এখনো মুক্তের মধ্যেই বিরাজ করছেন! একি এঁর বক্ষ থেকে একি রক্ত হাতে খুঁপে এল, কলে ধুয়ে বেন জারার মত ঝলছে—একি একি! এ যে আমারই জ্ঞাতার কবচ! জ্ঞাতঃ, বৎস, বীর, এতদিন যে আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম! প্রহতম, পানাদিক আজ কি মুহূর্তে তোমাকে পেলেম!

(নত হইয়া ঐক্যমারকে বক্ষে ধারণ।)

জানার প্রবেশ ও স্তম্ভিতভাবে দৃত্যারবান।)

রাজা। সত্য ভবে—সব সত্য! আমার অন্তরের ভিতর থেকে এ কপার যে প্রত্যয় জন্মায় নি। তবু সত্য, তবু সত্য! ওস্তাদি—
রাজ। (সতর্কিতে ও সমস্তঃ উঠিয়া দাঁড়াইয়া) পিতা—মহারাজ—তোমারই সন্তান,—এ তোমারি—

মহা। (ঘসিতে হাত দিয়া) চুপ্-নিরুজ্জা,
চুপ্-পান্দিয়াস—বিস্ময়পূর্ব্বক শত দিকার যে তুই আমার সন্তান। এই অস্ত্রে আজ—না এ হস্তে তোর শাপরক্তে কলঙ্কিত করব না—

(ক্ষতবেগে নিঃস্বপ্ন, স্বাভবেনে সেনাপতিকে দেখিয়া নেপথ্য হইতে)

সেনাপতি চামুড়া মন্দিরে এখনি বলি-
দানের আয়োজন করিতে বল—আর ঐ
দৈনিকের মৃতদেহ চণ্ডালহস্তে সমর্পণ কর।

সেনা। (নেপথ্য হইতে) বশাবেশ—

উভয়ের প্রস্থান।

রাজ। তবু দৈর্ঘ্য দরতে হবে—উঃ কি করব—কি উপায়! কি করে বাঁচো! (একটি বৃকপত্র হুড়াইয়া) এই পাতার এই রক্ত দিয়েই

পত্র লিখি—সময় নেই সময় নেই! অবশ্যই
ক্ষণকাল দূরে থাক;—মৃত্যু মুহূর্ত্ত বিলম্ব
কর—ভগবান বল দাও—বল দাও—

(বর্ষাকলকথতে ছুঁমির রক্ত লইয়া
গাছের পাতার পত্র লিখিয়া)

কাকে দেব—কে নিয়ে যাবে?—বুঝি সব
মৃগ্য হোল,—এখনি এসে পড়বে, ঐ বুঝি
এলো—

বিদূষকের প্রবেশ।

উঃ ভগবান রক্ষা করলেন! বক্ত তাঁর দয়া!
বিদু। হামির সঙ্গে পণে দেখা—সে
আমাকে এই সপ্ত শুদ্ধ বিষু দিয়ে এখানে
পাঠালে—আর নিজে শিবিকার চৌকীর গেল।
—উঠুন—আপনি উঠুন আমি দেখা করছি।
যেদবেদান্ত কিছু লিখি না লিখি বৈদ্যপাত্রটা
একরকম দণ্ড করছি—বিশ্বাস করবেন।

রাজ। (উঠিয়া) বিদূষক, দাও তবু
আমাকে দাও—আর তুমি শীঘ্র যাও,—এই
পত্র নিয়ে এখনি ছুটে যাও।

বিদু। আবার ছুটেতে হবে! (বক্ষে
হাত দিয়া) উঃ এখনো যে নিশ্বাস পড়েনা!
এ কি এ যে রক্তে লেখা! কোথায় বাব?

রাজ। যাও বিদূষক, শীঘ্র যাও—আর
সময় নেই—এই পত্র এখনি মহারাজকে
দিতে হবে—যদি পত্রখানি না দিতে পার ত
মুখে বলো—এ দৈনিক তাঁরই সন্তান,
আমাদের সুবরাজ—রাজপুত্র মরেন নাই।

বিদু। ঐক্যমার আমাদেরই রাজপুত্র!
রাজ। হ্যাঁ বিদূষক যাও, সেই কথাই
মহারাজকে শীঘ্র বল; নইলে শত্রুর হাত
থেকে এঁকে বাঁচাতে পারব না; শীঘ্র যাও—

ওহন বৎ, যত শংখা।

রানকড়া।

আমি এই কণ্ঠটি তাঁকে দিও তাহলেই তিনি
শব্দ বুঝবেন।

বিশু। আমাদেব রাজপুত্র জীবিত—কি
আনন্দ কি আনন্দ! যাচ্ছি—এখন যাচ্ছি!
এই সুখের আমিই তাঁকে দেব—দেখবেন
একথা আর কাউকে এখন বলবেন না।

ঋতবেগে আহান।

রাজ। (পুনরায় উপবেশন পূর্বক
ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে দিতে) রক্তে যে
ভেঙ্গে গেল। হানিত এখনো শিবিকা
নিরে এগ না? আবার কার পারের শব্দ এ!
হারে! বৃষ্টি পারগেয না—শব্দ নির্দগ্ধ—শব্দ
ব্যর্থ! ভগবান দয়াময়—

(চতুর্থ গৈনিকগণের সহিত সেনাপতির
প্রবেশ ও লক্ষণের রাজকণ্ঠ্যকে গৈনিক প্রণাম
নমস্কার)

সেনা। শিবিকা প্রস্তুত আপনি উঠলেনই—

রাজ। শিবিকার প্রয়োজন নেই,—
মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, আমি এখন শব্দরঞ্জে
চামুত্তামন্দিরে উপস্থিত হব।

সেনা। ক্ষমা করবেন,—এ জীবন
থাকতে সে নিষ্ঠুর আদেশ পাণ্ডিত হতে দেখ
না। আমি শিবিকা এনেছি আপনাকে
নিরাপদ করার জন্য—বিশেষ করবেন না।

রাজ। তোমার যত্ন শোক! কিন্তু
আমি রাজাধীশ গণ্যন করতে অপারক—
কেবল একটি অমুগ্ধ হ্রিকা আমার আছে।

সেনা। বসুন—আমি আপনার দান।

রাজ। গৈনিকেরা যেন এই দেহ স্পর্শ না
করে।

সেনা। (বগত) কি অমুগ্ধ! জ্বর
অগ্নে—উঠছে—অগ্নে উঠছে। (প্রকান্তে)

ক্ষমা করুন—আপনাকে রক্ষার জন্য রাজাধীশ
গণ্যন করতে পারি কিন্তু সামান্য গৈনিকের
জন্য—

রাজ। সামান্য গৈনিক!—(বগত)—না
বলা হবে না।

সেনা। গৈনিকগণ

নিরে যাও।

(গৈনিকগণের প্রবৃত্তিমায়েক লইতে আগমন)

রাজ। বৎসগণ—এঁকে তোমরা স্পর্শ
কোয়ো না, দূরে দাঁড়াও—তোমাদের রাজ-
কণ্ঠ্যর আদেশ—দূরে দাঁড়াও।

(গৈনিকগণের সঙ্কটতে দূরে দণ্ডায়মান
ও সতরে সেনাপতিকে নিরীক্ষণ)

সেনা। আপনি কৃত্য হয়ে রাজাধীশ
গণ্যন এদের প্রবৃত্ত করছেন?

রাজ। না। মহারাজ শব্দ নিরে বেতে
বলেছেন। এ গৈনিক এখনো জীবিত।

সেনা। (বগত) উঃ সহ হয় না! জীবিত!
এই মুহূর্তে এই অগ্নি আঘাতে শত শত করে
ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে যে! কিন্তু তাতে অচ্যুত
নিষ্ঠ হবে না। (প্রকান্তে) রাজকণ্ঠ্যর
আদেশ—আজ্ঞা গৈনিকগণ—বহুক্ষণ না আমি
ডাকি তোমরা অস্ত্রাঙ্গে দাঁড়াও।

(গৈনিকগণের ঘবনিকার অস্ত্রাঙ্গে গমন)

রাজকণ্ঠ্য বা আদেশ করবেন—এ দান
তাই পান করতে প্রস্তুত! আপনার জন্য
এ জীবনদানও তৃষ্ণকথা—কিন্তু—কিন্তু দানও
পূরকার প্রার্থনা করে—

রাজ। বশ কি পূরকার চাও—

সেনা। আপনাকে—আমার—মহিষী—

রাজ। মাতঃ বহুক্ষণ বিদীর্ণ হও—
বিদীর্ণ হও—

সেনা। (সংক্ষেপে) সামান্য নৈনিকের
নন্দনের অধিকারের নয়—আর আমার
মহিষী—

রাজ। চূপ নরায়ণ চূপ—(করবোড়ে
উঁকে দৃষ্টিপাত এবং হৃৎকুমার সহসা উঠিয়া—)
পাণিষ্ঠ নরায়ণ! এত বড় স্পর্ধ এই—
এই—প্রতিশোধ,—এই স্নাতিকণ!

(সেনাপতির বক্ষে আগ্নেয়বিদ্ধকরণ এবং
সেনাপতি ও হৃৎকুমার উভয়েই ভূমিতে
পতন—)

সেনা। উঃ কি জালা! নৈনিকগণ
চতালগণ লত, ধর, বাধ—প্রতিশোধ প্রতি
শোধ!

অথ। এখন মৃত্যুতেও আমার স্থান
নাই।

একাদশ দৃশ্য ।

(মন্দিরে—দেবীর সম্মুখে বলির স্থান ।
তত্ত্বিত পুণোদিতের পার্শ্বে পূজারি এবং
রাজকন্ডার পার্শ্বে ক্রন্দনশরীরণা সখীগণ
বীড়াইয়া)

রাজ। ঠাকুর আর বিলম্ব করবেন না
—রাজার আদেশ—

পূ। মাতঃ! আমি রাজাদেশ পালালে
অক্ষয়। মাতৃরক্তে আমি মাতার পূজা করতে
পারব না—পারব না—আজ হতে আমি
আমার পৌরোহিত্য ত্যাগ করলেম।

রাজা। (পূজারির নিকট অগ্রদূর হইয়া)
পূজারি তবে তুমি এল! মন্ত্রের গুণ আর
অপেক্ষা করেনা,—তুখা কেন কাণক্ষেপ করছ
—রাজাজ্ঞা পাশনে কর—

(ভূমি হইতে পূজা উঠাইয়া) এই লত
পূজা,—পিতার অজ্ঞানজনন পাপ বেক
আমাকে মুক্তি দাও—।

পূজারি। (নতমুখে অঙ্গদৈবরে) পারন
না—পারন না—।

(হাসির ভাঙাভাঙি রাজকন্ডার হস্ত
হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া এবং তাহা পূজারির
গদমূলে রাখিয়া নতলাই হইয়া উপবেশন
পূর্ণক)

ঠাকুর। আমার রক্ত গ্রহণ করুন—
রাজকন্ডার বদলে আমাকে—

রাজ। (গম্ভীর স্বরে) ওঠ হাদি—
আমার আজ্ঞা—ওঠ।

লতা। আমি এগেছি দেব—আমাকে—
পাতা।—তুমি লত, আমি—আমি—

চূপ।—ওঠ তোমরা ওঠ আমাকে
ঠাকুর—

রাজা। সখীগণ; তোমরা আমার ধর্ম
পালনে বাধা দিওনা,—আমাকে কর্তব্যপালনে
বল দেও—ওঠ—নিদ্রিত করছি—আজ্ঞা করছি
—ওঠ—ভগবান তোমাদের মঙ্গল বরুন।

(সকলের ক্রান্তিতে ক্রান্তিতে উঠিয়া
করবোড়ে প্রার্থনা)

অন্তর।—অন্তর ধান কর—অন্তর
কর—ভারিণি, ভাগ কর—ভাগ কর।—

(মাতৃজীবীর সহিত রাণীর প্রবেশ)

রাণী। জানি আমি জানি—এ কাজে
কেউ অগ্রদূর হবেনা—কাপুরুষ পুরোহিত—
ভক্তিহীন পূজারি! তোরা নরায়ণ নরায়ণ!
মাতৃজিনি—চরকাগই তুমি আমার সখি—
সহায়; এইবার তোমার স্নাতিকণের চরম
পরীক্ষা! এল—এল—

(তাহার হতে বজা প্রদান)

ম। (বজা হতে লইয়া পুনরায় মাটিতে
নিক্ষেপ পূর্ব্বক) মহারানি ক্ষমা করবেন—
পারব না—পারব না—আর বা বলবেন তাই
করব—

রানী। এ কি মাতঙ্গিনী—এ সময়
তুমিও আমাকে ত্যাগ করেন? এই শেষ
মুহুর্তে—শেষ মুহুর্তে! তুমি যে একদিন
আমার আগেগে আমারি মঙ্গলের জন্ত এর
ভাইকে—শিত রাজপুত্রকে বধ করেছিলে
—আর আজ—

মাত। না বধ করিনি—আমি আমি
—পারিনি মহারানি পারিনি—খাত্তী তাকে
নিরে পিষেছিল।—আজও পারব না—এ কাজ
পারব না—আর বা বলেন—

রানী। কি বলো তুমি—খাত্তী তাকে
নিরে গেছে—পারিনি তুমি—পারবে না? এই
বেধ—(বজা তুলিয়া)—মাথা নত কর
পাণ্ডুরানি—

রাজ। (মন্তক নত করিয়া) নমস্কার
মাতা,—এ কাণ গ্রহণ করন—রাজ্যের মঙ্গল
হোক—

রানী। (বজা তুলিয়া) একি আমার
হাত ওঠে না কেন? অক বো অবশ হবে
আগছে, চামুণ্ডে লম্ব হও ।

রাজ। হার! এই হতভাগিনীর জন্ত
কত লোকের কষ্ট! মাতা, আর না—প্রসন্ন
হও—প্রসন্ন হও, আমাকে গ্রহণ কর—রাজ্যের
অন্তত অমঙ্গল নিবারিত হোক ।

(রাণীর অবশর হস্ত হইতে বজা খণিত হইয়া
রাজকন্তার অঙ্গে পতন, এবং ধরাশায়ী রাজ-
কন্তার রক্তে তুমিহরণ প্রাপ্তি । লক্ষণের চিত্রা-

পিতের ক্রার অবস্থান । রাজা ও বিদূষকের
মন্দির সমুদ্বল্ল পথে আগমন ।)

রাজা। (কবচ নিরীক্ষণ করিতে করিতে)
সত্য কি জীবিত! বল বিদূষক! ঐবকুমার
আমারি পুত্র! সত্য কথা—না মিথ্যা প্রতারণা!

বি। মিথ্যা নয়,—সত্যই রাজপুত্র জীবিত ।
রাজকন্তার অঙ্গপুত্রে তাঁর দেবা স্তম্ভা
হচ্ছে।—কিন্তু আগনি ঈদ্র চামুণ্ডার মন্দিরে
আছেন—আগে রাজকন্তার বলি নিবারণ
করুন—

রাজা। কল্যাণীর বলি !

বিদু। হ্যা মহারাজ, আগনারই আদেশে
তিনি বলি দ্বানে গেছেন ।

মহা। কি সন্দেহ! মনে পড়েছে
মনে পড়েছে—বাও বিদূষক—বাও বলি
নিবারণ কর —

বিদু। এই যে আমরা চামুণ্ডা মন্দিরের
দ্বারেই এগেছি,—

(উভয়ের মন্দির মধ্যে প্রবেশ)

রাজা। (উদ্বল্লভ ভাবে) একি! কি দৃষ্ট
এ! একি স্বপ্ন—!

বিদু। (নরন মুগ্ধিত করিয়া) না মহারাজ
—এ জাগরণ!

রাজা। অত্যাগিনি! বৎসে, সত্যই পিতা
হয়ে তোমার বলিদান বিলম্ব! চামুণ্ডে—
মাক্ষিক,—এ কি করনি—এ কি হোল!

কন্তার পদতলে পতন ।

চিত্রাপিচ দৃষ্ট,—শূণ্বেণ উজ্জ্বল আলোক-
মালায় সজ্জিত ।

উপসংহার ।

(রাজার সন্ন্যাসীবেশে প্রবেশ)

রাজ । উঃ কি রক্ত সে কি রক্ত ! সে
রক্তে লগৎ লগৎ লগৎ হয়ে গেছে ! এতদিন
বিশ্ব অন্ধকার ছিণ—সেই পবিত্র রক্তের
শোভে—সে অন্ধকার কোণে ভাসিণা
নিরে গেছে ! যে নরন—এতদিন অন্ধ ছিণ—
তার নিম্নলিখিত নরনের দৃষ্টি দিয়ে সেই
অন্ধ নরন সে দৃষ্টিতে তুলে গেছে—আজ পূর্ণ
জাগরণ নিয়ে তোমার কাছে পৌঁছেছি ।
হে বিশ্বনিহতা, মঙ্গলদর পিতাপুত্র—তাই
হোক—তাই হোক যে উদ্দেশ্যে সে প্রাণপাত
করেছে সে উদ্দেশ্যে সকল হোক । এ রক্ত
হতে বিখ্যাত ধর্ম পূর্ণ হোক, আচারের মাঝে
বিবেক যুগা, পাণ্ডার, দেবপুত্রের নামে
নরবলি পূর্ণ হোক ।—মঙ্গলগতোর মহিমা-

বিত্তরই মানবের ত্রুত হোক—পূর্ণাকলাপে,
শান্তিমতায় মর্ত্যলোকে সবুগ অভ্যুদিত
হোক । হে শুভশক্তি গাতা জীবনব্রত
তুমি সহায় হও, জ্ঞান দাও—বল দাও,
তোমার পূর্ণশক্তিতে আদ্যদিগকে প্রবুদ্ধ কর ।
(নিশান হস্তে সন্ন্যাসিনী বেশে হাসি, লতা,
পাতা, ফুল, বেগু প্রভৃতি বাণিকাগণের
গাইতে গাইতে প্রবেশ)
অগ্নি জগৎস্তোর জগৎ—

হৃদয়ে করিনা ভয়, যুগ্ম অমৃতময়
সত্য ধর্ম পূর্ণা কর্ণে

বিখ্যা হউক কর—

পাপ হউক লয়—!

জয় জয় ধর্মের জয় ।

যবনিকা পতন ।

সমাপ্ত ।

কালো ।

মা তুই আমার বলি কেন কালো ?

আমার তবে বাসিন্দা না তো ভালো—

মা তুই তবে যা !

তোমার কাছে মা আসব না কালো,

খুঁজে যখন করতে বাসি বা'র—

কথাই কব না ।

হেসে মাতা কহেন—পাগল ছেলো,

পারিস্ কেমন বা না দেখি কেনে' !

আবার যদি ডাকিস্ কালো বলে'—

লত্যা কিছু বাব এবার চলে'

দ্বিধার শব্দে বাকী !

দ্বিধা গেলে' কীদিস্ যেমন কবে',

দেখ্ তেমনি কীদিস্ কিনা পড়ে',

পাঠাস্ কিনা গাড়ী ।

তুই-ও বাসি দ্বিধার মতন হ'লে'—

কহেন মাতা অক্ষ-ভাঙা বেলে ।

আজ্ঞা, মাগো—বাবাও ত সে কালো,

ভীরেও তবে বাসি না কালো—

তুই মা একা তবে ;

তিনটি জনে থাকব আমরা বহু.

দেখ্ মা তুই ডাকিস্ কেমন কহে'—

এমনি মজা হবে ।

বকে টানি' চক্ৰ ঘুরে' পানিক—

কহেন মাতা—আবার কালো মাণিক ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

পাড়ার্গেয়ে ।

আকাশ বাতাস ও আলোর প্রভাবে
রম্যমানের জীবন নিত্য সন্ধ্যায় প্রভু ঐশ্বর্য
কালে সুখী উঠিতেছিল। জন্মাবধি সে
সহরের সুখ দেখে নাই। সহরেরই উঠা-ঠাঠা চূর্ণ-
স্বৰ্ণকোনিষ্ঠিত প্রাচীর প্রদত্ত বাত, ঐশ্বর্যিক
গাতি, আলো, পাখা, কলকারখানা—এ সকলের
কথা সে অনেকবার শুনিয়াছিল, কিন্তু
এগুলিকে রম্যমাণ বাস্তবজগতের অন্তর্ভুক্ত
বলিয়া মনে করিতে পারিত না। পাশ্চ
বমানীর অগাধ পাখাপরিবেষ্টিত, ছায়াগোক-
মস্তিত তাহানের ক্ষুদ্র জীবন ও তাহার আশ-
পাশই রম্যমানের বাস্তবজগতের একমাত্র
পরিশোধনা ছিল। ইহার বাহিরে যে আর
কিছু থাকিতে পারে, রম্যমাণ তাহা কল্পনারও
আশ্রিতে পারিত না। সে নির্জনে কোকিল,
বোয়েল, পাণিয়ার কণ্ঠস্বর বর নিলাইয়া শিশু
দিকে থাকিত, কৌতুক ভরিয়া শিউলি, টাণা,
রজনীগন্ধা ফুল তুলিয়া বেড়াইত, নদীর অলপ
খাঁপ দিয়া স্নাতক কটের দিন কাটাইত।

রম্যমাণ আটপন্থ পিতৃমাতৃহীন। রম্য-
মাণের এক বৃদ্ধা মালী তাহাকে লালন-
পালন করিতেছিলেন।

রম্যমাণের লেখাপড়া সামান্যই হইয়াছিল।
প্রাচীরের এক প্রাচীর দোকানদারের নিকট
সে শ্রবণভাগ, বিচীভাগ, শিত্তবোধ পর্যন্ত
পড়িয়াছিল, এবং মাঝে মাঝে হুস করিয়া
স্বাধীন পড়িয়া তাহার মনোকে তনাইত।
অধিকাংশ সময়ই রম্যমাণ বাগানের তলায়
চকল বোয়ের খেলা দেখিত, মাঝখানে, উত্তপ্ত-

বাতাসে, হ্রস্ববর্ণ আকাশের নীচে যে দু'এক-
খানা মেঘ ভলিয়া দাইত, তাহাদের লগ্নে
পাখা দিয়া ছুটাছুটি করিত,—অনেকদূরে যে
গাছটা অথবা গাছগুলির মাঝা ছাড়াইয়া
উঠিয়া তাহার উপরকার পাখা-প্রাণাঘাত জোরে
বিহাইয়া দিয়া শান্তভাবে পড়িয়াই থাকিত,
তাঁহা দিকে ছাড়া করিয়া মুড়নেজে চাখিয়া
থাকিত। সব চেয়ে রম্যমাণের গাছগুলারই
সমৃদ্ধি;—ছোট ছোট গাছ পুষ্টিয়া, মাটি
খুঁড়িয়া, জল তুলিয়া তাহাদের বড়-করার মত
এমন আনন্দ সে আর কিছুতেই পাইত না।
তাহাদের ছোট প্রাণমানির ভিতর এমন
শক্তিক বৃদ্ধ তাহাদেরই মধ্যে বর্ধিত হইয়াছিল।

রম্যমাণ একদিন ঘান করিতে গিয়া
দৈবিক, তাঁর একখানি নৌকা বাধা আছে।
অনেকগুলি বালক লগ্নে নাখিয়া কোলাহল
করিতেছে। কেহ বল ছুঁড়িতেছে, কেহ
কাবা বাধিতেছে, কেহ বা তাঁর কাছ
হাত পা ছুঁড়িয়া স্নাতক শিখিতেছে। নৌকার
উপর বসিয়া একটি তত্ত্বলোক তামাক
খাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ছেলের
কণ্ঠ দেখিয়া হাসিতেছিলেন।

কঠিন একটু বালক "গেলুদ, বাবা যে
গেলুদ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে
দেখি লগ্নে গিয়া পড়িয়াছিল, অথচ ভাল
স্নাতক জানিত না। নৌকার ভিতর হইতে
জীলোকেরা "ওগো, কি হ'ল গো", বলিয়া
ছুটিয়া গাইর হইয়া আসিল, তত্ত্বলোকটি "ধন,
ধন", বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রম্যমাণ

বুদ্ধের যথো অণে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া
বাগকটির কাছে গিয়া, তাহাকে টানিয়া
ভীষের কাছাকাছি লইয়া আসিল ।

রমানাথের আঁধার আর ধরে না । যেহেতু
তাহাকে শিথিয়া দেহপূর্ণবরে নানারকম
প্রর করিতে লাগিল । বাগকের শিতা
রমানাথকে কোলে করিয়া নৌকার লইয়া
আনিলেন, তাহার ত্রিভা কাপড় ছাড়াইয়া
দিয়া নুতন জামা কাপড় পরাইয়া দিলেন,
তাহাকে বসাইয়া খাওয়াইলেন ; রমানাথের
মুখে তাহার পরিচয় পাইয়া বলিলেন, “তুমি
বাবা, আজ থেকে আমাদের ছেলের
মত হ'লে । আমাদের সঙ্গে কলিকাতার
চল । তোমার মাসীকেও আমরা নিয়ে
বাব ।”

অল্পশোকটি তখন রমানাথের মাসীকে
ডাকিয়া আনিয়া সব বলিলেন, নিজেরও
পরিচয় দিলেন । তিনি কলিকাতার এক
সওদাগর-আফিসে বড় চাকরী করেন, মাঝ
নগেন্দ্ৰনাথ দাস, জাতিতে বৈষ্ণব । পুত্রার
ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলেন । ছুটি ফুরাইয়া
গিয়াছে ; দ্রীর পরী তাল নাট, তাই নৌকা-
পথে হাওয়া বাইতে বাইতে কলিকাতার
কিরিতেছেন । তাহার ছেলেটি রমানাথের
প্রায় সমবয়সী, দুইজনে একসঙ্গে বেশ
খাঙ্কিবে । তিনি সমস্ত ভার লইতে প্রস্তুত ।
তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, “আমার হাড় এই পাঁচ
মিনিটের মধ্যে রমানাথকে অনেককালের
পুষ্যোপুষ্য বন্ধুর মত করে’ কেলেচে—ঐ দেখ
না ।”—হাড় তখন আপনাতঃ ব্যাগের জিনিস-
পত্র রমানাথকে দেখাইতেছিল,—যাদের
কথা শুনিয়া সে একমুখ হাসি লইয়া

রমানাথের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,
“আমি একে আর ছেড়ে দেব না ।”

রমানাথের মাসী কলিকাতার বাইতে
চাহিলেন না । তাঁহার এমি ছাড়িয়া, চাষের
জমি ছাড়িয়া বাইতে মন সরিল না । তবে
রমানাথকে ছাড়িয়া দিতে সীতস্ত হইলেন ।
মাসী বলিলেন, “রমানাথকে নিয়ে যেতে চাচ্চ,
নিয়ে যাও । আমি বুড়োবুড়ো হয়েছি, কখন
কি হয় । ওর যদি একটা উপায় হয় সে ত
ভাগ কথা ।”

আশ্রয়ণ পন্নীগ্রামে থাকিয়া রমানাথের
মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইত, সহর দেখিয়া আসে ।
তাঁহােবের গ্রামবাসী দু'একটি শোকের মুখে
কলিকাতার বিবরণ শুনিয়া ইহানীত তাহার
কলিকাতা দেখিবার ইচ্ছাটা খুবই প্রবল হইয়া
উঠিয়াছিল, এইজন্য, সে তাহার মাসী এবং
পন্নীগ্রামীকে ছাড়িয়া বাইতে বিশেষ কোন
আপত্তি করিল না ।

সেইদিন অপরাহ্নে যখন নৌকা ছাড়িয়া
দিল, রমানাথের মাসী অকলে চোখ মুড়িতে
মুড়িতে চলিয়া গেলেন ।

২

কলিকাতার আসিয়া রমানাথ বাহা দেখে
তাঁহাতেই অবাক হইয়া যায় । সে তাহার
মাসীর নিকট যে পরীক্ষাভোর গল্প শুনিয়াছিল,
তাঁহার মনে হইল, এ সকল সেই পরীক্ষাভোরই
অন্তর্ভূত । তাহার আগ্রহাতিশয্যে তাহার
বন্ধু হাভাথনেরও দিনকতক আহারনিষ্ঠা
ভাগ হইল ।

অপর্যিতক কলিকাতার মধ্যে পরিচিত
করিয়া দেওয়াকে হাভাথন বিশেষ একটা
গৌরবের কাজ বলিয়া মনে করিল । এক

একটা অদ্বিতীয় দৃশ্য দেখাও, আর রমানাথ
অবাক্ হইয়া তাহা দেখে । ঐ দেখ পাঁচ-
ঘোড়ার গাড়ী, ঐ দেখ মহুমেটে, ঐ দেখ
বড়গাটী লাঠেবের বাড়ী,—রমানাথ হাঁ করিয়া
দেখে । হার বিজয়ী বোয়ের মত উজ্জ্বল
রমানাথকে লইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে
লাগিল ।

কিন্তু হারের মনে ঐহই ভাবাত্তর উপস্থিত
হইল । রমানাথ পাড়ারগেরে বলিয়া সময়ে
সময়ে বিপদে পড়িত । একদিন অশ্রাবধানতা-
বশতঃ এক ঘোড়ার গাড়ীর সমুখে পড়িয়া
সে ভাবুক খাইল, আর একদিন ট্রাম হইতে
নামিতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, হার
সঙ্গে একদিন হুটবল খেলিতে গিয়া এমন এক
ঘাড়া খাইল যে, চোঁটে কাটরা রক্ত পড়িতে
লাগিল । এইদফল বাগানে রমানাথকে
লক্ষ্য করিয়া যে ঠাট্টা বিজ্ঞপ্তি চলিত, হার
তাহাতে গোণ দিত । হার মনে করিত,
রমানাথ তাহার বিশেষ সম্পত্তি, এবং তাহার
বন্ধুবান্ধবদিগকে হারাইবার এক আশ্চর্য্য
কল ।

রমানাথ বাড়ীতে আসিয়া হারের নিকট
আরই করুণভাবে অশ্রুযোগ করিত । সে
বলিত, “অত্ৰ লোকে হাসে হারুক্, তুমি
তাঁদের সঙ্গে হাস কেন ! ট্রাম থেকে
নামিতে গিয়ে পড়ে’ গেলুম, তুমি কোথায়
আমাকে ধরে’ তুলবে, না তোমার বন্ধুদের
সঙ্গে যোগ দিয়ে আরও হাসতে লাগলে !
সেদিন গাড়োয়ানটা আমার চাবুক মাথলে,
তুমি হেলে উঠে বললে, বেশ হয়েছে ! ছেলে-
স্ত্রী! সেদিন আমার কাণ ম’লে দিলে,
কত রকম ঠাট্টা করলে, তুমি পাড়িরে হাড়িরে

হাসতে লাগলে । তোমার কি তাই এসব
উচিত ?”

হার বলিত, “হাঃ বে, আমিও বুঝি তোমার
সঙ্গে ঠাট্টাবিজ্ঞপ্তি সহ করব—লোকে আমাকে
পাড়ারগেরে, বোকা বলুক্ মার কি !”

রমানাথ বলিত, “আমি হ’লে এমন করুক্

রমানাথের একটি প্রধান দোষ ছিল,
সে সৰ সত্যকথা বলিয়া ফেলিত । হার
যদি বাপকে লুকাইয়া খুড়ি উড়াইত, কিংবা
পেটের অস্থির উপর চানচুর খাইত,
অথবা দুপুর বেলায় ইডেন্ গার্ডেনে বেড়াইতে
যাইত,—রমানাথের জন্ত সে সৰ কথা
প্রকাশ হইয়া পড়িত । হার বলিত, “তুমি
ও আচ্ছা বোকা ! বাবা বিজ্ঞানো কল্লেম,
আর সৰ বণে’ ফেলে ! আচ্ছা বোকা
তু !” রমানাথ বলিত, “আমি কি করব,
আমি কি মিথ্যে কথা বলব !”

উক্তর তদ্বিত্য হার সূখ বাকাইয়া চলিয়া
যাইত । ক্রমে ক্রমে সে রমানাথের সঙ্গে
বেতান একেবারে বন্ধ করিয়া দিল ।
রমানাথ একলাটি এখন সেধর করিয়া
বেড়াইত ।

রমানাথের জন্ত হার তাহার বাপের
নিকট আরই মার খাইত । ইহাতে হারের
মাতৃ রমানাথের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া
উত্তীর্ণাঙ্কিতেন ; বলিতেন, “কি রকম হাথা
ছেলে, কেবলই আমার হারের নামে
লাগায় !”

এইরূপে রমানাথ নগেন্দ্রবাবুর গৃহে
অনান্যের দিন কাটাতে লাগিল ।

নগেন্দ্রবাবু রমানাথকে ফুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন, সে হালুস সঙ্গে এক-ত্রাশে পড়িত। পড়াশুনার রমানাথের খুব মন ছিল, এমনকি নগেন্দ্রবাবু তাহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং ভাল ভাল মিনিস কিনিয়া দিতেন। হালুস মনে ঠেহাতে খুব বিনোদ হইত, সে রাতদিন রমানাথকে কল করিবার ফলী খুঁজিচ্চা বেড়াইতে লাগিল।

হালুস জানিত, রমানাথ খুব গাছপালা ভালবাসে; সে তাহার কাছে কত রকম গাছের নাম করিত, ফুলে বাইবার সময় গবে কত রকম গাছ চিনাইয়া দিত, কত রকম ফুলের নাম করিত,—কেন্‌ ফুল কখন কোটে, কেন্‌ ফুলের কি রকম রঙ, তাহাদের বাড়িতে কি কি গাছ আছে, সব বলিত।

একদিন শনিবারে স্নান হইতে ফিরিবার সময় হালুস রমানাথকে সঙ্গে লইয়া নারিকেল-তালার এক বাবুর বাগান-বাড়িতে গেল। মালী ছাড়া আর কেহই তখন সেখানে ছিল না। দুজনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিল; কত রকমের ফলফুলের গাছ, কত রকমের লতাশাড়া,—বেশিয়া রমানাথের আনন্দ আর বহর নঃ। এত রকমের গোলাপ গাছ সে কখনও চক্ষে দেখে নাই।

হালুস বলিল, “এস ভাই, আমরা একটা গোলাপ-গাছ চেষ্টে নিই, টবে পুঁতে ছাতে রেখে দেব—কেমন?”

রমানাথের তারি আনন্দ হইল, বলিল, “বেশ ভাই, বেশ।”

হালুস বলিল, “তুমি ভাই, তা’ হ’লে এখানে

একটু দাঁড়াও, আমি মালীর কাছে গিয়ে সব ঠিক করছি।”

রমানাথ দাঁড়াইয়া রহিল। হালুস মালীর কাছে গিয়া তাহার হাতে একটা টাকা ভঁজিয়া দিয়া কহিল, “একটা গোলাপফুলের গাছ দিতে পার?”

মালী টাকা পাইয়া একটার পরিবর্তে দুইটা গাছ আনিয়া হালুসকে দিল। হালুস তখন রমানাথকে দেখাইয়া দিয়া মালীকে চুপচুপি ক’ কহিল; তাহার পর রমানাথের কাছে গিয়া তাহার হাতে দুইটা গাছ দিয়া কহিল, “এই দেখ, কেমন গাছ এনেছি। কাউকে গোণো না ভাই দে, আমি তোমাকে গাছ দিগেছি। বলবে না ভ, এঁয়া! তোমার আবার বলে’ দেওয়া যোগ আছে।”

রমানাথ প্রীতপ্রসন্ন হইল, কাহাকেও সে বলবে না। উভয়ে বাড়ি ফিরিল; দুইটা ভাঙা মাটির কলসীতে মাটি করিয়া, গাছ পুঁতিয়া ছাতে রাখিয়া দিল। মালী তাহাদের পিছনে পিছনে আনিয়া তাহাদের বাড়ি দেখিয়া গেল।

পরদিন নগেন্দ্রবাবু বৈকালে আগিল হইতে আসিলে মালী আনিয়া তাহার কাছে গাছ-চুঁতির নালিশ করিল,—তাঁহাৰই বাড়ির এক ডেলে তাহার মনিয়ের বাগান হইতে গাছ লটকা পলাইয়া আসিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু, হালুস রমানাথ উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উভয়ে আসিলে, মালী রমানাথকে দেখাইয়া কহিল, “এই বাবুই আমার গাছ নিয়েচে।”

নগেন্দ্রবাবু অবাক হইয়া গেলেন। রমানাথ ত সে রকমের ছেলে নয়। নগেন্দ্র-

৩১শ বর্ষ, বট মাস।

বাবু ভাবিলেন, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন রহস্য আছে, বোধ হয় মালীর দেখেবার জল হইয়া থাকিবে।

নগেন্দ্রবাবু রমানাথকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, “বল ত রমা, কি হ’য়েছিল?” রমানাথ এককৃত ঘটনা বৃত্তিতে পারিচাও হাকুর নিকট প্রতিশ্রুত বলিয়া কোন কথাই প্রকাশ করিল না। রমানাথ ছলছলনৈয়ে বলিল, “কমা কখনে, আমি কিছু বলতে পারব না।” নগেন্দ্রবাবু অবাক হইয়া গেলেন। রমানাথ কখনও তাহার মুখের উপর কথা বলে নাই। নগেন্দ্রবাবু রাগিয়া গিয়া বলিলেন, “সে কি! বলতে পারবে না কি।” রমানাথ অতর্কিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, “আমি কিছু বলতে পারব না।” নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, “তা’ হ’লে নিশ্চয়ই তুমি গাছ নিরেট!” রমানাথ চুপ্ করিয়া রহিল।

হাজিরে দাঁড়াইয়া রমানাথের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, অতিদ্রুত্রে তাহার ভয় হইতেছিল, রমানাথ কি বলিয়া ফেলে।

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, “তা’ হ’লে বুঝুদু, তোমার উপর আমার যে বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাসের তুমি সম্পূর্ণ অযোগ্য।”—একটু খামিয়া নগেন্দ্রবাবু আবার বলিলেন, “বুঝেছি, তুমি যে কেবল বিশ্বাসের অযোগ্য তা’ নও, তুমি চোর, তুমি প্রবঞ্চক! তুমি আমাকে এতদিন এতাবলা করে’ এসেছ।”—নগেন্দ্র বাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বের লইয়া রমানাথকে উপযুঁপিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন—বেলাখাতে তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া গেল।

হারু সমস্ত দিন আর রমানাথের কাছে ভিড়িল না; নগেন্দ্রবাবু রমানাথের সঙ্গে দেখিল কোন কথা বলিলেন না; বাড়ীর বেহুট রমানাথের কোন খোঁজ হইল না। নিত্যও উপেক্ষিত, অনাগরে, বেদনাগ্র রমানাথ আস্তে আস্তে বিছানার আসিয়া শুইয়া পড়িল।

হারু মা বলিলেন, “মা’ চোক বাপু, অমন ছেলেকে বাড়ীতে রাখতেও আমার ভয় করে।” তাহার বিধি বলিলেন, “আমি ত ঐ যেদেই বলেছিলাম, পাড়ারগেয়ে ছেলে—পেটে পেটে নষ্টামি বুঝি! ওদের কি বাড়ীতে থাওয়া দিতে আছে।”

রাজে খাবার সময় ভয়সর মা রমানাথকে ডাকিতে আসিলেন। রমানাথ বলিল, “আমার ক্ষেপে নেই, আমি খাব না।”

মাঝরায়ে রমানাথ ছটফট করিতে লাগিল। অরের তাপে তাহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া বাইতেছিল, বেদনার পা হইতে মাথা পর্যন্ত বসিয়া পড়িতেছিল। রমানাথ একাকী একঘরে থাকিত; সে উঠিয়া বসার ছুটাছুটি করিতে লাগিল, তাহার মালী, তাহার পল্লীভবনের কথা স্মরণ করিয়া কামিতে লাগিল।

ভোর হইতে না হইতে রমানাথ দুইটি টাকা সঙ্গে লইয়া, পালিগায়ে খালিগায়ে রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল।

পথের পোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া, টেননে গিয়া টিকিট কিনিয়া, গাড়ি চড়িয়া, রমানাথ একেবারে তাহার পল্লীবাগনবনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বিএছরের প্রথম তেজ

সমস্ত বনকৃষি ক্ষয়, স্ত্রিয়মণি; খোজের দাপটে গাছগুলি লুটাইয়া পড়িয়াছে। রমানাথ দোড়াইয়া গিয়া, নদীর জলে কাপড় ভিজাইয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া সমস্ত গাছের তলায় জল দিয়া বেড়াইতে লাগিল। এখানে বহুল গাছটি একেবারে মরিয়া গিয়াছে, এখানে নিউলিগাছের সব পাতা বসিয়া পড়িয়াছে, এখানে গোলাপগাছটি কিসে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। রমানাথ অরণ্যে মৌজে পুড়িয়া পুড়িয়া সব ঠিক করিতে লাগিল।

অপরূপের দিকে হঠাৎ ঘেঁষ করিয়া টিপিটিপি সৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দুইজন কৃষক লাঙ্গল কাঁধে করিয়া মাঠে বাইতে বাইতে ঘেঁষিল, এক বালক ছোট একটা সন্ধ্যামণি চারাগাছ নিজের শরীর দিয়া ঢাকিয়া বসিয়া আছে। তাহারা কাছে গিয়া দেখিল, বালকটির জ্ঞান নাই—কোন কথার উত্তর দিতে পারিতেছে না, কেবল মাঝে মাঝে চোঁড়াইয়া বলিয়া উঠিতেছে, “একবার রোমে পোড়ার, আবার ব্রুটিতে ভেজার,—একি কাত!”

কৃষকদ্বয় মধ্যে একজন রমানাথকে চিনিতে পারিল। সে রমানাথের মনিকে খবর দিল। মাদী আসিলে সকলে বসাদারি করিয়া রমানাথকে বসে লইয়া গেল। রমানাথের মাথা দিয়া তখন আঙ্গন বাহির হইতেছে, চোখ দুটা জখমুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে—সে বিছানার তইয়া ফ্যান ফ্যান করিয়া মাদীর সুবের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মাদী কাদিতে কাদিতে ঘটিতে জল আনিয়া রমানাথের মুখে চোখে দিতে লাগিল,

পাখা কঁপে লাগিল, সন্ধ্যা হাত ধুলাইতে লাগিল। কৃষক দুইজনের মধ্যে একজন ফেঁড়ের কাছে চণিয়া গেল, আর একজন পাড়া-গতিবিশিনীকে খবর দিতে ছুটিল। মাদী রমানাথকে লইয়া একলা বসিয়া রহিল।

অন্নকণপরেই নগেন্দ্রবাবু হাককে লইয়া রমানাথের কুটারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাক রমানাথকে দেখিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাদিতে কাদিতে বলিল, “আমি বাবাণে সব বলেছি তাই, আর কখনো এমন করব না—কখনো না, কখনো না! চল তাই, আমাদের বাড়ি দিগের’ চল।”

রমানাথ কোন কথা কহিল না—অনেক-অল্প নিশ্বাসের মত থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া, দুইহাতে প্রাণপণে হাকের গলা জড়াইয়া ধরিল, তখনই আবার ছাড়িয়া দিয়া ঘটি লইয়া উর্দ্ধ্বাশে ছুটিতে লাগিল। সকলে লকে লকে ছুটিল।

কাটা মাড়াইয়া, বনজল ভাঙ্গিয়া, রমানাথ সন্ধ্যামণির গাছতলায় আসিয়া ঘটিটি একেবারে উপড় করিয়া দিল। তখন তাহার সন্ধ্যা ধনধর করিয়া কাঁপিতেছে, পারে বল নাই, সে আর মাড়াইয়া থাকিতে পারিল না—মাটিতে তইয়া পড়িল।

সকলে যখন রমানাথের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন স্রাও বালক ঘটিটি হাতে করিয়া সন্ধ্যামণির গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ঐহীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চরম।

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(পূর্বাঙ্গবৃত্তি)

সাকরনগণ্যটি প্রমাণ।

পানিনিরূপক উদ্ধৃত নটশ্রেয়ঃ গ্রন্থকর্তা পানিনিরূপক নামেও পানি পদের সহিত পরিচয়। যে সকল নট এই সকল নাট্যশ্রেয়ঃ গ্রন্থে প্রবেশ করিত, তাহারা পানিনিরূপক নামে অভিহিত হইয়াছে। আবার তাহারা কৃপাশ্রেয়ঃ উপদেশ অনুসরণ করিত, তাহারা কৃপাশ্রেয়ঃ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আচার্য্যের গ্রন্থাবলী বহুকালাবধি বিদ্যমান হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রণীত নটশ্রেয়ঃ উপদেশমতে নাট্যকলায় ইতিহাস, একটা উল্লেখযোগ্য ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে। পানিনির আবির্ভাবকাল একটা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, এই ভাষার অধ্যয়ন মূল্য হইয়া থাকিবে।

ভারতীয় কিংবদন্তী,—সেকন্দরপুরে সম-সাময়িক শেখ-নন্দার রাজত্বকালে পানিনিকে স্থাপন করিয়াছে। এবং গুণাব্যবহৃত বৃহৎকথাও ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে। সত্যতঃ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পানিনির গ্রন্থ বিরচিত হয়। এই কালটি যোকশ্বলর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; এমন-কি বৈদিক কাল-ক্রমনির্ণয়ে তিনি ঐ সময় হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, M. M. Peterson ও Pischel সম্মতি পানিনিকে পঞ্চম বা ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে স্থাপন

করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্বে পানিনিরূপক ভাষ্যদির সহিত গ্রীক প্রমাণ-লিপ্যাদির তুলনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছি যে এ সম্বন্ধে কিংবদন্তীর কথাই সম্পূর্ণরূপে সত্য। ভারতীয় নাট্যকলা, মহাকাব্য হইতে যে চরম বিকাশ লাভ করে, তাহা পানিনির ভাষ্যকার শতাব্দীর মহাকাব্য হইতে আমরা অবগত হই। গ্রীক কোন্ সময়ে শতাব্দী আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

তাঁহারা গ্রন্থ যাহা “চুনি” নামেও অভিহিত হইয়া থাকে,—“বাক্যশ্রেয়ঃ” গ্রন্থকার ভর্তুহর, সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঐ গ্রন্থের আবার ভাষ্য করিয়াছিলেন। ভর্তুহর দ্বিতীয় কাণ্ডে, শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া এই মতবাদের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। “আচার্য্যের মৃত্যুর পরে বৈজ্ঞানিক, শৌভব, দ্বৈত, বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছিল। ভারতীয় ঐ পুরাতন গ্রন্থ হেলান্ধা হইয়াছিল; পরিশেষে, এই মূলগ্রন্থ পানিনির শিষ্যদিগের হস্তগত হয় নাই; কেবল উহার একটামাত্র প্রতিগিণি দাক্ষিণাত্যে বিদ্যমান ছিল। তেলিঙ্গনার অন্তর্গত “পার্বতী” যে মূলগ্রন্থ পাওয়া যায়, চরম প্রকৃতি আচার্য্যগণ ঐ মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, হ্রস্ব ও ভাষ্যাদির অধ্যয়ন করেন এবং এইরূপে তাহাদিগের

কর্তৃক অসংখ্য শাখা সংগঠিত হয়। আমরা
আমাদের বিনির্ভর্যকৃতিক ও স্বতন্ত্র বর্ণনায়
শিষ্ট হিগেন, তিনি আমাদেবের জন্ত এই গ্রন্থ
রচনা করিয়াছেন। (১) অতএব পঠন ও
অর্থবোধের মনো বহুপুণ্য। (২) অতএব
বাবধান। ভাষ্যকার কতকগুলি অন্তর
সুক্রিয় বাস্তব সমর্থন করিয়াছেন যে, “নহাভাষা”
১৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে
বিবর্তিত হয়। এই অভিমতের অগ্রদূত ও
প্রতিদূত উভয় পক্ষই অগ্রহ ও উৎসাহের
সহিত স্বয়ং মতের সাধারণতঃ প্রদর্শন করিতে
সচেষ্ট হইয়াছেন। কতকগুলি অন্তর
পূন্যপুণ্যরূপে পরীক্ষা করিয়া আমরা
ভাষ্যকারনির্ভর্যকৃত কালই নিঃসন্দেহভিত্তিক
প্রমাণ করিয়াছি। (২)

“যখন কোন ক্রিয়া বস্তুর সময়ে সংঘটিত
হয়, তখন সেই রূপে লগ্ (imperfect
tense) প্রয়োগ করিলে”—কাত্যায়ন
উহার একটি ব্যাখ্যা এই যে আবেশ
করিয়াছেন, মহাভারতের গ্রন্থকার তাহা
বর্ণন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এই
বিধির অবশ্যতা প্রদর্শন করিবার জন্ত
তিনি এই ব্যাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—
“বাহুদেব কংসকে হত্যা করিয়াছে।”—
ভাষ্যকার নাগোজিতট্ট উহার উপর
আর একটু টিপনী করিয়া বলিয়াছেন,—“যে
ব্যক্তি, ঐ ঘটনাটি তখনই ঘটনাছে এইরূপ

বর্ণিতঃ সে ঐ ঘটনা বসে
নাট।”

স্পষ্টই দেখা যায় যে এইরূপে এমন
কোন ব্যক্তির উল্লেখ করা হইতেছে যে
পাঠকের সম্মুখে ঐ প্রাণীভূত সত্তার হস্তা
বসকে দেখিয়াছে (৩) আর একটি বসনে
এই বিষয়টি আরও নিশ্চিত হইয়াছে ও
সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে (৪)।
নিম্নলিখিত ব্যাক্যগুলিতে যে বর্ণন
কালের প্রয়োগ আছে, পঠন
তার পরীক্ষা করিতেছেন ; “তিনি কংসকে
হত্যা করিলেন।” “তিনি বালিকে মৃগ্যবৎ
করিলেন।”—পঠন করিলে বর্ণন
যে পূর্ণ কংস নিহত হয়, বালি মৃগ্য
বৎ হয় ; তবে এখানে ক্রমে বর্তমান কালের
প্রয়োগ হইতে পারে। ইহা জায্য কথা।
বস্তুতঃ শৌভিকের (উহার এই নামে অভিহিত
হইয়া থাকে) কংসের মৃত্যু ও বালির বধন,
চন্দ্রের সম্মুখে ঘটনাছে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে
(৫)।—সুতরাং প্রমাণ এই দ্বারা যে ব্যক্তি
প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু উহার ভুল
ব্যক্তির দ্বারা বর্ণনা করে (উহার শৌভিক-
নিগের মত অভিনয় করে না)। উহার
আরও হইতে শব্দ পর্বাৎ কথা আবৃত্তি করে,
এবং এই রূপে ব্যক্তির দ্বারা পঠন
পূর্ণক ভাবে প্রোক্তব্যক্তির নিষ্কট আপনা-

(১) কাত্যায়ন II.

(২) Quid de Graecis veterum Indorum monumenta traderint, Paris 1890.
P. 16 & 38.

(৩) Goldstuckerএর গ্রন্থে উদ্ধৃত, Panini.

(৪) পানিনি III, ১, ২৬

(৫) Kielhornএর সংগ্রহে, Weber এর গ্রন্থে শোভিত।



বিগত একদশ বর্ষে । উৎসবের মধ্যে কতকগুলি লোক কংসের দলহীন, অংগের কতকগুলি লোক বাহুবলবের দলহীন ; এমন কি, উৎসব বিভিন্ন বর্ণের ধারণ করে ! কেবল যুগে লাগে যুগ, কেবল কালের যুগে যুগে যুগে লাগে । প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী তিন কালের যুগেও দুই বর্ষ :—“পাণ্ডাও ; উৎসব কংসকে হত্যা করিতেছে” “পাণ্ডাও উৎসব কংসকে হত্যা করিবে ; “এখন পলায়ন করা দুঃখ, উৎসব কংসকে হত্যা করিবে ।”

উপরের অন্তর্ভুক্ত নাকো যে নৈতিকতা : “পাণ্ডার অর্থ অধিনেতা—এইজন্য হুঁত হইয়াছে, মহাভারতের চীকানার কৈয়ত তাহার এইজন্য গাথা করিয়াছেন :—

কংস প্রভৃতির কৃমিকাগ্রহণকারী অতি-

নেতাগিরকে যে সকল আশ্রয় অধিনেতার শিকার হইয়া গিয়াছিল নৈতিক নৈমিত্তিক হইয়া থাকে ইত্যাদি ।

পতঙ্গগণের নৈতিকগণের মধ্যে অনেক কথা বলিয়াছেন ; উৎসব যে শুধু শাস্ত্র (৬) আশ্রয় করিতে অভ্যাস করে তাহা নহে, (৭) গানও অভ্যাস করে । (৮) সাহিত্যিক ইতিহাসের যুগে উৎসবের ইতিহাসিক জন্মগ্রহণ, উৎসবের সামাজিক অবস্থাও অত্যন্ত চীন ছিল । বেশি হয় নৈতিক সে সময়ে শুধু গায়িকা ও নর্তকী মাত্র ছিল । সে কালে “কৃষ্ণ” নামক ছদ্মবেশী নটেরা সমস্ত কৃমিকাগ্রহণ করিত । উৎসব নৈতিক ও কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিত ।

শ্রীমদভিবিজ্ঞানার্থে চিত্রিত ।

তিনটি স্বপ্ন ।

(প্রথম অংশে তিনটি স্বপ্নের বর্ণনাই হইতে)

(১)

আমি মক্কাহিম উপর দিয়া বাইতে-ছিলাম, রোজ তখন প্রথম । একটা কুম্ভচূড়া গাছের তলে বোড়া খামাইয়া নামিলাম ; মিন খুঁটিয়া বোড়াটাকে চরিতে ছাড়িয়া, দিলাম । তাহিনে বীরে পোড়া মাটির খুঁটির বিস্তার ; বিগত ছড়িয়া বোজতপ্ত হওয়া যেন হাঁপাইতেছিল । গাছের তলে বিনোদ বসিয়া তত্ত্বা আদিল ; মিনের গারে মাথা

দিয়া আমি খুঁটিয়া পড়িলাম । যুগের যোগে মজার বস্তু দেখা দিল ।

আমি যেন প্রকৃত মনোভাষ্যের এক ধাবে দাঁড়াইয়া আছি, আর দৃষ্ট বাস্তব অবিবাহ হানিয়া ছুটাছুটি করিতেছে । মনে হইল যেন একজন কে মাটিতে মূখ প্রকৃতি পড়িয়া আছে, আর তাহার পাশে আর একজন কে দাঁড়াইয়া—যেন দুটি ভারবাহী পতঙ্গ, মক্কাহিমের মত । যে পড়িয়া আছে, সে

(৬) মক্কাহিম । মক্কাহিমের নাম : ।

(৭) অশ্বিনী নট : ।

ক্রীড়াতি। তাহার পিঠে প্রকাণ্ড বোঝা আর তাহার আশে পাশে বালি অধিষ্ঠা উঠিয়াছে, যেন কত শতাব্দী ধরিয়া জমিয়াছে। আর দাঁড়াইয়া আছে যে সে নয়।

আমি কৌতূহল-দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম। আর, আশাও কৌতূহল আর একজন কৌতূহল-দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। আমি সেই দৃষ্টমান জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই যে প্রাণটি বালির উপর পড়িয়া আছে, একে ?

সে বলিল—নাও, যিনি নরের জননী।

আমি বলিলাম—ইনি এমন ভাবে ধূলি-শরনে পড়িয়া কেন ?

সে বলিল—কতকাল ধরিয়া ইনি এমন পড়িয়া আছেন, বায়ু ছাড়া ক্রিয়া উপর দিয়া ধূলা উড়াইয়া বহিয়া গেছে। বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ লোকের ইহাকে নড়িতে দেখে নাই; পুরাতন, অতি পুরাতন পুরাণও এই একই কথা বলে। কিন্তু বৃদ্ধেরও বৃদ্ধ, পুরাতনেরও পুরাতন কথ লম্বাশ্রীতি ও বিস্তৃত ভাবান্তরের মধ্যে ইহার চরণচিহ্ন দেখা গিয়াছে; ইহাতে বৃদ্ধা ঘাইতেছে যে যিনি এখন পাবাণী হইয়া পড়িয়া আছেন, একদিন তাহার এমন ছিল যখন তিনি স্বাধীন ভাবে তাহার পার্শ্বরেখা সহিত লক্ষণ করিতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইনি এখন পড়িয়া আছেন কেন ?

সে বলিল—বোধহয় যখন ইনি সরস্বতী নদ হইয়া স্রষ্টা দিতে গিয়াছিলেন সেই সময় অকৃতজ্ঞ সন্তান ইহাকে বন্ধন করিয়া পিঠে বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। তখন ইনি একবার ধরণীর পানে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু আশা কোথাও দেখিতে পান নাই। তখন

বোঝার চাপে সেই যে দুল্লভমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন আর পর্যাঙ্ক তেমনি পড়িয়াই আছেন। শতাব্দী আনিয়াছে, শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, তিনি যেমনকরি তেমনি পড়িয়া আছেন, বন্ধন ঘুচে নাই।

আমি ভূপতিভার যুগের নিকে চাহিলাম; যখন তাহার যুগযুগান্তের ঐশ্বর্য; কিন্তু ক্রমি তাহার অগ্রগণ্যে সিক্ত; স্বাশ্রিত্য নাসাংক, বালির খুণী উড়াইতেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইনি কি কখনো নড়িতে চেষ্টাও করেন না ?

সে বলিল—কখনো কখনো অবস্পন্দ হইয়াছে বটে, কিন্তু সারি বোঝা বহিয়া ইনি উত্তিতে পারিবেন না বলিয়াই কখনো চেষ্টা করেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ও শতটা পাশে দাঁড়াইয়া যাইতেছে কেন ? ইহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেও তা পারে।

সে বলিল—না, পারে না। সে—

আমি চাহিয়া দেখিলাম একটা চওড়া কিতা জমির উপর দিয়া লুটাইয়া গিয়াছে, উহার ধারা ইহায়া স্রবনেই গিয়া।

সে বলিল—যতদিন এ পড়িয়া থাকিবে ততদিন উহারও ঠার দাঁড়াইয়া যকুম্ভিম দিকে হাদৃষ্টে তাকাইয়া থাকি ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

আমি বলিলাম—নরট কি জানে কেন নড়িতে পারিতেছে না ?

অবোধ লক্ষী বলিল—না।

আমি কোনো কিছু ছিন্ন হওয়ার শব্দ শুনিলাম। দেখিলাম, যে-বন্ধন নারীর পিঠে বোঝা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহা ছিন্ন

হইয়া গেল ;

পড়িল।

আমি সন্দীপকে জিজ্ঞাস্য করিয়ায় —
ব্যাপার কি ?

সে বলিল—আত্ম-বোধ নারীত্ব বাসনাবন্ধন
ছিন্ন করিল। নবের অকৃতজ্ঞতার গোলা
খসিয়া পড়িয়াছে। নারী এখন উত্তীর্ণও
উত্তীর্ণে পালে।

কিন্তু আমি দেখিলাম সে তখনো পালুকা-
শয়নে ছিন্ন নিশ্চল—চক্ষু তাহার কক্ষ, অঙ্গ
তাহার সূচীত। সে যেন দূর দিগন্তে কিছু
খুঁজিতেছিল কিন্তু পাইতেছিল না। আমার
সম্মুখে হইতেছিল সে জাগ্রত অথবা সুপ্ত।
কিন্তু অকস্মাৎ তাহার উদারনেত্রে ঘোঁষি
জাগিল, যেমন অন্ধকার ঘরে সূর্য্যোদয়ের
অজ্ঞপ্তবেশ! তদ্রূপ তাহার কল্পিত হইয়া
উঠিল।

আমি বলিলাম—একি !

সদী মুহূর্ত্তের বলিল—চুপ ! উহার মনে
এমন জাগিয়াছে ‘আমি কি উত্তীর্ণে পারি
না ?’

আমি দেখিলাম। সে দ্বারা হইতে তাহার
মাথা তুলিল। তারপর একবার তাহার এত-
দিনের দুশিন্দ্রের দিকে, একবার উন্মুক্ত
বিশাল, প্রসার নির্মূল আকাশের দিকে, একবার
তাহার পার্শ্বের দিকে সে তাকাইল। কিন্তু
তাহার পার্শ্বের নর নর স্রোতের সীমাহীন
সীমার দিকে তাকাইয়া ছিল।

আমি দেখিলাম নারীর দেহ কল্পিত
হইল। সে হাঁটুতে ভাব দিল, শিরাতলি
দুলিয়া উঠিল। আমি চৌক্য করিয়া
উঠিলাম—ঐ ঐ নারী উত্তীর্ণেছে !

মাটিতে

কিন্তু চোঁটাশনে তদ্রূপ তাহার বক্ষপঙ্ক্ত
দুলিত হটতে লাগিল, সে দেখানকার
সেখানেই পড়িয়া রহিল।

কিন্তু এখন মন্তক তাহার উন্নত, সে-মাথা
দ্বার আর পড়িল না।

আমার সন্দী বলিল—নারী বড় তুর্ধ্বণ।
সেখ সেখ, তাহার চরণ এতকাল অব্যবহারে
একবারে অকর্মণ্য হইয়া গেছে।

সে বেচোরা আবার চোঁটা করিতে লাগিল,
যেদাবল্লভে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিত্যক্ত হইয়া
উঠিল।

আমি বলিলাম—উহার পার্শ্বের এখন
নিচর উৎসাহে সাহায্য করিবে।

আমার সন্দী বলিল—না, সে সাহায্য
করিবে না। নারীকে আত্মপক্ষেই
উত্তীর্ণে হইবে। কক্ষক, কক্ষক সে চোঁটা।
চোঁটার শক্তি আপনি লাভ হইবে।

আমি বলিলাম—মর সাহায্য না করুক,
মাথা ত দিবে না। সেখ সেখ, ও বৃত্তে সরিয়া
কোন আরো কথিয়া দিতেছে যে, নারী যে
আবার পড়িয়া যায় !

সন্দী আমার উত্তর করিল—হস্তত্যাগ
জ্ঞানে না সে কী অস্ত্র করিতেছে। এখন
নারী নড়িতেছে তখন বন্ধনরজ্জ্বতে টান
পড়াতে নর ব্যথা পাইতেছে, তাই নরও
নারীর নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়িতেছে।
কিন্তু সেই তত্ত্ববিন আসিবে যেদিন নর
বুঝিবে নারীর এই স্রোতের অর্থ। নারী
চোঁটা করিতে থাকুক, বোম পাইলে নর
নারীর পাশে গাড়াইবে, সমবেদনার ইহাদের
সুভবুজ হইবে।

নারী তাহার জীবা প্রদারিত করিল,

স্বদেশস্থ স্বরিষ্ঠা পড়িতে লাগিল, একটু
উষ্ণিয়ার আবার সে পড়িয়া গেল।

আমি বলিয়া উঠিলাম—হারি হারি! এত
কালের অনভ্যাস তাহার সকল শক্তি হরণ
করিয়াছে। আহা অরণ্য! চলিতে সে
পারিবে না!

আমার সঙ্গী বলিল—দেখ দেখ তাহার
নয়নে জ্যোতি!

দীর্ঘে দীর্ঘে বেচারী কাঁপিতে কাঁপিতে
হাটুতে ভর দিয়া উঠিল।

২

আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কোথাও
কিছু নাই; পূর্বে শু পশ্চিমে শু উত্তরে ক্ষেত্র
ও শু খোপ। লাল পিঁপড়ে লাল বলির
মধ্যে ব্যস্তভাবে আনাগোনা করিতেছিল।
গরম জীবন। আমি বৃকচূড়ার পাতার
তালকের কাঁকে কাঁকে দেখিলাম আকাশ
যেন হালার কোটি নীল চোখ সমূহ পাতার
কাকরির কাঁকে রাখিয়া উঁকি মারিয়া
আমার দেখিতেছে। আমি সটান শুইয়া
শ্রমের কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার
ঘুমাইয়া পড়িলাম। সেই লাগল-করা বস্ত্র-
নাচানো গরমে মাথার মধ্যে শ্রম আবার
বেলা জড়িল।

আমি দেখিতে লাগিলাম যেন একটা
মকরুয়ী দৃশ্য করিতেছে। একটি নারী
মকরাসুকা ভাঙিয়া ভাঙিয়া একটা কালা
নদীর পাড়ে আসিল, সে পাড় অতি উঁচু,
অতি খাড়া! এখানে তাহার সহিত এক
বৃকের সাক্ষাৎ হইল, বৃড়ার দীর্ঘ শুভ্র পাড়ি,
হাতে একটা পেচানো লাঠি, তার উপরে

লেখা 'যুক্তি'। বৃক নারীকে জিজ্ঞাসা
করিল—তুমি কি চাও?

নারী বলিল—আমি নারী; আমি স্বামী-
নতার রাক্ষসে ঘাইতে চাই।

বৃক বলিল—সে রাজ্য ত
দখলেই—

নারী বলিল—আমি ত এই কালো নদীর
উঁচু পাড়ের ওপারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি
না।

বৃক বলিল—ওপারে, দূরে?

নারী বলিল—কিছুই না। কখনো

কখনো অনেক দূরে যেন একটি বৃকজাঙ্গা-
সমাকর্ষণ পাহাড় দেখিতে পাইতেছি যেন
হয়,—পাহাড়ের মাথার গাছের চূড়ার দৌত্রের
ঝিকঝিক যেন চোখে ঠাণ্ড হইতেছে।

বৃক বলিল—ঐ ঐ, ঐ স্বাধীনতার রাজ্য!

নারী জিজ্ঞাসা করিল—কেমন করিয়া
আমি ঐ দেশে ঘাইতে পারিব?

বৃক বলিল—উপায় আছে, কিন্তু সে এক-
মাত্র উপায়। প্রেমের পাড়ি বাহিয়া, কষ্টের
স্রোত ভাঙিয়া। নাগ্ন; পছা; দ্বিভূতে অন্ননাগ।

নারী। কোনো পুল নাই?

বৃক। না।

নারী। ভাল কি গভীর?

বৃক। অতি গভীর।

নারী। স্রোত কি প্রবল?

বৃক। অত্যন্ত। যে কোনো দুহুর্থে
তোমার পদাশ্রয় হইতে পারে এবং তুমি
অন্তরে ডুবিতে পার।

নারী। কেহ কি এ নদী উত্তীর্ণ
হইয়াছে?

বুড়। কেহ কেহ চেষ্টা করিগাছে।
 নারী। কোথাও কি পাখাট আছে,
 পেখানে উত্তরন সহজ।
 বুড়। ঘাট নিম্নেকই
 হইবে।

নারী বলিল—আমি ঘাইব।
 বুড় বলিল—বেশ। তোমার মস্তবাসেব
 বস্ত্রাদি গুলিরা ফেল; বাহারা আগে চেষ্টা
 করিয়াছিল কাহারো ঐ কাপড় ভড়াইয়া
 ভুঁয়া মদিগাছে।

নারী নিঃশব্দে তাহার জীর্ণ সাজীন
 সংস্কার গুলিরা ফেলিল।
 বুড় বলিল—তোমার
 বেড়ি 'মল' গুলিরা ফেল।

নারী বাহ্যাব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইল।
 তাহার সঙ্গে শুধু একটি শুভ্র আবরণ,
 হৃদের কেনার মতো শাণ, তার বৃকের উপর
 লেখা 'সত্য'।

বুড় বলিল—ঐ আবরণ রাখিতে পার;
 উহা স্বাধীনতার রাস্তার লোকেই পরে;
 জলে উহা তোমাকে ডালাইয়া রাখিবে।...
 লও এই দণ্ড। ঘর উহা গুট করিয়া। যে
 দিন এই দণ্ড তোমার হস্তচ্যুত হইবে, সে
 দিন তোমার সর্জনশ। ইহা দিগা জল
 মাণিয়া মাণিয়া ঘাইগো, যেখানে ইহা থৈ
 পাইবে না, পেখানে তোমার পা দিগো না।

নারী বলিল—তবে আমি এখন ঘাই ?
 বুড় বলিল—না, থাম। তোমার বৃকে
 ও কি ?

নারী নীরব।

বুড় বলিল—থোন থোন, আমি দেখি
 ও কি ?

নারী বক্ষাবরণ গুলিল; তাহাশব্দ বৃকে
 একটি ছোট শিশু স্তম্ভপান করিতেছিল;
 কৃষ্ণ-বিক্রমের মতো ক্লান্ত তাহার চুল-
 জল; তাহার কচি কচি নম্র ডেলার
 মতো হাত দুখানি নারীর বৃকে লগ্ন ছিল।

গুক্তি বুড়া শিলাগা করিল—ও কে ?
 বৃক বাড়িয়া ও কি করিতেছে ?

নারী বলিল—দেখ দেখ এর হাত দুটি !
 গুক্তি বলিল—উহাকে বৃক হইতে নামাইয়া
 ফেল।

নারী বলিল—আহা! এ যে গুমাইয়া
 গুমাইয়া স্তম্ভ পান করিতেছে। আমি ইহাকে
 বৃকে বহিরা বার্ষিকতার বেলে লইয়া ঘাইব।
 এ যে আমার বৃকের 'ধন', সাধের শিশু।
 স্বাধীনতার বেলে এ মানুষ হইবে, আমার
 হৃদয়ে একত্র বিচরণ করিব, এর ঐ ক্ষুদ্র
 কিশোর হাত দুটি দীর্ঘায়ত হইয়া আমার
 চোকিয়া রাখিবে। মকুবুন্নিতে গে শুধু
 একটি কথা আমার কানে শুজন করিত—
 দে কথটি 'বাসনা'। স্বাধীনতার বেলে
 গিয়া ওকে নৃতন ভাষা শিখাইব—সখিৎ।

বুড়া গুক্তি বলিল—উহাকে বৃক হইতে
 নামাইয়া দেও।

নারী মিনতির স্বরে বলিল—আমি এক
 হাতে ইহাকে এমনি করিয়া বহন করিব,
 আর হাতে জল কাটিব।

বুড়া বলিল—না না, উহাকে নামাইয়া
 দেও। জলে নামিয়া তোমার সমস্ত মন
 পড়িয়া থাকিবে উহারই দিকে। নামাও
 নামাও উহাকে।.....ভর নাই, ও য়িরিবে
 না। যখন ও দেখিবে তুমি উহাকে একলা
 ফেলিয়া গিয়াছ, তখন ও আপনার হাত পা

মেরণ। আঘাটোয় উঠবে। তখন ও
তোমার আগেরই স্বাধীনতার রাজ্যে পৌঁছাবে।
স্বাধীনতার বাক্যে তোমাদের ভাবনা নাই,
সেখানে শ্রেয় হস্ত প্রসারিত করিয়াই আছে।
উৎসাহে অসহায় শিশু গুরুগারী করিয়া
রাখিও না, নামাত্র উৎসাহে, উৎসাহে বাড়িয়া
উঠিতে দাও, মাছুষ হইতে দাও।

নারী শিশুর মুখ হইতে গুন পুলিয়া লইতে
গেল। তখন সে এমন ধোরে ধংসন করিল
যে, বৃদ্ধধারার সহিত শোণিতধারা মিশ্রিত হইল।
নারী তাহাকে হাটিতে শয়ন করাইয়া আপনায়
আহত স্থান আবৃত করিল এবং নত হইয়া
তাহার লজ্জাকে কণাঘরত বুলাইয়া দিতে
লাগিল। দেখিতে দেখিতে শিশুর কেশকলাপ
গুস্ত হইয়া উঠিল, সে নৈশব হইতে একেবারে
বাড়িকো উপনীত।

নারী তখন নদীর পাড়ে গিয়া দাঁড়াইল।
সে বলিল—হারের হার! আমি কেন কোণু
যাইতেছি! এ নিরুদ্দেশ যাত্রা আমার কেন!
হার হার আমি একা! আমি একাকিনী!

এই আক্ষেপ শুনিয়া সেই বৃদ্ধা যুক্ত
বলিল,—হুপ! শুনিতেছি কিছু?

নারী মন দিয়া কান পাতিয়া থাকিয়া
থাকিয়া বলিল—হাঁ হাঁ তখনেছি, যেন দুই
অতিদূরে পদধ্বনি, হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি
পদধ্বনি, যেন এই দিকেই অগ্রসর হইয়া
আগিতেছে।

বৃদ্ধ বলিল—উহা তাহাদেরই পদধ্বনি
যাহারা তোমার পক্ষাঙ্ক অহসরণ করিয়া
চলিবে। অগ্রসর হও! ওগো সুতন পথের
প্রথম পথিক! পথ করিয়া দাও।……
তুমি কি দেখিবার শল্যপালের নদী পার হওরা?

প্রথমে একটা মনে পড়ে, স্রোতে সে ভাসিয়া
য'র; তাহার পক্ষান্তে আর একটা, তাহার
পক্ষান্তে আর একটা; এমন করিয়া
তাহাদের মৃতদেহের পৃথল্য এপাথ ওপার
হুড়িয়া যখন দেহ, তখন অবশিষ্ট লক্ষণে সহজে
নদী উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

নারী বলিল—যাহারা প্রথমে আসে
তাহারা মরিয়া যায়? ভাসিয়া যায়? কেহ
তাহাদের মনে করে না? আর করে না?

বৃদ্ধ বলিল—নাইবা করিল তাহাতে
কি!

নারী আশ্চর্য হইয়া বলিল—তাহাতে
কি?

বৃদ্ধ। তাহারা পথ ত করিয়া যায়!

নারী। আমাদের দেখপাতে যে পথের
সুত্রপাত সে পথে চলিবে কে?

বৃদ্ধ। সমগ্র মানবসমাজ।

নারী তখন নিজের বস্ত্রগুণ জোর করিয়া
চাপিয়া বহিল। আমি দেখিলাম সে সেই
কালো নদীর জটিল পথে নামিয়া গেল।

(৩)

আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমার
চারিদিকে অপরাহ্নের দীপ্তত আলোক
গোনার-বোনা চাঁদের মতো ছড়াইয়া
পড়িয়াছিল। অন্তঃগামী দূর্য্য কক্ষহুড়ার ডগায়
ডগায় সোমার আলতা পরাইয়া দিতেছিল।
আমার ঘোড়া আমার পাশে নিঃশব্দে আমারে
গ্যাপৃত। আমি পাশ দিয়া উঠলাম। লাল
বাগীর মধ্যে হাজার হাজার লাল শিশীলিকার
শায়ি। আমি যাত্রা শুরু করিব মনে করিলাম,
শিঙা আবার তত্না আসিল। তত্না-ঘোরে
আবার স্বপ্ন দেখিলাম।

সে এক চমৎকার দেশ। দেশানন্দের
পাহাড়ের চূড়ার সাহসিক। নারী সাক্ষী পুরুষের
পাশাপাশি হাতিখরাখরি বিচরণ করিতেছে।
তাহারা সরল অকলট ভাবে পরস্পরের
চোখের দিকে চাহিতেছিল, সে দৃষ্টিতে না
ছিল লজ্জা, না ছিল সঙ্কোচ, না ছিল বিধা
বা ভয়! সেখানে নারীর সঙ্গে নারীরও মধুর
সম্পর্ক—সকলেই সেখানে সমান।

আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—
ওগো এ কাহার দেশে বিদেশী নামিছে
এসে?

সে বলিল—এ স্বর্গ!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কোথার?

সে বলিল—পুনিবীতেই!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এমন স্বর্গরাজ্য
আমরা কবে দেখিব।

সে বলিল—অবিলম্বে।

আমার হস্তা টুটিয়া গেল। আমার
চারিদিকে অস্তরালেয় সোনার মায়া।
পাহাড়ের কপালে সোনার তিলকের মতো
সূর্য, আর সকলদিক-ভরা সীতল শান্তি!
পিন্ধীশিকারী ঘোরে ঘোরে গর্তগুহে ক্রিষ্ণে-
ছিল। আমি বোড়ার চড়িলাম, সূর্য
পাহাড়ের আড়ালে ছুঁবিধা গেল। সে
তিরোধান কী তীর্থন হইত য'ন আমি না
জানিতাম যে সূর্য আবার কাল এমনিতর
সোনার ধং ছড়াইয়া আর এক দিকে উপিত
হইলে।

প্রত্যেকেরই বক্ষোপাধার।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

প্রায়গ।

এই মণ্ডলের পরিধি আট হাজার লি এবং ইহা
একই নদীর দুই শাখার মধ্যে অবস্থিত। রাজধানী আর
২০ লি। গ্রহর পরিমাণে পত্র ভয়ে এবং ফলের বাহুল্য
অনেক। জলবায়ু উষ্ণ ও বনোন্ময়, অধিবাসীরা ভক্ত
ও দিগ্ধা। ইহারা বিভ্রান্তরক এবং বর্ষবিহীন।
দুইটি সম্ভারাবে হীনবানসম্রাজ্য কর্তৃকজন বতি বাস
করেন। দেবমন্দিরও কয়েকটি আছে; বিদগ্ধা-
দিগের সংখ্যা যথেষ্ট।

রাজধানীর দক্ষিণে, চন্দ্রাবুকোড়ানে রাজ্য অশোক
নির্মিত একটী স্থপ আছে; ইহার ভিত্তিস্থ স্তম্ভিকা-
পর্বে স্রোবিত হইলেও, আটোতলি বর্তমানেরও
পূর্বাধিক খুঁট উঠে। পুরাকালে তথাপত এই স্থানেই
অধিবাসিগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। নিকটব
একটী ভূপে বুদ্ধদেবের মণ্ড ও কেনের তিল আছে

এবং অত্র একটী স্থানে যথার পূর্ববর্তী চোর জন বুদ্ধ
অমণ ও উপবেশন করিয়াছিলেন তাহার তিল আছে।

সেখোক্ত ভূপের সন্নিহিতেই একটী আটোম
সম্ভারাম আছে; এইস্থানে দেব বোধিদর পত্রশাস্ত্র-
বৈশুলাম্ অবদন করিয়া হীনবানসম্রাজ্যবিপ্লবের স্থল
ভূম পত্তন করিয়াছিলেন এবং অধিবাসিগণকে পরাস্ত
করিয়াছিলেন। দক্ষিণাভা হইতে বোধিসত্ত্ব প্রথমতঃ
এই সম্ভারামেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে
মগধে একটী বদামদ্যাক, তাৎপরিৎ তাত্তিক ভ্রাক্ষণ
বাস করিতেন; নামের যুৎপরিপত্ত সর্ব শুভহার
মানস্রেকার স্রোণবহার তিনি তাহার কতিবশীকে
অত্র করিয়া নিরস্ত করিতেন। বোধিসত্ত্বের সূত্র
আদেশ বিপর অমণত হইয়া তিনি তাহাকে তাহা
স্রোণে পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই লক্ষ্য
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাপর, আপনায় কি নাম?”

বেব বোবিলের বলিলেন “তাঁহারা আমাকে বেব বলিয়া ডাকে।” অবিখানী নিজালা করিলেন “বেব কে?” বেব উত্তর করিলেন “আমিই বেব।” অবিখানী পুনরায় নিজালা করিলেন “আমি অর্থ কি?” বেব উত্তর করিলেন “হুহুহু।” অবিখানী বলিলেন “এক হুহুহু?” বেব উত্তর করিলেন “হুহু।” অবিখানী বলিলেন “তুমি অর্থ কি?” বেব বলিলেন “বেব।” অবিখানী জিজ্ঞাসা করিলেন “বেব কে?” বেব উত্তর করিলেন “আমি।” অবিখানী নিজালা করিলেন “আমি কে?” বেব উত্তর করিলেন “হুহুহু।” অবিখানী বলিলেন “হুহুহু কে?” বেব বলিলেন “হুহু।” অবিখানী জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে?” বেব উত্তর করিলেন “বেব।” তাঁহারা এই ভাবে আশ্রয়ের করিতে লাগিলেন। অবশেষে অবিখানী দৃকত পারিলেন তাঁহাকে গম্যস্থিত করা অসম্ভব। সেই সময়ে হইতে তিনি বেব বোবিলেরের বখেট সম্মান করিতেন।

সংস্কারভায়ে হৃদয়স্থিত ও অমৌলিক পতিদণ্ডের একটী বেববল্লির আছে। প্রবাদ এই যে, পুণ্যার্থীদের ইহা একটী প্রসন্ন স্থান। সত্ত্ব সংপ্রদ বর্ষবৃদ্ধা দান করিলে দেবল হয়, এই ভানে কর্দম দান করিলে ততোধিক বল হয়। অশিত, এই দশিরে যদি কেহ গিলি আদম হের জাম করিয়া মাংসভায়া করে, তবে সে অর্থে অক্ষয় হুখ ভোগ করে। দশিরের দুঃখকষ্টের পুরোভাগে মাংস অণুবাযুক্ত একটী বৃহৎ বৃক আছে। এই বৃক সে বহুবারতোম্বা একটী বৈভা—পুর্নোক্ত একাধের আশ্রয়ভায়া প্রস্তুত হিল বলিয়া, এই বৃক দান করিত। এই সত্ত্ব এই বৃকের দক্ষিণে ও বামে প্রচুর অগ্নি দেখিতে পাওয়া যায়। বখনই কোন ব্যক্তি এই দশিরে উপস্থিত হন, তখন নিজ আদম হের জাম করিয়া বেবভায়াগের বখেট বৃহৎ দেখিতে পান। অবিখানীপুন্নের আশ্রয়ভায়া ও বৃক হইতে বৈভোর প্রলোভনে, তাঁহাকে আরও প্রলোভিত হইতে হয় অতি প্রাচীন কাল হইতে এই বিদ্যা দেশভার চলিয়া আসিতেছে।

কিছু দিন পুর্বে “পুত্র” উপাধিযুক্ত, বিজ্ঞ, কৌতুক-

নিয় এক ভ্রাম্যন এই দশিরে উপস্থিত হইয়া সমগ্ৰে জনসমূহে বলিলেন “বহালগণ, ভোমরা বিশেষদ্বারা এবং উচ্চ অগণতন্ত্রতাবিশিষ্ট; তোমাদের বহুবিশ্বাস প্রবীণ করা হইয়াছে।” তৎপরে, তিনি তাহাদের যত পরিবর্তন কবিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের দহিত বজ্রোত্তী হইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনিই আবার বিশেষ দ্বিকাক্ষ হইয়া বহুগণকে বলিলেন “আমি ভাণ্ডাভাব করিব। পুর্বে আমি বলিতাম যে তাহাদের শিক্ষা বিদ্যা এবং হুস্তিগাণ্ড; এইক্ষেণে আমি বলিতেছি ইহা উত্তম ও সত্য। বখীর দক্ষিণ আকাশে তাঁহাদের বখীর ব্যক্তির আমাকে আলান করিতেছেন। এই পথিত দান হইতে আমি আমার অগণিত দরীকে বিক্ষেপ করিব।” তাঁহার বহুগণ তাঁহাকে একাগ্র হইতে বিরত থাকিবার অন্ত্র বখেট অনুযোগ করা হইতে বখন স্তম্ভকাক্ষ হইল না, তখন তাঁহার পতনের আকাশে বৃকের বিশেষ তাহাদের বহু-গুলি প্রসারিত করাতে, পতন হইলেও তাঁহার বহু হইল না। সংজ্ঞাভায়া করিয়া তিনি বলিলেন “আমি মনে করিয়াছিলাম যে আকাশে বেবভায়া আমাকে ঘাইবার সত্ত্ব দাক্ষিণ্যেবলিলে কিন্তু পরে এই হুই অবিখানী বৈভোর সত্ত্ব আমি বখীর বৃকভায়াে বকিত হইলাম।”

রামধারীর পুর্ন বখীর হুই মাংস-বখেট অবস্থিত ১. লি পরিবিত মনোহর উচ্চস্থান। এই স্থান হুই বাণ্ডাকারী। আশ্রয়দান কাল হইতে রাজা ও অভিভায়াগ, এই স্থানেই উপস্থিত হইয়া দান করেন। এই সত্ত্ব সকলে ইহাকে বৃহৎ দানক্ষেত্র বলে। বর্তমান কালে রাজা (পলাদিত্য) নিজ পুর্নপুণ্যগণের পলায়নগণ করিয়া পাঁচ বৎসরের দক্ষিত বন এই স্থানে একদিনে বিতরণ করিয়াছেন। এই বানকেই রানীকৃত মণি মুক্তা ও বন একত্রিত করিয়া, প্রথম বিদগ তিনি একটী বৃহৎদৃষ্টিকে সর্বাং বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া, সর্বাংগে পলায়ন মণিমুক্তা দান ইহাকে পুত্র করেন। পরে তিনি এই স্থানের দক্ষিণগণকে দান্য প্রদান করিয়া, তৎপরে বৃহৎপত অভিধগণকে দান করেন। তৎপরে, দক্ষিণ ব্যক্তিগণকে

এবং সংসারান্তরী বিবর্তিত্বকে বান করিয়া, অবশেষে, বিধান, আত্ম, অসাম্য ভাঙ্গ এবং তিন্দু-গণকে বান করেন।

এই একাধে নিম্ন কোষাগার পুত্র করিয়া এবং লক্ষলকে আরাধ্যে পুত্রিত্ব করিয়া, পরে তিনি নিজ রাজনুহুট ও কর্তব্যের দান করেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি কোষরূপে দুঃখ প্রকাশ করেন না। এবং যখন তাঁহার বান শেষ হয় তখন তিনি আলোকে লিখিত বলেন— এক্ষণে আমার বারা হিন্স ভাণ্ডা অধিনয় ও লক্ষ্য কোষাগারে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার পরে, বিভিন্ন যোনের শাসনকর্ত্তব্যে নিজ নিজ আচরণ, যদি সূক্ষ্মা শ্রুতি রাজাকে বান করেন এবং এইরূপেই রাজার কোষাগার পুনরায় পূর্ণ হয়।

এই বানকরের পূর্ণ দিকে নবীদগ্ধের অভ্যাস পুত্র পুত্র ব্যক্তি স্থান করিয়া বৈধভাগ করে। প্রত্যেক-বানীয়া িংঘনা করে; যে যারার নগ্নে প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার উপবাস করিয়া যেন এই স্থানে নিমন্ত্বে বৈধভাগ করে। তাহারে মতে এই পবিত্র জলে স্নান করিলে সকল পাপ মোহ ও বিবর্ত হয়। এই লজ্জা বানাদিক হইতে এবং দূর-দেশ হইতে যাত্রিগণ এই স্থানে সমবেত হইয়া বিশ্রাম করে। সাত দিবস উপবাসী থাকিয়া তাহার বৈধভাগ করে। এমন কি হনুমান ও পার্বতীর ছবিগুলি পর্য্যন্ত নবীতীরে সমবেত হইয়া কের কের স্নান করিয়া প্রহর করে, কের কের উপবাস করিয়া বৈধভাগ করে :

নিলামিত্যাত্মক যখন বানাদি করিতেছিলেন, সেই সময়ে একটী হনুমান স্তম্ভতলে বান করিত। এই হনুমানও যোগে উপবাস করিয়া কয়েক দিবস পরে ঐ কারণে বৈধভাগ করিল।

যে সকল অবিদ্যাপিত তপস্ভাগ করে, তাহার নবী নগ্নরূপে একটী উত্তম পুত্র নির্মাণ করিয়াছে। সূর্য্যোত্তর আকাশালীন তাহার এই তত্তে আয়োজন করিয়া, আশ্চর্য্যরূপে এক হস্ত ও এক পংখ্যের এই তত্তে বারণ করে; এইরূপে অবহার তাহার পুত্রের অভিনুপে চাহিয়া থাকে এবং পুত্রের পতিত

অতি লক্ষ্য করে। সন্ধ্যা হইয়া গেলে, তাহারাত্ত হইতে অবতরণ করে। অনেকগুলি সন্ধ্যা এই একাধে আচরণ করিয়া থাকে। এই একাধে তাহারাজ্য সূর্য্য হইতে মুক্তি পাইতে বান করে এবং অবশেষে যত বৎসর ঘরিতা এইরূপ তপস্ভাগ করিয়া থাকে।

এই বেশ হইতে বাকি পূর্ণ দিকে বাইবা আমরঃ বিস্ত্র পত্র ও বস্ত্র হস্তীপূর্ণ বনমধ্যে অবশেষ করি। ইহার নগ্নরূপে একত্রিত হইয়া পণ্ডিতগণকে নির্ধাতিত করে এবং ঐ লজ্জা একলকে অনেক সন্ধ্যাক মা হইলে এখানে অমর কথা প্রদাণ।

আর ৫০০ মি বাইবা আমরঃ কোণবী নৌতি।

কৌশলী

এই বেশ তার ১০০০ মি এবং রাজধানী ৩০ মি। তাঁর নগ্নরূপে লজ্জা প্রত্যেকের নগ্নরূপে আসিত। বেশে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও ইক্ষুপত্র পাওয়া যায়। ললবাসু লজ্জা উচ্চ, অবিদ্যাপীরা কঠোর আভ্যন্তরিত নির্দিষ্ট। ইহার বিজ্ঞানী করে এবং ব্যক্তিগত। ললবাসু বন্যী সন্ধ্যার আভ্যন্তরিত ইহারে তাৎপর্য্যে লজ্জা দেখা যায়। ১০০ পুত্র বতি বান করেন— ইহার লক্ষ্যেই কৌশলানবতাবল্য। ৫০০ বৈধ-মন্দির আছে এবং ললবাসু অবিদ্যাপী এই বেশে বান করে।

সপ্নাত্মক প্রাণীম আশ্রমে ৬০ হুট উচ্চ দুধ বিহারে চন্দ্রমণ্ডলনির্দিষ্ট মুক্তহুটি আছে; এই মুক্ত হুটির উচ্চ প্রভেদের চাঁদের আভ্যন্তরিত। লজ্জা উচ্চান ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐযুক্তি পুত্র বলে ইহা হইতে এক বৈধ আলোক নির্দিষ্ট হইয়া যথো যথো কীটমান হয়। ললবাসু নগ্নরূপে এই হুটির নগ্ন বেশে লইয়া বাইবার লজ্জা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই। এই লজ্জা তাহার ইহার আভ্যন্তরিত পুত্রা করিয়া ইহা একত উপানবাসনির্দিষ্ট হুটি বলিয়া প্রচার করেন।

তথ্যভেদে শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ হইয়াছিল, তখন

জীবার ভাঙার বিচারে তিনি বর্ণে অসামান্য করিয়া, ভিন্ন মান অনুসৃত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ গ্রেহ বশতঃ তথাপণ্ডের এক অতিমূর্তি নির্মাণে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; এই ক্ষত তিনি মূল্যনা মারামণ্ডকে জীবার ঐক্যিক শক্তিধর কোন কারিকরকে বর্ণে অগ্রণ করিয়া সুন্দর শরীর চিত্র লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা এবং জীবার চন্দ্রকর্ণনির্মিত মূর্তি নির্মাণের ক্ষমতা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। যখন তথাপণ্ড বর্ণ হইতে অত্যন্ত হইলেন, তখন ঐ চন্দ্রকর্ণ উৎপিত হইয়া পৃথগীকৃতক প্রণয় করিল। পৃথগীকৃত তাহাকে সন্মোহন করিয়া বলিলেন "অবিদ্যাতে অবিদ্যাবীমূষক বর্ণে লোকিত এবং বর্ণগণে চালিত করাই তোমার কার্য্য বলিল।"

বিহারের একশত শত বর্ণিকের পূর্ণতম চারি জন সুন্দর অঙ্গ ও উপবেশনের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিকটেই তথাপণ্ড কর্তৃক ব্যাচুত একটা সূত্র ও সন্মোহন। সূত্র এবংও জন আছে কিন্তু সন্মোহনটি বিস্ময় হইয়াছে।

মগরের দক্ষিণ পূর্ণকোণে, গোপীন্দ্র নামক অভিজাতের আত্মীয় বাসস্থানের পশ্চাৎপশ্চিম ভাঙ্গা দেখা যায়। সন্মোহনে সুন্দর বিহার এবং একটা সূত্র সুন্দর বেশ ও নব চিত্র আছে। তথাপণ্ডের সন্মোহনের তথাপণ্ডের দেখা যায়।

মগরের দক্ষিণ-পূর্ণকোণে, একটা আত্মীয় সন্মোহন আছে। এই স্থানে পূর্ণকোণে গোপীন্দ্রের উদ্যম ছিল। অলোককায় কর্তৃক দুই শত দুই উচ্চ একটা সূত্র এই স্থানে নির্মিত হইয়াছিল। তথাপণ্ড এই স্থানে কর্তৃক বর্ণের বর্ণগণের করিয়া-ছিলেন। সূত্রের সন্মোহনেই পূর্ণকোণে চারি জন সুন্দর উপবেশন ও অঙ্গের চিত্র আছে। এই স্থানে অঙ্গ একটা সূত্র সুন্দর বেশ ও নব চিত্র আছে।

সন্মোহনের দক্ষিণ-পূর্ণকোণে বিত্তল আশ্রমের উপরিস্থ ইষ্টকনির্মিত কক্ষে বহুজন বোধিসত্ত্ব বাস করিতেন। এই কক্ষে তিনি সন্মোহনমতাবলম্বী-নিপক্ষে পরাশ্রুত অবিদ্যাবীমূষক হস্তমুখি করিবার ক্ষমতা বিদ্যাভাজনির্মিতাশ্রুত অঙ্গের করিয়াছিলেন। সন্মো-

হাষের সুন্দর, আশ্রমস্থানে আত্মীয় আত্মীয়ের ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে অঙ্গ বোধিসত্ত্ব হিন্দুধর্মের দ্বি-কিত শাস্ত্র অঙ্গের করিয়াছিলেন।

মগরের ৮৩ মি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিত্তল সূত্রের অঙ্গনির্মিত বাসগৃহ আছে। তথাপণ্ড এই সূত্রকে বর্ণ করিয়া এই স্থানে নিজ ভাষা পরিভাষণ করিয়াছিলেন। যদিও এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত, তথাপি এই ভাষার কোন নিবর্ণন পাওয়া যায় না। বিকটেই অঙ্গনির্মিত ২০০ ফুট উচ্চ একটা সূত্র। বিকটে তথাপণ্ডের ইচ্ছাভাঃ সন্মোহনের চিত্র আছে এবং অঙ্গ একটা সূত্র তথাপণ্ডের কৈশ ও নব দক্ষিত আছে। যে সকল লিখা ব্যাখ্যাস্তর হস্ত, তাহারা এই স্থানে প্রাপ্ত করিয়া আশ্রমস্থানে লাভ করে।

শাক্যস্থানের বর্ণ লোণ পাইয়া এই শতাব্দী হইতে ইহার সন্মোহন হইবে। এই ক্ষত উচ্চ নীচ যাহারা এই সূত্র আশ্রম কর্তৃক, লক্ষ্যেই অঙ্গনির্মিতের পূর্ণকোণে ইহার পড়ে। কেহ কেহ সন্মোহন করতেন।

সন্মোহনের উত্তর পূর্ণকোণে আশ্রম ১০০ শত লিখা পাইয়া পক্ষা উত্তর হইয়া পূর্ণকোণেই হইয়া কিম্বদন্তী লোণ। এই মগরের পশ্চিম আশ্রম ১০ মি; অবিদ্যাবীমূষক বর্ণ এবং সূত্র। মগরের বিকটেই একটা আত্মীয় সন্মোহন; ইহার ভিত্তিসূত্র অবশিষ্ট আছে। এই স্থানে বর্ণগণ বোধিসত্ত্ব অবিদ্যাবীমূষক কর্তৃক পরীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সূত্রের পূর্ণকোণে একজন সন্মোহন বিবর্তীপণ্ডের বর্ণের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া বোধিসত্ত্বের প্রতি সন্মোহন প্রাপ্ত এবং অবিদ্যাবীমূষকের প্রতি অধিক সন্মোহন করিতেন। একদিন তিনি অবিদ্যাবীমূষকের বর্ণ হইতে একজন সন্মোহন, বিত্তল ব্যাচুত আশ্রম করিলেন। তিনি দ্বিগুণ শত শত পূর্ণ শত শত শতের এক সূত্র অঙ্গের করিয়াছিলেন। এই সূত্রে তিনি সুন্দর বর্ণের বর্ণ করিয়া, সুন্দর বর্ণের বর্ণের লিখা করিয়া নিজ বর্ণের অঙ্গের করিয়াছিলেন। ইহাতে ভাষা, সুন্দর ব্যক্তিগণের এক শত। অঙ্গের করিয়া

এ বিপ্লব বাহাদুর্য্যব করিতে আদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন যে, অবিমানাগ্রস্ত জরাজাত করিলে তিনি যুদ্ধবর্ধের বিনাশ সাধন করিবেন কিন্তু পরাজিত করিতে না পারিলে অবিমানী ত্যাগিকের দিব্য। কর্তন করিতে হইবে।" এই সময়ের সমবেত ঘটিবৎ, পরাজয়ের আশঙ্কা করিয়া সঙ্গরায় সত্ত্ব একত্রিত হইলেন এবং বলিলেন "আমি যুদ্ধ অগ্রবিত রক্তাক্তে, যুদ্ধের অবশিষ্ট অবশ্যপ্রানী। রাজা অবিমানীদের প্রতি পক্ষপাতী; একেই আমার বিরুদ্ধে তৎপর করিতে পারি। বস্ত্রত; আমার—যেহ সন্তান পতিত। কি করিয়া এইকণ উদ্ধার পাইতে পারি।"

বর্ধপাল বোধিলঃ বহল নবীন হইয়াও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের সত্ত্ব সাদৃশ্য সত্ত্ব করিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণিক উদ্ধার চরমের স্তব্ধ যাত্র হইয়াছিল। তিনি এই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন এবং উৎসাহের সহিত সমবেত ঘটিবৎকে বিরোধিতা করে অতি-আশঙ্কিত হইলেন "যদিও আমি অজ্ঞ, তথাপি আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। একতাই আমি রাজার আদেশ এইকণই প্রতিপালন করিব। যদি তর্ক দ্বারা জরাজাত করিতে পারি, তবে যুদ্ধ ত্যাগ হইবে। কিন্তু যদি আমি তর্কে পরাজিত হই, তবে লোকে আমার নবীন বয়সের যেহু পরাজিত হইতাকি, এইকণ বলিবে। উত্তর অকালেই দিকৃতি পাতকা হইবে এবং বর্ধরক্য হইবে। সমবেত সতলে এই প্রত্যয়ে সঙ্গত হইলেন এবং রাজাশ্রমে যাত্র করিয়া সত্ত্ব তীর্যকেই নিপাদন করিলেন। পরম্পরেই তিনি বেনী আরোহণ করিলেন।

তৎপর অবিমানী প্রত্যয়বাহার তীর্যক রিত্রাধন্যবর্ধ বাণ্য করিলেন। অবশেষে সতল অকালে নিজ বক্তব্য শেষ করিয়া অপর পক্ষের বক্তব্যের সত্ত্ব অশ্রমে করিতে লাগিলেন। বর্ধপাল বোধিলঃ প্রতিবন্ধী কথা শুনিয়া হাত্তসহকারে বলিলেন "আমি জরাজাত করিছি। আমি দেখাইব যে তিনি তীর্যক প্রতিপাল্য। বিশ্বস্তলি বর্ধপালকে

বিশ্বস্ত করিয়াছেন।" প্রতিবাদী উত্তরিত হইয়া বলিলেন "সহায়ঃ। উচ্চাভিমানী হইবেন না। যদি আমারে সত্ত্ব করিতে পারেন, তবে সমবেতই আগ্নি জরাজাত করিবেন কিন্তু তৎক্ষণে আমার বক্তব্য প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করুন।" তৎপর বর্ধপাল বীরবরে প্রতিপক্ষের বক্তব্য গ্রহণ করিলেন।

বিবন্দী, বর্ধপালের বক্তব্য সত্ত্ব হইয়া বিব দ্বিভাষ্যে উন্নত হইল। কিন্তু বর্ধপাল বলিলেন যে "সিদ্ধি জিহ্বা কর্তন করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। সত্ত্ব পরিবর্তন করিলেই প্রকৃত অশ্রুতান হইবে।" তৎক্ষণেই সেই অবিমানী সত্ত্ব তিনি বর্ধপাল্য করিলেন এবং অবিমানী বুদ্ধি বর্ধগ্রহণ করিলেন। রাজ্যে এই সময় হইতে বুদ্ধিবর্ধকে সঙ্গায় করিতে লাগিলেন।

নিকটেই রাজা অশোকান্বিত স্তব্ধ। ইহার প্রাচীর স্তম্ভিলাভ হইয়াছে তৎক্ষণে ইহা এইকণের আর উন্নত স্তব্ধ উচ্চ। এইখানে বুদ্ধিবর্ধ জরাজাত বর্ধগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিকটেই তীর্যক স্তম্ভের তির্যক বর্ধবান বহিরাগে। অশ্রুত, স্তম্ভ তীর্যক সত্ত্ব করিতে হইয়াছে।

১. এইস্থান হইতে উত্তর দিকে ১১০ কি ১২০ মি বাইরা আশ্রমী ধাপায়া বেনে পৌঁছি।

বিশাখা।

এই রাজ্য ৪০০ মি এবং রাজধানীর পরিধি ১৬ মি। দেশে সত্ত্ব পরিমাণে সাক্ষরবানী পাতকা দার এবং স্তম্ভকল বহুই। সত্ত্ববাসু বনোত্তম। অবিমানীরা সত্ত্ব। ইহার দ্বিভাষ্যালে অশ্রুত এবং অবিদিত বর্ধগ্রহণ করে। বিশটী সজ্ঞারামে আর তিন সত্ত্ব বহি বাল করেন; ইহার তীর্যক বক্তব্যবানী সত্ত্ব-সজ্ঞারামসত্ত্ব। এবং বেনে পক্ষপাতী দেবদ্বন্দ্বিত ও বহুসত্ত্বক বিবন্দী আছে।

রাজপথের দ্বারদিকে সত্ত্ব সত্ত্বের দক্ষিণে একটী বৃহৎ সজ্ঞারাম আছে। এই স্থানে বর্ধব বনোত্তম বিজ্ঞানকশ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই পাত্রে তিনি আশ্রমের বিজ্ঞান এবং বিদ্যারাম। ইহাতে

অনেক বাস্তুবাদ হয়। এই দ্বায়ে বর্ষপাল
ব্যবসায় সাত দিবসে হীমবানভাবলবী একপত
পতিতক পরাভ করিয়াছিলেন।

সজারামের নিকটে ছালা অপেক্ষা নির্মিত
১০০ পত ফুট উচ্চ তৃণ। এইখানে পুরাকালে
তথ্যপত হয় বৎসর বরিষা বর্ষজ্ঞেয় ও বহুপাতক
বোধবাণে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তৃণের সন্নিবিষ্ট
কায় ফুট উচ্চ একটা আশ্রয় বৃক্ষ। বহু বৎসর
বরিষা ইহা একই ভাবে আছে, ইহার ডাল বা শুঁড়ি
হয় নাই। পুরাকালে তথ্যপত বহুবাদন করিয়া

স্বয় শাখাদ এই দ্বায়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।
ইহাই বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। অবিশ্বাসী ও
ভ্রান্তপণ অনেক লোক এই বৃক্ষ ভেদন করিয়াছে,
কিন্তু ইহা পুনরুৎপন্ন হয় নাই।

নিকটে, পূর্ববর্তী চারি জন বৃদ্ধের ভয় ও উপ-
বেশনের চিহ্ন আছে। কেন ও বহু রকমের কষ্টও
তৃণ আছে। এই দ্বায়ে অনেক মণির আছে।
উত্তর পূর্বদিকে ১০০ পত লি দাঁড়া আশ্রয় প্রাপ্ত
পৌষি।

দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুজাতি।

এই প্রাচীনকাল হইতে আফ্রিকার
দক্ষিণাংশে জুলু নামক জাতির বাস করে; এই
কত ইংরেজেরা এই স্থানের নাম দিয়াছেন
জুলুগ্যান্ড। ইহার স্থান পরিমাণ প্রায় ৮২০০
বর্ষ মাইল। উত্তরে বালোণ্ডা ও
টোপালগাও, পূর্বে ভারত মহাসাগর,
দক্ষিণে টুগেলা নদী পশ্চিমে ড্রাকেনবার্গ
নামক পর্বতমালা। বর্তমান সময়ে ইহা
ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের অধিকারে নেটাল রাজ্যের
অন্তর্ভুক্ত হইয়া শাসিত হইতেছে। লোক-
সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। প্রায় লাড়ি হয়
পত ইংরাজ এখানে কার্যোপলক্ষে বাস
করিতেছেন।

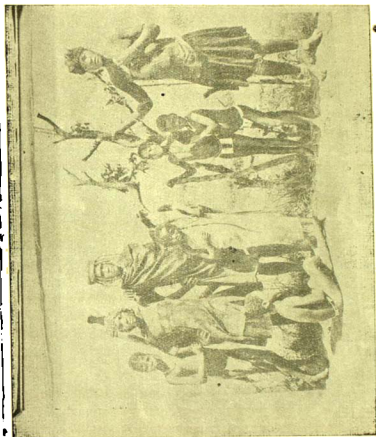
জুলুজাতি বাষ্ট্র নামক হাবসি সম্প্রদায়ের
শাখা বিশেষ। নেটাল, কেম্পালোনি,
দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, মোকালো প্রভৃতি
প্রদেশের সমুদ্রতীরেই প্রায় ইহারা বাস করে।
জাতির মোকালো প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টি-
পুষ্পার বহু প্রচলন দেখিয়া স্থলযানগণ

ইহাদিগকে কার্ফের অর্থাৎ বিদ্রোহী বলিভেন,
সেই হইতে ইহাদের আর এক নাম
জুলুকার্ফের হইয়া পড়িয়াছে।

জুলুজাতির আদিম বাসস্থান কোথায়
এবং কি প্রকারে তাহার উক্ত প্রদেশে
আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার কোনও আদ্য-
মিক পরিচয় লাভ করা যায় না। অনেকের
অনুমান অত্যন্ত হাবসী জাতির আগমনের
পরে ইহারা এ অঞ্চলে আসিয়াছিল। ইংরেজ
যে সময়ে পূর্ব আফ্রিকার আগমন করেন
গোধ হয় তাহার দেড় হাজার বর্ষ পূর্বে
জুলুজাতি উক্ত দেশে আগমন করে। কিন্তু
ইহারাও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাতলা
যায় না।

জুলুজাতি বাষ্ট্র প্রেইরী অত্যন্ত জাতির
অপেক্ষা জগতি ও স্থলর। ইহাদের বর্ণও
উহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জল। পূর্বে
ইহারা যেখান লুণ্ঠ চরণে আপনাদের পরিচয়
প্রদত্ত করিত কিন্তু এখন তাহারা স্বয়-নির্ভর

যত্র ব্যবহার করে। অস্ত্রাস্ত্র সত্তা ভাতিব দ্রোণোকবের কপনও কপনও বকোঁথজ
অপেক্ষা ইহাদেশ বস্ত্রের ব্যবহার অনেক কম। মৌপিতে পাওয়া যাবে। কিছু পুরুষদের
কেবল শীত ও বর্ষাকালে ইহাদি এক প্রকার বস্ত্র:বস্ত্র সজ্জা অনাগুতই থাকে। পুরুষদের
লম্বা জামা ব্যবহার করিয়া থাকে। বাগ্জত জামার বর্ণ একরূপ হয় না।



কতকগুলি জুগুকাতি পুরুষ বান্দা।

প্রত্যেকেই পুরুষ পুরুষ বর্ণের ও বিভিন্ন
প্রকারের জামা পরিধান করিয়া থাকে।
কেহ কেহ জামায় সূত্র সূত্র কাঁচও সংলগ্ন
করিয়া দেয়। কেহ কেহ বা নানো পকারের

গোতামে অথবা
জামা সাধারণ।

ইহাদেশ কেশবিগ্রহে অতি বিভিন্ন রকমের
পুরুষদের সমস্ত শিরোদেশ মুণ্ডিত করিয়া

ସଦ୍ୟହ୍ନେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କେଶ ବାନ୍ଧିଆ ମେଘ । କର୍ମନଃ କର୍ମନଃ ତାହାରୀ ମାମୋର ମାଳକଃ
 ଇହାରା ଗାଈ ଇହ ମାମୋର ଶର ଶକାର ଟୁମ୍ପି ମାମାୟ । ମୟେ ମୟେ ତାହାରୀ ତାମାକେୟ
 ମରିଧାନ କରନ୍ତା ଉଚ୍ଚ କେଶଫଳକେ ଟୁମ୍ପିର ଡିଗା, ଛୋଟ ଛୋଟ ହୃତ ଅନୁତି ଐ ଟୁମ୍ପିର
 ଶିତର ଦିଗା ବାନ୍ଧିବ କରନ୍ତା ମେଘ । ଐ ଟୁମ୍ପିରେ ଶିତର ବାନ୍ଧିଆ ପାକେ । ଶ୍ରୀଲୋକେରା ତାହାମେଘ



ଏକ ଦୁର୍ଗୁ ମରିଧାନ :

କେଶ ଚର୍ଚ୍ଚି ଅଥବା ଅତ କେନ ଆଟା ବାମା କେନ ଶ୍ରୀଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଢ଼ି ଆସତ
 ପାକ ଦିଗା ତାହାତେ ଏକଶକାର ଲବା ବେଢ଼ି କରନ୍ତା ଟୁମ୍ପାୟା ଯାଏ । ମାତେ ମିଶି ସେକରା
 ଆସତ କରେ । ଐ ବେଢ଼ି ଅନେକ ମୟେ ଏବଂ ମାତେର ସଦ୍ୟହ୍ନେ ହିସ କରନ୍ତା ତାହାତେ
 ଉମର ନିକେ ଉଠିଯାଏ ପାକେ । କେନ କେନଶକାର ସାତୁଧତ୍ତ ମାମୋର କରା ତାହାମେଘ

একটা প্রাচীন লব। অস্ত্রাভ অলম্বা ভাতোয়ের
মত জুজুতাও আপনাদের বের চিত্রিত করে।
কিন্তু এই প্রথা অনেকটা তাহানের ধর্মভাব
মিশ্রিত। আমাদের বেশে ত্রাকণ-সমূহ

উচ্চ-মণ্ডীর হিকুনের মধ্যে ত্রাকণ বজোপবীত
ও কর্ণনৈধ প্রথা প্রবর্তিত আছে। উদাহরণ
তরুণ 'অলম্বকরকি'র ভাবিতা বের চিত্রিত
করিয়া থাকে। এই সংস্কারের সময় শিকনের

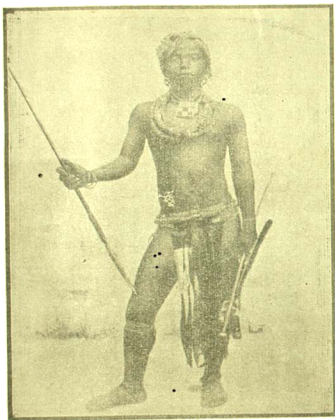


তরুণ অলম্বকরকি (মুগ)।

বের জল মিশ্রিত রঙে খোঁচ করিয়া এক-
প্রকার বেষ্টার্য মুক্তিকা তাহাতে লেপন করে।
এইরূপে শিকনের সর্বত্র বেষ্টমুক্তিকাধারা
অলম্বিত হইলে তাহাবিগকে ধূমিমানি

উপরে নাচিতে চাড়িয়া দেওয়া হয়। ধূমি
সংশ্লিষ্ট ঐ বেষ্টমুক্তিকা শুকাইয়া গেলে
পুনরায় ঐরূপ বেষ্টমুক্তিকা মাখান হইয়া
থাকে। তখন ঐ বাগকে যেন রক্তবর্ণ

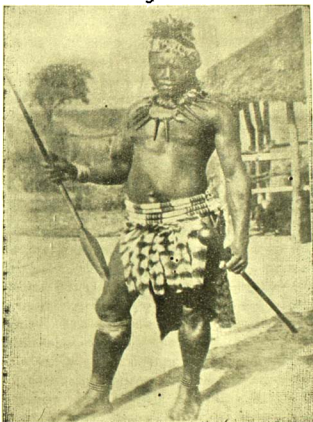
মণিবেবে মত দেখায়। অনেক ঘুরী দ্বী করে। অনেক জীলোক নাগিকানার্থ বিছ
কখনও কখনও আপনামেশ বেহও ঐকল করিয়া তাহাতে এক প্রকার মোটা নব
অঙ্কুরিত করে। ঘুরী পরিবারে মত পরিদাম করিয়া থাকে।
কুঙ্গু জীলোকে রা নাক ধরে প্রভৃতি বিছ কুঙ্গুতাঃ কুঙ্গু গুঙ্গু গুঙ্গুগুটীয়ে বাস করে।



এক কুঙ্গু মোড়া।

কুঙ্গুর যে সকল শাখা অবনত হইয়া প্রায় দিড়াইয়া দিয়া তাহার শীতাতপ নিবারণোপ-
যোগে ঠেকিয়াছে সেই সকল শাখাকে যোগ্য গৃহ নির্মাণ করিয়া লয়। ঐ সকল
কুঁকাইয়া মাটি ঢালা দেয়। পরে ঐ শাখা- কুটীরের প্রবেশদ্বার এত কুঙ্গু যে হাত ও
প্রশাসনকদের উপরে গান বা সঙ্গ পত্র হাঁটু মাটিতে পাতিয়া নিত্য সত হামাগুড়ি

দিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। বাণিশ একপ্রকার নরম চামড়ার প্রস্তুত। ইহারা কুতীরেব মধ্যে চাটাই অথবা কবল ইহারা পাত্তর। ও বস্ত্রাদি একপ্রকার ঘোটা বিছাইয়া শয়ন করে। ইহাদের মধ্যে কাপড়ে প্রস্তুত ব্যাগের মধ্যে পুরিমা রাখে। বালিশেরও ব্যবহার আছে। তাহাদের ঐ ব্যাগের মধ্যে পিতলের তালি দেওয়া



জগু সর্দার।

থাকে। প্রত্যেক গৃহে উল্লিখিত দ্রব্য বনের দগ হুৎ মাংস যথু প্রকৃতি ইহাদের সকল, মনোযোগে পাত্তাদি এবং শিকার প্রধান খাদ্য। এতদ্বিধ মধ্যে মধ্যে ইহারা ও আত্মরক্ষার উপযুক্ত ভীষণত্বক প্রকৃতি মৎস্ত কুটি প্রকৃতিও ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা সর্বদা খাদ্য অংশকা যথু অধিক ভালবাসে।

জুলুমহারুমারীর বিবাহ অনেকটা তাহাদের মাতাপিতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। পুত্রের পিতা কতটা পিতার নিকটে একটা গাড়ি পাঠাইয়া দেয়। যদি কতটা পিতা তাহা গ্রহণ করে তবে বুঝিতে হইবে বিবাহের সবকটা গৃহীত হইরাছে। কিছুদিন পরে বিবাহের সময় বন্দোবস্ত হইলে পুত্রের পিতা কতটা পিতার নিকটে আবার আর একটা গাড়ি পাঠাইয়া দেয়। তখন বিবাহের দিন নিয় হইয়া থাকে। বিবাহের সময় কতটা বরের নিকট হইতে অনেক উপহার গ্রাপ্ত হয়। ইহাদের সমাজে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এতরূপ বহুবিবাহ অনেকটা অবস্থার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যে ধনী লোকের অধিক পত্নীগ্রহণের সমর্থ হয়। ইহাদের সমাজে বানৌর জার জীর পক্ষও বানৌ-পরিভ্যাগ দৃষ্টীয় নহে। কিন্তু এতরূপ পরিভ্যাগের সময়ে স্ত্রী বা বানৌ অপরের যোগপ্রদর্শনে বাধ্য।

জুলুম আপনাদের পুরুষদের পূজা করে। ইহাদের বিশ্বাস এই যে মৃত্যু-ক্ৰিয়-গণের আত্মা ঠিক পূর্ণাবস্থায় অস্তিত্ব অস্বীকৃতি করিতেছে। আরাধনা দ্বারা পুনরায় তাহাদিগকে সেই স্থানে আনা ঘাইতে পারে। তদন্তরূপ উপর জুলুমের বোর বিধান। কাহারও কোন শারীরিক কষ্ট হইলে সে মনে করে তাহার পুরুষদের আত্মার কষ্ট হইতেছে বলিয়া তাহাকেও কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। এই জন্য ইহারা প্রেতের উদ্দেশে বলি প্রদান করে। জুলুম চিকিৎসকেরাও প্রেতদিগের সম্বন্ধিত রক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া রোগ দূরীকরণের

প্রয়াস পায়। তাহারা বলে মনুসমাজে বৃষ্টি আনিতে বা নদীর বজা বন্ধ করিতে পারা যায়। ডাইন ও ওকাগণকে (চিকিৎসক) ইহারা অতিশয় ভয় করে।

জুলুমজাতি সর্গসজ্জমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু মূলমতান ধর্মের অন্য কোন উপদেশ ইহারা গ্ৰহণ করেন না। বর্তমান সময়ে ইহাদের মধ্যে অনেককেই খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিতেছে। বাহারা গৃহধর্মাবলম্বী তাহাদের সামাজিক নিয়ম সমাজতন্ত্রের অনেকাংশেই পৃথক হইয়া পড়িতেছে।

জুলুমজাতি মৃতদেহ দাহ করে না। গ্রাহই প্রোথিত করে। ওকালা আপনাদের তান্ত্রিক কার্য সাধনোদ্দেশ্যে ভূপ্রোথিত মৃতদেহ উৎখাত করিয়া থাকে। এইরূপ অপেক্ষাকৃত ধনী জুলুম মৃত আত্মীয়গণের সমাধির নিকটে বর্ষাধিককাল পাহারা দেয়।

পশুশিকার, ভূবিবর্ধন এবং পশুপালন দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা দৌর পিতল প্রভৃতি খাত্ত গলাইয়া ওদারা তাহাদের কার্যোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রাদিও প্রস্তুত করিয়া লয়।

জুলুমজাতি অতিশয় কঠোর ও বৃদ্ধ-বিশ্রাবিশ্রাম। ইহাদের অধিকাংশ লৈলমাই পদাতিক। তাঁর স্ত্রী চাল তলোয়ার গলা "প্রভৃতি ইহাদের হস্তাস্ত্র। ইহারা কখনও কখনও নিষেধের দোষ ছাড়িয়া অস্ত্রের অধিকৃত প্রবেশ আক্রমণ করে। আর আলি বং এর পূর্বে ইহারা মোডেশিয়া, মায়েলী, ভানাল্যাও, প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। কতকগুলি জুলুম সম্রাট আফ্রিকাকে বিধ্বস্ত করিয়া বিচাছিল। পাঠকেরা বোধ হয় জুলুম

সরদার ডেনির নাম অবগত আছেন। কিছুদিন পূর্বে ইহারা ইংরাজ গণপরিষেতে বাস্তবায়ন করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে খুঁচ হইয়া দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

জুলুগাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে। অসভ্যজাতি মাহেই প্রায় মনে করে “কোর ধার মূলক তার”; কিন্তু জুলুগের মধ্যে একশ দিখান নাই। ইহাদের রাজ্য উত্তরাধিকারস্থের রাজত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ কোন দালাল মূহুর্ত্ত হইলে তাহার

পুত্রই রাজা হন। জুলুগিগের ধর্ম্মাধিকরণ বিচারক ও আইনব্যবসায়ীও আছে। আইনজ্ঞ ব্যক্তির কথা শুনিয়া বিচারক বিচার করেন। আইন স্বতন্ত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ নাই। ইহাদিগের আইনজ্ঞ সম্মুখায় বশ পরাম্পরায় আইনেরই ব্যবসায় করিয়া থাকে! সেওয়ানী ও কোজনারী উভয়দিক আটনই ইহারা জানে। জুলু বিচারালয়ে সাধারণের আবেদন নিবেদনের সমান অধিকার আছে।

ঐনয়নচন্দ্র সুপোষাধার।

মাতৃস্বপ্ন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মাতৃস্বপ্নিণী।

দৌড়াইলে পাছে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করে, এই তরে জ্যাক দৌড়াইল না, ঘীরে ঘীরে চলিল।

কিন্তু গতি ঘোর হইলেও, সামান্য কিছুতে বাধা ঘটবার সম্ভাবনা দেখিলে বাহাতে ছুটিয়া পলাইতে পারে, সে বিষয়ে সে সতর্ক রহিল। খানিকটা পথ এইরূপে চলিয়া তাহার ইচ্ছা হইল, একবার সে ছুটি বেগ—ঘীরে চলিবার বৈধা আর থাকিতেছিল না। উৎসেগে অসীমতা বাড়িয়া উঠিতেছিল। তথাপি সে ছুটিল না। গৃহের দিকে যে চলিয়াছিল।

সেখানে গিয়া সে কি দেখিবে? শূন্য—শূন্য গৃহ! মা নাই! তাহা হইলে সে কি করিবে? মায় সংবাদ তবে কোথায় মিলাবে? কেমন করিয়া মিলাবে?

মাই মিশুক, জিহ্মেনে সে কিরিবে না! কিরিবার উপায় সে রাখে নাই! সেখানে কিরিয়াব কথা, তাই দুহুর্ন্তের ভজ্ঞ ও জ্যাকের মনে উদয় হইল না। ঘনিও বা হইত, মাতৃব পূর্বে কণার আঘাত, মাতৃব কাতর ক্রন্দন, প্রচণ্ড ব্যক্তি—সে সকল মনে পড়িতেই তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ঐ যে বাড়ী—আলো জলিতেছে! মা তবে আছে! বাতরনের মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া বাহিরে পথ পড়িয়াছিল। দেখিয়া জ্যাকের চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মা না থাকিলে গৃহের প্রতি কণক এত আলো জলিবে কেন? মা তবে আছে! যদি এখনই কেহ বণে বাহির হইয়া যাও? জ্যাক ক্ষণভিত্তিতে বাটর মধ্যে প্রবেশ করিল। মাঝে বাটিতে কি নিশুল জনতা! চেয়ার টেবিল লোকা কোচ—হুবি, আলনা প্রভৃতি হগঘরে বিকৃত জুপাকার করিয়া রাখা হই-

রাছে। নানালোকে নাড়া-চাড়া করিয়া জিনিষ
পত্র লইয়া এ কি করিতেছে! ভিত্তি চৈলিয়া
জ্যাক ভিতরের কক্ষে প্রবেশ করিল। মাতার
শব্দা, খাট এমন অস্বাভাবিক কেন? তাহার
নিজের শব্দাটি মাথায় গইয়া ও কে বাহির
হইয়া যাব?

জ্যাক তাহার হাত ধরিয়া কহিল,
“আমার বিছানা কোথায় নিরে যাক?
এ আমার বিছানা।”

লোকটা সবিমবে জ্যাকের ঘুপের পানে
চাহিল। এমন সময় কীত্ৰা আসিয়া কহিল,
“এ কি, জ্যাক যে! তুমি কোথা থেকে
আসছ? হুগ থেকে কার সঙ্গে এলে?”

“মা কৈ?” পত্র ঘরে জ্যাক বিজ্ঞাসা
করিল, “মা?” তাহার কণ্ঠস্বরে একটা
ভয়ের ছায়া প্রচ্ছন্ন ছিল। উত্তরে সে কি
তুলিবে?

“মা ত এখানে নেই, জ্যাক! আচ্ছ,
জান না যুক্তি তুমি?”

“কোথায় মা? এ কি সব কছে?
কায় এয়া?”

“দিনের বেলা নিলাম হয়ে গেছে—যাত্রা
জিনিষপত্র নিয়ে যেতে পারিনি, তাহা নিয়ে
যাচ্ছে। তুমি ভিতরে এস, রান্নাঘরে এস,
সেখানে কথা কব, চল।”

রান্নাঘরের পথে পুরাতন ভূতোর দল
জ্যাককে বিরহা কেলিল। পাছে ইহারা
তাহাকে ধরিয়া জিম্বেনেলে রাধিয়া আসে,
এই ভয়ে জ্যাক কাহাকেও বলিল না যে, সেখানে
হইতে সে পলাইয়া আসিয়াছে! সে বলিল,
ছুটি পাইয়া একবার মাকে শুধু দেখিবার মত
সে বাকী আসিয়াছে।

কীত্ৰা কহিল, “মা ত এখানে নেই—
কোথায় গেছে, তা আমি”—কথাটা ব্যাখ্যা
গেল। কীত্ৰা মাথা বলিল, “আহা, এমন
ছেলে কেনে গেল, এর কাছে লুকোতে আমার
জাপ তেটে যাচ্ছে—না, না—জ্যাক আমি
জানি মা কোথায়—বলছি। পারিল পরে
এতিয়া আন—মা দেখানে।”

“দে কি অনেক ঘুরে, কীত্ৰা?”

“এখানে থেকে বারো জোলা।”

এতিয়া—এতিয়া—এতিয়া! জ্যাক
মনে মনে বারবার ঐ নাম উচ্চারণ করিল।
এতিয়া! নামটা সে যুগ্ম করিয়া কেলিল।
কীত্ৰা কহিল, “ছোট খাটো কতকগুলো
বাগান আছে—তার কাছে ছোট একখানি
হুম্মর বাড়ী, বাড়ীর নাম, আন্সন-হুম্ম।
সেখানে মা আছে।”

একাত্তর আগ্রহে, জ্যাক কথাগুলি তুলিল।
এখান হইতে যে পথ যদি গিয়াছে—সেই
পথ ধরিয়া চলিয়া রাহেউ, ভিত্তি ভাঙ পায়
হইয়া লাচনের পথ ছাড়িয়া কর্বেলের পথে
পড়িতে হইবে। তারপর সেই রাত্তা ধরিয়া
সিন্ধু নদীর পার দিগা গেল সেনারের অঙ্গল,
দেউ পায় হইলেই এতিয়া!

দুঃখের কথা তুলিয়া জ্যাকের স্তর হইল
না। সারা পথ সে হাঁটিয়া বাইবে। আজ
রাতেই চলিতে আরম্ভ করিবে! আজ সারা
রাত্রি, কাল সারা দিন চলিতে কি এতিয়া
পৌছান বাইবে না? পথে কত লোক চলি-
তেছে—অনাথ আত্মর তিথারী বাহারা—
তাহাদিগের ত গাড়ী চড়িবার পরমা দিলে না,
তাহারা যে পদত্বয়েই বেশ-শোভার সুরিরা
বেড়ায়, তবে জ্যাক কেন হাঁটিয়া এতিয়া

শোভিতে পারিবে না? যেমন করিবা হউক, সে এটিখো ঘাইবে, যাকে দেখিবে! কিসের তর?

জ্যাক বলিল, “তবে আমি স্থলে চলুন, কীর্তী।” আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার লজ্জা তাহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল—ভাবিতেছিল, একবার জিজ্ঞাসা করে, সেই আর্জেন্ট ও কি এতিমোতে আছে?—সেই শব্দটা কি মাতা-পুত্রে এমন বাৎসরিক ঘটাইল? কিছু কথাটা জ্যাকের মুখে বাধিয়া গেল—বাহির হইল না!

“তবে, এগ জ্যাক,—মাতা হয়ে থাকে! লগে কেউ থাক, না হয়!”

“না, না, কোন দরকার নেই, কীর্তী।” বালকের মনে একটা দুর্জয় অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছিল। মা—বাহার লজ্জা জ্যাকের মনে এতটুকু শান্তি নাই, তাহাকে দেখিবার লজ্জা জ্যাকের প্রাণ কাটিয়া গাইতেছে—যে মার সংবাদ একদণ্ড না পাইলে জ্যাকের বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না—সেই মা—তাহাকে কুলিয়া, তাহার কোন সংবাদ না লইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। জ্যাক ভাবিল, একবার মার কাছে গিয়া মার কোলে মাথা রাখি! ঘরিতে পারে শু, মার এই অবহেলা! অন্যদেরের চুক্তিত প্রতিশোধ লওয়া হয়, তাহারও অপরাধ গোপন না চিরদিনের লজ্জা জুড়াইয়া বাচে! আঃ, কি সে অগতির কৃষ্ণি! কীর্তী ও ভ্রাতৃবর্গের নিকট হইতে বিনাম লইয়া জ্যাক পথে বাহির হইল।

তখন চারিখার কুশাশার তরিতা উঠিয়াছে। সেই খন কুশাশার মধ্যে পথের আলোকগুলি উত্তার আকাশে বীজ্তিহীন নক্ষত্রের সত

মিটমিট করিতেছিল। চলিবার সময় মাঝে মাঝে অজানিত আশঙ্কার জ্যাকের বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল! কতদূর—তাৎকে ঘাইতে হইবে! কত পথ তাৎকে চলিতে হইবে! উপায় নাই, চলিতেই হইবে! না হইলে সেই দুর্দান্ত মরোত্তর হাতে পড়িলে আর মক্ষা থাকিবে না! প্রতি মুহূর্তে তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, যদি ধরা পড়ে! পথে কনট্টেবলের লঠন দেখিলেই জ্যাকের বুকটা দলক করিয়া উঠে, বুক সন্ধান পাইয়া সে তাহাকেই ঘরিতে আদিতোছে! দুগে কাহারও কঠোর শুনিলে জ্যাক কাঁপিয়া উঠে—মনে চর, কে যেন তাহারই সন্ধান বলিয়া দিতেছে। জ্যাক আকাশের দিকে চাহিল, মনে হইল, যেন লারা আকাশ নিতরুণবে তাহার গতি লক্ষ্য করিতেছে! শুধু দেখিতেছে, কোথায় সে যায়! যেমনই সে বিশ্রাম করিতে বসিবে, যেমনই তাৎকে ঘরিয়া দিমনে সে চাপান দিবে! নিতরুণ বার্তাগুলি, নিতরুণ আকাশ,—নিতরুণ প্রকৃতি সকলে মিলিয়া তাহারই বিরুদ্ধে এক গভীর বড়বর করিতেছে! ঐ না কে বলে, “ধর, ধর, জ্যাক যে পলায়!”

সারারাত্রি ঘরিতা জ্যাক চলিল। তাহার পর পথন প্রভাত হইল, তখন তাহার দেহ অবসর হইয়া পড়িল। তবু বিরাম নাই, সে চলিয়াছে! এ দীর্ঘ পথে এতটা যন্ত্রের মত শুধু চলিয়াছে! উপায় নুটি, শুধু মূখ যেন প্রাণহীন, মনহীন একটা পুতুলকে কে দম দিয়া পথে ছাড়িয়া দিয়াছে!

পথে কত লোক চলিয়াছে। কর্ণ-

চক্ষুঃ সঘনরূপে চারিদিক সুপরিচিত । সে
পক্ষে সকলেই কি এত গভীর ব্যাখ্যায়
সমর্থ কিম্বদন্তি সম্বন্ধে দুইটা চলিয়াছে—
ইহাব মধ্যে তাকে যে সফলের দৃষ্টি একাই
চলিবে, তাহাতে বিচিৎ কি ? অ্যাকের গুপ্ত
স্বপ্নের দিকে ভবিষ্যৎ চাহিবার কাহারও
অপসর ছিল না !

ক্রমে রোজ পড়িয়া আসিল । নবীর
ধার দিয়া পথ—জ্যাক সেই পথে চলিল ।
অপরূপের বাণু হৃৎকোর শেষ রক্তিকণাগুলি
উড়াইয়া ছুড়াইয়া দুইটা বেড়াইতেছিল ।
দিনের গান খরিয়া আসিতেছিল ।
কর্ণকান্ত ধরিত্রীর তপ্ত নিখাস নদীর
অশ্রু নিপাটরা বাইতেছিল । প্রকৃতি মুচ্ছারূপ
হইয়া পড়িতেছিল । আলোকের যেখান
উপর ক্রমে ঘোরে ঘোরে কে একটা হৃৎ
কালো পর্দা বিছাইয়া বিল । চারিদিকে
ঈশ্বর নামিল !

সারারাত্রি, সারাদিন জ্যাক পথ চলিয়াছে ।
এখন পা দুইখানা ঘেন আর চলিতে চাহে
না ! ত্যাকের মনে হইল, আর না, এইবার
তুমিতে দেহভার লুটাইয়া দিও, অগ্ন্যব মত
চলার বিধায় হইয়া থাক ! কিন্তু না, যা
—আ—কোণের মা !

বিস্রাম করিতে বসিলে চলিবে না—
বিলম্ব নয়—স্বপ্ন করিয়া হটক, আর কাছে
বাটতেই হটবে । সুতরাং যদি হুত, এখন
নয়,—ওগো জীবন, আর কোণে জুর্জগা
বালককে পৌছাইয়া যাও, তার পর ছাড়িয়া
যাইও ! হে বন্ধ ! আর কিছুকাল সহচর
থাক !

তখন গভীর রাত্রি ।

কতিং আলো দেখা যায় ! অন্ধকারে চাঞ্চি
ব্যয় তরিয়া গিয়াছে । গ্রাম্য পথে আর
কেহ নাই, শুধু সে চলিয়াছে । একবার সে
বন্দল ! সন্নিহা অ্যাকের দিকে চাহিল—জিত
শুখাইয়া আসিতেছিল—পা দুইটা বিধম
তার বেধ হইতেছিল । এ তার টানিয়া লইয়া
যাইবার শক্তি আর তাহার ছিল না ! এমন
সময় সহসা সে দেখিল, দুইটা আলোক-রশ্মি
তাহারই দিকে আসিতেছে !

আলোক-রশ্মি ক্রমে সম্মুখ আসিল ।
জ্যাক ডাকিল, “মশার !”

তাহার জিত অড়াইয়া গিয়াছিল ।
অপঘটা বর বাহির হইল না । অগ্ন্যপনে
শক্তি লক্ষ্য করিয়া জ্যাক ডাকিল, “মশার,
গাড়ী পাননা !”

“কে তুমি ?”

“আমার গাড়িতে বিন, আমি চলতে
পাচ্ছি না, সারা রাত হেঁটে আর পাচ্ছি না—”

“কোণের ঘাবে, তুমি ?”

“সেনার !”

“বেশ এস, আমার সঙ্গে—আমি
একিয়ারেই থাকি !”

গাড়িতে উঠিয়া জ্যাক বলিল, সে
হৃৎকোর বোডিং থাকে । সেনারের আর
অগ্রগত হইয়াছে, সন্নিহা অ্যাকের প্রত্যক্ষ
পাকিতে তাহার দৈর্ঘ্য ঘরিল না, কানেই
হাঁটিয়া চলিয়াছে ! যা ছাড়ো অগতে তাহার
আর কেহ নাই !

লোকটি কহিল, “আমার পথেই তোমার
বাড়ী পড়বে । আগে সেনার, তার পর জরল
পার লেলে তবে একিয়ারে । আমি আরো দূরে
যাব । তোমার নামেরে দিয়ে যাব ।”

জ্যাকের মনে অসুস্থতা হইল। কেন সে মিথ্যা বলিল? সত্য করিয়া সে কেন বলিল না, যে সেও এতিয়াতে ঘাইবে! কেনার তাহাকে নামাইয়া দিলে আবার এ পলটুকু হাঁটুয়া যাওয়া কি তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে? সে শক্তি নাই! চাঁদ, কেন, এ দুর্ভাগ্য তাহার হইল? এমন কি সংশোধন করিয়া লইয়া সত্য কথাটা বলবে? না! তাহা হইলে ইহার মনে সন্দেহ হইবে—যদি তিনি রাগ করিয়া নামাইয়া দিয়া যান! সত্য বলিবার সাহস—আমি জ্যাকের নাই! কি দুর্ভাগ্য, সে! গাড়ী চলিতেছিল। অন্যতর অসুস্থতার ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। সহসা জ্যাক তুলিল, “এই তোমার দেবার—নামো,” জ্যাকের মনে হইল, কে যেন তাহাকে লগুড়াবাত করিল। কি ভয়ঙ্কর! জ্যাককে নামাইয়া গাড়ী চলিয়া গেল।

জ্যাক অশ্রুপূর্ণ চিত্তে পথের প্রান্তে বসিয়া পড়িল। গাড়ীর আলো ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে মিলাইয়া গেল। তখন শীতল বায়ু বহিতেছিল! অগভীর ক্লান্তিতে জ্যাকেরও অসুস্থতাবশত লোপ পাইয়াছিল। তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্পার্শ্বে স্থিতিশীল ক্ষেত্রভাগ। নিবিড় অরণ্যে ভরিয়া রহিয়াছে। গাছের শাখা কাঁপাইয়া বায়ু বহিতেছিল—নৈন প্রকৃতির বিরাট গানে প্রান্তর মুখরিত—জ্যাক ইহার মধ্যে বসিয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে আনিতোও পারিল না।

সহসা ভীষণ নখে চমকিয়া সে জাগিয়া উঠিল! অর্ধেকশীতল মেঝে চাহিয়া সে দেখে, একটা সুবীর্ণ আলোকপুঙ্খবাহী রাক্ষস সশব্দে অদূরস্থ বনপথ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার

দীপ্ত লোহিত চোখ দুইটা আশ্রমের মত জলিতেছিল! পরক্ষণে দাম্পত্য পথ তুলিয়া সে মূখিল, এ রাক্ষস নচে, অদূরে দৌর পথ দিয়া একখানা টোপ সংবেগে চিরিয়া গেল।

করুণা ব্যক্তিরাহে? কোথায় সে? কতক্ষণ ঘুমাইয়াছে? সে জানে না—ভীষণ শব্দ দেখিয়া সে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সে শব্দ দেখাচ্ছে যেন মাত্র কবরের উপর মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাত্র তাহার শ্রান্ত শিরে চাত বুলটিতেছিল। সে হিমমত্তল স্পন্দে তাহার রক্ত কমেয়া লাইবার উপক্রম হইয়াছিল। মাত্র দিকে কি’রকম চাহিতেই মনে পড়িল, এ কি, মাত্র যে মরিয়া গিয়াছে! এমনই সে কাঁপিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। এই নিদ্রাক্ষকতার সাত্ত্ব মাত্র কখন মনে পড়িয়া যাওয়ার ভাবের ভয় হইল। আবার নিদ্রা গেলে বর্ষ অগ্রে মাত্র দেখা যুগের! মাত্র সে মুক্তি মনে করিতে যে অন্ধ শিহরিয়া উঠে!

জ্যাক আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আরও কত পথ চলিলে হবে যনের প্রান্ত মিলিবে! এ কি সুবীর্ণ স্বাদ!—অসুস্থতা পথ!

এমন সময় অদূরে এবটা কুকুট ডাকিয়া উঠিল। আকাশের শিথনে উষা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তারাই ভূমণের হেমজটা আকাশের কালো পর্দা ভেদ করিয়া ছিটাইয়া পড়িতেছিল। সমস্ত প্রকৃতি বৃহত্তবে উষার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কোথায় উষা—এস ভূমি—তোমার কিরণে জগতের অন্ধকার দূর করিয়া দাও! রক্ত অলসার বালককে আশা, ও উচ্চতা দিয়া

কুড়াইয়া দাও তোবাৰ কোলে ঝাঁপাইয়া
পড়িবাৰ চক্ৰ পে হুই বাহু ব'ড়াইয়া আকুল
চইয়া रहিছে !

মুহু সন্মীতের বহু আশিৰ্ব্বাস। পরিচিত
কণ্ঠে পরিচিত গান, এ কে গায় ? জ্যাক
চাহিয়া দেখিল ।



বাভাৰনের ধারে দাঁড়াইয়া, কে,
ও ? এ কি বস ? জ্যাক দুটো হাতে চক্ষু
মুছিল, আগায় চাহিয়া দেখিল—না এ
ত বস নয় !

জ্যাক ডাকিল, “মা !” কৌল বহু
বাতাসে মিলাইয়া গেল ।

বাভাৰন পাৰ্শ্বে যে রমণী দাঁড়াইয়া
ছিল, সে বিষয়ে দাঁড়াইয়া পড়িল—
তাঁহাৰ কণ্ঠেব মুহু সন্মীত পাশিৰ্ব্বা
গেল—সে পথের ধারে চাহিয়া দেখিল ।
সে রমণী, ইয়া ।

তখন সবেমাত্র সূৰ্যোদয় হইতেছে ।
ইয়া দেখিল, সূৰ্য্যের লোহিত আলোকে

“ইয়া জ্যাককে আপনাব বৃকে চাপিরা ধরিল।”

সহসা সম্মুখে অতিষ্ঠের পথে হুই হাতে,
আকাশের পক্ষী তৈলিয়া উষা আসিরা লগচে-
দেখা দিল ! প্রথমে সূর্য্যে হৃদয় একটা
নীত রশ্মি কুলির মত দেখা দিল । তাঁহাৰ পর
কে খেন সেই রঙ্গিন কুলিটা আকাশের
চাৰিদিকে বুলাইয়া দিল ! কুছাণাৰ আশ্রয়ের
মধ্য দিয়া সে বিভিন্ন বর্ণ ধরণীর বকে ছুড়াইয়া
পড়িল ।

সাম্য প্রকৃতি তখন জাগিয়া উঠিতেছিল ।
তাঁহাৰ দিগ্বজ্জ্বল নিখাল ধীরে ধীরে
বহিয়া গেল । ক্রমে পানীর গানে, চাৰিধার
তরিতা উঠিল !

সম্মুখেই জ্যাক দেখে, পরিষ্কর একখানি
কুয় খুঁচ । গৃহের একটা বাভাৰন বৃক
হইতেছে—বৃক বাভাৰনের মধ্য দিয়া কাঁহাৰ

মাত এক বালক বাভাৰনের নিম্নে
সোপানের পাৰ্শ্বে দাঁড়াইয়া ! বালকের মূণ
তুখাইয়া গিরাছে, চক্ষু কোটরে গিরাছে !
ইয়াৰ বেহ মুহুর্ন্তের অঙ্গ কাঁপিরা উঠিল—শিরা
মধ্য দিয়া একটা তড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল—
ইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, “জ্যাক !”
তাঁহাৰ বেহ আপনা হইতে কাঁপিরা উঠিল ।
মুহুর্ন্তে ইয়া জ্যাকের নিকট ছুটিয়া আসিল ।
বাভাৰ সম্মুখের সোপানের নিম্নে জ্যাকের
“অবলম্ব পতীর চলিয়া পড়িতেছিল, ইয়া
আশিৰ্ব্বা সোপানের নিম্নে বসিয়া জ্যাককে
আপনাব বৃকে চাপিরা ধরিল—আপনাব
মাতৃম্বয়ের সম্বন্ধ-সকিত হেহের তাপে হিম-
শিতল মুহুর্ন্ত পুঙ্কবে সন্মীত করিয়া কুলিল ।
মাত বৃকে মাথা রাখিয়া জ্যাক গভীর সান্তনায়
ধীরে ধীরে চক্ষু মুজিত করিল । ক্রমশঃ

ছান্নাশুষ্টি ।

(মোগাসার কভানী হইতে)

দশমি কোন একটা মৌসুমিয়ার, ক্রিয়াকর্মী ভাষণ বিবিস্ত-বাপের দত্তবিশদ হইয়াছে, সেই বিষয়ে কথাবার্তা হইতেছিল । একটা প্রাচীন পাঠ্যবাহার, দায়াকু-সম্মিলন উপলক্ষে কতকগুলি লোক সমবেত হয় । এতদ্বারা এক একটা ঘটনার বৃত্তান্ত বলিতেছিল, আর বলিতেছিল, ঘটনাটা সত্যই ঘটয়াছিল ।

তুর-তাম্রাণ নামক ৮২ বৎসর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ মাকুইন্স, ‘চিম্বানী’র নিকটে আনিয়া চিম্বানীর উপর ঠেস দিয়া বোঝাইলেন । ঐসং কল্পিত বয়ে তিনি বলিলেন :

—“আমিও একটা অদূত ঘটনার কথা জানি, এমন অদূত যে, তাতেই খেন আমার সমস্ত জীবনটা রাহস্যময় হয়ে আছে । ৪৬ বৎসর হ’ল, আমার এই ঘটনাটা হয়, আর এমন একটা মল্লত ঘাট না ঘন আমি তার বগ দেখি নে । সে ঘটনাটা আমার উপর একটা ভয়ের দাগ, একটা ভয়ের ছাপ রেখে গেছে ; —কপাটা বৃদ্ধিতে পাব্বে ? হাঁ, দশ মিনিট ধরে এমন একটা ভয় পেয়েছিলাম, যে সেই ভয় এখনও পর্য্যন্ত আমার মনকে দখল করে আছে । কেন একটা অপ্রত্যাশিত লক্ষ্যে আমার অন্তরাঙ্গা পর্য্যন্ত কেঁপে ওঠে । সন্ধ্যার ছায়ায় কোন একটা অল্পাট্ট মিনিট দেখলে, আমি কোথায় পালাব ভেবে পাইনে । আর রাত্রেই আমি বড়ই ভয় করি ।

“আমার এখন যে বয়স হয়েছে এ বয়স

না হলে আমি এই ঘটনার কথা কারও কাছে প্রকাশ করতেন না । কিন্তু এখন আমি সমস্তই বলতে পারি । এই ৮২ বৎসর বয়সে কায়নিক বিপদে ভর পাওয়া গেছে হয় তখন নিশ্চয় কথা নয় । কিন্তু ঠাকুরণ তোমরা বেশ জেনো, আলল বিপদের সময় এ বৃদ্ধা কখনও পিছপাও হয় নি ।

“এই ঘটনাটা আমার মনকে এমন গলট-পাণট করে দিয়েছিল, আমার অন্তরে একটা গভীর, একটা রহস্যময়, একটা ভাষণ একটা আতঙ্ক জন্মে দিয়েছিল, যে, এ কথা আমি কখন কারও কাছে বলি নি । এই কথাটা আমার অন্তরের সেই অন্তরালে লুকিয়ে রেখে-ছিলাম যেখানে আমাদেয় কষ্টকর গুপ্ত কথাগুলি, লক্ষ্যজনক গুপ্ত কথাগুলি আমাদেয় জীবনের সমস্ত অপ্রাকৃত গুপ্তলতাগুলি লুকান থাকে ।

আমি তোমাদের কাছে যেমনটি বলেছিলাম ঠিক তাই বলছি ; কেন ঘটেছিল তার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করব না । অবশ্যই তার কোন একটা কারণ ছিল ; তবে যদি আমি সেই সময়ে একেবারে পাগলের মত হয়ে গিয়ে থাকি, সে আশা না কথা । কিন্তু না, আমি পাগল হই নি, আমি তার প্রমাণ দেব । এতে তোমাদের যা বনে কল্পে হয় কর’ । বৃত্তান্তটা পোজাশুষ্টি এই :—

“১৮২৭ অব্দে ছান্না মাসে আমি ক’রা নগরে দুর্গরক্ষী পৈন্ডের মধ্যে ছিলেম ।

“একদিন আমি পোজা-বিশদ মাল-

ঘাটের উপর পায়চালি করছি, এমন সময়ে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। মনে হল যেন তিনি, কিন্তু লোকটি কে ঠিক্‌ স্বরূপ হচ্ছিল না। আমি অজ্ঞাতসারে যেন একটু দাঁড়াবার ভরসা করলেম। অপরিস্ফুট লোকটি আমার এই ভরসা লক্ষ্য করে আমার পানে একবার চোরে দেখলে, তারপর আমার উপর ক্রোশের সঙ্গে পড়ল।

“লোকটি আমার বাগাবদ্ধ, এক সময়ে ওকে খুবই ভাল বাসতেন। পাঁচ বৎসর কাল ওকে আর দেখি নি। মনে হল অর্ধ শতাব্দীর বার্ষিক্য তার উপর এসে পড়েছে। চুল সব লোনা হয়ে গেছে। চন্দ্রাব সমগ্র শরীরটা হয়ে পড়েছে এমনি জরাজীর্ণ। আমি বিস্মিত হয়েছি বুকের পেয়ে, তাঁর জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত আমার কাছে বসেন। একটা ভীষণ হৃৎকোমর তাঁর শরীরে তেলে পড়েছে।

“তিনি একটি নবযুগীয় প্রেমে উন্মত্ত হয়ে, তাকে বিবাহ করেন। এক বৎসরকাল যুগ্মতার সুখের সীমা ছিল না, আগন্তকা ভাগবাস্য দিয়ে যেন তার তৃপ্তি হত না,—ভাগ্যের সে হঠাৎ যাত্রা গেল—বোধ হয় হৃৎকোমরে। বোধ হয় অতি ভাগবাস্যই তার মৃত্যুর কারণ।

“যে দিন গোর বেগম হ'ল সেই দিনই আমার বন্ধু কর্মীর ছোট্টোলে এসে বাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি একাকী,—নিবাস ও হস্তাশ্রমে কালযাপন করতে লাগলেন। নোকানলে তাঁর জ্বর দিবানিশি বৃদ্ধ হতে লাগল। তখন আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন কথা তাঁর মনে আসত না।

“—তিনি বলেন,—আমার যখন তোমার

সঙ্গে দেখা হল, তখন তাই আমার একটি উপকার করতে হবে; আমার জমিদারী জুড়ীতে গিয়ে আমার ঘরের ডেস্‌কোয়ার বেগম থেকে কতকগুলি জরুরী কাগজপত্র খুঁজে বের করতে হবে। যে-লে দোককে দিয়ে দে কাজ হয় না, কেননা সেটি অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার,—খুব বিখ্যাসী লোকের বরকার। আর আমার কথা যদি বল, আমি সে বাড়ীতে আর প্রবেশ করি না। কিছুতেই না।

“সেই ঘরের চাবি ও ডেস্‌কোয়ার চাবি তোমার কাছে দিচ্ছি,—আমি চলে আসবার সময় সেই বর ও ডেস্‌কো বন্ধ করে এসেছিলাম। তাছাড়া, আমার বাগানের মালাকে আমার এই চিঠিটা দিলেই সে আমার বাড়ীর দরজা খুলে দেবে।

“কাল সকালে আমার ওখানে মহাল ভোজন কর’—সেই সময়ে ঐ পিথরে কথা-বার্তা হবে।

“তাঁর এই সান্নাভ কাজটি অব্যাহত করব—অস্বীকার করলুম। তা ছাড়া এই উপলক্ষে আমার বেড়ানও হবে। তাঁর জমিদারী কর। হতে আর দশ মাইল; খোড়ার চড়ে গেলে এক ঘণ্টার পৌছন যায়।

“তার পরদিন, দশটার সময় তাঁর ওখানে গেলাম। সুখোমুখী হয়ে আমায় ভোজনে বসলেন। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে বিশটি কথাও বেরল না। তিনি এই জন্ত আমার কাছে মাপ চাইলেন। তিনি বলেন, যে ঘরটির ভিতর তাঁর সমস্ত সুখশান্তি নিহিত, সেই ঘরে আমি যাচ্ছি—এই চিন্তাটি বাতাই তাঁর

চিত্তকে বিপর্যাস্ত করে তুলেছে। আমার মনে হ'ল, তাঁর মনে কি একটা যুগ্মগুণি চলে—তাতেই তাঁর চিত্ত বিলিত হয়ে পড়েছে,—তাতেই যেন তাঁর সমস্ত মন ব্যাপ্ত হতে আছে।

“যখনে তিনি আমাকে ঠিক বুঝিয়ে দিলেন, দেখানেন কি প্রণালীতে কাজ করতে হবে। সে পূর্ব লোভা ব্যাপার। যে দেহাঙ্কের চানি আমি পেয়েছি, সেই দেহাজ খেকে, একটা পুনিষা ও এক তাড়া দলিলপত্র বের করে’ নিতে হবে। তারপর তিনি আরও এই কথা বলেন—

—“কিন্তু তাঁর উপর তুমি নজর দেবে না, এ কথা তোমাকে অঙ্গুরোধ করাই বাছল্য।

“এই কথাই আমি একটু গাখিত হলেম, এবং একটু তীব্রভাবে উত্তর দিলেম। তিনি আম্তা-আম্তা করতে লাগলেন।

—“আমাকে হার্মিনা করতে, আমি তরনিক হরণা পাছি।

“এই কথা বলে তিনি কাঁপতে লাগলেন।

“তাঁর এই কানটা করবার অজ্ঞ, প্রায় একটার সময় আমি তাঁর ওপান থেকে ছাড়লেন।

“দিনটি বেশ উজ্জল। পেরোর ডাক শুনে শুনে মাঠের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেম। আমার ভলোয়ার খানাও দুটোজতার ঠেকে তালে-তালে শব্দ করতে লাগল।

“তারপর অরণোর মধ্যে প্রবেশ করে, ঘোড়াকে কদম-চালে চালিতে লাগলেন। কৃকের শাখাপন্ন আমার দুখচুখন করতে

লাগল। কখন-কখন একটা পাতা পাত দিয়ে ধরে’ আশ্রয়ের লহিত আমি চিবতে লাগলেন; কেন তা জানিনে—তখন আমার মনে কি একটা তুমুল আনন্দের তাণ, কেমন একটা ক্ষুধা, কেমন একটা বলের মত্ততা এসেছিল।

“সেই পল্লী-প্রাঙ্গণের কাছাকাছি এসে, ঘণ্ডীর নামে আমার কাছে যে চিঠিটা ছিল সেই চিঠিটা বের করবার অজ্ঞ পকেট হাতড়াতে লাগলেন। চিঠিটা বের করে দেখলেন, চিঠিটা গালা দিচ্ছে আটা। আমি এই দেখে এমন আশ্চর্য ও বিরক্ত হলেম যে, ইচ্ছে হচ্ছিল ফিরে চলে যাওয়া। কিন্তু তারপর তাৎপণ্য, সেটা তাল চলে না; এতে আমার ক্রুদ্ধতা প্রকাশ পাবে। আমার পণ্ডির মন যে রকম বিবুদ্ধ হয়েছিল, তাতে হরত তিনি ক্রমে চিঠিটা গালা দিচ্ছে এঁটে কেলেছেন।

“মনে হল পল্লী-ভবনটি ২০ বছর কাল ‘পোড়ো’ অবস্থায় রয়েছে। বেড়ার কাঠ-ডগো খুলে গেছে,—পড়ে গেছে। কেমন করে খাড়া আছে কে জানে। তঁড়ি পথচলা কৃগাঙ্কর বাস-জমির দীমা-চিহ্ন আর ঠাণ্ডর হয় না।

“একটা খড়খড়ির উপর পদাঘাত করায়, সেই পদে একটু বুক, পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল, আর আমাকে দেখে যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। ঘোড়া থেকে আমি মাটিতে লাকিয়ে পড়লেন, তারপর সেই চিঠিটা তার হাতে দিলেন। সে, চিঠিটা পড়লে, কেম আর একবার পড়লে, চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। আমাকে

আড়চোখে দেখে নিলে, তারপর, চিঠিটা
পকেটে ভেঁজে আমাকে বলল :—

“ভাল, আপনি কি চান ?

“আমি ককতাবে উত্তর করলেম ;—

“আমি কি চাই তোমার তা জানা
উচিত, কেন না, ঐ চিঠির মধ্যেই তোমার
মনের হুকুম আছে। আমি এই বাড়ীতে
চুকতে চাই।

“সে যেন বিশ্বাসে অতিভূত হবে পড়ল।
সে উত্তর করলে :—

“তাহলে, আপনি ঠাহরাণীর...কামরার
ভিতর...যেতে চান্ধেন ?

“আমার বৈধব্যচ্যুতি হবার উপক্রম হল।

“কি আপন! আমাকে ক্রমাস্ত
এই একম স্তর করবার তোমার
উদ্দেশ্যটা কি ?

“সে আশ্চর্য-আশ্চর্য করতে লাগল।

“না, না...মশাই...কিন্তু বরটা,...
বরটা, তার মৃত্যুর পর থেকে...আর খোলা...
হয়নি। পাঁচ মিনিট বহি অপেক্ষা করেন,
আমি একবার বেধে আসি বরটা.....

“আনি রেগে তার কথার বাধা
বলল :—

“বটে, আমাকে তুমি এখানে আটকে
রাখতে চাও ? তুমি ত সে ঘরে চুকতে
পারবে না—এই বেধ, সে ঘরের চাবি
আমার কাছে।

“তখন সে আর কি বলবে,—সে বলল :—

—আচ্ছা, তাহলে মশার আপনাকে
পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

“আমাকে কেবল শিঁড়িটা দেখিয়ে
দেও, আমি একলা যাব। তুমি সঙ্গে

না এলেও, আমি পথ চিনে যেতে পারব।

“কিন্তু.....মশার.....তবু.....

“এইবার আমার ভরানক রাগ হল।

“এখন তুমি চুপ করে পাক, চুপ
করবে কিনা ? না হলে, তোমার পক্ষে ভাল
হবে না বলি।

“আমি ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেম,
তারপর বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেম।

“প্রথমে রান্নাবরটা পার হলেম, তারপর,
যে ঘটি ছোট কামরার এই লোকটা সস্ত্রীক
বাস করত, সেই ঘরটা কামরা পার হ’লেম।
তারপর একটা বৃহৎ প্রবেশ দালান পার হতে,
শিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেম। তারপর,
আমার বন্ধু যে দরজাটা নির্দেশ করেছিলেন,
সেই দরজাটা দেখতে পেলেম।

“দরজাটা অক্রেপে খুলে ভিতরে প্রবেশ
করলেম।

“ঘরটা এতদূর অন্ধকারে যে, প্রথমে
কিছুই ঠাণ্ডা করতে পারলেম না। আমি
সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়লেম। বহুক্ষণেতে কেমন
একটা ভাপলা গন্ধ—পরিভ্যক্ত ‘পোড়ো’ ঘরের
মত। ক্রমে ক্রমে আমার চোখের দৃষ্টি
অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে এল, তখন পরিষ্কার
দেখতে পেলেম, একটা বড় ঘর ; মিনিসপত্র
এলোবেলো হয়ে আছে। ঘরের উপর
ছাদের নীচে, কিন্তু গম্বুজ বালিসঙলা আছে ;
সেই বালিসঙলা এক ঘরখানা কুপ্তের চাপে
কিংবা মাপার চাপে যেন একটু দমে
গেছে—মনে হয় যেন কেউ এইমাত্র
স্বরেছিল।

“কেদারীঙলা অগোছালতাবে ইতস্তত
পড়ে আছে। আরও লক্ষ্য করলেম, একটা

দয়ালু,—গোধ হর একটা আলমারীও দয়ালু—
অর্জেক খোলা।

“ঘরটার আলো আনবার ভক্ত, জানলার
কাছে গিয়ে জানুশাটা খুলে দিলাম; কিন্তু
খড়খড়িও লোহালকড় এমন মর্মে ধরেছিল
সে, খড়খড়িও খোলা গেল না।

“আমার তলোয়ারের দ্বারে দেওল
ভাঙায় চেষ্টা করলেম কিন্তু পারলেম না।
এই বার্থ চেষ্টার বিরক্ত হয়ে, যেটুকু আলো
আছে সেই আলোর উপরেই নির্ভর করে,
সেই ডেক্‌নেটার কাছ দিয়ে গেলেম।

“একটা আত্ম-কেদারার বলে, আমার
বন্ধ যে দেয়াড়টার কথা বলেছিলেন, সেই
দেয়াড়টা খুলে। দেয়াড়টা জিনিসপত্রে
একবারে ভরা ছিল। আমার কেবল তিনটে
পুলিয়ার বরকার, আমি সেই পুলিয়ার
বুজতে লাগলেম। আমি দহরুর পারি
চোখ টেনে-টেনে গত্রের শিরোনামাগুল
পড়বার চেষ্টা করিলাম—এমন সময়, আমার
শিঙনে একটা অশুশ শব্দ শুনে পেলেম—
বরং বলা উচিত—অসুস্থ করলেম। আমি
ডাঙে বড় একটা ক্রম্প করলেম না;
আমার মনে হল, বাঙালে হরত কোন
কাপড় নড়ে উঠেছে। কিন্তু মিনিট খানেক
পরে, পূর্ব অশটে আবার একটা চলাফেরার
শব্দ হল। এইবার আমার গা কাঁটা দিয়ে
উঠল। এইরকম অল্পেতেই তার পাওরা
নিভাত মুঢ়তা মনে করে লক্ষ্য পিছন দিকে
আর কিংবা তাকালেম না। যে কাপড়ের
তাড়াটা আমার বরকার, সেইটে তখন
খুঁজতে লাগলেম। তৃতীয় তাড়াটা খুঁজে
পেয়েছি ঠিক সেই সময় আমার কাঁধের উপর

কে যেন কঠে নিখাল ফেলতে মনে হল—
‘অমনি আমি এক লাফে উঠে দেখান থেকে
দল হাত পুরে সরে দাঁড়ালেম। তারপর,
তলোয়ারের হাতলে হাত রেখে পিছন দিগে
দেখলেম—‘যদি তলোয়ারটা না থাকত তাহলে
গোধর জীবর মত দোড়ে গালাতের।
দেখলেম :—সাদা কাপড়-পর। একটি
দীঘাক্রি ত্রীলোক, একটু আগে যাতে
বলেছিলেন সেই আরাণ-কেদারার পিছনে
দাঁড়িয়ে আমার পানে তাকিয়ে আছে।

“আমার সর্বশরীর পরশর করে’ কাপড়ে
লাগল—মাটিতে স্থিতি করে পড়ে যাই
আর কি। সে কি রকম মুঢ় ধরনের ভীষণ
ভয় তা যে না অসুস্থ করেছি সে কখনই
বুঝতে পারবে না। অস্ত্রাস্রাটা যেন গলে’
যেতে লাগল। আমার হৃদয়কে যেন আর
আমি অসুস্থ করতে পারছিলাম না।
সমস্ত শরীরটা যেন স্পন্দনের বত তুলতে
মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমার
সমস্ত ভিতরটা ধরে পড়তে।

“আমি ছায়াবৃত্তিতে বিশ্বাস করিনে।
কিন্তু মুঠ ব্যক্তিরের ভয়ে আমি প্রায় সূর্যোপর
হয়েছিলাম। ওঃ! কিছুক্ষণ আমি যে
বয়সা পেয়েছিলাম, সেইরকম বাক্য বয়সা
জীবনে কখন ভোগ করিনি—সে একটা
অলৌকিক ভয় থেকে অনিবার্য বিকট
বয়সা।

“যদি সেই ত্রীলোকটি না কথা কইত, আমি
ভয়েই মাগা যেতেম! কিন্তু সে কথা কইলে।
এমন মধুর ও হৃৎকের বরে কথা হইতে
লাগল যে, আমার সর্বস্ব কণ্টকিত হয়ে
উঠল। আমি যেন আত্মহারা ও হতভুদ্ধি

হয়ে পড়লেন। কিন্তু আমার মধ্যে যে একটা অজ্ঞানের ছিল—ঐশ্বর্যের অজ্ঞানের ছিল, তা—পেকেট আমি কোনকালে আমার মূখে ভাঙে তাব আনন্দে দিইনি। সে রমণীই চোক বা ভাষামূর্তি হোক, আমি কিরতাবে ছিলেম। কিন্তু এল কণা আমি কিছুকাল পরে জানতে পেয়েছিলাম, কিন্তু এখন ছায়া-দৃষ্টি। দেখি ঠিক দেই মুহূর্ত আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। আমি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলাম।

“রমণী বলে :—

“—মরণ্য, আপনি ইচ্ছা করলে আমার একটা পুত্র উপকার করতে পারেন।

“আমি উত্তর দেব মনে করলেম, কিন্তু একটা বর্ণও উচ্চারণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ’ল। কেবল এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ আমার কণ্ঠ হ’তে নিঃসৃত হ’ল।

“রমণী আমার বলতে লাগল :—

“উপকারটা করবেন কি? আপনি—

আমাকে রক্ষা করতে পারেন, আমাকে আরোগ্য করতে পারেন। আমি ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছি; ওঃ! কি যন্ত্রণা! কি যন্ত্রণা!

“রমণী আমার সেই আবেদন কেদারায় আশ্রয় আশ্রয় বলে পড়ল। বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

“—উপকারটা করবেন কি?

“আমি নাকী সরে উত্তর করলেম—হঁ। তখনও আমার কণ্ঠের আড়ট হয়ে ছিল।

“রমণী তখন একটা বিহ্বলের চিকণী আমার দিকে এগিয়ে ধরে জগজগতের বলতে লাগল :—

“—চিকণীটা দিয়ে আমার মাথা ঝাঁড়ে

দিন। ওঃ—নীচ মাথা ঝাঁড়ে দিন। তা হলেই আমি সেত্রে উঠব।

আমার মাথার দিকে তাকিয়ে দেখুন ...আমার কি কষ্ট হচ্ছে; আমি এই চুলের দ্বারা কি যন্ত্রণাই পাচ্ছি!

“আমার মনে হল, রমণীর ঘন কৃষ্ণ জামুগারিত স্তন্যবীৰ্য কেশজঙ্ঘ আরাম কেদারার পিঠেব উপর দিয়ে খুলে পড়ে একেবারে মাটি ছুঁয়েছে।

“কেন আমি এ কাজ করলেম? কাপড়ে কাপড়ে কেন আমি চিকণীটা ধরলেম, কেন আমি রমণীর বীৰ্য কেশজঙ্ঘ হাতে নিলেম? কত যন্ত্রণা লাগতে হাতে করে ধবলে যে রক্ত বোঝে হয় সেই রক্ত হাতে তরানক ঠাণ্ডা ঠেঙতে লাগল। কেন আমি এ কাজ করলেম, কিছুই জানি না।

“সেই অহতুটিটা যেন আমার জামুগে এখনও রয়ে গেছে, তা তাবলে এখনও আমার জ্বলন্ত হয়।

“আমি চিকণী দিয়ে তার চুল ঝাঁড়ে দিতে লাগলেম। কেমন করে যে সেই নীতল কেশজঙ্ঘ বাগিরে ধরলেম এমন তা বুঝতে পারছি নে। একবার চুলটাকে পাকিয়ে নিলেম, একবার গ্রহি ধিলেম, আবার গ্রহিটা খুলে ফেলেম। ঘোড়ার বালামকীতে বৈদ্যন বিহ্বল করে সেই রক্ত বিহ্বলী করে দিলেম। রমণী বীৰ্যনিখাল ফেলতে লাগল, মাথাটা হেট করে রইল, মনে হল, যেন একই আরাম পাচ্ছে।

“তারপর, সে চঠাৎ আমাকে বলে, “যজ্ঞবাদ।” আর এই কথা বলেই চিকণীটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে,—যে

দরজাটা পূর্বে অর্ধেক খোলা দেখেছিলেন,
সেই দরজা দিয়ে পানিয়ে গেল।

“আমি এখন একাকী।” জীর্ণ চঃবঃের
পর ভেগে উঠলে যে রকমটা হয়, কিছুক্ষণ
ধরে সেই রকম ভরে আমি আত্মহারা হয়ে
গিয়েছিলেন। তারপর বখন জ্ঞান হল,
আমি দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে খুব
একটা ধাক্কা দিয়ে খড়খড়িগুল ভেঙ্গে
ফেললাম।

“একটা আলোক-তরঙ্গ ঘরের ভিতর
এসে পড়ল। যে দরজাটা দিয়ে রমনী
পানিয়েছিল, আমি সবেগে সেই দরজার
কাছে এগেলাম। দেখলাম, দরজাটা বন্ধ,
একটুও নড়ান যায় না।

“তখন পলাবার ক্ষমতা যেন আমি উন্মত্ত
হয়ে উঠেলাম—আমার একটা আতঙ্ক উপ-
স্থিত হল, মুহুর্ত সময় বৈরাগ্য গৈরিকালের
মধ্যে হঠাৎ আতঙ্ক উপস্থিত হয়—সেই
ধরনের আতঙ্ক। খোলা ডেক্সের উপর
যে তিনটে চিঠিপত্রের পুঁজি ছিল, খপ-
করে সেই গুল হাতে নিলেম,—নিরেই
এক দৌড়ে ঘরটা পার হলেম, চার চার খাপ
টপ্কে দাঁড়ি দিয়ে নামতে লাগেলাম। এই
রকম করে কোন প্রকারে বাড়ীটা থেকে
বেরিয়ে পড়লাম। দশ পা দূরে আমার
ঘোড়াটাকে দেখতে পেয়ে, এক লাফে তার
উপর চড়ে বসে, নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেম।

“একেবারে রহস্য নিয়ে আমার বাসার
সম্মুখে এসে থামেলাম। আমার আঙ্গুলির
হাতে ঘোড়ার ঝালটা দিয়ে, তাকাতাড়ি
আমার কামরার পেলেম—সেখানে গিয়ে সমস্ত
বাগানটা ভাঙতে বসেলাম।

“আমার শুধু একটা দৃষ্টি-বিভিন্ন কি না এই
নিরে এক খণ্ডি কাগজ আমার মনে তোলপাড়
হতে লাগল। হঠাৎ আমার সেই রকম
একটা ঘাবড়ার জ্বলন্ত হয়েছিল, যা
থেকে নানাপ্রকার অসংখ্য অলৌকিক দৃশ্য
দেখা যায়।

আমি বখন জানলার কাছে গেলেম,
আমার দ্বিধা বিখাপ হয়ে আত্মহীন গুটা
আমার দৃষ্টি-বিস্তারিত হতে, ইচ্ছার বিস্তারিত
হতে। কিন্তু হঠাৎ আমার বুকের উপর
মন্ত্র পড়ল। দেখেলাম আমার কোঠাটা
জীলোকের চুলে ভরা—চুলগুল বোদামে
জড়িয়ে গেছে!

“একএকটা চুল তুলে বাহিরে ফেলে
দিতে লাগেলাম, আর আমাব আত্মশূলভগ
কাপতে লাগল।

“তারপর আমার আঙ্গুলিক ডাকলেম।
তবে আতঙ্কে আমার মন এতটা বিচ্ছিন্ন
হয়েছিল যে মেনিদি আমি আর বন্ধুর ওখানে
যেতে পারলেম না। তারপর, তাঁকে
কিছু বলা বাক্যে, দ্বিধা হয়ে ভাবতে
লাগেলাম।

“আমি একজন মৈনিককে দিয়ে চিঠিপত্র-
গুলি বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে নিলেম। তিনি
তার হাতে একটা মসিহা দিলেন। তিনি
মৈনিকের কাছ থেকে আমার অনেক
খবর নিয়েছিলেন।

সে তাঁকে বলেছিল, আমি বড়ই কঠিন
পাতি, আমার রোজ গণে সর্দিগাণি হয়েছিল,
আরও কত কি। এই কথা তনে তিনি
উত্তর দিয়েছিলেন।

“তারপরদিন, খুব ভোরে আমি তাঁর

ওখানে গেলেম, মনে করেছিলাম যেমনটি
ঘটেছিল তিক্ তাকে বলব। কিন্তু পূর্ণ
রাত্রে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন,
আর বাড়ী কেহেন নি।

“এনি সেই দিনই কিরে এলেম—তার
সঙ্গে দেখা হল না। এক সপ্তাহে অপেক্ষা
করলেম। তখনও বাড়ী কেহেন নি। আমি
পুলিসে খবর নিলেম। চারিদিকে তাঁর খোঁজ
হল; কোন লপে পেহেন, কোথায় আছেন
তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

“সেই ‘পোড়ো’ অটোপিতার তরতর করে

খোজ করা হল। সন্দেশ কমবার মত’ কিছুই
পাওয়া গেল না।

“এমন কোন নিবর্ণন পাওয়া গেল না
যাতে মনে হতে পারে, ওখানে কোন রমণী
সুকিয়ে আছে।

“খানাহারামিতে কোন ফল হল না—
তাবপন্ন আর কোন অত্মদান হলনি।

“এই ছাপার বৎসর আমি আর কোন
খবর পাই নি। আর কিছুই জানি
নে।”

ঐজ্যোতিষিরজনাপ ঠাছুর।

সংসারের সার।

(ডাউনিং হাউসে)

লাবা দবয়ের বস্ত্র হুগমা-সৌবত,

সজ্জিত সে পাকৈ,

বম্বরের এক মধু-চাকৈ !

সমস্ত খনির মোহ, বৈভব-গৌরব

সুসজ্জিত আছে

এক খানি হীরকের মাঝে !

সিদ্ধ-বাণী ছায়া-নীল আলোর ঝগক

বিস্তারিছে অপে,

কৃত্র এক মল্লতার বৃকে !

শ্রবণা, দৌরভ, ছায়া আলোর পূর্ণক

মোহ ও বৈভব,

হুগনাথ তুচ্ছ এই সব ;—

নিষ্ঠা সে মুক্তার চেয়ে খাটি সমধিক,

নিষ্ঠুর সরল

হীরকের অধিক উজ্জল ;

মিলিরাছে গুঢ়তম নিষ্ঠুর নিষ্ঠীক

শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা সনে

তরুণীর প্রথম চুম্বনে।

ঈশ:ভোজনাপ দত্ত।

মুক্তা ও শুক্লি।

মুক্তা বলে “দেখ শুক্লি আমারি কারণে

তোমারি পৌরব বাড়েন নবের সপনে।”

শুক্লি বলে “হায় বহু! তুখা অভিমান,

তোমারি কারণে মোর নষ্ট হয় প্রাণ।”

ঐক্যশচন্দ্র বহু।

রাসমণির ছেলে।

(১)

কানৌপরের মা ছিলেন রাসমণি—কিন্তু তাঁহাকে দায়ে পড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে সুবিধা হয় না। তাঁহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়া থাকেন তাহা বৃষ্টিতে হইলে পূর্ণ-ইতিহাস জানা চাই।

সাপায়গানো এই—শানিগাড়ির বিখ্যাত বনিমাদী ধনীর বংশে ভবানীচরণের জন্ম। ভবানীচরণের পিতা অভয়াচরণের প্রথম পক্ষের পুত্র ভ্রাতাচরণ। অদিক বয়সে জী বিয়েগের পর দ্বিতীয়বার স্বধন অভয়াচরণ বিবাহ করেন তখন তাঁহার স্বতন্ত্র আলাদা তালুকটি বিশেষ করিয়া তাঁহার কস্তার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। আমাত্যার বয়স হিগণ করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কস্তার বৈদগ্ধ্য যদি ঘটে তবে খাওয়া পরার লজ্জা যেন সপত্নীপুত্রের অধীন তাঁহাকে না হইতে হয়।

তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম অংশ কলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার বৌদ্বিহ ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার কস্তা নিজের বিশেষ সম্পত্তিটির অধিকার লাভ করিলেন ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনিও

পরলোকবাঈর সময় কস্তার ইচ্ছাকে লক্ষ্যে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

ভ্রাতাচরণ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত। এমন কি, তাঁহার বড় ছেলেটি তখনই ভবানীর চেয়ে এক বছরের বড়। ভ্রাতাচরণ নিজের ছেলেদের সঙ্গে একত্রেই ভবানীকে মাহুণ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের স্বামীর সম্পত্তি হইতে কখনো তিনি এক পরমা নিজে লন নাই এবং বৎসরে বৎসরে তাহার পরিষ্কার হিলাবটি তিনি বিমাতার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধুত্বের স্মৃৎ হইয়াছে।

স্বতন্ত্র প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল এতটা সাধুতা অসম্ভব, এমন কি ইহা নিবৃদ্ধিতারই নামান্তর। অথচ শৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ দ্বিতীয় পক্ষের জীস হাতে পড়ে ইহা আশ্চর্য লোকের কাহায়ে তাল লাগে নাই। যদি ভ্রাতাচরণ ছল করিয়া এই হলিলটি কোনো কোশলে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিবেদীরা তাঁহার পৌকনের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপায়ে তাহা স্বেচ্ছাক্রমে দানিত হইতে পারে তাহার পরামর্শদাতা প্রবীন ব্যক্তিগণও অভাব ছিল না। কিন্তু ভ্রাতাচরণ তাঁহাদের তির্যকানীন পারিবারিক স্ববকে অঙ্গহীন করিয়াও তাঁহার বিমাতার সম্পত্তিটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং স্বভাববিশিষ্ট দেবশীলতা-বশত বিমাতা ব্রহ্মস্বামী ভ্রাতাচরণকে আপনায়

পুত্রের মতই বেহ এবং বিবাহ করিতেন। এবং তাঁহার সম্পত্তিকে ভ্রাতাচরণ অত্যন্ত পৃথক্ করিয়া দেখিতেন বলিয়া তিনি অনেকবার তাহাকে ভৎসনা করিয়াছেন ;— বলিয়াছেন, বাবা, এ ত সমস্তই তোমাদের ; এ সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমি ত বর্গে যাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে ; আমার এত হিসাবপত্র দেখিবার সময়কার কি।—ভ্রাতাচরণ সে কথা কর্পণাত করিতেন না।

ভ্রাতাচরণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু ভবানীচরণের পরে তাঁহার কোনো শাসনই ছিল না। ইহা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিত নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবানীর প্রতিই তাঁহার বেশি বেহ। এমনি করিয়া ভবানীর পড়ুভনা কিছুই হইল না। এবং বিষয়বুদ্ধি লব্ধে ত্রিদিব নিত্যর মত থাকিয়া পাদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি বয়স কাটাইতে লাগিলেন। বিষয়কর্মে তাঁহাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হইত না—কেবল মাকে মাকে এক একদিন সই করিতে হইত। কেন সই করিতেছেন তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না, কারণ, চেষ্টা করিলে ঝটকর্থা হইতে পারিতেন না।

এদিকে ভ্রাতাচরণের বড় ছেলে ভ্রাতাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীরূপে থাকিয়া কবে কবে পাকা হইয়া উঠিল। ভ্রাতাচরণের মৃত্যু হইলে পর ভ্রাতাপদ ভবানীচরণকে কহিল, পুড়ামহাশয়, আমাদের আর একজ পাকা চলিবে না। কি জানি কোনোদিন সামান্য কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে তখন সংসার ছাঁখায়া হইয়া যাইবে।

পৃথক্ হইয়া কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে এ কথা ভবানী শ্রমেও কখন করেন নাই। যে সংসারের শিতকাল হইতে তিনি মানুষ হইয়াছেন সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ লব্ধ বলিয়াই জানিতেন—তাঁহার যে কোনো একটা জাগরণ জোড় আছে, এবং সেই জোড়ের মুখে তাহাকে ছইখানা করা যায় সহসা সে সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের মনোবেদনার ভ্রাতাপদকে যখন কিছুদূর বিচলিত করিতে পারিল না তখন কেমন করিয়া বিষয় বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধ্য চিন্তায় ভবানীকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ভ্রাতাপদ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল, খুড়ামহাশয় কত কি ! আপনি এত ভাবিতেছেন কেন ? বিষয় ভাগ ত হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাচিয়া থাকিতেই ত ভাগ করিয়া দিয়া গেছেন।

ভবানী হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন—সত্য না কি ! আমি ত তাঁহার কিছুই জানি না। ভ্রাতাপদ কহিলেন, নিশ্চয় ! জানেন না ত কি ? বেশমুখ লোক জানে পাছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজন্য আগলি তালুক আপনাদের মধ্যে লিখিয়া দিয়া ঠাকুরদাদা প্রেরণ হইতেই আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন—সেই ভাবেই ত এ পৃথক্ চলিয়া আসিতেছে।

ভবানীচরণ তাহিলেন, সকলই সত্য। লিখিয়া করিলেন, এই বাড়ি ?

ভার্যাপদ করিলেন, ইচ্ছা করেন ত বাড়ি আপনাই রাখিতে পারেন। সদর মহকুমার যে কুঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনোরকম করিবার চলিবারাইবে।

ভার্যাপদ এত অনায়াসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তুত হইল বোধিরা তাহার ঔষাধে তিনি বিম্বিত হইয়া গেলেন। তাহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনোরকম দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাহার কিছু মাত্র সম্বন্ধ ছিল না।

তবানী বধন তাহার মাতা ব্রজহুন্দরীকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন—তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন ওমা, সে কি কথা! আলমি তালুক ত আমার খোরপোষের জন্য আমি জীৱনব্যয়পে পাইয়াছিলাম—তাহার আরও ত তুমি বেশি নব। পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাইবে না কেন?

তবানী কহিলেন, ভার্যাপদ বলে পিতা আমাদিগকে ঐ তালুক ছাড়া আর কিছু দেন নাই।

ব্রজহুন্দরী কহিলেন, সে কথা বলিলে আমি ভাবিবে কেন? কর্তা নিজের হাতে তাহার উইল ছই এই লিখিয়াছিলেন—তাহার এক গ্রন্থ আমার কাছে রাখিয়াছেন; সে আমার দিক্কেই আছে।

দিক্কে খোলা হইল। সেখানে আলমি তালুকের দানপত্র আছে কিন্তু উইল নাই। উইল ছুরি গিয়াছে।

পরামর্শদাতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাহাদের গুরুষ্ঠাকরের ছেলে। নাম বগলাচরণ। সবলেই বলে তাহার ভারি পাকা

বুদ্ধি। তাহার বাপ এাসের মন্ত্রদাতা, আর ছেলেটি মন্ত্রদাতা। পিতা পুত্রে এাসের পরকাল ইচ্ছাকাল ভাগ্যভাগি করিবার লটরাছে। অস্ত্রের পক্ষে তাহার কলাফল যেমনই হউক তাহাদের নিজেদের পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, উইল নাই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে দুই ভাইয়ের ত সমান অংশ থাকিবেই।

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল বাহির হইল। তাহাতে তবানীচরণের অংশে কিছুই লেখে না। সমস্ত সম্পত্তি পৌত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তখন অন্তঃসারণের পুত্র অংশে নাই।

বগলাচরণ কাণ্ডারী করিয়া তবানী মকদ্দমার মহাদপুত্রে পাড়ি দিলেন। বন্দরে আসিয়া লোহার দিক্কেট বধন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে পাইলেন,

লক্ষী পেঁচার বাগাটি একেবারে শূন্য—সামান্য ছোটো একটা সোনার পাগল খসিয়া পড়িয়া আছে। পৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গেল। আর আলমি তালুকের যে ডগাইছ মকদ্দমা বরচাঁর বিনামতল হইতে জাগিয়া রছিল কেনোহতে তাহাকে আশ্রয় করিবার থাকা চলে মাত্র কিন্তু বংশবধাৱা রক্ষা করা চলে না। পুরাতন বাড়িটা তবানীচরণ পাইয়া যেন করিলেন তারি দিতরাছি। ভার্যাপদের বৎসবের চলিয়া গেল। উভয়পক্ষের মধ্যে আর দেখাশোনা রহিল না।

(২)

ভ্রামচরণের বিখ্যাস্যাতকতা ব্রজহুন্দরীকে শেলের মত বাজিল। ভ্রামচরণ অন্তঃসারণ

করিয়া কর্তার উইল চুরি করিয়া তাইকে বকিত করিল এবং পিতার বিধানভঙ্গ করিল ইহা তিনি কোনোমতেই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি বহুদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রতিদিনই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাম বাম করিয়া বলিতেন ঘণ্টে ইহা কখনই সহিবে না। ভবানীচরণকে আরোই প্রতিদিন তিনি এই বলিতা আশ্বাস দিরাছেন যে, আমি আইন আদালত কিছুই বুঝি না, আমি তোমাকে বলিতেছি, কর্তার সে উইল কখনই ত্রিশদিন চাপা থাকিবে না। সে কুহি নিশ্চয়ই কিরিয়া পাইবে।

বয়সের মাতার কাছে এই কথা শুনিয়া ভবানীচরণ মনে অত্যন্ত একটা ভয়সা পাইলেন। তিনি বিজে অক্ষম বলিয়া এইরূপ আশ্বাস-বাক্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সাহসার জিনিষ। সতী সাধুর বাক্য ফলিবেই, বাহা তাঁহারই তাহা আপনিই তাঁহার কাছে কিরিয়া আসিবে এ কথা তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাস তাঁহার আরো দৃঢ় হইয়া উঠিল—কারণ মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার পুণ্যভোগ তাঁহার কাছে আরো অনেক বড় করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্র্যের সমস্ত অভাবপীড়ন যেন তাঁহার গায়েই বাজিত না। মনে হইত, এই যে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, এই যে পূর্ণেকার চাপচলনের ব্যতায়, এ যেন দুদিনের একটা অভিন্নর মাজ—এ কিছুই সত্য নহে। এইজন্য সাবেক ঢাকাই ধুতি ছিঁড়িয়া গেলে যখন কম দামের মোটা ধুতি তাঁহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তখন তাঁহার হাসি পাইল। পুকার সময় সাবেককালের ধুমধাম চলিল না,

নমোনম করিয়া কাল সারিতে হইল; অত্যাগন্তজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন, তিনি ভাবিলেন ইহারা জানে না এ সমস্তই কেবল কিছুদিনের জঙ্ক—তাঁহার পর এমন ধুম করিয়া একদিন পূজা হইবে যে ইহাদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। সেই ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমারোহ তিনি এমনি প্রত্যাশের মত দেখিতে পাইতেন যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক তাঁহার চোখেই পড়িত না।

এ সম্বন্ধে তাঁহার আশোচনা করিবার প্রথম মানুষটি ছিল নোটো চাকর। কত বার পুণোৎসবের দারিদ্র্যের মাঝখানে বসিয়া প্রভু কৃতো, ভাবী দুদিনে কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহারই বিচারিত আশোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন কি, কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, না হইবে, এবং কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আনিবার আয়োজন আছে কি না তাহা লইয়া উভয় পক্ষে যোমতর মতান্তর ও গুরুবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। বস্তাবগিন্ধ অনৌদার্যবশত নটবিহারী সেই তারীকালের কর্দম মনোহর কৃপণতা প্রকাশ করার ভবানীচরণের নিকট হইতে তীক্ষ্ণ ভৎসনা লাভ করিয়াছে একদা ঘটনা প্রায়ই ঘটিল।

মোটের উপরে বিবরণসম্পত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনো প্রকার দ্বন্দ্বিতা ছিল না। কেবল তাঁহার একটমাত্র উদ্বেগের কারণ ছিল, যে তাঁহার দিবস ভোগ করিবে। আসন্ন পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তান হইল না। কস্তাদারগণ হিটবরীয়া যখন

তঁাকে আর একটি বিবাহ করিতে অস্বপ্নে
করিত তখন তঁহার মন এক একবার
চঞ্চল হইত;—তাঁহার কারণ এ নয় যে
নববধূ লক্ষ্যে তঁহার বিশেষ লক্ষ ছিল—
বরক্কে দেখক ও অরের জ্বর গ্রীকণ্ডে পুণ্ড্রন
ভাবিত তিনি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করিতেন
—কিন্তু বাহার ঐশ্বর্যমস্তাবনা আছে
তাঁহার সম্বন্ধমস্তাবনা না বাক্য নিম্ন
বিভবনা বলিয়াই তিনি জানিতেন ।

এমন সময় যখন তঁহার পুত্র অশ্লিল
তখন সকলেই বলিল, এইবার এই বরের
ভাগ্য কিরিত তাঁহার স্থলপাত হইয়াছে ।
স্বয়ং স্বর্গীয় কর্তা অভ্যন্তরণ আবার এ ঘরে
অস্বপ্নাছেন, ঠিক সেই সকলেরই টানা
চোপ । ছেলের কোটিভিত্ত বোঝা গেল,
এই নক্ষত্রের এমন ভাবে যোগাযোগ
ঘটিয়াছে যে ক্ষতসম্পত্তি উদ্ধার না হইয়া
যায় না ।

ছেলে হওয়ার পর হইতে ভবানীচরণের
বাবুদারের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল ।
এতদিন পর্য্যন্ত দারিত্র্যকে তিনি নিতান্তই
একটা খেলার মত সকলোকে অতি
অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন কিন্তু ছেলের
সম্বন্ধে লে ভাবটি তিনি বন্ধ করিতে
পারিলেন না । দারিত্র্যের বিখ্যাত
চৌধুরীদের ঘরে নির্বাপিত কুলশ্রমীপকে
উদ্ধার করিবার জন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের
আকাশবাণী আহুতুল্যের ফলে যে শিশু
দমাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে তাঁহার প্রতি ত
একটা কর্তব্য আছে । আল পর্য্যন্ত দারি-
বাহিক কাল ধরিয়া এই পথিবারে পুত্রসম্বান
মাত্রই আলমকাল যে সময়ের লাভ করিয়াছে

ভবানীচরণের কোঠা পুরই প্রথম তাঁহা
হইতে বাকিত হইল এ বেদনা তিনি ক্লান্তিতে
পারিলেন না । এ বংশের চিরপ্রাণী আমি
যাহা পাটয়াছি আমার পুত্রকে তাঁহা দিতে
পারিলাম না তাঁহা যৎপ করিয়া তঁহার
মনে হইতে লাগিল আমিই ইহাকে ঠকাইলাম ।
তাই কালীপদর জন্য অর্থব্যয় যাহা করিতে
পারিলেন না ত্রুটর আলম দিয়া তাঁহা
পুত্র করিবার চেষ্টা করিলেন ।

ভবানীচরণের স্ত্রী রামমণি ছিলেন
অল্প বয়সের মাহুদ । তিনি দারিত্র্যের
চৌধুরীদের বংশগৌরব লক্ষ্যে কোনো
দিন উবেগ অস্বপ্ন করেন নাই । ভবানী
তাঁহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে
তিনি হাসিতেন—তাহিতেন, বৈদ্য সাহস
ধরিয়া বৈদ্য বংশে তঁহার স্ত্রীর জন্য
তাঁহাতে তাঁহার এ ক্রটি কমা করাই উচিত
—চৌধুরীদের মানসম্মান লক্ষ্যে ঠিক
মত দারপা করাই তঁহার পক্ষে অসম্ভব ।

রামমণি নিজেই তাঁহা স্বীকার করিতেন
—বলিতেন, আমি গরীবের ঘরে মান
সম্মানের দার দারি না, কালীপদ আবার
বাঁচিয়া থাকে সেই আমার সকলের চেয়ে
বড় ঐশ্বর্য ।—উইল আবার পাঁচরা বাইবে
এবং কালীপদর কল্যাণে এ বংশে পুত্র
সম্পদের শূত্র নবীপণে আবার বান ডাকিবে
এ সব কথাই তিনি একেবারে কানই
দিতেন না । এমন মাহুদই ছিল না
যাঁহার সঙ্গে তঁহার যাবী হারানো উইল
লইয়া আলোচনা না করিতেন । কেবল
এই সকলের চেয়ে বড় মনের কথাটি তঁহার
স্ত্রীর সঙ্গে হইত না । চই একবার তঁহার

সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কোনো বস পাইলেন না। অত্যন্ত মহিমা এবং ভাবী মহিমা এই দুইয়ের প্রতিই তাঁহার স্ত্রী মনোযোগ ব্যক্ত করিতেন না, উপস্থিত প্রয়োজনই তাঁহার সমস্ত চিন্তাকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সে প্রয়োজনও বড় অল্প ছিল না। অনেক চেষ্টার সংসার চালাইতে হইত। কেননা, লক্ষী চলিয়া গেলেও তাঁহার বোকা কিছু কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপার থাকিয়া যায়। এ পরিবারে আশ্রয় প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু আশ্রিতের দল এখনও তাঁহাদিগকে ছুটি দ্বিজে চায় না। তবামী-চরণও তেমন লোক নহেন যে, অত্যাচার করে কাহাকেও বিদায় করিয়া দিবে।

এই ভয়গ্রস্ত ভাড়া সংসারটিকে চালাইবার ভার রাসমণির উপরে। কাহাণী কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহায্যও পান না। কারণ এ সংসারে লজ্জা অবস্থার দিনে আশ্রিতেরা সকলেই আরামে ও আশ্রয়েই দিন কাটাইরাছে। চৌধুরীবাংশের মহারাজের তলে ইহাদের সুশ্রবণ্যার উপরে ছায়া আপনাই আসিয়া বিস্তীর্ণ হইরাছে এবং ইহাদের মুখের কাছে পাকফল আপনাই আসিয়া পড়িয়াছে—সেজন্য ইহাদের কাহাকেও কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই। আজ ইহাদিগকে কোনো প্রকার কাজ করিতে বলিলে ইহারা তারি অপমান বোধ করে—এবং রাজ্যবরের ধোঁয়া লাগিলেই ইহাদের মাথা ধরে, আর হাঁটা-হাঁটি করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন

পোড়া বাতের ব্যামো আসিয়া অভিজ্ঞত করিয়া তোলে যে কবিরাজের বহুশ্রম তৈলেও রোগ উপশম হইতে চায় না। তা ছাড়া তবানীচরণ বলিয়া থাকেন আশ্রয়ের পরিবর্তে যদি আশ্রিতের কাছ হইতে কাল আদায় করা হয় তবে সে ত চাকরি করাইবা লওয়া—তাহাতে আশ্রয়-দানের শুল্কই চলিয়া যায়—চৌধুরীদের ঘরে এমন নিয়মই নহে।

অতএব সমস্ত দায় রাসমণিরই উপর। দিনরাত্রি নানা কৌশলে ও নানা পরিশ্রমে এই পরিবারের সমস্ত অভাব তাঁহাকে গোপনে মিটাটরা চলিতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্রি দৈত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া টানাটানি করিয়া দরদস্তুর করিয়া চলিতে থাকিলে মানুষকে বড় কষ্টের করিয়া তুলে—তাহার কমনীয়তা চলিয়া যায়। বাহাদের জন্ত সে পথে পথে খাটিয়া মরে, তাহারাই তাহাকে সজ্জ করিতে পারে না। রাসমণি যে কেবল পাকশালার অন্ন পাক করেন তাহা নহে অন্নের সংস্থানভারও অনেকটা তাঁহার উপর—অগত সেই অন্ন সেবন করিয়া মধ্যাহ্নে বাহারা নিদ্রা ঘেন তাঁহার প্রতিদিন সেই অন্নেরও নিদ্রা করেন অন্নভারও সুখ্যাতি করেন না।

“কেবল ঘরের কাজ নহে—তাপ্তক স্তম্ভের অন্নভর বা কিছু এখনো থাকি আছে তাহার হিলাবপত্র দেখা, খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা সমস্তই রাসমণিকে করিতে হয়। তহশিল প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্বে এত কথাকবি কোনো দিন ছিল না—তবানীচরণের টাকা অভিমত্ভার ঠিক উল্টা, সে বাহির

হুইতেই জানে, প্রবেশ করিবার বিস্তৃত্তাহার জানা নাই। কোনো দিন টাকার লজ্জা কাহাকেও তাগিত করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমণি নিজের প্রাপ্য লব্ধকে কাহাকেও শিকি পরশা রেহাৎ করেন না। ইহাতে প্রজারা তাঁহাকে নিন্দা করে, গোমত্যা জলো পণ্ডিত তাঁহার সতর্কতার দ্বারা অস্থির হইয়া তাঁহার ন্যশোচিত ক্ষুদ্রাশয়তার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে ছাড়েন না। এমন কি, তাঁহার স্বামীও তাঁহার কৃপণতা ও তাঁহার কর্কশতাকে তাঁহাদের বিশ্ববিখ্যাত পরিবারের পক্ষে মানহানিকর বলিয়া কখন কখন মৃদুবেগে অগণ্ডি করিয়া থাকেন। এসময় নিন্দা ও ভৎসনা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের নিঃশেষ কাজ করিয়া চলেন, যোব সমস্তই নিজের বাড়ি লন;—তিনি গরীবের ঘরের মেয়ে, তিনি বড়মাহুবিদ্বানের কিছুই নোখেন না এই কথা বারবার স্বীকার করিয়া ঘরে বাহিরে সকল লোকের কাছে অগ্রহ হইয়া, আঁচলের আঁটটা করিয়া কোমরে জড়াইয়া, কড়ের বেগে কাজ করিতে থাকেন; কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

স্বামীকে কোনো দিন তিনি কোনো কাজে ডাকা ঘুরে থাকে—তাঁহার মনে মনে এই ভর সন্দেহ ছিল পাছে ভবানীচরণ লহল কর্তৃত্ব করিয়া কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া বলেন। তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এ সব কিছুতে তোমার থাকার প্রয়োজন নাই এই বলিয়া সকল বিষয়েই স্বামীকে নিরস্তর করিয়া রাখাই তাঁহার একটা প্রধান চেষ্টা ছিল। স্বামীও আজগুজ

দেটা হৃদয়রূপে অত্যন্ত থাকিতে সে বিষয়ে তাঁকে অধিক চুপে পারিতে হয় নাই। রাসমণির অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান হয় নাই;—এই তাঁহার অকর্তব্য লহল-প্রকৃতি পরমুখাপেক্ষী স্বামীটিকে লইয়া তাঁহার পত্নীশ্রম ও মাতৃস্নেহ দুই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বহু:প্রাপ্ত বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাজেই শান্তির সুস্থায় পর হইতে বাড়ির কৰ্তা এবং গৃহিণী উভয়েরই কাজ তাঁহাকে একলাই সম্পন্ন করিতে হইত। ওকতাক্ষরের ছেলে এবং অজ্ঞান বিশদ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার লজ্জা তিনি এমনি কঠোরভাবে চলিতেন যে, তাঁহার স্বামীর সঙ্গীরা তাঁহাকে তারি ভর করিত। প্রসন্নত: গোপন করিয়া রাখিবেন, ল্পষ্ট কথাগুলার ধারটুকু একটু লহম করিয়া দিবেন এবং পুঙ্খবদন্তীর সঙ্গে যথোচিত সত্বাচ রক্ষা করিয়া চলিবেন—সেই নানীজনোচিত স্বেযোগ তাঁহার বটল না।

এপর্যন্ত ভবানীচরণ তাঁহার বাধ্যতাবোধে চলিতেছিলেন। কিন্তু কালীপদ লব্ধে রাসমণিকে মানিরা চণা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাঁহার কারণ এই, রাসমণি ভবানীর পুত্রটিকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাঁহার স্বামীর লব্ধে তিনি ভাবিতেন, বেচারী করিবে কি, উহার দোষ কি! ও বড় মাহুদের ঘরে লগ্নিহাছে—ওর ত উপায় নাই! এই লজ্জা তাঁহার স্বামী যে কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করিবেন ইহা তিনি আশাই করিতে পারিতেন না। তাই লহল অভাবস্বেও

প্রাপণ পদ্ধতিতে তিনি স্বামীর সমস্ত অস্বাস্থ্য
 প্রত্যাহ্বন যথাসম্ভব জোগাইয়া দিতেন ।
 তাঁহার স্বপ্নে, বাহিরের লোকের সম্বন্ধে হিম্মত
 খুবই কম ছিল কিন্তু ভবানীচরণের আহ্বানে
 ব্যবহারে পারতৎকে সাবধে নিয়মের কিছুমাত্র
 ব্যত্যয় হইতে পারিত না । নিত্যই টানা-
 টানির মিনে ঘনি কোনো বিষয়ে কিছু ক্রটি
 পড়িত তবে সেটা যে অভাবজনিত ঘটনা হইত সে
 কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে
 দিতেন না—হয় শুধু বলিতেন, ঐ রে, হস্তভাগা
 কুস্ত্র খাবারে যথ বিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া
 দিয়াছে ! বলিয়া নিজের ক্রুদ্ধ অসহ্যরূপে
 দিকার দিতেন । নহত লক্ষ্যছাড়া নোটের
 খোঁজই নুতন কেনা কাপড়টা খোঁজা
 দিয়াছে বলিয়া তাহার বুদ্ধির প্রতি প্রচুর
 অপ্রসাদ প্রকাশ করিতেন,—ভবানীচরণ তখন
 তাঁহার প্রিয় জুতাটির গন্ধাবলম্বন করিয়া
 গৃহীণীর রোপ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার অস্ত
 ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন । এমন কি, কখনো
 এমনও ঘটিয়াছে, যে কাপড় গৃহীণী কেনেন
 নাই, এবং ভবানীচরণ চক্ষুও বন্ধে নাই
 এবং যে কাননিক কাপড় খানি হারাইয়া
 ফেলিয়াছে বলিয়া নটবিহারী অভিব্যক্ত—
 ভবানীচরণ অন্নান মুখে স্বীকার করিয়াছেন
 যে সেই কাপড় নোটো তাঁহাকে কৌড়াইয়া
 দিয়াছে, তিনি তাহা পরিগ্রহেন, এবং তাহার
 পর—তাঁহার কি হইল সেটা ২৪তম তাঁহার
 কলমপদ্ধতিতে জোগাইয়া উঠে নাই—রাসমণি
 নিজেই সেটুকু পূরণ করিয়া বলিয়াছেন—
 নিশ্চয়ই তুমি তোমার বাহিরের বৈঠকখানার
 ঘরে ছাড়িয়া রাখিয়াছিলে—সেখানে যে খুঁপ
 আগে যায়—কে চুরি করিয়া লইয়াছে ।

ভবানীচরণের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা ।
 কিন্তু নিজের ছেলেকে তিনি কোনো আশেই
 স্বামীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন না ।
 সে ত তাঁহারই গর্ভের সন্তান—তাঁহার আবার
 বিদেশে বাসুধানা ! সে হইবে লক্ষ্যমর্ষ
 কাজের লোক—অনায়াসে গ্রন্থ সহিবে এবং
 খাটিয়া খাইবে । তাহার এটা নহিলে চলে না
 ওটা নহিলে অপমান বোধ হয় এমন কথা
 কোনোমতেই শোভা পাইবেন না । কালীপদ
 সম্বন্ধে রাসমণি খাওয়া পরার খুব মোটা রকমই
 বরাদ্দ করিয়া দিলেন । মুড়িমুড় দিরাই
 তাহার জলখাবার সারিগেল এবং মাথা কান
 ঢাকিয়া ঘোলাই পরাইয়া তাহার শীত নিবা-
 রণের ব্যবস্থা করিলেন । গুরুদয়ারকে বহু
 ডাকিয়া বলিয়া দিলেন ছেলে যেন পড়া-
 শনার কিছুমাত্র শৈথিল্য করিতে না পারে,
 তাহাকে যেন বিশেষরূপে লালনে সম্যক রাখিয়া
 লক্ষ্য দেওয়া হয় ।

এইখানে বড় সুকণ বাধিল । দ্বিতীয়-
 ব্রতাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিজ্ঞোহের
 লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু রাসমণি
 যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না ।
 ভবানী প্রবলপন্থের কাছে ভিত্তিহীনই হার
 মানিয়াছেন এবারও তাঁহাকে অগত্যা হার
 মানিতে হইল কিন্তু মন হইতে তাঁহার বিরুদ্ধতা
 ছুটিল না । এ ঘরের ছেলে ঘোলাই মুড়ি
 দিরা গুড়মুড়ি খায় এমন বিশদৃশ পুত্র যিনি
 পর দিন কি দেখা যায় !

পুত্রের স্নেহের তাঁহার মনে পড়ে কর্তাদের
 আবেল নুতন লালনপদ্ধতি পরিয়া তাঁহার। ক্রকপ
 উৎসাহ বোধ করিয়াছেন । পুত্রের দিনে
 রাসমণি কালীপদের অস্ত যে গড়া কাপড়

জামায় ব্যবস্থা করিয়াছেন সাবেক কালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যসহ তাঁহাতে আগন্তিক করিত। রাসদণ্ডি স্বামীকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কালীপদকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে খুশি হয়, সে ত সাবেক দত্তদের কথা কিছু জানে না—তুমি কেন মিছামিছি মন তার করিয়া থাক! কিন্তু ভবানীচরণ কিছুতেই কুলিতে পারেন না, যে, বেচারী কালীপদ আপন বংশের পৌরব জানে না বলিয়া তাহাকে ঠিকানো হইতেছে। বস্ত্রত সামান্য উপহার পাইয়া সে বখন গর্জে ও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে ছুটিয়া দেয়াইতে আসে তখন তাহাতেই ভবানীচরণকে যেন আরো অস্বস্ত করিতে থাকে। তিনি সে কিছুতেই দেখিতে পারেন না। তাঁহাকে যুব কিরাইয়া চলিয়া বাইতে হয়।

ভবানীচরণের মকদ্দমা চালাইবার পর হইতে তাঁহাদের গুরুভ্রাতৃদের ঘরে বেশ কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগম হইয়াছে। তাহাতেই সম্বল নষ্ট করিয়া গুরুপুত্রটি প্রতি বৎসর পূজার কিছু পূর্বে কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার চোখ ভোলানো সত্তা পৌরী জিনিষ আনাইয়া কয়েকমাসের জন্য ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। অল্প কালী, ছিপছাড়িহাতার একত্রে সমবায়, ছবি আঁকা চিত্রিত কাগজ, মিলানে কেরা নানা রঙের পটা রসম ও মাটির খান, কবিতা-লেখা; পাড় ওয়ালা গাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি প্রাচ্যের নরনারীর মন উত্তলা করিয়া দেয়। কলিকাতার বাবুসহলে আজকাল এই সমস্ত উপকরণ না হইলে তত্ত্বতা রক্ষা হয় না শুনিয়া গ্রামের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি-

মাত্রই আপনায় প্রাণাত্য বুড়াইবার জন্য সাধাতিরিজ ব্যয় করিতে ছাড়েন না।

একবার বগলাচরণ একটা অত্যন্তব্য মেঘের সৃষ্টি আনিয়াছিলেন। তার কোন একজারগার বম বিশেষ মেঘ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া গাড়াইয়া প্রবল বেগে নিজেই লক্ষ্য করিতে থাকে।

এই বীজনপরাগণ গ্রীষ্মকালের মেঘসৃষ্টির প্রতি কালীপদর অত্যন্ত লোভ জন্মিল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে এই জন্য তার কাছে কিছু না বলিয়া ভবানীচরণের কাছে করণ-কর্মে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তখনই উদারভাবে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন কিন্তু তাহার দাম তুমিই তাঁহার যুব কুলাইয়া গেল।

টাকাকড়ি আদায়ও করেন রাসদণ্ডি, তবলিও তাঁহার কাছে, পরচেও তাঁহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ তিথ্যার মত তাঁহার অঙ্গপূর্ণের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে এক সময়ে হাঁ করিয়া আপনায় মনের ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিলেন। রাসদণ্ডি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন—পাপন হইয়াছে!

ভবানীচরণ চুপ করিয়া ধানিকন্দ্য তাবিত লাগিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা বেশ, তাহের সঙ্গে তুমি যে রোজ আমাকে বি আর পায়ল দাও সেটার ত প্রয়োজন নাই।

রাসদণ্ডি বলিলেন, প্রয়োজন নাই ত কি? ভবানীচরণ কহিলেন, কবিরাজ বলে উঠাতে পিতৃ বৃদ্ধি হয়।

রাসমণি ভীক্তভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তোমার কহিবার ত সব জানে !
ভবানীচরণ কহিলেন—আমি ত বলি
তাহে আমার লুটি বন্ধ করিয়া তাহের
স্বাবস্থা করিয়া দিলে ভাল হয় । উহাতে পেট
ভরি করে ।

রাসমণি কহিলেন, পেটভার করিয়া আর
পৰ্য্যন্ত তোমার ত কোনো অনিষ্ট হইতে
দেখিলাম না । অসকাল হইতে লুটি খাইয়াই
ত জুমি যাহ্ন !

ভবানীচরণ সর্লক্ষ্যকার ত্যাগবীকার
করিতেই প্রস্তুত—কিন্তু সেদিকে ভাবি
কড়াকড়া । বিবেচন দব বাড়িতেছে কিন্তু
লুটির লক্ষ্য ঠিক সমানই আছে । মধ্যাহ্ন
ভোজনে পারসটা বখন আছেই তখন দুইটা
না দিলে কোনো কতিই হয় না—কিন্তু বাহ্যে
হইলেও এ বাড়িতে বাহুরা বসাবর দই পারস
খাইয়া আসিয়াছেন । কোনোদিন ভাবনী-
চরণের ভোগে সেই চিরন্তন দ্বিধা অনটন
দেখিলে রাসমণি কিছুতেই তাহা সহ করিতে
পারেন না । অতএব গায়ে-হাওরা-লাগানো
সেই মেঘমুগিট ভবানীচরণের দই পারস দি
লুটির কোনো ছিপ্রপথ দিয়া যে প্রবেশ
করিলে এমন উপায় দেখা গেল না ।

ভবানীচরণ তাঁহার গুরুপুত্রের বাসায়
একদিন যেন নিত্য অকার্য্যগেই গেলেন এবং
বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথার পর সেই মেঘের
পবনটা বিজ্ঞাসা করিলেন । তাঁহার বর্জমান
আর্থিক দুর্গতির কথা বঙ্গলাচরণের কাছে
গোপন থাকিবার কোনোই কারণ নাই তাহা
তিনি জানেন, তবু আজ তাঁহার টাকা নাই
বলিয়া ঐ একটা সামাজ্য খেলনা তিনি তাঁহার

ছেলের লজ্জা কিনিতে পারিতেছেন না একবার
আত্মা দিতেও তাঁহার যেন মাথা হিঁকিয়া
পড়িতে লাগিল । তবু দুঃসহ লক্ষ্যচক্ষের
অবস্কৃত করিয়া তিনি তাঁহার চাদরের ভিতর
হইতে কাপড়ে মোড়া একটি দানো পুরাতন
জামিয়ার বাহির করিলেন । লক্ষ্যপ্রায় কণ্ঠে
কহিলেন, সমরটা কিছু খরাপ পড়িয়াছে,
নগদ টাকা হাতে বেশি নাই—তাই মনে
করিয়াছি এই জামিয়ারটি তোমার কাছে
বন্ধক রাখিয়া সেই পুতুলটা কালীপদর লজ্জা
লইয়া যাইব ।

জামিয়ারের চেয়ে আরদামের কোনো
জিনিষ যদি হইত তবে বঙ্গলাচরণের বাধিত
না—কিন্তু সে জানিত এটা লক্ষ্য করিয়া
উঠিতে পারিবেন—আমের লোকেরা ত নিন্দা
করিবেই তাহার উপরে রাসমণির রসনা
হইতে বাহ্য বাহির হইবে তাহা মরল হইবেন ।
জামিয়ারটাকে পুনরায় চাদরের মধ্যে গোপন
করিয়া হতাশ হইয়া ভবানীচরণকে কিরিতে
হইল ।

কালীপদ পিতাকে রোজ বিজ্ঞাসা করে,
বাবা আমার সেই মেঘের কি হইল ?
ভবানীচরণ রোজই হাসিমুখে বলেন, রোস—
এখনি কি ! সপ্তমী পূজার দিন আগে আশ্বিন !

প্রতিদিনই মুখে হাসি টানিয়া আনা
“রূপাধার হইতে লাগিল ।

আজ চতুর্থী । ভবানীচরণ অলম্বরে সন্তোষে
কি একটা ছুতা করিয়া গেলেন । যেন
হঠাৎ কথাশ্রসকে রাসমণিকে বলিয়া
উঠিলেন—দেখ আমি করদিন হইতে লক্ষ্য
করিয়া দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা যেন
দিনে দিনে খরাপ হইয়া যাইতেছে ।

রাসমণি কহিলেন—বাগাই! খাওয়ান হইতে খাইবে কেন? ওর ত আমি কোনো অশ্রু দেখি না।

ভাবানীচরণ কহিলেন—দেখ নাই! ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কি বেন ভাবে।

রাসমণি কহিলেন—ও একগু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমি ত বাঁচিভাষ! ওর আবার ভাবনা! কোথায় কি গুটামি করিতে হইবে ও সেই কথাই ভাবে!

দুর্গশ্রাভীন্দর এদিকটাতেও কোনো দুর্গশ্রাভা দেখা গেল না—পাখরের উপরে ঘোলের দাগও বসিল না। নিখাস ফেলিয়া মাথার হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবানীচরণ বাহিরে চলিয়া আসিলেন। একলা ঘরের দাওয়ার বদরা পূব কদিয়া ভাষাকে খাইতে লাগিলেন।

পঞ্চমীর দিনে উৎসাহ পাক্তে দই পারস অমনি পড়িয়া পড়িল। সন্ধ্যাবেলায় শুধু একটা সন্দেশ খাইয়াই জল পাইলেন, সুচি ছুইতে পারিলেন না। বলিলেন, জুখা একেবারেই নাই।

এইবার দুর্গশ্রাভীন্দর মন্ত একটা ছিট দেখা দিল। বজীর দিনে রাসমণি স্বয়ং কালীপদকে নিভুতে ডাকিয়া লইয়া তাহার আশ্রয়ের ডাকনাম ধরিয়া বলিলেন—ভেঁটু, তোমার এত বয়স হইয়াছে, তুমি তোমার অস্ত্রের আশ্রয় পুড়িল না! হি ছি। দেখা গাইবার উপায় নাই সেটাতে গোট করিলে অর্ধেক চুরি করা বয়, তা জান!

কালীপদ নাকীহরে কহিল—আমি কি জানি! বাবা যে বলিয়াছেন ওটা আমাকে দেবেন।

তখন এবার বলাই অর্থ কি, রাসমণি ভাষা কালীপদকে বুঝাইতে বলিলেন। পিতার এই বলার মধ্যে যে কত গ্রেহ কত বেদনা, অশ্রু এই জিনিসটা দিতে হইলে তাঁহাদের বহিঃপ্রণয়ের কত ক্রটি কত গুণ ভাষা অনেক করিয়া বলিলেন। রাসমণি এমন করিয়া কোনোদিন কালীপদকে কিছু বুঝান নাই—তিনি গাধা করিতেই পূব সংক্ষেপে এবং জোরেই লগেই করিতেন—কোনো আবেশকে নয় করিয়া তুলিবার আবশ্রুকই তাঁর ছিল না। সেইজন্য কালীপদকে তিনি যে আশ্রয় এমন মিনতি করিয়া এত বিস্তারিত করিয়া কথা বলিতেছেন তাহাতে সে আশ্রয় হইয়া গেল, এবং মাতার মনের এক আশ্রয়—যে কতটা দরদ আছে বালাক হইয়াও একরকম করিয়া সে তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু যেমের দিক হইতে মন একমুহুর্তে কিরাইয়া আসা কত কঠিন তাহা বহু পাঠকদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তাই কালীপদ পূব অত্যন্ত গভীর করিয়া একটা কাঠি লইয়া মাটিতে আঁড়ক কাটিতে লাগিল।

তখন রাসমণি আবার কঠিন হইয়া উঠিলেন—কঠোরবরে কহিলেন, তুমি রাগই কর আর কাঙ্ক্ষাটিই কর বাবা পাইবার নয় তাহা কোনমতেই পাইবে না।—এই বলিয়া আর বুঝা দরদ নষ্ট না করিয়া অতঃপদে গৃহকর্মে চলিয়া গেলেন।

কালীপদ বাহিরে গেল। তখন ভাবানীচরণ একলা বসিয়া ভাষাকে খাইতেছিলেন। পূব হইতে কালীপদকে দেখিয়াই তিনি ভাষাভাঙি উঠিয়া বেন একটা বিশেষ

কাজ আছে—এমনি ভাবে কোথাও চলিলেন ।
কালীপদ ছুটিয়া আসিয়া কহিল—বাবা,
আমার সেই বেম্—

আজ আর ভগ্নানীচরণের মুখে হাসি
বাহির হইল না । কালীপদর গলা জড়াইয়া
দহিয়া কহিলেন—তোম, বাবা, আমার
একটা কাজ আছে—সেই আসি, তার পরে
সব কথা হবে!—বলিয়া তিনি বাড়ির বাহির
হইয়া পড়িলেন । কালীপদর মনে হইল
তিনি বেন তাকাতাড়ি ভেধ হইতে জল
মুছিয়া কেলিলেন ।

তখন পাড়ার এক বাড়িতে পতীক্ষা
করিয়া উৎসবের বাশির বাহন। করা
হইতেছিল । সেই রজনীতৌকিতে সকল
বেলাকার করণহুতের পরতের নবীন মৌস্ত
বেন প্রজ্জ্বর অস্ত্রভায়ে বাধিত হইয়া
উঠিতেছিল । কালীপদ তাহাদের বাড়ির
দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের
দিকে চাহিয়া রহিল । তাহার পিতা যে
কোনো কাজেই কোথাও বাইতেছেন না,
তাহা তাহার গতি দেখিয়াই বুঝা যায়—
এতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাশ্রের
যোষা টানিয়া টানিয়া চলিরাছেন এবং
তাহা কোথাও কেলিবার স্থান নাই,
তাহা তাহার পশ্চাৎ হইতেও স্পষ্ট দেখা
বাইতেছিল ।

কালীপদ অস্ত্রপূরে করিয়া আসিয়া
কহিল, মা, আমি সেই পাখা-করা বেম
টাই না ।

মা তখন জাঁতি লইয়া কি-একহতে স্রুপ্তি
কাটিতেছিলেন । তাহার মুখ উজ্জল হইয়া
উঠিল । ছেলেতে মায়েতে সেইখানে বসিয়া

কি একটা পরামর্শ হইয়া গেল তাহা কেহই
জানিতে পারিল না । জাঁতি রাখিয়া ধামাতরা
কাটা ও আকাটা স্রুপ্তি কেলিয়া রাসদণি
তখনই বগলাচরণের বাড়ি চলিয়া গেলেন ।

আজ ভগ্নানীচরণের বাড়ি কিরিতে
অনেক বেলা হইল । স্থান সারিরা বখন
তিনি খাইতে বসিলেন তখন তাহার মুখ
দেখিয়া বোধ হইল আজও দধি পায়েসের
সদপাতি হইবে না, এমন কি মাছের মুড়াটা
আজ সম্পূর্ণই বিড়ালের ভোগে লাগিবে ।

তখন দড়ি দিয়া ঘোড়া কাগজের এক
বাক্স লইয়া রাসদণি তাহার বাহীর সম্মুখে
আনিয়া উপস্থিত করিলেন । আহারের পরে
বখন ভগ্নানীচরণ বিশ্রাম কহিতে বাইবেন
তখনই এই রহস্তটা তিনি আবিষ্কার করিবেন
ইহাই রাসদণির ইচ্ছা ছিল কিন্তু যদি পাঠস ও
মাছের মুড়ার অনাবর দূর করিবার জন্য
এখন এটা বাহির করিতে হইল । বাস্তব
জিহ্বার হইতে সেই যেমনমুগ্ধি বাহির হইয়া
বিনা বিলম্বে প্রবল উৎসাহে আপন গ্রীষ্মতাপ
নিবারণে লাগিয়া গেল । বিড়ালকে আজ
হতাল হইয়া কিরিতে হইল । ভগ্নানীচরণ
গৃহীণীকে বলিলেন, আজ ঘাড়াটা বড় উত্তম
হইয়াছে । অনেকদিন এমন মাছের ঝোল
বাই নাই । আর দইটা যে কি চমৎকার
অমিরাছে সে আর কি বলি !

সপ্তমীর দিন কালীপদ তাহার অনেক
দিনের আকাঙ্ক্ষার ধন পাইল । সেদিন
সমস্ত দিন সে মেঘের পাখাখাওয়া দেখিল,
তাহার সম্বন্ধসী বন্ধুস্বাক্ষরদণ্ডকে দেখাইয়া
তাহাদের জর্জর উল্লেখ করিল । অস্ত্র কোনো
অবস্থায় হইলে সমস্তকণ এই পুরুলের এক

যেহে পাখা নাড়ায় সে নিশ্চয়ই একদিনেই বিরক্ত হইয়া বাটক—কিন্তু অষ্টমীর দিনেই এই আতিশা বিসর্জন দিতে হইবে জানিয়া তাহার অস্থগা অটল হইয়া রহিল। রাসমণি তাঁহার স্তম্ভপুত্রকে গুইটাকা মগন দিচ্চা কেবল একদিনের জন্ত এই পুত্ৰলটি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অষ্টমীর দিনে কালীপদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বহুশেষ বাক্যসময়ত পুত্ৰলটি বগলাচরণের কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। এই একদিনের মিলনের সুখস্বাদি অনেকদিন তাহার মনে আগরক হইয়া রহিল, তাহার কল্পনাশ্রমে পাখা চলার আর বিষাদ রহিল না।

এখন হইতে কালীপদ যাতার মন্ত্রণার সঙ্গী হইয়া উঠিল এবং এখন হইতে ভবানীচরণ প্রতিবৎসরই এত সহজে এমন মূল্যবান পুত্রার উপকার কালীপদকে দিতে পারিতেন যে, তিনি নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া বাইতেন।

পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া যে কিছুই পাওয়া যায় না এবং সে মূল্য যে যতখের মূল্য, যাতার অগ্ররক হইয়া সে কথা কালীপদ প্রতিদিন ঘটই বুঝিতে পারিল ততই সেখিতে দেখিতে সে যেন ভিতরের দিক হইতে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাজেই এখন সে তার যাতার দক্ষিপদার্থে আসিয়া দাঁড়াইল। সংসারের ভার বহিতে হইবে সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না একথা বিনা উপদেশ-বাক্যেই তাহার মস্তক সজে মিশিয়া গেল।

জীবনের দারিদ্র্য গ্রহণ করিবার জন্ত তাহাকে প্রোত্ত হইতে হইবে এই কথা স্মরণ রাখিয়া কালীপদ প্রায়শপণে পড়িতে লাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া

যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তখন ভবানীচরণ মনে করিলেন, আর বেশি পড়াশুনায় পরকার নাই এখন কালীপদ তাঁহাদের বিবরণকর্ম দেখার প্রস্তুত হউক।

কালীপদ যাকে আদিয়া করিল, কলিকাতার গিয়া পড়াশুনা না করিতে পারিলে আমিও মজ্বল হইতে পারিব না।

মা বলিলেন, সে ত ঠিক কথা বাবা। কলিকাতার ত বাইতেই হইবে।

কালীপদ কহিল, আমার জেজ্ঞে কোনো পরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই চালাইয়া দিব—এবং কিছু কালকর্মেরও জোগাড় করিয়া লইব।

ভবানীচরণকে রাগি করাইতে অনেক কষ্ট পাইতে হইল। দেশব্যাপ মত বিপর সম্পত্তি যে কিছুই নাই সে কথা বলিলে ভবানীচরণ অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন তাই রাসমণিকে সে বৃত্তিটা চাপিয়া বাইতে হইল। তিনি বলিলেন, কালীপদকে ত মজ্বল হইতে হইবে।—কিন্তু পুত্রবাহুজ্ঞমে কোনো দিন শানিয়ারাতির বাহিরে না গিয়াই ত চৌধুরীরা এতকাল মজ্বল হইয়াছে! বিবেশকে তাঁহার বয়সুদীর মত ভয় করেন। কালীপদর মত বালককে একলা কলিকাতার পাঠাইবার প্রস্তাবমাত্র কি করিয়া কাহারো মাথার আসিতে পারে তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে গ্রামের সর্গোপদান বুদ্ধিমান ব্যক্তি বগলাচরণ পর্য্যন্ত রাসমণির মতে মত দিল। সে বলিল, কালীপদ একদিন উকীল হইয়া সেই উইলচুরি দাঁকির শোষ দিবে—নিশ্চয়ই এ তাহার জগোর লিখন—অতএব কলিকাতার

বাঁজরা চটেতে কেবল তাহাকে নিবারণ
করিতে পারিবে না।

এ কথা শুনিয়া ভবানীচরণ অনেকটা লাজনা
পাইলেন। গামছার সাঁধা পুরাণো সমস্ত নখি
বাঁহির করিয়া উইল-চুরি মটরা কালীপদর সঙ্গে
বারান্ধা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্মতি
মাতার মস্তুর কাঁড়টা কালীপদ বেশ
বিচকণতার সঙ্গেই চালাইতেছিল কিন্তু পিতার
বহুলাসতার সে জোব পাইল না। কেননা
তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অস্ত্রটি
সবচেঁ তাহার মনে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল না।
তবু সে পিতার কথার সাহা দিয়া গেল।
সীতাকে উদ্ধার কথিবার জন্য বীরশ্রেষ্ঠ রাম
যেমন লক্ষ্য বাঁধা করিয়াছিলেন—কালীপদর
কলিকাতার বাজাকেও ভবানীচরণ তেমনি
পূর্ব বড় করিয়া দেখিলেন—সে কেবল সামান্য
পাল করার যোগ্য নয়—যেহে লক্ষ্যকে
পরে ফিরাইয়া আনিবার আয়োজন।

কলিকাতার বাইবার আগের দিন রাসমণি
কালীপদর গলার একটি বক্ষাকবচ খুলিয়া
দিলেন; এবং তাহার হাতে একটি পকাশ
টাকার নোট দিয়া বলিয়া দিলেন—এই নোটটি
রাখিবে, আপনাকে বিপদে প্রয়োজনের সময়
কাজে লাগিবে।—সংসার খরচ চাইতে অনেক
কষ্টে জমানো এই নোটটিকেই কালীপদ
যথার্থ পবিত্র কথের স্তার জ্ঞান করিয়া গ্রহণ
করিল—এই নোটটিকে মাতার আনীর্কাদেব
মত সে চিরদিন রক্ষা করিবে, কোনোদিন
খরচ করিবে না এই সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল।

(৩)

ভবানীচরণের মুখে উইল-চুরির কপাটা
এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন

তাহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ।
তাহারই কথা বলিবার জন্য তিনি এখন সমস্ত
পাড়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাহার চিঠি
পাইলে যেরে যেরে তাঁরা পড়িয়া শুনাইবার
উপলক্ষ্য নাক চাইতে চব্বা আর নানিতে
চায় না। কোনোদিন এবং কোনোপক্ষে
কলিকাতার যান নাই বলিষ্ঠাট কলিকাতার
গৌরববোধে তাহার কল্পনা অত্যন্ত
উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের কালীপদ
কলিকাতার পক্ষে এবং কলিকাতার কোনো
সংবাদই তাহার অগোচর নাই—এমন কি,
হুগলির কাছে গঙ্গার উপর দ্বিতীয় আর
একটা পুল বাঁধা হইতেছে এ সমস্ত বড় বড়
বসর তাহার কাছে নিত্যক বরের কথা মাত্র।
—তবেই তাহা গঙ্গার উপর আর একটা যে
পুল বাঁধা হইবে—আজই কালীপদর চিঠি
পেয়েছি তাতে সমস্ত বসর লিখেছে!—বলিষ্ঠা
চব্বা খুলিয়া তাহার কাঁচ ভাল করিয়া মুছিয়া
চিঠিখানি অতি দীরে দীরে আত্মপাত
ক্রটিবেশীকে পড়িয়া শুনাইলেন।—দেখচ
তাঁরা! কালে কালে কতই যে কি হয়ে
তার ঠিকানা নেই। শেখকালে পুলোপারে
গঙ্গার উপর দিয়ে কুকুর শেখালজ্ঞাণেও গার
হয়ে বাবে কলিতে এও ঘটল হে!—গঙ্গার
এইরূপ মাহাত্ম্যবর্ধ নিঃসন্দেহই শেখতীর
ব্যাপার কিন্তু কালীপদ যে কলিকালে
এতবড় একটা জয়যাত্রী তাহাকে নিশিথ
করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিত্যক
জ্ঞাণ লোকেরা এ খবরটা তাহারই কল্যাণে
জানিতে পারিয়াছে নেই আশঙ্ক্য তিনি
বর্তমানবৃগে জীবের অসীম দুর্গতির দৃষ্টান্তও
অনায়াসে তুলিতে পারিলেন। বাহার দেখা

পাইলেন তাহারই কাছে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, আমি যশে দিছি, গঙ্গা আর বেশি দিন নাই!—মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন গঙ্গা যখনই বাইবার উপক্রম করিবেন তখনই সে খবরটা দর্শন প্রথমে কালীশদর চিঠি হইতেই পাওয়া যাইবে।

এদিকে কলিকাতার কালীশদর বহুকষ্টে পনের বাসার থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া, রায়ে হিলাবের খাতা নকল করিয়া পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। কোনোমতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পার হইয়া পুনরায় সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্চর্য ঘটনা উপলক্ষে সমস্ত গ্রামের লোককে প্রকাণ্ড একটা জোজ দিবার জন্ত ভবানীচরণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন তবুও তাঁর কুলে আদিয়া ভিড়িল—সেই সাহসে এখন চটতে মন খুলিয়া থরত করা যাইতে পারে। বাসনশাস্ত্র কাছে কোনো উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজটা বন্ধ রহিল।

কালীশদর এবার কলিকাতার কাছে একটি মেসে আসিয়া পাইল। মেসের যিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নীচের তলার একটি অব্যবহার্য ঘরে থাকিতে অগ্রহণ্তি দিয়াছেন। কালীশদর বাড়িতে তাহার ছেলেকে পড়াইয়া দুইবেলা খাইতে পার এবং মেসের সেই স্নানক্ষেত্রে স্নানকার ঘর তাহার বাগ। ঘরটার একটা মস্ত হুবিধা এই যে সেখানে কালীশদর ভাগী কেহ ছিল না স্নানক্ষেত্রে যদিত সেখানে বাতাস চলিত না, তবু পড়া শুনা অব্যাহত চলিত। যেমনই হউক হুবিধা অগ্রহণ্তি দিবার করিবার অবস্থা কালীশদর নহে।

এ মেসে বাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে, বিশেষত বাহারা দ্বিতীয় তলার উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সঙ্গে কালীশদর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। উক্তের বসায়ান্তে নিম্নের পক্ষে কতদূর প্রাণান্তিক কালীশদর তাহা স্থিরেতে বিলম্ব হইল না।

এই মেসের উচ্চলোকে ইঞ্জের সিংহাসন বাহার, তাহার পরিচয় আবজ্ঞক। তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড়মাহুষের ছেলে; কলিকাতার পড়িবার সময় মেসে থাকা তাহার পক্ষে অন্যাবজ্ঞক—তবু সে মেসে থাকিতেই ভালবাসিত।

তাহাদের দুহৎ পরিবার হইতে কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষসন্তান আত্মীয়ক আনায়ে কলিকাতার একটা বাসভাড়া করিয়া থাকিবার জন্য বাড়ি হইতে অগ্রহণ্তি আনিয়াছিল—সে তাহাতে কোনোমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকিলে তাহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না। কিন্তু আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেন্দ্র লোকজনের সঙ্গে খুবই ভালবাসে—কিন্তু আত্মীয়দের হুজি এই যে, কেবল দ্বিতীয় তাহাদের সখি লইয়া বাংলা পাওয়া যায় না, তাহাদের নানা দায়ীকার করিতে হয়;—কাহারো সখি একটা করিতে নাই, কাহারো সখিও গঠি না করিলে অত্যন্ত নিম্নার কথা। এই জন্য শৈলেন্দ্রের পক্ষে লোকের চেষ্টে হুবিধার আশা মেসে। সেখানে লোক যথেষ্ট আছে অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা

আগে যাহ, হাশে কণা কণ; তাহার নবীর
জলের মত, কেবলি বহিরা চলিয়া যার লখচ
কোথাও লেনমাত্র ছিন্ন রাখে না ।

শৈলেশের দ্বারা ছিল সে নেক তাল;
যাহাকে বশে লজ্জবর। লক্ষণেই জানেন
এই দ্বারগটির মন্ত সুবিধা এই যে নিম্নের
কাছে হইবার কোনো বরকার করে না।
লোক হইবার কোনো বরকার করে না।
অহঙ্কার জিনিষটা হাতিবোড়ার মত নব;
তাহাকে নিত্যই অন্ন খরচে ও বিনা
খোরাকে বেশ মোটা করিয়া রাখা যায়।

কিন্তু শৈলেশের ব্যয় করিবার সামর্থ্য ও
জরাজি ছিল—এইজন্য আপনাত অহঙ্কারটাকে
সে সম্পূর্ণ বিনাশরূপে চেরিয়া বাইতে দিত না;—
যদি খোরাক দিয়া তাহাকে হৃদয় হৃদয়িত
করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুত শৈলেশের মনে সরা বপুটে ছিল।
লোকের হুংরু দূর করিতে সে সত্যই
ভালবাসিত। কিন্তু এত ভালবাসিত যে
যদি কেহ হুংরু দূর করিবার লজ্জ তাহার
শরপাশর না হইত তাহাকে সে বিধিযতে
হুংরু না দিয়া ছাড়িত না। তাহার ঘরা
বধন নির্দয় হইয়া উঠিত তখন বড় ভাবল
আকার ধারণ করিত।

মেষের লোকদিগকে বিরেটীর দেখানো,
পাঠা খাওয়া, টাকা খার দিয়া সে
কপটতাকে সর্বদা মনে করিয়া না রাখা
তাহার দ্বারা আরেই ঘটত। নবপরিণীত
মুগ্ধ যুগ্ম পুণ্ডর ছুটিতে বাড়ি বাইবার সময়
কলিকাতার বাসাবরচ সমস্ত শোধ করিয়া
বধন নিষে হইয়া পড়িত তখন বধুর মনো-
চরণের উপযোগী সৌখীন সাবান এবং

এলেক, আর তারি লক্ষ এক আধখানি
হালের আধখানী বিলাতী ছিটের জ্যাকেট
সংগ্রহ করিবার লজ্জ তাহাকে অত্যন্ত বেশি
হস্তিভার পড়িতে হইত না। শৈলেশের
জুজুটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে বলিত,
ভোমাকেই কিছু তাই পছন্দ করিয়া দিতে
হইবে।—বোঝানো তাহাকে লক্ষ করিয়া
লইয়া নিজে নিত্যই সন্তা এবং বাজে জিনিষ
বাছিয়া তুলিত;—তখন শৈলেশ তাহাকে
তৎসনা করিয়া বলিত—আবে ছি ছি,
তোনার কি রকম পছন্দ।—বলিয়া সব চেয়ে
সৌখীন জিনিষট টানিয়া তুলিত। বোঝান-
বার দ্বারা বলিত, হাঁ ইনি জিনিষ চেনেন
বটে!—খরিদার দামের কথা আলোচনা
করিয়া সুখ বিষয় করিতেই শৈলেশ দাম
চুকাইবার অকিঞ্চন্য তাহাটা নিজেই
লইত—অপরলক্ষের কুমোড়ঃ আপত্তিতেও
কর্ণপাত করিত না।

এমনি করিয়া, দেখানে শৈলেশ ছিল
লেশানে সে চারিদিকের সকলেরই সকল
বিষয়ে আশ্রয়রূপ হইয়া উঠিয়াছিল।
কেহ তাহার আশ্রয় স্বীকার না করিলে
তাহার সেই ঐচ্ছ্য সে কোনোমতেই লক্ষ
করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার
লক্ষ তাহার এতই অল্পল।

বেচারি কানীপদ নীচের সাংঘ্যসকল ঘরে
ময়লা মাছের উপর বসিয়া একখানা ছেঁড়া
পেঙ্গি পরিয়া বইয়ের পাতার চোপ জালিয়া
গুলিতে গুলিতে পড়া মুখ করিত। যেমন
করিয়া বৌক তাহাকে অগাধনিপু পাইতেই
হইবে।

মা তাহাকে কলিকাতার আসিবার পূর্বে

মাথার দিগা দিগা বলিয়া নিরাঙ্কিলেন, পড়-
মাছবেব ছেলের সঙ্গে ঘেণঘেণি করিয়া
সে যেন আঘাতপ্রবোধে মাতিয়া না উঠে।
কেবল মাতার আবেশ বলিয়া নহে—
কালীপদকে যে দৈবজ্ঞ স্বীকার করিতে
হইরাছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়মামুষের
ছেলের সঙ্গে মেলা তাহার পক্ষে অসম্ভব
ছিল। সে কোনোদিন শৈশবের কাছে
বেঁগে নাই—এবং যদিও সে আনিত শৈশবের
মন পাইলে তাহার প্রতিদিনের অনেক দুঃখ
সমন্বিত একমুহূর্তেই সহজ হইয়া বাইতে পারে
তবু কোনো কঠিন সন্দেহেও তাহার প্রগাঢ়-
গাভের প্রতি কালীপদের গোট আকৃষ্ট
হয় নাই। সে আপনার অস্তাব লইয়া
আপনার দারিদ্র্যের নিহৃত অঙ্কুরের মধ্যে
প্রস্ফুর হইয়া বাস করিত।

গবীণ হইয়া তবু দূরে থাকিবে শৈশবের এই
অঙ্কুরটা কোনোমতেই গহিতে পারিল না।
তাহা ছাড়া এমনই বসনে কালীপদের দারিদ্র্যটা
এতই প্রকাজ যে তাহা নিত্য দৃষ্টিকটু।
তাহার অত্যন্ত দীনহীন কাপড়চোপড় এবং
মশারি বিছানা যখন দেওলার সিঁড়ি উঠিতে
চোখে পড়িত তখন সেটা যেন একটা
অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে
তাহার গলায় তাবির সূঁচনো; এবং সে
দুই লক্ষ্য যথানিধি আঁকিত করিত। তাহার
এই লক্ষ্য অল্প প্রায়শ্চাত্য উপরের দলের
পক্ষে বিবদ হাজির ছিল। শৈশবের পক্ষের
দুই একটি লোক এই নিহৃতবাহী নিরীহ
লোকটির রহস্ত উপাটন করিবার লজ্জ
দুইচারিদিন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল।
কিন্তু এই দুখচোরা মাজঘের মূল তাহার

পুণিতে পারিল না। তাহার ঘরে বেশিক্ষণ
বসিয়া থাকা স্বকর নহে, স্বাকর ত নহই
কাজেই তত্ব দিতে হইল।

তাঁহারের পাঠার বাৎসর্য তেজ্ঞে এই
অকিঞ্চনকে একদিন আছান করিলে সে
নিঃস্বই কৃতার্থ হইবে এই কথা মনে করিয়া
অগ্রসর করিয়া একদা নিমন্ত্রণপত্র পাঠান
হইল। কালীপদ আনাইল তেজ্ঞের ভোজ্য
লক্ষ্য করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অত্যাশ
অন্তর্য। এই প্রত্যাশ্যানে বলবলপদে
শৈশবের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিছুদিন তাহার ঠিক উপরের ঘরটাতে
এমনি দুঃখাপন্ন ও লবেগে গামবাধনা
চলিতে লাগিল যে, কালীপদের পক্ষে পড়ায়
মন দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিনের
বেলায় সে বপালস্তব গোলাদিবিত্তে এক গাছের
তলে বই লইয়া পড়া করিত এবং রাতি
থাকিতে উঠিয়া খুব ভোরের দিকে একটা
প্রাণী আদিয়া অধারনে মন দিত।

কলিকাতার আহার ও দাসদানের
কঠে এবং অতি পরিভ্রমে কালীপদের একটা
মাধ্যমহার ব্যাঘা উপলব্ধ হুটিল। কখনো
কখনো এমন হইত তিন চারিদিন তাহাকে
পড়িয়া থাকিতে হইত। সে নিঃস্বই আনিত
এ সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে
কখনই কলিকাতার থাকিতে দিবে না
এবং তিনি ব্যাকুল হইয়া দ্বন্দ্ব বা কলিকাতা
পর্যন্ত হুটিয়া আসিবে। ভাবানীচরণ
আনিতেন কলিকাতার কালীপদ এমন হুণে
আছে বাহা গ্রামের লোকের পক্ষে কখনো
করাও অসম্ভব। পাড়াগাঁয়ে যেমন গাছপালা
কোপস্বাড়া আনিই অয়ে কলিকাতার চাওদার

সরুপ্রকার মাঝারের উপরও যেম সেইরূপ
আপনিই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার
কলভোগ করিতে পারে এইরূপ তাহার
একটা ধারণা ছিল। কালীপদ কোনোমতেই
তাঁহার সে ভূঁপ ভাগে নাই। অল্পখের অত্যন্ত
কষ্টের সময়ও সে একদিনও পিতাকে পর
নিষিদ্ধে ছাড়ে নাই। কিন্তু এইরূপ পীড়ার
দিনে শৈশবের দল বধন গোলামাল করিয়া
ভুতের কাজ করিতে থাকিত তখন কালীপদর
কষ্টের সীমা থাকিত না। সে কেবল এগাল
এগাল করিত এবং জনশ্রুত ঘরে পড়িয়া
মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে স্মরণ করিত।
বারিষের অপমান ও গ্লান এইরূপে বড়ই
সে ভোগ করিত। ততই ইহার বন্ধন হইতে
তাঁহার পিতামাতাকে মুক্ত করিবেই এই
প্রতিজ্ঞা তাঁহার মনে কেবলি দৃঢ় হইয়া উঠিত।

কালীপদ নিজেই অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া
সকলের লক্ষ্য হইতে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা
করিত কিন্তু তাহাতে উৎপাত কিছুমাত্র
কমিল না। কোনোদিন বা সে মেলিল
তাঁহার চিনাবাণীরের পুরাতন সত্তা জুতার
একপাটিঃ পরিবর্তে একটি অতি উজ্জ্বল
বিলাতী জুতার পাটি। একদা বিলম্ব
জুতা পরিয়া কলেজে যাওয়াই অসম্ভব।
সে এসবছে কোনো নাশিন না করিয়া
পরের জুতার পাটি ঘরের বাহিরে রাখিয়া
দিল এবং জুতামোড়ানবৎগাণ্য হুতির নিগট
হইতে সর বাহের পুরাতন জুতা কিনিয়া
কাজ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর
হইতে একজন ছেলে হঠাৎ কালীপদর ঘরে
আগিয়া লিঙ্গাঙ্গা করিল—আপনি কি কুনিয়া
আমার ঘর হইতে আমার দিগারেটের কেসটা

লইয়া আসিয়াছেন! আমি কোথাও খুঁজিয়া
পাইতেছি না।—কালীপদ বিহত হইয়া
বলিল, আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।—
এই যে, এইখানেই আছে, বলিয়া সেই
লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে মূল্যবান
একটি দিগারেটের কেস তুলিয়া লইয়া
আমি কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কালীপদ মনে মনে হিম করিল এম্—এ
পরীকার যদি ভালরকম হুতি পাই তবে
এই মেস্ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

মেসের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবন্দর
ধুম করিয়া গরবতীপূজা করে। তাহার
বাহের প্রবান অংশ শৈশব বহন করে
কিন্তু সকল ছেলেই চাঁবা দিয়া থাকে।
গত বৎসর নিত্যই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদ
কাছে কেহ চাঁবা চাহিতেও আসে না।
এবংসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার
জন্যই তাহার নিকট চাঁবার খাতা আনিয়া
ধরিণ। যে দলের নিকট হইতে কোনোদিন
কালীপদ কিছুমাত্র সাহায্য লয় নাই—
বাহাদের প্রার নিত্য অহুষ্টিত আমোদগমোদে
যোগ দিবার দোষাগা সে একেবারে অস্বীকার
করিয়াছে তাহার বধন কালীপদর কাছে
চাঁবার সাহায্য চাহিতে আসিল তখন আনিয়া
সে কি মনে করিয়া পাচটা টাকা দিয়া
ফেলিল। পাচ টাকা শৈশব তাহার দলের
লোক কাহারও নিকট হইতে পায় নাই।

কালীপদর বারিষের ক্রপণতার এপর্যন্ত
সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে
কিন্তু আজ তাহার এই পাচ টাকা দান
তাঁহাদের একেবারে অসম্ভব হইল। তাঁহার
অবস্থা যে কিরূপ তাহা তাঁহাদের অগোচর

নাই তবে উহার এত বড়াই কিদের ? : নানাস্থিতিদিগ করিয়া তাড়া চুকাইয়া গঠন।
ও যে দেখি সকলকে টেকা দিতে চায় ! ঐ পুঁটুলিটার গর্ভে নানা হাড়ি পুরি তাড়ের

সরসভাপুত্রা ধুম করিয়া হইল—কালীপদ
যে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা না দিলেও
কোনো ইতরশ্রমণেব হইত না। কিন্তু
কালীপদর পক্ষে সে কথা বলা চলে না।
পরের বাড়িতে তাহাকে খাইতে হইত—
সকল দিন সমরমত আহার ভুটিত না।
তা ছাড়া পাকশালার ভৃত্যরাই তাহার
ভাগ্যবিদাতা, সুতরাং ভালমন্দ কমিবেশী
সব্বচে কোনো অগ্রির সমালোচনা না করিয়া
জলখাবারের লজ্জা কিছু সকল তাহাকে হাতে
রাখিতেই হইত। সেই সজটুকু গানাদুলের
তুচ্ছ তুল্যের সঙ্গে বিসর্জিত দেবীশ্রুতিমার
পশ্চাতে অন্তর্ধান করিল।

কালীপদর মাথাধারার উৎপাত বাড়িয়া
উঠিল। এবার পতীকার সে কেন্দ্র করিল না
বটে কিন্তু বৃত্তি শাইল না। কাজেই পড়িবার
সময় সন্ধ্যা করিয়া তাহাকে আরো একটি
টুটনির খোঁগাড় করিয়া লইতে হইল।
এবং বিস্তর উপজবসবেও বিনাভাড়ার
বাসাটুকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিভুলবাসীরা আশা করিয়াছিল
এবার ছুটির পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ ঘরে
আর আসিবে না। কিন্তু থানসমবেই তাহার
সেই নৌচের খরটার তালো পুশিয়া সেগণ
খুশির উপর সেই তাহার চিরকালে
চেককাটা চায়না-কাট পরিয়া কালীপদ
কেটদের মধ্যে প্রবেশ করিল—এবং একটি
ময়লা কাপড়ে বাধা মত্ত পুঁটুলিসমনেই টিনের
বাস্তব নানাইয়া রাশিয়া শেরালমহের স্টেতাহার
ঘরের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া অনেক

মধ্যে কালীপদর মা কাটা আম কুল চাপুতা
প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার সুস্বাদু
পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাধাইয়া
খিচ্ছিলেন। কালীপদ জানিত তাহার
অসন্তোষে কোরুপব্যবহার উপরতলার দণ
তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া পাকে। তাহার
আর কোনো ভাণনা ছিল না কেবল তাহার
বড় সন্ধ্যাট ছিল পাছে তাহার শিতামাতার
কোনো মেয়ের নিদ্রান এই বিদ্রূপকারীমেয়
হাচে পড়ে। তাহার মা তাহাকে যে খাবার
কিনিবত্তি খিচ্ছিলেন এ তাহার পক্ষে অসম্ভব
—কিন্তু এ সমস্তই তাহার দূরিত প্রামাণ্যের
আবরণের ধন ;—যে আবার সেগুলি দক্ষিণ

সেই ময়লা দিয়া আটা মজাঢাকা হাড়ি, তাহার
মধ্যেও সহরের ঐবর্ষা লজ্জার কোনো লক্ষণ
নাই, তাহা কাচের পাত্র নয়, তাহা চিনামাটির
ভাণ্ডও নহে—কিন্তু এইগুলিকে কোনো
সহরের ছেলে যে অবজ্ঞা করিয়া দেখে—
ইহা তাহার পক্ষে একবারেই অসম্ভব। আগের
বারে তাহার এই সমস্ত বিনোদ জিনিস-
গুলিকে তরুণপোষের নীচে পুরানো খবরের
কাগজ প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রজ্জ্বল করিয়া
রাখিত। এবারে ভালচোবির আগ্রহ লইল।
যখন সে পাঁচমিনিটের লজ্জাও ঘরের বাড়ির
ঘাইত যের তালোবড় করিয়া ঘাইত।

এটা সকলেরই গোপনে লাগিল। শৈলেন
বলিল ধনরত্ন ত বিস্তর ! ঘরে টুকলে চোরের
চক্ষে জল আসে—সেই ঘরে ঘন ঘন তালো
পড়িতেছে—একবারে দ্বিতীয় বাক্ষ অফ
বেকল হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আশাদেয়

কাচাকোট বিশ্বাস নাই—পাছে ঐ পাখন।
ছোটের চায়নাকোটটার গোল সামলাইতে না
পার। ওহে রাধু, ওকে একটা তত্ত্বগোছের
নতুন কোট কিনিয়া না দিলে ত কিছুতেই
চলিতেছে না। চিরকাল ওর ঐ একমাত্র
কোট দেখিতে দেখিতে আমার বিরক্ত বয়স
গেছে !

শৈলেন কোনেন্দ্রিন কালীপদর ঐ
লোনোথরা চুনবালিখণ্ডা স্বচ্ছতার বরটার মধ্যে
প্রবেশ করে নাই। নির্ভি দিগা উপরে
উঠিবার সময় বাহির হইতে দেখিলেই তাহার
সজ্জনরীর সজ্জিত হইয়া উঠিত। বিশেষত
সজ্জার সময় যখন দেখিত একটা টিমুটিমে
এমীপ লইয়া একলা সেই বায়ুপুঞ্জ বহু ঘরে
কালীপদ গা পুলিয়া বসিয়া বইয়ের উপর
খুঁজিয়া পড়িয়া পড়া করিতেছে তখন তাহার
প্রাণ হীপাইয়া উঠিত। বলের লোককে
শৈলেন বলিল, এবারে কালীপদ কোন লাভ-
ক্ষতির ধন মানিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে—
সেটা তোমরা খুঁজিয়া বাহির কর!—
এই কৌতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ
করিল।

কালীপদর ঘরের তালটি নিচাইয়াই
অন্ন বাসের তাল—তাহার নিবেধ খুব প্রবল
নিবেধ মছে—প্রায় সকল চাবিতেই এ তাল
খোলে। একদিন সজ্জার সময় কালীপদ
যখন ছেলে পড়াইতে গিয়াছে সেই অবকাশে
জন হুই তিন অত্যন্ত আনুবে ছেলে হাঙ্গিতে
হাঙ্গিতে তাল পুলিয়া একটা লষ্ঠম হাতে
তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তত্ত্বগোছের
নীচে হইতে আচার চাটুনি আমলক প্রভৃতির
ভাঙাভাঙিক আবিষ্কার করিল। কিছু শেওলি

যে নহুল। গোপনীয় সামগ্রী তাহা তাহাদের
মনে হইল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে বাগানের নীচে হইতে
এ—সম্মুখে এক চাবি বাহির হইল। সেই
চাবি দিরা টিনের বাসটা খুলিতেই কয়েকটা
ময়লা কাপড় বই খাতা কাঁচি ছুরি কলম
ইত্যাদি চোখে পড়িল। বাস বন্ধ করিয়া
তাহার চলিয়া বাইবার উপক্রম করিতেছে এমন
সময় সমস্ত কাপড়চোপড়ের নীচে ক্রমাগত
মোড়া একটা কি পদার্থ বাহির হইল। ক্রমাগত
খুলিতেই ছিঁড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা
দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটর
পর আরেকটি প্রায় তিনচার গান কাপড়ের
আবরণ ছাড়াইয়া কেবল একখানি পকাশ
টাকার নোট বাহির হইয়া পড়িল।

এই নোটখানা দেখিয়া কেহ আর হাসি
রাখিতে পারিল না। হো হো করিয়া উজ্জ্বল
হাসিয়া উঠিল। সকলেই হিহ করিল এই নোট
খানারই জন্তে কালীপদ ঘন ঘন ঘরে চাবি
লাগাইতেছে, পৃথিবীর কোনো লোককেই
বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার
কপলতা এবং লম্বা প্রকৃতিতে শৈলেনের
অসাদ-প্রত্যানী সহচরতলি বিম্বিত হইয়া
উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল রাস্তার
কালীপদর যত ঘন কাহার কাশি শোনা
গেল। তৎক্ষণাৎ বাসটার ডালা বন্ধ করিয়া,
নোটখানা হাতে লইয়াই তাহার উপরে
ছুটিল। একজন ভাড়াভাড়ি দরজার তাল
লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিয়া অত্যন্ত
হাসিল। পকাশ টাকা শৈলেনের কাছে

কিছুট নর তবু এত টাকাত দে কালীপদর
বাগে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ
অস্বাভাবিক করিতে পারিতনা। তাহার পরে
আবার এই নোটটুকুর লজ্জা এত সাধন!
সকলেই স্থির করিল দেখা যাক্ এই টাকাতা
থোরা গিয়া এই অস্বস্তি লোকটি কি রকম
কাজটা করে।

রাতি নটার পর ছেলে পড়াইয়া প্রান্ত
দেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছুই লক্ষ্য
করে নাই। বিশেষত মাথা তাকাত যেন
ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। বৃত্তিরাছিল এমন
কিছুদিন তাহার এই মাপার বসনা চলিবে।

পরদিন সে কাপড় বাহির করিবার লজ্জা
তত্ত্বপোষের নীচে হইতে টিনের বাস্কাটা
টানিয়া দেখিল বাস্কাটা খোলা। ঘষিত
কালীপদ স্বভাবত অসাধনান নর তবু তাহার
মনে হইল হয় ত সে চাবিখন্ড করিতে ভুলিয়া
গিয়াছিল। কারণ, ঘরে যদি চোর আসিত
তবে বাহিরের দরজার তালা বন্ধ থাকিত
না।

বাস্তব খুলিয়া দেখে তাহার কাপড়চোপড়
সমস্ত উলটপালট। তাহার বুক দিয়া খেল।
ভাড়াভাড়ি সমস্ত জিনিষপত্র বাহির করিয়া
দেখিল তাহার সেই মজ্জিত নোটপানি নাই।
কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগুলি আছে।
বারবার করিয়া কালীপদ সমস্ত কাপড় সবলে
ঝাড় দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না।
এদিকে উপরের তলার ছুই একটি করিয়া
লোক যেন আপন কাজে সঁজি দিয়া নাহিয়া
দেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বারবার
উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অট্টহস্তের
কোঠারা খুলিয়া গেল।

যখন নোটের কোনো আশাই রহিল
না এবং মাথার কষ্টে যখন জিনিষপত্র
নাটানাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর
হইলনা তখন সে বিছানার উপর উশুড় হইয়া
মৃতদেহের মত পড়িয়া রহিল। এই তাহার
মাতার অনেক ছুপের নোটপানি—জীবনের
কত সুখকে কঠিন ঘরে লেবণ করিয়া
দিনে দিনে একটু একটু করিয়া এই নোটপানি
সঞ্চিত হইয়াছে। একথা এই ছুপের ইতিহাস
সে কিছুই জানিত না, দেখিল সে তাহার
মাতার তারের উপর তার কেবল বাঁধাইয়াছে,
অন্যথেষ্ট দেখিল মা তাহাকে তাহার আত-
মিকের নিরন্ত আবেষ্টমান ছুপের নোট করিয়া
দইলেন দেখিল তার মত এমন গৌরব সে
তাহার বসে আর কখনো কোণ করে নাহি।
কালীপদ আপনাত জীবনে সব চেয়ে যে বড় ব্যক্তি,
যে মহত্ব আশ্রয়িত হইয়াছে এই নোটপানির
মধ্যে তাহাই পূর্ণ হইয়াছিল। সেই তাহার
মাতার অতলস্পর্শ দেহপুত্রমহনকরা অমূল্য
ছুপের উপহারটুকু ছুরি বাওরাকে সে একটা
পৈশাচিক অভিশাপের মত মনে করিল।
পানের পিঁড়ির উপর দিয়া পানের বদ্য অঙ্গ
বারবার শোনি। বাইতে লাগিল। অকারণ
গুঠা এবং নামার আর আর বিষম
নাই। গ্রামে মাগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছাই
হইয়া বাইতেছে আর ঠিক তাহার পান
দিয়াই কৌতুককর কলপনে নদী অবিরত
ছুটিয়া চলিয়াছে—এও দেই রকম।

উপরের তলার অট্টহস্ত ভুলিয়া এক
সময়ে কালীপদর ঘটাৎ মনে হইল এ চোরের
কাজ নয়;—একদৃষ্টে সে বৃত্তিতে পাবন
পৈশেঞ্জের দল কৌতুক করিয়া তাহার এই

নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও তাহার মনে এত ব্যক্তি নাই। তাহার মনে শুধু লাগিল যেন ধনদানগর্ভিত যুবকেরা তাহার মাঝের গায়ে হাত চুলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে, এই দি'ড়ি-টুকু বাহিয়া একদিনো সে উপরের ওপার পদার্পণও করে নাই। আজ তাহার গায়ে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়ে জুতা নাই, মনের আবেগে এবং মাথাধরার উত্তেজনায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে—সবেগে সে উপরে উঠিয়া পড়িল।

আজ চবিবার—কলেজে বাইবার উপসর্গ ছিল না। কাকের ছাদওরালা ব্যারাম্ভার বন্ধুগণ কেহবা চৌকিতে কেহবা বেতের মোড়ার বসিয়া কালীপদ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝখানে ছুটিয়া পড়িয়া ক্রোধগদগদবরে বলিয়া উঠিল—হিন্ আমায় মোটী দিন্ !

যদি সে খিনতির হরে বলিত তবে কল পাইত সম্ভব নাই। কিন্তু উদ্ভ্রান্ত অজ্ঞানতার দোষে তাহা নৈলেন অত্যন্ত ক্ষাপা হইয়া উঠিল। যদি তাহার বাড়ির দায়িত্বান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসত্যকে কনি বরিয়া দূর করিয়া দিত সম্ভব নাই। সকলেই ঝাড়াইয়া উঠিয়া একত্রে গর্জন করিয়া উঠিল, কি বলেন মশায় ! কিসের নোট !

কালীপদ করিল, আবার বাগ্ন থেকে আপনাতা নোট নিজে এসেছেন !

এতবড় কথা ! আমাদের চোর বলতে চান !

কালীপদ হাতে যদি কিছু থাকিত তবে সেই ব্রহ্মর্ষি সে খুনোখুনি করিয়া ফেলিত। তাহার রক্তম বেথিয়া চারপাচজনে মিলিয়া

তাঁহার হাত চাপিয়া দামল।

বাথের মত জ্বরহীতে লাগিল।

এই অত্যাচার প্রতিকার কবিবার তাহার কোনো শক্তি নাই—কোনো প্রমাণ নাই—সকলেই তাহার সম্বন্ধকে উদ্ভ্রান্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। বাহারা তাহাকে যত্নাবান যত্নদানে তাহার তাহার ঠেঁয়াকাকে অসহ্য বলিয়া বিষম আত্মপালন করিতে লাগিল।

সে যদি যে কালীপদের কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। নৈলেন একখানা একশোটাশার নোট বাহির করিয়া বলিল—দাও, বাতালটাকে দিয়ে এসেগে যাও।

সহচররা কহিল, পাগল হয়েছ ! তেজটুকু আগে মক্—আমাদের সকলের কাছে একটা রিটন্ আপনালি আগে দিচ্ তার পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে।

বলামত্রে সকলে শুইতে গেল এবং যুঝাইয়া পড়িতেও কাহারও বিলম্ব হইল না। সকলে কালীপদের কথা শ্রাব্য সকলে তুলিয়াই গিয়াছিল। সকলে কেহ কেহ দি'ড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তাহার ঘর হইতে কথা কনিত পাইল—তাবিল, হয় ত উকীল ডাকিয়া পরামর্শ করিতেছে। দরজা ভিতর হইতে খিল লাগানো। বাহিরে কান পাতিয়া বঁহা তুলিল তাহার মধ্যে আইনের কোনো সম্ভাব নাই, সমস্ত অসৎ প্রলাপ।

উপরে গিয়া নৈলেনকে খবর দিল। নৈলেন নামিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে কানিয়া ঝাড়াইল। কালীপদ কি যে বক্তৃত্তে ভুল বোকা বাইতেছে না, কেবল কপে কপে “বাথ” “বাথ” করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

তর হইল, হর ত সে নোটের নোকে পাগল হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে গুই তিনবার ডাকিল, কালীপদবাবু। কেহ কোনো সাড়া দিল না। কেবল সেই বিভিবিড় নকুন চলিতে লাগিল। নৈলেন পুনশ্চ উচ্চবরে কহিল—কালীপদবাবু দরজা খুলুন, আগনার সেই নোট পাওয়া গেছে। দরজা খুলিল না, কেবল নকুনির শুকনধ্বনি শোনা গেল।

যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে তাহা নৈলেন কল্পনাও কবে নাই। সে যুগে তাহার অমুসবধের কাছে অমুগোপনাকা প্রকাশ করিল না কিন্তু তাহার মনের মধ্যে বিবিন্দে লাগিল। সে বলিল, দরজা ভাঙিয়া ফেলা যাক্—কেহ কেহ পরামর্শ দিল, পুণিল ডাকিয়া আন—কি জানি পাগল হইয়া যদি হঠাৎ কিছু করিয়া বসে—কাল যে রকম কাণ্ড দেখিরাছি—সাহস হর না!

নৈলেন কহিল, না, ঐস একজন গিয়া অনাধি ডাক্তারকে ডাকিয়া আন। অনাধি ডাক্তার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিরা দরজার কান দিয়া বলিলেন—এ ত বিকার বলিয়াই বোধ হয়।

দরজা ভাঙিয়া তিতরে গিয়া দেখা গেল—তুজাপোলের উপর এলোমেলো বিছানা খানিকটা ঝট হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে—কালীপদ মেঝের উপর পড়িয়া—তাহার চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, কপে কপে হাত পা ছুঁড়িতেছে এবং প্রলাপ বকিতেছে—তাহার রক্তবর্ণ চোখ গুটা খোলা, এবং তাহার মুখে সেন বসু ফাটিয়া পড়িতেছে।

ডাক্তার তাহাব পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ

পরীক্ষা করিয়া নৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার আত্মীয় কেহ আছে ?

নৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন নকুন বেশি ?

ডাক্তার গভীর চেষ্টা কহিলেন, খবর বেগম ভাল, লক্ষণ ভাল নয়।

নৈলেন কহিল, ইহাদের লুকে আনাদের ভাল আগাপ নাই—আত্মীয়ের খবর কিছুট জানিবা। সন্ধান করিব। কিং উচিতমধ্যে কি করা কর্তব্য ?

ডাক্তার কহিলেন, এ পর চইতে রোগীকে এখনি বোতলার কোনো ভাল খবর লটয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাও চাই।

নৈলেন রোগীকে তাহার নিজের গরে লটয়া গেল। তাহার সহচরদের সঙ্কলকে তিড় কবিত্তে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল। কালীপদর মাথার বরকের পুঁটুলি লাগাটরা নিজের হাতে বাতাল করিতে লাগিল।

পূর্বেই বলিরাছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে শাছে কোনপ্রকার অবজা বা পরিদাল, করে এইজন্য নিজের পিতাবাতার সঙ্কল পরিচর কালীপদ ইহাদের নিকট হইতে গোপন করিয়া চলিরাছে। নিজে তাহাদের নামে যে চিঠি লিপিত তাহা সাবধানে ডাকঘরে দিয়া আদিত এবং ডাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আদিত—প্রত্যহ সে নিজে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আদিত।

কালীপদর বাড়ির পরিচর লটবার কল

আর একবার তাহার বাস্তু খুলিতে হইল । তাহার বাসেব মধ্যে দুইভাড়া চিঠি ছিল । এতোক ভাড়াটি অতি বড় কিতা দিয়া রাখা । একটা ভাড়াতে তাহার মাঝেব চিঠি—আর একটিতে তাহার পিতার । মাঝের চিঠি সংখ্যার অল্পই, পিতার চিঠিই বেশি ।

চিঠিগুলি হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং যোগীর বিছানার পাশে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল । চিঠিতে কিতানা পড়িয়াই একেবারে চব্বিরা উঠিল । পানিমাড়ি, চৌধুরীবাড়ি, ছয় আনী ! নীচে নাম দেখিল, ভবানীচরণ দেখলেন । ভবানীচরণ চৌধুরী !

চিঠি রাখিয়া, জুহু হইয়া বসিয়া সে কালীপদর সুখের দিকে চাহিয়া রহিল । কিছুদিন পূর্বে একবার তাহার লছরদেশে যথো ক্বে একজন বলিয়াছিল তাহার সুখের সঙ্গে কালীপদর সুখের অনেকটা মিলন মিলে । সে কথাটা তাহার মনেতে ভাল লাগে নাই । এবং অত্র সকলে তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিল । আর বৃত্তিতে পারিল, সে কথাটা অমূলক নহে । তাহার পিতামহের দুই ভাই ছিলেন—ভ্রামাচরণ এবং ভবানীচরণ, একথা সে জানিত । তাহার পরবর্তীকালের ইতিহাস তাহাদের ব্যক্তিতে কখনো আলোচিত হয় নাই । ভবানীচরণের যে পুত্র আছে এবং তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে জানিতই না । এই কালীপদ ! এই তাহার পুত্র !

শৈলেনের তখন মনে পড়িতে লাগিল, শৈলেনের পিতামহী, ভ্রামাচরণের স্ত্রী বতদিন পাঁচিয়াছিলেন, শেষ পর্যন্ত পরমখেতে তিনি

ভবানীচরণের কথা বলিতেন । ভবানীচরণের নাম করিতে তাহার দুই চক্রে জল ভরিয়া উঠিত । ভবানীচরণ তাহার শেষ বটে, কিন্তু তাহার পুত্রের চেয়ে বয়সে ছোট—তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতই মাহুষ করিয়াছেন । বৈশদিক নিম্নের বনন তাহার বয়স হইয়া গেলেন, তখন ভবানীচরণের একটু খবর পাইবার জন্য তাহার বন্ধ ভূষিত হইয়া থাকিত । তিনি ব্যবহার তাহার ছেলেরের । বলিয়াছেন—ভবানীচরণ নিত্যক অল্প ভালমাহুষ পলিগা নিম্নবই তোর । তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিল—আমার খবর তাহাকে এত ভালবাসিতেন, তিনি যে তাহাকে বিবাহ হইতে বঞ্চিত করিয়া দাইবেন একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না ।—তাঁহার ছেলেরা এবং কপাহ অত্যন্ত বিরক্ত হইত এবং শৈলেনের মনে পড়িল সেও তাহার পিতামহীর উপর অত্যন্ত রাগ করিত । এমন কি, পিতামহী তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানীচরণের উপরেও তাহার ভাবি রাগ হইত । বর্তমানে ভবানীচরণের যে এমন দরিত্র অবস্থা তাহাও সে জানিত না—কালীপদর অন্তরা দেখিয়া সকল কথা সে বৃত্তিতে পারিল এবং এতদিন মনস্ত্রয় প্রলোভনসত্ত্বেও কালীপদ যে তাহার অহুত্রে প্রবৃত্তিতে ভক্তি হয় নাই ইহাতে সে ভাবি গৌরব অহুত্ব করিল । যদি বৈবাহ্য কালীপদ তাহার অহুত্ব হইত তবে আর যে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না ।

(৪)

শৈলেনের দলের লোকেরা এতদিন প্রতঃহই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান

করিয়াছে । এই বাসাতে তাহারের মাঝখানে কাকাকে শৈশবের মাদিতে পারিল না । ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া অতি যত্নে তাঁহাকে এঁচটা ভাল-বাড়িতে স্থানান্তরিত করিল ।

ভবানীচরণ শৈশবের চিঠি পাইয়া একটি সঙ্গী আশ্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতার ছুটিয়া আসিলেন । আসিবার সময় বাবুল হইয়া রাসমণি তাহার কষ্টলগ্নিত অর্ধের অধিকংশই তাহার স্বামী হাতে দিয়া বলিলেন, দেখো যেন অবস্থা না হয় । যদি ভেতন বোঝো আমাকে খবর দিলেই আমি যাব ।—চৌধুরীবাড়ি বস্তু শব্দে হটহট করিয়া কলিকাতার বাগার প্রস্তাব এতটুকু অস্বস্তি যে প্রথম সংবাদেই তাহার বাগার ঘটিল না । তিনি স্বাক্ষরকালীর নিকট মান্ত করিলেন এবং প্রাচীণ্যকে ডাকিয়া সন্তান করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন ।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া ততবুদ্ধি হইয়া গেলেন । কালীপদর তখনো ভাগ করিয়া জ্ঞান হয় নাই ; সে স্ত্রীকে মাষ্টার মখার বলিয়া ডাকিল—ইহাতে স্ত্রীও বুক ফাটিয়া গেল । কালীপদ প্রায় মারের মাঝে প্রলাপে, বাবা বাবা বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল—তিনি তাহা । হাত ধরিয়া তাহার মূণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চবেগে বলিতেছিলেন—এই যে বাবু, এই যে আমি এগছি ।—কিছু সে যে তাঁকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না ।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, অর পূর্ণের চেয়ে কিছু কমিয়াছে, হঠাৎ এবার ভালর দিকে যাইবে । কালীপদ ভালর দিকে

যাইবে না একথা ভবানীচরণ মনেই করিতে পারেন না । বিশেষত তাহার শিশুকাল হইতে লকণেই বলিয়া আসিতেছে কালীপদ বড় হইয়া একটা অশাণ্ড সাধন করিবে—সেটাকে ভবানীচরণ কেবলমাত্র শোক-মুখের কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই—সে বিখ্যাত একেবারে তাহার সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল । কালীপদকে বাড়িতেই ছেলে, এ তাহার ভাগ্যের লিখন ।

এই কারণে, ডাক্তার যতটুকু ভাল বলে তিনি তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভাল ভবিষ্যৎ বলেন এবং রাসমণিকে যে পর দেখেন তাহাতে আশঙ্কা কোনো কথাই থাকে না ।

শৈশবের ব্যাপারে ভবানীচরণ একেবারে আকর্ষ্য হইয়া গেলেন । সে যে তাহার পরমাত্মীয় নহে এ কথা কে বলিবে ! বিশেষত কলিকাতার সুশিক্ষিত স্ত্রীভা-
-হেলে হইয়াও সে তাহাকে বেরকম ভক্তিভ্রম করে এমন ত দেখা যায় না । তিনি ভাবিলেন কলিকাতার ছেলেদের বুঝি এই প্রকারই স্বভাব । যেন যেন ভাবিলেন সে ত হবারই কথা, আমাদের পাড়ারগে-
ছেলেদের শিক্ষাই বা কি আর লবৎই বা কি !

অব কিছু কিছু কবিতা লাগিল এবং কালীপদ ক্রমে চৈতন্যলাভ করিল । পিতাকে লম্বার পাশে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, জাবল, তাহার কলিকাতার অবস্থার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে বলা গড়িল । তাহার চেয়ে ভাবনা এই যে, তাহার প্রাম্য পিতা সহরের ছেলেদের পরিহাসের

পাত্র হইয়া উঠিবেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না, এ কোন ঘর! মনে হইল, এ কি অগ্নি দেখিতেছি!

তখন তাহার বেশি কিছু চিন্তা করিবার লক্ষ্য ছিল না। তাহার মনে হইল অগ্নির খবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভাল বাসায় আনিয়া রাখিরাছেন। কি করিয়া আনিলেন, তাহার খরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন, এত খরচ করিতে থাকিলে শেষে কিরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইবে সে সব কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই। এখন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেমস্ত সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার যেন দাবি আছে।

একদমেরে যখন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমন সময় নৈলেন একটি পায়ে কিছু জল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কিছু পরিহাস আছে না কি। প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই যে, পিতাকে ত ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

নৈলেন কলের পাত্র টেরিবার উপর রাখিয়া পায়ে খরিয়া কালীপদকে প্রণাম করিল এবং কহিল, আমি গুরুতর অগ্ৰাধ করিয়াছি আমাকে মাগ করুন।

কালীপদ লম্বা হইয়া উঠিল। নৈলেনের মুখ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল তাহার মনে কোনো অপটভা নাই। প্রথম যখন কালীপদ ঘেসে আনিরাছিল এই ঘোবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হৃদয়

যুগ্মী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু সে আপনার দারিদ্র্যের সঙ্কোচে কোনো দিন ইহার নিকটেও আসে নাই। যদি সে সমকক্ষ লোক হইত—যদি বন্ধুর মত ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার শব্দে স্বাভাবিক হইত তবে সে কত খুশি হইত—কিন্তু পরম্পর অত্যন্ত কাছে থাকিলেও মাঝখানে আগার ব্যবধান লক্ষ্য করিবার উপায় ছিল না। মিঁড়ি দিয়া যখন নৈলেন উত্তীর্ণ হইয়া আসিত, তখন তাহার দৌণীম চাপরের হৃদয় কালীপদের অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত—তখন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হস্তপ্রসূর চিত্তায়েগাধীন তরুণ যুথের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই মুহূর্তে কেবল কণকালের ক্ষণ তাহার সেই স্মারসংস্পর্শে কোণের ঘরে পূর সৌন্দর্যলোকের ঐশ্বর্য বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল হইত। তাহার পরে সেই নৈলেনের নির্দিষ্ট তাকিয়া তাহার কাছে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। আজ নৈলেন যখন কলের পাত্র বিছানার তাহার সমুখে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঐ হৃদয় যুথের দিকে কালীপদ দ্বারা একবার তাকাইয়া দেখিল। কন্য়ার কথা সে যুখে কিছুই উচ্চারণ করিল না—আজ্ঞে আজ্ঞে ফল তুলিয়া ধাইতে লাগিল—ইহাতেই বাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গেল।

কালীপদ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিল তাহার প্রাণ পিতা ভবানীচরণের

সব শৈশবের সুখ ভাব জমিরা উঠিল। শৈশবের ঠাণ্ডাকে ঠাণ্ডা বসে, এবং শরৎকালের মধ্যে অবাধে ঠাট্টাতামাশা চলে। তাহার উভয়পক্ষের হাতকৌতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অসুস্থিত ঠাকুরপদিনি। এতকাল পরে এই পরিবাসের দক্ষিণবাহুর হিম্মলে ভবানীচরণের মনে যেন বৌবনস্থতির পূজক সঞ্চার করিতে লাগিল। ঠাকুরপদিনির অস্তিত্বভিত্তি আচার আমসত্ত্ব প্রকৃতি সমস্তই শৈশবে রোগীর অনবধানভাগ। অবশ্যে ছুরি করিয়া নিঃশেষে খাইয়া ফেলিয়াছে একথা আজ সে নিঃসঙ্কটে বোকার করিল। এই ছুরির খবরে কালীপদর মনে বড় একটা গভীর আনন্দ হইল। তাহার মনের হাতের সামগ্রী সে বিষের নোকে ডাকিয়া খাওয়াইতে চাহ যদি তাহারাই ইহার আদর থাকে। কালীপদর কাছে আজ নিজের রোগের লক্ষ্য আনন্দসভা হইয়া উঠিল— এমন স্থল তাহার জীবনে সে আরই পাইরাছে। কেবল কণে কণে তাহার মনে হইতে লাগিল আচ্ছা মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুকপরাশর হৃদয় দুটি কণে কণে রহে করিতেন সেই কথা সে কখনো করিতে লাগিল।

তাহাদের কলকসম্ভার কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল যেখানে আনন্দ প্রবাহে মাঝে মাঝে বড় বাধা দিত। কালীপদর মনে যেন দারিদ্র্যের একটা অভিমান ছিল— কোনো একসময়ে তাহার প্রচুর ঐখ্যো ছিল একথা লইয়া বৃথা পক্ষ করিতে তাহার তাঁর লজ্জা বোধ হইত। আমরা গরিব, এ কথাটাকে কোনো “কিছু” দিচ্চা চাশা দিতে

সে ঘোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও যে তাহার ঐখ্যোর দিনের কথা পক্ষ করিয়া পাড়িতেন তাহা নহে। কিন্তু সে যে তাহার স্থপের দিন ছিল—তখন তাহার বৌবনের দিন ছিল। বিবাহসম্বন্ধ সংসারে বীজবৎ-মুষ্টি তখনো ধরা পড়ে মাই। বিশেষত ভবানীচরণের স্ত্রী, তাহার পরমপ্রেমপালিনী স্নাতৃব্রাণা রমাসুন্দরী, যখন তাহার সংসারের পৃথিবী ছিলেন তখন সেই লক্ষ্যের ভবা ভাবারের দ্বারে দাঁড়াইয়া কি অল্প আদরই তাহার স্ত্রীরাছিলেন—সেই অস্বস্তি স্থপের দিনের স্থতির ছটাতেই ত ভবানীচরণের জীবনের লক্ষ্য পোনার মত হইয়া আছে। কিন্তু এই লক্ষ্য হ্রস্বস্থি আপোচনার মান্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া ফেলি সে উইল ছুরির কথাটা আসিয়া পড়ে। ভবানীচরণ এই প্রশ্নে তার উত্তরিত হইয়া পড়েন। এখনো সে উইল পাওয়া যায় এ সবকি তাহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই— তাহার স্ত্রীসাম্রী মায় কথা কখনই বার হইবে না। এই কথা উঠিয়া পড়িলেই কালীপদ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিত। সে জানিত এটা তাহার পিতার একটা পাগলামিয়ার। তাহার মনে ছেলে এই পাগলামিকে আশোনে প্রস্রবণ দিয়াছে কিন্তু শৈশবের কাছে তাহার পিতার এই দুর্বলতা প্রকাশ পায় এ তাহার কিছুতেই ভাল লাগে না। কতবার সে পিতাকে বলিয়াছে, না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।—কিন্তু একদা তর্কে উঠা ফল হইত। তাহার সন্দেহ যে অসুপক নহে তাহা প্রমাণ করিবার ক্ষমতা সমস্ত ঘটনা •

তিনি তর তর করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তখন কালীন্দ্র নানা চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাঁহাকে থামাইতে পারিত না।

বিশেষত কালীন্দ্র ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, এই এসকটা কিছুতেই শৈলেনের ভাল লাগে না। এমন কি, সেও বিশেষ একটু যেন উত্তেজিত হইয়া ভবানীচরণের মুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিত। অল্প সকল বিষয়েই ভবানীচরণ আর সকলের মত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন—কিন্তু এই বিষয়টোতে তিনি কাহারও কাছে হার মানিতে পারেন না। তাহার মা পিতৃঘৃণতে পড়িতে আনিতে—তিনি নিজে হাতে তাহার পিতার উইল এবং অল্প দলিলটা বাস্তবে বদ্ধ করিয়া লোহার দিগ্ধকে জুগিয়াছেন; অথচ তাহার সামনেই মা এখন বাস্তব খুলিলেন তখন যেখা গেল অল্প দলিলটা। যেমন ছিল তেমনি আছে অথচ উইলটা নাই, ইহাকে চুরি বলা হইবে না ত কি! কালীন্দ্র তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য সন্মিত—তা বেশত বাধা, বাধা তোমার বিষয় ভোগ করিতেছে তারা ত তোমারি ছেলেরই মত, তারা ত তোমারি ভাইপো। সে সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে—ইহাই কি কম স্নেহের কথা!—শৈলেন এসব কথা বেশক্ষণ সহিতে পারিত না, সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া বাইত। কালীন্দ্র মনে মনে নীড়িত হইয়া ভাবিত—শৈলেন মরত তাহার পিতাকে অর্থলোভে বিব্রীত বিনিয়া মনে করিতেছে, অথচ তাহার পিতার মধ্যে বৈয়াক্ততার নামগন্ধ নাই একথা

কোনোমতে শৈলেনকে বুঝাইতে পারিলে কালীন্দ্র বড়ই আরাম পাইত।

এতদিনে কালীন্দ্র ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচয় নিশ্চয় প্রকাশ করিত। কিন্তু এই উইল-চূর্ণিৎ আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল! তাহার পিতা পিতামহ যে উইল চুরি করিয়াছেন একথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না, অথচ ভবানীচরণের পক্ষে শৈতৃক বিবরণের প্রাচ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘ আছে সেকথাও সে কোনোমতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই এসবকে কোনোপ্রকার তর্ক করা সে পক্ষ করিয়া দিল—একবারে সে চূর্ণ করিয়া থাকিত—এবং যদি কোনো স্নেহেগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া বাইত।

এখনো বিকালে একটু আর অল্প আশিয়া কালীন্দ্রের মাথা ধরিত কিন্তু সেটাকে সে রোগ বিনিয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জন্য তাহার মন উবিদ হইয়া উঠিল। একবার তাহার কলারশিপ কস্কাইয়া গিয়াছে আর ত দেহের হইলে চলিবে না। শৈলেনকে লুকাইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল—এসবকে ভ্রাতারের কঠোর নিষেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ করিল।

ভবানীচরণকে কালীন্দ্র কহিল, বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া যাও—সেখানে মা একলা আছেন। আমি ত বেশ পারিয়া উঠিয়াছি।

শৈলেনও বলিল, এখন আপনি গেলে কোনো ক্ষতি নাই। আর শু ভাবনার কারণ কিছু দেখি না। এখন যেটুকু আছে সে

৩৫শ বর্ষ, ৪ঠা মাঘ।

রাসমণির ছেলে।

দ্বিদিনেই সারিয়া বাইবে। আর, আদরা ত আঁছি।

ভবানীচরণ কহিলেন—দে আমি বেশ জানি; কালীপদর লজ্জা তাবনা করিবার কিছুই নাই। আমার কলিকাতার আগিবার কোনো আয়োজনই ছিল না, তবু মন মানে কই তাই! বিশেষত তোমার ঠাকরণ দিদি যখন যেটি ধরেন সে ত আর ছাড়াইবার আশা নাই।

শৈলেন হাসিয়া কহিল—ঠাকুর্দা তুমিইত আদর দিয়া ঠাকুর্দাদিদির একেবারে মাটি করিয়াছ।

ভবানীচরণ হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা তাই আচ্ছা, যের যখন মাথবো আগিবে তখন তোমার শাসনপ্রণালীটা কি রকম কঠোর আকার ধারণ করে দেখা বাইবে।

ভবানীচরণ একান্তভাবে রাসমণির সেবার পালিত জীব। কলিকাতার নানা একবার আদর আয়োজনও রাসমণির আদর বস্ত্রের অভাব কিছুতেই পূরণ করিতে পারিতেন নাই। এই কারণে যের বাইবার লজ্জা তাহাকে বড় বেশি অনুভব করিতে হইল না।

সকাল বেলায় জিনিষ পত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন এখন পদর কালীপদর যের গিয়া দেখিলেন তাহার চোখবুখ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে—তাহার গা বেন আতনের মত গরম;—কাল অর্ধেক রাত্রে সে লজ্জিক মুখই করিয়াছে, বাকি রাত্রি এক নিমেষের লজ্জাও ঘুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর দুর্কলতা ত সারিয়া উঠে নাই, তাহার উপরে আবার রোগের এবল আক্রমণ

দেখিয়া ডাক্তার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শৈলেনকে মাড়ালে ডাক্তার লইয়া গিয়া বলিলেন, এবার ত গতিক ভাল বোধ করিতেছি না।

শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, দেখ ঠাকুর্দা, তোমারও কষ্ট হইতেছে রোগীরও বোধ হয় ঠিক তেমন সেবা হইতেছে না, তাই আমি বলি আর দেখি না করিয়া ঠাকুর্দাদিদিরকে আনানো যাক।

শৈলেন যতই চাকিয়া বলুক একটা প্রকৃত ভর আসিয়া ভবানীচরণের মনকে অতিক্রান্ত করিয়া ফেলিল। তাহার হাত পা পরপর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, তোমরা যেমন ভাল বোক কুই কর!

রাসমণির কাছে চিঠি গেল তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতার আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতার পৌছিয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টামাত্র কালীপদকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকালের অবস্থায় দে রহিয়া রহিয়া মাকে ডাকিয়াছিল—সেই জনিস্তলি তাহার বুকে বিঁধিয়া রহিল।

ভবানীচরণ এই আশাত সহিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভাল করিয়া একাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না—তাহার পুত্র আবার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিনীত হইল—স্বামীর মধ্যে আবার দুই জনেরই তার তাহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাহার প্রাণ বলিল আর আবার সহ না। তবু তাহাকে সহিতেই হইল।

৪

ৰাজি তখন অনেক। গভাৰ শোকের একান্ত ঐকিতে কেবল অণকালের ক্ষুদ্র তালমণি অচেতন হইয়া গুৰাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণের ঘুম হইতে ছিলনা। কিছুক্ষণ বিছানায় এ পাশ ওপাশ করিয়া অশেষে নীৰ্খানবাস সহকারে "হয়ামব হরি" বলিয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন। কালীপদ যখন গ্রামের বিজ্ঞানঘেই পড়িত, যখন সে কলিকতায় বাস নাই তখন সে যে-একটি কোণের ঘরে বলিয়া পড়াক্তা করিত ভবানীচরণ কল্পিত হস্তে একটি প্রদীপ ধরিয়া সেই শূন্যঘরে প্রবেশ করিলেন। তালমণি হাতে চিত্র করা ছিন্ন কাঁথাটি এখনো তক্তাপোষের উপর পাঠা আছে, তাহার নানাব্যানে এখনো সেই কালীর মাগ হুইয়াছে; বলিন দেহাণের গায়ে কলগার আঁকা সেই জ্যামিতির বেগাগুলি দেখা যাইতেছে; তক্তাপোষের এক কোণে কতকগুলি হাতে বাঁধা ময়লা কাগজের পাতার নৰে তৃতীয়পত্নী রমাল রীডারের ছিন্নাংশে আজিও পড়িয়া আছে। আর—হায় হায়—তার ছেলে বৎসের ছোট পায়ের এক পাট চটি যে ঘরের কোণে পড়িয়াছিল তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ তাহা সকলের চোখে বড় হইয়া চোখে বেগা দিল জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই বাহা আজ ঐ ছোট জুতাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

সুদূৰ্ব্বিতে প্রদীপটি রাখিয়া ভবানীচরণ সেই তক্তাপোষের উপর আঁদিয়া বসিলেন।

• তাহার গুচ্ছ চোখে জল আসিল না, কিন্তু

তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল—যথেষ্ট পরিমাণে নিখাস লইতে তাঁহার পাখর ঘেঁষে কাটিয়া যাইতে চাহিল। ঘরের পুষ্কদিকের সমস্তা খুলিয়া দিয়া সরাসরি ঘাইয়া ভান বাহিরের দিকে চাহিলেন।

অন্ধকার রাত্রি—টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সম্মুখে আটোরেগেটিত খন জল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার যথের সামনে একটুখানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখনো তাহার বহুশ্রেয় রোপিত স্তম্ভকালতা ককির বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সজীব আছে—তাঁহা ফুলে ফুলে তরিতা গিয়াছে।

আজ সেই বাগকের বয়লাপিত বাগানের দিকে চাইয়া তাঁহার প্রাণ মেন কঠোর কাছে উঠিয়া আসিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; জীয়েব সময় পুকার সময় কলেশের ছুটি হয় কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র তাঁহার বরিত্র ঘর শূন্য হইয়া আছে সে আর কোনো দিন কোনো ছুটিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। "ওরে বাপ আমার!" বলিয়া ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বলিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাঁহার বাগের দারিত্র্য ঘুড়াইবে বলিয়াই কলিকাতার গিয়াছিল কিন্তু জগৎ সংসারে সে এই বৃদ্ধকে কি একান্ত নিঃসহন করিয়াই চলিয়া গেল! বাহিরে বৃষ্টি আস্তো চোপিয়া আসিল।

এমন সময় অন্ধকারে বাস-পাতার মধ্যে পারের শব্দ শোনা গেল। ভবানীচরণের বুকের মধ্যে বড়ানু করিয়া উঠিল। বাহা কোনো মতেই আশা করিবার নহে



আশা করিয়া বলিলেন।
 হইল কালীন্দ্র গেন বাগান
 লগাছে। কিন্তু সূতি যে মূলদারায়
 ... — কয়ে ভিকিবে, এই অলস উৎসেগে
 যখন তাঁহার মনের ভিতরটা ঢকল হইয়া
 উঠিয়াছে এমন সময়ে কে গরাদের বাহিরে
 তাঁহার ঘরের দায়ে আসিয়া বৃহত্ত্বকালের
 জন্ত দাঁড়াইল। চাবির বিয়া পে মাথা হুড়ি
 দিয়াছে—তাঁহার মূখ তিনিবার কো নাই।
 কিন্তু সে বেন মাগার কালীন্দ্রই মত হইবে।
 এগেছিস্ বাপু—বলিয়া ভবানীচরণ তাঁড়াতাড়ি
 টুটিয়া বাহরের দরজা খুলিতে গেলেন।
 ষার খুলিয়া বাগানে আসিয়া সেই ঘরের
 লগুণে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কেহই
 নাই। সেই সূতিতে বাগানঘর ঘুরিয়া
 বেড়াইলেন কাহারো দেখিতে পাঠিলেন
 না। সেই নিঃশব্দতায় অন্ধকারের
 মধ্যে ঝড়োটা তাঁড়া গলাব একবার
 “কালীন্দ্র” বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—
 —কাহারও সাড়া পাঠিলেন না। সেই ডাকে
 নটু ঢাকড়া গোহাল ঘর হইতে বাহির হইয়া
 আসিয়া অনেক করিয়া সূতকে ঘরে লইয়া
 আসিল।

পরদিন সকালে নটু ঘর খাঁট দিতে গিয়া
 দেখিল গরাদের সামনেই ঘরের ভিতরে
 পুঁচু লিতে বাবা একটা কি পড়িয়া আছে।
 সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আসিয়া দিল।
 ভবানীচরণ খুলিয়া দেখিলেন একটা পুরাতন
 বলিলের মত। চমকা বাহির করিয়া চোখে

লাগাইয়া একটু পড়িয়াই তিনি তাঁড়াতাড়ি
 ছুটিয়া রাসমণির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন
 এবং কাগজখানা তাঁহার নিকট মেলিয়া
 ধরিলেন।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কি ও?
 ভবানীচরণ কহিলেন—সেই উইল।
 রাসমণি কহিলেন—কে দিল?
 ভবানীচরণ কহিলেন—কাগজায়ে
 আসিয়াছিল—সে বিয়া গেছে।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি
 হইবে?
 ভবানীচরণ কহিলেন—আর আবার
 কোনো দরকার নাই। বলিয়া সেই বলি
 ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এ লংবাটো পাড়ার পশ্চিমী রুটিয়া গেল তখন
 বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া লগুণে বলিল
 —আমি বলি নাই, কালীন্দ্রকে দিয়াই উইল
 উদ্ধার হইবে?

রাসচরণ হুঁদী কহিল—কিন্তু দাদাঠাকুর,
 কাল যখন রাত দশটার গাড়ি এঠেপনে
 পৌছিল তখন একটা স্তম্ভর দেখিতে বাবু
 আমার দোকানে আসিয়া চৌধুরীদের বাড়ির
 লথ জিজ্ঞাসা করিল—আমি তাহাকে
 দেখাইয়া দিলাম। তার হাতে বেন কি একটা
 দেখিয়াছিলাম।—

“আরে ব্রহ্ম” বলিয়া এ কথাটাকে বগলা-
 চরণ একেবারেই উড়ানিয়া দিল!

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

সর্পস্ফাটীয় বিরাট সম্মিলন ।

‘সামান্যস্বপ্নাশ্রয়’এই অর্থও আছে যে সমস্ত লতনে পৃথিবীর সর্পস্ফাটীয় একটি বিরাট সম্মিলন (Universal Races Congress) হইয়া গিয়াছে । এই বিরাট সম্মিলনে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে হইতে সমবেত প্রতিনিধিরা সর্পস্ফাটীয় মানব সমাজের মধ্যে মিলনের যান্ত্রি যোগাযোগ করিয়াছেন ।

যেদিন বেতকার আর্গোয়া ন্যা এগিয়ার ত্রিভূতীর্ষ অঙ্ককারের অর্থ্য তেন করিয়া আলোকময় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জ্ঞান ও শক্তির অতীন্দ্রিয় পরিবার স্তম্ভ বিভিন্ন পথে প্রবেশ করিলেন। যেদিন তাঁহারা কখনো মাই যে পথ পথ বৎসর পরে বর্ষ ও আচার ব্যবহারের প্রভেদ কয়ে কয়ে আকৃতিগত ও অকৃতি-গত পার্থক্য লইয়া, পুরুষদের হস্তগোবধেই পরম স্তম্ভলাভ করিলে । এই বিবেচন্যহস্তের সর্পস্ফাটীয় করিয়া বিশ্বমানবকে পাণ্ডি, ভালমালা ও এককের পথে চলিত করা ই এই মিলনযজ্ঞের উদ্দেশ্য ।

আজ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেই যীকার করিয়াছেন যে এই বিশেষ লক্ষ্যী বিজ্ঞানের সূত্র : (বিজ্ঞানলক্ষ্যী) তাঁহার সব সব আবিষ্কার ও পদার্থের যাত্রা ধর্ম ও ধার্মিক অর্থের উপর আপনাদের বিপরীত অস্বাভাবিকভাবে যোগাযোগ করিতেছেন । কিন্তু একটিকে বিজ্ঞানলক্ষ্যী যেমন জ্ঞানের প্রতীকগণিত হতে আদ্যমিথ্যে কয়ে — তাঁরই পথে লইয়া হইতেছেন, সেইজন্য বিশ্বসংস্কৃতির ঐক্যবোধ বর্ধনোত্তর ও বিবেচন্যসিদ্ধতা আদ্যের যোগ-যাত্রার পথে এক বিবিধ অঙ্ককারমালাপাত করিয়াছে । এবং আশ্চর্য্য এই যে, বিশেষ লক্ষ্যীতে এই বিবিধ বিবেচন্যমালা কয়ে পড়ার হইয়া থাকিতেছে । মনের উদারতা ও সামান্যীতির অর্থাৎ ভারতবর্ষে সমাজের মধ্যে জ্ঞেয়, বর্ষ প্রভৃতির উত্তর হইয়া মানবের এককের পথে কষ্টক উপলব্ধ করিয়াছে । আর পাশ্চাত্য জাতিরা উদারতা, সামান্যত ও মিলনের যান্ত্রি প্রচার করিয়াও কৃষ্ণকার জাতির উপর যে

অস্ত্রায় অস্ত্রাচার করিতেছেন তাহা ভাব্যে হইতে হয় । এমন কি যেতকাল আমেরিকানরা কৃষ্ণকার নিগোম্বিগের সহিত এক যাত্রার অর্থ্য করিত, এক উপাদানালয়ে উপাদান করিতে, এক যেল গাড়ীতে অর্থ্য করিতেও অপমানিত যোগ্য হইতেন ।

বিপণ্ন হিত মাৎক একজন হুসুজা আমেরিকান পাণ্ডী নিগোম্বিগের স্তম্ভ এক প্রাণী পুত্রকে লিখিয়াছেন :—

“This rule you should always carry in your mind that is, you should do all service for your masters as if you did it for God Himself.....You are to do all service to them as unto Christ. Failing to do this, you will be turned over to the devil to become his slaves for ever in hell.”*

মানুষ আপনাদের বর্ধের সীতি ভুলিয়া কতকগুলি মানব-মণ্ডল হইয়া পড়ে তাহিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় । সীতি নহি আজ পুনরায় বর্ধরাজ্য হইতে পৃথিবীতে ফিরায়া আসেন তাহা হইলে হস্ত উদার যেত শিশুদিগের ব্যবহার দেখিয়া সুপার ও লক্ষ্যায় বর্ধ-হস্ত হইয়া পুনরায় বর্ধরাজ্যে ফিরায়া যান ।

প্রাচীন ভারত এককালে এ বিশ্বের যেসকল উদারতার সূত্রই সেগাইয়াছে তাহা আজ বিশেষ পণ্ডিতগণে সভ্যতাভিমানী জাতির অস্বাভাবিক । যখন কোঁচ-এশীতির জাতি কল্পনেনেত্র ভারতমাতার দ্বারে আজকের স্তম্ভ উপস্থিত হইয়াছে তখন তাহাকে ভারতমাতা কল্যাণময়ী হাতুড়পে আশ্রয় আরম্ভের মধ্যে আশ্রয় দিতাছেন । পাণ্ডী, খ্রীষ্টান, যোগদ ও পাঠানোমা আলর প্রাপ্ত হইয়া ভারতমাতার বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু আজ এই বৃহৎ ও চৈতন্যের যোগে বিশ্বজাতির মধ্যে মানা প্রচার জ্ঞেয়

*Vide Modern Review for August 1911.